প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অ

কবিতা) ... শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ... ৬১
(গল্প) ... শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ...
বিতা) ... শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ...

আ

বৃষ্টি ... শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস ...

উ

কবিতা) ... শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ...
নী (গল্প) ... শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ... ৪

এ

বিবাহ ... শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ... ১৯

ও

গতি ... শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম্. এ. ... ৬৬৭

ক

তাকুঞ্জ ২৬৩, ৭১৪
... শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্. এ. ... ৬৮৩
ব্যকথা ... শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ... ৩০০
ল আঁখি (কবিতা) ... শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ... ৭১৫
ঙ্করসেনের গড় (গল্প) ... শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ২৩৮
শীনগর ... শ্রীবীরেশ্বর ... ২২৭
শীনগরের আবিষ্কার ... শ্রীবীরেশ্বর ... ৭৭২
কুহুরব (কবিতা) ... শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু ... ২৬৩
কাকিল (কবিতা) ... শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধর ... ২৬৪
কৌমার ... শ্রীচন্দ্রশেখর ... ৩২৯

গ

"গঙ্গা গঙ্গা কতখানি জল ?" ... শ্রীশচীভূষণ ... ৫১
গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ... শ্রীজলধর ... ৩৮৩

TORN AND DAMAGE PAGE(S)

চুণার ... কুমা

জলাঞ্জলি (গল্প) ... শ্রীসু
জননী (কবিতা) ... শ্রীপ্রি
জন্মোৎসবে ... শ্রীহে
জাপানের পত্র ... শ্রীপা

ডাক্তার (গল্প) ... শ্রী

দাদার কাণ্ড (গল্প) ... ঐ
দিনেকের শিশু (কবিতা) ...
দুই ভাই (গল্প) ...

নদীতীরে (কবিতা)
"নয়শো রূপেয়া"
নিশীথে (কবিতা)

প্রতীত্য-সমুৎপাদ

ফতেপুর শিক্‌রি

বকুল (কবিতা)
বন্যা (গল্প)
বর্ষান্তে (কবিত
বসন্ত (কবিতা
বসন্তে (কবিত
বায়ুর অল্পতা
বিজ্ঞানেশ্বর

র শ্রীশরৎকুমার রায়, বি. এ.

জ

ীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এল্.
য়নাথ সেন ...
মেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ...
ীব্রাজক ...

ড

মন্দ্রকুমার রায় ...

দ

লশচন্দ্র মজুমদার
য়কুমার বড়াল ... ...
মন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ...

ন

সরোজকুমারী দেবী ...
রদাস মুখোপাধ্যায় ...
নরলাবালা সরকার ...

প

মন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ. ...

ফ

বেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৪৯

ব

নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ১৮৪
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্. এ. ... ৬৯১
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৬৩
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৭১৪
নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ৭৭৬
গদানন্দ রায় ৩৭৬
ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ. ... ২৯

ারাধনের বট (গল্প) ... শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৬৩৫
য়েনের অনুবাদ (কবিতা) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৩৯২ ৩৫৩
দয়-বীণা (কবিতা) ... শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ৩৮২ ২৬৩
হেমাদ্রি ... শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ. ... ২২০

এল্.
৪৭৬

২৯২

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

অ

অক্ষয়কুমার বড়াল

দিনেকের শিশু (কবিতা) ১২৯
সতী (গাথা) ... ৫০২

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি. এল্.

মহারাজা রামকৃষ্ণ ... ২৪, ১৬৬
সেকালের কলিকাতা গেজেট ১৫৯

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত

সাক্ষিগোপাল ... ৭৬২

ক

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ.

মোহনলাল ... ৮৬

কুঞ্জবিহারী বসাক

মানবের সুখ (কবিতা) ... ২৬৪
সংসারের পথে (কবিতা) ... ৭১৫

চ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়,

একনিষ্ঠ বিবাহ ... ১৯
কৌমার ... ৩২৯

জ

জগদানন্দ রায়

বায়ুর অল্পতা ... ৩০৬
বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ... ৫৫
মঙ্গল গ্রহের জীব ... ৩৮

জলধর সেন

শতবর্ষপূর্ব্বে বদরিকাশ্রম ৩৭৪

ঠ

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

"নয়শো রূপেয়া" ... ৭৩
সাহিত্য-পঞ্জী ... ২৪৮, ৩৯৭

ত

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্.এ.

বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট ... ২৯
রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণ ৪৩৩
হেমাদ্রি ২২০

দ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

ডাক্তার (গল্প) ... ৫৫৮
যমজ-কৌতুক ... ৩০৮

দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ফতেপুর শিক্‌রি ... ৪৯০

ভারতবর্ষে ... ৬৪৬, ৬৮৬

ন

নবীনচন্দ্র সেন

ভানুমতী ... ১১২, ২০১, ২৭৩, ৫৪১, ৬০১, ৬৫০, ৭১৭

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্‌. এ.

বন্যা (গল্প) ... ৬৯১

নিখিলনাথ রায়, বি. এল্‌.

মীরণের পরিণামরহস্য ... ১৩৭

যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয় ৫২৫, ৬১৫

নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্‌. এ.

অবোধ (কবিতা) ... ৬১

অশ্বা (কবিতা) ... ৫৭৪

উন্মাদিনী (গল্প) ... ৪১৫

কাব্য-কথা ... ৩০০

কুহুরব (কবিতা) ... ২৬৩

বসন্তে ... ৭৭৬

বকুল (কবিতা) ... ১৮৪

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রার্থনা (কবিতা) ১৯৩

হৃদয়-বীণা (কবিতা) ... ৩৮২

প

পরিব্রাজক

জাপানের পত্র ... ৫৫৪

প্রমীলা নাগ

শিশু (কবিতা) ... ৩১২

প্রিয়নাথ সেন

জননী (কবিতা) ... ৭০৬

ব

বিনয়কুমারী ধর

কোকিল (কবিতা) ... ২৬৪

বীরেশ্বর গোস্বামী

কুশীমগর ... ২২৭

কুশীনগরের অবিষ্কার ... ৭৭২

ম

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, এম্‌. এ.

মৌর্য্যসম্রাট অশোক ৩৬২, ৪৯৬, ৬০৯,

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

রাজা বীরবল ... ৩৪৩

মানকুমারী বসু

শেষকথা (কবিতা) ২৬৩

য

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কাল আঁখি (কবিতা) ... ৭১৫

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কিঙ্করসেনের গড় (গল্প) ২৩৮

যোগেশচন্দ্র রায়, এম্‌. এ.

ওষধিপতি ... ৬৬৭

ভারত-যুদ্ধকাল ও সপ্তর্ষির গতি ৭৪০

র

রজনীকান্ত গুপ্ত

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ৩৮৩

ভাষা ও সাহিত্য ... ১৫৫

মোহনলাল ... ৩৯৩

রমণীমোহন ঘোষ, বি. এল্‌.

সাধ (কবিতা) ... ৭১৪

রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি. এল্‌.

মাধবী দেবী ... ৭০৭

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্‌. এ.

প্রতীত্যসমুৎপাদ ... ১

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল্‌ ৫৮৯

শ

শরৎকুমার রায়, বি. এ.

চুণার ... ২৮৯

শশিভূষণ বিশ্বাস

আশ্চর্য্য বৃষ্টি ... ২৬৯

"গঙ্গা গঙ্গা কতখানি জল?" ৫১

বৃষ্টিরহস্য ... ১৫০

ভেক ... ৩৭০

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

দাদার কাণ্ড (গল্প) ... ৪৫৭

স

সখারাম গণেশ দেউস্কর

মহারাষ্ট্র সাহিত্য ৫৭, ১৩০, ৩১৩, ৭৫৬

সমর্থ রামদাস স্বামী ... ৫১৩, ৬৭০

সরলাবালা সরকার

নিশীথে (কবিতা) ... ৭১৪

সরোজকুমারী দেবী

নদীতীরে (কবিতা) ... ২৬৪

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এল্‌.

জলাঞ্জলি (গল্প) ... ৩৫৩

মৃত্যু (কবিতা) ... ২৬৩

হ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌.এ.,বি.এল্‌.

সেক্সপীয়ার ৩২, ৩৩৫, ৪৭৬

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

অভাগিনী (গল্প) ... ২৯২

উমা (কবিতা) ... ৪৫২

জন্মোৎসবে (কবিতা) ... ৭৭৫

দুই ভাই (গল্প) ... ৪১

বর্ষান্তে (কবিতা) ... ২৬৩

বসন্ত (কবিতা) ... ৭১৪

মাষ্টার মহাশয় (গল্প) ... ১০১

রোগশয্যায় (গল্প) ... ১৬৯

হায়েনের অনুবাদ (কবিতা) ৩৯২

হারাধনের বট (গল্প) ... ৬৩৫

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, এম্‌. এ.

কর্ম্ম ৬৬৩

শিশু-প্রকৃতি ... ২৬৫

মাসানুক্রমিক সূচী।

বৈশাখ।

১। প্রতীত্যসমুৎপাদ ১
২। একনিষ্ঠ বিবাহ ১৯
৩। মহারাজ রামকৃষ্ণ ২৪
৪। বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট ২৯
৫। সেক্সপিয়র ৩২
৬। মঙ্গল গ্রহের জীব ৩৮
৭। দুই ভাই (গল্প) ... ৪১
৮। "গঙ্গা,গঙ্গা,কতখানি জল ?"(সচিত্র) ৫১
৯। বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ... ৫৫
১০। মহারাষ্ট্র সাহিত্য ৫৭
১১। অবোধ (কবিতা) ৬১
১২। সহযোগী সাহিত্য ... ৬৪—৭১
১। সাহিত্য ৬৪
২। সমাজনীতি ৬৬
৩। ইতিহাস ৬৮
১৩। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা... ৭১

জ্যৈষ্ঠ।

১। "নয়শো রূপেয়া" ৭৩
২। মোহনলাল ৮৬
৩। মাষ্টার মহাশয় (গল্প) ... ১০১
৪। ভানুমতী ১১২
৫। সহযোগী সাহিত্য ... ১২১—১২৯
১। সাহিত্য ১২১
২। ভ্রমণ ১২৪
৩। বিবিধ ১২৭
৬। দিনেকের শিশু (কবিতা) ... ১২৯
৭। মহারাষ্ট্র সাহিত্য ... ১৩০—১৩৫
১। আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি ... ১৩০
২। রাণী মা চৌধুরাণী ... ১৩৩
৮। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা... ১৩৫

আষাঢ়।

১। মীরণের পরিণামরহস্য ... ১৩৭
২। বৃষ্টি-রহস্য ১৫০
৩। ভাষা ও সাহিত্য ১৫৫
৪। সেকালের 'কলিকাতা গেজেট' ১৫৯
৫। মহারাজ রামকৃষ্ণ ১৬৬
৬। রোগ-শয্যায় (গল্প) ১৬৯
৭। বকুল (কবিতা) ১৮৪
৮। সহযোগী সাহিত্য ... ১৮৫—১৯২
১। সাহিত্য ১৮৫
২। সমাজনীতি ১৯০
৯। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রার্থনা (কবিতা) ১৯৩
১০। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ... ১৯৬

শ্রাবণ।

১। ভানুমতী ২০১
২। হেমাদ্রি ২২০
৩। কুশীনগর ২২৭
৪। সহযোগী সাহিত্য ... ২৩৩—২৩৮
১। সাহিত্য ২৩৩
২। ভ্রমণবৃত্তান্ত ২৩৬
৫। কিঙ্কর সেনের গড় (গল্প) ... ২৩৮
৬। সাহিত্য-পঞ্জী ২৪৮
৭। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ... ২৫৮
৮। কবিতাকুঞ্জ ২৬৩

ভাদ্র।

১। শিশু-প্রকৃতি ২৬৫
২। আশ্চর্য্য-বৃষ্টি ২৬৯
৩। ভানুমতী ২৭৩
৪। চূণার ২৮৯
৫। অভাগিনী (গল্প) ২৯২

৬ কাব্য-কথা ৩০০
৭। বায়ুর অল্পতা ৩০৭
৮। যমজকৌতুক ৩০৮
৯। শিশু (কবিতা) ৩১২
১০। মহারাষ্ট্র সাহিত্য ৩১৩
১১। সহযোগী সাহিত্য ৩২৫
১। সাহিত্য ৩২৫
১২। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা... ৩২৮

আশ্বিন।

১। কৌমার ৩২৯
২। সেক্সপিয়র ৩৩৫
৩। রাজা বীরবল ৩৪৩
৪। জলাঞ্জলি (গল্প) ৩৫৩
৫। মৌর্য্যসম্রাট অশোক ... ৩৬২
৬। ভেক ৩৭০
৭। শতবর্ষপূর্ব্বে বদরিকাশ্রম ... ৩৭৪
৮। হৃদয়-বীণা (কবিতা) ... ৩৮২
৯। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ... ৩৮৩
১০। সহযোগী সাহিত্য ... ৩৮৮
১। সমালোচনা ... ৩৮৮
১১। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৩৯০
১২। হায়েনের অনুবাদ ৩৯২

কার্ত্তিক।

১। মোহনলাল ৩৯৩
২। সাহিত্য-পঞ্জী ৩৯৭
৩। উন্মাদিনী (গল্প) ৪১৫
৪। রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণ ... ৪৩৩
৫। সহযোগী সাহিত্য ... ৪৪৫—৪৫২
১। সাহিত্য ৪৪৫
২। ভ্রমণবৃত্তান্ত ৫৪৮
৬। উমা (কবিতা) ৪৫২
৭। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ... ৪৫৫

অগ্রহায়ণ।

১। দাদার কাণ্ড (গল্প) ৪৫৭
২। সেক্সপিয়র ৪৭৬
৩। ফতেপুর শিক্‌রি ৪৯০
৪। মৌর্য্যসম্রাট অশোক ... ৪৯৬
৫। সতী (গাথা) ৫০২
৬। সমর্থ রামদাস স্বামী ৫০৩
৭। সহযোগী সাহিত্য ... ৫১৪—৫২৩
১। সাহিত্য ৫১৪
২। ইতিহাস ৫১৬
৮। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ... ৫২৪

পৌষ।

১। যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয় ... ৫২৫
২। ভানুমতী ৫৪১
৩। জাপানের পত্র ৫৫৪
৪। ডাক্তার (গল্প) ৫৫৮
৫। অম্বা (কবিতা) ৫৭৪
৬। সহযোগী সাহিত্য ... ৫৭৯—৫৮৬
১। সাহিত্য ৫৭৯
২। ভ্রমণবৃত্তান্ত ৫৮৩
৭। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা... ৫৮৭

মাঘ।

১। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল ... ৫৮৯
২। ভানুমতী ৬০১
৩। মৌর্য্যসম্রাট অশোক ... ৬০৯
৪। যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয় ... ৬১৫
৫। সহযোগী সাহিত্য ... ৬২৯—৬৩৫
১। জাতিতত্ত্ব ৬২৯
২। জীবনচরিত ৬৩৩
৬। হারাধনের বট (গল্প) ... ৬৩৫
৭। ভারতবর্ষে ৬৪৬
৮। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৬৫২

ফাল্গুন।

১। ভানুমতী ৬৫৩
২। কর্ম্ম ৬৬৩
৩। ওষধিপতি ৬৬৭
৪। সমর্থ রামদাস স্বামী ... ৬৭০
৫। ভারতবর্ষে ৬৮৬
৬। বন্যা (গল্প) ৬৯১
৭। সহযোগী সাহিত্য ... ৭০১—৭০৫
১। সাহিত্য ৭০১
২। ভ্রমণবৃত্তান্ত ৭০২
৮। জননী (কবিতা) ৭০৬
৯। মাধবী দেবী ৭০৭
১০। কবিতাকুঞ্জ ৭১৪
১১। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ... ৭১৫

চৈত্র।

১। ভানুমতী ৭১৭
২। মৌর্য্যসম্রাট অশোক ... ৭২৮
৩। ভারত-যুদ্ধকাল ও সপ্তর্ষির গতি ৭৪০
৪। মহারাষ্ট্র সাহিত্য ৭৫৬
৫। সাক্ষিগোপাল ৭৬২
৬। সহযোগী সাহিত্য ... ৭৬৮—৭৭২
১। কবি শেলি ও তাঁহার মৃত্যু ... ৭৬৮
৭। কুশীনগরের আবিষ্কার ... ৭৭২
৮। বসন্তে (কবিতা) ৭৭৫
৯। জন্মোৎসবে (কবিতা) ... ৭৭৫
১০। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা... ৭৭৬

চিত্র-সূচী।

১। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ... ... বৈশাখ সংখ্যার প্রথমে।
২। স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগ ... ... শ্রাবণ সংখ্যার „
৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ... ভাদ্র সংখ্যার „
৪। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ... ... আশ্বিন সংখ্যার „
৫। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল ... ... মাঘ সংখ্যার „
৬। গঙ্গাফড়িঙ ... ... ৫২ ও ৫৪ পৃষ্ঠা।
৭। রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং ... ... ১৮৫ ও ১৮৭ পৃষ্ঠা।



শ্রীনবীন চন্দ্র সেন।

KUNTALINE PRESS,
CALCUTTA.

প্রতীত্যসমুৎপাদ।

ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িত চিরাতুর জীবলোকের ব্যাধিপ্রমোচনের জন্য ভগবান্ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বৈদ্যরাজের স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মানবজাতির তৃতীয়াংশের অদ্যাপি এইরূপ বিশ্বাস। চিকিৎসকেরা নিদানশাস্ত্রে রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করেন। মানবের ব্যাধিপ্রমোচক বৈদ্যরাজ বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভের সময় জীবনব্যাধির কারণস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।

দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই ;—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, ও জরামরণ।

এই নিদানতত্ত্বের বা প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যা লইয়া বিবিধ মতভেদ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ আচার্য্যেরা সকলে এক মতে ইহার ব্যাখ্যা করেন না। হীনযান সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা মহাযানীদের সহিত ঠিক্ মিলে না। মহাযানীদের মধ্যেও সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যাখ্যা আছে, বোধ হয় না। বৌদ্ধমতাবলম্বীদের বাহিরে অন্যান্য দার্শনিকেরাও ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইউরোপের পণ্ডিতেরাও একটা নির্দ্দিষ্ট মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা সচরাচর যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের এটা রীতি। এই প্রচলিত রীতির সমালোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক। আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় স্বাধীনচিন্তার সম্বন্ধে নানারূপ আস্ফালন করেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে স্বাধীনচিন্তার অর্থ, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের উপদেশপ্রণোদিত চিন্তা। ইউরোপের পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে ভাল কথা বলেন; কিন্তু তাঁহাদের উক্তিকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বেদবাক্যের স্থানে বসাইলে চিন্তার স্বাধীনতা কত দূর থাকে, বুঝিতে পারি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নবোদিত বেদ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইয়াছে। আমাদের বৈদান্তিক মত ইউরোপে পণ্ডিতসমাজে pantheism নামে পরিচিত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় সাহেবদের জেহোবার পায়ে চটিজুতা ও মাথায় শিখা পরাইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মনামে অভিহিত করিতেছেন।

আমরা পরের জিনিষকে আপনার মনে করিতেছি ; আপনার জিনিষকে ঠিক্ চিনিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় একটু সাবধানতা আবশ্যক নহে কি ?

বৌদ্ধ নিদানতত্ত্বের অর্থ বুঝিবার পূর্ব্বে, দ্বাদশটি নিদানের অর্থ বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, নাম কয়টি পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের যথাবিহিত সংজ্ঞা না থাকিলে তাহার অর্থগ্রহে সুবিধা হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এ স্থলে সেইরূপ সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এক একটা শব্দ ঠিক্ কি মর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়াছে, কতটুকু তাহার ভিতর আছে, কতটুকু নাই, বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত সংজ্ঞার অভাবে উদাহরণাদির সাহায্যে অর্থ বুঝিবার চেষ্টা পাইতে হইবে। এক একটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমরা বাঙ্গলা শব্দের অপেক্ষা ইংরাজী শব্দের অর্থ ভাল বুঝি। সেই জন্য হয় ত বর্ত্তমান প্রস্তাবে মাঝে মাঝে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকবর্গ এই সুরুচিবিরুদ্ধ ব্যবহার মার্জ্জনা করিবেন।

১। অবিদ্যা—এই শব্দটি আমাদের দার্শনিক শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রচলিত। কেবল বৌদ্ধগণের একচেটিয়া নহে। অবিদ্যা অর্থ বিদ্যার বা জ্ঞানের অভাব ; অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান। মোটের উপর সহজ হইল। কিন্তু অজ্ঞান ও ভ্রান্তজ্ঞানের মধ্যে কতটুকু তফাত, স্থির করা একটু দুষ্কর। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বোধ হয় বলেন, জগতের সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা প্রকৃত সত্য জ্ঞান নহে ; তাহা একটা মহা ভ্রম। উহা জ্ঞান নহে, উহা ভ্রান্ত জ্ঞান। একালের অজ্ঞেয়বাদী অথবা আগ্‌নষ্টিক বলেন, জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানি না, আমাদের জানিবার উপায় নাই, জানিবার চেষ্টা বৃথা, ইত্যাদি। কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার একটু মতভেদ আছে। আগ্‌নষ্টিকদের মধ্যেও আবার সম্প্রদায়ভেদ আছে। হার্বার্ট স্পেন্সার ও হকস্‌লি, উভয়েই আগ্‌নষ্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী বলিয়া পরিচিত। হকস্‌লি সাহেবই আগ্‌নষ্টিক নামটির সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি আপনাকে কোন প্রচলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলিতে না পারিয়া আপনার জন্য এই নূতন উপাধির উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থের এক খণ্ডের আরম্ভে The Unknowable বড় বড় হরপে ছাপা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ে ঠিক একই রকম অজ্ঞেয়বাদী নহেন। স্পেন্সার বলেন, জগতের খানিকটা অংশ, জগতের কতকগুলি সংবাদ, আমাদের সম্প্রতি অজ্ঞাত এবং

চিরকালই অজ্ঞেয় থাকিবে। হকস্‌লী সম্ভবতঃ এতটুকু স্বীকার করিবেন না। কোনও সংবাদকে তিনি অজ্ঞেয় বলিবেন কি না সন্দেহ। তবে কোনও কোনও কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহা জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয়, তাহা আমি বলিতে পারি না ; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি সম্প্রতি ইহার উত্তর জানি না। অপরে যদি জানি বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, তাহাতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই ; তবে এ পর্য্যন্ত যে কোনও দুর্ভাগ্য জীব জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সেই জ্ঞান হকস্‌লীর তীক্ষ্ণ যুক্তির করপত্রে শতধা বিদীর্ণ ও বিকৃত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্পেন্সার অজ্ঞেয়বাদী ; হকস্‌লী অজ্ঞানবাদী বা অবিদ্যাবাদী। অজ্ঞেয়বাদ ও অজ্ঞানবাদের মধ্যে সীমানির্ণয় যেমন শক্ত, অজ্ঞানবাদ ও ভ্রান্তিবাদের মধ্যেও প্রভেদ-স্থাপন সেইরূপ কঠিন কাজ। জগৎ কি, আমি জানি না, ইহা অজ্ঞানবাদ ; জগতের যে জ্ঞানটুকু আছে, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান, বা মিথ্যাজ্ঞান, ইহা ভ্রান্তিবাদ। এই দুই বাদের মধ্যে কতটুকু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, বিসংবাদ বাধাইবার সম্প্রতি কোনও প্রয়োজন নাই।

ফলে, উভয়ের মধ্যে যদি কোনও সীমাজ্ঞাপক রেখা টানিতে পারা যায়, সে রেখা এত সূক্ষ্ম যে, সহজে সকলের চোখে পড়িবে না, এবং যে কোনও ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে সেই রেখা লঙ্ঘন করিয়া এপার হইতে ওপার চলিতে কোন ব্যাঘাত বা বিঘ্ন অনুভব করিবেন না। হয় ত একটা হইতে অন্যটাকে তফাত করাই যায় না। প্রকৃত সংবাদ জানি না বলিলেই, যে সংবাদ জানি, তাহা মিথ্যা, এই মীমাংসা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং অবিদ্যাবাদের ও ভ্রান্তিবাদের প্রায় সমার্থকতাই আসিয়া পড়ে।

কৌতূহলী পাঠক মহাশয় যদি জগতের জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে কতকটা এইরূপ উত্তর দিব। যিনি বলেন, জগতের স্বরূপ একেবারে অজ্ঞেয়, তাঁহার মীমাংসায় আমি সন্দেহ করি। যিনি বলেন, না, জগতের স্বরূপ অজ্ঞেয় নহে, ইহা এইরূপ, তাঁহার বাক্যে আমার আদৌ শ্রদ্ধা নাই।

গল্প আছে, কোনও মুমূর্ষু রাজার স্বাস্থ্যঘটিত প্রকৃত সংবাদ মন্ত্রিবর্গ রাজনৈতিক কারণে গোপন রাখিতেছিলেন। কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য দূত নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সংবাদ ? দূত বলিলেন,—সংবাদ ভাল, কেহ

বলে রাজা মরিয়াছেন, কেহ বলে রাজা মরেন নাই। প্রশ্ন—তোমার বিশ্বাস কি? উত্তর—আমি ইহাও বিশ্বাস করি না, উহাও বিশ্বাস করি না। প্রশ্ন—তবে উপায়? উত্তর—কথাটা বড় গুহ্য; আপনি সহজে প্রকাশ করিবেন না। সম্পাদক মহাশয় দূতের আনীত সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু আমার উত্তরে পাঠকবর্গ সন্তুষ্ট হইবেন, ভরসা করি।

২। সংস্কার—এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থগ্রহ দুঃসাধ্য। ইউরোপের পণ্ডিতেরা নানা জনে নানা অর্থ করিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শনে সংস্কার শব্দের আর এক স্থানে প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধদর্শনোক্ত পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে তৃতীয় স্কন্ধের নামও সংস্কার। এই পাঁচ স্কন্ধের বিষয়ে পরে অনেক কথা আসিবে। নিদান মধ্যে গৃহীত সংস্কার ও স্কন্ধ-মধ্যে গৃহীত সংস্কার উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে, বোধ হয় না। সেই সংস্কার কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গোটা কতক উদাহরণ লওয়া যাক্।

সংস্কারের মধ্যে বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে বায়ান্ন প্রকার ভেদ বর্ত্তমান। বায়ান্নটা নামের উল্লেখে দরকার নাই। কতকগুলির উল্লেখ করিলেই,সংস্কার কি, তাহা কতক বুঝা যাইবে। একটা সংস্কার—স্পর্শ, contact; একটা—বেদনা,স্পর্শ হইতে উৎপন্ন অনুভূতি, sensation বা feeling; আর একটা—চেতনা perceptionএর কাছাকাছি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সংস্কার যথা,—স্মৃতি, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, মোহ,লোভ,লজ্জা, করুণা, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি। ফলে মানসিক ব্যাপারমাত্রই,—মনুষ্যের যে কিছু চিৎবৃত্তি বর্ত্তমান,—elementary sensations, cogntions, volitions, emotions, সমস্তই,—সংস্কার। Elementary কথাটি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছি। মনে কর, সহসা আমার সম্মুখে একটা সাপ উপস্থিত। এ স্থলে কি কি মানসিক ব্যাপার ঘটে? একটা দীর্ঘ, চাকচিক্যশালী,বক্রগতিশীল আকৃতি বা রূপ, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত উদ্যত সবেগাহত ফণা হইতে তীব্র পরিচিত ছোঁ শব্দ—এই রূপ ও এই শব্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত সর্পস্মৃতি—সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যবিচার বা বিতর্ক—তার পর পলায়নপ্রয়াসের উদ্বোধক আশঙ্কা, অর্থাৎ একটা মোহ, পরক্ষণেই সবেগে লম্ফপ্রদান ও পলায়ন। ইংরাজিতে বলিলে, প্রথমে রূপের ও শব্দের sensation; তার পর পরিচিত সর্পের স্মৃতি ও কর্ত্তব্যনির্ণয়রূপ বিতর্ক—এই cognitive ব্যাপার, তার পর আশঙ্কারূপ emotion ও পলায়নচেষ্টার প্রবর্ত্তক volition.

এখন এই sensation বা বেদনা হইতে emotion ও volition পর্য্যন্ত যত

কিছু মানসিক ব্যাপার, সমস্তই সংস্কারের অন্তর্গত। রূপ একটা সংস্কার। রস সংস্কার, শব্দ সংস্কার, অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কার; ভয়, চেষ্টা প্রভৃতিও সংস্কার। এবং এই সকল সংস্কার একত্র যোগে আমার মনঃশরীর। মনঃশরীরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে যে সকল টুক্‌রা পাওয়া যায়, তাহার এক একটি এক এক সংস্কার। এই সংস্কারগুলি বাদ দিলে আমার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। এই সংস্কারগুলি একত্র গোছাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে, আমি পূর্ণ, জাগ্রত, নানা-উপাধি-ভূষিত মহৈশ্বর্য্যময় অহং হইয়া দাঁড়াই।

এক কথায়, রূপ, রস,গন্ধ,শীত, গ্রীষ্ম, জ্বালা, যাতনা,সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতীতি, ভয়, হর্ষ, লজ্জা, চেষ্টা,প্রয়াস প্রভৃতি সমস্তই সংস্কার। এবং এই সংস্কারসমষ্টি একত্র করিলে যাহা হয়, তাহারই নাম অহং, আমি, বা এই মানুষ।

কিন্তু ঠিক্ তাই কি? কেবল সংস্কারগুলিকে একত্র করিয়া সমষ্টি করিলেই কি গোটা মানুষ বা গোটা অহং হয়? বোধ হয়, ঠিক হয় না; আর একটার দরকার, সেটা সংস্কারের অতিরিক্ত আর একটা জিনিষ, তাহার নাম বিজ্ঞান; ইহাই পরবর্ত্তী তৃতীয় নিদান।

৩। বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের ইংরাজি নাম এক কথায় consciousness, বেদান্তশাস্ত্রে নাম সংবিৎ। সংবিৎ হয় ত বিজ্ঞান ছাড়াইয়া আর একটু উচ্চে উঠে। কিন্তু এ স্থলে বৃথাতর্কপরিহারের জন্য, বিজ্ঞান, সংবিৎ, consciousness একার্থসূচক ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সংস্কারসমষ্টির সহিত বিজ্ঞানকে যোগ করিলে, তবে অহং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; নতুবা হয় না। কেবল সংস্কারসমষ্টিকে অহং বলিলে একটু ভুল হয়। কেন, দেখাইতেছি। আমার মধ্যে যে সকল রূপ রস গন্ধ, বুদ্ধি স্মৃতি প্রতীতি, শোক হর্ষ লজ্জা ভয় প্রভৃতি আছে, তাহারা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম্বন্ধশূন্য, স্বস্বপ্রধান হইয়া বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমি আমিত্ব লাভ করিতাম কি না সন্দেহ। এ সকলের অতিরিক্ত আর একটা শক্তি বা চিৎপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, যাহা এই সকলের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনা করে, সকলকে একত্র টানিয়া আনে, জড়াইয়া রাখে, সকলকে যথাস্থানে বিন্যাস করে; সকলকে সাজাইয়া গোছাইয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া আমাকে নির্ম্মাণ করে। অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, মাংসপেশী, শোণিত প্রভৃতি জড় শরীরের উপাদান; এক অর্থে উহাদের সমষ্টি ও সমবায়ের নামই জড় শরীর। কিন্তু ঐ সকল উপাদানকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া

পরস্পরের সুনিয়ত সম্বন্ধস্থাপন আবশ্যক। যেখানে যাহার দরকার, সেখানে তাহাকে রাখিয়া,যাহার যাহা কার্য্য, তাহার উপর তাহার ভার দিলে, তবে শরীর-যন্ত্র নির্ম্মিত হইবে। নাপিত যখন যন্ত্রপ্রয়োগে আমার কেশগুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করে, অস্ত্রচিকিৎসক যখন তাঁহার নির্ম্মম ছুরিকাপ্রয়োগে আমার অঙ্গুলি কয়টিকে কাটিয়া লয়েন, তখন সে কেশ আর সে অঙ্গুলি আর আমার থাকে না। তাহাদের প্রতি তখন যতই সস্নেহ-লোচনে চাহিয়া দেখি না কেন, তাহারা আর আমার নয়। এমন কি, আমি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবয়বকে আর সঞ্চালন করিতে পারি না, তখন সেই অবয়বের সহিতই বোধ হয় আমার প্রভুত্বসম্বন্ধ আর থাকে না। তখন সে আর আমার নহে; আমি তাহার কর্ত্তা নহি। সেইরূপ সংস্কারগুলি আমার মনঃশরীরের, আমার আত্মার, উপাদান হইলেও, তাহারা যতক্ষণ যথাস্থানে বিন্যস্ত ও আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ তাহারা আমার থাকে না। এই বিন্যাসের, সন্নিবেশের ও যথাবিহিত কার্য্যে বিনিয়োগের ভার যাহার উপর তাহারই নাম বিজ্ঞান। এবং বিজ্ঞান কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত সংস্কারসমষ্টি আমি। সাপ দেখিলাম ও সাপের ছোঁ শব্দ শুনিলাম, কেবল তাহাতে চলিবে না। এই রূপের সহিত এই শব্দের সাহচর্য্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক; এবং পূর্ব্বগত তাদৃশ রূপ ও তাদৃশ শব্দের সহিত স্মৃতিসাহায্যে পারম্পর্য্যসম্বন্ধের স্থাপনাও আবশ্যক। তবে আমি জানিব যে, আমিই একটা সাপ দেখিতেছি, এবং এই সর্পদর্শনরূপ মহা ব্যাপারের, অঘটন-ঘটনা-পটীয়ান্ কর্ত্তার নামই consciousness বা বিজ্ঞান।

৪। নামরূপ—এই পারিভাষিক শব্দটির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা সচরাচর জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি; একটার নাম বাহ্যজগৎ, অর্থাৎ আমি-ছাড়া জগৎ; আর একটা অন্তর্জগৎ, বা আমার আত্মময় জগৎ, আমার আমি। আমার জড়শরীরটা আমার অন্তঃশরীরের বাহিরে; প্রকৃতপক্ষে ইহা জড় জগতের অন্তর্গত। সুতরাং সমগ্র জগতের দুই ভাগ,—চলিত ভাষায় একটাকে মনোজগৎ, একটাকে জড়জগৎ বলিলে অধিক দোষ হয় না। এই দুইটা জগৎ আমার প্রত্যক্ষ বিষয়; ইহাদিগকে লইয়াই আমার কারবার; এই দুইকে ছাড়িয়া আর তৃতীয় নাই। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় বলিতে গেলেও সমগ্র জগতের দুই ভাগ; একটা 'নাম',—স্থূল কথায় অন্তর্জগৎ, বা মনোজগৎ। একটা 'রূপ',—স্থূল কথায় বাহ্যজগৎ বা জড় জগৎ। নাম ও রূপ উভয় লইয়া সমগ্র প্রত্যক্ষ জগৎ—উভয় ছাড়িয়া আর তৃতীয় বস্তুর

অস্তিত্ব নাই। নাম এবং রূপ একত্রযোগে নাম-রূপ বা সমগ্র জগৎ। বৌদ্ধ-দর্শনের ভাষায় এই নামরূপ পদার্থ পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই চারিটি স্কন্ধ একত্রযোগে নাম। আর ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ, এই চারিটি মহাভূতের সমষ্টি পঞ্চমস্কন্ধ রূপ। বেদনা অর্থে feeling ও sensation মাত্র, অর্থাৎ অনুভূতিমাত্র বুঝিতে হইবে। সংজ্ঞা বলিলে বুদ্ধি প্রতীতি প্রভৃতি, অর্থাৎ perception মাত্র বুঝিতে হইবে। তৃতীয় স্কন্ধ সংস্কারের অর্থ উপরেই বলা গিয়াছে। এ স্থলে বেদনা ও সংজ্ঞা, sensation ও perception ব্যতীত অপর সমস্ত মানসিক ব্যাপার, শোক হর্ষ, ঘৃণা লজ্জা, ভয় ক্রোধ, স্মৃতি, বিচার বিতর্ক, চেষ্টা প্রয়াস, ইত্যাদি সমস্ত cognition, volition ও emotion বুঝিতে হইবে। সত্য বটে, উপরে সংস্কার শব্দ আরও একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদনা ও সংজ্ঞা পর্য্যন্ত সংস্কারের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ স্থলে সংস্কারকে বেদনা ও সংজ্ঞা হইতে পৃথক্ করিয়া ধরায় একটু ন্যায়শাস্ত্রমতে দোষ ঘটে। কিন্তু সে দোষটুকু ছাড়িয়া দিলে, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার বলিলে, সমুদয় চিত্তবৃত্তির উল্লেখ হইল। ইহাদের সহিত আবার বিজ্ঞান বা consciousness যোগ করিলে, অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নির্ম্মিত হইল। কিন্তু এই প্রকাণ্ড মনোজগৎ, যাহা লইয়া আমাদের এত কারবার, সুষুপ্তির সময়েও আমরা যে জগৎ ছাড়িয়া পলাইতে পারি না, বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় সেই প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একটা নাম-মাত্র। কেবল একটা নাম; ইহার প্রকৃত স্বরূপ কেমন, ইহার পরও আর জিজ্ঞাসা করিবে কি?

অন্তর্জগৎ ত একটা নামমাত্রে পরিণত হইল। বাহ্যজগৎ বা জড় জগৎ-টাই বা আবার কি? ক্ষিত্যাদি মহাভূতের সমষ্টিরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যাহার মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র বালুকাসমান, যাহা মহাকাল ও মহাকাশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, যাহার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় আমাদের রসনাপ্রান্তে বাগ্দেবীর আবির্ভাব হয়, সেই প্রকাণ্ড জড়জগৎ বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় একটা রূপমাত্র—একটা প্রতীতিমাত্র;—ইংরাজিতে বলিলে mere appearance বা phenomenon. বৌদ্ধাচার্য্যকে যাহা ইচ্ছা গালি দিতে পার, কিন্তু তাহাকে জড়বাদী বলিতে পারিবে না।

যে সকল সুধীজন একালের বৈজ্ঞানিকগণকে জড়বাদী বলিয়া গালি দেন, তাঁহারা স্বয়ং জড়বাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন কি না, গভীর সংশয়ের

বিষয়। যাঁহারা একমুখে বৈজ্ঞানিককে গালি দেন, পরক্ষণেই দেখিতে পাই, তাঁহারা অবিকৃতচিত্তে একটা জড় জগতের বা বাহ্যজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও সংশয়শূন্য হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, কৃপার সহিত তাঁহাদিগকে বলিতে বাধ্য যে, তাঁহাদের স্বীকৃত যে জড়জগতের প্রতি তাঁহারা এত ঘৃণা দেখান, সেই জড় জগৎ আদৌ অস্তিত্ববিহীন, তাহা তাঁহাদের একটা কল্পিত বিভীষিকা। তাঁহাদের বিকৃত কল্পনা একটা পিশাচমূর্ত্তির গঠন করিয়া সেই পিশাচের আতঙ্কে কাতর হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে; জ্ঞানীর চক্ষে সেই পিশাচের অস্তিত্ব নাই, তাঁহাদের নিরর্থক আতঙ্কও কেবল হাস্যরসের ও কৌতুকরসের প্রণোদক। বিজ্ঞান নিশ্চয় জানে, ক্ষিত্যাদি মহাভূত ভূতও নয়, পিশাচও নয়, উহা কেবল একটা রূপ বা appearance; বৌদ্ধদর্শনের ও হিন্দুদর্শনের গৌরব যে, ইউরোপের বিজ্ঞান এত দিনে যে ভ্রান্তির অন্ধকার হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে কত শত বৎসর পূর্ব্বে সেই তামস তিমির নষ্ট করিয়া সম্যক্ দৃষ্টির দ্বারা দর্শন-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যিনি মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি জানেন যে, জড় জগৎ বলিয়া আদৌ একটা স্বতন্ত্র জগৎ নাই। উহাকে প্রয়োজনবিশেষে সুবিধার নিমিত্ত আমরা বাহ্যজগৎ বলিয়া ধরিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের বাহিরে নহে, উহা একটা রূপ, একটা প্রতীতি-মাত্র; উহা আমাদের অন্তঃশরীরেরই উপাদান। অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ, এই দুই ভাগে সমগ্র জগৎকে বিভক্ত করিলে, সাংসারিক ও ব্যাবহারিক কাজে সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ ভাবে বিভাগ যুক্তিসঙ্গত নহে; দর্শনশাস্ত্র ঐরূপ বিভাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না। বিজ্ঞানবিরোধী জড়বাদী যাহাকে বাহ্য জগৎ বা জড়জগৎ আখ্যা দেন, তাহা আমারই আত্মার একটা অংশ—একটা উপাদান। একটার বেশী দুইটা জগৎ নাই, এবং সেই জগৎ আমি স্বয়ং। তোমরা যতই বল না, আমি বিশ্বমধ্যে এক আমার ভিন্ন অন্য কিছুর ও কাহারও অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। তোমরাও অস্তিত্বহীন, এবং তোমাদের কল্পিত ও অকারণে ঘৃণিত জড়জগৎ, তাহাও আমার নিকট অস্তিত্বহীন। আমি একাকী সম্রাটের মত তোমাদের কল্পিত অনন্ত মহাকাশ ও অনাদি মহাকাল ব্যাপিয়া আছি। এই 'পুদ্গল' পুরুষ একেশ্বর আমিই বা আবার কীদৃশ পদার্থ? না—একটা নামের ও একটা রূপের সমষ্টিমাত্র।

৫। ষড়ায়তন—ষড়ায়তন শব্দের অর্থ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ

আমাদের শরীর; ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অকস্মাৎ একটি বাড়িয়া গেল কেন, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। সচরাচর ও লৌকিক ভাষায় জড় শরীর বলিলে যাহা বুঝায়, ষড়ায়তন অর্থে তাহাই বুঝিব।

৬। স্পর্শ—অর্থাৎ ষড়ায়তন বা জড় শরীরের সহিত তোমাদের জড় জগতের স্পর্শ বা সম্বন্ধ।

৭। বেদনা—বেদনা শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে; সহজ ভাষায় বেদনা অর্থে স্পর্শজাত অনুভূতি—রূপ রস গন্ধাদির অনুভূতি; অথবা আরও একটু অর্থবিস্তৃতি করিয়া তোমাদের বাহ্য জগতের অনুভূতি। ইংরাজিতে feeling বলা যাইতে পারে।

৮। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা অর্থে কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের স্পর্শ ও সম্বন্ধ বজায় রাখিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি। ইংরাজিতে এক কথায় desire বা appetite বলা যাইতে পারে।

৯। উপাদান—বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় উপাদান অর্থে উপকরণ নহে; উপাদানের অর্থ কতকটা তৃষ্ণারই মত। স্থূল হিসাবে উপাদান বলিলে কতকটা অনুরাগ বা প্রবল আসক্তির ভাব আসে।

১০। ভব—ইংরাজিতে being, becoming, existence; বাঙ্গালায় সত্তা, অস্তিত্ব।

১১। জাতি—জন্ম, উৎপত্তি। সহজবোধ্য।

১২। জরামরণ—ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

নিদান কয়টির অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। শাস্ত্র-সঙ্গত ও সর্ব্ববাদিসম্মত অর্থ দিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পারিভাষিক শব্দার্থ সম্বন্ধে তেমন প্রবল মতভেদ ত বর্ত্তমান নাই। কিন্তু এই নিদানশৃঙ্খলের প্রকৃত তাৎপর্য্য লইয়া যথেষ্ট বিসংবাদ চলিতে পারে। এইখানেই নানা মুনির নানা মত। এখন সেই শৃঙ্খলার গ্রন্থি আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

একটা বিষয়ে সকলের একমত। নিদানের শৃঙ্খলা বা সূত্র একটা অভি-ব্যক্তির প্রণালীমাত্র, ইহা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। অভি-ব্যক্তি শব্দ ইংরাজি Evolution অর্থে ব্যবহার করিলাম। অভিব্যক্তি বটে, তবে কিসের অভিব্যক্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

অভিব্যক্তি জরামরণের। জরামরণ আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও জরামরণের

উৎপত্তি অর্থাৎ Origin of evil একটা প্রধান সমস্যা। খ্রীষ্টানেরা একটা প্রাচীন উপন্যাসের সাহায্যে এই তত্ত্বের অক্লেশে ও এক নিশ্বাসে মীমাংসা করিয়া ফেলেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন তত সহজে মীমাংসা করিতে পারে না। বোধিদ্রুমমূলে ভগবান্ তথাগত যে মীমাংসার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, তেমন মীমাংসা অন্য কোথাও আর নাই। জরামরণের মূল অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, তাহা হইতে ষড়ায়তন, ইত্যাদি ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত জরামরণ উৎপন্ন। শিকলের এক প্রান্তে অবিদ্যা, অন্য প্রান্তে জরামরণ; মধ্যস্থলে অন্যান্য নিদান। এখন এই সূত্র বা শৃঙ্খল ধরিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে অগ্রসর হইতে হইবে। আচার্য্যেরা ও পণ্ডিতেরা কিরূপে অগ্রসর হয়েন, দেখা যাউক।

ব্রহ্মসূত্রের টীকাকার গোবিন্দনাথের মতে নিদানশৃঙ্খলা মনুষ্যজীবনের ইতিহাসমাত্র।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণমধ্যে মনুষ্য-জীবনের আরম্ভ। প্রথম ভ্রূণমধ্যে কতকগুলি সংস্কার, অর্থাৎ সামান্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়; সেইখানেই বোধ হয় তাহার সামান্য সুখদুঃখাদি অনুভূতির সঞ্চার হয়। জীবনসঞ্চারের প্রথমলক্ষণপ্রকাশের সময়েই ভ্রূণ ক্লেশ ও আরাম এই উভয়ের প্রভেদ করিতে শিখে। কেন শিখে? ক্লেশ ও আরাম কি বাস্তবিক পৃথক্ পদার্থ; বস্তুতই কি সংসারে কতকটা কষ্ট ও কতকটা আরাম পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া বর্ত্তমান আছে? না,—এই প্রভেদানুভূতির মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। সুখ দুঃখ অনিত্য, অসৎ, ব্যবহারিক পদার্থ; কেবল অজ্ঞানের বশে বা ভ্রান্তির বশে, ভ্রূণ উভয়ে প্রভেদ দেখে। ক্রমে সংস্কারগুলি কতক পরিস্ফুট হইয়া আসিলে বিজ্ঞানের সঞ্চার; অর্থাৎ পূর্ব্বে সুখ দুঃখ ছিল, কিন্তু ভ্রূণ যেন তাহা জানিয়াও জানিত না, এখন কতকটা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে; ক্রমে তাহার নামরূপের বিকাশ। নামরূপ কতকটা যেন সূক্ষ্মশরীর গোছের, সংস্কার ও বিজ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ। ক্রমে ষড়ায়তন অর্থাৎ অবয়বাদিসম্পন্ন জড় শরীর কতকটা পূর্ণ আকার ধারণ করে, তাহাতে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য আরম্ভ হয়। তার পর সেই স্থূলশরীরের ক্রমে বাহ্যজগতের সহিত 'স্পর্শ' ঘটে; এখনও ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে মনে করিবার প্রয়োজন নাই। মাতৃগর্ভই এখন তাহার বাহ্য জগৎ; সেই জগতের সহিত তাহার স্পর্শে তাহার 'বেদনা' বা নানাবিধ অনুভূতি ফুটিয়া উঠে। বেদনা হইতে 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ আরাম উপভোগের ও দুঃখপরিহারের আকাঙ্ক্ষা; তাহা হইতে 'উপাদান' অর্থাৎ সুখলাভের ও দুঃখপরিহারের জন্য বিশেষ প্রযত্ন, চেষ্টা ও প্রয়াস। এই অবস্থায় উপনীত হইলে 'ভব'; এখন ভ্রূণের মনুষ্যত্ব একরকম পূর্ণতা লাভ করিল। এই সময়েই বোধ করি সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া 'জাতি' অর্থাৎ লৌকিক হিসাবের মনুষ্যজন্ম লাভ করে। বেচারার 'জাতি'-লাভের ফল জরামরণ।

এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দ শুনায় না। বুদ্ধদেব যেন একটা ফিজিয়লজির তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক ফিজিয়লজি বা শরীরবিদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত শারীর তত্ত্ব স্বীকার করিবে কি না, জানি না, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীর তত্ত্বের আবিষ্কারে মার মহাশয়ের তত দূর ভয় পাইবার দরকার ছিল না। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্য্যেরা সকলে স্বীকার করেন না। মহাযানী সম্প্রদায় সকলের মধ্যে অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ইউরোপের ওলদেনবর্গ, রিস্ ডেবিডস্, চাইলডার্স প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও সেই সকল বচন অবলম্বনে নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের কলিকাতার ডাক্তার ওয়াডেল অজণ্ট গ্রামে গুম্ফামধ্যে বৌদ্ধগণের ভবচক্রের এক চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ছবিতে বারটি নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। ওয়াডেল সাহেব তিব্বত হইতেও ভব-চক্রের ছবি আনিয়াছেন, এবং তিব্বতের লামাগণের প্রদত্ত একটা ব্যাখ্যা শুনিয়া আসিয়াছেন। এই চিত্র উল্লিখিত গোবিন্দনাথ-প্রদত্ত ব্যাখ্যারই কতকটা সমর্থন করে। সেই ছবির একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেই কতকটা বুঝা যাইবে।

ভবচক্র বা সংসার-চক্রের প্রতিকৃতি একখানি চাকা; চাকার কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ নাভিদেশে কপোত,সর্প ও শূকরের মূর্ত্তি রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতিস্বরূপ অঙ্কিত। এই তিনকে কেন্দ্রে রাখিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। তাহার নেমিদেশে বারটি ঘরে দ্বাদশ নিদানের দ্বাদশটি মূর্ত্তি মনুষ্যজীবনের ইতিহাস দেখাইতেছে। প্রথম ঘরে এক ব্যক্তি অন্ধ উষ্ট্রকে চালিত করিতেছে। উষ্ট্র অবিদ্যার প্রতিরূপ। চালক স্বয়ং কর্ম্ম। জন্মের আরম্ভে মনুষ্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মকর্ত্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রের মত অবিদ্যার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও নূতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। দ্বিতীয় ঘরে কুম্ভকাররূপী কর্ম্ম সংস্কাররূপ মসলায় বা কর্দ্দমে মনুষ্যের অন্তঃশরীর-রূপ ঘটের নির্ম্মাণ করিতেছে। তৃতীয় ঘরে বানরমূর্ত্তি অপূর্ণ মনুষ্যে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। চতুর্থ ঘরে

বৈদ্য রোগীর নাড়ী টিপিতেছেন, অর্থাৎ স্পন্দনশীল মনুষ্যত্ব বা 'নামরূপ' বাহ্যজগতের সহিত স্পর্শলাভের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। পঞ্চম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে দুইটা চোখ উঁকি মারিতেছে, অর্থাৎ 'ষড়ায়তন'-রূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টির ভিতর হইতে মনুষ্যত্ব বাহ্যজগতে চাহিতেছে।

এই অবস্থায় ভ্রূণাবস্থা হইতে মুক্ত মনুষ্যের সহিত বাহ্য জগতের কারবার রীতিমত আরম্ভ হইল। ছয়ের ঘরে আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতী মনুষ্যের সহিত জগতের, অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের স্পর্শ সূচনা করিতেছে। এই স্পর্শের ফলে বেদনা, বা দুঃখাদি অনুভূতির আরম্ভ; সাত চিত্রে বাহির হইতে নিক্ষিপ্ত তীর চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই অনুভূতির পরিচয় দিতেছে। আটের ঘরে সুরাপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি তৃষ্ণা বা বাসনার উৎপত্তিসূচক। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে; সংসারের গাছ হইতে আগ্রহের সহিত ও আসক্তির সহিত ফল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত, সেই জন্য নয় ঘরে ফলাকর্ষী মনুষ্য উপাদান বা সংসারাসক্তির প্রতিমূর্ত্তি। দশম ঘরে নবোঢ়া বধূর মূর্ত্তি 'ভব' অর্থাৎ মনুষ্যের সংসারে গৃহস্থ-রূপের অস্তিত্বের পরিচায়ক। মানুষ এখন ঘরকন্না পাতিয়া গোটামানুষ হইয়াছে। তারপর একাদশ চিত্র নবপ্রসূত শিশুসহ জননীর মূর্ত্তি। সন্তানের জন্ম 'জাতির' অর্থ বুঝাইতেছে। সন্তানের জন্মের পর মনুষ্যের আর কোন কাজ নাই। উপসংহারে জরামরণ; দ্বাদশ ঘরে 'বাঁশের দোলার' উপরে শয়ান শবমূর্ত্তি।

ভবচক্রের এই ব্যাখ্যা অতি প্রাচীন; অজণ্টর গুহামধ্যের ভাস্কর কার্য্য সকল বার তের শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তিব্বতে প্রসিদ্ধি আছে যে, মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা নাগার্জ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে,এই ব্যাখ্যার বয়স প্রায় দুই হাজার বৎসর দাঁড়ায়। একে প্রাচীন, তাহাতে সেকালের ও একালের অনেক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত, কাজেই এই ব্যাখ্যার সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে শঙ্কা হয়। ব্যাখ্যায় মোটের উপর দাঁড়ায় এই। আমরা কথায় কথায় মানুষের দশ দশার উল্লেখ করিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা দশের উপর দুই বাড়াইয়া বলিয়া থাকেন, মানুষের দ্বাদশ দশা। প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক চিত্র। শেক্‌স্‌পীয়র মনুষ্য-জীবনকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সহিত একস্থানে তুলিত করিয়াছেন। মানবশিশুর 'mewling and pewling in its mother's arms" এই অবস্থায় অভিনয়ের আরম্ভ, এবং বার্দ্ধক্যে "sans eyes, sans teeth" অবস্থায় অভিনয়ের যবনিকাপাত; সেই বৃত্তান্ত যাঁহারা একবার পড়িয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ কবিত্বের জন্য বুদ্ধদেবকে শেক্‌স্‌পীয়রের অনেক নিম্নে বসাইবেন, এবং বৌদ্ধমন্দিরমধ্যে ইংরাজ কবির মূর্ত্তি কেন বুদ্ধমূর্ত্তির স্থান গ্রহণ না করিবে, তাহার জন্য পঞ্চান্ন কোটি মনুষ্যের কৈফিয়ত চাহিতে পারিবেন।

আমার বিবেচনায় প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাপারটা মনুষ্যজীবনের ইতিহাস বা অভিব্যক্তি বটে, কিন্তু সেই ইতিহাস ও অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তিবাদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবোলুশন থিওরির সহিত মিলাইতে গিয়া মহাগোলে পড়েন। তাঁহাদের একদেশদর্শিতাতেই বেদান্ত-মত পান্‌থীজমে পরিণত হইয়াছে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে আজ-কাল অভিব্যক্তিবাদের জয়জয়কার। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক নানা স্থানে সেই অভিব্যক্তিবাদের সহিত ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠকের পরিচয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাগতিক ব্যাপারমাত্রেই অভিব্যক্তিনিরূপণ বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৌরজগতের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য নীহারিকাবাদ প্রভৃতি বর্ত্তমান; পৃথিবীর গঠনে অভিব্যক্তি বুঝাইতে ভূবিদ্যা ব্যস্ত। জীবকুলে অভিব্যক্তির প্রণালী ডারউইন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যদেহের অভিব্যক্তি বুঝান ফিজিয়লজি শাস্ত্রের একটা প্রধান অঙ্গ এম্ব্রিয়োলজি বা ভ্রূণবিদ্যা। অন্তঃকরণের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য স্পেন্‌সার সাহেব বড় বড় দুইখণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। মনুষ্যসমাজের অভিব্যক্তি বুঝাইতে বড় বড় দার্শনিক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক অদ্যাপি নিযুক্ত। পাণিনি হইতে মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত শাব্দিক পণ্ডিতেরা ভাষার অভিব্যক্তি-আবিষ্কারে নিযুক্ত। এ সমস্তই বিজ্ঞানের বিষয়; এক কথায় এই সকল অভিব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি বা ব্যবহারিক অভিব্যক্তি নাম দিতে পারা যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক রকমের অভিব্যক্তি আছে—তাহাকে দার্শনিক অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। কেহ যদি পারমার্থিক অভিব্যক্তি বলিতে চাহেন, বলুন; সম্প্রতি নাম লইয়া বিতণ্ডার অবসর নাই। আমাদের হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তি এইরূপ দার্শনিক অভিব্যক্তি। সাংখ্যদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে যে অভিব্যক্তি আছে, তাহা এই দার্শনিক অভিব্যক্তি। আমার বোধ হয়, বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদও সেই দার্শনিক অভিব্যক্তিমাত্র; মূলতঃ ইহা হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তি হইতে অভিন্ন। ইউরো-

পীয় দর্শনশাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই। সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা হইবে, হয় ত উপহাস্য হইয়া পড়িব। কিন্তু আমার যতটুকু ধারণা আছে, তাহাতে বোধ হয়, দেকার্ট, বার্কলি, হিউম, কান্ত প্রভৃতি দার্শনিকেরা অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই দার্শনিক অভিব্যক্তির আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে অনেকটা সেই পথে অগ্রসর হইতে দেখি। হকস্‌লী ও ক্লিফোর্ড যেন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। গণিতবিৎ কার্ণ পীয়ার্সনের নাম এখনও তত বিখ্যাত নহে; আমার বোধ হয়, তিনি আরও কতকদূর অগ্রসর হইয়া প্রায় খাঁটি বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ মতে পৌঁছিয়াছেন। আমার সন্দেহ হয়, বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সহিত বৌদ্ধদর্শনের তেমন প্রভেদ নাই! অদ্বৈতবাদকে একালের পণ্ডিতসমাজ বড় পছন্দ করেন না। চিরপোষিত সংস্কারগুলির মূলে যাহাতে একবারে কুঠার অর্পণ করিতে চায়, চিরাভ্যস্ত চিন্তাপ্রণালীকে যাহাতে একবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চায়, তাহার সহিত সম্প্রীতিস্থাপন বড় সহজ কথা নহে। এদেশেরও অনেক পণ্ডিত ও সম্প্রদায়স্থাপয়িতা শঙ্করাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তের মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ও অসৎ শাস্ত্র বলিয়াই নিন্দিত হইয়া থাকে। এ স্থলে সে সকল বিতণ্ডায় প্রবেশ করিব না। প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ আমার নিকট যেরূপ বোধ হয়, যথাবিহিত বিনয়ের সহিত ও আশঙ্কার সহিত তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমরা লৌকিক বা ব্যাবহারিক হিসাবে সমগ্র জগৎকে অন্তর্জগৎ বা মনোজগৎ ও বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। জড়জগৎ দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া আমাদের পুরোভাগে বিস্তৃত ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রচলিত বিশ্বাস। অন্তর্জগৎ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহার সহিত কারবার ও দেনা লেনা করে। আমার জীবনকাল ব্যাপিয়া এই অন্তর্জগতের সহিত জড় জগতের কারবার ও আদানপ্রদান চলে। বাহ্যজগৎ একটা প্রতীয়মান রূপ লইয়া আমার অন্তর্জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়। জড় পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানি না; কিন্তু বস্তুতঃ জড় পদার্থের যে রূপ আমি দেখিতে পাই,সেই রূপেই জড় আমার নিকট পরিচিত। জড় বলিয়া আমার আত্মা হইতে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট একটা পদার্থ আছে; সেই জড়ের প্রতীয়মান স্বরূপ জড় জগৎ। আমার আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ; আত্মার ত স্বরূপ

কি, তাহা জানি না; তবে মনন, চিন্তন, হিংসা, প্রীতি, চেষ্টা প্রভৃতি আত্মার প্রত্যক্ষ স্বভাব।

প্রচলিত মত এইরূপ। মোটের উপর দুইটা পদার্থ; আমার ভিতরে আত্মা; আমার বাহিরে জড়। আত্মা কালব্যাপী; জড় দেশব্যাপী ও কালব্যাপী। উভয়ে স্বতন্ত্র ও স্বস্বপ্রধান। আত্মা, ভোক্তা, কর্ত্তা, মননশীল, চিন্তনশীল, চেষ্টাপরায়ণ। জড় আত্মার ভোগ্য; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে। যতদিন মনুষ্যের জীবন, ততদিন বোধ হয়, আত্মা ও জড় উভয়ের ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ বজায় থাকে; মৃত্যুর পর আত্মার সহিত জড়ের কোন সম্বন্ধ থাকে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ বর্ত্তমান আছে।

প্রচলিত মত এই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মত অন্যরূপ। যুক্তির নিকট জড় রূপরসগন্ধাদির সমবায়মাত্র, এবং রূপ রস গন্ধ আত্মারই একদেশমাত্র। আত্মার একাংশ যেমন সুখ দুঃখ লজ্জা ভয় হিংসা দ্বেষ মনন চিন্তন, অন্য অংশ সেইরূপ রূপরসাদি। সুখ দুঃখ লজ্জা ভয় মনন চিন্তন রূপ রস সকলের সাধারণ দার্শনিক সংজ্ঞা 'সংস্কার'। এই সংস্কারগুলি একত্র করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করিলেই আত্মা প্রস্তুত হয়। কয়েকখানি কাষ্ঠখণ্ডকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা তাহাদের নেমি, অর, নাভি প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি; এবং সন্নিবেশের পর যে দ্রব্য দাঁড়ায়, তাহাকে রথচক্র আখ্যা দিয়া থাকি। এক একখানা কাষ্ঠকে রথচক্র বলা যায় না; কাষ্ঠ কয়খানা একটা নির্দ্দিষ্ট বিধানে সাজাইলে, তাহার নাম রথচক্র হয়। সেইরূপ সংস্কারগুলি অর্থাৎ মনন চিন্তন, রাগ দ্বেষ, সুখ দুঃখাদি মানসিক ব্যাপারগুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করিলে, সেই সমষ্টি আত্মা হইয়া দাঁড়ায়। আবার কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে একে একে ছাড়াইয়া লইলে যেমন রথচক্র বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ সংস্কারগুলিকে একে একে সরাইয়া ফেলিলেও আত্মার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আত্মা সংস্কার সকলের সমষ্টীকরণে নির্ম্মিত। আবার সেই সমষ্টীকরণ কাজটা কিরূপে সম্পন্ন হয়? উত্তর, বিজ্ঞানের সাহায্যে। বিজ্ঞান কি? প্রত্যুত বিজ্ঞানও একটা সংস্কারমাত্র, একটা চিত্তবৃত্তিমাত্র। কিন্তু ইহার কাজ অন্যান্য সমস্ত সংস্কারকে সাজাইয়া গোছাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া স্থাপন। বিজ্ঞান যদি এই কার্য্য সম্পাদন না করিত, তাহা হইলে সংস্কারগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম্বন্ধশূন্য হইয়া থাকিত, এ উহাকে চিনিত না, ইহার সহিত উহার কোন

পরিচয় বা সম্পর্ক থাকিত না; সকলের সমষ্টীভূত মনুষ্যাত্মা বা 'নামরূপ' অস্তিত্ব-হীন হইত।

মনুষ্যাত্মার বা নামরূপের একাংশ জড়জগৎ; কতকগুলি রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের, অর্থাৎ কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টির নাম জড়জগৎ। জড়জগতের অন্য স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্তু এই রূপরসগন্ধাদির সহিত আবার সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধাদি অন্যান্য সংস্কারের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। আগুনের স্পর্শে আমাদের বেদনা ও জ্বালা বোধ হয়; সূর্য্যালোকে আমাদের চৈতন্যসঞ্চার ও স্ফূর্ত্তি হয়; বাঘ দেখিলে আমাদের আতঙ্ক ও পলায়নেচ্ছা ঘটে; সঙ্গীতশ্রবণে আমাদের আনন্দ হয়। রূপশব্দস্পর্শাদির সহিত এই স্থলে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি আতঙ্ক আনন্দ প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের স্থাপনকর্ত্তা বিজ্ঞান; অথবা যখন এই সম্বন্ধ স্থাপিত দেখি,তখনই বলি, বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও বিকাশ হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকিলে বিজ্ঞানেরও অস্তিত্ব থাকিত না। আত্মার একাংশের, অর্থাৎ লৌকিক ভাষার অন্তর্জগতের সহিত অপরাংশের, অর্থাৎ লৌকিক ভাষার বাহ্য জড় জগতের এই সম্বন্ধ না থাকিলে, বিজ্ঞান থাকিত না। আবার সেই বাহ্যজগতে বা রূপ রস গন্ধাদির মধ্যেও নানাবিধ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে, সূর্য্য চন্দ্রের সহিত আবার পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে; পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্রাদির সহিত আবার জীব জন্তুর মনুষ্যদেহের সম্বন্ধ আছে। ফুলের রূপ ও গন্ধ ও স্পর্শ একত্রসম্বদ্ধ হইয়া ফুল আখ্যা পায়; অগ্নির স্পর্শ ও রূপ একত্রসম্বদ্ধ হইয়া অগ্নি আখ্যা পায়; অম্লজান ও উদজান নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জল আখ্যা পায়; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সম্বন্ধের স্থাপনাও বিজ্ঞানের কাজ। তোমরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বল, যে সকল নিয়মের বলে জড় জগতের কার্য্য চলিতেছে, সেই সকল নিয়ম বিজ্ঞান কর্ত্তৃকই স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল অসংখ্যেয় রূপ রস গন্ধ একত্র সজ্জিত হইয়া 'জড় জগতের' সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহারই নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। এই সম্বন্ধগুলি বর্ত্তমান না থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়মও থাকিত না, জড়জগতের অস্তিত্বও অসম্ভব হইত, এবং বিজ্ঞানেরও অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা নহে, বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টা ও স্থাপয়িতা। মনে রাখিবেন, বিজ্ঞান অর্থে এখানে science নহে; বিজ্ঞান অর্থে এখানে একটা চিত্তবৃত্তি বা

সংস্কার, সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সংস্কার; ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ consciousness ভিন্ন আর কিছু সম্প্রতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বিজ্ঞান এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কিরূপে? এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কেন? এই সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে মনুষ্যাত্মার অস্তিত্ব থাকিত না; এবং জগতে মনুষ্যাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, সুতরাং জগতের অস্তিত্ব শূন্যে পর্য্যবসিত হইত, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই সম্বন্ধস্থাপনের কারণই বা কি? কিরূপেই বা এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়? এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিতে গিয়া মনুষ্য পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসে; কখনও বা ঈশ্বরাদি বিভীষিকার কল্পনা করিয়া প্রতারিত হয়। বিজ্ঞান সংস্কারগুলিকে সজ্জিত করিয়া নামরূপের নির্ম্মাণ করিল কেন? কাষ্ঠখণ্ডগুলি সজ্জিত হইয়া রথচক্রে পরিণত হইল কিরূপে? বৌদ্ধদর্শনের উত্তর, এই ব্যাপারের মূলে অবিদ্যা। এই বাক্যের স্পষ্ট অর্থ কি, ঠিক্ বলিতে সাহস করিতেছি না। অবিদ্যা অর্থে হয় অজ্ঞান বা জ্ঞানাভাব; অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। প্রথম অর্থ যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, কেন হয়, তাহা জানি না; উহা খাঁটি আগ্নষ্টিকের কথা। দ্বিতীয় অর্থ যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, উহা একটা ভ্রান্তিমাত্র। সংস্কারগুলি সজ্জিত আছে, তুমি দেখিতেছ; সজ্জিত সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানযোগে নামরূপের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও বোধ হইতেছে; কিন্তু সবই মিথ্যা; সবই অলীক কল্পনা। এই অর্থ ঠিক্ হইলে বৌদ্ধদর্শন বৈদান্তিক মায়াবাদ। যাহাই হউক, উপরে বলিয়াছি, অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ দুরূহ। মায়াবাদ ও শূন্যবাদ ও অবিদ্যাবাদ, প্রায় একই স্থানে অবস্থিত।

এখন কতকটা কিনারা পাওয়া গেল। মূলে অবিদ্যা; জ্ঞানাভাব বা ভ্রম। অবিদ্যাবলে সংস্কারগুলি বিজ্ঞান কর্ত্তৃক সজ্জিত ও যথাবিন্যস্ত হইয়া নামরূপের অর্থাৎ আত্মার বা জগতের সৃষ্টি করে। আত্মা ছাড়িয়া ভিতরে জগৎ নাই। বিশ্ব আত্মময়। নামরূপের বা জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ষড়ায়তন অর্থাৎ আত্মার অন্তঃশরীর অন্তর্জগৎ, বাহ্যশরীর বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহারা কি বাস্তবিকই স্বতন্ত্র? না, এই স্বাতন্ত্র্যবোধের স্রষ্টা বিজ্ঞান; এই স্বাতন্ত্র্যবোধের হেতু অবিদ্যা, অজ্ঞান অথবা ভ্রান্তি। এখন বিজ্ঞানের সম্বন্ধস্থাপনা কার্য্য ক্রমেই চলিতে থাকে; অন্তর্জগতের সহিত স্বাধীনরূপে প্রতীয়মান বাহ্যজগতের আদানপ্রদান ক্রমেই চলিতে থাকে; বিবিধ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কারের সহিত মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ লাভ করে।

এই ব্যাপারটা 'স্পর্শ'। স্পর্শ বা বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের সহিত আদান প্রদানে বেদনা, অর্থাৎ বিবিধ অনুভূতিরূপ সংস্কারের নূতন নূতন বিকাশ। জগতে রূপরসগন্ধাদির নূতন নূতন স্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাব। তাহার ফলে 'তৃষ্ণার' উদ্গম; বাহ্যজগতের সহিত কারবার বজায় রাখিবার, আদান প্রদান চালাইবার আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব। তাহা হইতে 'উপাদান'—জগতের সহিত আসক্তিস্থাপন। এই সমস্ত ব্যাপারকে ইংরাজিতে differentiation বলা যাইতে পারে। এক্ষণে বাহ্যজগৎ অন্তর্জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, উভয়ের মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে আসক্তি স্থাপিত হইয়াছে। এখন মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও বলিতে পারিতাম না যে, মনুষ্যত্ব পূর্ণ। এখন বলিতে পারিতেছি, মনুষ্যত্ব পূর্ণ; এই পূর্ণতাপ্রাপ্তির নাম 'ভব'। যেখানে 'ভব', সেইখানেই 'জাতি'—মনুষ্যজন্ম। মনুষ্যজন্মের অপর অর্থ ভগবান্ সিদ্ধার্থের মতে জরামরণ। জরামরণের সহকারী শোক পরিদেবন দুঃখ দৌর্ম্মনস্য।

এই শেষ কথাটা একটু বিচার্য্য। বৌদ্ধদর্শন ও আধুনিক হিন্দুদর্শন এক-বাক্যে মানবজীবন দুঃখময় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণকেই পরমপুরুষার্থ জানিয়া, তাহার উপায়-অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এইখানেই একদেশদর্শিতা। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ও হিন্দুসম্প্রদায় সকলের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সহিত সনাতন বেদমূলক ব্রাহ্মণরক্ষিত আর্য্যধর্ম্মের এইখানে প্রভেদ। এবং কেবল এই প্রভেদের জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুগণের বিবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সমাজদ্রোহে পরিণত হইয়াছে। যে ধর্ম্মে মনুষ্যজীবনের কেবল আঁধারের ভাগটাই দেখে, আলোর ভাগ দেখে না; কোনরূপে জীবনের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভই পরমপুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ দেয়, তাহা সমাজকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; তাহা ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম। সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজ বুদ্ধদেব ও তাঁহার পথানুবর্ত্তী সংস্কারকগণের প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িক অধর্ম্মকে সম্যক্ প্রশ্রয় দেয় নাই; তাই সহস্র প্রচারক ও সংস্কারকের হস্তে ভগ্ন খণ্ডিত বিদীর্ণ ও বিকৃত হইয়াও এই পরাধীন অধঃপতিত হিন্দু জাতি আপনার জাতীয় অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিয়া মনুর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

একনিষ্ঠ বিবাহ।

এক্ষণে যে সকল জাতি পৃথিবীতে সভ্যতম বলিয়া পরিচিত, তাহারা সকলেই একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ, অর্থাৎ এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দারান্তর গ্রহণ করে না, বা সামাজিক বিধানানুসারে করিতে পায় না। যে সকল সভ্য জাতির সামাজিক নিয়ম বা শাস্ত্রবিধান একাধিকস্ত্রীগ্রহণের প্রতিকূল নহে, তাহারাও প্রায়শঃ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। একনিষ্ঠ বিবাহপ্রণালীই এক্ষণে সমুদায় সভ্য-সমাজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও অবলম্বিত।

সভ্য সমাজ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হউক, কিন্তু একনিষ্ঠ বিবাহপ্রণালী সভ্যতার পরিচায়ক নহে। মানুষ সভ্য হইয়াছে বলিয়া যে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্যবশতঃ একপত্নীমূলক বিবাহপদ্ধতির অবলম্বন করিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। বরং দেখা যায় যে, যে সকল জাতি নিতান্ত অসভ্য, যাহারা মনুষ্যজীবনের প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত, তাহারা প্রায়শঃ একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। "বহুবিবাহ" প্রবন্ধে প্রসঙ্গাধীন কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থলে আরও কতকগুলি দিতেছি।

সিংহল দ্বীপে অরণ্যবাসী 'বেদ্দা' জাতি এত অসভ্য, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এত হীন যে, ইহাদের ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু ইহারা কখনও একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। শুধু তাহাই নহে; ব্যভিচার ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের কার্ নিকোবার দ্বীপবাসীরা একপত্নী-পরায়ণ, এবং ব্যভিচার ইহাদের মধ্যে মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত। সাঁওতাল-দিগের মধ্যে বহুবিবাহ স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু একাধিক পত্নী গ্রহণ করিলে সমাজে এতটাই নিন্দার্হ ও অপদস্থ হইতে হয় যে, প্রায় কেহই তাহা করে না। নীলগিরির বাদাগা জাতি, উত্তর আসামের নাগা জাতি, কিসান জাতি, ব্রহ্মের কারেন্ জাতি, ইণ্ডোচীন, মলয় উপদ্বীপ এবং ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অনেক জাতির মধ্যে একাধিকস্ত্রীগ্রহণ হয় বিধিনিষিদ্ধ, না হয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইগোরোটী জাতি একপত্নীপরায়ণ ত বটেই, উপরন্তু ইহাদের সমাজে ব্যভিচারবিষয়ে সমাজশাসন এতই কঠোর যে, ব্যভিচারী বা ব্যভি-চারিণীকে গৃহ এবং সমাজ হইতে জন্মের মতন বিদূরিত হইতে হয়। মার্কোয়েসাস্ দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন দ্বীপে একনিষ্ঠ পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন বিবাহ-

প্রণালী প্রচলিত নাই। পাপুয়ান্‌দিগের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, এবং ব্যভিচার ও উপপত্নীরক্ষা একেবারেই নাই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় অসভ্য মনুষ্যের মধ্যেও এমন দুই একটি সম্প্রদায় আছে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে একপত্নীপরায়ণ। আমেরিকার ও আফ্রিকার অনেকানেক অসভ্য জাতির সম্বন্ধেও এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়।

এই স্থলে একটি রহস্যজনক ব্যাপারের উল্লেখ করিতে হইতেছে। দুই একটি এমনও অসভ্য জাতি দেখা যায়, যাহারা পূর্ব্বে একনিষ্ঠবিবাহপরায়ণ ছিল, কিন্তু উচ্চতর সভ্যতার সংস্রবে আসিয়া কতক পরিমাণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। মিনাহাসা প্রদেশের আল্‌ফুরা জাতি পূর্ব্বে একনিষ্ঠ-বিবাহপরায়ণ ছিল। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তার হিক্সন্ সাহেব বলেন যে, মুসলমানের সংস্রবে আসিয়া ইহারা আপনাদের পূর্ব্বতন ও উচ্চতর যৌন নীতি হইতে স্খলিত হইয়া এই-রূপে বিলাসবাসনার বশবর্ত্তী হইতেছে। কর্ সাহেব বলেন যে, বিরিয়া জাতির মধ্যে একাধিকপত্নীগ্রহণ সমাজনিয়মে একেবারেই নিষিদ্ধ, কিন্তু ইয়োরোপীয়-দিগের সংস্রবে আসিয়া ইহারা এক্ষণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহবিষয়ে না হউক, উচ্চতর সভ্যতার সংস্রবে অন্য বিষয়ে এইরূপ নীতি-ভ্রংশের দুই একটা দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও দেখা যায়। সাঁওতালেরা সত্যবাদি-তার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ; ইয়োরোপীয় পাদ্রীদিগের সংস্রবে আসিয়া ইহারা এক্ষণে মিথ্যা কথা বলিতে শিখিয়াছে।

সে যাহা হউক, উপরিউদ্ধৃত দৃষ্টান্তনিচয় হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, একনিষ্ঠ বিবাহ সভ্যতার ফল বা পরিচায়ক নহে। বাস্তবিক কোন সমাজে কিরূপ বিবাহপদ্ধতি অবলম্বিত হইবে, তাহার প্রকৃত নিয়ামক, সামাজিক, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা—সভ্যতা বা নীতির উৎকর্ষাপকর্ষ নহে। যে সমাজের অবস্থা ও প্রয়োজনাধীন যে বিবাহপদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সে সমাজ সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং অবলম্বন করিতে বাধ্য। না করিলে রক্ষা নাই। নীতি বা আদর্শের মুখ চাহিয়া প্রয়োজনকে উপেক্ষা করার অবশ্যম্ভাবী ফল—ধ্বংস।

নিতান্ত অসভ্যদিগের একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ হইবারই কথা। যে অবস্থায় মানুষকে মৎস্য ও পশুশিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়,সে অবস্থায় বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রতিপালনোপযোগী আহারের সংস্থান করা

কাহারও পক্ষে সহজ নহে, এবং অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। কৃষিকার্য্য উদ্ভাবিত হইলে এই অন্তরায় অনেকটা নিরাকৃত হয় বটে, কিন্তু অসভ্য সমাজে কৃষিকার্য্য প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া, তখন স্ত্রীলোকেরও একটা মূল্য থাকে। যে অবস্থায় স্ত্রীলোক জীবিকা অর্জ্জনের সাহায্য করে না, তখন যেমন ইচ্ছা করিলেই বা চাহিলেই স্ত্রী পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকের অর্জ্জনের পথ উদ্ভাবিত হইলে তখন আর তেমন পাওয়া যাইতে পারে না। তখন শারীরিক পরিশ্রম বা উপহারের বিনিময়ে স্ত্রী লাভ করিতে হয়। বহুস্ত্রীগ্রহণের পক্ষে আহার্য্য-সংস্থানাত্মক অন্তরায় তিরোহিত হইলে, মূল্যসংস্থানরূপ আর একটা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষিকার্য্য প্রচলিত হইলেও এই কারণে অধিকাংশ স্থলেই পুরুষকে একটিমাত্র স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

অসভ্য সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা যার-পর-নাই হীন—তাহারা সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং সম্পত্তিরূপেই ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল, সুতরাং সমাজের যেরূপ অবস্থায় মনুষ্যের অধিকার কেবল শক্তিগত, সে অবস্থায় দুর্ব্বল স্ত্রীজাতিকে যে প্রবল পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন হইতে হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। অনেক অসভ্য সমাজে স্ত্রীলো-কের মৃত্যু ও জীবন পর্য্যন্ত পুরুষের ইচ্ছাধীন থাকে। এরূপ অবস্থায় পুরুষেরা যে একটিমাত্র পত্নী লইয়া সন্তুষ্ট হয়, সে কেবল প্রয়োজনের দায়ে। কৃষি-কার্য্য এবং সম্পত্তি অর্জ্জনের অন্যান্য উপায় প্রবর্ত্তিত হইলে, এই প্রয়োজনের দায় হইতে মানুষ অনেকটা অব্যাহতি পায়। এবং তখন তাহারা আর একনিষ্ঠ-বিবাহপরায়ণ থাকে না—প্রবৃত্তি ও সাধ্যানুসারে যাহার যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করে। কিন্তু বহু স্ত্রী গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও সম্পত্তি অধিকাংশ লোকের থাকা অসম্ভব। সমাজবিশেষে বহুপরিজনপ্রতিপালনের ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই থাকিতে পারে; সেই জন্য সচরাচরই দেখা যায় যে, যে সকল সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে,সে সকল সমাজেও যাহারা সঙ্গতিসম্পন্ন, ক্ষমতাশালী, পদস্থ,বা উচ্চবংশসম্ভূত, কেবল তাহারাই বহু স্ত্রী গ্রহণ করে—জন-সাধারণ বহুবিবাহ করেও না, করিতে পারেও না।—পারে না বলিয়াই করে না। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আমেরিকা ভূখণ্ডে গোয়ারাণী চিরিগোয়ানা প্রভৃতি জাতি এবং কালিফোর্নিয়ার ও কালিফর্ণিয়ার কতকগুলি জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, সমাজনিয়মানুসারে কেবল সর্দ্দারেরাই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে—জনসাধারণের এ অধিকার নাই। প্রাচীন পেরুতে

বহুস্ত্রীগ্রহণের অধিকার কেবল অভিজাতদিগের ছিল। ইয়েসো প্রদেশের আইনো জাতির মধ্যে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। আফ্রিকা খণ্ডেই বহুবিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু এখানেও একনিষ্ঠ বিবাহই সাধারণ নিয়ম, বহুবিবাহ তাহার ব্যতিক্রম-মাত্র। কোরাণের বিধান অনুসারে চারিটি স্ত্রীগ্রহণের অধিকার সকল মুসলমানেরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এ অধিকার ব্যবহৃত হয় না। সায়েদ্ আমীর আলি বলেন, প্রয়োজনবশেই হউক, বা বিশ্বাসনিবন্ধনই হউক, ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনেরও অধিক একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ। তিনি আরও বলেন যে, সুশিক্ষিত মুসলমানেরা বহুবিবাহকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। কর্ণেল ম্যাক্‌গ্রেগার লিখিয়াছেন যে, পারস্য দেশে শতকরা দুইজনমাত্র বহুবিবাহকারী। কোচীন এবং শ্যাম দেশে দেশাচার যদিও বহুবিবাহের বিরোধী নহে, তথাচ এই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণ কার্য্যতঃ প্রায়ই একটির অধিক বিবাহ করে না। আমাদিগের শাস্ত্র ও দেশাচার বহুবিবাহের বিরোধী নহে, অথচ হিন্দুজাতি কার্য্যতঃ একনিষ্ঠবিবাহপরায়ণ—বহুবিবাহকারীর সংখ্যা এত অল্প যে, তাহা না ধরিলেও চলে। অষ্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেও সাধারণতঃ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। আর বোধ হয় দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

উপরিউদ্ধৃত দৃষ্টান্ত সকল দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে,যে সকল সমাজ কর্ত্তৃক বহুবিবাহ অনুমোদিত, সে সকল সমাজেও অধিকাংশ লোক একবিবাহকারী—একনিষ্ঠ বিবাহই নিয়ম; বহুবিবাহ তাহার ব্যভিচারমাত্র। সম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তিরা আপনাপন ইচ্ছানুসারে বহু স্ত্রী আত্মসাৎ করে বটে, কিন্তু ইহাদিগকেও বাধ্য হইয়া ক্রমে আত্মসংযম করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, যে সমাজের জনসাধারণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না, সে সমাজের অধিনায়কেরা যদি বহু স্ত্রী আত্মসাৎ করেন, তাহা সাধারণের মতের ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধগামী হইয়া করিতে হয়; কেন না, যত অধিক সংখ্যক স্ত্রী তাঁহারা গ্রহণ করেন, সমাজমধ্যে সাধারণের বিবাহযোগ্যা স্ত্রীসংখ্যার তত হ্রাস হইয়া যায়। বিশেষ বিশেষ কারণে সমাজবিশেষে জন্মকালে পুত্র ও কন্যার সংখ্যাতারতম্য হয় বটে—কোথাও পুত্র অধিক জন্মে, কোথাও কন্যা অধিক জন্মে—কিন্তু বিশেষ কারণ না থাকিলে সমাজমধ্যে প্রায় সমানসংখ্যক স্ত্রী ও পুংসন্তান জন্মিবার

দিকেই স্বভাবের গতি। এরূপ অবস্থায় সমাজের কতকগুলি লোক যদি বহুবিবাহ করে, তাহার অনিবার্য্য ফল এই যে, সেই সমাজের আর অনেকগুলি লোককে পত্নীলাভে একেবারে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহাদের বিলাসপ্রিয়তা-নিবন্ধন জনসাধারণের স্ত্রীলাভের ব্যাঘাত ঘটে, জনসাধারণ যে তাহাদের এবং তাহাদের অবলম্বিত প্রথার প্রতিকূল হইবে, ইহা স্বাভাবিক। জনসাধারণ যে প্রথার বিরোধী, সে প্রথা যে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইবে, এবং কালে লোপ পাইবে,ইহা অবশ্যম্ভাবী। পার্ব্বত্য ডায়াক্ জাতি সাধারণতঃ একনিষ্ঠবিবাহ-পরায়ণ হইলেও, সামাজিকবিধানানুসারে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নহে; অথচ তাহাদের কোন অধিনায়ক একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিলে সমাজমধ্যে তাহার প্রভাব ও প্রভুত্ব একেবারে লোপ পায়। এই কারণে ক্ষমতাশালী সম্পন্ন, ও উচ্চবংশ-সম্ভূত ব্যক্তিদিগকেও ক্রমে একপত্নীমূলক বিবাহই অবলম্বন করিতে হয়।

কিঞ্চিদুন্নত সমাজে যে সকল কারণে পুরুষ বহু স্ত্রী গ্রহণ করে, সমাজ সমধিক উন্নত হইলে, সেই সকল কারণের কতকগুলি তিরোহিত হয়; আর কতকগুলি যদিও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তন্নিবন্ধন বহুবিবাহের আর প্রয়োজন হয় না। সুসভ্য সমাজে বহু স্ত্রী শক্তি বা সঙ্গতির পরিচায়ক নহে, পদমর্য্যাদা বা সম্পত্তি অর্জ্জনের উপায়ীভূতও নহে। আভ্যন্তরিক কলহ বিবাদে বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সুসভ্য মানবকে আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্বের উপর নির্ভর করিতে হয় না—সে ভার সমাজ বা রাজশক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর, রূপযৌবনের আকর্ষণ, ইন্দ্রিয়লালসা, নূতনপ্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল কারণে অসভ্যেরা বহুবিবাহ করে, সুসভ্য সমাজে তজ্জন্য বহুবিবাহের আবশ্যক হয় না—একমাত্র পত্নী গ্রহণ করিয়াও এই সকল অসংযত বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় সুসভ্য সমাজে থাকে। এই সকল কারণে সুসভ্য মানব একনিষ্ঠবিবাহপরায়ণ হয়। জীবনসংগ্রামের কঠোরতাও একটা কারণ।

সকল দিক বিবেচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ একমাত্র স্ত্রী গ্রহণ করে। সভ্যতার পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, সমাজের শক্তিশালী, সঙ্গতিসম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তিগণ বহুবিবাহ-পরায়ণ হয়—জনসাধারণকে বাধ্য হইয়াই একটিমাত্র স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইলে মানব আবার সেই প্রাথমিক একপত্নীমূলক বিবাহপ্রণালী অবলম্বন করে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজ্যাভিষেক।

রাণী ভবানীর পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি রাজকুমারী তারা ও রাজজামাতা রঘুনাথ লাহিড়ীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবার আশা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ অকালে কালকবলে নিপতিত হওয়ায় সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর রাণী ভবানী অনন্যোপায় হইয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ নামে বঙ্গদেশে বৈরাগ্যের অবতার বলিয়া পরিচিত।

রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও কিছু দিন পর্য্যন্ত রাণী ভবানীর হস্তেই রাজসাহীর রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল; তদুপলক্ষে মাতার সহিত পুত্রের কিয়ৎপরিমাণে মনোমালিন্যেরও সূত্রপাত হইয়াছিল। যুবক রামকৃষ্ণ স্বহস্তে রাজ্যকার্য্য পরিচালন করিবার জন্য লালায়িত হইলেও, রাণী ভবানী সহসা রাজ্যভার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন বাঙ্গালী জমিদারগণের পক্ষে মহা সঙ্কটের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; মুসলমানের শাসনক্ষমতা তিরোহিত হইয়া কোম্পানী বাহাদুরের নূতন শাসনকৌশল প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। তৎকালে রাজসাহীর ন্যায় বিস্তীর্ণ জনপদের শাসনভার এক জন অপরিণতবয়স্ক বালকের হস্তে সমর্পণ না করিয়া, বুদ্ধিমতী রাণী ভবানী স্বহস্তে শাসনক্ষমতা রাখিয়া, রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের সময় হইতে তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল। পদমর্য্যাদা ও শাসনক্ষমতা উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া রাণী ভবানী গঙ্গাবাস আশ্রয় করিলেন;—তৎসূত্রে রাজসাহীর রাজসম্পৎ মহারাজ রামকৃষ্ণের করতলগত হইল।

রাজসাহীর রাজবংশাবলীর ইতিহাসলেখক স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন;—"মহারাণী ভবানীর স্বর্গারোহণের পর রামকান্তের দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজসাহীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।" * বলা বাহুল্য, ইহার একবর্ণও সত্য নহে। তবে মিত্র মহাশয়ের পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লিখিত

* Maharaja Ramkrisna, the adopted son of Ramkanta, succeeded his mother the Maharanee on her death.—*The Rajas of Rajshahye.*

বলিয়া ইংরাজদিগের নিকট এইরূপ অনেক অলীক কাহিনী ইতিহাসনামে পরিচিত হইয়াছে!

সেকালের লোকের নিকট রামকৃষ্ণ "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ বাহাদুর" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাদশাহ শাহ আলমের সনন্দবলে তিনি এই গৌরবান্বিত সুদীর্ঘ শূন্যগর্ভ রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীপতি মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ বাহাদুরের রাজ্যাভিনয়সময়েই নাটোর রাজবংশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।

সে রাজ্যনাশকাহিনী বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের ইংরাজ লেখকগণ তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণের বিষয়-বৈরাগ্যকেই একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের লিখিত কাহিনী কণ্ঠস্থ করিয়া কৃতবিদ্য স্বদেশবাসিগণও তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন! নাটোর রাজদপ্তরে এবং কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডে এখনও যে সকল কাগজপত্র পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে, এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যায় না।

রামকৃষ্ণের ইতিহাস প্রাচীন জমিদারবংশের ধ্বংসকাহিনীর করুণক্রন্দনে পরিপূর্ণ। মোগলগৌরবরবি মহাত্মা আকবরশাহের শাসনসময়ে বাঙ্গালী জমিদারদলের যেরূপ পদমর্য্যাদা ও শাসনক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজেরা যখন দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন, তখন জমিদারদল পদগৌরবে ও শাসনক্ষমতায় সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। * মহারাজ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক জমিদারদিগের সময়ে সেই পদগৌরব ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। সেকালের জমিদারগণ কি কৌশলে একালের উপাধি-ব্যাধিপীড়িত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম!

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনসময়েই বাঙ্গালী জমিদারদিগের শাসনক্ষমতা তিরোহিত হইতে আরম্ভ হয়। মোগলরাজ্যে জমিদারগণ কেবলমাত্র করসংগ্রহের

* The Zaminders of Bengal were opulent & numerous in the reign of Akber, and they existed when Jafar Khan was appointed to the administration under him and his successors their respective territorial Jurisdiction appeared to have been augmented, and when the English acquired the Diwani, the principal Zaminders exhibited the appearance of oppulence and dignity.—*The Fifth Report.*

যন্ত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না; দেশের প্রকৃত শাসনভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তজ্জন্য মোগল রাজসরকারে তাঁহাদের পদগৌরব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে করসংগ্রহের যন্ত্রমাত্রই মনে করিয়াছিলেন; এবং এক যন্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য যন্ত্র সংস্থাপিত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাতে অনেক প্রাচীন জমিদারবংশের ভূসম্পত্তি আধুনিক ধনশালী বিষয়বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণের করতলগত হইয়াছিল; কোন কোন স্থলে রাজ্যরক্ষার্থ পুরাতন জমিদার হেষ্টিংসের কথামত অধিক রাজকর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, কালক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতির গতিরোধ করিবার আশায় হেষ্টিংসের প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কোম্পানী বাহাদুরের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ করিতে গিয়া রাজকোষ শূন্য হইল, কিন্তু হেষ্টিংসের প্রবর্ত্তিত রাজস্বনীতি উত্তরোত্তর অধিকতর রাজকর প্রত্যাশা করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া লাভের লোভে অনেক লোকে রাজসাহীর রাজ্য ইজারা লইবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতে লাগিল, এবং অবশেষে কোন কোন স্থলে তাহাদের প্রস্তাব হেষ্টিংসের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল।

ইহার জন্য রাজসাহী রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজাবিদ্রোহের সূত্রপাত হইল। কোম্পানী বাহাদুরের বীরবাহু তখন ফৌজ পাঠাইয়া বিদ্রোহদমনের চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রামে গ্রামে হাহাকার উঠাইতে লাগিল। নন্দলাল রায় নামক এক ব্যক্তি পরগণা আমরূল ইজারা লইয়াছিল, তাহার প্রার্থনাক্রমে নাটোরে লেপ্টেন্যাণ্ট কিন্‌লকের অধীনে কোম্পানীর ফৌজ প্রেরিত হইল। *

জমিদারগণ নানারূপ বাজে জমা আদায় করিতেন; তাহা ক্রমশঃ রহিত হইয়া তাঁহাদের আয়ের পথ সংকীর্ণ হইতে লাগিল। ১১৮৯ সালের বৈশাখ হইতে নূতন "ফৌজদারী রেগুলেশন" প্রবর্ত্তিত হইয়া জমিদারদলের শাসনক্ষমতার মূলেও কুঠারাঘাত করিল। †

* Letter to Lieutenant Kinloch, commanding in Natore, respecting disturbances of the rayats in Pargana Amrul.—

Bengal Mss Records. Vol. I. 37.

† Circular letter to Collectors, informing them that the Fouzdari Regulation is to take effect from the 1st Baisak 1189.—

Bengal Mss Records. Vol. 1. 44.

এই সময়ে রাজসাহী প্রদেশে কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে ইভলিন্ সাহেব রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত রাণী ভবানীর কলহের সূত্রপাত হইল। নূতন ইজারদারদিগের সহিত প্রজাবর্গের অকৌশল উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তিনি রাণীকেই তাহার জন্য অপরাধিনী করিলেন, এবং নূতন শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য পল্টন পাঠাইতে লিখিলেন। * রাজসাহী রাজ্যে পল্টনের শাসন শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার ফল প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল না। ইভলিন্ সাহেব বুঝিলেন যে, প্রজাপীড়নমাত্রই সার হইল, রাজকর সংগৃহীত হইল না, কোম্পানী বাহাদুরের লাভ হইল না; ইজারদারের নিকট অনেক টাকা বাকী পড়িতে লাগিল! †

ইভলিন্ সাহেব যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলেন, তাহার ফলে রাজসাহীতে কোম্পানীর খাস শাসন ও করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। ¶

রাজসাহী রাজ্যে কোম্পানীর খাস তহশিল প্রবর্ত্তিত হইবার সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে অনেক অর্থলোলুপ লোকে ইজারা লইবার জন্য লালায়িত হইল। তন্মধ্যে বলরাম শর্ম্মা, জয়নারায়ণ দাস, কমলাকান্ত দাস, রুদ্রনারায়ণ শর্ম্মা এবং রামকান্ত শর্ম্মা নামক পাঁচ ব্যক্তি একত্র রাজসাহী ইজারা লইবার প্রার্থনা করায়, তাহাদের প্রার্থনাই গ্রাহ্য হইল। ইহারা আশানুরূপ অর্থশোষণ করিতে পারিল না; অনাবৃষ্টিবশতঃ প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল না; লোকে অবশ্যদেয় রাজকর প্রদান করিতেও ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। ইজারদারগণ হাহাকার করিতে লাগিল। কোম্পানী বাহাদুর তাহাদের করুণক্রন্দনে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, অনাবৃষ্টি জন্য কোনরূপ অনুগ্রহপ্রদর্শনের ব্যবস্থাও করিলেন না!

* Letter to Governor General enclosing extract of a letter from Mr. Evelyn when at Rajshahye, respecting the obstructions thrown in the way of the collections by the Zaminder and her officers, and representing the necessity of having a military force, under the command of a European officer, stationed in that province.—*June 18, 1782.*

† Letter from Mr. Evelyn, reporting the existence of heavy balances in Rajshahye, although the cultivators complain of undue exactions, and proposing to make an enquiry into the collections realised by the Amin.—*March 3, 1783. Approved.*

¶ Letter to Mr. John Evelyn directing him to conclude a kha's settlement for Rajshahye for 1190.—*April 14, 1783.*

অনাবৃষ্টির পর শস্যনাশ এবং শস্যনাশের পর অন্নক্লেশ সমুপস্থিত হইল। তখন রাজসাহীর কালেক্টারও নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি লিখিলেন যে, এ সময়ে রাজকরসংগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, প্রজার উপর উৎপীড়ন করার প্রশ্রয় দিতে হইবে। *

রাণী ভবানী এই সকল দুঃখদৈন্যের মধ্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রজারক্ষার জন্য স্বয়ং ইজারাগ্রহণার্থ আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ১১৯১ সালের জন্য ২৪ লক্ষ ও তৎপর বৎসরে ২৫,০০০ অতিরিক্ত জমা স্বীকার করিয়া, রাণী ভবানী চারি বৎসরের ইজারা লইতে চাহিলেন। †

রাণী ভবানী প্রজার কাতর ক্রন্দনে অধীর হইয়া যেরূপ অগ্নিমূল্যে স্বরাজ্যের ইজারা সনন্দ গ্রহণ করিলেন, তাহা কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে মঙ্গলাবহ হইলেও,রাণীর পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইল না। এই বন্দোবস্তে কোম্পানীর ২৩৭৬০০ বার্ষিক অতিরিক্ত লাভ হইল বটে, কিন্তু প্রজার নিকট এত টাকা আদায় করিবার উপায় রহিল না! ¶

একে অন্নকষ্ট, তাহাতে পদবিচ্যুত ইজারদারগণ ও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রাণী ভবানীর কার্য্যে পদে পদে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। তাহারা জানিত, রাণী অকৃতকার্য্য হইয়া ইজারা ত্যাগ করিলে, তাহারাই স্বনামী বেনামী ইজারদার হইয়া লক্ষাভাগ করিতে সক্ষম হইবে। রাণী ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ‡

রাণী ভবানীর শাসনকৌশল বিফল হইল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও রাজকর পরিশোধ করিতে পারিলেন না। তখন কোম্পানী বাহাদুর তর্জ্জন

* Letter from Collector of Rajshahye stating that the crop has seriously failed, and recommending the suspension of the ensuing *Kist* to prevent the former from oppressing the rayats.—*March 22, 1784.*

† Petition from vakil of Rajshahye, enclosing a proposal from the Rani to form her District for four years, paying 24 lakhs of rupees for the Bengal year 1191, and an annual progressive increase of Rs. 25000 for the three succeeding years.—*April 25, 1784.*

¶ Letter to Governor General and Council, stating that the proposed new settlement of Rajshahye will afford an advantage to Government of Rs 237600.

‡ Petition from Rani Bhabani stating the opposition & interruption she experiences from the officers of the Diwani and the Fouzdari Adawlat.—*August 23, 1784.*

র্জ্জন করিতে ত্রুটি করিলেন না। রাজসাহীর কালেক্টার লিখিলেন যে, রাণীর পক্ষে রাজকর পরিশোধ করা অসম্ভব! *

অতঃপর রাণী ভবানী নানারূপ কাকুতি মিনতি করিয়াও ফললাভ করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। রাজসাহীর রাজ্যনাশের পূর্ব্বসূচনা উপলব্ধি করিয়া, তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ দশ সহস্র মুদ্রা "পেশকশ" প্রদান করিয়া রাজস্বসংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন! †

মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজসাহীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাজসাহীর জমিদারের সম্পূর্ণ ধনবল, পদগৌরব ও শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন না। মন্বন্তরের সময়ে রাণী ভবানী অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্নজল বিতরণ করিয়া রাজকোষের পূর্ব্বসঞ্চিত অগাধ ধনরাশি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; রাজসাহী রাজ্যে ইজারদার নিযুক্ত হইয়া পৈতৃক পদগৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া জমিদারের শাসনক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছিল। সুতরাং রামকৃষ্ণের রাজোপাধি যতই সুদীর্ঘ হউক, তাঁহার রাজ্যাভিষেকসময়ে তাঁহার ধনবল, পদগৌরব ও শাসনক্ষমতা তদনুরূপ সৌভাগ্যবর্দ্ধন করিতে পারিল না!

বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট।

বিজ্ঞানেশ্বর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম-ভারতে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ ভট্ট। তিনি 'পরমহংস' ও 'পরিব্রাজক' বলিয়া স্বরচিত 'মিতাক্ষরা'র শেষে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। § মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিন অধ্যায়ে যে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, 'মিতাক্ষরা'

* Letter from the Collector of Rajshahye, stating his opinion that it is impossible for the Rani to comply with the requisition of the Committee.

† Letter from the Governor General in Council directing Raja Ramkrishna to be invested with the Zamindari of Rajshahye and a demand upon him for Sikka Rupees 10,000 as a fee of investiture (Peshkash).—*August 20, 1788.*

§ "শ্রীপদ্মনাভভট্টোপাধ্যায়াত্মজ-শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজক-বিজ্ঞানেশ্বর-ভট্টাচার্য্য-কৃতৌ ঋজুমিতাক্ষরায়াং যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রবিবৃতৌ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।"

তাহারই ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। ৩৯৯ লক্ষ্মণাব্দের (১৪০৬ খৃঃ) লিখিত মিতাক্ষরার এক প্রতিলিপি (V. 302) পাওয়া গিয়াছে। যতী বিজ্ঞানেশ্বর ভারদ্বাজ-গোত্রজ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি বিশ্বরূপের শিষ্য। বিশ্বরূপ আচার্য্য 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র যে দুরূহ ও বিস্তীর্ণ ভাষ্য রচনা করেন, বিজ্ঞানেশ্বর তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া সরল ও সুখবোধ্য ভাষায় 'প্রমিতাক্ষরায়' লিপিবদ্ধ করেন। ডাক্তার ওপার্ট কোচিনের মহারাজার পুস্তকাগারে বিশ্বরূপের রচিত এক খণ্ড ভাষ্য দর্শন করেন। * বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরার দায়াধিকারতত্ত্ব পরিগৃহীত হইয়াছে। সমুদয় ভারতবর্ষ অবনতমস্তকে মিতাক্ষরার দায়বিভাগ গ্রহণ করিয়া, বিজ্ঞানেশ্বরের প্রাধান্য ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ডাক্তার জলির মতে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি' খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হয়। ইহার প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় 'গরুড়পুরাণে' অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় 'অগ্নিপুরাণে'র একাংশে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বরূপ আচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকার। বিজ্ঞানেশ্বরের পর শিলাহারবংশীয় রাজা অপরাদিত্য (অপরাজ) দেব ও দেববোধ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'র ন্যায় কোনও ভাষ্য সমাদৃত হয় নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে 'মিতাক্ষরা' কলিকাতায় প্রথমতঃ মুদ্রিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বোম্বে নগরে মিতাক্ষরার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানেশ্বর স্বপ্রণীত 'মিতাক্ষরা'য় অসহায়, মেধাতিথি ভট্ট, জিতেন্দ্রিয়, মৈথিল শ্রীকার, বিশ্বরূপ ও ধারেশ্বর ভোজরাজদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আপস্তম্বসূত্র মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ডাক্তার জলির মতে, আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্র পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী এই ধর্ম্মসূত্র-রচনার অধস্তনকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতমের ধর্ম্মসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গৌতমের পর বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্র প্রণীত হয়। বৌধায়নসূত্রের পর আপস্তম্বসূত্র দক্ষিণাপথে রচিত হয়।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর মতে বিজ্ঞানেশ্বরের উল্লিখিত শ্রীকার মিথিলায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হন। এই মৈথিল স্মার্ত্ত মেধাতিথির পরবর্ত্তী। বিশ্বরূপ, বিজ্ঞানেশ্বর ও ধারেশ্বর ভোজদেব, শ্রীকারের পরবর্ত্তী

* Dr. Oppert's "Catalogue of Sanskrit Mss." no. 3010.

স্মৃতিগ্রন্থপ্রণেতা। ব্যবস্থা ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য-যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে মিথিলা অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্ত্তী ও শ্রীকারের পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল স্মার্ত্তদিগের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। মিথিলা স্মৃতি শাস্ত্রের আদিম অনুশীলনস্থল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মেধাতিথির দ্বারা দ্রাবিড়ে স্মৃতি-চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহারাষ্ট্র ও বারাণসীতে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশীলন প্রবর্ত্তিত করেন। জীমূতবাহন দ্বারা বঙ্গদেশে স্মৃতির চর্চ্চা আরব্ধ হয়। জীমূতবাহন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শূলপাণি ও কুল্লুক ভট্টের পূর্ব্বতন গ্রন্থকার। জীমূতবাহন স্বরচিত 'দায়ভাগে' ভোজরাজ দেব ও গোবিন্দরাজের প্রণীত 'মনুভাষ্য' উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভোজদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধারা নগরে রাজত্ব করিতেন। গোবিন্দরাজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 'মনুভাষ্যে'র রচনা করেন।

'মিতাক্ষরা'র ভাষ্য 'সুবোধিনী' খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর ভট্টের দ্বারা রচিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে নন্দপণ্ডিত দ্বারা মিতাক্ষরার টীকা রচিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বালকৃষ্ণ (বালম) ভট্ট ও তাঁহার মাতা লক্ষ্মীদেবী নন্দপণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ পূর্ব্বক 'মিতাক্ষরা'র তৃতীয় টীকার রচনা করেন। বারাণসীতে লক্ষ্মীদেবীর মিতাক্ষরা-ভাষ্য বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট কল্যাণ নগরের চালুক্যবংশীয় মহারাজ ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্যের সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া, 'মিতাক্ষরা'র রচনা করেন। নিজামরাজ্যের রাজধানীর হাইদরাবাদের শত মাইল উত্তর-পশ্চিমে কল্যাণ নগর অবস্থিত ছিল। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিদ্যাপতি বিহ্লণ দেব এই প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের জীবনী 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক পদ্যময় ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ১০৭৬ হইতে ১১২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন। স্বরচিত 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের শেষভাগে তিনটি শ্লোকে বিজ্ঞানেশ্বর আপনার আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য (বিক্রমার্ক) নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩ খৃষ্টাব্দে) রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নরপতি কক্কলকে (কর্ক দ্বিতীয় = অমোঘবর্ষ চতুর্থ) পরাজিত করিয়া, মহারাজ তৈলপ চালুক্যবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্য এই তৈলপরাজের অধস্তন চতুর্থতম বংশধর। তিনি চালুক্যবংশের সর্ব্বপ্রধান

নরপতি। তাঁহার অধিকারকালে দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র শান্তিসুখ বিরাজিত ছিল। কল্যাণ নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার নামাঙ্কিত প্রায় দুই শত শাসনলিপি দক্ষিণাপথের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানেশ্বর এই মহাপরাক্রান্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ও মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কল্যাণ নগরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞানেশ্বরের সময় হইতে মহারাষ্ট্র দেশে ও দক্ষিণাপথে বিশেষভাবে স্মৃতি-শাস্ত্রের চর্চ্চা আরব্ধ হয়। অসহায়, মেধাতিথি ভট্ট, জিতেন্দ্রিয়, শ্রীকার, বিশ্বরূপ ও ভোজদেবের পরে আবির্ভূত হইয়া বিজ্ঞানেশ্বর জগদ্বিখ্যাত 'মিতাক্ষরা'র রচনা করেন। স্বরচিত গ্রন্থে তিনি পূর্ব্বোক্ত স্মার্ত্তকারগণের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বিজ্ঞানেশ্বর ও বিদ্যাপতি বিহ্লণ সমসাময়িক গ্রন্থকার। বিজ্ঞানেশ্বরের পর যে সকল স্মার্ত্ত গ্রন্থকার দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হন, তন্মধ্যে রাজা অপরার্ক হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের নাম অতিপ্রসিদ্ধ।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সেক্সপীয়র।

১

মহাকবি সেক্সপীয়রের কবিপ্রতিভার স্বরূপ বুঝিবার জন্য, ঐ প্রতিভার মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' প্রবন্ধের মুখবন্ধে * আমি কবিপ্রতিভার মূলতত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, এ স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 'মহাকবির প্রতিভার অভ্যন্তরে নিরাকার উৎপাদিনী মহাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রতি বীজে শক্তির স্বরূপ বিভিন্ন, তাই বৃক্ষ-জগতে এত বৈচিত্র্য। প্রতি প্রতিভায় শক্তির স্বরূপ বিভিন্ন,তাই কাব্য-জগতে এত বৈচিত্র্য। এই শক্তিই প্রতিভার মূলতত্ত্ব; ইহা লইয়াই কবির স্বাতন্ত্র্য; তাই কালিদাস সেক্সপীয়র নহেন।' আর ঐ মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলাম। 'সমালোচক প্রথমে ধীরভাবে সমালোচ্য

* সাহিত্য; তৃতীয় বর্ষ; ৮৩—৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাব্যের সকল লক্ষণ পরীক্ষা করেন—ঘটনাপরম্পরার অনুধাবন করেন। তাহার পর মূলতত্ত্বে উপনীত হইতে অগ্রসর হয়েন। কারণ ঐ ঘটনাপরম্পরা পরস্পর সম্পৃক্ত, সজীব, একতাবিশিষ্ট। তাহারা এক মূল কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। ঐ মূলতত্ত্ব কি? সকল স্থলেই সমালোচক একটা কল্পনাসিদ্ধান্ত ঐ মূলতত্ত্বরূপে খাড়া করেন। যদি এই কল্পনাসিদ্ধান্তের সহিত সকল ঘটনার সকল সম্বন্ধের সমাবেশ হয়, তবে উহাই সিদ্ধসিদ্ধান্ত, উহাই যথার্থ মূলতত্ত্ব। অন্যথা কল্পনামাত্র।"

কালিদাস ও সেক্সপীয়রের মহা প্রতিভারও মূলতত্ত্ব আছে। কারণ, তাঁহাদের প্রতিভাপ্রসূত কাব্যেরও ঘটনাপরম্পরা পরস্পরসংযুক্ত, সজীব, একতাবিশিষ্ট; অর্থাৎ, এক মূল কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই মূলতত্ত্ব কি?

আমার মনে হয়, কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। আর সেক্সপীয়র মানুষতার কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনাশক্তি।

কালিদাস যে সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব যে অমানুষী সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' প্রবন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই। অতঃপর সেক্সপীয়রের কবিপ্রতিভার মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

'সেক্সপীয়র মানুষতার কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনা-শক্তি।' এ কথার অর্থ কি? এ কথার প্রমাণই বা কি? প্রমাণ পরে উপস্থিত করিব। সম্প্রতি এ কথার অর্থ কি, তাহাই স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রথম বুঝিতে হইবে, মানুষতা কি? মনুষ্যের স্বরূপ কি?

মনুষ্য সৃষ্টির ললাম, শেষ বিবর্ত্তন, চরম উৎকর্ষ। মনুষ্য ক্ষুদ্র হইয়াও মহান্, কঠিন হইয়াও কোমল, জড় হইয়াও চেতন, সান্ত হইয়াও অনন্ত, পশু হইয়াও দেবতা। তাহার রহস্য কে বুঝিবে? সে অজ্ঞেয়, অত্যদ্ভুত, অশেষ লীলাময়। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'ত্রিধারা'য় এই ধরণের কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। 'পৃথিবীর যেমন, মানুষেরও তেমনি দুইটি দিক আছে। একটি ভাল দিক, একটি মন্দ দিক। মানুষের পদতলে পৃথিবী, মানুষের মস্তকোপরি স্বর্গ। তাই বুঝি মানুষ এক দিকে পশু, আর এক দিকে দেবতা। অতএব মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পশুধর্ম্মও বুঝা চাই, দেবতাধর্ম্মও বুঝা চাই।' সুকবি

অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার প্রদীপ গীতিকাব্যে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় এই মানুষের পশুত্ব, দেবত্ব বিবৃত করিয়াছেন।—

"হের, এ প্রণবে, সতি,
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি ;
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
ঝর ঝর সুর-সৃষ্টি ঝরে শিরোপর।
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।
কিছু তুচ্ছ নাহি তার,
সে যে দেব-অবতার—
কল্পনায় কুতূহলী,
দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের নিয়ামক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, গদা-পদ্মধারী।"

ইহা মনুষ্যের দেবভাবের পরিচায়ক। তাহার পশুভাবের পরিচয় এইরূপ—

"সেই উন্মাদনা-স্রোত
আজো প্রাণে ওতপ্রোত ;
আজো তৃপ্তি অবসরে
সে অতৃপ্তি হাহা করে ;
সেই চিত্তে অপ্রসাদ, জীবনে ধিক্কার ;
সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ-হুহুঙ্কার।
আজো সেই পশু-ধর্ম্মে
ভ্রমি লক্ষ্যহীন কর্ম্মে ;
আত্ম-স্থাপনার ছলে
বিশ্ব দিই রসাতলে ;
কামে ক্রোধে লোভে মদে সৃষ্টি শতচুর ;
হাহা, নর সাক্ষাৎ অসুর।"

এই দেবত্ব ও পশুত্বের রাসায়নিক সংযোগে মনুষ্য। এ সংযোগে দেবভাব ও পশুভাব মিলিয়া মিশিয়া এক অভিনব অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই পদার্থ মানুষ।

মানব-রহস্যবিৎ সেক্সপীয়র হ্যামলেটের মুখে মনুষ্যের দেবভাব এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন—

"What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!"

'মানব কি অদ্ভুত রচনা! বিবেকে কি মহান্! শক্তিতে কি অসীম! আচারে ও চেষ্টায় কি বিস্ময়কর! কার্য্যকুশলতায় দেবসদৃশ। বুদ্ধিবৃত্তিতে ঈশ্বরতুল্য। মানব জগতের সুষমা, জীবসৃষ্টির ললাম।'

সেই হ্যামলেটের মুখেই আমরা অন্যত্র শুনিতে পাই—

"Get thee to a nunnery: why wouldst thou be a breeder of sinners? I am myself indifferent honest; but yet I could accuse me of such things, that it were better my mother had not borne me. * * * What should such fellows as I do crawling between earth and heaven. We are arrant knaves, all; believe none of us."

হ্যামলেট ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনী ওফিলিয়াকে বলিতেছেন—

'যোগিনী হইয়া জীবন যাপন কর। কেন পাপিষ্ঠের জননী হইবে বল? দেখ, আমি যে খুব মন্দ লোক, তাহা নহি। তবু আপনাকে আপনি যত বিষয়ে অপরাধী জানি, তাহাতে মনে হয় যে, আমার মাতা আমাকে জঠরে ধারণ না করিলেই ভাল ছিল। আমার মত পাপিষ্ঠেরা ধরাধামে বিচরণ করিলে কি ফল বল? আমরা সকলেই ঘোরতর পাষণ্ড। আমাদের কাহাকেও প্রত্যয় করিও না।'

ইহা মানুষের পশুভাবের পরিচয়। আর সেক্সপীয়র প্রপীড়িত লিয়রের মুখে অথবা নির্য্যাতনগ্রস্ত টাইমনের রসনা হইতে যে অভিশাপ-বহ্নির প্রতপ্ত গৈরিক স্রাব উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মানবের পশুত্ব কবি কতটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।—

All the stored vengeances of heaven fall
On her ingrateful top! Strike her young bones,
You taking airs, with lameness!
You nimble lightnings, dart your blinding flames
Into her scornful eyes! Infect her beauty,
You fen-suck'd fogs, drawn by the powerful sun,
To fall and blast her pride!

Lear Act II. Sc IV.

'ঈশ্বরের চিরসঞ্চিত প্রতিহিংসা তাহার কৃতঘ্ন শিরে বর্ষিত হউক। সংশোষক বায়ু তাহার নবীন দেহে পঙ্গুতার সঞ্চার করুক। দ্রুতগামী বিদ্যুদগ্নি তাহার ঘৃণাব্যঞ্জক নেত্রে অন্ধতা আনয়ন করুক। প্রখরকিরণাকৃষ্ট পঙ্কধূমে তাহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাউক। যেন তাহার গর্ব্ব চিরদিনের জন্য খর্ব্ব হয়।'

Piety, and fear,
Religion to the gods, peace, justice, truth,
Decline to your confounding contraries,
And let confusion live! Plagues, incident to men,
Your potent and infectious fevers heap
On Athens, ripe for stroke!

Lust and liberty
Creep in to the minds and marrows of our youth,
That g'ainst the stream of virtue they may strive,
And drown themselves in riot! Itches, blains,
Sow all the Athenian bosoms; and their crop
Be general leprosy! Breath infect breath,
That their society, as their friendship, may
Be merely poison.

Timon of Athens. Act IV. Sc I.

'শ্রদ্ধা ভয় ধর্ম্ম শান্তি ন্যায় সত্য—সকলই যেন (এথেন্‌স নগরীতে) স্ব স্ব ধ্বংসকারী বৈপরীত্যে পর্য্যবসিত হইয়া গণ্ডগোলের একাধিপত্য আনয়ন করে! যেন মহামারী প্রবল সংক্রামক জ্বরে ধ্বংসপ্রবণ এথেনস্ নগরীকে বিপর্য্যস্ত করে। যুবক যুবতীর মজ্জায় ও মনে যেন কাম ও যথেচ্ছাচার প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষম আবর্ত্তে নিমজ্জিত করে। যেন এথেনস্‌বাসীদিগের দেহ সর্ব্বব্যাপক কুষ্ঠরোগে বিকৃত হইয়া যায়। আর যেন প্রত্যেকের নিশ্বাস দোষযুক্ত হইয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে নিরন্তর বিষ বমন করিতে থাকে।'

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'নবজীবনে' শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'জন্তুধর্ম্মী মানব' এই শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে মানুষের পশুভাব বা পশুত্ব অতি দক্ষতার সহিত প্রতিপাদিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে মনুষ্য জন্তু নানাবিধ। পশু পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য জন্তু আছে। অক্ষয় বাবু তিনটিমাত্র উদাহরণ দিয়া বিচক্ষণ পাঠক পাঠিকাকে জু-বাগানে গিয়া ষ্টকের সহিত আমদানি মিলাইয়া ক্ষোভ মিটাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সৌখীন ব্যক্তিরা শুকপক্ষিধর্ম্মী। তোষামোদকারীরা বিড়ালধর্ম্মী, এবং খলস্বভাব মনুষ্যেরা সর্পধর্ম্মী। ইহা ছাড়া তাঁহার মতে কাক পেচক কুক্কুট প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষিধর্ম্মী মানব আছে। ছাগ মেষ শূন শূকর শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুজাতীয় মানবেরও অভাব নাই। এবং গোধা গিরগিটে ইন্দুর ছুছুন্দরী প্রভৃতি নানারূপ সরীসৃপধর্ম্মী মানবও খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অক্ষয় বাবুর চিত্রটি পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য দেবধর্ম্মী মানব নামে আর একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে মনুষ্যের দেবভাব বা দেবত্ব অতীব সহৃদয়তার সহিত প্রকটিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ বাবু দেখাইয়াছিলেন যে, জন্তুধর্ম্মী মানবের ন্যায় দেবধর্ম্মী মানবও নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির। জন্তুপ্রকৃতিও যেমন বহুবিধ, দেবপ্রকৃতিও তেমনি বহুবিধ। উদাহরণস্বরূপ তিনি অন্নপূর্ণাধর্ম্মী, দিকপালধর্ম্মী ও নারায়ণধর্ম্মী মনুষ্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনাগুলি পড়িলে সাধারণ মনুষ্যের মধ্যেও কতটা দেবভাব প্রচ্ছন্ন আছে, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

এই তত্ত্বটি বিবৃত করিবার জন্য প্রাচীনেরা একটি গল্প বলিয়া থাকেন। গল্পটি গল্প হইলেও বড় শিক্ষাপ্রদ। এক দীন দুঃখী ব্রাহ্মণ উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া জঠরজ্বালার অঙ্কুশতাড়নায় সারাদিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না দেখিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল, এবং মনোবেদনায় অধীর হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাপুরুষকে অনেক গালি পাড়িতে লাগিল। বিধাতাপুরুষ আত্মদোষস্খালনে উৎসুক হইয়া, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন, এবং কথায় কথায় ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনের কথা উঠিলে বলিলেন, 'বাপু! বৃথা কেন ক্ষোভ কর। মানুষেই ত ভিক্ষা দেয়। তুমি ত মনুষ্যের কাছে ভিক্ষার জন্য যাও নাই। তোমার ভিক্ষা মিলিবে কেন?' ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুর! মানুষের কাছে যাই নাই ত কি পশুর কাছে গিয়াছিলাম না কি?' বিধাতাপুরুষ বলিলেন 'তা বই কি!' বলিয়া একখান চসমা ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'এই চসমা চক্ষে দিয়া চাহিয়া দেখ দিকি?' ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিল, বাস্তবিকই মানবদেহধারিমাত্রই মনুষ্য নহে। দেখিল যে, চর্ম্মচক্ষে যাহাদের মানুষ দেখিয়াছিল, তাহারা এক একটি জন্তুই বটে। কেহ ব্যাঘ্র, কেহ ভল্লুক, কেহ সর্প, কেহ মূষিক, কেহ শুক,

কেহ বাজপাখী, ইত্যাদি। কদাচিৎ দুই এক জন প্রকৃত মনুষ্য আছে। তখন তাহার চিত্তক্ষোভ দূর হইল। সে বিধাতাপুরুষের স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। অক্ষয় বাবুর উপরি-উক্ত প্রবন্ধের মত এই গল্পটিতেও সত্যের একদেশমাত্র বিবৃত হইয়াছে। মানুষ কেবল পশু নহে; মানুষ দেবতাও বটে। মানুষ পশুত্ব দেবত্বের রাসায়নিক সংযোগ। মানুষ রহস্যময় অত্যদ্ভুত পদার্থ। ইহাই মনুষ্যের স্বরূপ। মানব দেবত্ব ও পশুত্বের অদ্ভুত সমন্বয়। আর মানবতা—সেই অদ্ভুত মানবের বিশাল সমগ্রতা; মানব-প্রকৃতি সপ্তকের প্রকাণ্ড সমষ্টি। সৃষ্টিরহস্যজিজ্ঞাসু হ্যামলেটও মানুষ, ইহকালপর উদরসর্ব্বস্ব ফলস্ট্যাফও মানুষ। অকারণবৈরী ইয়াগোও মানুষ, আর বৃদ্ধ লিয়রের প্রভুভক্ত সেবক কেণ্টও মানুষ। দানবী রিগনও মানুষ, এবং দেবী করডিলিয়াও মানুষ। বিলাসিনী ক্লিওপেটরাও মানুষ, আর পতিদেবতা ইমোজেনও মানুষ। উচ্চতম দেবভাব ও নীচতম পশুভাব, এই উভয়ের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান! কি ব্যাপক ব্যবচ্ছেদ! কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কে তাহা ধারণায় আনিতে পারে? কে কল্পনার আয়ত্ত করিতে পারে? যদি কেহ কখন পারিয়া থাকে, তবে সে সেক্সপীয়র। তিনি পারিয়াছেন, কারণ তিনি অমানুষ; তাঁহার কল্পনাশক্তি অমানুষী ছিল। সেই জন্য তিনি মানবতার কবি। মানবতার বিরাট চিত্র তাঁহারই কল্পনা-দর্পণে যথাযথ প্রতিভাত হইয়াছিল।

এ কথার অর্থ কি, আমরা বারান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মঙ্গল গ্রহের জীব।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্পকাল মধ্যে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। দূরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গল গ্রহটি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহার স্থানে স্থানে একপ্রকার কৃষ্ণচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং মেরুদ্বয়ের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল শ্বেত আলোক দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ আরও অনেক ব্যাপার সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষ অভিনিবেশসহকারে পরীক্ষা করিলে, বহুসংখ্যক সরল রেখা দ্বারা সমগ্র গ্রহটি

নানা আকারের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি জ্যামিতিক-ক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মঙ্গলের এই অদ্ভুত প্রাকৃতিকদৃশ্য ও আকারাদি বিষয়ে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ অনেক কথা বলিতেছেন;—মঙ্গলের আধুনিক অবস্থা ও জীববাসোপযোগিতা সম্বন্ধে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নানা অনুমান, ইতিমধ্যেই প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে জীববাসোপযোগী অনেক পদার্থ মঙ্গল গ্রহে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন;—পূর্ব্বে যে মঙ্গলগোলকস্থ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন গুলির কথা বলা হইয়াছে,—ইহাদের মতে,—তাহা নীলবর্ণ জলরাশি ও মেরুদেশস্থ সুবিস্তৃত তুষারস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্রহগোলকব্যাপ্ত উল্লিখিত সরল রেখাগুলির উৎপত্তিতত্ত্বও কয়েক জন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। ইহারা বলেন,—উক্ত সরল রেখাগুলি প্রাকৃতিক কারণে কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না; সুবিন্যস্ত সরলরেখাযোগে এই প্রকার নানাবিধ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের অঙ্কন, প্রকৃতির কোন কার্য্যেই কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এগুলি নিশ্চয়ই কোনও বিশেষবুদ্ধিসম্পন্ন মঙ্গলবাসী জীবের কীর্ত্তি। মঙ্গলে পৃথিবীর ন্যায় ঝড় বৃষ্টি ও মেঘাদির আধিক্য নাই; সেই জন্য তথায় শস্যাদি উৎপাদনের ও জীবস্থিতির নিমিত্ত কৃত্রিম নদী ও খাল ইত্যাদির বিশেষ আবশ্যক; ইহাদের মতে, মঙ্গলপৃষ্ঠব্যাপ্ত রেখাগুলি, মঙ্গলবাসিগণের নিখাত সুবিন্যস্ত কৃত্রিম নদী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

জীবের অস্তিত্বজ্ঞাপক এই প্রকার বিবিধ চিহ্নের আবিষ্কার করিয়া,মঙ্গল গ্রহ উৎকৃষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের বাসস্থান বলিয়া প্রায় সকলেই অনুমান করিতেছেন। মঙ্গলের তাপপরিমাণ প্রায় পৃথিবীর তাপের অনুরূপ; ইহার মেরুদ্বয়ে যে তুষাররাশি সঞ্চিত থাকে,এই তাপপ্রভাবে তাহা জলীভূত হইয়া,পরে উক্ত কৃত্রিম নদী ও সমুদ্রাদি দ্বারা সমগ্র গ্রহপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। মাঙ্গলিক আকাশে বায়ু ইত্যাদিরও অস্তিত্ব আছে, স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহা পার্থিব বায়ুর ন্যায় ঘন নয়, কাযেই তদ্দ্বারা আকাশের বা ঋতুর কোন বৈচিত্র্যই সাধিত হয় না। মঙ্গলে 'একঘেয়ে' চিরবসন্ত সর্ব্বদাই বিদ্যমান। ঘনত্ব হিসাবে পদার্থের ভার মঙ্গলে বড় অল্প;—গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক-লক্ষ-মণ-ভার-বিশিষ্ট কোনও পার্থিব পদার্থ মঙ্গলে লইয়া গেলে, তাহার ভার তথায় কেবল ৩৭৬ মণ মাত্র হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, মঙ্গলের আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও ঘনত্বের অল্পতাই এই ভারবৈষম্যের কারণ। কেবল কৃত্রিম খাল প্রভৃতি দেখিয়া মাঙ্গলিক জীবের

অস্তিত্ব প্রথমতঃ অনেকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা সকলও জীবস্থিতির সম্পূর্ণ অনুকূল দেখিয়া, মঙ্গল গ্রহে জীবাবাসের সম্ভাব্যতা অধুনা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই প্রকারে মাঙ্গলিক জীবের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাহাদের আকার, বুদ্ধি ও পৌরুষাদি সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য কয়েক জন পণ্ডিত সচেষ্ট রহিয়াছেন। মঙ্গলবাসিগণ যে মনুষ্য অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী জীব, তাহা মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী ও খাল ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের আকৃতি ও পৌরুষাদি সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পণ্ডিতগণের এই উন্মত্ত প্রয়াস কত দূর সাফল্য লাভ করিবে, পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নানা যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া, বহু গবেষণা ও গণনায় যাহার আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, আজ কাল ঔপন্যাসিকগণ কেবল কল্পনার সাহায্যে তৎসম্বন্ধে অনেক কথার প্রচার করিতেছেন। এই বৈজ্ঞানিক-উপন্যাস-কারগণ, প্রায়ই প্রাকৃতিক শক্তি ও তাহার কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, উক্ত-শক্তিজাত অলৌকিক ও অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যপরম্পরার কল্পনা করিয়া প্রকৃতির অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি 'বর্ডারল্যাণ্ড' নামক একখানি ইংরাজি সাময়িকপত্রে, মঙ্গলবাসিগণের একটি কল্পিত ইতিহাস প্রকটিত হইয়াছে।

'বর্ডারল্যাণ্ডে'র ঔপন্যাসিক লেখক বলেন,—মঙ্গলবাসিগণ বৃহৎমস্তিষ্কশালী জীব; ইহাদের মস্তিষ্কের পরিধি কিছুতেই চারি ফিটের কম নয়; এই প্রকার মস্তিষ্ক ব্যতীত সমগ্র মঙ্গলপৃষ্ঠে সুয়েজখালের ন্যায় দীর্ঘ কোটি কোটি নালার খনন করা কিছুতেই সুসাধ্য হইত না। ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত, এবং শ্বাসকার্য্যটা বৃহৎ চক্ষুযুগলের নিম্নস্থ দুইটি অনতিদীর্ঘ চক্ষু দ্বারা সম্পন্ন হয়। পার্থিব প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদের উদর নাই, এবং পাকক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না; কাযেই ভোজন ব্যাপারটার সহিত মঙ্গলবাসিগণ সম্পূর্ণ অপরিচিত,—আহারের কার্য্যটা নিকৃষ্ট জীববধজাত শোণিত স্বস্ব ধমনীতে প্রবিষ্ট করাইয়াই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষভেদ নাই। এজন্য মঙ্গল লোকটা চিরশান্তিময়,—বংশবিস্তার কার্য্য উদ্ভিদাদির ন্যায় সম্পন্ন হয়। লেখক বলেন,—মঙ্গলিক জীবের পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বগুলি কেবল

উপন্যাস-সুলভ কল্পনাকল্পিত নয়,—অভিব্যক্তিসম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদ সত্য হইলে, মঙ্গলের এই কল্পিত বিবরণ অসত্য ভাবিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। লেখক মঙ্গলবাসিগণকে অসাধারণ প্রতিভাশালী ও বৈজ্ঞানিক জীবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কি কৌশলে অন্ধ জড়শক্তিকে দৈনন্দিন কার্য্যের উপযোগী করিতে হয়, সে বিষয়ে ইহারা যে কতদূর সিদ্ধহস্ত, তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। একটি উপগ্রহ মঙ্গলপৃষ্ঠের অতি নিকট দিয়া, দ্রুতবেগে গ্রহপ্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; এই উপগ্রহের গতিতে, ভ্রমণপথের ঠিক্ নিম্নদেশ সর্ব্বদাই মহাঝটিকাসঙ্কুল হইয়া পড়ে,—কোনও মাঙ্গলিক জীবই এই প্রাকৃতিক উৎপাতে উক্ত স্থানে বাস করিতে পারে না। কিন্তু তদ্দ্বারা মঙ্গলবাসিগণের একটা বিশেষ উপকার সাধিত হয়;—গ্রহ ও উপগ্রহের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত ইহাদের মধ্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা সুব্যবস্থিত যন্ত্র দ্বারা সংযত হইয়া, সমগ্র অধিবাসিবর্গের ব্যবহার্য্য তাপ ও আলোকের অভাব পূরণ করে। পৃথিবী হইতে মঙ্গলের যে লোহিতাভ জ্যোতিঃ দেখা যায়, তাহা কেবল গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে অবিরাম বিদ্যুতের আদানপ্রদানজাত আলোক হইতে উৎপন্ন।

দুই ভাই।

১

সঙ্কীর্ণ গলির উপর একটি বাড়ী; তাহারই দ্বিতলস্থ একটি মধ্যায়তন কক্ষে একজন রমণী মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা। বার্দ্ধক্যের কঠোর করস্পর্শ এখনও রমণীর বিগতপ্রায়যৌবনলাবণ্য আননে একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে পারে নাই; রোগক্লেশ এখনও সে পাণ্ডুর আননের শেষ রূপচিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। বিংশতিবর্ষীয় পুত্র বিপিন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জননীর পাণ্ডুর মুখ পানে চাহিয়া আছে।

অস্তগমনোন্মুখ তপনের লোহিতাভ করজাল পশ্চিমের মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া শয্যার পাদদেশে আসিয়া পড়িল। একটা ক্ষুদ্র বিহগ বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া একবার মধুর কূজন করিল, তাহার পর উড়িয়া গেল—বুঝি সে ভাবিল, এ মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাহার আনন্দ-গীতি শোভন হইবে না। মরণাহতা

জননী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বিপিন, একবার নলিন আর শেফালিকাকে ডাক।"

বিপিন দুই জনকে ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া পার্শ্বের কক্ষ হইতে একটি মলিনবর্ণ দশমবর্ষীয় বালক ও একটি কনকচম্পকদামগৌরী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; যেন রজনী ও ঊষা একত্র আসিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া উভয়েরই চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। নলিন রমণীর পুত্র; শেফালিকা তাঁহার কোনও আত্মীয়ার কন্যা, শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। রমণীর স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পত্নী বিচার বা বিবেচনার অপেক্ষা না করিয়া স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বামীকে ছাড়িয়া স্ত্রীর কোনও ধর্ম্ম নাই।

দুর্ব্বল হস্তে বালকের ও বালিকার হস্ত ধরিয়া রমণী যুবকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। যুবক এতক্ষণ কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়াছিল—এবার কাঁদিয়া ফেলিল। আপনার হস্তে তপ্ত অশ্রুর স্পর্শানুভবমাত্র রমণী বলিলেন, "ছিঃ! বাবা বিপিন, তুই এমন অধীর হইলে উহাদের কে দেখিবে? তোর পিতার মৃত্যুর পর হইতে এতদিন তোদের মানুষ করিয়াছি; সংসারের দুঃখ কষ্ট এক দিনের জন্য তোদের জানিতে দিই নাই; ভাবিতাম—তোরা ছেলেমানুষ, তোদের কোনও কষ্ট সহিবে না। আজ তুই বড় হইয়াছিস, আজ ইহাদিগের ভার তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতেছি—আমি ত সুখেই মরিতেছি! আমার জন্য কান্না কেন বাবা? ইহাদের সকল ভার তোর উপর রহিল।"

জননী পুত্রকে কাঁদিতে বারণ করিলেন বটে, কিন্তু অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

সেই দিন নিশাশেষে রমণীর ক্ষীণজ্যোতিঃ জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

বিপিন ভাবিল—মা যখন নলিনের ও শেফালিকার ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন, তখন আমি সাধ্যমতে তাহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

২

যে দিন বিপিনের হস্তে নলিনের ও শেফালিকার ভার অর্পণ করিয়া রমণী-জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার পর দশ বৎসর বহিয়া গিয়াছে। অনন্ত-কালের তুলনায় দশটি বৎসর সমুদ্রসৈকতে এক কণা বালুকামাত্র; কিন্তু এই দশ বৎসরকালে সেই যুবকের ও সেই বালক বালিকার কত পরিবর্ত্তন হইয়া

গিয়াছে! বিপিন এখন যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত। জানি না, কি গোপন বাসনায়, কি দারুণ চিন্তায়, কি কঠোর মনঃকষ্টে, তাহার উৎফুল্ল যৌবন-শ্রী-সম্পন্ন আননে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। যৌবনের উৎসাহ বা উদ্যম, আকুলতা বা আবেগ, কিছুই তাহার নাই। জগতে কে অপরের হৃদয়ের গোপন বেদনা জানিতে পারে? নলিন এখন আর বালক নহে, প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। শেফালিকাও এখন আর সে বালিকা নাই—যৌবনের ঐন্দ্রজালিক কর-স্পর্শে তাহার দেহে মলয়পবনস্পর্শে কাননে বিকশিত কুসুমের শোভার মত অসামান্য রূপরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাঞ্চল্য এখন গাম্ভীর্য্যে নিমগ্ন হইয়াছে। নলিন এখন এক বড় বণিকের হৌসে খাজাঞ্চি অর্থাৎ "ক্যাশিয়ার"।

আজ বৈশাখের সন্ধ্যায় আপনার কক্ষে বসিয়া বিপিন কি ভাবিতেছে। সম্মুখে টেবিল কয়খানা পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে; একটা বড় ল্যাম্প কক্ষে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিতেছে। রাজপথে কোনও পথিকের উচ্চহাস্য বা কোনও শকটের গমনশব্দ শ্রুত হইতেছে; কিন্তু সে সকলে বিপিনের মনোযোগ ছিল না, সে তদ্গতচিত্তে কি ভাবিতেছিল।

কিছু ক্ষণ ভাবনার পর বিপিন আপনা-আপনি বলিল, "আর বিলম্ব করি কেন? নলিনের ভার মা আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যতদিন সে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিল, ততদিন আপনার সুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার সুখবিধানে চেষ্টিত হইয়াছি। আজ আর সে বালক নহে। এখন সে বড় হইয়াছে,—যে গচ্ছিত ধনের চিন্তায় এতদিন ব্যস্ত ছিলাম, সে চিন্তার কারণ এখন আর নাই। তবে আর কেন আপনার সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকি? জগতে সুখ-লাভের চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকে; আমি কেন করিব না? আজ নলিনকে এ কথা বলিব।"

বিপিন এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় কক্ষদ্বার হইতে কে ডাকিল, "দাদা!"

বিপিন বলিল, "কে, নলিন? এস, ভাই, ভিতরে এস।"

নলিন কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল; বসিয়া বলিল, "দাদা একটা আবশ্যক কথা বলিতে আসিয়াছি।"

বিপিন বলিল, "আমিও তোমাকে একটা দরকারী কথা বলিব। তুমি কি বলিবে, বল।"

নলিন বলিল, "আমি শেফালিকাকে বিবাহ করিব।"

বিপিন চমকিয়া উঠিল। তাহার নয়নদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত-

মধ্যে সে আত্মসংবরণ করিল। নতদৃষ্টি নলিন তাহার মুখের বেদনাব্যঞ্জক ভাব লক্ষ্য করিতে পারিল না। আত্মসংবরণ করিয়া বিপিন বলিল, "আচ্ছা।"

কিছু ক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বিপিন বলিল, "তুমি শেফালিকার মত লইয়াছ?"

নলিন বলিল, "হাঁ।"

তাহার পর দুই জনে আবার চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নলিন উঠিয়া যাইতেছিল, দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, তুমি কি বলিবে বলিতেছিলে?"

বিপিন বলিল, "আজ থাক্। আর একদিন বলিব।"

নলিন আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে এ বিবাহে দাদার সম্মতি-সংবাদ শেফালিকাকে বলিতে গেল।

৩

নলিন চলিয়া গেলে বিপিন উঠিয়া কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর চেয়ারে বসিয়া দুই করে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন কি যাতনাময়,—কি মনোবেদনাব্যঞ্জক, তাহা কে বলিবে? মর্ম্মব্যথাপীড়িত হৃদয় হইতে অব্যক্ত বেদনা বহিয়া সে অশ্রুরাশি নয়নে ফুটিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ কাঁদিয়া বিপিন ভাবিতে লাগিল, এত দিন আপনার সকল সুখ তুচ্ছ করিয়া যাহার সুখবিধানে চেষ্টিত হইয়াছি, আজ কি আত্মসুখাশায় তাহাকে চিরজীবনের জন্য অসুখী করিব? মৃত্যু-শয্যায় মা আমার হাতে নলিনকে ও শেফালিকাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আজ আমি আপনার সুখের জন্য তাহাদিকে অসুখী করিব? জীবন কুসুমের মত ক্ষণস্থায়ী—তাহা প্রভাতে ফুটিয়াছে, সন্ধ্যায় শুকাইয়া যাইবে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কেন তাহাদের সুখ নষ্ট করিব? আমি তাহাদের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করি, তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই আমার কর্ত্তব্য। নলিন শেফালিকাকে বিবাহ করিয়া সুখী হউক—আমি তাহার সুখের অন্তরায় হইব না। মা আমার আমাদের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আর আমি তাঁহার কথায় একটা সুখ-আশা বিসর্জ্জন করিতে পারিব না? নলিনের ভার আমার উপর; তাহার সুখের জন্য, যত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব।

বিপিন চক্ষু মুছিয়া স্থির হইল। হৃদয়ে কোনও মহৎ সঙ্কল্প উপস্থিত হইলে

বলের অভাব হয় না; তখন বল আপনি আইসে। সঙ্কল্প স্থির হইলে পর বিপিনের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অপসৃত হইয়া গেল।

বিপিন আপনি উদ্যোগ করিয়া শেফালিকার সহিত নলিনের বিবাহ দিল; কিন্তু হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রান্তে কোথায় যে কেমন একটু বেদনা তীক্ষ্ণকুশাঙ্কুরের মত বিদ্ধ হইতেছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে পারিল না।

৪

দিন যেমন যায়, তেমনই যাইতে লাগিল। বিবাহের পর প্রথম দিন কতক নলিনের মনে যে অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাস আসিয়াছিল, বন্যার জলের মত তাহা শীঘ্রই সরিয়া গেল। তখন দাম্পত্য জীবনের দৈনন্দিন মান অভিমান, আদর সোহাগ, ভ্রূকুটি চুম্বন, যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইতে লাগিল। আনন্দের প্রথম প্লাবন দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। তবুও যেন নলিনের ও শেফালিকার হৃদয়ে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটু পরিবর্ত্তন আসিল,—সেটা একান্তই স্বাভাবিক; কেন না, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একাংশ ত্যাগ করিয়া আর এক অংশে প্রবেশ করিতে হয়;—দুই অংশে প্রভেদ প্রভূত। বিবাহিত-জীবনে একটা দায়িত্ববোধ, একটা গাম্ভীর্য্য আইসে, যাহা অবিবাহিত জীবনে আসিতে পারে না।

বিপিনের পূর্ব্বে যেমন দিন কাটিতেছিল, এখনও তেমনই কাটিতে লাগিল। কেবল তাহার দেহে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন সকল ক্রমেই পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতে লাগিল,—উন্নত কপালে চিন্তারেখা দৃষ্ট হইল, কেশজাল শ্বেত হইয়া উঠিল, মনের স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। নলিন এক এক দিন জিজ্ঞাসা করিত, "দাদা, তোমার কি কোনও অসুখ হইয়াছে?" বিপিন বলিত, "না।" নলিন বলিত, "তবে দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছ কেন?" বিপিন হাসিয়া বলিত, "ও কিছুই নহে। আমি মরিবার পূর্ব্বে তুই জানিতে পারিবি, সে জন্য অত ভাবিয়া কাজ নাই।"

শেষ নলিন জেদ করিয়া দাদাকে দেশভ্রমণে রাজি করিল। আপনি সঙ্গে গিয়া, টিকিট করিয়া, সে দাদাকে কলম্বোযাত্রী ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়া নলিন শেফালিকাকে বলিল, "দাদার নিশ্চয়ই কোনও অসুখ করিয়াছে; কিন্তু তিনি যে তাঁহার অসুখের কথা, কি অন্য কোন কথা আমার কাছে গোপন করেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। সে কথা

ভাবিলে আমার বড় কষ্ট হয়।" বলিতে বলিতে নলিনের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। শেফালিকা বলিল, "এখন তিনি সারিলেই ভাল। তিনি নিশ্চয়ই সারিয়া আসিবেন।"

৫

নিয়মিত সময়ে বিপিন গৃহে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু এই ভ্রমণে তাহার দেহের বা মনের কোনও প্রকার উন্নতিই পরিলক্ষিত হইল না।

গৃহে আসিয়া বিপিনের যেন আরও কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত। ইতিপূর্ব্বে অভ্যাসহেতু দৈনন্দিন জীবনে তত অভাব অনুভূত হইত না—এবার সে অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাই অভাব তীব্র বলিয়া বোধ হইত। দেশভ্রমণে বিপিনের বরং এই অপকারই হইয়াছিল—উপকার কিছুমাত্র হয় নাই। যে যাতনা জুড়াইবার নহে, তাহা কি দেশভ্রমণে জুড়ায়? কল্পনা যে ক্ষুদ্র যাতনাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, সে যাতনা অভিনব দৃশ্যের মধ্যে গেলে দূর হইতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাণের প্রকৃত যাতনা কিছুতেই জুড়ায় না—হৃদয়ের ক্ষত কিছুতেই মিলায় না।

গৃহে নিতান্তই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয় দেখিয়া, বিপিন একদিন নলিনকে বলিল, "নলিন, তোর আফিসের কাজ আমাকে শিখাইতে পারিস্?" নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" বিপিন উত্তর দিল, "কখন কি আবশ্যক হয় কে জানে, —শিখিয়া রাখায় হানি কি?" নলিন বলিল, "তাহা কিছুতেই হইবে না; যত দিন আমি উপার্জ্জন করিতে পারিব, তত দিন কিছুতেই তোমাকে চাকরী করিতে দিব না।" বিপিন হাসিয়া বলিল, "পাগল, আমি কি এখনই চাকরী করিতে যাইতেছি? বাড়ীতে কোন কাজ নাই,—বড় একা একা বোধ হয়, তাই তোর আফিসে যাইয়া বসিব।"

নলিন দাদাকে আফিসে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। বিপিন আফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীরই মত প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আফিসে যাইত; আর নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিত না। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ উপস্থিত হইল। আফিসের কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ যে আফিসের আয় ব্যয়ের হিসাবাদি দেখিয়া যাইবে, ইহা কর্ত্তাদের অভিপ্রেত ছিল না। কাজেই ভ্রাতাকে খাতাপত্রে হাত দিতে দেওয়ার জন্য নলিন তিরস্কৃত হইল। সে কথা শুনিয়া বিপিন পরদিবস হইতে আফিসে যাওয়া রহিত করিল।

এ কয় দিন আফিসে যাইবার অভ্যাসের পর বিপিন দেখিল—গৃহের বিজনতা

নিতান্তই অসহনীয়। বিপিন নলিনকে কিছু না বলিয়া একটা চাকরী যোগাড় করিল; কিন্তু সে সন্ধান পাইয়া শেফালিকা ও নলিন এত দুঃখ করিল ও এমন প্রতিবাদ করিল যে, স্নেহশীল বিপিনের আর চাকরী করা হইল না। নলিন বলিল, "দাদা, তুমি আমার গৃহের দেবদূত—যে গৃহ-দেবতাকে পরিশ্রম করায়, তাহার মঙ্গল নাই। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তুমি কিছুতেই চাকরী করিতে পাইবে না।" শেফালিকা বলিল, "কি দুঃখে তুমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে যাইবে? তোমার কিসের অভাব? তোমরা একজনও বাড়ী থাকিবে না,—আর আমি কি একা এই বাড়ীতে থাকিতে পারি? তুমি কিছুতেই চাকরী করিতে পাইবে না।"

নলিনের ও শেফালিকার স্নেহ দেখিয়া বিপিনের চক্ষে জল আসিল। বিপিনের আর চাকরী করা হইল না।

বিপিন উপন্যাস পাঠ করিয়া হৃদয়ের যাতনা ভুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গম্ভীরপ্রকৃতি বেদনাক্লিষ্ট বিপিনের উপন্যাস ভালই লাগিত না। কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না দেখিয়া বিপিন শেষে দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মনের অবস্থা ভাল না থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না। অল্পদিনের মধ্যেই বিপিন আবার অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিল। নিতান্ত মর্ম্মব্যথায় প্রপীড়িত হইলে বিপিন কেবল একএকবার সেই ভক্তিভরা গানটি স্মরণ করিত,—

"থাক নাথ, থাক মোর সাথে সাথে অনুক্ষণ।
আসিছে সন্ধ্যার ছায়া বিস্তারি করাল কায়া,
ছিল যারা, তেয়াগিয়া করিয়াছে পলায়ন;
সুখ-আশা রাশি রাশি সকলি যেতেছে ভাসি'
অনাথের নাথ, তুমি কাছে থেক অনুক্ষণ।"

এমনই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

৬

ইহার পর বিপিনের আর বড় অধিক দিন কর্ম্মের অভাব রহিল না। শেফালিকার যখন একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হইল, তখন বিপিনের নিকট যেন এক নূতন জগতের দ্বার মুক্ত হইল। বিপিনের হৃদয়ের ঘনান্ধকারের মধ্যে সেই শিশু যেন ভাস্বর শুকতারার মত ফুটিয়া উঠিল। শিশু বুঝি আপনার সঙ্গে স্বর্গের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লইয়া আসে, তাই এই চিরদুঃখময় জগতেও সে সকলের হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়া থাকে। শিশুর ক্ষুদ্র দুইখানি বাহুর বন্ধনের

নিকট জগতের আর সকল বন্ধন হীনবল বলিয়া বোধ হয় ;—শিশুর অধরে অমল হাসির সম্মুখে জগতের কত কর্ত্তব্য ভাসিয়া যায় ;—হৃদয়ের কঠোর বৈরাগ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নলিনের পুত্র বিপিনের হৃদয়ে নূতন আনন্দ দান করিল। সেই শিশুকে লইয়া বিপিনের সময় কাটিত। শিশুও বিপিনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, বিপিনও শিশুকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। প্রৌঢ় জ্যেষ্ঠতাত ও শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে মনের মিলের যে কি কারণ ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। তবে এক জনকে ছাড়িয়া থাকিতে অপরের কষ্ট হইত। কার্য্যবশতঃ কোথাও গেলে গৃহে ফিরিয়া যতক্ষণ শিশুকে দেখিতে না পাইত, ততক্ষণ বিপিন সুস্থির হইতে পারিত না ; শিশুও কিছুক্ষণ জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিতে না পাইলে কাঁদিয়া বাড়ীর সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিত।

দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, ভালবাসা বিরক্তি লইয়া, দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর চলিয়া গেল। নলিনের পুত্র সুকুমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জেঠামহাশয়ের সমগ্র হৃদয়খানি দখল করিয়া লইল।

৭

পৌষের অপরাহ্ণ। ধূমাচ্ছন্ন পশ্চিম গগনে স্বভাবতঃ অনুজ্জ্বল-কর শীতের তপন হেলিয়া পড়িয়াছে—তাহার ম্লানকরপ্রভায় গৃহ-চূড়া সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার কক্ষে বাতায়নসম্মুখে বসিয়া বিপিন পথের দিকে চাহিয়া আছে ; আর তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া নলিনের দুই বৎসরবয়স্ক পুত্র সুকুমার অর্দ্ধস্ফুট কথায় কত-কি বলিয়া যাইতেছে। বিপিনের গৃহের সম্মুখে একটা ছাত্রাবাস হইতে কৃষ্ণ, ধূসর, লোহিতাভকৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণের গরম কোট পরিধান করিয়া একদল ছাত্র বেড়াইতে বাহির হইল। তাহাদিগের যুবকজনসুলভ উচ্চহাস্যে সে গলি শব্দমুখর হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে এক জন পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিতে না করিতে পাঁচ সাত জনে সেটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করিল,—ফলে সেটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন সকলেই একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—এ একটা ভারি মজা!

বিপিন যুবকদিগের কার্য্য লক্ষ্য করিতেছে, এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নলিন দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিকৃতকণ্ঠে নলিন ডাকিল, "দাদা!"

বিপিন চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "কি ভাই?"

নলিন বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আফিসের হিসাবপত্র আমার হাতে থাকে। আমি মধ্যে মধ্যে চেক জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইতাম। সেই টাকা আমি 'স্পেকুলেশনে' ব্যয় করিতাম। কোনটায় জিতিয়াছি, কোনটায় হারিয়াছি। মোটের উপর হিসাব মত টাকা আবার ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিতাম। এবার আমি যাহাতে টাকা দিয়াছি, তাহাতেই হারিয়াছি। জিতিবার আশায় ক্রমাগতই টাকা বাহির করিয়াছি ; কিন্তু একবারও জিতিতে পারি নাই।"

নলিন একটু চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আফিসের কর্ত্তারা এবার সব জানিতে পারিয়াছে। এখনই আমাকে ধরিতে আসিবে।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিপিন যেন বজ্রাহতের মত হইয়া রহিল ; তাহার পর বলিল, "কত টাকা লইয়াছ?"

নলিন উত্তর করিল, "ত্রিশ হাজার।"

বিপিন বলিল, "এত টাকা তোমারও নাই, আমারও নাই।—এখন উপায়?"

নলিনের দৃষ্টি তাহার শিশুর উপর পড়িল। বেদনা-ব্যথিত স্বরে সে বলিল, "তবে কি আমার উদ্ধারের কোনও উপায় নাই?"

সংসার-সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহার ভাগ্যে এখনও সুধা ভিন্ন গরল উঠে নাই, সে কি সহজে সংসার ত্যাগ করিতে চাহে?

সহসা বিপিনের মনে হইল, সে নলিনকে লিখিতে শিখাইয়াছিল—উভয়ের হস্তাক্ষর একরূপ। সে একটা কি স্থির করিল। তাহার পর সে নলিনকে বলিল, "আমি তোমাকে উদ্ধার করিব ; কিন্তু শপথ কর—আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে?"

অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে বাত্যাবিতাড়িত বারিধিবক্ষে ভগ্নপোত নাবিক সহসা তরঙ্গে তীরে উপনীত হইলে যেমন আনন্দিত হয়, নলিন তেমনই আনন্দিত হইল। সে বলিল, "তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

বিপিন বলিল, "তবে আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর,—আমি যাহা করিব, তুমি তাহার প্রতিবাদ করিবে না। বল,—আমি যাহা বলিব, তুমি তাহাই স্বীকার করিবে।"

নলিন স্বীকৃত হইল।

সেই সময় সোপানশ্রেণীতে দ্রুতপদশব্দ শ্রুত হইল। নলিন বলিল, "ওই তাহারা আসিতেছে। আমি কি গৃহের পশ্চাতের দ্বারপথে পলাইব?"

বিপিন বলিল, "তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাক। যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

পরমুহূর্ত্তেই পুলিশের ইন্‌সপেক্টার ও আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৮

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী নলিনকে দেখাইয়া পুলিশের ইন্‌সপেক্টারকে বলিলেন, "এই ব্যক্তিই অপরাধী।"

ইন্‌সপেক্টার নলিনকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। বিপিন বলিল, "কি অপরাধে উহাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন?"

আফিসের কর্ম্মচারী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ও আমাদের আফিস হইতে ত্রিশ হাজার টাকা চুরী করিয়াছে।"

স্থিরভাবে বিপিন বলিল, "চুরী ও করে নাই—আমি করিয়াছি।"

শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

বিপিন বলিতে লাগিল, "আপনি জানেন, আমি দিনকতক আপনার আফিসে যাইতাম। সে জন্য আপনি নলিনকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি আফিসের সব দেখিয়া আসি। আমি চেক জাল করিয়া চুরী করিয়াছি। নলিন নির্দ্দোষ।"

আফিসের কর্ম্মচারী বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম—তোমার ভ্রাতা এতদিন কাজ করিয়া এখন সহসা এ দুষ্কর্ম্ম করিল কেন? তুমি নিজমুখে দোষ স্বীকার করিতেছ? জান, আমি অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট?"

স্থির স্বরে বিপিন বলিল, "আমি দোষী।"

ইনস্পেক্টার বিপিনকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিপিন তাঁহার নিকট হইতে দুই মিনিট সময় লইয়া একখানা পত্র লিখিল—লিখিয়া সে পত্রখানা নলিনকে দিয়া বলিল, "আমি চলিয়া গেলে এই পত্রখানা পড়িয়া দেখিও। পড়িলে সব বুঝিতে পারিবে।"

তাহার পর আফিসের কর্ম্মচারী ও ইনস্পেক্টারের সঙ্গে বিপিন থানায় চলিয়া গেল। যেখানে সুকুমার দাঁড়াইয়াছিল, সে আর সে দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

* * * * *

বিপিন যাইতে না যাইতে নলিন তাহার পত্রখানি খুলিয়া পড়িল,—

"ভাই নলিন,

"যে দিন তুমি আমার নিকট শেফালিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে—সে দিন আমি তোমাকে একটা আবশ্যক কথা বলিতে যাইতেছিলাম। আমি শেফালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তোমাকে জানাইব, ভাবিতেছিলাম। তুমি প্রস্তাব করিলে আমি ভাবিলাম—মা মরিবার সময় তোমাকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন, আমি তোমার সুখের অন্তরায় হইব না।

"সে দিন মার কথা স্মরণ করিয়া তোমার বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলাম। আর আজ শেফালিকার কথা ভাবিয়া তোমাকে বাঁচাইলাম। আমি জানি, তুমি দণ্ড পাইলে শেফালিকার সকল সুখ নষ্ট হইবে।

"এ কথা শেফালিকাকে বলিও না। শুনিলে সে কষ্ট পাইবে। তদ্ভিন্ন এ কথা শুনিলে যদি তোমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধাভক্তি দূর হইয়া যায়, তবে তোমাদের উভয়েরই জীবন নরকযন্ত্রণাময় হইয়া উঠিবে। তাই আমার শেষ অনুরোধ,—শেফালিকা যেন এ কথা জানিতে না পায়। সে আমাকেই দোষী বলিয়া জানুক।

"এক জনকে ছাড়িয়া যাইতে আমার কষ্ট হইতেছে—সে সুকুমার। আমার হইয়া তাহাকে একটি স্নেহ-চুম্বন দিও। শিশু সহজেই আমাকে ভুলিয়া যাইবে।

"তোমার চিরশুভার্থী ভ্রাতা বিপিন।"

পত্র পাঠ করিয়া নলিন স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সহসা শিশুর ক্রন্দনে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সুকুমার তখন 'জেঠার কাছে যাবো' বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"গঙ্গা, গঙ্গা, কতখানি জল?"

বাল্যকালে "গঙ্গাফড়িঙ" ধরিয়া কতবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"গঙ্গা, গঙ্গা, কতখানি জল?" পতঙ্গ একটি পদ উত্তোলন করিয়া জলের গভীরতা জানাইয়াছে। সে সময় তাহাতেই কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি; গঙ্গাফড়িঙ মারিতে নাই, উহা দেবতা বলিয়া ঠাকুরমার নিকট যাহা শুনিতাম, তাহার যাথার্থ্য সেই পতঙ্গ-পদ-সঞ্চালনে উপলব্ধি করিয়াছি। বলা বাহুল্য, বয়োবৃদ্ধির সহিত এ বিশ্বাস তিরোহিত হইল; ক্রমে বাল্যের গঙ্গাফড়িঙকেও ভুলিলাম।

বহু দিন পরে, বাল্যের সেই পতঙ্গকে আবার মনে পড়িল; তখন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুরমার কথা কি সত্য? গঙ্গাফড়িঙ কি দেবতা?" এই প্রকার সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল। উহা যদি দেবতা কিম্বা দেবতার নিকটবর্ত্তী কিছু না হইবে, তাহা হইলে, কেবল আমাদের দেশে নয়,

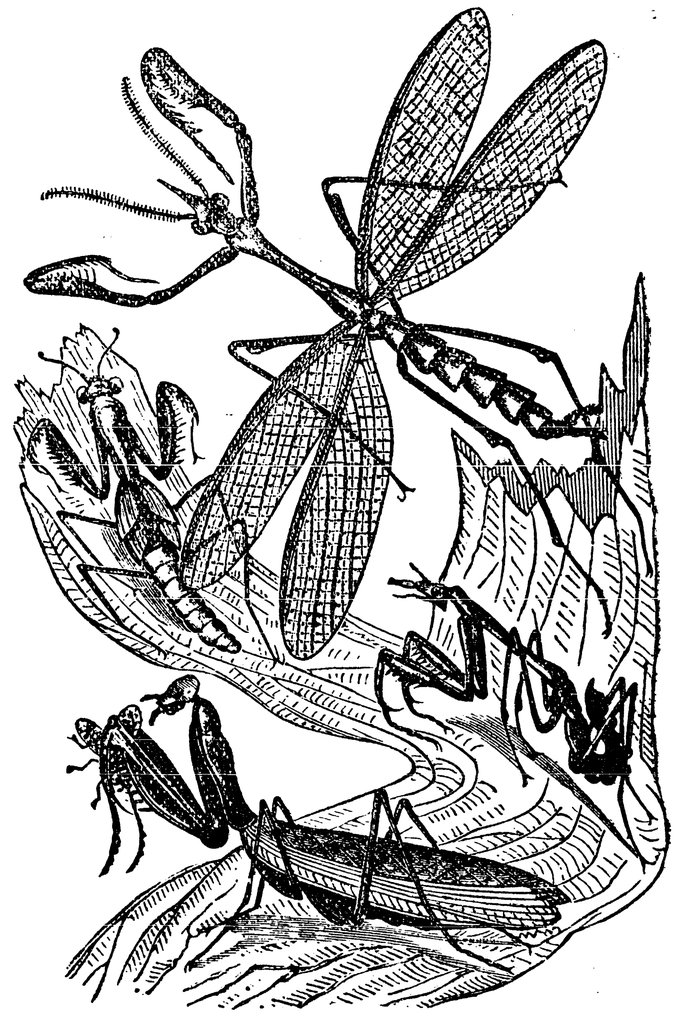

অনেক দেশে উহাকে সেণ্ট, প্রচারক, ঋষি ইত্যাদি শ্রদ্ধাময় নামে অভিহিত করিবে কেন? স্পারমান কহিয়াছেন যে, এই জাতীয় এক পতঙ্গকে হটেণ্টট্‌গণ পূজা করিয়া থাকে। পরিব্রাজক কেলড (Caillaud) বলেন যে, আফ্রিকার কোন

কোন স্থানেও গঙ্গাফড়িং পূজা পাইয়া থাকে। য়ুরোপের অনেক ভাষায় ইহাকে ম্যাণ্টিস্ mantis, এবং এই জাতীয় পতঙ্গকুলকে Mantidœ কহে। এই কথা যে গ্রীক ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ ভবিষ্যৎবক্তা। হটেণ্টট্‌গণের ধারণা যে, এই পতঙ্গ যাঁহার গাত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপবেশন করিবে, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত। পল্লীবাসী ফরাসীগণের বিশ্বাস এই যে, এই পতঙ্গ পথিকগণকে পথপ্রদর্শন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর জীবতত্ত্ববিৎ মফে (Mouffet) লিখিয়া গিয়াছেন, "পথহারা শিশু ইহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা একটি পদ প্রসারণ করিয়া পথ দেখাইয়া দেয়, এবং তাহাতে কখন ভুল করে না।" কেন এক পতঙ্গের প্রতি ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও এসিয়া—সমগ্র ভূখণ্ডে এত শ্রদ্ধার ভাব উদিত হইল? তবে কি ঠাকুরমার কথা সত্য? মনের সন্দেহ অধিক দিবস রহিল না। গঙ্গাফড়িঙ! অনেক দিন ধরিয়া তুমি সারা সংসারকে প্রবঞ্চনা করিয়া মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উপভোগ করিয়াছ; এখন আর নয়; বিড়াল-তপস্বী, তুমি এত দিনে ধরা পড়িয়াছ। যাহাদিগকে মহাপুরুষ ইত্যাদি জ্ঞানে সমগ্র জগৎ এখন মান্য করিতেছে, কে জানে, তাহারাও আবার কালে তোমার মত ধরা পড়িবে না?

গঙ্গাফড়িঙকে দেখিলে মনে হয়, এমন সৎ ও সাধু পতঙ্গ বুঝি আর নাই—ফলপত্রবিদ্ধকারী, তরুত্বগ্‌ভেদী, অশেষ অনিষ্টের আস্পদ, পতঙ্গরূপী দৈতকুলে বুঝি বা প্রহ্লাদ! ইহা আপনার সম্মুখস্থ পা দুইখানি উত্তোলন করিয়া এমনই ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকে যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী একাগ্রচিত্তে পরম পুরুষের ধ্যান করিতেছে। কিন্তু খাদ্য সমীপবর্ত্তী হইলে হয়। সন্ন্যাসী নিমেষে তাহার সংহার সাধন করিয়া আপন উদরপূর্ত্তি করিবে। পেটের জন্য এতই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করিতে হয়! গঙ্গাফড়িঙের সম্মুখস্থ পদদ্বয়ে কেমন করাতের দাঁতের মত দাঁত; ইহার দ্বারা উহারা এক আঘাতে বিপক্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। যাঁহারা ইহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহাদিগের ন্যায় কলহপ্রিয়, নৃশংস, হত্যাকারী পতঙ্গ বিরল। আপনার জাতিকে পর্য্যন্ত ইহারা ভক্ষণ করে। চীনদেশে ইহাদিগের বিদ্যা বহুকাল হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। চীনবালকগণ বংশ-পিঞ্জরে দুই গঙ্গাফড়িঙ রাখিয়া, তাহাদিগের পরস্পরের যুদ্ধ দর্শন করিয়া থাকে; যে পর্য্যন্ত একটি যোদ্ধা না মরে, সে পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের অবসান হয় না। বিজেতার মৃতদেহ আহার করিয়া জেতা আপনার সমরশ্রম

দূর করে। অতি শৈশব কাল হইতে ইহারা মারামারি কাটাকাটি করিতে থাকে। অণ্ড হইতে বাহির হইবার সময় ইহাদের কেবল পক্ষ থাকে না; নতুবা শিশুগণের অবয়ব বয়ঃপ্রাপ্ত পতঙ্গের ন্যায়। ডিম্ব হইতে বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই পক্ষহীন পতঙ্গশিশু মারামারি আরম্ভ করে। বালক

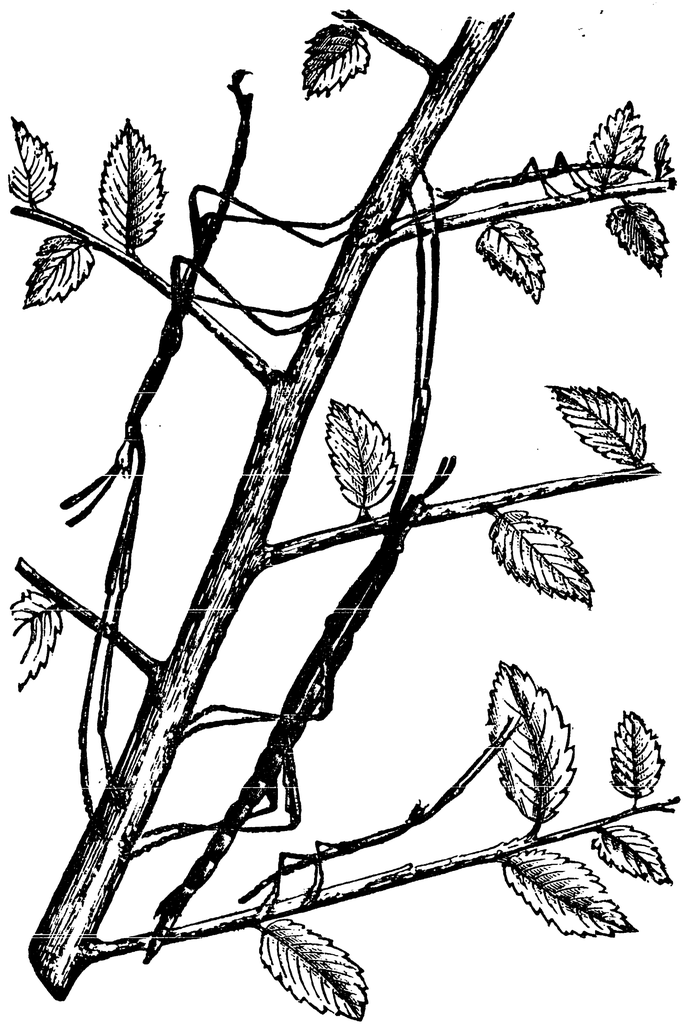

অপেক্ষা বালিকারাই অধিকতর সমরনিপুণা ও বলবতী বলিয়া, এই বাল্য-যুদ্ধে বহু পতঙ্গকুমার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এই জন্য ইহাদিগের স্ত্রীজাতির সংখ্যা অধিক ও স্ত্রীগণ বহু স্বামী গ্রহণ করিয়া স্ত্রীধর্ম্ম রক্ষা করে। গ্রীষ্মকালের

শেষভাগে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। তরুশাখার গাত্রে এই সকল অণ্ড এক বৎসর কাল থাকে; তৎপরে তাহা ফুটিয়া শিশু বাহির হয়।

এই জাতীয় কোন কোন পতঙ্গের এমনই আকৃতি ও বর্ণ যে, তাহাদিগকে পতঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কাহারও বর্ণ নবকিসলয়সম স্বর্ণাভ হরিৎ; কাহারও ঘোর ঘনশ্যাম; কাহারও বর্ণ শুষ্ক শীর্ণ পত্রের ন্যায় বাদামী ও দেহ সূক্ষ্ম-শিরাবিশিষ্ট। বৃক্ষপত্রের রঙে রঙ মিলাইয়া তাহারা অন্য প্রাণীকে ফাঁকি দেয়; অতর্কিত শিকার সমীপে আসিলে তাহাদিগকে বধ করে; এবং আপনাদিগকেও প্রবলতর প্রাণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া, কৌশলবলে সংসারের ঘোর জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়। কাহারও কাহারও পক্ষ হয় না; তাহাদিগকে শুষ্ক পত্রবৃন্ত বা তরুশাখা বলিয়া ভ্রম হয়। এরিমিয়াফিলি (Eremiaphilœ) নামক এই জাতীয় এক পতঙ্গ আফ্রিকা ও আরবের মরুভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা বালুকাবর্ণ; সুতরাং বালুকার উপর পড়িয়া থাকিলে, বিশেষ নিবিষ্ট হইয়া না দেখিলে,চিনিতে পারা যায় না। এই জাতীয় অনেক পতঙ্গ রূপ-বিচিত্রতার নিমিত্ত 'ভ্রাম্যমাণ পত্র', 'জীবন্ত যষ্টি', 'দানবের অশ্ব' ইত্যাদি নানা অদ্ভুত নামে অভিহিত হয়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

তরল জলজান-বাষ্প।

প্রচুর চাপ দিলে ও সঙ্গে সঙ্গে শীতল করিলে, বাষ্পীয় পদার্থমাত্রই তরলাকার প্রাপ্ত হয়; আবার তরল বাষ্পে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকিলে, শেষে তাহাও কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। পরিজ্ঞাত বাষ্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্ববর্ণিত প্রথায় তরলীকৃত, এবং অনেকগুলিকে কঠিন আকারে পরিণত করা হইয়াছে;—কারবনিক্ এসিড্ বাষ্প, এবং অল্প দিন হইল, বায়ুও, কঠিন আবস্থায় নীত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ হইতে জলজান (Hydrogen) বাষ্প তরলীভূত করিবার জন্য বহুদিবস হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট শৈত্য ও চাপ প্রদানের কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায়, কাহারও চেষ্টা এত দিন ফলবতী হয় নাই। এই প্রসঙ্গে জলজান লইয়া পরীক্ষাকালে, চাপবৃদ্ধির অনুপাতে স্বচ্ছ-বাষ্প-টিকে ক্রমে অস্বচ্ছ ও কুজ্ঝটিকাময় হইতে দেখিয়া, যথেষ্ট চাপ প্রদানের ব্যবস্থা করিলে ইহা যে নিশ্চয়ই তরলীভূত হইতে পারে, এ বিষয়ে আর কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কয়েক মাস হইল, অধ্যাপক ডিয়ার ভুবনবিখ্যাত রসায়নবিদ্ লর্ড র‍্যালে প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সমক্ষে জলজান বাষ্প তরলীভূত করিয়াছেন। ডিয়ার সাহেবের পরীক্ষার আমূল বৃত্তান্ত আজও প্রচারিত হয় নাই;—তবে, এই ব্যাপারের নানা পরীক্ষায় বিখ্যাত রসায়নবিদ্‌গণ এ পর্য্যন্ত যে প্রকার ভগ্নমনোরথ হইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে, উপস্থিত আবিষ্কারটি যে ডিয়ার সাহেবের এই গবেষণা ও নানাকৌশলপূর্ণ পরীক্ষার ফল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

সাধারণ বায়ুতে উন্মুক্ত রাখিয়া কঠিন তাপ সংযোগ করিলে, পদার্থমাত্রই এক একটি নির্দ্দিষ্টপরিমাণ তাপে তরলীভূত হইতে আরম্ভ করে; আবার এই প্রকারে কোনও তরল পদার্থ বাষ্পীভূত করিতে হইলে, তাহাতেও একটি নির্দ্দিষ্টপরিমাণ তাপপ্রদানের প্রয়োজন হয়। বিশুদ্ধ জল, ১০০ অংশ পরিমিত উত্তপ্ত হইলেই বাষ্পীভূত হইতে থাকে; আবার যখন ইহার শীতলতা তাপমান যন্ত্রের শূন্য-পরিমিত হয়, তখন কঠিন হইয়া বরফে পরিণত হইয়া থাকে। জলের ন্যায় পদার্থমাত্রেরই উক্তপ্রকার এক একটি নির্দ্দিষ্ট তাপপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, জলজান বাষ্পে শূন্যের নিম্নস্থ ২৪০ অংশ-(—২৪০°)-পরিমিত তাপ থাকিলেও, তাহা বাষ্পাকারে থাকিয়া যায়;—সুতরাং উক্ত বাষ্প কত শীতল করিলে তরলীভূত হইবে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ অনুমান করুন। তরল জলজানে একটি বায়ুপূর্ণ কাচপাত্র আংশিক নিমজ্জিত রাখিলে, পাত্রস্থ বায়ু তৎক্ষণাৎ কঠিন হইয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা তরল জলজানের শৈত্য-পরিমাণ আরও হৃদয়ঙ্গম হয়। ডিয়ারের আবিষ্কারের পূর্ব্বে, তরল জলজানের গুণাদি সম্বন্ধে রাসায়নিকগণ অনেক কথা কেবল অনুমানবলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন;—পূর্ব্ব-অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষাসিদ্ধ ফলের অনুযায়ী হয় কি না, এখন পণ্ডিতগণ তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। তরলাবস্থায় জলজানের গুরুত্ব জলের গুরুত্বের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ।

জলজান বাষ্প আকাশে মুক্তাবস্থায় প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, এবং আজকাল যে উপায়ে উক্ত বাষ্প প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও অতীব ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তরল বায়ু যে প্রকার নানা কার্য্যে ব্যবহার করিবার উদ্যোগ চলিতেছে, ব্যয়বাহুল্যবশতঃ সম্ভবতঃ জলজান দ্বারা সে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহার অসাধারণ শীতলতার সাহায্যে রসায়ন শাস্ত্রের এক মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, হেলিয়ম্ (Helium) নামক একটি নবাবিষ্কৃত বাষ্পকে এতদিন কোনও উপায়েই তরলীভূত করিতে পারেন নাই;—শুনা যাইতেছে, তরল জলজানের সাহায্যে সম্প্রতি হেলিয়ম্ বাষ্প তরলীভূত হইয়াছে, এবং ইহার অনেক অজ্ঞাত ধর্ম্মও আবিষ্কৃত হইতেছে।

চিত্রবহ যন্ত্র।

আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিস প্রদর্শনীতে যে সকল নূতন যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে, ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক-সমাজে তাহাদের কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। হার্ জেপনিক্ নামক একজন যন্ত্রশিল্পী, টেলিলেক্ট্রোস্কোপ (Telelectroscope) নামক এক আশ্চর্য্য যন্ত্রের প্রদর্শন করিবেন। এই যন্ত্রের দ্বারা যে কোনও স্থানের দৃশ্য অবিকল যে কোনও স্থানে প্রেরণ করিতে পারা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রেরিত ছবির বর্ণ ও আকারাদি ঠিক্ আদর্শ চিত্রের অনুরূপ হয়।

যন্ত্রনির্ম্মাতা বলেন,—এই যন্ত্র দ্বারা সচল পদার্থের ছবি সহস্রক্রোশদূরব্যবহিত স্থানে প্রেরণ করিলেও, সেই দূরবর্ত্তী স্থানেও, পদার্থটির প্রকৃতগতিবিশিষ্ট ও ভঙ্গীযুক্ত প্রতিকৃতি তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইবে। এই আবিষ্কারবার্ত্তা সত্য হইলে, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের বহুকালের বাসনা চরিতার্থ হইবে।

ইতিমধ্যে যন্ত্রটির গঠনপদ্ধতির এক স্থূল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ম্মাতা বলেন,—যে ছবিটি দূরস্থানে পাঠাইতে হইবে, তাহা প্রথমতঃ দুইখানি দর্পণের সাহায্যে কতকগুলি বিন্দুতে বিভক্ত করিতে হয়; পরে ছবির অংশীভূত পূর্ব্বোক্ত বিন্দু সকল আর একখানি দর্পণ দ্বারা পুনঃপ্রতিফলিত করিয়া, এবং পরে সেই প্রতিফলিত আলোক বিন্দু-

বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিণত করিয়া, চিত্রবহন সম্পন্ন হয়। সুন্দর উপায়ে ও সুকৌশলে এই বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা আছে। আলোকপাত হইবামাত্র সেলিনিয়ম্ নামক পদার্থে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই প্রবাহের পরিমাণ আলোকমাত্রেই স্থির থাকে না। বর্ণচ্ছত্রস্থ লোহিতাদি আলোক যথাক্রমে সেলিনিয়মে পতিত হইলে, প্রত্যেক জাতীয় বর্ণে এক একটি নির্দ্দিষ্টপরিমাণ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। সেলিনিয়ম কোষে (Cell) টেলিগ্রাফের ন্যায় ধাতব তার আবদ্ধ থাকে; নানাবর্ণের আলোকবিন্দু উল্লিখিত দর্পণ হইতে প্রতিফলিত হইয়া সেলিনিয়মে পড়িলেই বর্ণানুসারে অল্পাধিক বৈদ্যুতিকপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বহুদূরবর্ত্তী স্থানে নীত হইয়া থাকে। এই প্রকারের বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় উক্ত প্রবাহের উৎপাদক আদিম বর্ণগুলির পুনর্বিকাশ করিবার সুব্যবস্থা আছে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, লৌহদণ্ডের উপরিভাগে তার জড়াইয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করিলে, লৌহদণ্ডটি চৌম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং প্রবাহের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিলে, শক্তির পরিমাণও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রবাহ রুদ্ধ করিলে, লৌহদণ্ডের আর চৌম্বক শক্তি থাকে না। চিত্রবহ যন্ত্রের তারের প্রান্তদেশ ঐরূপ এক লৌহদণ্ডে মণ্ডিত থাকে, এবং ইহার সম্মুখে একখণ্ড ত্রিকোণ কাচ ও তাহার পশ্চাতে একটি অত্যুজ্জ্বল আলোক সজ্জিত রাখা হয়। প্রেরিত বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ অনুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে চুম্বকশক্তি প্রাপ্ত হইলে, এই লৌহখণ্ড সম্মুখস্থ লম্বমান কাচখণ্ডকে চুম্বকশক্তির অনুপাতে আন্দোলিত করে। এই আন্দোলনের পরিমাণ অনুসারে পশ্চাৎবর্ত্তী আলোক বিশ্লিষ্ট হইলে বিশেষ বিশেষ আলোকের উৎপত্তি হয়। আন্দোলনের মাত্রা প্রবাহের মাত্রার উপর নির্ভর করে; আবার প্রবাহের পরিমাণ তারের অপরপ্রান্তস্থ দৃশ্য বা চিত্রের বর্ণানুসারে নিয়োজিত হয়। সুতরাং যে সকল বর্ণে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল, এই প্রক্রিয়া দ্বারা আবার সেই সেই বর্ণের বিকাশ হয়। এই প্রকারে আদর্শ পদার্থের অংশভূত বিন্দুর অনুরূপ বিবিধ বর্ণের বিন্দু উৎপন্ন হইলে অপর দুইখানি দর্পণের সাহায্যে ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থটির নিখুঁৎ ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

জীবনচরিত।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবিপ্লবকালে যে সকল মনস্বিনী ভারতমহিলা আপনাদিগের দূরদর্শিতা, ধৈর্য্য, রাজকার্য্যপটুতা ও রাজনীতিক চাতুর্য্যগুণে অসংখ্য শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা ও প্রজাগণের সংরক্ষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যবর্দ্ধন করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ধারাধিপতি আনন্দরাও পওয়ারের (প্রমারের) বিধবা পত্নী বীরাঙ্গনা মীনা বাঈ তাঁহাদিগের অন্যতম। "মাসিক মনোরঞ্জন" নামক মহারাষ্ট্রীয় মাসিকপত্রের জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় এই রমণীরত্নের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার মর্ম্ম পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি।

মীনা বাঈ।

মুসলমান আক্রমণের প্রবল তরঙ্গমালা রাজপুতভূমির উপর পুনঃ পুনঃ আপতিত হইয়া, তত্রত্য হিন্দুধর্ম্মকে ও তদবলম্বিগণকে জর্জ্জরিত করিলে, মেওয়াড় ও মারওয়াড় প্রভৃতি

বংশপরিচয়।

প্রদেশের বহুসংখ্যক রাজপুত পরিবার স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির শিখরশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের 'পওয়ার'-(প্রমার)-উপাধিধারী ক্ষত্রিয়পরিবার পূর্ব্বকথিত কারণে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়কুলাবতংস ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী ভোঁসলের চেষ্টায় মহারাষ্ট্রে স্বরাজ্য স্থাপিত হইলে, ভোঁসলে বংশের সহিত পওয়ার, ঘোরপড়ে, দাভাড়ে ও কদম প্রভৃতি মারাঠা ক্ষত্রিয়পরিবারসমূহ ক্রমে ক্রমে দেশ-বিজয় ও করসংগ্রহাদি কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শিবাজীর পৌত্র মহারাজ শাহুর রাজত্বকালে, মালব ও গুজরাট প্রদেশে মহারাষ্ট্রগণের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী প্রভৃতি সত্ব স্থাপন পূর্ব্বক করাদান করিবার ভার, 'উদাজী পওয়ার' (উদয়জী প্রমার) নামক এক সম্ভ্রান্ত মরাঠা ক্ষত্রিয় সর্দ্দারের প্রতি অর্পিত ও তাঁহাকে ঐ অঞ্চলস্থিত 'ধার' (বিদ্যোৎসাহী কবিবৎসল ভোজরাজের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ধারা নগরী) নামক প্রদেশের জাইগিরী প্রদত্ত হইয়াছিল। মীনা বাঈ উদাজী পওয়ার কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজবংশের কুলবধূ।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর অবসানকালে উদাজীর বংশধর কোণ্ডাজী পওয়ার ধার নগরীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক মালব প্রদেশের মারাঠাগণের সত্বরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র অল্প-

আনন্দ রাও।

বয়স্ক আনন্দ রাওয়ের সহিত গোবিন্দ রাও গায়কওয়াড়ের (গুই-কুমারের) শ্যালককন্যা মীনা বাঈয়ের পরিণয় হয়। শৈশবেই আনন্দ রাওয়ের পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, তিনি মাতামহালয়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি যখন স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন দেওয়ান রঙ্গরাও উয়েকরের হস্ত হইতে পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার পূর্ব্বক সমস্ত রাজ্যসূত্র নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন শিন্ধে (শিন্ধিয়া), হোলকর ও অপর ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের উপর্য্যুপরি আক্রমণে ধার প্রদেশ দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। রাজ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা ও অবস্থা দর্শনে অতিমাত্র চিন্তাক্রান্ত হইয়া আনন্দ রাও অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

ধার রাজ্য যখন এক দিকে এইরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণে ও লুণ্ঠনাদিতে জর্জ্জরিত ও বিপর্য্যস্ত ও অপর দিকে দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের অবাধ্যতা ও অব্যবস্থায়

বিধবার বিপত্তি।

অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আনন্দ রাও পওয়ার তৎপ্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া দুশ্চিন্তানলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তখন মীনার বয়স সপ্তদশ বৎসর মাত্র। আনন্দ রাও সত্য সত্যই মীনাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছিলেন। ধার রাজ্যে মীনার হিতকারী কেহ ছিল না। রাজ্য ও রাজপুরী সেই শোকতপ্তা অনাথা বালবিধবার পক্ষে শত্রুময় হইয়া উঠিয়াছিল। মুরারি রাও নামক আনন্দ রাওয়ের এক নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় ধার রাজ্যের উত্তরাধিকারলাভের জন্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া, মীনার জীবনও সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বামীর পরলোকগমনকালে মীনা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কাজেই পলায়ন ভিন্ন সে সময়ে অবলার আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না। মীনা বাঈ এক জন বিশ্বাসী রাজনিষ্ঠ দুর্গাধ্যক্ষের হস্তে ধার রাজ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া, স্বয়ং নির্ব্বিঘ্নে প্রসূত হইবার জন্য, গুজরাথের অন্তর্গত 'মণ্ডু' গ্রামে গমন করিলেন। তথায় অতি অল্প দিবসের মধ্যে

পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া তিনি পূর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইলেন। ক্রমে শিশু পুত্র রামচন্দ্রকে ধারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আশা ও বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল। এমন সময় মীনা তাঁহার বিশ্বস্ত দুর্গাধ্যক্ষের নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, 'আপনি ধার নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দুর্গাশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান ও স্বপক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করুন।' এই পত্র পাইয়া মীনার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া দশ বার জন অনুচর সহ ধার নগরোপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। হায় মীনা! কোথায় দুর্গাধ্যক্ষের সাহায্যে পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজমাতার ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে—ভাবিয়াছিলে, না, বিধিবিড়ম্বনায় বিশ্বাসভ্রষ্ট কর্ম্মচারীর কপটতাজালে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে চলিলে!

মীনার রাজ্য-পরিত্যাগের পর মুরার (মুরারি) রাও দিন দিন অধিকতর প্রবল হইতেছিল। সে ধার রাজ্যের অধিকাংশ কর্ম্মচারীকে উৎকোচ প্রদান করিয়া বা উপায়ান্তর অবলম্বনে

ষড়যন্ত্র।

বশীভূত করিয়াছিল। মীনার পুত্রোৎপত্তির সংবাদশ্রবণে সে অধিকতর ক্রুদ্ধ ও চিন্তিত হইয়াছিল। মীনা বাঈ ও তাঁহার শিশু সন্তানকে হস্তগত করিবার জন্য, পাপিষ্ঠ প্রথমে মীনার বিশ্বস্ত দুর্গাধ্যক্ষকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হইল। দুর্গাধ্যক্ষ উৎকোচাদির প্রলোভন সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া অনাথা বিধবার সর্ব্বনাশসাধনে স্বীকৃত হয়।

মীনা এই সকল চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে না পারিয়া বিশ্বস্তচিত্তে নগরে প্রবেশ করিলে, দুর্গাধ্যক্ষ তাঁহাকে বুঝাইলেন, সে দিন দুর্গে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে

অবরোধ।

মঙ্গলজনক হইবে না। কাজেই সরলা বালা সে দিন দুর্গাধ্যক্ষের নির্দ্দিষ্ট এক গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন দুর্গপ্রবেশে সম্মত হইলেন। অনতিবিলম্বে মুরার রাও সসৈন্যে মীনার গৃহ আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল যে, 'আমার শরণাপন্ন হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত না হইলে, আমরা এই গৃহে অগ্নিসংযোগ করিব।' অকস্মাৎ এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া জালবদ্ধা মৃগীর ন্যায় সেই অসহায়া বালার মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্য। কিন্তু মীনা

মুক্তির উপায়।

সেই বিপদে অভিভূত না হইয়া ধৈর্য্যসহকারে স্বীয় উদ্ধারের, বিশেষতঃ আনন্দ রাওয়ের বংশরক্ষার উপায়-উদ্ভাবনে অবহিতা হইলেন; নিশীথকালে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে তিনি একটি দরিদ্রা কৃষকরমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার পুত্রের সহিত স্বীয় পুত্রের পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে সেই কৃষকরমণী স্বীয় পুত্রটিকে তাঁহার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া, শিশু রামচন্দ্রকে গ্রহণপূর্ব্বক নিশীথ অন্ধকার ভেদ করিয়া, শত্রুসৈন্যের অলক্ষিতভাবে দুর্গাধ্যক্ষের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিল, এবং তাঁহাকে বলিল, 'মীনা বাঈ আপনার প্রতি বিশ্বাস করিয়া এই শিশুর—রাজ্যের প্রকৃত ও ধর্ম্মসম্মত উত্তরাধিকারীর রক্ষার ভার সর্ব্বতোভাবে আপনার উপর প্রদান করিয়াছে। অতএব আপনি ইহাকে গ্রহণপূর্ব্বক ইহার রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন; ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা।' দুর্গাধ্যক্ষের হৃদয় মীনার এইরূপ অপরিমিত বিশ্বাসপরায়ণতাদর্শনে বিগলিত হইয়া গেল। তিনি বালককে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মীনা এই সংবাদশ্রবণে হৃষ্টা হইয়া মুরার রাওকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি আত্মসমর্পণ করিব না; তুমি ইচ্ছা করিলে গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে পার।' তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, 'না, আমি যেখানে আছি, সেইখানেই থাকিব, পলায়ন করিব না। এখন যদি এই গৃহে অগ্নি-

সংযোগ হয়, তাহা হইলে সানন্দচিত্তে জ্বলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, স্বামীর চিতারোহণের পুণ্যলাভ করিব।' ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ম্যালকম্ সাহেবের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে মীনা বাঈ স্বমুখে এ কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এ দিকে রাজপুত্রের দুর্গপ্রবেশের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মুরার রাও মীনাকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যসহ দুর্গাবরোধের জন্য যাত্রা করিল। কারণ, রাজ্যের উত্তরাধিকারীকে বন্দী

যুদ্ধোদ্যোগ। করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে মীনা বাঈ মুক্তি লাভ করিয়া আপনার দল পুষ্টি করিতে যত্নবতী হইলেন। তিনি স্বীয় বিপদের ও মুরার রাওয়ের দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় বর্ণনা করিয়া, নিকটবর্ত্তী মিত্র-রাজন্যবর্গকে পত্রপ্রেরণ ও তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সে সময়ে, অর্থাৎ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে, দেশীয় নরপতিগণের রাজ্যে যেরূপ অব্যবস্থা ও অন্তর্বিপ্লবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে কোনও নরপতিই মীনার সাহায্যার্থ সৈন্যপ্রেরণ করিতে পারিলেন না। কেবল বরোদার গায়কওয়াড় মীনার আত্মীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এই বিপৎকালে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বরোদা হইতে বাপু রঘুনাথ নামক জনৈক কর্ম্মচারী এক দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য লইয়া মীনা বাঈর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া মীনা মুরার রাওয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মুরারের সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও, সে প্রথমে সহজে পরাজিত হইল না। কিন্তু মীনার পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্যের দীর্ঘ-

জয়লাভ। কালব্যাপী অশ্রান্ত চেষ্টায়, পরিশেষে তাহাকে হতবীর্য্য হইয়া ধার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে হইল। ইহার অল্প দিন পরেই প্রবাসে মুরারের প্রাণবিয়োগ হওয়ায়, মীনা বাঈ নিঃশত্রু হইলেন।

বাপু রঘুনাথকে বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দেখিয়া, মীনা বাঈ তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মীনা স্বহস্তে সমস্ত রাজ্যসূত্র গ্রহণ করায়, স্বল্পকালমধ্যে ধার প্রদেশের বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া, সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত ও প্রজাগণ সুখী হইল। কিন্তু বিধাতা মীনার ভাগ্যে

পুত্রবিয়োগ। সুখ লিখেন নাই। এই কণ্টকপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে নানা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাই মীনার দুঃখময় জীবনের এক অঙ্ক শেষ হইতে না হইতে আর এক বিষাদকারুণ্য-পূর্ণ অঙ্কের আবির্ভাব হইল। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়া তাঁহার সুখোদয়ের যে সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহসা তাঁহার একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। তিনি দারুণ শোকে পরিতপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মধ্যভারতে ভয়াবহ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। পেণ্ডারী-(পিণ্ডারী)-গণের অমানুষিক অত্যাচারে সমগ্র মধ্যভারত বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। শিন্দে (সিন্ধিয়া), হোলকর

মধ্যভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব। ও অন্যান্য রাজপুত রাজন্যগণ পরস্পরের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক দেশের সর্ব্বত্র সমরানল প্রজ্বলিত ও অশান্তির বিস্তার করিতেছিলেন। কোনও রাজ্যেই প্রজাগণের ধন প্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। এই কারণে মীনা [illegible] শোকসংবরণপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যাবলীর পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ ও রাজ্যের [illegible]সম্ভাবনা দূরীভূত করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইল। স্বামীর বংশরক্ষার জন্য তিনি [illegible], হোলকর প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া, স্বীয় ভগিনীর এক পুত্রকে [illegible]ওকস্বরূপ গ্রহণ ও তাহার 'রামচন্দ্র রাও' নামকরণ করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মধ্যভারতের অরাজকতার মাত্রা বর্দ্ধিত হওয়ায় ধার

রাজ্য 'পরচক্রের' পুনঃপুনঃ আক্রমণে জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। পেণ্ডারী (পিণ্ডারী) সর্দ্দার করীম খাঁ ধার প্রদেশের একাংশ গ্রাস করিল, শিন্দে সরকারও সে সুযোগ পরিত্যাগ

উপায়। করিলেন না। মীনা বাঈ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শত্রুর অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। নিকটবর্ত্তী প্রায় সকল পরাক্রান্ত ভূপতিই বলপ্রকাশে তাঁহার নিকট হইতে করাদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অতএব মীনা বাঈয়ের সমস্ত সঞ্চিত ধন নষ্ট হইয়া তিনি ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। দিন দিন দেশের অবস্থা যেরূপ অশান্তিকর ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে রুদ্রমূর্ত্তিধারণ ভিন্ন মীনা বাঈ রাজ্যরক্ষার কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। তিনি সৈন্যসংখ্যার বৃদ্ধি করিয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অষ্ট সহস্র সৈন্য সহ বাপু রঘুনাথ বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণপূর্ব্বক পরদেশলুণ্ঠনের জন্য প্রেরিত হইলেন। মীনা বাঈ দুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক শাসনব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই নবাবলম্বিত উপায়ের ফলে, মীনার ধনাগম হইতে লাগিল। সৈন্যরক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ ও শিন্দে, হোলকর ও পেণ্ডারী প্রভৃতিকে করপ্রদানকার্য্যে সেই অর্থ ব্যয়িত করিয়া, তিনি

রাজ্যে শান্তি। ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় অন্যান্য নরপতিগণের নিকট তাঁহার সম্মানবৃদ্ধি ও দস্যুদিগের উপদ্রব নিবারিত হইয়া রাজ্যে বহুপরিমাণ শান্তি স্থাপিত হইল। কয়েক বৎসর পরে মধ্য-ভারতে ইংরাজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হওয়ায়, পেণ্ডারীদিগের দমন হইল, এবং অন্যান্য ভূপতিগণ তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া, পূর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; মীনা বাঈও ইংরাজদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া, তাঁহাদিগের সাহায্যে গতবৈভব ও হস্তচ্যুত প্রদেশসমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। মীনার ব্যবস্থাগুণে অদ্যাপি ধার রাজ্য তাঁহার বংশধরগণের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

অবোধ।

১

কে জানে এ কি এ দশা? নিশিদিন অনিবার
আঁখি-ফাটা আঁখিজল, বুক-ফাটা হাহাকার!
প্রেম নাই, প্রীতি নাই, শুধু শুষ্ক ধূলিখেলা,
নিরাশ জীবন-পথে নিরাশ স্বপন-মেলা!
শুনেছি যৌবন-বনে প্রেমের কুসুম ফুটে,
মধুর মিলন-রসে অমিয়-লহরী ছুটে,
চোখে শুধু ভাসে হাসি, কানে শুধু বাজে গান,
নাসায় সুরভি শ্বাস, পুলকে আকুল প্রাণ,—
তা' নহে, তা' নহে, এ কি!—নিশিদিন অনিবার
আঁখি-ফাটা আঁখিজল, বুক-ফাটা হাহাকার!

২

নিয়ত জ্ঞানের দ্বারে প'ড়ে ছিনু অচেতন,
স্বপনেরে সত্য ভাবি' বিহ্বল পাগল মন ;
কঠোর সমস্যা ল'য়ে দিন রাত কেটে যায়,
'বিজ্ঞান'-পিপাসু প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিতে চায় ;
কল্পনারে সাথী করি উঠি দ্রুত মনোরথে
ব্যাকুল বাসনারাশি ছুটিবারে মেঘপথে।
পূর্ণিমাকিরণে বসি' নির্নিমেষ দু' নয়ানে
চাহিয়া থাকিতে শুধু দূর ছায়াপথ পানে।
হাতে ল'য়ে গ্রহরাশি গণিতে অঙ্গুলী ঘায়,
গাঁথিতে তারার মালা ফুলের কলিকা প্রায়।
দারুণ 'দর্শন' ল'য়ে নিশীথের জাগরণ,
জগতের তত্ত্ব লাগি দেবলোকে বিচরণ ;
অসীমের দ্বারদেশে প্রার্থনার বজ্রনাদ,
হৃদয়ে নিরাশা শেষে কল্পনায় অবসাদ !—
জ্ঞানের ভিখারী আমি এরূপে কাটানু কাল,
আপনাতে জড়াইনু আপনারি ইন্দ্রজাল !

৩

কঠোর শাস্ত্রের পথে কুয়াসা-আঁধার-আলো,
হৃদয় রে ! তাও তোর, তাও তোর ছিল ভালো !
মিছে তুই ফিরে এলি তুচ্ছ এ সংসার-ধামে,
প্রেমের মরণে হায়, ডাকিলি প্রেমের নামে।
জীবন-নিদাঘে তোর বৃথায় ফুটালি ফুল,
মরমের পাশ দিয়ে আশা-নদী কুলুকুল !
রোপিলি প্রণয়-তরু, বসিলি বিজন ছায়,
একটিও পাখী এসে গান গাহিল না তা'য়।
ছুটাইলি পরিমল, পরিলি প্রভাতী সাজ ;
বৃথায় আগ্রহ তোর জুটিল না অলিরাজ।
কে জানে ধরিতে কারে বাড়াইলি আলিঙ্গন,
উপহাসি শুধু তোরে ব'হে গেল সমীরণ।

৪

ভালবাসা অন্বেষণে নিয়ে এলি হাহাকার ;
আপনারে বিলাইয়ে কি ল'য়ে বাঁচিবি আর ?

এখনো এখনো তুই ভেবে দেখ্ দেখ্ মন,—
এখনো বৈরাগ্য তোরে দিতে চাহে আলিঙ্গন।
স্বার্থভরা এ জগৎ,—এ জগতে প্রেম নাই ;
সংসার-শ্মশানে তার প'ড়ে শুধু আছে ছাই।
ভস্মে মলয়জ ভাবি লেপিয়া মরম-তল,
প্রক্ষালিতে পরিণামে দিতে হয় অশ্রুজল।
কবির হৃদয় তোর, তুই চাস কাব্যহাসি,—
জীবন-নন্দনবনে মন্দার কুসুমরাশি,—
তুই চাস ছুটিবারে স্বর্গের আলোক পানে,
সে তোরে টানিয়া আনে মৃত্তিকার মাঝখানে।
একমাত্র চুম্বনেতে বরষ কাটাবি হায় !
নিষ্ঠুর অরুচিবশে সে তোরে ফেলিয়া যায়।
একটু অধিক হ'লে হৃদয়ে সে বাসে লাজ—
প্রাণে যেন ফুটে শেল, শিরে যেন পড়ে বাজ !
হায় রে ! দুর্লভ প্রেম, দুর্লভ সে ভালবাসা,
কোথা কোন্ দেশে গিয়ে মিটিবে এ দীর্ঘ আশা ?

৫

তাই বলি, এইবার ফিরে চল্, চল্ মন ;
আজও ওই ডাকে তোর পুরাতন সখাগণ।
সৃষ্টির হৃদয় হ'তে মুছে ফেল্ ফুলরাশ,
বিকশিত বালিকার শশিমুখে কচি হাস।
ক্ষুদ্রেরে তাড়ায়ে দিয়ে মহানেরে কোলে ধর ;
অন্ধকারে ঢেকে ফেল্ প্রেমের বাসর-ঘর।
যাহার চরণ-তলে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিলি,
যাহার সুখের লাগি নিজেরেও বিকাইলি,
সে তোর প্রলাপবাণী শুনিতে না চাহে আর,
বহিতে পারে না তোর দুরন্ত প্রেমের ভার !
তাই বলি, আর কেন ? চেয়ে যদি দেখিল না,
বুক-ভরা ভালবাসা বুঝিল না বুঝিল না !

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতা।

আমাদিগের বঙ্গভাষায় মহিলা কবিদিগের কোনও বিশেষ নাম নাই; কিন্তু বহু মহিলা-কবির মধুর সঙ্গীতে বাঙ্গলা কবিতাকুঞ্জ মুখরিত। ইহা আমাদিগের অল্প আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা নহে যে, বঙ্গসাহিত্যের এই গঠনযুগেই মহিলা লেখকগণ পুরুষ লেখকদিগের সহিত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। অল্প দিন হইল, ইংরাজ মহিলা-কবি ক্রিশ্চিনা রসেটির মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুস্তক হইতে মহিলা-কবি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

ক্রিশ্চিনা রসেটি যে অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বরী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ক্রিশ্চিনার পিতামাতা ইটালীর লোক হইলেও, লণ্ডনের জনকোলাহলময় বক্ষে ক্রিশ্চিনার

পরিচয়।

জন্ম ও লণ্ডনই তাঁহার বাসস্থান। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কবিতার ভাব ও মাধুরী খাঁটি ইংরাজী। কাজেই তাঁহাকে ইংরাজ কবি বলা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। ক্রিশ্চিনার পিতা গ্রেব্রিয়েল বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেই সংগ্রাম-শঙ্কিল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন। সেখানে ইটালীয় ভাষার অধ্যাপনা করিয়া তাঁহার কিছু আয় হইত; তাহাতেই সংসার চলিত। ক্রিশ্চিনার ভ্রাতা ডাণ্টে গ্রেব্রিয়েল রসেটির নাম এখন ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত; তবে কবিতা রচনা করিয়া ও চিত্র অঙ্কিত করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে ডাণ্টে গেব্রিয়েলের বহুদিন লাগিয়াছিল। ক্রিশ্চিনা স্বয়ং গৃহকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। জননীর প্রতি তাঁহার অচল অনুরাগ ছিল। ধূলিধূমাকীর্ণ সৌধারণ্য লণ্ডন মহানগরের জনতাপীড়িত বক্ষে ক্রিশ্চিনার কোলাহলহীন জীবন যাপিত হইয়াছিল। এক জন এ কথাও বলেন যে, ভ্রাতা ডাণ্টে গেব্রিয়েলের চিত্রে মহিলার আননে যে বিষাদময় ভাব চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, ভগিনী ক্রিশ্চিনার রহস্যকুহেলিকাচ্ছন্ন, কোমল, বিষাদভারাক্রান্ত দৃষ্টিই তাহার আদর্শ।

লেখক বলিয়াছেন যে, ক্রিশ্চিনাকে প্রথমবার দেখিয়া তাঁহার মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। তাঁহাকে দেখিলে একটু দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত; তাঁহার

আকৃতি প্রকৃতি।

ভ্রূযুগলে যে গাম্ভীর্য্য প্রকটিত হইত, তাঁহার কোনও আলেখ্যেই তাহা সম্যকরূপে প্রতিভাত হয় না। তাঁহাকে দেখিলেই প্রতিভাশালিনী বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর, বড় মোহন; কিন্তু তাঁহার আর একটা বিশেষত্ব ছিল, সেটা তাঁহার "Clear cut method of syllebification." তাহা বোধ হয় তাঁহার বিদেশীয় বংশের ফল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, তাঁহার উচ্চারণে, তাঁহার ভাষায় বা তাঁহার ভাবে তিনি খাঁটি ইংরাজ হইলেও, ক্রিশ্চিনার এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে সহজেই বুঝা যাইত যে, তিনি বিদেশিনী। কিসে যে তাহা প্রকাশ পাইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। তাঁহার কথা শুনিলে কাহারও কাহারও মনে হইত,—যেন ইংরাজী ভাষায় বিশেষরূপ অভিজ্ঞ, বহুবর্ষাবধি সেই ভাষার প্রয়োগকুশল কোনও বিদেশীয় কথা কহিতে

ছেন। যে সকল বিবিধ ব্যাপারের সংমিশ্রণে ক্রিশ্চিনার জটিল চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার বিদেশিত্ব যে অন্যতম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কবিতা-রচনার যশ অধিকাংশ কবির পক্ষেই দুঃখলব্ধ, বহু সাধনার ফল। কীট্‌সের জীবিতাবস্থায় তাঁহার ভাগ্যে যশোলাভ হয় নাই; যশোলাভ করিতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বহুদিন গিয়াছিল। ক্রিশ্চিনা রসেটির ভাগ্যেও সহজে যশোলাভ হয় নাই। বহুদিন ভারতীসেবার পর, পাঠকের অবহেলার অন্ধকার ভেদ করিয়া তবে যশের আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন ক্রিশ্চিনা একটা বিদ্যালয়ের কার্য্যে জননীর সহকারিতা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার ভগিনী ইটালীয় ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। এমন কি, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দেও মহারাণীর পৌত্র ডিউক অফ্ ক্লারেন্সের মৃত্যুউপলক্ষে কোনও পত্রের জন্য একটা কবিতা রচনা করিয়া ক্রিশ্চিনা তিন গিনি মাত্র পাইয়াছিলেন, এবং তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন। অথচ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই তিনি অতি মধুর কবিতা লিখিতে পারিতেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার অষ্টাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে রচিত একটি ক্ষুদ্র গীতিকবিতার অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—

কবিতা-রচনা।

আমি যবে মরি যাব প্রিয়,
গাহিও না বিষাদের গীতি;
রোপিও না ঝাউ মোর শিরে,
রচিও না গোলাপের বীথি।

আমি কিছু বুঝিব না সখা,
ছায়া আসে, বারিধারা ঝরে;
আমি আর শুনিব না সখা,
পাখী গাহে সুমধুর স্বরে।

তৃণরাজি জাগিবে সেথায়
ধারাসিক্ত,—শোভিত শিশিরে।
পার মোরে ভুলে যেও সখা,
পার রেখ হৃদয়-মন্দিরে।

চিরব্যাপ্ত সান্ধ্য অন্ধকারে
নেহারিব কত স্বপ্নদল,—
হয় ত—এ সব মনে রবে,
হয় ত বা ভুলিব সকল।

পাঠকসমাজে ক্রিশ্চিনার কবিতার আদর সত্ত্বেও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কবিতা লিখিয়া বৎসরে তিনি চার বা পাঁচ শত টাকা মাত্র পাইতেন; ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার আয় বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এক জন খ্যাতনামা চিত্রকর তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন; ক্রিশ্চিনাও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু চিত্রকর রোম্যানক্যাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, ক্রিশ্চিনা এ বিবাহে সম্মত হন নাই।

অন্যান্য কথা।

ক্রিশ্চিনা রসেটির প্রতিভা সম্বন্ধে নানা সমালোচক নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মিষ্টার ওয়াট্‌স্ ডানটন্ তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন। মিষ্টার অ্যাণ্ড্রু ল্যাং বলেন যে, তাঁহার কবিতায় চেষ্টার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার মিষ্টার সাইমন্‌স বলেন যে, ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতা আপনার মাধুরীর কথা আপনি অবগত নহে। এখানে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সকল রচনা সম্বন্ধেই সমালোচকদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়া অসম্ভব নহে।

ভ্রাতা উইলিয়ম রসেটি ভগিনী ক্রিশ্চিনার রচনা সম্বন্ধে বলেন যে, তাহাতে চেষ্টা ছিল না, তাহা নির্ঝরের বারিরাশির মত আপনা-আপনি প্রবাহিত হইত। ভ্রাতার মতে,

ভ্রাতার কথা।

রচনার পূর্ব্বে ভগিনী কখনও রচনার বিষয় লইয়া বিশেষ চিন্তা করেন নাই; আবার নিয়ম মত চেষ্টা করিয়া রচনাও তিনি করেন নাই। যখন মনে কোন ভাব সমুদিত হইত, তখন ক্রিশ্চিনার রচনা আপনি আসিত। তিনি

প্রথমে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি লিখিয়া যাইতেন, এবং প্রথম বার রচনার পর বিবেচনা করিয়া সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার মত এই ছিল যে, কবিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে স্বাভাবিক ভাবমাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে রচনামাধুরীও অত্যাবশ্যক। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভ্রাতা ও ভগিনী প্রায় এক গৃহে বাস করিতেন; অথচ ভ্রাতা এক দিনও ভগিনীকে রচনাকার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিতে পান নাই। ক্রিশ্চিনা রচনা-সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ বা পরামর্শ লইতেন না। তবে ভগিনীর প্রকাশিত রচনা লইয়া ভ্রাতা ডাণ্টে গেব্রিয়েল দোষ গুণ বাছিয়া ভগিনীকে তাঁহার কবিতা সমালোচনা করিয়া শুনাইতেন।

আমরা ক্রিশ্চিনার যে কবিতাটির অনুবাদ প্রদান করিয়াছি, তাহার মধ্যে বিষাদের একটা অন্তঃসলিল প্রবাহ পরিলক্ষিত হইবে। বাস্তবিক তাঁহার একাধিক সুমধুর কবিতায় মৃত্যুর প্রতি এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কবিতার একাংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

জীবন মধুর নহে, সে দিন মধুর হ'বে
যেই দিন আসিবে মরণ;
বুঝিব না ফুটে ফুল, উড়ে যায় পাখীকুল,
প্রজাপতি ছুটে অগণন।
বুঝিব না যবে আর এ দেহের চারিধার
জাগিয়া উঠিছে তৃণরাশি।
আর শুনিব না যবে, গাহিয়া মধুর রবে
চাতক যেতেছে মেঘে ভাসি;
চঞ্চল বসন্ত স্মরি, ফেলিব না অশ্রুবারি,
দেখিব না শস্যক্ষেত্র আর।
আর বুঝিবে না প্রাণ, মোদের অভ্যস্ত স্থান,
কে এখন করে অধিকার।

মৃত্যুর বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ক্রিশ্চিনার শরীর বড় অসুস্থ ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আরোগ্যলাভাশা বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত ক্রিশ্চিনা রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন; এত যন্ত্রণাতেও তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য বিনষ্ট হয় নাই।

সমাজনীতি।

জাপানী মহিলা।

আজকাল জাপান-ভ্রমণ বড় সখের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। য়ুরোপ-ভ্রমণ এখন চর্ব্বিতচর্ব্বণ; আমেরিকার কর্ম্মের ভিড়ে প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে; কাজেই ভ্রমণকারীকে হয় আফ্রিকায়, নয় ত এসিয়ায় আসিতে হয়। আফ্রিকার যে নিবিড় কাননাভ্যন্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোক আজ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই সঙ্কটসঙ্কুল প্রদেশে ভ্রমণ সকলের পক্ষে সহজ নহে; কারণ, সকলেই লিভিংষ্টোন বা ষ্ট্যান্‌লি নহে। তবেই রহিল কেবল এসিয়া। এসিয়ায় চীন ও জাপানই অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত; কিন্তু চীনে ভ্রমণের সুবিধা অতি অল্প; জাপানে সুবিধা অত্যন্ত অধিক; তদ্ভিন্ন জাপান যেন কোনও ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্ট মায়াপুরীর মত সহসা আপনার শতসৌধসুশোভিত সমুন্নত শির উত্তোলিত করিয়াছে। কাজেই আজকাল জাপান-ভ্রমণ বড় সখের হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি "লেডি" নামক পত্রে কোনও লেখক জাপানী মহিলাদিগের যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

কবি সার এড্‌উইন আর্ণল্ড কেবল আপনার রচনায় জাপানী মহিলাদিগের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। পরন্তু বৃদ্ধ বয়সে এক জাপানী যুবতীকে বিবাহ করিয়া, স্বীয়

দৈনন্দিন জীবন।

জাপানী প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবার ফরাসী গ্রন্থকার লোটি তাহাদিগের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। বোধ করি, উভয়েই ভ্রান্ত। জাপানী মহিলাগণ বড় হৃদয়রঞ্জন; তাহারা সুদৃশ্য পুত্তলিকামাত্র নহে। তাহাদের বেশ নয়নবিনোদন, তাহাদের ব্যবহার বড় মধুর, তাহাদের আমোদ আহ্লাদ শিশুসুলভ। কিন্তু তাহাদের চরিত্রে যে গভীরতা আছে, তাহাই সহজে বিদেশীর চক্ষে পড়ে না। গৃহকর্ম্মে জাপানী রমণীর বিশেষ দৃষ্টি; বড় ঘরের গৃহিণী ভৃত্যদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, দরিদ্রপত্নী আমোদ আহ্লাদের পূর্ব্বে গৃহকার্য্য সুসম্পন্ন করেন। জাপানী রমণীকে দেখিলে সদাকার্য্যরত মধুমক্ষিকা ও মোহনদর্শন প্রজাপতির কথা মনে পড়ে। বড় ঘরের গৃহিণীরা পরস্পরের গৃহে সম্মিলিত হইয়া, পোশাকের কথায়, সাহিত্যের কথায় ও সে দিন গৃহপ্রাচীরে যে সকল চিত্র বিলম্বিত থাকে, সে সকলের কথায়, সময় অতিবাহিত করেন; সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র পেয়ালায় চা-পান ও ক্ষুদ্র পাইপে ধূমপান চলে।

জাপানী মহিলারা সময় সময় বান্ধবীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আপনার নূতন পোশাক দেখাইয়া থাকেন। অস্মদ্দেশের মহিলাগণ নিমন্ত্রণসভায় অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত

বেশবৈচিত্র্য।

করিয়া গর্ব্বানুভব করেন। ইতিপূর্ব্বে জাপানী মহিলারা দেশীয় বেশ ত্যাগ করিয়া য়ুরোপীয় বেশ পরিধান করিতেছিলেন। এখন সে স্রোত ফিরিয়াছে, ভালই হইয়াছে; কারণ দেশীয় বর্ণবৈচিত্র্যবহুল বেশ পরিধান করিলে, দেশীয় প্রথায় কেশবিন্যাস করিলে ও দেশীয় মোজা ও জুতা পরিলে যে যুবতীকে সুন্দরী দেখায়, বিদেশীয় বেশে তাঁহাকে নিতান্ত কুরূপ বলিয়া বোধ হয়। সাম্রাজ্ঞীর সহচরীগণ আজও য়ুরোপীয় বেশের ভক্ত। যে জাপানী মহিলা দেশীয় বেশ বাছাই সম্বন্ধে অত্যন্ত সুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, বিদেশীয় বেশ সম্বন্ধে তাঁহার রুচিরও নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। য়ুরোপীয় বেশে জাপানী রমণী যে প্রকার বর্ণবৈষম্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে নয়ন ক্লিষ্ট হইয়া উঠে; আর বিদেশীয় বেশের ব্যবহারে লাঞ্ছনার ত সীমা নাই।

এখন একাধিক বালিকাবিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার হইলে জাপানী মহিলাদিগের সহিত বিদেশিনীদিগের অধিক পরিচয়

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

হইবে, এবং হয় ত সময়ে উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণ অধিক স্বাধীনতা পাইবেন। সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মহিলাগণ অবাধ মুক্ত স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিয়া থাকে। রঙ্গালয়ে রঙ্গ দেখিতে, দোকানে দ্রব্যাদি কিনিতে, মন্দিরে উৎসব দেখিতে ও নগরের বা গ্রামের নানা স্থানে নানা দৃশ্য ও তামাসা দেখিতে তাহারা সর্ব্বদাই যাইয়া থাকে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মহিলাদিগের স্বাধীনতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ; তাঁহারা বান্ধবীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনেন ও বান্ধবীদিগের গৃহে গমন করেন, এই পর্য্যন্ত।

জাপানে সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাদিগের সর্ব্বপ্রধান বিপদ শ্বাশুড়ী। য়ুরোপীয় মহিলাগণও শ্বাশুড়ীর অত্যাচার ভোগ করেন বলিয়া খেদ করেন; কিন্তু জাপানী শ্বাশুড়ী যে কিরূপ বস্তু, তাহা তাঁহারা আদৌ জানেন না। বিবাহের দিন হইতেই পুত্রবধূ শ্বাশুড়ীর সকল আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য; বলা বাহুল্য, শ্বাশুড়ী আপনার অতিরিক্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া

প্রায়ই পুত্রবধূকে যাতনা দিয়া থাকেন। যদি কোন য়ুরোপীয়া মহিলা কোনও জাপানী পুরুষকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহার প্রধান বিপদ শ্বাশুড়ী। কাজেই য়ুরোপীয়া মহিলার পক্ষে জাপানী জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাণিপীড়ন সুবুদ্ধির কার্য্য নহে; জ্যেষ্ঠ পুত্র জননীর সহিত এক পরিবারে বাস করিতে বাধ্য—কনিষ্ঠগণের সম্বন্ধে তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। তবে সুখের বিষয়, এরূপ বিবাহ বড় অধিক হয় না। এক জন ইংরাজ মহিলা এক জন য়ুরোপ-প্রবাসী জাপানীকে বিবাহ করেন। যত দিন দম্পতী য়ুরোপে ছিলেন, তত দিন কোনও গোলযোগই ছিল না; কিন্তু দেশে ফিরিতে না ফিরিতেই শ্বাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিন কতক শ্বাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করিয়া পত্নী পতিকে জানাইলেন যে, আর সহ্য করা অসম্ভব। তখন পতি-পত্নী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, শ্বাশুড়ীকে বুঝাইতে হইবে যে, ইংরাজ পুত্রবধূ দাসীমাত্র নহে। এই মৎলব স্থির হইবার পর এক দিন শ্বাশুড়ীর সাক্ষাতেই পুত্রবধূ স্বামীকে হুকুম করিলেন, "আমার বুট জুতা খুলিয়া লও এবং চটি জুতা লইয়া আইস।" স্বামী তৎক্ষণাৎ পত্নীর আজ্ঞা পালন করিলেন। জননী বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া রহিলেন; কারণ, স্ত্রী যে স্বামীকে হুকুম করিতে পারে, এ বিশ্বাস জাপানী মহিলার নাই। স্বামী জুতা লইয়া হাজির হইতে না হইতেই স্ত্রী স্বামীকে আপনার শাল আনিতে পাঠাইলেন। স্বামী তখনই হুকুম তামিল করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "শাল পরাইয়া দাও।" স্বামী তাহাই করিলেন, শ্বাশুড়ীর ক্রোধের আর সীমা রহিল না। "যো দিন গিয়া"র জন্য তাঁহার খেদও যথেষ্ট হইল, সন্দেহ নাই। যে পুত্র স্ত্রীর দাসমাত্র, সে পুত্রের সহিত তিনি আর বাস করিবেন না বলিয়া জননী পুত্রের গৃহ ত্যাগ করিলেন, দম্পতীও উদ্ধার পাইলেন।

শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া কেহ এরূপ না ভাবেন যে, জাপানে পত্নীর প্রভাব নাই। সমাজের সকল স্তরেই জাপানী পত্নী স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া, সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হইয়া, নানা মধুর কোমল গুণে স্বামীর উপর যে প্রভাব সংস্থাপন করেন, সে প্রভাব পতি-পত্নীর সমঅধিকারপ্রার্থিনী প্রতীচ্য পত্নীর প্রভাব অপেক্ষা কোনও অংশেই অল্প নহে। জাপানী মহিলা এখনও বেশ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে আপনার প্রাচ্য কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়া প্রতীচ্য আদর্শে আপনাকে গঠিত করেন নাই।

শ্বাশুড়ী-ভীতি।

পত্নীর প্রভাব।

ইতিহাস।

সিপাহী-বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের কথা এখনও নিত্য নূতন। সিপাহী বিদ্রোহের একটা বিশেষত্ব এই যে, বিদ্রোহকালে এক জন বা অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ বহু ভারতবাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অসীম বীরত্বে বা অসাধারণ কৌশলে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; কেহ বা একক বহু শত্রু নাশ করিয়াছিলেন। একের বা অল্পসংখ্যকের বীরকীর্ত্তির নিকট বহু সেনাদলের যুদ্ধের বীরকাহিনী তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ সার হিউ গাফ্ বিদ্রোহকালে এ দেশে সেনাদলে কার্য্য করিতেন।—বিদ্রোহবহ্নিতে তিনি দগ্ধ হয়েন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে সেই লোলজিহ্ব অনলশিখার উত্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে সিপাহী বিদ্রোহের অনেক কথা আছে।

সার হিউ গাফের অনেক কথা ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ঐতিহাসিকের রচনায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সৈনিকের রচনায় কিছু প্রভেদ থাকি-

বেই। সার হিউ বিদ্রোহকালে Victoria Cross লাভ করেন। তাঁহার রচনায় সৈনিকজনোচিত সংযম দৃষ্ট হয়। মিরাটেই প্রথম অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, মিরাটেই অনল ভীষণতম হইয়াছিল,—বিদ্রোহের চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সার হিউ মিরাটে ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। মিরাট অতি রম্যস্থান; সেখানে শিকার বা আমোদ কিছুরই অন্ত ছিল না, তদ্ভিন্ন সেনাদল বিশেষ সামাজিক ছিল। আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বিদ্রোহের মত একটা আকস্মিক বিপৎপাতের চিন্তা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তখন পঞ্জাবে স্থির শান্তি বিরাজ করিতেছে, সীমান্ত প্রদেশেও সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। কাজেই কাহারও মনে কোনও আশঙ্কাই ছিল না।

ঝটিকার পূর্ব্বে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল পর্য্যন্ত কোনও গোলই ছিল না,—তখন হইতে অসন্তোষ-সংবাদ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পুরাতন Brown Bess বন্দুকের পরিবর্ত্তে নূতন বন্দুক ব্যবহারের প্রবর্ত্তনেই যত বিপদ উপস্থিত হইল। প্রথমে দুই এক খানা গৃহদাহ, দুই একটা সেনাদলের বিদায়দান ইত্যাদি হইয়া গেল; সকলে ভাবিল, মেঘ কাটিয়া গেল। এই সময় সার হিউ কানপুর ও লক্ষ্ণৌ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। তখন কয় খানি গৃহদাহ হইয়া গিয়াছে; অধীনস্থগণ তখনও অসন্তুষ্ট ও কর্ত্তৃপুরুষদিগের আজ্ঞাপালনবিমুখ—এ সকল সত্ত্বেও ইংরাজ কোনও বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। আপনার অসীম ক্ষমতায় ইংরাজের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল! আপনার ক্ষমতায় এরূপ অন্ধ বিশ্বাস না থাকিলে, হয় ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ রক্তাপ্লুত দৃশ্য অভিনীত হইত না। সার হিউ নানা সাহেবকে শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যত্নে ও অতিথিসৎকারে স্থানীয় ইংরাজগণের মুখে তাঁহার প্রশংসা আর ধরিত না।

নূতন টোটা।

সার হিউ তাঁহার পুস্তকে একটা ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। এক জন ফরাসী ভ্রমণকারী সে কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কানপুরে ইংরাজ অধিবাসিগণের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সংহারের হুকুম দিয়া নানা সাহেব আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে নর্ত্তকীর নয়নরঞ্জন লাস্যলীলা দেখিয়া সারা রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন!

সার হিউর আপনার সেনাদলেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ পঁচাশি জন অপরাধী সৈনিকের সামরিক বিচার করা হয়। বিচারকালে সার হিউ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলে অপরাধীদিগকে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। তাহারা ভূমিতে উপবেশন করিল; সকলে দোষ অস্বীকার করিতে বিলম্ব করিল না। তাহাদের মধ্যে অনেকে বহু দিন ইংরাজ সেনাদলে কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, অনেকে "মেডেল"ও পাইয়াছে। তাহাদিগের মুখে রোষভাব প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু অদৃষ্টবাদী প্রাচ্যজনোচিত স্থিরভাব সকলের মুখেই দৃষ্ট হইতেছিল। স্বল্পক্ষণমধ্যেই মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেল। বিচারকালে কেবল একটা গোল হইয়াছিল। "এডজুটাণ্ট" যখন সাক্ষ্যদান করেন, তখন কয় জন অপরাধী ক্রুদ্ধ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এড্‌জুটাণ্ট সাহেব কি ইহা বলিয়াছেন?" কথাগুলি আবার বলা হইলে, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!"

অনল জ্বলিল।

অপরাধীদিগের দণ্ড বড় কর্ত্তার মঞ্জুর হইলে, অপরাধীদিগকে দণ্ড শুনাইতে আনা হইল। দেশীয় সৈনিকদিগের বন্দুক ছিল, কিন্তু গুলি বারুদ কিছুই ছিল না। দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিয়া শুনান হইল। সেনাদলে কে কত দিন কার্য্য করিয়াছে, তদনুসারে দণ্ডদান হইতে

লাগিল; প্রাচীন সেনাগণ কেহ বা যাবজ্জীবন কারাবাস, কেহ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড পাইল; অবশিষ্ট অপরাধীদিগের কেহ বা বিংশতি, কেহ বা পঞ্চদশ, কেহ বা দশ বৎসর কারাবাসের দণ্ড পাইল,—কাহারও দশ বৎসরের কম কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইল না। সর্ব্বসমক্ষেই তাহাদিগের জুতা খুলাইয়া পায়ে বেড়ী পরান হইল। যখন তাহাদিগকে জেলখানায় লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহাদিগের কেহ কেহ "কর্ণেল"কে লক্ষ্য করিয়া জুতা ছুঁড়িল; তাহারা হিন্দুস্থানী ভাষায় "কর্ণেল"কে গালি দিতে লাগিল, এবং সঙ্গীদিগকে তাহাদিগের কথা মনে রাখিতে বলিল। সে দিন ইংরাজ সেনাদল সসজ্জ না থাকিলে, বোধ করি, একটা গুরুতর কাণ্ড হইয়া যাইত। সকলে ভাবিল, বুঝি গোল মিটিয়া গেল। তখন কেহই বুঝেন নাই—এই সকল সিপাহীর দণ্ডে অন্য সিপাহীরা বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল।

দণ্ডদান।

সেই দিন অপরাহ্নে অপরাধী সিপাহীরা সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিল। অন্যান্য সেনানায়কের সহিত সার হিউও তাহাদিগের বেতন চুকাইয়া দিতে কারাগারে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। যদিও লেখক তখন তরুণযুবকমাত্র, তথাপি সে দৃশ্য তাঁহার তরুণ হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সিপাহীরা কারাগারের একাংশে আবদ্ধ ছিল। প্রথমে দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা তখনও "গরম" রহিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা সকল কথা বুঝিল—বুঝিল যে, এত দিন সম্মানের সহিত যে কার্য্য করিয়াছে, আজ তাহা হইতে বিতাড়িত হইল, তখন তাহাদের এ ভাব আর রহিল না। বিশেষতঃ সিপাহীদিগের মধ্যে সৈনিক-ব্যবসায় তখন কুলক্রমাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সিপাহীর পুত্রও সেনাদলে প্রবেশ করিত। সাময়িক উত্তেজনায় একটা কাজ করা এক কথা, আর সকল বুঝিয়া কাজ করা আর এক কথা। সকল বুঝিতে পারিয়া বহু বৃদ্ধ সিপাহী কাঁদিতে কাঁদিতে সেনানায়কদিগকে তাহাদের উদ্ধার করিতে বলিতে লাগিল। বহু তরুণ সিপাহীও বৃদ্ধদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

কারাগারে।

১০ই মে রবিবারে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। প্রভাত কাটিয়া গেল। সার হিউ ম্যাকনাবের সহিত একত্র গির্জ্জায় গমন করিলেন। হায়! সেই দিনই ম্যাকনাবের জীবন শেষ হয়! ইহার পর সার হিউ ম্যাকনাবের গতপ্রাণ দেহ রাজপথে পতিত দেখিয়াছিলেন। নিয়মমত আপনার এবং এক বন্ধুর অশ্ব কয়টির তত্ত্ব লইলেন, পালিত ভল্লুক দুইটি ও চিতা বাঘটির সংবাদ লইলেন; তাহার পর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম আরব্ধ হইয়াছে। সার হিউ বেশ পরিধান করিতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, দেশীয় পদাতিক সৈনিকদিগের বারিকে অগ্নি লাগিয়াছে; বহু বাঙ্গলোও দগ্ধ হইতেছে। তাহার পরেই সংবাদ আসিল যে, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ নায়কদিগকে সংহার করিতেছে। সার হিউ অশ্বারোহণ করিয়া বাহির হইলেন। সিপাহীদিগের বারিক ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে,—সেই সদাহাস্যমুখ সিপাহীগণ অস্ত্রাদি লইয়া উন্মত্তের মত নৃত্য করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, যে দিকে ইচ্ছা গুলি চালাইতেছে!

বিদ্রোহারম্ভ।

উপস্থিত হইয়াই সার হিউ বুঝিলেন, সেখানে থাকা উচিত নহে; সেখানে থাকিলে মৃত্যু নিশ্চিত। সিপাহীরা দেখিয়াছিল, সার হিউ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। বিস্মিত হইয়া তিনি অশ্ব থামাইবামাত্র তাহারা তাঁহার সহচরদিগকে সরিয়া যাইতে বলিল ও বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেশীয় সেননায়কগণ

সার হিউকে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল। সার হিউ বেগে অশ্ব ছুটাইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় সিপাহীরা একবার বন্দুক আওয়াজ করিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সার হিউ আহত হইলেন না। সার হিউ আপনার সেনাদলমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানেও বিষম অশান্তি বিরাজ করিতেছে, সেনাদল অশ্বারোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করিতেছে, অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া অস্ত্রাদি লইতেছে,—তখন আর তাহাদের চর্ব্বিসংযুক্ত টোটা বলিয়া বাদবিচার নাই। সার হিউ সেনাদলকে সকল কথা বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কোনও ফলোদয় হইল না। তবে সুখের বিষয় এই যে, দেশীয় সেনানায়কদিগের চেষ্টায় কেহই তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করে নাই। অল্পক্ষণমধ্যেই সেনাদল আরও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তখন সেনাদলে "মারো, মারো" রব উঠিতে লাগিল। কয় জন সৈনিক সার হিউকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল; একটা গুলি সার হিউর জিনের একাংশে লাগিল। সেই বিদ্রোহী সেনাসাগরে ইংরাজদিগের মধ্যে সার হিউ একাকী। সেই সময় Quarter-master কানিংহাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—মুক্ততরবারিহস্তে কয় জন সিপাহী তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া সার হিউর সঙ্গীরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া সার হিউ ও কনিংহাম সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সিপাহীরা গোলমাল করিতে করিতে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। সার হিউর বিশ্বাস যে, তাঁহাদের জীবননাশ বা গমনরোধ তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা হইলে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না।

জীবনসঙ্কট।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র। "মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষ" এক জন অজ্ঞাতনাম লেখকের লিখিত একটি সাময়িক প্রবন্ধ। লেখকের মতের "গবর্মেণ্ট অপর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্য বন্ধ করিয়া কেবল দুর্ভিক্ষনিপীড়নে অর্থ ব্যয় করেন নাই বলিয়া বোধ হয়, কেহ অভিযোগ করিবেন না।"—এমন অভিযোগ কেহ করে নাই বটে, কিন্তু গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষনিবারণের যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন নাই, ইহা যে এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত অভিযোগ,—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুর্ভিক্ষনিবারণকল্পে ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্ট যাহা করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য কৃতজ্ঞ। মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষনিবারণচেষ্টার লেখক যে নক্সা আঁকিয়াছেন, তাহাও সুরম্য। কিন্তু তাহাতেই রাজশক্তির পূর্ণ কর্ত্তব্য সম্যক সমাপ্ত হইয়াছে,—আমরা কোনও মতে তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। আমরা প্রজার প্রাণরক্ষা রাজশক্তির অনুগ্রহমাত্র মনে করি না,—রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণনা করি। দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য যে দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের টাকা মজুদ রাখিবার কথা,—সে টাকার পাহাড় কোন্ অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছে, লেখক কি তাহার সন্ধান রাখেন? যখন এক দিকে সহস্র সহস্র প্রজা ক্ষুধার জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া রাজপথে মরণশান্তি লাভ করিতেছে, তখন সীমান্তসমরে কোটী কোটী মুদ্রা আহুতি দিবার ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দেখা যায়? যে রাজ্যে প্রজার অনাহারজন্য মৃত্যু-নিবারণের ব্যবস্থা করিতে গেলে "অন্য যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্য বন্ধ" হইয়া যায়, তাহার শাসন-রক্ষণ-ব্যবস্থা এত ব্যয়সাধ্য কেন?—সে দেশের রাজশক্তি বিদেশের,—প্রভু দেশের নিকট তজ্জন্য অর্থভিক্ষা করিতে এত কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত কেন?—লেখককে আমরা এ সম্বন্ধে

কংগ্রেসের বিপুল সাহিত্য পাঠ করিবার পরামর্শ দিই। তিনি যে বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, সে বিষয়ের মূল সূত্রে তাঁহার বিন্দুমাত্র দর্শন নাই। বিষয়টি যেমন গুরুতর এবং বিবিধ রাজনৈতিক সমস্যার সহিত যেমন বিজড়িত,—বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক এ সম্বন্ধে তেমনই অনভিজ্ঞ,—তেমনই একদেশদর্শী। অনধিকারচর্চ্চার এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "তৃপ্তি" একটি সুন্দর কবিতা;—কিন্তু বিস্তৃতিবশতঃ শেষভাগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। "প্রত্যাবর্ত্তন" শ্রীযুক্ত জলধর সেনের হিমালয়-ভ্রমণের উপসংহার। এই সংখ্যায় সেই চিরমধুর ভ্রমণকাহিনীর সমাপ্তি। বিভিন্ন দৃশ্য, বিবিধ ভাব ও বিচিত্র কাহিনীর স্তরে স্তরে লেখক নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া এত দিন পাঠকের সঙ্গে যে নিভৃত নিগূঢ় প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন,—তাহার যেন সমাপ্তি না হয়! হিমালয়ভ্রমণ-লেখকের অদৃষ্টে অন্য পুরস্কার এ দেশে দুর্ল্লভ, কিন্তু বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকসম্প্রদায়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ তাঁহার প্রাপ্য। "স্বরলিপি" প্রকরণে প্রকাশিত, বসন্তোৎসব-উপলক্ষে শ্রীমতী সরলা দেবীর রচিত গানটি অতি সুন্দর,—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যকাননের গন্ধামোদে নিষিক্ত,—পুরাতন অতীতের মধুর স্বপ্নজালে জড়িত, বিগত সুখোৎসবের বিদায়ী নিশ্বাসে বিকম্পিত। যাঁহারা পরম 'উৎসাহে' এই কুহকস্বপ্নের ভিত্তির উপর রহস্যরসের উৎসসৃষ্টি করিতে গিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারা "রত্নাবলীর" শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া থাকিবেন,—কিন্তু কাব্যকলারসে হায়! তাঁহারা বঞ্চিত। এ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়ের "মীর কাসিম" সমাপ্ত হইল। লেখক বলিয়াছেন, উপযুক্ত উপকরণের অভাবে মীরকাসিমের আলেখ্য সম্পূর্ণ হয় নাই। গ্রন্থকারের প্রথম চিত্র "সিরাজদ্দৌলার" তুলনায় মীর কাসিম অঙ্গহীন ও মৃতকল্প;—কিন্তু লেখকের লিপিকৌশলে এই পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনীর নবরাগ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট। গ্রন্থাকারে দেখা দিলে মীরকাসিমের সহিত পুনঃ-সম্ভাষণের ইচ্ছা রহিল। "বিপ্রলব্ধ" শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের গ্রথিত একটি চলনসই গল্প। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় "সিনিয়র মার্কনী" প্রবন্ধে নবাবিষ্কৃত তারহীন টেলিগ্রাফীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" এ নহে বিদায়" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর একটি কবিতা।—এই সংখ্যার সম্পাদন করিয়া সম্পাদিকা-দ্বয় অন্য হস্তে "ভারতী"র ভার ন্যস্ত করিয়া বিদায় লইতেছেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক সময়ে "ভারতী"র অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি;—আজি এই বিদায়ের দিনে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।—সমালোচনার তুলাদণ্ডে "ভারতী"র পরিমাণ করিতে গিয়া আমরা হয় ত ভ্রান্ত হইয়াছি; কিন্তু "ভারতী"র প্রভাবে বঙ্গভাষার যে উপকার হইয়াছে, তাহা কখনও বিস্মৃত হই নাই। "ভারতী"র নিকট যাহা পাইয়াছি,—তজ্জন্য আমরা ঋণী,—তাহা কখনও অস্বীকার করি নাই; তথাপি আরও চাহিয়াছি! যখন মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর ভার পরিত্যাগ করেন, তখন শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী "ভারতীর" সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া তাহার লালন পালন করিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। যে দেশকালপাত্রের সম-বায়ে এ দেশে মাসিকপত্র পরিচালন করিতে হয়, আমরা তাহা জানি। সেই বিবিধ বাধা অতিক্রম করিয়া দুই জন মহিলা-সম্পাদক যাহা সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা আত্মগৌরব অনুভব করিতে পারি। আমাদের কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন হইতে পারে,—কিন্তু মাতৃভাষার উপাসকগণের উদ্দেশ্য এক, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সেই উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে যদি কখনও প্রতিবাদ বা অপ্রিয়বাদ দ্বারা ভারতীর সম্পাদিকাদ্বয়ের অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি,—আশা করি,—তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

এবার স্থানাভাবে অন্যান্য মাসিকের সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।

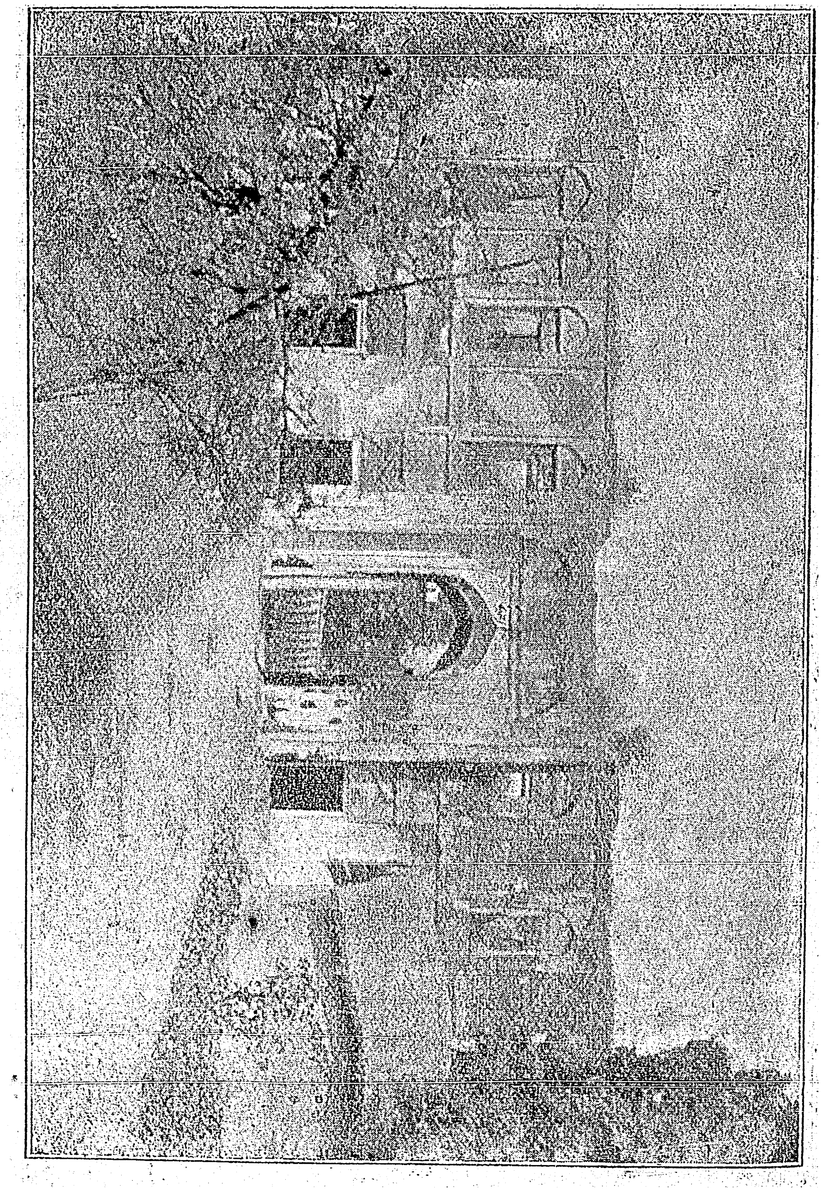

নাটোর রাজবাটী—ঘড়িদালান।

"নয়শো রূপেয়া"।

স্মৃতি ও সমালোচনা।

'নয়শো রূপেয়া' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ * সম্প্রতি আমাদের সমালোচ্য। ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, পঁচিশ বৎসরেরও বোধ হয় কিছু বেশী পূর্ব্বে। যাঁহারা ২৫।২৬।২৭ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর ঈশ্বরেচ্ছায় আয়ুষ্মান হইয়া অদ্যাপি জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট 'নয়শো রূপেয়ার' পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছুই নাই।

কিন্তু ২৫।৩০ বৎসর কাল বড় কম নয়। তা তত বেশীই বা কি? ২৫।৩০ বৎসরের রাত্রি দিনগুলি অনেকেরই চক্ষের উপর দিয়া এই ত দেখিতে দেখিতেই দ্রুত দৌড়াইয়া গেল; 'সে ত এই ক' দিন বই ত নয়!' আমাদেরই অব্যবহিত অতীতের—অতি নৈকট্যের এবং উপস্থিতিরই ত কত আঁচড় কত দাগ তাহাদের গায়ে মাথায় মুখে বুকে এখনও ঐ দেখা যাইতেছে; ২৫।৩০ বৎসর বেশী দিন আর কি! তথাপি পাটীগণিতের গণনামতে ২৫।৩০ বৎসর কাল একটা শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ বা তাহারও বেশী, বিলক্ষণ দীর্ঘকালই বটে। কাজেই সেই কালের কথা এখন পুরাণ কথারই মধ্যে পরিগণিত বলা যাইতে পারে। কল্যকার কথা যখন অদ্যই অতীত ইতিহাস, তখন কে বলিবে, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথা লুপ্ত উপন্যাসের গুপ্ত কাহিনী নয়, বা তেমনিতর আর একটা কিছু নয়? কাজেই এত দীর্ঘ কাল পরে উহার এই দ্বিতীয় সংস্করণে 'নয়শো রূপেয়া'র পরিচয় নূতন করিয়াই কিছু দেওয়া প্রয়োজন।

'নয়শো রূপেয়া'র প্রথম সংস্করণের সহিত আমাদের এখন বিস্মৃতপ্রায় পূর্ব্বস্মৃতি সংযুক্ত রহিয়াছে। এই সাংঘাতিক সত্যমূলক, হাস্য ও করুণরসমূলক সামাজিক নাটক যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং অভিনীত হয়, তখনও 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' বঙ্গ সমাজে, বঙ্গ সাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর শিক্ষাপ্রণালীতে, ঐরাবত-শক্তি সঞ্চালিত করিতেছিলেন। তখন বঙ্গদর্শনের

* ২ নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

বসন্ত সৌরভে বঙ্কিম বাবুর স্ফুরন্ত গৌরব ঢেউ খেলিতেছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের একত্র-সমবেত অদ্যকার অসংখ্য সিংহ ও শৃঙ্গী হইতে অসংখ্য কাঁচ-পোকা ও পিপীলিকায় গঠিত একটা 'একাডমি অফ্ লিটারেচর' প্রতিজ্ঞা করিয়া, সংকল্প করিয়া, সভাসমিতি করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, শত লোকের শত রকমে লেখনী চালাইয়া, রাশি রাশি রেজলিউশন প্রচার করিয়া যে শক্তি সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইতেছেন না, যে কার্য্যের প্রায় কিছুই করিতে পারিতেছেন না, নয়শো রূপেয়ার প্রথম প্রকাশকালে, সেই শক্তি—সাহিত্যের স্বতঃসংবোধিনী শাসনশক্তি এবং সেই কার্য্য—সাহিত্যে স্বাস্থ্য, সুরুচি, সৌন্দর্য্য ও সংযমপ্রদানের কার্য্য, বিনা সংকল্পে, বিনা প্রতিজ্ঞায়, একক এক ব্যক্তি, জীবিকা-অর্জ্জনের অসীম শ্রমের মধ্যে বিরলপ্রাপ্ত অবকাশকালে কথঞ্চিৎ-পরিমাণে লেখনী চালন করিয়া, একখানি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠার কতিপয় প্রবন্ধ, কতিপয় পংক্তির দ্বারা, যেন এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অবহেলে সঞ্চালন ও সংসাধন করিতেছিলেন। যখন ঈশ্বরচন্দ্র সমাজসংগ্রামে ও সাহিত্য-সংস্কারে অসীম শক্তি বিস্তার করিয়া এক বিন্দু বিশ্রাম অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং অক্ষয়কুমার বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বালীর বনকুটীরে বসিয়া বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে ও 'উপাসকসম্প্রদায়'-সঙ্কলনে নিযুক্ত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র নব্য বাঙ্গালীর নবোত্থিত সাহিত্যের শাসয়িতা সম্রাট এবং 'বঙ্গদর্শন' সেই সম্রাটের শাসনদণ্ড ও সমার্জ্জনী। সম্রাট, সাহিত্যের সৃষ্টি, শাসন ও সম্মার্জ্জন, এ তিনই করিতেছিলেন। শাসন ও সম্মার্জ্জন কেবল সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় নহে, স্বকীয় সুমার্জ্জিত ও সুন্দর সৃষ্টি দ্বারাও করিতেছিলেন। মধুসূদন তখনও জীবিত,—হায়! জীবন্মৃত। 'মেঘনাদ' 'তিলোত্তমা'দি ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিভার প্রভাতসুরভিসমীরে, তখন শিক্ষিত প্রভাবিত ও অশিক্ষিত জাগরিত হইতেছে; সরল, সার্ব্বজনিক ও বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথম সুলভ সাহিত্যপত্র 'সুলভ সমাচার' প্রকাশিত হইয়াছে। হেম বাবুর ও নবীন বাবুর নব কবিতা তখন অগ্নিকণা,—উত্তপ্ত মদিরা উদ্গীরণ করিতেছে; 'বৃত্র', 'পলাশী' ও 'ক্লিওপেট্রা' তখনও বোধ হয় অপূর্ণ পাণ্ডুলিপি,—প্রেসে প্রেরিত হয় নাই। তখন 'সোমপ্রকাশ' রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালা সংবাদপত্র; এখনকার আধবৃদ্ধা 'ভারতী' তখনও ভবসংসার সন্দর্শন করেন নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর দিব্যোজ্জ্বল উপাদেয় কাব্য—অনাদৃত উপেক্ষিত স্বপ্নপ্রয়াণ তখনও অশরীরী স্বপ্নরাজ্যের সীমাতিক্রম করিয়া পৃথিবী পরে

প্রসূনিত হয় নাই। প্রয়াণের প্রথম ক'টি সর্গ বঙ্গদর্শনের বক্ষ শোভিত করিয়াছিল। 'প্রয়াণ'-কারের অধিকতর ভাগ্যবান কনিষ্ঠ ও কবি ভ্রাতা তখন নেহাত 'নাবালক'। বন্ধুত্বপ্রাণ, সর্ব্বজনপ্রিয়, (প্রকৃত) দীনবন্ধুর সুখ্যাতি ও সাহিত্যজ্যোতি তখন বঙ্কিম অপেক্ষাও বেশী। তখনও (জীবনের কখনই বা নয়) প্রথমোক্ত শেষোক্তের সহায় সারথি, সহোদরপ্রতিম। 'নীলদর্পণ', 'লীলাবতী', 'সধবা' প্রভৃতি তাহার বহুপূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যাকাশে নাটকীয় নভোমণ্ডলে দীনবন্ধু তখন সন্তাপহীন দিবাকরবৎ বিচরণ করিতেছিলেন। ঢাকার এখন-বিলুপ্ত 'বান্ধব' তখনও বাহির হয় নাই। দেওয়ান বাহাদুর ও রায়বাহাদুর কালী বাবু তখনও কেরাণী-খানার নিষ্কলঙ্ক কক্ষে বসিয়া বিদ্যালোচনা করিতেছিলেন। চুঁচুড়ার অক্ষয় বাবু তখনও 'শিক্ষানবিশ'। বেঙ্গল দপ্তরের চন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ভাষায় উদিত হন নাই। 'উদ্ভ্রান্তে'র চন্দ্র বাবু বোধ হয় উদিত হইয়া থাকিবেন; লায়ব্রেরি-য়ান শাস্ত্রী মহাশয় তখনও বোধ হয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রী মহাশয় বাহির হইয়া থাকিবেন। পোষ্ট আপিসের বাঁড়ুয্যে মহাশয় বঙ্গদর্শনে বাহির হইতেছেন; বর্দ্ধমানের বাঁড়ুয্যে মহাশয় তখনও জাহির হন নাই;—আরও অনেক মহাশয়ের মত বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনী সার্টিফিকেটের জন্য সাহিত্য-মন্দিরে স্বাস্তয়ন করিতেছেন। বঙ্কিমী দলের কোনও কোনও ছোকরা—এখন যাঁহাদের কেহ কেহ হয় ত নিজের নিজের একটি একটি ছোটখাট দল বাঁধিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমের সই-মোহরের ছাড় পাইবার তারিখের দিন হইতেই বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহারা এখন কেবল বঙ্কি-মের সাহিত্যসংগঠনপ্রণালী নহে, বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বও বুঝি বা বিস্মৃত হইয়া-ছেন, অথবা তাহা উপেক্ষা ও আক্রমণ করিতেছেন; নহিলে বুঝি বা বড় লোক হওয়া যায় না। তখন রাজেন্দ্র লালা (পরে রাজা ও ডাক্তার) বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে সরিয়া গিয়াছেন; পালি, প্রাকৃত, বৌদ্ধ ও প্রত্নতত্ত্বে অল্পায়ু রাজকৃষ্ণ ও হেডমাষ্টার ক্ষীরোদ বাবু পাঠ লইতেছেন। তখন সাহিত্যের স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বিত ক্ষেত্রে শিশির বাবু সমুদীয়মান; তদীয় রাজনৈতিক নবানুরাগ, আকাশ পাতাল ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়াছে; তদীয় স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ তখনও বিষ্ণুভক্তিতে বিভাসিত হয় নাই। 'পত্রিকা' তখনও পুরাপুরি বাঙ্গলাক্ষর-বর্জ্জিত হয় নাই। মিষ্টার রমেশচন্দ্র, বাগ্মী বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারক বিহারী গুপ্তের সহিত তখন বিলাতে 'সার্ভিস্'

ছাত্র। অভাগ্য উপেন্দ্র দাস বোধ হয় শিশিরী দলে তখন বিচরণ করিতেছেন, বিস্মৃত 'শরৎ-সরোজিনী' 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' তখন বাহির হইয়াছিল, বা হইতেছিল, মনে করিয়া বলিতে পারি না। তখন সাহিত্য সাহিত্যই ছিল; সওদাগরী, দূতীগিরী, দোকানদারী, ঝকমারী হইয়া পড়ে নাই। সমালোচনা তখন নরক-বিড়ম্বনায় ও বিকট বিজ্ঞাপনের ঘোষণায়, কপটতায়, কৃত্রিমতায়, চাটুকারিতায়, পক্ষপাতিতায় এবং নীচতায় নামিয়া পড়ে নাই। তখন ইতর সাহিত্য একেবারেই না ছিল, এমন নয়; কিন্তু শিক্ষিত জন ও ভদ্রসন্তানগণ ইতর সাহিত্য লিখিতেন না। ক্বচিৎ লিখিলে সমাজচ্যুত হইতেন, চাবুকে চাবুকে অস্থি চর্ম্ম হারাইতেন। তখন সাহিত্যক্ষেত্র জুয়ার আসর ও বঙ্গীয় পাঠক উপহার-খোর হয় নাই। তখন সাহিত্যে পুরাতনের প্রকৃত সম্মান ছিল, পুরাতনের পঙ্কিল পূতিগন্ধের পূজা ছিল না। তখন সাহিত্যে সুযুক্তি, সুবিচার, স্বাধীনতা, সত্যপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস ছিল, সাহিত্যের ও সমাজের কলঙ্ক ও কুসংস্কার কাটিয়া দিবারই চেষ্টা ছিল; কুযুক্তি, কপটতা, অবিচার, ও অন্ধ উগ্রতা দ্বারা তাহার আবরণ, সমর্থন ও সংরক্ষণ করিবার ও পথে পথে ফেরি করিয়া বেড়াইবার ব্যবসা ছিল না। তখন 'হেঁদুয়ানির' হাম্বারব উঠে নাই। কিন্তু দেশ এখনকার মত তখন এত অধিক অহিন্দু হয় নাই। দৃষ্টান্ত সম্মুখেই দেখ। নয়শো রূপেয়া পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সমাজ-কলঙ্কের চিত্র; সে চিত্রের আসল আজও অক্ষুণ্ণ আছে; তাহার পার্শ্বে আর আসল,—যাহা তখন ছিল না,—এখন হইয়াছে। তখন ডাক-নিলামের মত অত্যুচ্চ হারে, মেয়ে বিক্রয়ের প্রথা থাকিলেও, ছেলে বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হয় নাই। এখন ছেলে মেয়ে, উভয়ই ডাকের দরে, 'হাইয়েষ্ট বিডারে' বিক্রয় হয়। হিঁদুয়ানির হাম্বারব বিক্রেতা ক্রেতা উভয়েরই কাঁধে হাত বুলায়; শুক্রবিক্রয়ের সাংঘাতিক পাপের প্রশ্রয় দিতে 'পশ্চাৎপদ' হয় না; বড় জোর তাহার জন্য 'তৈলবট'-প্রত্যাশায় মাসকড়াই ও কাঞ্চনদানের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করে। তখন, অন্ততঃ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে বৈবাহিক বণিগ্‌বৃত্তি প্রবেশ করে নাই। "আমার মতামত লইয়া আমাকে যে যাহাই বলুক, খৃষ্টানই বলুক আর নাস্তিকই বলুক, আমি শাস্ত্রবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ, আজও এত বয়ে যাই নাই যে, বেণে-বাড়ী মেয়ের বিবাহ দিয়া, জাতি কুল নষ্ট করিতে পারি।" কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উপলক্ষে কোনও কুলীন বরকর্ত্তার নিকট হইতে সোণা রূপা টাকার 'ফর্দ্দ' পাইয়া, শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর ঐ

উক্তি করিয়াছিলেন। সক্রোধে ফর্দ্দ ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া তৎক্ষণাৎ 'পাকা কথা' ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। বরকর্ত্তার ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের অশেষ অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সে কুলে সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই। আত্ম-ইচ্ছায় উক্ত ফর্দ্দ অপেক্ষা আরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়া অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু, এই বিদ্যাসাগরকে এবং তাৎকালিক এই প্রকৃতির শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারী লোকদিগকে আমরাই বলিয়া থাকি অহিন্দু। হাঁ অহিন্দুই বটে! আর আমরাই এখন কেবল হেঁদু।

'নয়শো রূপেয়া' নাটক বাহির হইয়াছিল, শিশিরী দল হইতে। কিন্তু তখন এখনকার মত দলাদলের উপর পুস্তকের গুণাগুণ নির্ভর করিত না। এখন যেমন আত্মীয়ের ও আপনার দলের লোকের অতি অপকৃষ্ট ও অপাঠ্য পুস্তকও আপন আপন পত্রিকায়, প্রশংসাবাদের পৌনঃপৌনিক ঢক্কা-নাদে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবন্ধে, মস্ত ও স্ফীত করিয়া তোলা হয়, এবং অপরের, অন্য লোকের বা অদোলো লেখকের পুস্তক, অত্যুৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইলেও, এক-লাইনী সমালোচনা বা নীরব নিন্দার ঘোষণা করা হয়, বা চাপা কয়েকটা কথার চালাকিতে সব গোল চুকাইয়া দেওয়া হয়, তখন এরূপ রীতি, এরূপ নির্লজ্জতা ও নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান ছিল না। কাযেই তখন সমালোচনার সাহিত্য-মূল্য ছিল; সমালোচনা বলিতে শাফাই সাক্ষী বা 'সেল সার্টিফিকেট' বুঝাইত না; বেভাঁজ বিজ্ঞাপন বলিয়াও লোকে তাহাকে বুঝিত না। কিন্তু এখন ভদ্রলোকে শতকরা সাড়ে নিরনব্বই খানা সমালোচনাকে ঠিক তাহাই বুঝে। সুতরাং এখনকার সমালোচনার আর যত কিছু মূল্যই থাকুক, সাহিত্য-গত মূল্য নাই, সূচ্যগ্রপরিমাণ সম্মানও নাই। পরন্তু ভাল পুস্তকের ও ভদ্রলোকের পুস্তকের আর এখন আদৌ সমালোচনা হয় না। ভদ্রলোকে এবং যে লোকে একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিতে পারে, লিখিবার শক্তি ধরে, সে ব্যক্তি কখনই এতটা আত্মসম্ভ্রমহীন, অজগর কুম্মাণ্ড হইতে পারে না যে, আপন পুস্তকটিকে ভাল বলাইবার জন্য, আপন গুণগৌরবের ব্যাখ্যা ও স্তুতিগান করাইবার জন্য সম্পাদক ও সমালোচকদের ধামা ধরিবে, নিকৃষ্ট ও নিম্নস্তরের লেখকদের দ্বারে দ্বারে, দোকানে দোকানে, উমেদারি করিয়া বেড়াইবে। পরন্তু সেরূপ স্তুতিকীর্ত্তন তাঁহাদের তৃপ্তিদায়কও হইতে পারে না। ভাবুকে ও চিন্তাশীলে, চিন্তাশীলতার সমুজই চাহেন; চিন্তাহীনতার ও রসানভিজ্ঞতার অর্চ্চনা আরাধনা কামনা করেন না। বিচক্ষণ ব্যক্তি বুঝিয়া

ছটা মন্দ বলিলেও ভাল লাগে, কিন্তু অবুঝের বেতালা স্তব স্তুতিতেও গায়ে কেবল জ্বর আসে। তাহাতে কেবল প্রশংসকের উপর নহে, প্রশংসিতের প্রতিও অশ্রদ্ধা হয়। এ কারণেও উপযুক্ত লেখক অযোগ্য হস্তের সমালোচনা চাহেন না; তজ্জন্য গুড়ুক, গোলাপী খিলি ও গায়ে-পড়া 'আপ্যায়িত' ব্যয় করার ত কথাই নাই। কাজেই এখন মার্জ্জিত সাহিত্যের—উন্নত শিল্পের সমালোচনা হয় না; অতএব বিক্রয়ও হয় না। উপস্থিত অবস্থায় না হওয়াই শ্রেয় ও সম্মানকর বটে। কিন্তু তখন এমন ছিল না; দলেরই হউক আর বেদলেরই হউক, তখন বই ভাল হইলেই তাহার আদর হইত; মন্দ হইলেই নিন্দা ঘটিত। কাজেই 'নয়শো রূপেয়া' বাহির হইতে হইতেই সমাদৃত হইয়াছিল, সাহিত্য-সমাজে স্বকীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। কেন না, তখন সে সমাজ বিদ্যমান ছিল। এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্য-সমাজ নাই। অতএব আশ্চর্য্য কি যে, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার-প্রকাশিত আমাদের আলোচ্য এই নাটকের এবার আদর হয় নাই; হইবার সম্ভাবনাও নাই, কথাও নয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণে লোকসমাজের ও সাহিত্য-সমাজের সর্ব্বত্রই উহার যথোচিত প্রশংসা ও আলোচনা হইয়াছিল; যতটা মনে পড়ে, তখনকার নব-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশন্যাল' নাট্যশালায় উহার অভিনয়ও হইয়াছিল। তখনকার সাহিত্য-শাসয়িতা বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম বাবু এও কোং 'নয়শো রূপেয়া' দেখিবামাত্র লুফিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে উহার বিস্তৃত বঙ্কিমী সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। এবং পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি যদি নেহাত প্রতারণা না করিয়া থাকে, সে সমালোচনা বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমের ও নয়শো রূপেয়ার নিজের উপযুক্তই হইয়াছিল।

কিন্তু 'নয়শো রূপেয়া' কাহার টাঁকশালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কোন মস্তিষ্কের মিণ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল, তখন জানা যায় নাই। এই নাটকের উপর উহার লেখকের নাম তখনও ছিল না; এখনও নাই। আমাদের অনুমান এ সম্বন্ধে একান্ত অনির্দ্দিষ্ট, অনিশ্চিত। অন্ততঃ এতকাল পরেও, এই লেখকের—বাঙ্গালা ভাষার এই একমাত্র নাটকলেখকের নাম প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল; আবশ্যকও ছিল। এই অনাবশ্যক অপ্রকাশে নব্য বঙ্গীয় সমাজের ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটা প্রয়োজনীয় কথা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। তা যে মস্তিষ্কের 'মিণ্ট' হইতেই 'নয়শো রূপেয়া' নির্গত হউক, সেটি নিশ্চয়ই নাট্যরসের 'রয়াল মিণ্ট' বটে। এবং সে রয়াল মিণ্টের 'রূপেয়া'

খাদহীন খাঁটি রূপায় এমন রকম খোদিত যে, তাহার মুদ্রণচিহ্ন—মর্ম্মভেদী ছাপ মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। এত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই নয়শো রূপেয়ার নিলামী মুদ্রায় এক বিন্দু মোরচে ধরে নাই; রগ্ রগ্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে; টাঁকশাল হইতে যেন টাটকা তৈয়ার হইয়া আসিল।

সামাজিক চিত্রের হিসাবে 'নয়শো রূপেয়া' একরূপ অতুলনীয়! পরন্তু—সে হিসাবে উহা নিত্য-সংঘটিত প্রত্যক্ষ এক অতি সত্য ঘটনার অত্যন্ত সাংঘাতিক মূর্ত্তি। সংস্কার-উদ্দেশে কাব্যে নাটকে, স্যাটায়ারে ক্যারিকেচারে, যদি সমাজ-কলঙ্ক,—লোকব্যবহারের বিষাক্ত ব্যাধি,—মনুষ্যস্বভাবের অভ্যস্ত অশৌচ আক্রমণ করিতে হয়, উদ্ঘাটন করিয়া লোকচক্ষুর উপর ধরিতে হয়, তবে তাহা এইরূপেই করিতে হয়, এইরূপেই ধরিতে হয়। এমনতর দেদীপ্যমান দৃশ্য, সত্য সরল উজ্জ্বল ও সফল চিত্র-ফটো, লিপিকরের 'ক্যামেরা'য় খুব কমই উঠে। আলেখ্যের হিসাবে ইহা সফল, অনুকৃত দ্রব্যর অবিকল; পরন্তু উহার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ সংশোধন সম্বন্ধেও নয়শো রূপেয়ার লাটবন্দী নিলাম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। আমরা যত দূর জানি, উহা কিয়ৎপরিমাণে, প্রত্যক্ষ ফল-প্রসূ হইয়াছিল। কাব্য-চিত্র ও নাট্য-দৃশ্যের দ্বারা কার্য্যগত ততটা ফল প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু নয়শো রূপেয়ার নিদারুণ অঙ্কুশ, কন্যাবিক্রয়-ব্যবসায়ী বেহায়া বড়ুয়া বামুনের স্থূল চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও তাহার পাংশুল চিত্ত বিকল ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তবে সাহিত্য-শক্তি সমাজের সে স্তরে পঁহুছিবার পথ তখন তত ছিল না বটে, তথাপি, নয়শো রূপেয়ার নিলাম-ডাক যত দূর পঁহুছিতে পারিয়াছিল, তত দূরের বৈবাহিক ক্রয়বিক্রয়ের বিকৃত বিষাক্ত বায়ু যে কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত করিয়াছিল, ইহা বেশ বলা যাইতে পারে।

মধ্য বঙ্গে উক্ত ব্যবসা, বোধ হয়, কিছু মন্দা হইয়া থাকিবে। উত্তর-বঙ্গে কিন্তু এখনও ঐ ট্রাফিকের খুব খর তেজ। বহু গৃহস্থ বটু, গৃহিণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণীহীন। উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গে, পদ্মার, মেঘনার ও কর্ণফুলীর কূলে কূলে, পশ্চিম বঙ্গেও বটে,—কোন্ বঙ্গেই বা নয়?—বঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জুরিস্‌ডিক্সন্ জুড়িয়া, নয়শো রূপেয়ার বহুল ও বিস্তৃত প্রচার বাঞ্ছনীয় ও অভিনয় ও আবৃত্তি আকাঙ্ক্ষণীয়; অনুবাদ প্রয়োজনীয়। স্বয়ং শিশির বাবু ইহার একটা ইংরাজী অনুবাদ করুন না কেন? উহার হিন্দী অনুবাদ করুন, আমাদের বঙ্গবাসী আফিসের অমৃত বাবু। দেশের যাবতীয় বাঙ্গালা ও অন্যান্য

বার্ণাকুলার পত্র পত্রিকা প্রকাশকের অনুমতি লইয়া, নয়শো রূপেয়া ক্রমশঃ আপন আপন অঙ্গীভূত করুন। 'রূপেয়ার' ইংরেজী অনুবাদ অমৃত পত্রিকাতেই অগ্রে প্রকাশিত হউক না। সিডিসন্ আইনে সকলেরই ত প্রায় 'সে পাঠ' উঠিয়া গিয়াছে; এখন এই পাঠই কিছুকাল চলুক না? কাপির অভাবে অনর্থক আপনাদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি না করিয়া, কুলেখকের কদর্য্য রুচি ও জঘন্য রচনা না ছাপাইয়া, বরং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, নাটক, নভেল—নিদেন পাঁচালী, পীরের গান, ছেপে দেওয়াই শ্রেয়। তাহাতে পুরাতন গ্রাহক রক্ষা ও নূতন গ্রাহকও কিছু কিছু আমদানি হইতে পারে। আমরা সত্যপাঠপূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি, নয়শো রূপেয়ায় নূতন গ্রাহক ও নগদ বিক্রয় নিশ্চয়ই বাড়াইবে।

নয়শো রূপেয়ার উৎপত্তিস্থান মধ্য বঙ্গে, সভ্য ও শিক্ষিত বঙ্গে, নয়শো রূপেয়ার আদান প্রদান অভিনয় বিনিময় বিলক্ষণই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব দূরবঙ্গের বটু বামুন, কায়েত, অশিক্ষিত শূদ্রাদি অসংখ্য হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে ও নিম্নতলে, এখন এই নয়শো রূপেয়া পৌঁছান উচিত। পরন্তু, সভ্য ও ভব্য বঙ্গের উপস্থিত ব্যাধির প্রশমনার্থ প্রয়োজন যেরূপ, তাহাতে কিন্তু নয়শো রূপেয়ার অনুরূপ অপর ঔষধও আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে, এখন কেবল নয়শো রূপেয়া প্রচুর নয়; 'নয় হাজার রূপেয়া' বা 'নয় লাখ রূপেয়া' গোছের একটা লাটবন্দী নিলাম চাই। কিন্তু তাহাতেও কি নির্লজ্জ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লজ্জা হইবে? অশিক্ষিত লোকে অশিক্ষিতা কন্যার বিবাহ দিয়া বা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ বাধ্য হইয়াই লইত, বা লয়; যে অর্থের অত্যুচ্চ পরিমাণ 'নয়শো রূপেয়া'। ইহাকে বিবাহ, বিক্রয় বা বিনিময়, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। কিন্তু ইহার মূলে কেবল বিকৃত সমাজপদ্ধতির নয়, অবিকৃত অর্থনীতির একটি অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নিহিত। যে পিতা দুহিতা বিক্রয় করিয়া অর্থ লয়, জানা আবশ্যক যে, সে পিতা অর্থ দিয়া পত্নী ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং পত্নী এ স্থলে Reproductive capital অর্থাৎ উৎপন্নসম্ভাব্য মূল ধন। যে ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া একমাত্র stock in trade পত্নী ক্রয় করিয়াছে, সে সেই পত্নীপ্রসূত কন্যাধন বিনিময় না করিয়া খায় কি, এবং তাহার পত্নীক্রয়ার্থ অর্থের পূরণই বা হয় কিসে? অর্থের সদ্ব্যবহার কেবল বাণিজ্যেই হয়। বাণিজ্য ব্যতীত যে কিছু অর্থব্যয়, তাহার প্রায় অধিকাংশই অপচয়। সেই অর্থই সার্থক, যে অর্থ

উৎপাদনক্ষম ও যাহা হইতে অর্থাগম হয়। ইহা অর্থনীতির সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম। অতএব পত্নীক্রয়কারী কর্ত্তৃক কন্যাবিক্রয়ে সমাজনৈতিক নীচতা যতই হউক, উহা অন্ততঃ অর্থনৈতিক ব্যভিচার নহে, এবং অবৈধ ব্যবসাও নহে। যাহা হউক, ইহা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামাজিক পাপ। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় কি করিতেছেন? যাহা করিতেছেন, সকলেই জানেন, সে জানা যেমন তেমন জানা নয়, মর্ম্মভেদী জানা। শিক্ষিত পিতা, শিক্ষিত পুত্র, দুইই পুরা পুণ্যশ্লোক; প্রথম পুণ্যশ্লোক, দ্বিতীয় পুণ্যশ্লোকের পরিণয়-বাণিজ্যে, অর্থ-ব্যবহারের মৌলিক আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যে বিপুল অর্থরাশি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহার তুলনায় অশিক্ষিতের কন্যা-নিলামের 'নয়শো রূপেয়া' নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহা পেশো ও বেপেশো বরের বাপের ও বাপের বধূর বাণিজ্য বটে; কিন্তু নেহাত অবৈধ বাণিজ্য। ইহা বিক্রয়ও নয়, বিনিময়ও নয়, খাঁটী প্রতারণা। ইহার পালটাও অবশ্য আছে বটে। না থাকিবে কেন? কিন্তু সেটা শেয়ানায় শেয়ানায় বা শয়তানে শয়তানে কোলাকুলী; সুতরাং সে ক্ষেত্রে 'নয়শো রূপেয়া' অপেক্ষা আরও অধিক চোকাল ও চিক্কণ চাবুক আবশ্যক।

'নয়শো রূপেয়া' সাহিত্যাংশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতি সরল সহজ সাদামাটা চলিত কথায়, কথা কহার গন্ধে, ইহার আপাদমস্তক গঠিত। লেখক যেন একই নিশ্বাসে এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। ইহা পাঠ করিতেও হয়, একই নিশ্বাসে; পাঠসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেন পুনঃ নিশ্বাস গ্রহণ করা যায় না। পাঠসমাপ্তির পরেও ইহা পুনর্ব্বার পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হয়। অথচ এই নাটকে এক লাইন কবিতা নাই; একটিও গান নাই; এক বিন্দুও ভাল লেখার ভাণ নাই। ভাষার ও ভাবের রং ফলাইবার চেষ্টামাত্রই নাই। এ সকলের কিছুই ইহাতে নাই; আছে কেবল নাটক, নিভাঁজ নাটক, নাটকীর রূপ, রস, স্পর্শ, নাটকীয় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ইহা পূর্ণ। ক্রিয়ার প্রতিরোধক ও ক্রিয়াবিহীন ভাব ও ভাবুকতার প্রতিপোষক একটি বাক্য, একটি বর্ণও প্রায় ইহাতে নাই। ক্রিয়ার, কথার ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নাটকীর কার্য্যস্রোত অঙ্কে অঙ্কে অবাধগতিতে ছুটিয়া গিয়াছে, এবং কেবল তাহারই সহায়তায় সমগ্র 'প্লট' ও নাট্যক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগের প্রকৃতি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। রঙ ফলাইতে, রস নিঙ্গড়াইতে, রসিকতা চালাইতে, রূপ রগড়াইতে ও বৃথা বাক্যব্যয় করিতে লেখক কোথাও ক্ষণেকের জন্য উপ-

বেশন করেন নাই। এক দৌড়ে গড় গড় করিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গেই যাহা কিছু শুনাইবার, যাহা কিছু দেখাইবার, সবই শুনাইয়াছেন, সবই দেখাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সঞ্চালন করিয়াছেন, শরীরের শিরা ধমনী নাচাইয়াছেন, এবং হাস্যকরুণবীভৎসাদি ভাবের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অত্যল্প স্থানে, নাটকীয় নির্দ্দিষ্ট অত্যল্প সময়ে, এ সবই হইয়াছে; সেই সঙ্গে শ্লেষের সুতীক্ষ্ণ চুম্বন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অব্যর্থ বিরেচন এবং চিত্র ও চরিত্রের বিচিত্র অঙ্কন আছে। কবিত্বের করতপ নাই, কল্পনার কচকচি নাই, জল্পনার ইতস্ততঃ নাই, উদ্ভটের অবতারণা নাই; সবই সত্যের—প্রত্যক্ষের প্রতিকৃতি, মানুষমানুষীর রক্ত মাংসের মূর্ত্তি; সবই সত্য, দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষবৎ সটান যাইয়া মস্তিষ্ক ও মন স্পর্শ করে। 'নয়শো রূপেয়া' নিশ্চয় সজীব, 'রিয়ালিষ্টিক', অথচ রোমাণ্টিকের রেখা,—অরুগ্ন রেখা উহাতে অলক্ষিত নয়।

আমাদের বিবেচনায় ও আমরা যাহা শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি, তাহার আলোচনায়, ঐ গুলিই নাটকের প্রথম উপকরণ ও প্রধান লক্ষণ। এবং সেই কারণেই আমরা বলিয়াছি, 'নয়শো রূপেয়া' নাটক যথার্থই নাটক; নিছক নিরবচ্ছিন্ন নাটক। পুনশ্চ এখন আমরা বলিতে পারি, উহা হয় ত অদ্য তারিখ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র নাটক। কেন না, অমনতর রকমের দ্বিতীয়টি আমরা দেখি নাই। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমও এ পর্য্যন্ত পাঠ করি নাই।

'নয়শো রূপেয়া' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ভাষায় তত্ত্ব অধিক সংখ্যক নাটক প্রচারিত হয় নাই। যতগুলি হইয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই বোধ হয় আমরা দেখিয়াছিলাম। সেই সবগুলির শ্রেষ্ঠতরগুলি কাব্যাংশে বা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-গুণে 'নয়শো রূপেয়া' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; শ্রেষ্ঠই বটে; কিন্তু নাটকত্বে একমাত্র 'নীলদর্পণ' ব্যতীত তাহাদের কোনটিই উহার নিকটে পৌঁছে নাই বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু 'নয়শো রূপেয়া' প্রথম প্রকাশের পরে, উহার দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে, বাঙ্গালা ভাষায় বহু শত নাটক প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইয়াছে; রঙ্গালয়ের অনিবার্য্যপ্রয়োজনপূরণার্থ প্রায় নিত্য নিত্য নূতন নাটক দেখা দিতেছে। এখন প্রতি বৎসর বড় দিনে পাঁচ সাত খানা করিয়া নূতন নাটক ও প্রহসন প্রকাশিত হয়, ছোট দিনেও সেই

পরিমাণে হয়; মেজো দিনেও কোন না হয়? নিত্য নৈমিত্তিক পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে হয়, সংবাদপত্রের সুর ধরিয়া হয়, আন্দোলনস্রোতের গতি দেখিয়া হয়, থিয়েটারগামীদের মন ও মেজাজ বুঝিয়া হয়, আজব সহরের হুজুক বুঝিয়া হয়, পরন্তু ইংরেজী ও বাঙ্গালা বৎসরের হিসাব ধরিয়া নূতন নূতন নাটক লিখিত, গীত, অভিনীত হইয়া থাকে; "মর্ত্তিত" (?) হইয়া থাকে; পঠিত হয় কি না, জানি না। কিন্তু তখন কোথায় এত হইত? ইহার শতাংশের একাংশও তখন ছিল না। 'নয়শো রূপেয়া' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালার কেবল সবে মাত্র নূতন সৃষ্টি হইতেছিল। তখন বিডন ষ্টীটে রঙ্গমঞ্চের বাজার বসে নাই; কর্ণওয়ালিসে, মেছোবাজারে, চিতপুরে, বৌবাজারে, নেটিভ কলিকাতার এত পল্লীতে ও অলি-গলিতে পাবলিক ও প্রাইবেট "ষ্টেজ" উত্থিত হয় নাই। কিন্তু এখন সৌভাগ্যক্রমে আর সে দিন নাই। কলিকাতা ত রাজধানী, সমগ্র ভারতের মহা মেট্রোপলিস। জিলা ও মহকুমার সদর ত সজ্জিত সহর, বৃহৎ স্থান। এ সকল 'মহস্বর' মোকামে রঙ্গালয় নাট্যবৈঠক ত হইয়াছেই। অজ পাড়াগাঁয়েও এখন সি-ই-ন উঠে, কনসর্ট ছুটে, করতালি, ক্যাপিটাল, এনকোর আদির আদান প্রদান হইয়া থাকে। যাত্রার দল এখন হাফ থিয়েটার। পল্লীগ্রামের খোকা খুকীদের খেলাঘরেও আজকাল ঝম্প, কম্প, মূর্চ্ছা, পতন ও নেপথ্যাদির বালস্বভাবসুলভ নকল দেখিয়া সুখহাস্য সংবরণ করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি যে, এই সব কচি ছেলেপুলের পিতামহগণ কখনও নাট্যশালা, রঙ্গালয় ও নাটকাভিনয়ের নামও শুনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, এখন তখন অপেক্ষা রঙ্গশালা ও নাট্যকলার কতই বিস্তার, বিকাশ, স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি হইয়াছে। অতএব ইহাতে আশ্চর্য্য আর কি যে, এখন তখন অপেক্ষাও নাটকের সংখ্যা শত গুণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বয়ঃক্রমের পরিমাণে যে ইহা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই নয়; অবিশ্রান্ত নাটকাভিনয়ের অনুপাতেই নাট্যসাহিত্যের স্রোত বহিতেছে। এখন কেবল থিয়েটারের অধিনেতা, আচার্য্য, অধ্যক্ষ, এক্টর ও ম্যানেজারেরাই নাটক লিখেন না, থিয়েটারের বাজার-সরকার ও বিজ্ঞাপনবরদারেরাও নাটক লিখিয়া থাকেন, এবং তাহা কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়া অভিনয় করা হয়। নূতনের প্রয়োজনীয়তা এখন এমনি প্রবল যে, রঙ্গগৃহের

পানওয়ালা ও পানীওয়ালারাও ক্রমে 'প্লেরিট' হইতে পারে। তা হউক; ফলতঃ কথা এই যে, ঐ সকল কারণের সমবায়ে সংখ্যার হিসাবে নাটক এখন আমাদের অনেক হইয়াছে, এবং প্রতি বৎসরেই সেই সংখ্যার অঙ্ক স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। আমরা এখনকার এত অধিক নাটক পুস্তকের ও নাট্য প্রহসনের উত্তম ও অধম কতকাংশ অবশ্যই কিছু কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি বটে; কিন্তু তাহাদের বহুসংখ্যকই দেখার, শুনার বা পাঠ করার অবসর ঘটে নাই। কেন না, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ মনুষ্যজীবনের অবকাশ সেই পরিমাণে বা ততোধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ। সুতরাং বাতিকসত্ত্বেও এখনকার বহুসংখ্যক নাটকই আমাদের দেখা ঘটিয়া বা জুটিয়া উঠে নাই। যাহা দেখি নাই, তাহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ কিছুই বলা চলে না। হইতে পারে, তাহাদের ভিতর সেক্সপীয়র, মোলিয়ার, কালিদাসাদির অমর কীর্ত্তি আছে। কিন্তু সে কীর্ত্তির কথা অদ্যাবধি কাহারও মুখে শুনি নাই। শুনিলে অবশ্য সে কীর্ত্তিপ্রসূ নাটক কয়েকটি আনাইয়া দেখিতাম, অথবা আপনারাই নিজে যাইয়া তাহাদের 'রসোদ্গার' দেখিয়া আসিতাম। পক্ষান্তরে, আমরা এখনকার যত নাটক দেখিয়াছি, তাহাদের কতকটিতে নানারকমের গুণপনা, রূপ রসের অবতারণা ও পাকা হাতের রচনা আছে;—তাহাদের কোন কোনটিতে মৌলিকতা ও প্রকৃত নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যাংশে, কল্পনাংশে, রচনাংশে, অভিনয়ের ও আমোদপ্রদানের উপযোগিতাংশে, পরন্তু প্লট প্রভৃতির পারিপাট্যে, ঘটনাদির বৈচিত্র্যে, চিত্রাদির অঙ্কনে, গন্তপন্তাদি ভাষার সংগঠনে, হইতে পারে,—না হইবেই বা কেন?—এখনকার বহু নাটকই, নয়শো রূপেয়া অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এত দিনের শিক্ষায়, প্রতি রজনীর পরীক্ষায়, শত রকমের সংঘর্ষণে ও সম্মার্জ্জনে, অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ হইবারই কথা। কিন্তু নাটকাংশে—নাটকীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ও নাটকীয় কার্য্যের নিয়মীকরণের হিসাবে, এখনকার একটি নাটকও 'নয়শো রূপেয়া' নাটকের সমকক্ষ নাটক নহে—নিকটস্থ নাটকও নহে। ইহা আমাদের নিজের অভিমত, অতএব ইহা অভ্রান্ত বা প্রমাদশূন্য, এমন কথা নিশ্চয়ই বলি না। পরন্তু, এই অভিমত অবিসংবাদী হইবে, এমন আশাও করি না। তবে পূর্ব্বাপর বিবেচনা ও যথাসাধ্য বিচার করিয়া, এবং অপক্ষপাত ও নিঃস্বার্থ সাহিত্য সমালোচনার সম্মানসংরক্ষার ঐকান্তিক আবশ্যকতা সর্ব্বথা স্মৃতি-পথে রাখিয়া, আমরা ঐ অভিমতে উপস্থিত

হইয়াছি; বিনয়-নম্রতাসহকারে কেবল এইমাত্রই বলিতে পারি। এইমাত্র বলিতে পারি, অতএব সেই জন্যই বলিয়াছি যে, নাট্যাংশে 'নয়শো রূপেয়া' বুঝি বা একমাত্র বাঙ্গলা নাটক; হায়! সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বাঙ্গলা নাটকের সংখ্যা এত অল্প;—এবং এত অল্পসংখ্যক নাটক, নাটকের প্রকৃত-লক্ষণসমন্বিত ও সে বিষয়ে সমালোচনার সমুচিত বিশ্লেষণ সহ্য করিতে পারে। 'নয়শো রূপেয়া',—যাহার কিঞ্চিৎ নাটকত্ব আমরা স্বীকার করিয়াছি, নিজেও সর্ব্বাংশে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সমালোচনা সহ্য করিতে সক্ষম নহে, ইহাও স্থির। তবে উহার অন্যান্য ত্রুটী ও অভাবাদি সত্ত্বেও নাটকত্বের লক্ষণ কিঞ্চিৎ আছে বলিয়াই উহাকে খাঁটি নাটক বলিতেছিলাম; ফল কথা এই যে, অনেক পুস্তক, যাহা নাটক-নামে অভিহিত, নট নটীর কথোপকথনে, কবিতায় ও গীতাদিতে অভিনীত, অলঙ্কারকর্ত্তাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে বা তাহার ব্যভিচারে অঙ্কে গর্ভাঙ্কে বিভক্ত হইয়া বিরচিত ও গঠিত, তাহা নাটকীয়-শরীরধারী শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সেই শরীর-ধর্ম্ম-লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, নাটকীয় আত্ম-সমন্বিত নহে, সুতরাং আত্মহীন মৃত বা সজীব (কেন না শোণিত জীবাণু-শক্তি থাকিলে, আত্ম-বিরহিত সজীবতা একবারেই অসম্ভব নয়) শরীরের মত প্রকৃত বা মৌলিক নাটকত্ববিহীন; অতএব নাটক নহে, বা নাটকীয় শরীরমাত্র। কিন্তু এই সকল নাটকাভিধেয় পুস্তকের অনেকানেক পুস্তক নাটক না হইলেও, অন্য রকমের, অর্থাৎ নাটকীয় দেহে নভেল কাব্যাদির আত্মযুক্ত উৎকৃষ্ট রচনা, প্রীতিদায়িনী ও ভাবোদ্দীপনী রচনা; কেন না, তাহাতে শক্তি, সৌন্দর্য্য ও সজীবতা, এ সবই বিদ্যমান; অবিদ্যমান কেবল নাটকীয় আত্মা। নাটক না হইয়াও রচনা মনোমোহিনী, হৃদয়স্পর্শিনী, নবরসময়ী হইতে পারে; অধুনা স্থলবিশেষে ক্বচিৎ তাহা হইতেছেও বটে। আমাদের পূর্ব্বতন বাঙ্গলা নাটকে সাধারণতঃ নাটকত্ব অপেক্ষা মনোমোহিনী রচনার দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখা হইত; আমাদের অধুনাতন নাটকে, নাটকত্ব অপেক্ষা 'ষ্টেজ এফেক্টে'র দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা হয়। সুতরাং বঙ্কিম বাবু বলিতেন,—সমীচীন সমালোচকমাত্রেই বলেন,—বাঙ্গলা ভাষায় নাটক নাই; অথবা খুব অল্পই আছে। পূর্ব্বতন নাটক চমৎকার পাঠোপযোগী হইত। অধুনাতন নাটক রঙ্গমঞ্চের অভিনয়েই খুলে; পাঠকালে তাহাতে প্রায়ই মন ভুলে না; পাঠোপযোগী তাহা প্রায়ই হয় না; কিন্তু অভিনয়োপযোগী হয়। 'নয়শো রূপেয়া' নাটকে আমরা ইত্যগ্রেই উল্লেখ

করিয়াছি, মনোহারিণী রচনা বা তদনুরূপ কোনও গুণপনা নাই; তাহাদের প্রতি লক্ষ্যই নাই; কেবল নাটকীয় আত্মা আছে; সাক্ষাৎসম্বন্ধে একটি সামাজিক অতি অপকৃষ্ট প্রচলিত প্রথা অঙ্কিত করিতে গিয়া, উহা হয় ত যেন লেখকের অজ্ঞাতেই নাটকীয় আত্মায় প্রভাবিত হইয়া উঠিয়াছে।

'নয়শো রূপেয়া' নাটক মিলনান্ত মিষ্টকাহিনী বা সিরিও-কমিডি; সুতরাং বলা বাহুল্য, শোকান্তের বা বিয়োগান্তের দারুণ করুণ ছায়া—ট্রাজিডির তীব্র আগ্নেয় তাপ, দৃষ্টাদৃষ্টের প্রারব্ধ ও পুরুষকারের সংঘর্ষ সংগ্রাম এবং তদুপযোগী উচ্চ অঙ্গের নাটকত্ব নয়শো রূপেয়ায় নাই;—তাহার নিজের সজাতীয় অধিকার সীমার মধ্যেও তাহা নয়। সাধারণ মনুষ্যসমাজের 'রিয়ালিষ্টিক' রাজ্যে লোকপ্রচলিত উপ বা অপ-প্রথার নিত্য নৈমিত্তিক প্রত্যহিক ঘটনার বিবৃতি, বর্ণনা ও আলোচনাসূত্রে, যে প্রকৃতির নাটকত্ব উৎপন্ন হইতে পারে,—নাটকে ও প্রহসনে পরস্পর সাক্ষাৎ ও সংমিলনসূত্রে যে রকমের নাটকত্ব জন্মিতে পারে, 'নয়শো রূপেয়া' সেই শ্রেণীর নাটকত্ব-যুক্ত নাটক। 'রূপেয়ার' অনেকানেক গুণের কথা আমরা বলিয়াছি; উহার দোষের কথা কিছু বলিতে হইলে, মোটের উপর কেবল এই বলা যায় যে, উহা স্থলবিশেষে এবং অবশ্য স্থলবিশেষের উত্তাপাধিক্যের হেতুতেই, একমাত্রা অসংযত, একমাত্রা অনাবশ্যক অশ্লীল। নাটকেই হউক—সাহিত্যের ও শিল্পের যে অঙ্গেই হউক, অসংযম,—অসংযমজনিত অনাবশ্যক অশ্লীলতা অসমর্থনীয়।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

মোহনলাল।

পলাশী যুদ্ধের মোহনলাল, কবি নবীনচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনীর কল্যাণে আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। কবি কয়েকটি ঐতিহাসিক চিত্র বিকৃতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া, আজকাল কিছু গঞ্জনা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মোহনলাল প্রকৃত মোহনলালের সুস্পষ্ট চিত্র—এ বিষয়ে কোনও কঠোর ঐতিহাসিকেরও তাঁহার সহিত মতভেদ হইতে

পারে না। স্বয়ং মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন ইহার সাক্ষী। মুসলমান ঐতিহাসিক, বাঙ্গালী বীর মোহনলালের বীরত্বকাহিনীর অপলাপ করেন নাই। তাঁহার অযথা গর্ব্ব প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াও দক্ষতার উপযুক্ত সম্মানই করিয়াছেন। আপাততঃ ইতিহাস-সমালোচনায় মোহনলাল আমাদের পর হইতে চলিয়াছেন, তাঁহার মোহন মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কলঙ্কের ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সেই জন্যই তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার সময় উপস্থিত।

সিরাজের রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মোহনলালকে দেখিতে পাই। মুতাক্ষরীণ-কার বলিতেছেন, 'মোহনলাল পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলার নিজের দেওয়ান ছিলেন।' এ দেওয়ানী সিরাজের যৌবরাজ্য অবস্থায়, স্পষ্টই অনুমিত হয়। সিরাজ নবাব হইয়াই তাঁহাকে 'দেওয়ানই-আনি' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিত্ব-পদে উন্নীত করিলেন। রাজকার্য্যপর্য্যালোচনার জন্য সকল বিষয়ের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। তাঁহাকে মহারাজ উপাধি ও তৎসহ নবাবী প্রথামত সম্মানসূচক ঝাণ্ডা, নকড়া, ঝালরদার পাল্কী প্রদত্ত হইল। সেই অবধি তিনি পাঁচ-হাজারী মনসবদারী ও (সেনানায়কত্ব) প্রাপ্ত হইলেন। (১) কিন্তু মোহনলালের এই উন্নতিই সিরাজ উদ্দৌলার অধঃপতনের বীজবপন করিয়া রাখিল। হতভাগ্য সিরাজের প্রতি অনুকম্পার মাত্রা যতই কেন বর্দ্ধিত করা যাউক না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, একে তাঁহার যৌবনসময়োচিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে প্রবীণ মন্ত্রিবর্গ পূর্ব্বাবধিই বিরক্ত ছিলেন; তাহার পর সিরাজ উদ্দৌলা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই, প্রবীণগণকে উপেক্ষা করিয়া, মীর মদন ও মোহনলালের মত অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ দুই জন ব্যক্তিকে, সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত করিলেন। এইরূপ অবিমৃশ্যকারিতার সহিত নিজের বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারপ্রদান সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই মীরজাফর, প্রবীণ মন্ত্রী রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি দরবারের প্রধান সদস্যবর্গের অসন্তোষের মূল কারণ। (২) মোহনলাল সহজ বীর, স্বীয় দক্ষতার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; তাহাতে আবার তিনি নবাবী দরবারের মোলায়েম কায়দায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত,—প্রবীণগণের মুখ চাহিয়াও কাজ করিতেন না।

---

(১) Mustafa's Mutaqherin vol I. p. 717.

(২) Mutaqh-Trans vol I. p. 718.

এই জন্যই গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, তাঁহার সগর্ব্ব ব্যবহারই প্রবীণ মন্ত্রী দলের মনোভঙ্গের প্রথম কারণ।

মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদক মুস্তাফা নামক জনৈক স্বধর্ম্মত্যাগী ফরাসী মুসলমান, রাজা মোহনলাল সম্বন্ধে প্রবাদমূলক এক অলীক অপরাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (৩) তিনি বলেন, 'মোহনলাল সিরাজ উদ্দৌলাকে আপন ভগ্নী উপহার দেন; এই ভগ্নী এ দেশের এক আদর্শ-সুন্দরী; অতি তন্বঙ্গী।' ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রবাদ বলিয়াই এই টীকার সার সংগ্রহ করিয়াছেন; প্রভুর অতিবিশ্বস্ত ও উপকারী ভৃত্য বলিয়াও টীপ্পনীতে এই সঙ্গে মোহনলালের উল্লেখ করা হইয়াছে। (৪) মুতাক্ষরীণ, রিয়াজ্-উস্-সালাতিন বা অন্য কোনও দেশীয় ইতিহাসে এ কথা নাই। যদি ভগিনীদানই মোহনলালের উন্নতির কারণ হইত, তাহা হইলে কোনও মুসলমান লেখক যে এ কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন, এমন বোধ হয় না। গোলাম হোসেন সিরাজের চরিত্রবর্ণন বা মোহনলালের কথায় গ্রন্থের অনেকাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। মোহনলালের ভগ্নী সিরাজের পত্নী বা বাঁদী হইলে, তাঁহার লেখনীতে এ ঘটনা বাদ পড়িত, ইহা সম্ভব নহে। আমাদের বিশ্বাস, সিরাজ ও মোহনলালের পতনের পর, গুজবপ্রিয় মুর্শিদাবাদ সহরের নিম্ন শ্রেণীর কোনও মুসলমানী আড্ডায়, মুস্তাফা এই মূল্যবান গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার অলীকত্ব সম্বন্ধে পরে বিচার করা যাইবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের রাজসাহীর বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার নবপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'য় মোহনলালের উপর অনেকটা নিগ্রহ করিয়াছেন। (৫) তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ মোহনলালের নাম অনেকের সুপরিচিত। বাঙ্গালী কবি তাঁহার বীরত্ব বর্ণন করিতে গিয়া যে সকল কবিতা প্রসব করিয়াছেন, তাহাও অনেকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু মোহনলাল হিন্দু হইয়াও কি উদ্দেশ্যে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন ও জীবনরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কবি তাহার মূলতত্ত্ব আলোচনা করেন নাই।" এই মুখবন্ধের পর এক জন প্রতিভাশালী

(৩) Mutaqh-Note vol I. p. 717.

(৪) Stewart's Bengal p. 309.

(৫) সিরাজদ্দৌলা; ৬৯—৭৫ পৃঃ।

ঐতিহাসিক সে তত্ত্ব হস্তে লইলেন; কিন্তু তিনি এখানে সুবিচার করিলেন কি না, এখনও অনেকের সন্দেহ রহিয়া গেল। তিনি বলেন, "মোহনলাল এক জন সামান্য অবস্থার লোক। নবাব সরকারে তাঁহার কোনই পদগৌরব ছিল না। সিরাজদ্দৌলা যখন যৌবনোন্মাদে মত্ত, সেই সময়ে যে সকল লোক দলে দলে তাঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিল, মোহনলাল তাঁহাদেরই এক জন।" অতঃপর মোহনলালের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভগ্নীও আসিয়া সিরাজের অন্তঃপুরে উপনীত হইল; মোহনলালের ন্যায় আরও কত লোকে এইরূপে সিরাজদ্দৌলার উপর আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহাতে মোহনলালকে যে এক জন নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি মানবপশুরূপে প্রদর্শন করা হইল, স্নেহভাজন সিরাজের দিকে একটু টানিতে গিয়া গরীব মোহনলালের মস্তকে যে লগুড়াঘাত করা হইল, আমাদের মিত্র মৈত্র মহাশয় তাহা লক্ষ্যই করিলেন না। যে ব্যক্তি যৌবনে সিরাজের পাপলিপ্সার অযথা সাহায্য করিয়া ভগিনী-উৎসর্গে সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিল, লোকে তাহাকে কি ভাবের "বীরপুরুষ" বলিয়া ভাবিবে? সে কিরূপ "সমাদরের" পাত্র, বন্ধুবরই বলিতে পারেন! কোনও ইতিহাসই তাঁহার এ উক্তির সমর্থন করে না। মোহনলাল অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ; সিরাজের নিজের দেওয়ান ছিলেন, এইমাত্র নির্দ্দেশ আছে। সিরাজের যৌবরাজ্যসময়ে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ যে স্বয়ং মোহনলালকে দেওয়ানী পদে নিয়োগ করিয়া যান নাই, তাহার প্রমাণাভাব। অক্ষয় বাবু পরে রাজা মানসিংহের সহিত মোহনলালের তুলনা করিয়াছেন, এবং টীকায় আমার "নবাবী আমলের হিন্দু কর্ম্মচারী" (সাহিত্য; ১৩০২) প্রবন্ধে মোহনলালের "অপবাদ" সম্বন্ধে ইঙ্গিত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "আমরা ইহাকে অপবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি; রাজা মানসিংহ এবং মোহনলাল উভয়েই সমাদরের পাত্র। মোগলকে ভগিনী দান করিয়াছেন বলিয়া বীরত্ব গৌরব অবসন্ন হইতে পারে না।" মুসলমানের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিলে গৌরবহানির সম্ভাবনা না থাকিতে পারে; কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে কি একরূপই দাঁড়াইতেছে? যদি বলা যায়, মুস্তাফার "Made a present" মানে বিবাহ দেওয়া হইল, আর কিছু নয়, তাহাতে অন্যের বড় একটা আপত্তি না হইতে পারে। (৬) কিন্তু বন্ধুবর যে ভাবে এই অপবাদ দেখাইলেন, তাহাতে আর

(৬) সিরাজের ইতিহাসে যে, দুই এক স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই, সেই

বলিবার কথা কি থাকিল? যাহা হউক, মোহনলালের ভগ্নী সিরাজের বিবাহিতা পত্নী মনে করিয়া লইলে কি হয়, দেখা যাউক। বাঙ্গলা দেশে কিন্তু নবাবী রাজজামাতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অভাব!

ইতিহাসে আমরা সিরাজ উদ্দৌলার দুই পত্নীর উল্লেখ পাই। ১ম, তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, মির্জা ইরেজ খাঁর দুহিতা। ২য়, লুৎফউন্নেসা, সিরাজের জারিয়া বা ক্রীতদাসী। প্রথমা পত্নীর কথা কেবল বিবাহের সময়েই পাওয়া যায়; নামনির্দ্দেশ নাই। লুৎফউন্নেসাই তাঁহার প্রণয়িনী, জীবন মরণে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী। সিরাজ একবার বৃদ্ধ মাতামহের উপর অভিমান করিয়া যখন বলপূর্ব্বক পাটনা-অধিকারে যাত্রা করেন, তখনও লুৎফউন্নেসা তাঁহার সঙ্গিনী; আবার পলাশী যুদ্ধের পরে পলায়নের সময়েও লুৎফউন্নেসাই তাঁহার অবলম্বন। (৭) উমদৎউন্নেসা নামে সিরাজের আর এক পত্নীর কথা প্রথমে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিভারিজ সাহেব ১৭৯১ সালের নিজামত রেকর্ড হইতে উদ্ধার করেন। (৮) আমরা পরে এ সম্বন্ধে সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা এই:—১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর উমদৎউন্নেসার উকীল মীর ফতে আলি, লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট এক দরখাস্ত করিতেছেন; তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, আমার মক্কেল নিজামত ফণ্ড হইতে ৪৫০ টাকা পেন্সন পান, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাকী ১১০৯৩৷৶০ দাঁড়াইয়াছে, এই টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হউক। ইতিপূর্ব্বে প্রতিনিধি গবর্ণর ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের নিকটও এক দরখাস্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৮৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রের ইংরাজী অনুবাদে প্রকাশ যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের অনুগ্রহে রেসিডেণ্ট স্পীক সাহেব উমদৎউন্নেসার পেন্সন রীতিমত দিয়া

খানেই বন্ধুবর অক্ষয় বাবু আমার নামোল্লেখ করিয়াছেন। মোহনলাল সম্বন্ধে পত্র দ্বারা আমার শেষ বক্তব্য জ্ঞাত হইয়াও গ্রন্থ কলেবরে তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করেন নাই। অবশ্য শেষ নোটে লিখিয়াছেন, "মোহনলালের ভগিনীদানকাহিনী মুতাক্ষরীণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক ইংরেজেরা কিন্তু এ কথা রটনা করিতে ত্রুটী করেন নাই। অনেকে বলেন, এটি নিতান্তই ইংরেজের রচা কথা।" সমসাময়িক ইংরেজেরা কেহই রটনার ত্রুটী করেন নাই, তাহা হইলে প্রমাণের বাকী কি থাকিল! মুস্তাফা'র টীকা দেখিয়া ষ্টুয়ার্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। আমরা ইংরেজ মহাত্মার কথায় ষ্টুয়ার্টকেই লক্ষ্য করিয়াছি। "গৌরব অভাবে" বহুবচন প্রয়োগটা বোধ হয় ভুলই হইয়াছে।

(৭) Mutaqherin—vol I, 614.

(৮) Calcutta Review 1892 (April) p. 341.

আসিতেছেন; কিন্তু পূর্ব্ব বাকীর দরুণ ৫২৯২ টাকা এখনও পান নাই। উমদৎউন্নেসা এই পত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে অনুরোধ করিতেছেন, "আমি আমার জায়গীরের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাটনা যাত্রা করিতেছি, পাটনায় জজকে আমার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পত্র দিলে কৃতার্থ হইব।" ইহার উত্তরে সেক্রেটরী চেরী সাহেব স্পীক সাহেবকে লিখিতেছেন যে, বেগমের বাকী টাকার প্রার্থনা, নিজামতের দেনা পরিশোধের নিয়ম-অনুযায়ী হইলে, তাঁহাকে ঐ টাকা দেওয়া হয়। (৯) ইহার পরে বিভারিজ সাহেবের উল্লিখিত ১৭৯১ সালের আগষ্ট মাসে পেন্সন্-বৃদ্ধির প্রার্থনা। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, পূর্ব্বে বেগম মাসে পাঁচ শত টাকা পাইতেন; হেষ্টিংসের আমলে ৪৫০ হয়, এক্ষণে ৩২৫ দাঁড়াইয়াছে।

উমদৎউন্নেসার জায়গীর ছিল, এই প্রথম দেখা গেল। বিভারিজ সাহেব ইহা জানিলে, অবশ্য উমদৎউন্নেসা ও লুৎফউন্নেসা অভিন্ন হইতে পারেন, এমন অনুমান করিতেন না। পরে মোহনলালের যেরূপ পরিণাম নির্দ্দেশ করা যাইবে, তাহাতে উমদৎউন্নেসা তাঁহার ভগ্নী হইতে পারেন না। শেষ পর্য্যন্ত জায়গীর স্থির থাকাই ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ। এই জায়গীর দ্বারা তাঁহাকে আমরা সিরাজের পাটরাণী ইরেজ খাঁর দুহিতা বলিয়া অনুমান করি। ফরষ্টার সাহেব নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে সিরাজের সমাধিমন্দিরে যে বেগমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি উমদৎউন্নেসাও হইতে পারেন। এই সমাধিমন্দিরে (খোষবাগ) সিরাজের দুই স্ত্রীর সমাধি আছে বলিয়া প্রকাশ। একটি লুৎফউন্নেসার; অন্যটি উমদৎউন্নেসার হওয়াই বিশেষ সম্ভব।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরের মতে, লুৎফউন্নেসাই মোহনলালের ভগ্নী;—বিভারিজ সাহেব তাঁহারই নিকট ঐরূপ শুনিয়াছেন। মুতাক্ষরীণের টীকাই তাঁহার প্রথম বিশ্বাসের মূল। তিনি এই জনশ্রুতি সম্বন্ধে পরে প্রাচীন লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা এই:—"সিরাজ এক দিন সহচর সঙ্গে সহরের দক্ষিণ দিকে (বর্ত্তমান সাহা নগরে) বাঙ্গালীপাড়ার পথে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। দেখিলেন, একটি অট্টালিকার উপরে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। রূপ দেখিয়া চঞ্চলমতি সিরাজ মোহিত হইলেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, ঐ কুমারী তাঁহার স্বীয় দেওয়ান মোহনলালের অবিবাহিতা ভগ্নী,

(৯) Letter to Mr. speke, Resident. Dated the 6th May 1789.

অনতিবিলম্বে বিবাহের প্রস্তাব হইল, ভয় ভক্তিতে মোহনলালের কোনও আপত্তি হইল না ; শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।" এই জনশ্রুতি মোহনলালের উন্নতির কারণ এইরূপেই স্থির করিয়া দিল। মুস্তাফার মানসী কন্যা যৌবনে এই বেশ ধারণ করিল। আমাদের দেশে অনেক জনশ্রুতিই এই আকারের। কোথাও কিছু লেখা দেখিলেই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের আর সন্দেহের কারণ থাকে না ; ক্রমশঃ লতা পল্লব ফুলফলে তাহার পুষ্টিসাধন করি। বিদ্যা-সুন্দরের সুড়ঙ্গ বাহির করিবার জন্য বর্দ্ধমানে কত মনীষীর মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করে? যাহা হউক, নিম্নলিখিত কারণে আমরা লুৎফউন্নেসাকে মোহনলালের ভগ্নী বলিয়া স্বীকার করিতে অসমর্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিরাজের পাটনা যাত্রার সময়ে লুৎফউন্নেসা তাঁহার সঙ্গিনী। মুতাক্ষরীণ-কার লিখিয়াছেন, সিরাজ এই সময়ে লুৎফউন্নেসা ও তাঁহার মাতাকে নিজের এক দ্রুতগামী বলদ-শকটে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং সেই একই রথে যাত্রা করেন। (১০) মোহনলালের মাতাও এই অবস্থায় সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে এক শকটে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে হয়। মনে রাখা উচিত, জনশ্রুতি মোহনলালের দেওয়ানী ও অট্টালিকা অস্বীকার করে নাই ; তাহাতেই বোধ হয়, তিনি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত, মুস্তাফা তাঁহার এই স্থানের টীকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি স্বচক্ষে এই কথিত শকটের প্রকাণ্ড বলীবর্দ্দ দুইটি দেখিয়াছেন ; নিজের মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের ককুদ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন, আরও অর্দ্ধ ফুট বাকী থাকে। আমাদের মনটা নাকি বড়ই সন্দিগ্ধ, তাই এই উক্তিটি একটু কেমন কেমন বোধ হয়। মুস্তাফা বলিয়াছেন, দুই বৎসর পরে এই বলদ দুইটি মীরজাফর ওয়াট্‌স্ সাহেবকে দান করেন। মীরজাফর নবাবের বলীবর্দ্দ উপহার দিলেন ; অতএব উপহার মীরজাফরের নবাবীপ্রাপ্তির পরেই ঘটা উচিত। অথচ সিরাজের এ পাটনা-যাত্রা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে। কথাটা এজন্য বড় সঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, মুস্তাফা বড় গুজবপ্রিয় লোক। মুস্তাফার অনেক কথা বড়ই সাবধানে গ্রহণ করিতে হয়। কুৎসারটনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ; তাঁহার এ বিষয়ের টিপ্পনীগুলি অনেক স্থলে এরূপ অশ্লীল ও জঘন্য

(১০) Mutaqherin vol I. 614-15.

য, সভ্য ভাষায় তাহার উল্লেখ অসম্ভব। (১১) যাহাই হউক, তাঁহার মন্তব্যে মোহনলালের ভগ্নীর উল্লেখ দেখিয়া, লুৎফউন্নেসাকে ঐ ভগ্নী বলিয়া স্থির করিবার কোনও কারণই নাই। লুৎফউন্নেসা পরিণামে খোষবাগে আলিবর্দ্দী ও সিরাজের সমাধিমন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার শব সিরাজের পদতলে সমাহিত রহিয়াছে।

আমাদের স্থানীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, এই মোহনলালের ভগ্নীর প্রসঙ্গে আরও একটু বেশী দূর গিয়াছেন। মুস্তাফা লিখিয়াছেন, ফৈজী বা ফয়জন নামে এক পরমসুন্দরী নর্ত্তকীর রূপের কথা শুনিয়া সিরাজ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তাহাকে দিল্লী হইতে আনয়ন করেন। সে রূপসী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, অতি ক্ষীণাঙ্গী, ওজনে ২২সের মাত্র ; এক কথায় সর্ব্বসৌন্দর্য্যের ললামভূতা। সে পরে সিরাজের ভগ্নীপতি সৈয়দ মহম্মদের প্রেমে পড়ায় ক্রোধোন্মত্ত সিরাজ তাহাকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া তাহার চারি দিক অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তিন মাস পরে ঐ স্থান হইতে তাহার কঙ্কলাবশিষ্ট মৃতদেহ বাহির করা হয়। যে দুইটি প্রকাণ্ড টীকায় ফৈজী ও মোহনলালের ভগ্নীর উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার অনুবাদ বা নকল দিবার অবসর বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। (১২) এ মাসের "সাহিত্য"ও কেবল এই প্রবন্ধের জন্য নহে। যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ টিপ্পনী দুইটির বলে ফৈজীর স্কন্ধে মোহনলালের ভগিনীত্ব আরোপিত করিবার কোনও কারণ নাই। নিখিল বাবু নিজ কাহিনীতে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেন কেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি ব্যস্ততার সহিত এই অংশটি লিখিয়াছেন। ফৈজী মোহনলালের ভগ্নী, টীকার এই অর্থ হইলে, ষ্টুয়ার্ট বা বিভারিজ তাহা লক্ষ্য করিতেন। টীকাটির অর্থও বিশদ ;—মোহনলালের ভগ্নীকে তন্বঙ্গী বলিয়া, এ দেশের লোকের সৌন্দর্য্যবোধের কথায় মুস্তাফা বলিয়াছেন যে, সুন্দরীর বর্ণনায় লোকে সাধারণতঃ বলিবে, এমন সুন্দরী যে পান খাইলে গলার ভিতর দিয়া রক্তিম রাগ দেখা যায় ; এতই ক্ষীণাঙ্গী যে, ওজনে ২২সের মাত্র। এই উক্তির পর স্পষ্টই বলিয়াছেন, ফৈজীর ওজন এই ২২সের ছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেবেরও এই নোট্ দৃষ্টে মোহনলালের ভগিনীর ওজন দেওয়া সমীচীন হয় নাই। নিখিল বাবুর প্রথম ভ্রম তাঁহার পরবর্ত্তী তর্কগুলিকে এক দিকেই প্রযুক্ত করিয়াছে। ক্ষমতা ও

(১১) See Notes Mutaqh. p. p. 636, 647, 650 &c. &c.
(১২) Vide Mutaqh-Foot note p. p. 614-15, 717.

গুণপনা যতই থাকুক, ফৈজীর ভ্রাতা হইলে মোহনলালের উপর সিরাজের কতটুকু আস্থা থাকিতে পারে? মুস্তাফার স্পষ্ট উক্তির পর এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা অনাবশ্যক।

দেখা গেল, এ তিন জনের কেহই মোহনলালের ভগ্নী হইতে পারেন না। সম্বন্ধ সুস্থির করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, অন্য কোনও অজ্ঞাত বেগমের অনুসন্ধান আবশ্যক। এত কথার পরেও যদি সিরাজ মোহনলালের ভগিনীপতি ছিলেন, এই জনশ্রুতি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাতেও মোহনলালের বীরপ্রকৃতির বিপক্ষে কিছু বলিবার থাকে না। এক্ষণে তাঁহার কি কৃতিত্ব ছিল, সেই প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। তিনি মোসাহেব ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত।

সিংহাসনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিরাজদ্দৌলা চারি দিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত দেখিলেন। এক দিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী ঘেসিটী বেগম কৌশলী রাজবল্লভের পরামর্শে সিরাজের মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক অপোগণ্ড শিশু লইয়া উপস্থিত। পক্ষান্তরে প্রবীণ মন্ত্রিদল জগৎ শেঠের সহিত একমত হইয়া পূর্ণিয়ার নবাব, সিরাজের পিতৃব্যপুত্র সওকৎ জঙ্গকে সিংহাসনপ্রদানের অভিলাষী। এ সময়ে একমাত্র মোহনলালই সিরাজের অবলম্বন। তাঁহারই পরামর্শে এই আসন্ন বিপদগুলি কোরকেই নিষ্পিষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইল। ঘেসিটী বেগম মতিঝিল প্রাসাদ হইতে অন্তঃপুরে আনীত হইলেন; বেগমের পাত্রেসমিত অর্থগৃধ্নু সহকারিগণ কার্য্যকালে সরিয়া পড়িল। অতঃপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে শওকৎজঙ্গকে শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ণিয়া যাত্রা করেন। তিনি স্বয়ং এক দল সৈন্যসহ রাজমহলের দিক্ দিয়া অগ্রসর হইলেন; অপর সৈন্যদল মোহনলালের অধীনে গঙ্গা পার হইয়া সোমদহ, হায়েৎপুর ও বসন্তপুর গোলার দিক হইতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইল। (১৩) নবাবগঞ্জ ও মণিহারীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক

(১৩) মুতাক্ষরীণ (১—৭৩৯ পৃঃ) ষ্টুয়ার্ট ভ্রমক্রমে 'সরদহ' পড়িয়াছেন। অক্ষয় বাবু সুপরিচিত সরদহের উল্লেখ পাইয়া 'রাণী ভবানীর জমিদারী' যোগ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মুর্শিদাবাদ হইতে পূর্ণিয়া যাইতে হইলে, রাজশাহীর দক্ষিণ সরদহ পাওয়া যায় না। হিয়াৎপুর ও সোমদহ—মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তভাগে। পূর্ব্বে দুইটি স্থানই প্রসিদ্ধ ছিল। স্থানীয় লোকে সোমদহকে 'সমধা' বলে। এখানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা প্রভৃতি প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। বসন্তপুর গোলা পূর্ণিয়া নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী।

পরিখাবেষ্টিত এক সুন্দর স্থানে পূর্ণিয়ার প্রবীণ মন্ত্রিগণের পরামর্শে সৈন্যসংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চারি দিকে বিলে পরিবেষ্টিত এক উচ্চভূমি, এক পার্শ্বে একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ; সেখানে মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যেই ব্যূহ রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বোধ শওকৎ জঙ্গের আদেশে তাঁহার সৈন্যের উৎকৃষ্ট অংশ ব্যূহের বাহিরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে সন্নিবিষ্ট হইল। ১১৭০ হিজিরা সালের ২১শে জমাদিয়স্ সানি বেলা আড়াই প্রহরের সময় মোহনলালের সৈন্য আবারি ও মণিহারীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। এই স্থানের নাম বলদিয়াবাড়ী। এখান হইতে শওকতের শিবির দুই ক্রোশের অধিক নহে; কিন্তু মধ্যে বিলের অংশবিশেষ ব্যবধান। মোহনলাল সসৈন্যে গঙ্গার পাহাড়ের উপর একটি উচ্চস্থানে উপনীত হইলেন। সেনাপতিগণের মধ্যে মীরজাফর খাঁ, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীর কাসেম খাঁ, এবং প্রসিদ্ধ বীর উমের খাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয়, জিলির খাঁ ও আসালৎ খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গলা সৈন্যের শীর্ষস্থানীয় পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। (১৪) তাঁহাদের ক্ষুদ্র কামানগুলি কিছু অগ্রসর হইয়া শত্রুশিবিরে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিল, কিন্তু এত দূর হইতে সকল গোলা শিবিরে পৌঁছিল না, অর্দ্ধ পথে পঙ্কসলিলে পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃহৎ কামানগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন দুই চারিটি গোলা শওকতের শিবিরে পড়িতে লাগিল। শওকৎ ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামে এক জন বাঙ্গালী কায়স্থ শওকতের পিতার আমল হইতে পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন; ইনি প্রথমে ব্যূহমুখে আপন সৈন্যদল ও কামান সংস্থাপিত করেন। (১৫) কিন্তু শওকৎ জঙ্গের ভয় দেখিয়া, তিনি এই সময়ে আপন কামানগুলির সহিত অর্দ্ধক্রোশ অগ্রসর হইয়া, শত্রুপক্ষের প্রতি গোলা চালাইতে লাগিলেন।

মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন স্বয়ং শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত

(১৪) অক্ষয় বাবুর "মীরজাফর খাঁকে সিরাজ আপন চক্ষে চক্ষে রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যান", "যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের সৈন্যদলের সঙ্গে মীরজাফরের সৈন্যদল মিলিত হইল" ইত্যাদি নির্দ্দেশ মুতাক্ষরীণের সহিত একমত হইতেছে না। মোহনলাল এ যুদ্ধে সকল সেনাপতির উপরে কর্ত্তা ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

(১৫) "Shiam Sundar, a Bengali Cahet", "The comptroller of the artillery"—(Mutaqh I, 740—42)

ছিলেন। তিনি বলেন, এইরূপ কার্য্যে সাহস ও প্রভুর হিতসাধনে উৎসাহ দেখাইতে গিয়া শ্যামসুন্দরের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরক্ষিত ব্যূহ হইতে বহির্গত হওয়ায় বিলের ব্যবধানরূপ সুবিধা অন্তর্হিত হইল। (১৬) সম্ভবতঃ বিপুল নবাবসৈন্যের সম্মুখে ব্যূহমধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া শ্যামসুন্দর হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার "সাবধানের বিনাশ নাই" দলের প্রবীণ লোক; তাঁহার সমালোচনা আবার পরবর্ত্তী কালে গৃহমধ্যে শান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে কয় জন লোকে ওয়েলিংটনের মত নিবাত-নিষ্কম্প হইয়া থাকিতে পারে? শ্যামসুন্দরের সে সময়ের অবস্থাও বিবেচ্য। নবাবী বৃহৎ কামানগুলি যখন ভীমনাদে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে, শওকৎ জঙ্গ তখন ভয়বিহ্বল হইয়া নিজের "মাহী" পতাকা নামাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, অনেক লোক একত্র দেখিয়া শত্রুপক্ষ সেই দিকে কামান দাগিতেছে ভাবিয়া, নিজের অনুচরবর্গকে ধমক্ দিয়া স্থানান্তরে যাইতে আজ্ঞা দিতেছেন, (১৭) তখন কি গোলন্দাজ সেনাপতির পক্ষে বিরুদ্ধপক্ষের কামানগুলিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে? শওকতের তীব্র ভৎর্সনায় তাঁহার শিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যদল অগ্রসর হইতে গিয়া যদি মহাপঙ্কে নিপতিত না হইত, তাহা হইলে যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যগণের কি অবস্থা হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, দেখা গেল, শ্যামসুন্দর বাঙ্গালী কায়স্থ হইলেও সামান্য "মসীজীবী নহেন; লেখনী ত্যাগ করিয়াই সেনাপতি হন নাই।" (১৮) সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের নিকট অসি-মসীর সাপত্ন্য-সম্বন্ধ বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শ্যামসুন্দর মোহনলালেরই প্রতিকৃতি। সুতরাং নবাবী আমলের হিন্দু সেনাপতিগণের মধ্যে ইঁহার আসন বড় নিম্নে নয়। অপদার্থ শওকৎ জঙ্গের লবণের মর্য্যাদারক্ষার জন্য ইনিও প্রাণ দিতে অগ্রসর ছিলেন; অতএব, কালে শওকতের সহিত ইঁহারও কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভাগ্যবিড়ম্বনায় বাঙ্গালী জাতি নিজের যে যৎসামান্য গৌরবের বিষয় আছে, তাহারও কোনও ইতিবৃত্ত রাখে নাই, নতুবা মোহনলাল ও শ্যামসুন্দরের ন্যায় কত কর্ত্তব্যপরায়ণ অমিততেজা বাঙ্গালী বীরের নাম করিয়া এই হতভাগ্য দেশ রসনা তৃপ্ত করিতে পারিত!

(১৬) Mutaqherin, vol I. 742.

(১৭) Mutaqh. vol I. p. 743.

(১৮) ষ্টুয়ার্ট কায়স্থের অনুবাদে 'Scribe' করিয়া গোল করিয়াছেন; বাঙ্গালী বলিয়া

অতঃপর নবাবগঞ্জ যুদ্ধে যাহা ঘটিল, অক্ষয়বাবু তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় তাহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। ভয়চকিত শওকতের গঞ্জনায় দূরে সংস্থাপিত প্রধান সেনাপতি কারগুজার খাঁর অধীন পূর্ণিয়ার শিক্ষিত অশ্বারোহী দল শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া বিলের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গলা কামানের লক্ষ্যে পরিণত হইল। যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও বাঙ্গালী অশ্বারোহী সৈন্যের শাণিতকৃপাণমুখে উৎসৃষ্ট হইতে লাগিল; এই সময়েই মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি সেনানায়কগণ সদলে প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষসেনার উপর নিপতিত হইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করিলেন। শ্যামসুন্দর আহত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গোলাম হোসেন প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া যুদ্ধের ঘনীভূত অবস্থায় সুরাপানে অবশ শওকৎকে ধরাধরি করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহিত করাইলেন; বিপক্ষের এক গোলা আসিয়া তাঁহার ললাটভেদ ও ভবযন্ত্রণার অবসান করিল।

এই যুদ্ধে আমরা আর দুই জন হিন্দু সেনাপতির উল্লেখ পাই। এক জনের নাম মিতনলাল। ইনি শওকতের শরীররক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক। দ্বিতীয় লালু হাজারী। অন্যতম পদাতিক গোলন্দাজ সেনানী; শওকতের অসদ্ব্যবহারে বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইনি সিরাজদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৯) ষ্ট্যাটিষ্টিকাল্ রিপোর্টের ওডনেল্ সাহেব ইঁহাকে শওকতের অশ্বারোহী সেনাপতি বলিয়া বিষম ভ্রম করিয়াছেন।

উল্লেখও করেন নাই। অক্ষয় বাবু এই অংশ লিখিবার সময় বোধ করি, মুতাক্ষরীণের সাহায্য পান নাই। শ্যামসুন্দর 'বাঙ্গালী কায়স্থ' এ উল্লেখ পাইলে, বন্ধুবরের মত স্বজাতিপ্রাণ ঐতিহাসিক কখনই তাঁহার সম্বন্ধে অন্যরূপ মত লিপিবদ্ধ করিতেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। নব্য বাঙ্গালীর বাঙ্গলা পড়িতে যদি নিতান্তই ঘৃণা না থাকে, তবে 'সিরাজদ্দৌলা'র ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইবে। সেই সময়ে মৈত্র মহাশয় আমাদের কথা স্মরণ রাখেন, এই অনুরোধ।

হণ্টার সাহেবের সহযোগী ওডনেল্ পূর্ণিয়ার ষ্ট্যাটিষ্টিকাল্ রিপোর্টে সিয়ার-উল্-মুতাক্ষরীণের নবাবগঞ্জ যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ বলেন, সিরাজ মীরজাফরকে অপদস্থ করার পর জাফর স্বয়ং পূর্ণিয়ায় গিয়া শওকৎ জঙ্গকে উত্তেজিত করেন,—"Hindu scribe shiam sunder who was probably a kaystha"—"শওকতের অশ্বারোহী সৈন্য বিখ্যাত হাজারীলালের অধীনে ছিল"—ইত্যাদি। মুতাক্ষরীণের মোহময় নাম লইয়া কত জনে কত কি বলিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করে?

(১৯) Mutaqhherin vol I. 742.

যুদ্ধশেষে শান্তিস্থাপন ও সুব্যবস্থার জন্য মহারাজা মোহনলাল কিছুদিন পূর্ণিয়ায় অপেক্ষা করিলেন। সৈয়দ আহম্মদের সমস্ত সম্পত্তি, বেগমগণ ও সন্তানাদি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। এখানে শওকতের জননীর কোনও উল্লেখ নাই। পরিশেষে নিজ মনোনীত এক জন দক্ষ লোকের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করিয়া মোহনলাল রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার পুত্রকে পরে পূর্ণিয়ায় নায়েব-নবাবী পদে নিযুক্ত দেখিতে পাই। সিরাজের অধঃপতনের পর, পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী সামন্তেরা ইঁহাকে বন্দী করিয়া সিংহাসন কাড়িয়া লন। (২০) যাঁহার পুত্র একটা দেশের নবাবী করিবার উপযুক্ত, সেরূপ বয়সের এক জন বিজ্ঞ বীরপ্রকৃতির লোক বালক সিরাজদ্দৌলার যৌবনোন্মাদের পার্শ্বচর হইতে পারেন কি না, পাঠক বিচার করিবেন।

যুদ্ধবিগ্রহে যে মোহনলাল নেতা, তিনিই আবার রাজকার্য্যপরিচালনের কর্ণধার। প্রবীণ সদস্যদল ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট; রাজবিপ্লবের ষড়যন্ত্রে গোপনে লিপ্ত। ইতিহাস বিশদ করিয়া না বলিলেও, মোহনলালের ন্যায় পরিণত মস্তিষ্কের সাহায্য না পাইলে,—সিরাজদ্দৌলার প্রতিভা হাল আইন মতে যতই বাড়াইয়া লওয়া যাউক—এ তরঙ্গে তাঁহার বুদ্ধির হালে পাণি পাইত না, ইহা বেশ বুঝা যায়। এ অবস্থায় সিরাজ ও ইংরাজের মধ্যে যে পত্রাদির আদান প্রদান চলিয়াছিল, (২১) তাহাতে ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ করি, সিরাজের কৃতিত্বের এমন ভক্ত অতি অল্প, যাঁহারা এগুলি তাঁহারই মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া মানিয়া লইবেন। যৌবনোন্মত্ত সিরাজ বুদ্ধিমান ছিলেন, সন্দেহ নাই; মন্ত্রী মোহনলালের বিজ্ঞতায় বুদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ধীরতার সংযোগ হইতেছিল। কিন্তু দেশ বিদেশের কুচক্রী দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলকাম হওয়া, মোহনলাল কেন, স্বয়ং ম্যাকিয়াভেলীর পক্ষেও সহজ হইত না। এই জন্যই শেষ অবস্থায় প্রবীণ পক্ষেরই জয় হইল। সিরাজের পক্ষ হইতে কখনও ইঁহাকে, কখনও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার বৃথা চেষ্টা চলিতে লাগিল। কার্য্যক্ষেত্রে যাহা দাঁড়াইল, সকলেই জানেন। এই কারণেই পলাশী ক্ষেত্রে মহারাজা মোহনলাল উপস্থিত থাকিয়াও নেতা ছিলেন না। রাজা দুর্লভ রায় বৃহৎ এক দল সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রের বন্দোবস্ত করিবার জন্য

(২০) মুতাক্ষরীণ; ২।৬ পৃষ্ঠা। পর পৃষ্ঠার দুই স্থানে মোহনলালের পুত্র বলিতে "মোহনলাল"-মাত্র ভ্রমক্রমে ছাপা আছে।

(২১) Ives' Voyage and Narrative; ইহাকে Jurnal বলা ঠিক নহে।

প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুবন্দোবস্তে নবাবী সেনা নবাবের জন্য অস্ত্রধারণ না করিয়া স্থির হইয়া রহিল; রাজার, মীরজাফরের ও ইয়ারলতিফের আজ্ঞায় স্থাপিত সৈন্যদল সমস্ত নবাবী সৈন্যের অষ্টাংশের প্রায় সপ্তাংশ। তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় রণপয়োধির লহরীগণনারূপ দুষ্কর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। অবশিষ্ট সামান্য বিশ্বাসী সৈন্য, মোহনলাল ও মীরমদনের অধীনে দক্ষিণপার্শ্বে ভাগীরথীতীরে সমাবিষ্ট ছিল; যুদ্ধক্ষেত্রের মোহনলাল বাঙ্গালী কবির কল্যাণে সাধারণের সুপরিচিত। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বিপক্ষ পক্ষের গোলার আঘাতে ভগ্নোরু মীরমদন স্বর্গগত হইলে, মোহনলাল যখন বিপুল বিক্রমে শত্রুদলকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তখনই (২২) মীরজাফর প্রভৃতির পরামর্শে ভয়চকিত সিরাজের বারংবার অনুযোগে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নবাবী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; এইখানেই যুদ্ধকাণ্ডও সমাপ্ত হইল।

পলাশীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহারাজা মোহনলাল মুর্শিদাবাদে ধৃত হন। গোলাম হোসেন বলিতেছেন, যে মন্ত্রীকে সিরাজ এত উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছিলেন, যাহার মস্তক গর্ব্বে গগনস্পর্শ করিয়াছিল, এবং অন্যের অসূয়ার ভারবহন করিয়া যে কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন, রাজা দুর্লভরামের প্রীতিসাধন জন্য তাঁহাকে ধৃত করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়। রাজা দুর্লভরাম তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন, এবং সম্ভবতঃ এই সম্পত্তির জন্যই তাঁহার জীবনলীলারও অবসান হয়। (২৩) মুস্তাফা টীকায় এ সম্বন্ধের গুজব দিতেও ভুলেন নাই। তিনি বলেন, কেহ কেহ বলে, মীরজাফর তাঁহার কতকগুলি অনুচর পাঠাইয়া লগুড়াঘাতে মোহনলালের

ইহার পরে ভয়বিহ্বল সিরাজ ফিরিবার জন্য জেদ করেন; মীরজাফর ফিরিবার সংবাদ পাঠান নাই। তিনি এ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন, এমনে করা বিষম ভ্রম। নবাব স্বয়ং উপস্থিত। প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে আপন আপন দল যুদ্ধে উপস্থিত ছিল।

(২২) By this time Mohanlal who had advanced with Mirmadan was closely engaged with the enemy; his cannon was served with effect; and his infantry having availed themselves of some covers and other grounds were pouring a quantity of bullets in the enemy's ranks. It was at this moment he received the order of falling back and of retreating. He answered that 'this was not the time to retreat; that the action was so far

প্রাণবধ করান; কেহ বা বলে, দুর্লভরাম বিষপ্রয়োগে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দুর্লভরামকে ছাড়িয়া মীরজাফর বেচারীর স্কন্ধে দোষ চাপান সমীচীন নহে। মোহনলালের পুত্র পূর্ণিয়ার কারাগার হইতে কখনও বাহির হইয়াছিলেন কি না, ইতিহাসে তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। পলাশী যুদ্ধের গ্রাম্য কবিতায় "কলিকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী" এই চরণে তাঁহার এক কন্যার কথাও জানা যাইতেছে। যে সিরাজের অন্ন খাইয়া মোহনলাল চিরদিন তাঁহার মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, যাঁহার জন্য তিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার শোচনীয় হত্যার সঙ্গে মোহনলালের পরিণামও এইরূপে জড়িত। শত্রুদল এইরূপেই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল।

মোহনলাল বাঙ্গালী কি না, যাঁহারা এই সন্দেহ উপস্থিত করেন, আমাদের মনে হয়,—তিনি যে বাঙ্গালী নন, তাহা প্রমাণিত করিবার ভার তাঁহাদের উপর। মুর্শিদাবাদের বাঙ্গালী নবাবের তদানীন্তন প্রধান হিন্দু সদস্যবর্গ সকলকেই বাঙ্গালী দেখিতে পাই। কন্যা অনাথা হইয়া কলিকাতাতেই আশ্রয় লন; দিল্লী যান নাই। মুসলমানী গ্রন্থে বলে, তিনি কায়স্থ ছিলেন। প্রবাদ এই, মুর্শিদাবাদেই তাঁহার বাটী। যদি বলা যায়, তিনি মুর্শিদাবাদবাসী লালা কায়স্থ, তাহা হইলেও তাঁহার বাঙ্গালী হইবার কোনও বাধা দেখি না। মুর্শিদাবাদের লালা কায়স্থ বাঙ্গালী-পদবাচ্য না হইলে, ভট্টনারায়ণের "ষষ্ঠিতম মিশ্রণ" বলিয়া আমাকেও "কান্যুজে" বলিয়া লোকের ভ্রম হওয়া সম্ভব। মোহনলালের বাসস্থান বা বংশাবলীর বিবরণ দিতে পারা যায় না। এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায়, অন্যান্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারী, যশোবন্ত রায়, বীরুদত্ত, রাজারাম সিংহ প্রভৃতি আরও কত জনের খবর কে দিতে পারেন? বর্ত্তমান প্রস্তাবের শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সন্ধান কেহ বলিতে পারেন কি? বিপ্লবের পর মোহনলালের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা একবার চিন্তা করুন। হতভাগ্য সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী না হইয়া বিপ্লবকারী দলের সহযোগী হইলে, আজ কলিকাতায় তাঁহার নামে একাধিক অর্দ্ধ-

advanced, that whatever might happen would happen now; and that should he turn his head to march back to camp his people would disperse and perhaps abandon themselves to an open flight—Mutaqh. vol. I. 768.

(২৩) Mutaqherin, vol I, 776.

ক্রোশব্যাপী প্রাসাদ ও গবর্মেণ্টের প্রসাদভোগী তাঁহার বংশাবলীগণকে দেখিয়া অনেকের নয়ন মন তৃপ্ত হইত। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় মোহনলালের ভাগ্য-বিধান অন্যরূপ। (২৪)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাষ্টার মহাশয়।

১

লোকে তাঁহাকে "পাগ্‌লা মাষ্টার" বলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের "বি. এ." উপাধি লাভ করিয়াও অন্য কোনও ভাল চাকরীর, এমন কি, সকল ছাত্রের শেষগতি ওকালতীর চেষ্টাও না করিয়া, কেন যে তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে সুদূর পল্লীগ্রামে একটা মধ্য-ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, সে রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিত না। সেই জন্য নানা জনে সে সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত করিত। কেহ বলিত, পরিবারের কোনও কুৎসার জন্য তিনি লোকসমাগমবহুল সহরে যাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন; কেন না, সহরে এক জন না এক জন দেশের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। কেহ বলিত, প্রথম যৌবনে ভালবাসিয়া হতাশ হইয়া তিনি জনতা হইতে দূরে হৃদয়ক্ষত সারিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আবার কেহ বলিত, লোকটার মাথা খারাপ, নহিলে কেহ এমন কাজ করে না।

গ্রামে একটা বড় বাজার ছিল। বাজারের পার্শ্বে, বাজারের ঘাট হইতে অনতিদূরে গোটাকতক ঝাউ ও দেবদারু-তরুবেষ্টিত একখানা বড় আটচালা ঘরে স্কুল বসিত। আর সেই আটচালার পশ্চাতে নদীর অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর একখানা ক্ষুদ্র ঘরে হেডমাষ্টার বাস করিতেন। তাঁহার ঘর হইতে সমস্ত দিন বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার উচ্চ কথোপকথন ও কারখানার শ্রমজীবীদিগের কোলাহল দূরোচ্চারিত কলরবের মত অস্পষ্ট শ্রুত হইত। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইলে দেখা যাইত, বাজারের ঘাটে বৃহৎ বৃহৎ নৌকা হইতে ধান্য

(২৪) এই প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া ইতিহাসের অনুরোধে দুই তিন জন হিতকামী সুহৃদকে লক্ষ্য করিয়া দুই চারিটি অপ্রিয় সত্য বলিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া অস্থিত চিত্তে বিদায় লইতে হইতেছে। লেখক।

কয়লা প্রভৃতি পণ্য নামান হইতেছে, বা চিটা, চিনি, তিসি প্রভৃতি মাল নৌকায় বোঝাই হইতেছে; সেই ঘাটের এক পার্শ্বে পরিপুষ্ট-উদর দোকানদারদিগের মধ্যে কেহ বা স্নান করিতেছে, কেহ বা স্নানান্তে মার্জ্জনচিক্কণ পিত্তল-পাত্রে জল লইয়া যাইতেছে।

মাষ্টার মহাশয়ের মাসিক বেতনের পঁচিশ টাকার মধ্যে দশ টাকাতেই তাঁহার আপনার সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। যত দিন মাতা জীবিতা ছিলেন, তত দিন মাষ্টার মহাশয় প্রতি মাসে তাঁহাকে দশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন; অবশিষ্ট পাঁচ টাকা দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য ব্যয়িত হইত। মাতার মৃত্যুর পর হইতে সে পনের টাকার সবটাই ছাত্রদিগের কল্যাণে ব্যয়িত হয়। দরিদ্র ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তকক্রয়, চিকিৎসার ব্যয়নির্ব্বাহ, ক্বচিৎ কোনও অতি-দরিদ্র ছাত্রের জন্য বর্ষাকালে ছত্র-ক্রয় প্রভৃতিতে সে পনের টাকা শেষ হইয়া যাইত। যেবার হাতের টাকা ফুরাইয়া গেলে কোনও ছাত্রের কোনও প্রয়োজনীয় অভাব মোচন করা হইয়া উঠিত না, সেই বারই মাষ্টার মহাশয় সত্য সত্য অর্থের অভাব অনুভব করিতেন, নহিলে নহে।

স্কুলের সময় ভিন্ন—প্রভাতে, অপরাহ্নে বা সায়াহ্নেও মাষ্টার মহাশয়ের বিশ্রাম ছিল না। ছাত্রগণ সকল সময়েই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পাঠ বুঝাইয়া লইতে আসিত। দোকানীরা কেহ বা পত্র লিখাইতে, কেহ বা শিরোনামা লিখাইতে, কেহ বা মকদ্দমার কাগজপত্রের অর্থ করাইয়া লইতে, কেহ বা "সমন্‌স"এর তারিখ জানিতে, কেহ বা ঘাটের ইজারদার অথবা পোষ্টমাষ্টারের নামে দরখাস্ত লিখিয়া লইতে আসিত। মাষ্টার মহাশয়ের কিছুতেই বিরক্তি ছিল না। তাঁহাকে কেহ কখনও রাগ করিতে দেখে নাই। কেহ কখনও তাঁহার মুখে বিরক্তিভাব লক্ষ্য করিতে পারে নাই। এততেও মাষ্টার মহাশয়ের কার্য্য শেষ হইত না। কোনও ছাত্রের শরীর অসুস্থ হইলে তাহার গৃহে যাইয়া চিকিৎসার সকল বিষয়ের খোঁজ লওয়া ও আবশ্যক হইলে তাহার ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করা, এমন কি, রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রিজাগরণ পর্য্যন্ত, মাষ্টার মহাশয়ের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের মধ্যে ছিল। মাষ্টার মহাশয় যেন সকলেরই আপনার লোক ছিলেন। ছাত্রগণ মাষ্টার মহাশয়কে যেমন ভালবাসিত, ছাত্রদিগের অভিভাবকগণও মাষ্টার মহাশয়কে তেমনই ভালবাসিতেন। যে পরকে সত্য সত্যই আপনার মত দেখে, লোকে সহজেই তাহাকে আপনার ভাবিতে আরম্ভ করে।

মাষ্টার মহাশয়ের অনেকগুলি পুস্তক ছিল, তাহার অধিকাংশই জীর্ণ। একটু অবসর পাইলেই মাষ্টার মহাশয় পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। কিন্তু সে অবসরলাভের সৌভাগ্য তাঁহার প্রায়ই হইত না।

২

মাষ্টার মহাশয়ের বড় দুঃখ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রগণ প্রায়ই অধিক দিন পাঠ করিতে চাহিত না। তিনি জিদ করিয়া কোন কোন ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে পাঠাইতেন বটে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর এ পর্য্যন্ত কেহই সহরে গিয়া পাঠ করিতে সম্মত হয় নাই। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদিগের পুত্রগণ দোকানের হিসাব লিখিতে শিখিলেই পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দোকানের খাতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িত। এক একটি বুদ্ধিমান ছাত্র স্কুল ত্যাগ করিলে মাষ্টার মহাশয় যেন কোনও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ ভোগ করিতেন। সেই জন্য যখন মাধব কর্ম্মকার কেহ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিলে পুত্র বিনোদকে যত দিন ইচ্ছা পড়িতে দিতে স্বীকৃত হইল, তখন মাষ্টার মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বিনোদকে সমস্ত দিন পড়াইয়াও মাষ্টার মহাশয়ের তৃপ্তি হইত না। তিনি সন্ধ্যাকাল হইতে আবার তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিতেন। তাহার পর কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, কি বর্ষায়, প্রতিদিন স্বয়ং লণ্ঠন লইয়া মাষ্টার মহাশয় বিনোদকে গৃহে রাখিয়া সুপ্তগ্রামের বিজন পথে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। মাধবের গৃহের অনতিদূরে গ্রামের চৈত্যদ্রুমে অসংখ্য খদ্যোত ক্ষণবিলসিত ক্ষণবিলয়িত জ্যোতিঃ বিস্তার করিত, ঝিল্লীধ্বনিমুখরিত প্রান্তরে জম্বুকের চীৎকার শ্রুত হইত, পথোপরি শয়ান কুক্কুর স্তব্ধরাত্রে পথে পদশব্দ শুনিয়া দুই এক বার ডাকিয়া উঠিত; বিনোদের অদূরবর্ত্তিনী সিদ্ধির কথা ভাবিতে ভাবিতে মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিত। দেখিয়া লোকে বলিত, "মাষ্টারের কাজ দেখিয়া মনে হয়, যেন মাধব কর্ম্মকারের ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যত উপকার মাষ্টারেরই হইবে!"

নিয়মিত সময়ে বিনোদ পরীক্ষা দিয়া আসিল। যতদিন পরীক্ষার ফল বাহির না হইল, ততদিন অসাধারণ উদ্বেগে মাষ্টার মহাশয়ের দিন কাটিতে লাগিল। তাহার পর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। সে বিভাগের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে বিনোদ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদ লইয়া মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং মাধবের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টার মহাশয়কে উপস্থিত

দেখিয়া মাধব তাড়াতাড়ি মলিন বস্ত্রে একখানা চৌকী ঝাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিল। মাষ্টার মহাশয় বসিয়া মাধবকে পরীক্ষার ফলের কথা বলিলেন।

অন্যান্য কথার পর মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "মাধব, বিনোদের এখানে পড়া শেষ হইল। এখন উহাকে সহরে পড়িতে পাঠাইতে হইবে।"

মাধব বলিল, "বিনোদের লেখাপড়া যাহা কিছু হইয়াছে, সবই আপনার কৃপায়। আপনার কথার উপর কোনও কথা বলা আমার উচিত হয় না, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়, গরিবের ছেলের আর বেশী লেখা পড়ায় কি হইবে?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "দেখ, লেখা পড়া শিখিয়া তোমার ছেলে যদি একটা বড়লোক হয়,—ধর, জেলার হাকিম হয়, তবে কি তোমার আনন্দ হইবে না? সে কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, আমি কাল সকালে আবার আসিব।"

মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন।

৩

লেখা পড়া শিখিলে ছেলে জেলার হাকিম পর্য্যন্ত হইতে পারে শুনিয়া মাধবের স্ত্রীর নিতান্ত জিদ হইল, যেমন করিয়াই হউক, ছেলেকে সহরে পাঠাইতে হইবে। স্ত্রীর ও পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাধবও সেই মতে মত দিল।

পর দিন প্রত্যুষে মাষ্টার মহাশয় মাধবের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

মাধব বলিল, "আপনি যদি বিনোদকে সহরে পাঠাইতে চাহেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। বিশেষ বিনোদের নিজের বড় ইচ্ছা, সে সহরে পড়িতে যায়। আমি বিনোদের রোজগারের প্রত্যাশা করি না। আপনাদের আশীর্ব্বাদে দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের জন্য আমি ছেলের রোজগারের আশা করি না। তবে ও যদি একটা বড়লোক হয়, তাহার অধিক সুখ আমার আর নাই। কিন্তু সহরে খরচ অনেক; খরচের কি হইবে?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "সে ভার আমার। সে জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না।"

* * * * *

মাষ্টার মহাশয় হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সহরে যাইয়া পুস্তকাদি কিনিতে ও সব গুছাইয়া লইতে প্রথমেই বিনোদের কিছু অধিক অর্থ আবশ্যক হইবে। তাহার জোগাড় করিয়া তবে তাহাকে সহরে পাঠাইতে হইবে।

মাধবের বাড়ী হইতে মাষ্টার মহাশয় গ্রামের জমীদারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। জমীদার বাবু তখন একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মোসাহেব নামক পরাঙ্গপুষ্ট জীবদল তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

নমস্কার, প্রতিনমস্কার এবং কুশলাদিজিজ্ঞাসার পর, ক্রমে স্কুলের কথা আসিয়া পড়িল। স্কুলের নানা কথার পর মাষ্টার মহাশয় আসল কথাটা পাড়িলেন। পরীক্ষায় বিনোদের সাফল্যের কথা বলিয়া তিনি তাহাকে আরও পড়িবার জন্য সহরে পাঠাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। জমীদারের মুখে বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভাব লক্ষিত হইল। তাহার পর মাষ্টার মহাশয় বিনোদের জন্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জমীদার বলিলেন যে, কোনরূপ সাহায্য দান করা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। মাষ্টার মহাশয় বিনোদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা বলিলেন। তখন জমীদার স্পষ্টই বলিলেন, "বাপু! ও সব পাগলামী তোমারই সাজে। আমি দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিতে পারিব না। আমি সাহায্য দিয়া গরিবের ছেলেকে লেখা পড়া শিখাই, আর সে বিদ্বান হইয়া আমার উপর চালাকী করুক। তোমার চালচুলা নাই, তুমি ও সব কর, আমি পারিব না।"

এই অন্যায় ও অপমানজনক কথায় মাষ্টার মহাশয়ের আত্মসংযম ব্যথিত হইল। স্নিগ্ধমেঘমধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের মত নিরীহ মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "প্রজাপীড়ন করিয়া দরিদ্র প্রজার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনি এই সম্পত্তি করিয়াছেন। আর আজ এক জন দরিদ্র প্রজার পুত্রের শিক্ষার জন্য সামান্য কিছু ব্যয় করিতে পারেন না। আপনি বুঝেন না যে, দেশের শিক্ষিতগণ দেশের মূল্যবান সম্পত্তি; আপনি সাহায্য করুন আর নাই করুন, আমি বিনোদকে সহরে পাঠাইব।"

ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে জমীদারের দিকে চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় দ্রুতপদে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স্কুলের সামান্য মাষ্টারের ধৃষ্টতা দেখিয়া জমীদার ক্রোধে ও বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে ফুরসীর নল খসিয়া পড়িল।

সেই দিন হইতে গ্রামের স্কুলে জমীদারের বার্ষিক দশ টাকা সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল।

৪

এ দিকে গৃহে ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয় মৃতজননীর শেষ অলঙ্কারখানি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। সেই অলঙ্কারখানিই তাঁহার জননীর শেষ স্মৃতিচিহ্ন, সেখানি বিক্রয় করিতে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল।

তাহার পর আপনার পুস্তকগুলির মধ্যে যে কয়খানি বিনোদের আবশ্যক হইতে পারে, সে কয়খানি লইয়া মাষ্টার মহাশয় ঝাড়িয়া আলাহিদা করিয়া রাখিলেন। বিনোদের মাসিক খরচও তিনি নিজ বেতন হইতে দেওয়া স্থির করিলেন।

মাষ্টার মহাশয় একে একে বিনোদের আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। কয় দিন ধরিয়া সে সকল গোছান হইল। এটা লওয়া আবশ্যক, ওটা লইবার আবশ্যক নাই, এইরূপ নানা তর্ক বিতর্কের পর জিনিষপত্র বাঁধা হইল। শুভদিন দেখিয়া জনকজননীর আশীর্ব্বাদ লইয়া বিনোদ বিদ্যাশিক্ষার্থ গ্রাম হইতে যাত্রা করিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে লইয়া সহরে গমন করিলেন।

বিনোদকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, তাহার বাসস্থান স্থির করিয়া, তাহাকে নানা বিষয়ে আবশ্যক উপদেশ দিয়া, পুত্রের শুভার্থ তাহাকে বিদেশে রাখিয়া ব্যথিতহৃদয় জনকের মত মাষ্টার মহাশয় আবার আপনার পূর্ব্বকার্য্যে ফিরিয়া আসিলেন।

কয় বৎসর বিনোদের শিক্ষাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, এখন মাষ্টার মহাশয়ের কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত। মাষ্টার মহাশয়েরও অজ্ঞাতে তাঁহার হৃদয়ে সেই শান্ত, বুদ্ধিমান, অধ্যয়নানুরাগী ছাত্রের প্রতি স্নেহবন্ধন উৎপন্ন হইয়া ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্নেহ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। বিশেষ যৌবনের তপ্ত রক্ত যতই শীতল হইয়া আইসে, হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি ততই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহে। সেই সময় মানব স্নেহের পাত্রের অভাব প্রথম অনুভব করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় মানব সন্তানের অভাব প্রথম অনুভব করে। বন্ধ্যা নারীর সন্তানলাভাকাঙ্ক্ষা বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল হইয়া উঠে। সেই বয়সে উপযুক্ত পাত্র পাইলে স্বভাবতঃ নিম্নগামী স্নেহ তাহাকেই চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরে, আর সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। তাই স্নেহের পাত্র স্নেহের অনুপযুক্ত হইলেও স্নেহ সহজে দূর হয় না।

মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহ সেই অধ্যয়নপ্রিয় ছাত্রটিকেই বেষ্টন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই দুই চারি দিন বিনোদের সংবাদ না পাইলে মাষ্টার মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

৫

বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল। ছুটির সময় বিনোদ যখন বাড়ী আসিত, তখন মাষ্টার মহাশয়ের আর এতটুকু অবসর থাকিত না। তিনি পরীক্ষার সময় তাহাকে যেমন করিয়া পড়াইতেন, এখনও সে গৃহে আসিলে তাহাকে তেমনই করিয়া না পড়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না।

এমনই করিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত গুরুশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য বিনোদ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে আর সে স্বাস্থ্যজনিত লাবণ্য নাই, প্রতিভাদীপ্ত নয়নে এখন ক্লান্তিভাব লক্ষিত হয়। তাহার অস্থিসার দেহে মস্তক অসম্ভব বড় বলিয়া বোধ হইতেছে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিয়া, দুই বেলা কোনরূপে পেটভরা আহার করিয়া অতিরিক্ত শ্রমে বিনোদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে; বায়ুসঞ্চালনহীন স্যাঁৎসেঁতে জীর্ণ গৃহের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে পাইলে, উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার পাইলে, বোধ করি, এ গুরুশ্রমও তাহার সহ্য হইত। মাষ্টার মহাশয় অর্থের অভাব এবার যেমন অনুভব করিলেন, পূর্ব্বে আর কখনও তেমন করেন নাই।

পরীক্ষার বিষমশ্রম হইতে বিশ্রাম লইয়া পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যসুখদায়ী জলবায়ুর প্রভাবে ও জননীর শুশ্রূষাগুণে বিনোদের মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বিনোদ আবার একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার জননী বা মাষ্টার মহাশয় কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, বিনোদের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; আবার সামান্য শ্রমেই শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে। বিনোদ আপনিও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময় সময় বিনোদ আবার সহরে গেল। মাষ্টার মহাশয় উদ্বিগ্নহৃদয়ে পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার পর এক দিন বিনোদের পত্র আসিল, বিনোদ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে।

বিনোদ মাষ্টার মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়াছে ও তাহার পিতা মাতাকে এই সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল। মাষ্টার মহাশয় এক বার, দুই বার, তিন বার পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার পর তিনি সেখানি হাতে করিয়া, আনন্দোৎফুল্লচিত্তে মাধবকে এই সুসংবাদ প্রদান করিতে গমন করিলেন।

মাধব তখন বাটীর মধ্যে একটা লাউগাছ মাচায় তুলিয়া দিতে ব্যস্ত। মাষ্টার মহাশয় বাহিরের ঘরে উঠিয়া তাহাকে ডাকিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া গামোছা স্কন্ধে মাধব তখনই বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মাষ্টার মহাশয় মাধবকে সুসংবাদ প্রদান করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না।

তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া পুত্রের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদ ভাল আছে ত?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "বিনোদ ভাল আছে। সে পরীক্ষাতে সকলের উপর হইয়াছে। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে।"

শুনিয়া কিছুক্ষণ মাধব কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলিল, "বিনোদের যাহা কিছু লেখা পড়া হইয়াছে, সে আপনারই কৃপায়। তাহাকে সহরে পাঠাইতেও আমার তেমন ইচ্ছা ছিল না; তাহার মাতা ও আপনিই জিদ করিয়া তাহাকে সহরে পাঠাইয়াছিলেন।"

আনন্দে মাধবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমি আজ আসি। তুমি যাইয়া বিনোদের মাতাকে এ সংবাদ দাও।"

সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে গিয়া তাঁহার ছাত্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইবে ভাবিয়া, মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয় আনন্দাপ্লুত হইয়া উঠিতে লাগিল।

৬

কলেজ খুলিলে বিনোদ আবার নূতন উদ্যমে পাঠে মনোযোগ দিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগের জন্য যে মুখস্থ বিদ্যার বোঝা ব্যবস্থা করেন, সে বোঝা তাহার দুর্ব্বল শরীরের পক্ষে কিছু অতিরিক্ত হইল। দ্বিতীয় মাসের শেষেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তৃতীয় মাসের শেষে বিনোদ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক জন প্রাচীন চিকিৎসক দেখিয়া বলিলেন, "তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। বিশ্রাম ও স্থানপরিবর্ত্তনই এখন ঔষধ।" মনে মনে

চিকিৎসক বলিলেন, "এত গুরু শ্রমে যে শতকরা নিরনব্বই জন ছাত্রের এই দশা হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুগ্নদেহে বিনোদ গৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে ফিরিয়া স্থান ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে প্রথম দুই এক দিন বিনোদ একটু সুস্থ বোধ করিল। কিন্তু সে কেবল প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে শেষ বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিনোদের পাণ্ডুর আননে আর রক্ত দেখা দিল না, ম্লানজ্যোতি নয়নে আর উজ্জ্বলতা ফিরিল না।

এবার জননীর অবিশ্রান্ত শুশ্রূষাতেও কোনও উপকার দর্শিল না। বিনোদের জীবনস্রোত ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। সে ক্রমেই অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ আসিয়া দুই দিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রোগীর নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া হতাশ হইলেন। তিনি বলিয়া গেলেন, "রোগীর অবস্থা তত ভাল নহে। সারিবার হয়, আপনি সারিবে; অধিক ঔষধ দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।" কবিরাজ মহাশয়ের কথাতেই মাধব বুঝিল যে, বিনোদের জীবনের আশা অতি অল্প।

মাষ্টার মহাশয়ের চিন্তার আর অবধি রহিল না। উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বেই অনেক সময় কাটাইতে লাগিলেন।

স্কুলে ছেলেরা লক্ষ্য করিত, মাষ্টার মহাশয়ের মুখ শুষ্ক, তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক, আর যেন কোনও কার্য্যেই তাঁহার মন নাই।

এমনই ভাবে সপ্তাহাধিক কাল কাটিয়া গেল। তাহার পর বিনোদের জ্বর আরও প্রবল হইয়া উঠিল; দুই এক বার রক্তবমনও হইতে লাগিল।

জ্বরের ঘোরে বিনোদ অজ্ঞান হইয়া রহিল। অজ্ঞান অবস্থায় সে কেবল পাঠের কথা ও পরীক্ষার কথা বলিতে লাগিল। তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মাষ্টার মহাশয় আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বিন্দু বিন্দু অশ্রু রোগীর গাত্রে পড়িতে লাগিল।

পর দিন প্রভাতে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল; সব ফুরাইল।

৭

পল্লীগ্রামে নিতান্ত লোকাভাব না হইলে নিকট আত্মীয় স্বজাতি ভিন্ন আর কাহাকেও মৃতদেহ বহন করিতে দিবার প্রথা নাই। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় যখন বিনোদের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তখন কেহ আর তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল না।

অদূরেই শ্মশান। মৃতদেহ লইয়া শববাহিগণ শ্মশানে উপনীত হইলে মাষ্টার মহাশয় আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। শ্মশানতরুর কাণ্ডে মস্তক রাখিয়া তিনি বহুক্ষণ স্ত্রীলোকের মত রোদন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের যাতনা কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়?

প্রদোষে দেহসৎকারান্তে স্নান করিয়া মাষ্টার মহাশয় যখন শ্রান্তদেহে ব্যথিতহৃদয়ে গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার সহিত জমীদারের এক মোসাহেবের সাক্ষাৎ হইল; সে তখন বাবুর বাড়ী যাইতেছিল। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সে একটু হাসিয়া বলিল, "কি হে মাষ্টার! মাধবের ছেলে-টাকে মারিলে? জান ত—অনভ্যাসের চন্দনের ফোঁটায় কপাল চচ্চড় করে, গরিবের ছেলের অত সহিবে কেন?"

মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে একটা কি ছিল, যাহা অন্যায় সহিতে পারিত না; অন্যায় দেখিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠিত। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "যাহা হই-বার হইয়াছে, সে জন্য আমি কাহাকেও দোষী করিতে চাহি না। কিন্তু যদি কাহারও কোন দোষ থাকে, তবে সে তোমার মনিবের। আমি তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলাম। তাঁহার সাহায্য পাইলে, ভাল খাইতে পাইলে, ভাল স্থানে থাকিতে পারিলে, হয় ত বিনোদ মরিত না।"

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন।

মোসাহেবটিও এই কথা কেমন করিয়া বাড়াইয়া মনিবকে বলিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে জমীদারের বাড়ীর দিকে গেল।

৮

শ্রান্তদেহে, ব্যথিতহৃদয়ে, মাষ্টার মহাশয় আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিকের দ্রব্যাদির সহিত তাঁহার মৃত ছাত্রের স্মৃতি বিজড়িত। সেই সকল দ্রব্যাদি দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না। আপনার প্রিয়তম সন্তানের মত প্রিয় ছাত্রের মৃত্যুশোক কি সহজে যায়? আপনার সন্তান থাকিলেও বুঝি মাষ্টার মহাশয় তাহাকে এত ভালবাসিতে পারিতেন না।

ক্রমে রাত্রি হইল, বাজারের কোলাহল থামিয়া গেল। চারি দিকে গভীর নিস্তব্ধতা, কেবল জ্যোৎস্নালোকসমুজ্জ্বল অম্বরতলে নদী কলকল করিয়া বহিতে লাগিল। দাওয়া হইতে রুক্ষকণ্ঠে কে ডাকিল, "মাষ্টার!"

দ্বার মুক্ত করিয়া দাওয়ায় আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন, জমীদারের দুই জন পাইক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে ডাকিতে-ছিলে?"

চড়া গলায় এক জন উত্তর দিল, "হাঁ, তোমাকে জমীদারের বাড়ীতে যাইতে হইবে।"

মাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন, মোসাহেবের মুখে সেই কথা শুনিয়া জমীদার তাঁহাকে ধরিতে পাঠাইয়াছেন; জমীদারের গৃহে যাইলে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইবে। তিনি বলিলেন, "আমি যাইতে পারিব না।"

পাইক উত্তর করিল, "তোমাকে যাইতে হইবে।"

স্থির স্বরে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমি যাইব না।"

পাইক উত্তর করিল, "তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম আছে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমার দেহ স্পর্শ করিও না। সাবধান!"

এক জন পাইক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমাকে ধরিলে ভাল হইবে না।"

"কি হইবে?" বলিয়া এক জন পাইক অগ্রসর হইয়া মাষ্টার মহাশয়ের গণ্ডে চপেটাঘাত করিল।

উপর্য্যুপরি কয় দিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রিজাগরণে ও মনঃকষ্টে মাষ্টার মহাশয়ের শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পাইকের চপেটাঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাষ্টার মহাশয়ের অচেতন দেহ ঘরের দাওয়া হইতে নদীর নিম্নগ পাহাড়ের উপর গড়াইয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে পাইক দুই জনও লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহারা ধরিতে পারিবার পূর্ব্বেই সেই জন-কোলাহলহীন নিশীথে, সেই চন্দ্রালোকপুলকিত, বীচিভঙ্গবহুল নদীগর্ভে সে দেহ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * * *

পর দিন নিয়মিত সময়ে ছাত্রগণ শ্লেট, পেন্সিল ও পুস্তকাদি লইয়া স্কুলে আসিয়া শুনিল, মাষ্টার মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না।

সমাপ্ত।

ভানুমতী।

১—কমলে কামিনী।

শরৎ কাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুল কিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি; পূর্ব্বে বৃক্ষপল্লব-সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্ব্বতমালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎ শস্য-ক্ষেত্রখচিত তটভূমি। তাহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরুকাননশোভিত ছনুয়া, বড় ঘোনা, বড় বাঁকিয়া, পেকুয়া, গণ্ডামারা প্রভৃতি গ্রামাবলীর বর্ষাবিধৌত শ্যামকান্তি। উত্তরে বর্ষার পর্ব্বতপ্রবাহে পূর্ণকলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতা মুহুরী নদীর বিশাল রজতধারা। বালসূর্য্যের তরলসুবর্ণকরে মণ্ডিত হইয়া এই দৃশ্যাবলী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা কবির কল্পনাতীত, এবং চিত্রকরের চিন্তাতীত। কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে কুতুবদিয়া, মহেষখালী, সোনাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ বিশাল মরকতখণ্ডের মত ভাসিতেছিল। কুতুবদিয়ার উত্তরপ্রান্তস্থিত "বাতিঘর" একটি গগনস্পর্শী তালবৃক্ষের মত, মহেষখালীদ্বীপস্থ আদিনাথ পর্ব্বত মরকতস্তূপের মত, এবং তাহার শেখরস্থ আদিনাথের মন্দির প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের মত, নীলাকাশপটে শোভা পাইতেছিল। সোনাদিয়া বা সুবর্ণ দ্বীপের ভূম্যধিকারী অনাথনাথ সমুদ্রতীর-সংলগ্ন বজরার ছাদে বসিয়া, গাম্ভীর্য্যপূর্ণহৃদয়ে প্রকৃতির এই মহাশোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন—

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু; সুনীল সলিলরাশি,
রবির সুবর্ণ করে বিকাশি সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে, দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেন পুষ্পমালা ঢালি।
অনন্ত সিন্ধুর সেই অনন্ত অস্ফুট গীত
কি যেন অনন্ত স্মৃতি করিতেছে জাগরিত—
অতীত ও অনাগত, সুখ-দুঃখ-বিজড়িত,
সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর সংমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর!

খেলিছে তরঙ্গমালা শিরে ফেনপুষ্পরাশি,
সমুদ্রমন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরলহৃদয় সিন্ধু—তরঙ্গ অনন্তোচ্ছ্বাস।

প্রৌঢ় অনাথনাথ স্তম্ভিতভাবে ভক্তিপ্রপূরিত হৃদয়ে এই মহাদৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা যে উভয় অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও অসীমশক্তিসম্পন্ন, এই সিন্ধুগর্ভে বসিয়া সিন্ধু ও আকাশ দর্শন করিলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তিনি মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" বা চণ্ডীকাব্য সর্ব্বদা পড়িতেন ও তাহার গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। শরৎপ্রভাতে এই সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে দূরে তরঙ্গভঙ্গে যে ফেনরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছিল, উহা তাঁহার যেন একটি কমল-কানন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই কমলে যেন তিনি শ্রীমন্তের মত সেরূপ শিশু সহ ক্রীড়াশীলা একটি অপূর্ব্ব কামিনীও দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইল; তিনি তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সিন্ধুতীর মুখরিত করিয়া এবং তাঁহার সুকণ্ঠে সিন্ধু-নিনাদ প্লাবিত করিয়া স্থানীয় কবি ৺শ্যামাচরণের একটি গীত গাহিতে লাগিলেন,—

১

অপরূপ অতি শুন নরপতি,
কালীদহের জলে দেখেছি নয়নে,
পদ্মেতে পদ্মিনী, জিনি সৌদামিনী,
হেরিলাম কামিনী কমল-বনে।

২

বঙ্কিম-নয়নী জিনিয়া হরিণী,
কেশবেণী ফণী, বিদ্যুৎ-বরণী,
ধরি করিবরে ধনী গ্রাস করে,
ক্ষণেকে উদ্গার করিছে বদনে।

৩

ক্ষণে দেখি জলে, ক্ষণেকে কমলে,
চঞ্চলা লুকায় ক্ষণেকে অঞ্চলে,
চপলা চমকে ক্ষণে কুতূহলে,
ক্ষণে গজরাজ নিক্ষেপে গগনে।

কিন্তু এ কি ভ্রম! এ কি তাঁহার ভক্তিপ্রণোদিত কল্পনামাত্র? না, তিনি যেন সত্য সত্যই সেই ফেনপুঞ্জের মধ্যে শিশু সঙ্গে ক্রীড়াশীলা একটি রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি তরঙ্গপৃষ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টা—স্পষ্টতরা হইতেছে। ক্রমে তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গফেনায় প্রচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, যাহা এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, ক্ষুদ্র তরীর ক্ষুদ্র কর্ণখানি ধরিয়া যেন গৌরী স্বয়ং তরঙ্গে তরঙ্গে তরী সহ নাচিতেছেন, এবং নৌকার ছাদের উপর যে একটি ক্ষুদ্র শিশু নির্ভয়ে বসিয়া আছে, তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া এক হস্তে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি চুম্বন করিতেছেন। তরীর অন্য প্রান্তে বসিয়া একটি পুরুষ ও নারী দাঁড় টানিতেছে। নৌকা আরও নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন—

কিশোরী বালিকা সোনার পুতুল,
দুই হাতে হাল চাপি বক্ষে ধরি,
হেলিছে দুলিছে উঠিছে পড়িছে
তরঙ্গে তরঙ্গে কি লীলা করি!
নাচিছে তরণী, নাচিছে তরুণী,
এই উঠিতেছে পড়িতেছে এই,
মোচার খোলার মত ক্ষুদ্র তরী
এই দেখি আছে, এই দেখি নেই।
এই তরীআগা উঠিল আকাশে
হেলিয়া সম্মুখে হা'লে ভর করি,
চুম্বিল কিশোরী শিশুর বদন
বাম করে তারে হৃদয়ে ধরি।
এই তরী 'পাছা' উঠিল এবার,
তরঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ করি,
পড়িল সরিয়া কিশোরী কৌশলে
তরী-কর্ণ বক্ষে সাপটি ধরি।
আরক্ত বসনে আঁটা ক্ষীণ কটি,
মুক্ত কেশরাশি কেতন মত

উড়িছে পশ্চাতে সমুদ্র অনিলে
সৌন্দর্য্যের লীলা করিয়া কত।
গৌর বরণে, আরক্ত বসনে,
সদ্যঃস্নাত লীলাময়ী অলকায়,
শারদ রবির প্রভাত-কিরণ
ঝলসিছে, শোভা নাহি এ ধরায়।
তরঙ্গ-আঘাতে ক্ষুদ্র তরী যবে
ফেনরাশিগর্ভে হয় নিমজ্জিত,
কক্ষে বক্ষে হাল চাপিয়া কৌশলে,
দুই ভুজে শিশু করিয়া উত্থিত,
কভু শূন্যে তুলি দেখে তার মুখ,
কভু বক্ষে রাখি চুম্বে আদরিণী;
বোধ হয় মনে, এ নহে মানবী,—
সত্য কালীদহে "কমলে কামিনী"।

নৌকা ক্রমে আরও নিকটস্থ হইলে রমণীকণ্ঠের গীতধ্বনি যেন অনাথনাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ধ্বনি ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইল, যেন সমুদ্রের জীমূতগর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া একটি বাঁশি বাজিতেছে; কণ্ঠ এত উচ্চ, এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী। মরুসদৃশ সেই নির্জ্জন সমুদ্রগর্ভে একখানি তরী, তাহাতে শিশু সঙ্গে সেই ক্রীড়াময়ী কিশোরীমূর্ত্তি, এবং সেই কিশোরীর কণ্ঠে এই গীত। গীতের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ নাচিতেছে, তরণী নাচিতেছে, তরুণী নাচিতেছে, এবং দুই দাঁড়ে তাল রাখিতেছে। সাগরানিল রহিয়া রহিয়া স্বরলহরী বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রকপোত পক্ষসঞ্চালনে করতালিবৎ শব্দ করিয়া উড়িতেছে ও বসিতেছে, এবং তরঙ্গপৃষ্ঠে শ্বেত পদ্ম ফুলের মত শোভা পাইতেছে। দূর হইতে ইহারা ফেনরাশির সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার চক্ষে কমলকাননের ভ্রান্তি সঞ্চার করিয়াছিল। অনাথনাথ একমাত্র কর্ণসর্ব্বস্ব হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

"কেঁদ না কেঁদ না বাছা কাতর অন্তরে;
আমি এই চলিলাম অভয় দিতে বিজয়বসন্তেরে।
আমি আছি সদা,
ভক্তের প্রেমে বাঁধা,

(তা কি তুমি জান না হে ?)
আমি মশানে করেছি রক্ষা সাধু শ্রীমন্তেরে।"

অনাথনাথের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিতেছিল, এই গীতে তাহা চরিতার্থ হইল। তাঁহার হৃদয়-বীণা ও কিশোরীর হৃদয়-বাঁশী প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় নিনাদিত হইয়া একই তানে বাজিতেছিল। তাঁহার আবার ভ্রান্তি হইল; তিনি ভাবিলেন, এই তরুণী সত্য সত্যই শ্রীমন্তের বিপদসঞ্চারিণী এবং মশানে রক্ষাকারিণী "কমলে কামিনী"।

২—মুক্তকেশী।

নৌকা তাঁহার বজরার নিকটস্থ হইলে অনাথনাথ দেখিলেন, হালে দুর্গা-প্রতিমার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা, এবং তাহার সম্মুখে নৌকার ছাদের উপর বসিয়া চারি পাঁচ বৎসরের একটি অতি সুন্দর শিশু। দুইটিই স্নেহমণ্ডিত মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। কোমলতা, স্নেহ ও লাবণ্য, উভয়ের দেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেখিলেই বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে যেন ভ্রাতা ভগ্নীর মত স্নেহসম্পর্ক। যে দু'জন দাঁড় টানিতেছিল, অনাথনাথের তাহাদিগকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া বোধ হইল, এবং উভয়ের উৎকট দাম্পত্যপ্রেমালাপ শরতের দক্ষিণানিল এইরূপে তাঁহার কর্ণে আনিতে লাগিল।

স্বামী। না, সম্মুখে যদি বজরা দেখিয়া থাক, উহা স্থানীয় জমিদারের হইবে। নৌকা তাহার কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরে লাগাও।

স্ত্রী। তোর যেমন বুদ্ধি, উত্তরে কেন, দক্ষিণে লাগাও।

স্বামী। দক্ষিণের বাতাস। দক্ষিণে লাগাইলে আমাদের নৌকার বাতাস ও রান্নার ধোঁয়া জমিদারের বজরায় যাইবে, তিনি বিরক্ত হইবেন।

স্ত্রী। এখন বুঝি দক্ষিণের বাতাস ? অন্ধ কি সাধে ! বাতাস যে উত্তর দিক হইতে বহিতেছে, তাহাও টের পাইতেছ না ? আর কোথাকার জমিদার যে তাহার ভয়ে আমরা উত্তর দিকে নৌকা লাগাইব। লাগা নৌকা দক্ষিণ দিকে।

বালিকার মুখ ম্লান হইল, সে সভয়ে নৌকা দক্ষিণ দিকে লাগাইতেছিল, এমন সময়ে অনাথনাথের নৌকার মাঝি ও ভৃত্যগণ গর্জ্জন করিয়া নৌকার উত্তর দিকে লাগাইতে বলিল।

স্ত্রী। ওরে নবাব সিরাজদ্দৌলার বেটারে। ওঁদের হুকুম মত নৌকা লাগাতে হবে।

"কি, থাক মাগি" বলিয়া বজরা হইতে ভৃত্যগণ লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িতেছিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

রমণী তখন তাহার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে ইহারা গালি দিতেছে, মারিতে আসিতেছে, আর তুই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছিস্। অন্ধ আর কাহাকে বলে।"

স্বামী। আমি ত তখনই দক্ষিণ দিকে নৌকা লাগাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

স্ত্রী। তুই নিষেধ করিয়াছিলি, না আমি নিষেধ করিয়াছিলাম ? আমি বলিয়াছিলাম না উত্তরের বাতাস বহিতেছে, নৌকা দক্ষিণে লাগান ভাল হইবে না ? আমারই দোষ, সর্ব্বদা আমারই দোষ, আমি মন্দ।

শেষ কথা কটি রমণী তাহার বদনব্যাপী বিপুল নাসিকা হইতে নির্গত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৌকার 'পালা' পুতিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল, "এখনও ধর্ম্ম আছে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হয়। আমি ভাল মানুষের মত কথাটি বলিলাম, তার জন্য তাহারা এত গালি দিল, মারিতে আসিল। তার উপর স্বামীর এই গালি ও তিরস্কার। হা ঈশ্বর! তুমি ইহার বিচার করিবে। আমি মন্দ, আমার জিহ্বা বিষ, আর সকলের জিহ্বায় অমৃত।"

পালাপোতা হইলে উঠিয়া গিয়া বালিকাটিকে এক প্রস্থ প্রহার করিল, "লক্ষ্মীছাড়ি ! আমার খাস, আমার কথা শুনিস না। আমি বলিলাম, নৌকা উত্তর দিকে লাগা, তুই দক্ষিণ দিকে লাগাইলি কেন ?" বালিকা চুপ করিয়া মার খাইল। রমণী নাসিকাপথে ক্রন্দন করিতে করিতে—যেন সমস্ত জগৎ তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে,—'ছহির' মধ্যে গিয়া শয্যা লইল। বজরার মাঝি মাল্লারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

বালিকা অশ্রুমোচন করিয়া ছহির মধ্যে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিতে লাগিল। "উঠ মা, নৌকাতে কিছুই খাবার নাই, কি রাঁধিব মা ? গোপাল এখনই খিদেয় কাঁদিতে আরম্ভ করিবে; জমিদারের বজরার কাছে খেলা করিলে দু' পয়সা পাইতে পারিব।"

স্ত্রী। আমি যাইতে পারিব না, আমার শরীরে সুখ নাই। এক দিকে খাটিতে খাটিতে মরি ; দিন রাত্রি অষ্ট প্রহরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও অবসর পাই না। আমার সোনার শরীর মাটি হইল। তাহার উপর এই গাল।

স্বামী নৌকার 'পাছায়' বসিয়া তাম্রকূট সাজিতে সাজিতে নেপথ্যে ইহা টিপ্পনী করিয়া বলিতেছিলেন, "খাটুনির মধ্যে যাহা হইতেছে এই।—মেয়েট সমস্ত দিন বাজি করে, তাহার পর রাঁধে, তাই বাপ বেটা দুটো খাইতে পায়।"

পতিপরায়ণা পত্নী এই টীকা শুনিতে পাইলেন না। মাঝিরা শুনিল ও হাসিয়া উঠিল।

দাম্পত্য প্রেমের এই মধুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় বজরা হইতে এক জন ভৃত্য ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি বাজিকর?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "হাঁ। হুজুর কি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাজি দেখিবেন?" ভৃত্য বলিল, "দেখিবেন, তোমরা শীঘ্র আইস।"

বেদিনী ঠাকুরাণী তখন অশ্রুজল মোচন করিয়া নৌকার ভিতর হইতে পূর্ব্ববৎ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিবে কি?" তাহার স্বামী বলিল, "বাবুর যাহা খুসি দিবেন। তাহা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?" বেদেনী তখন আবার জীমূতমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তুই আবার আমার সঙ্গে লাগতে আসিলি, আমি বাবু টাবু চিনি না, এই খাটিয়া আসিয়াছি, যদি বাবু হয়, দুই টাকা দেয় ত খেল্‌ব।"

অনাথনাথ স্বীকৃত হইলেন, বেদেনীর মন তখন বড়ই প্রসন্ন হইল। সে আট গণ্ডার বেশী কখনই পায় নাই, তাহাতে দুই টাকা। তার উপর বাবুকে সন্তুষ্ট করিলে টাকাটা সিকাটা আরও কোন দিবেন না? তখন সে মধুর কণ্ঠে "এই আমরা আসিতেছি" বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাজ সজ্জা করিতে লাগিল।

আর পাঁচ মিনিট পরে ঢোল বাজাইয়া তাহারা বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালক বালিকা দুটি রাধাকৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বালিকার হাত ধরিয়া বালক আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার চূড়া নাচিতেছে। ঢোলের শব্দ শুনিয়া সমস্ত দ্বীপের নরনারী ও বালকবালিকাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম বাজিকর নিজে কয়েকটি অদ্ভুত কৌশল দেখাইল। বেদেনীর খাটুনির মধ্যে মন্দিরা-বাদন, এবং বালকবালিকা যে বেদের সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিল, সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠের যোগদান। তাহা না দিলেই ভাল হইত। বেদের খেলার সময়ে বালিকা ঢোল বাজাইতেছিল। তাহার পর সে ও

লক ধড়াচূড়া ও মুকুট খুলিয়া ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যায়াম খিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, রমণীর দেহ নবনীত-ম; তাহাতে অস্থি নাই। সেই নবনীতাঙ্গে অদ্ভুত শক্তি ও কৌশল। এক কটি ব্যায়াম দেখিতে দেখিতে অনাথনাথের হৃদয়ে তাহার জীবনের জন্য াশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল; কিশোরী কখন রণে মহিষের বক্রশৃঙ্গ বাঁধিয়া বহু ঊর্দ্ধে দুই খুঁটার মধ্যে টাঙ্গান দড়ির উপর য়া শিশুটিকে অঙ্কে লইয়া দ্রুতবেগে হাঁটিয়া যাইতেছে, কখন বা দড়ির উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এক এক পা সরাইয়া নাচিতেছে। কখন বা শিশুটিকে র্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে। অনাথনাথ ত ক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, কিরূপে তরঙ্গে দোলায়মান তরীর হালে াড়াইয়া সে "কমলে কামিনী"র অভিনয় করিতে পারিয়াছিল। কখন সে বদিয়ার নাভিস্থ একটি উচ্চ বাঁশের উপর উঠিয়া, কখন এক পা, কখন এক স্ত, কখন বক্ষঃ কক্ষ পৃষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া নিরালম্ব নিরাশ্রয় ভাবে দীন য়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কখন সে চিৎ হইয়া ক্ষুদ্র দেহলতা-টিকে একটি চক্রে পরিণত করিয়া, এবং বক্ষের উপর শিশুটিকে দণ্ডায়মান রাখিয়া, মাটি হইতে একটি ক্ষুদ্র ছুয়ানি গোলাপসন্নিভ অধরৌষ্ঠে তুলিয়া ইতেছে। তাহার সেই স্বেদাক্ত, কুসুমকোমল মুখখানি দেখিয়া অনাথনাথের দয় করুণায় উছলিয়া উঠিল। বালিকা তাঁহার এই করুণভাব লক্ষ্য করিতে-ছিল, এবং এক একবার তাঁহার দিকে সস্নেহ করুণ কাতর দৃষ্টিতে দেখিতে-ছিল। তাহার পর বালিকা এক আম্রের আঁটি পুতিল। কিঞ্চিৎ পরে সে আঁটিতে বৃক্ষ হইল; আরও কিছু পরে তাহাতে আম্র ফলিল। সকলে দেখিল, প্রকৃত আম্রের ডাল ও তাহাতে আম্রের ফল। সর্ব্বশেষে বাজিকর একটি ক্ষুদ্র শিবির প্রস্তুত করিল, তাহার ভিতর সেই বালিকা প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বাজিকর বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিল, বালিকা নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তির মত একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারির অগ্রভাগের উপর বসিয়া আছে।

কিশোরী তখন অবলম্বনবিহীনা,
মুদ্রিত নীলাব্জনেত্র বসি শূন্যাসীনা।
বিমুক্ত কবরী আলুলায়িত কুঞ্চিত
করিয়াছে গ্রীবা অংস উরস আবৃত।

কেশ-অন্তরালে চারু মুখ অনিন্দিত,
শোভিতেছে পূর্ণচন্দ্র মেঘরেখাঙ্কিত।
ঈষৎ হেলিয়া গ্রীবা পড়িয়াছে বামে,
মাধুরী বসিয়া যেন করুণার ধ্যানে।
শোভিতেছে দেহলতা রক্তবাসাবৃতা,
সন্ধ্যার রক্তিমা যেন মেঘরেখাঙ্কিতা।
অবশ যুগল কর পড়ি অযতনে,
যেন অঙ্কপুষ্পপাত্রে চর্চ্চিত চন্দনে।
ক্রমে আরও মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে আকাশ,
বহিতেছে আরও বেগে সমুদ্রবাতাস।
কুঞ্চিত অলক কৃষ্ণ উড়িতেছে ধীরে,
তুলিয়া হিল্লোল নীল সরসীর নীরে।
মেঘাচ্ছন্ন সিন্ধুবেলা, পর্ব্বত, কানন,
ঢোলের গম্ভীর শব্দ, সমুদ্রগর্জ্জন,
গাম্ভীর্য্যপূর্ণিত বাজিকরের সঙ্গীত,
সোণার প্রতিমা শূন্যে বসিয়া মূর্চ্ছিত।
নিরাশ্রয়া, দীনাহীনা, চেতনবিহীনা,
কি করুণা, কাতরতা, কিবা মধুরিমা,
ভাসিছে নিশ্চল মুখে দেহ অবয়বে,
কি যেন করুণা ভিক্ষা করিছে নীরবে।
শিশুটি সে মুখ পানে চাহি অবিরল,
গাহিছে করুণকণ্ঠে নেত্র ছল ছল।

বাজিকর কিছু ক্ষণ পরে তরবারিখানিও সরাইয়া নিল, এবং অনাথনাথের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "ভানুমতী!"

অনাথনাথ এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন, দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ওমার খাইয়াম।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের তিন জন ছাত্র এই প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহাদের মধ্যে এক জন ধনবান হইলে অপর দুই জনের সহিত সে ধন সমভাবে ভাগ করিয়া লইবে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই তিন জনই কোন না কোন প্রকার খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে নিজাম উলমুলকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। তিনি সুলতানের উজীর হইয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। হাসানবিন সব্বা তত্রত্য বিশেষবিখ্যাত হত্যাকারী সম্প্রদায় সংস্থাপিত করেন, এবং পরিশেষে তাঁহারই সম্প্রদায়ের লোক নিজাম উলমুলককে হত্যা করে। এই বন্ধুত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির নাম ওমার খাইয়াম।

ওমারের পিতা তাম্বুনির্ম্মাতার কার্য্য করিতেন। অল্প দিন হইল, প্রতীচ্যে ওমারের কবিতার আদর হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে পারস্যের পঞ্জিকা সংশোধক বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি ছিল।

পরিচয়।

প্রতীচ্যে জ্যোতিষী ওমারের খ্যাতি ছিল, কবি ওমারকে কেহ চিনিত না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফিট্‌জেরাল্ড প্রথমে ওমারের কতকগুলি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ওমারের কবিতার সহিত বিদেশীদিগের সেই প্রথম পরিচয়। আজ ওমারের কবিতার অসাধারণ আদর;—এখন ওমারের অঙ্কশাস্ত্রবিষয়ক ও জ্যোতিষসম্বন্ধীয় গ্রন্থ অতি অল্প লোকেই পাঠ করিয়া থাকে।

ওমারের কবিতার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদই প্রথম। পুনঃপুনঃ নকলে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত নানা ভুলে, মূল কবিতাগুলি পূর্ণ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন যে সকল কবিতা ওমারের বলিয়া চলিতেছে, সে সকলই তাঁহার কি না সন্দেহ। প্রাচীন রচনার এই সকল বিপদের কথা

অনুবাদ।

সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগীকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ওমারের কবিতার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, সে সকল কবিতা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যে ছন্দে ওমারের কবিতা সকল রচিত, সে ছন্দ তাঁহার আপনার নহে; পরন্তু তাহা পারস্যের কবিকুলের প্রায় সকলেই ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার প্রতি শ্লোক চারি ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহারই রচনায় এত বৈচিত্র্য আছে যে, রচনা একঘেয়ে বলিয়া মনেই হয় না। দুঃখের বিষয়, ওমারের বহু অনুবাদকের মধ্যে কেহই তাঁহার ছন্দ রাখিয়া অনুবাদ করিবার চেষ্টা করেন নাই; তাই অনুবাদ পাঠ করিয়া মূলের ভাষালালিত্য বুঝিবার কোনও উপায় নাই। তবে ফিট্‌জেরাল্ড অনুবাদে যে ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও বড় মধুর। অন্য অনুবাদকগণও ফিট্‌জেরাল্ডের পথানুসরণ করিয়াছেন। কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতের যত্নে যদি ওমারের কবিতার মূলগুলির একটা সংশোধিত সংস্করণ প্রচারিত হয়, এবং ফিট্‌জেরাল্ডের মত অনুবাদে সিদ্ধহস্ত কোনও কবি ওমারের ছন্দ রাখিয়া তাহার অনুবাদ প্রকাশ করেন, তবে মূলের ভাষানভিজ্ঞ পাঠকও ওমারের কবিতার ভাবের ও ভাষার মাধুরী উপভোগের অবসর পাইবেন।

ওমারের প্রেমের কবিতাগুলি এক হিসাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দের মত। এক জন তাহার ভাষাগত সরল অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট, আর নানা দল তাহার নানারূপ "আধ্যাত্মিক" অর্থ বাহির করিতে ব্যগ্র। ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদে তিনি সহজ সরল অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন,—"আধ্যাত্মিক" অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া আপনি কষ্ট পান নাই, পাঠককেও কষ্ট দান করেন নাই।

প্রেমের কবিতা।

ওমারের প্রেমের কবিতাগুলি বড়ই মধুর। ভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হইলেও সে সকল অতি মধুর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমেরিকান কবি পোয়ের মতে, মৃত্যু যখন সৌন্দর্য্যের সহিত সম্মিলিত হয়, তখনই তাহার কবিত্ব বর্দ্ধিত হয়। জগতে সর্ব্বত্রই রূপসীর মৃত্যু কবিতার একটি প্রধান বিষয়। ওমার সে বিষয় লইয়া যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, হুইন্‌ফিল্ডের কৃত অনুবাদ হইতে আমরা তাহার একটির অনুবাদ প্রদান করিলাম,—

যেথায় দেখিবে তুমি গোলাপ রয়েছে ফুটি,
জানিও—পড়েছে সেথা নৃপতির রক্ত ছুটি ;
যথা নিশিগন্ধা মেলে কুসুম-নয়ন তার,—
সেথা ভূমিতলে আছে রূপসীর দেহভার।

আমেরিকান কবি পার্ণারের কৃত অনুবাদ হইতে আমরা আর একটি কবিতার অনুবাদ প্রদান করিলাম,—

এই যে নদীর তীরে ফুটিয়া উঠেছে ফুল,
কে জানে অধর কার পরশিছে এর মূল ?
ধীরে ধীরে ফেল পদ শ্যামতৃণ-ভরা কূলে,
কে জানে কে নিদ্রাগত হেথায় সকল ভুলে ?

ওমারের এই সকল মধুর কবিতা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, জার্ম্মান কবি হায়েনের ক্ষুদ্র কবিতাগুলিই কেবল সৌন্দর্য্যে ওমারের কবিতার সহিত তুলিত হইতে পারে।

প্রেমের কবিতা ব্যতীত ওমার আরও অনেক প্রকার কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল কবিতা ওমারের রচিত বলিয়া প্রথিত, সে সকল কবিতাই ওমারের রচিত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এখানে আমরা ওমারের কবিতার হুইন্‌ফিল্ড-কৃত অনুবাদ হইতে একটি ভিন্নবিষয়িণী কবিতার অনুবাদ প্রদান করিলাম,—

অদৃষ্টের অনুজ্ঞায় কত শত হৃদি ভাঙ্গি যায়,
অর্দ্ধস্ফুট ফুল কত না ফুটিয়া ভূমিতে লুটায় ;
জীবনের, যৌবনের গর্ব্ব তবে করিও না অত,
না ফুটিতে ঝরি যায় মুকুলেই ফুল কত শত।

ওমারের ধর্ম্মমত লইয়া নানা তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে তাঁহাকে ভিন্ন-ভিন্ন-ধর্ম্মমতাবলম্বী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমাদিগের,

ধর্ম্ম-মত।

বিশ্বাস, তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত-সুন্দরের সত্ত্বা অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে ওমারের ভক্তির সূর্য্যালোক সময় সময় সন্দেহের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, আবার তাহা কখনও পূর্ণোজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ওমারের কবিতার অন্যতম অনুবাদক লুগালিয়ে বলেন যে, এক পাত্র মদ্য পান করিয়া ওমার ঈশ্বরের নিন্দা করেন, দ্বিতীয় পাত্র পান শেষ করিয়া ঈশ্বরের গুণগান করেন।

এই অসীমরহস্যময় বিশ্বে যখনই জীবন অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হয়, যখন জীবন ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস হয়, যখনই মনে হয়,—ইহলোকের পর আর কিছুই নাই, তখনই বোধ হয়, বর্ত্তমানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ সমর্পণ করাই আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য ; তখনই বোধ হয়, বর্ত্তমানে সুখলাভের চেষ্টা করাই উচিত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় বর্ত্তমানের সুখ অবহেলা করা মূর্খের কার্য্য। যদি সত্যই বর্ত্তমানের পর আর কিছু না থাকে, তবে রোমান কবি হরেস ও পারসীক কবি ওমার যাহা বলেন, তাহা মিথ্যা নহে। হরেস বলেন, "বসন্তের

ফুলকুল চিরদিন সমান সুন্দর থাকে না, চন্দ্রের করজালও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, তবে অনন্তের অজ্ঞেয় চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইয়া মর কেন ?"

ওমার তাঁহার একটি কবিতায় এ সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, ফিট্‌জেরাল্ড-কৃত অনুবাদ হইতে আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম ;—

আমরা ত নিরন্তর চলেছি সকলে,
ছায়াবাজি-চিত্র যথা যায় দলে দলে।
সূর্য্যালোকে আলোকরা,
শোভে এই বসুন্ধরা,
করি মোরা চৌদিকে ভ্রমণ—
চলি শুধু যেই পথে বাজিকর চালায় যখন।

এ ত শুধু মুহূর্ত্তের তরে অবস্থান,
প্রান্তরে মুহূর্ত্ত তরে প্রাণবারিপান ;
মুহূর্ত্তের পরে সবে
সেথা উপনীত হ'বে—
যেথা কই—কিছু নাই আর !
যেথা হ'তে এসেছিল, সেথা গিয়া মিলিবে আবার।

গৌরবের তরে কেহ ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
কেহ খুঁজে মৃত্যুপারে স্বরগ-আবাস ;—
নগদ যা' কিছু পাও,
তাই সাথে লয়ে যাও,
ধারে কাজ বৃথা বলে গণি,—
কি কাজ শুনিয়া কোথা দূরে উঠে দুন্দুভির ধ্বনি ?

পূর্ণ কর মদ্যপাত্র ; বসন্ত অনলে
অনুতাপ শীতবস্ত্র নিক্ষেপ সকলে ;
এই কথা বুঝি সার—
সময়-বিহঙ্গ আর
করিবে না অধিক গমন,
উড়েছে পবনপথে, দেখ ওই মেলিয়া নয়ন।

এর পরে আছে কিছু এই ভাবি মনে
ত্যজিব কি সব সুখ এ মর জীবনে ?
এই জীবনের পরে
মদ্য পা'ব আশা ক'রে
ভাঙ্গিব কি পানপাত্র মোর—
ভাবি সেই মদ্যপানে পাইব কি মহানন্দ ঘোর ?

স্বরগের আশা আছে, নরকের ভয়,
আমি জানি এ জীবন বেশী দিন নয় ;
এই কথা সত্য জানি

আর সব মিথ্যা মানি;
এই কথা জানি আমি সার—
যে ফুল বারেক ফুটে, ফুটে না সে কখন আবার।

যে পাঠক কেবলমাত্র এই কবিতাটি বা কেবল এইরূপ কোনও একটি কবিতা পাঠ করিবেন, তিনি ওমারের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একরূপ বিশ্বাস করিবেন। সে বিশ্বাস সত্য কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে. ওমারের ধর্ম্মমত বুঝিতে হইলে, ওমারের বহু কবিতা পাঠ করিতে হইবে; তাহা না হইলে ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিবার সম্ভাবনাই অত্যন্ত অধিক। ওমার জগতের মানব—তিনি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দেবতা নহেন। কাজেই পাপ প্রলোভন হইতে ওমারও একেবারে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার কবিতাতেও আমরা তাহার নিদর্শন পাইয়া থাকি। ওমার প্রকৃত কবির মত হৃদয়ে যখন যে ভাব উদিত হইয়াছে, তখন সেই ভাবই আপনার কবিতায় লিখিয়া অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা ওমারের কবিতার অন্যতম অনুবাদক লুগালিয়ের কৃত অনুবাদ হইতে একটি কবিতার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম;—

বাম করে রাখিয়াছি কোরাণ পুস্তক ধ'রে,
মদ্যপূর্ণ পানপাত্র ধরেছি দক্ষিণ করে;
ঈশ্বরের দৃষ্টিপথে এমনি দাঁড়ায়ে রই,
সাধু আমি নহি, কিন্তু নরকের কীট(ও) নই।

প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। কাজেই হুইনফিল্ড-কৃত অনুবাদ হইতে ওমারের আর একটি কবিতার অনুবাদ প্রদান করিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এই কবিতা হইতে ওমারের প্রকৃত ধর্ম্মমতের কতটা আভাস পাওয়া যাইবে।

পাতিয়া রেখেছ ফাঁদ, তুমি মোর পথময়,
পড়িলে সে ফাঁদে, তুমি দেখাও নরকভয়!
তোমার নিয়মে চলে এ অসীম ধরাতল,
তুমি যা করাও করি; তবু তুমি পাপী বল।
হৃদয়ের চিন্তারাশি নহে তব অগোচর,
বিপদ সময়ে কর প্রসারিত স্নেহকর।
ক্ষমা তবে কর প্রভো, দাও মোরে অনুতাপ,
বিপদ-সময়ে তুমি ক্ষম সকলের পাপ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

জাপান ও জাপানী।

জাপানের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাপান আমাদিগের নিকট স্বপ্নরাজ্য। সেখানকার খর্ব্বাকৃতি অধিবাসিগণ সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরে, বর্ণবৈচিত্র্যবহুল বেশে সজ্জিত হয়, ছোট ছোট পেয়ালায় চা পান করে ও চিন্তাক্লেশহীন জীবন যাপন করে। আমেরিকান ধর্ম্মযাজক পিরীর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা জাপানের ও জাপানীদিগের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

জাপানীদিগের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০ বৎসর হইতে জাপানের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু অতিপ্রাচীন লিখিত বৃত্তান্ত সকল ও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত নহে। তৎপূর্ব্বে কেবল দেবদেবীর কল্পিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। লেখকের মতে, ৪৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানের ইতিহাস পাওয়া যায়। জাপানী পুরাণে জগৎসৃষ্টির কোনও বিশেষ বিবরণ নাই। জাপানী পুরাণের মতে সৃষ্টির আদিতে জড় জগৎ বর্ত্তমান ছিল;—সেই জড়জগৎ হইতে পৃথ্বী ও ব্যোম উদ্ভূত হয়। তাহার পর প্রথমে এক জন ও তৎপরে আর চারি জন স্বয়ম্ভু দেবতার আবির্ভাব হয়। ইঁহারাই জড় জগৎকে কাষ্ঠ, অগ্নি, ধাতু, ভূমি ও জলে বিভক্ত করেন। ইহার পর এই দেবকুলে ইজানাগী ও ইজানামী নামক ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্ম হয়। ইঁহারাই বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, জাপানের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ ও অসংখ্য দেবদেবীর জন্ম দান করেন। অগ্নি দেবতাকে প্রসব করিবার সময় ইজানামীর মৃত্যু হয়। শোকার্ত্ত পতি, পত্নীর অনুসন্ধানে পাতালে প্রেতপুরীতে গিয়া পত্নীকে তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। পত্নী স্বীকৃতা হইয়া সে স্থানের দেবকুলের অনুমতি আনিতে গমন করিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইলে, পতি তাঁহার অনুসৃত পথে গিয়া দেখিলেন, পত্নীর মৃতদেহ গলিত শবে পরিণত হইয়াছে—আর সেই গলিতশবমধ্যে অষ্টবজ্রদেবতা উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। নিরাশ পতি জাপানে ফিরিয়া কোনও নদীর নির্ম্মল নীরে অবগাহন করিয়া দেহ পবিত্র করেন। অবগাহনকালে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এমন কি, তাঁহার বস্ত্র হইতেও দেবকুল উদ্ভূত হইলেন। সূর্য্যদেবী তাঁহার বাম চক্ষু হইতে ও চন্দ্রদেব তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু হইতে উৎপন্ন।

ইতিহাস ও কল্পনা।

জাপানের পৌরাণিকযুগের দেবদেবীগণের বৃত্তান্তের সহিত সম্রাটদিগের বৃত্তান্ত বিজড়িত। জাপানীদিগের মতে, প্রথম সম্রাট খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্ঞী জিঙ্গো সেনাদল সংগ্রহ করিয়া মৎস্যকুলের সাহায্যে সেনাদলকে জলবিস্তার উত্তীর্ণ করাইয়া কোরিয়া অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে মিকাডো কুলের রাজ্য আরব্ধ হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে চীন দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম আনীত হয়। এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্বল মিকাডোগণ নামমাত্র সম্রাট; দেশশাসনের ভার অভিজাতবংশীয়গণের হস্তেই সমর্পিত।

রাজ-শাসন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগিজগণ জাপান দেখে। ইহার পরই জেসুইট ধর্ম্মযাজকদল জাপানে উপনীত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। কোনও প্রাচীনধর্ম্মাবলম্বী জাতির মধ্যে শত-সূক্ষ্ম-নিয়মবদ্ধ কোনও নবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইলে, প্রথমেই অনেক অজ্ঞ লোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে। জাপানেও তাহাই হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সিন্ধুপরপারবাসী পোপের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। রোম্যান-ক্যাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী স্পেনের তখন প্রাধান্য। স্পেনের কোনও জাহাজের কাপ্তেন একবার জাপানের কোনও অভিজাতবংশীয় ব্যক্তিকে মানচিত্রে স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্য দেখাইতেছিলেন। জাপানী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া স্পেন রাজ্য এই বৃহৎ সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন? কাপ্তেন উত্তর করিয়াছিলেন যে, স্পেনরাজ প্রথমে দেশে ধর্ম্মযাজক পাঠাইয়া দেশবাসিগণকে বশ করিয়া লয়েন, পরে সৈন্য প্রেরণ করেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশীয়গণ সৈন্যদিগের সাহায্য করিলে দেশ অধিকার করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। এই কথায় ও ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহে জাপানীদিগের সন্দেহের

খৃষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

সূত্রপাত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। তখন জাপানে দশ লক্ষেরও অধিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল। যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল; অবশিষ্ট সকলেই নিহত হইয়াছিল। খৃষ্টানদিগকে খড় জড়াইয়া অঙ্গারস্তূপে ফেলিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত। ক্রশ ভাঙ্গিয়া সেই কাষ্ঠে অনেককে দগ্ধ করা হইয়াছিল। পরিশেষে ত্রিশ সহস্র দেশীয় খৃষ্টান একটি সুবৃহৎ দুর্গে গিয়া আক্রমণরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। চারি মাস আক্রমণরোধের পর তাহারা পরাজিত হইয়া সকলেই নিহত হয়। দেশ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম বিতাড়িত হইল। ইহার পর কেবল বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বিদেশীয়গণ পদার্পণ করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এমন কি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও জাপানের রাজপথপার্শ্বে এই ইস্তাহার দেখিতে পাওয়া যাইত,—

"যত দিন সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তপ্ত করিবে, তত দিন যেন কোনও খৃষ্টান জাপানে আসিতে সাহসী না হয়। সকলে এই কথা জানুক যে, যদি স্পেনের রাজা স্বয়ং, বা খৃষ্টানের ঈশ্বর, বা পরমেশ্বর স্বয়ং এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁহারও শিরশ্ছেদন হইবে।"

যাহা হউক, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন বিদেশীয়গণ জাপানে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তখন ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ যাইয়া দেখেন যে, কোনও কোনও পল্লীগ্রামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায় খৃষ্টধর্ম্ম তখনও বর্ত্তমান।

সিণ্টো ধর্ম্মই রাজ্যের অভিজাতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম। সিণ্টো ধর্ম্ম এক প্রকার পূজাপদ্ধতি-মাত্র। মিকাডোর আজ্ঞাপালনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

অন্যান্য ধর্ম্ম।

বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, এখনও বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ প্রভাব। জাপানে কনফুমিয়ানিস্‌মেরও ভক্ত অনেক। আবার গত এক শত বৎসরের মধ্যে টেন্‌রিকিও নামক এক নবধর্ম্ম বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কৌতুকের বিষয় এই যে, জাপানে একধর্ম্মাবলম্বন অর্থে অন্যধর্ম্মত্যাগ নহে। বহু জাপানী একাধিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, কেহ কেহ প্রচলিত সকল ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

জাপানী কায়দায় ভদ্রতার মাত্রাধিক্য দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কাহাকেও কোনও উপহার দিতে হইলে বলিতে হয়, "এ জিনিষটা এতই সস্তা ও সামান্য যে,

ভদ্রতার মাত্রাধিক্য।

আপনার সম্মুখে আনিতে লজ্জা করে।" নিমন্ত্রিতদিগকে "উপযুক্ত রাজভোগ" দিয়া বলিতে হয়, "এত সামান্য ও অপরিষ্কার আহার্য্য আপনাদের পাতে দেওয়া অন্যায়। ক্ষমা করিবেন।" দুই জন বন্ধুতে পথে সাক্ষাৎ হইলে টুপি তুলিয়া নমস্কারান্তে কিরূপ আলাপ হয়, তাহার একটা নমুনা এখানে প্রদত্ত হইল,—

ক। আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইবার সৌভাগ্য আমার বহুদিন হয় নাই।

খ। আপনার সহিত ইহার পূর্ব্ববার যখন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন আমি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম।

ক। আমিই রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম;—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

খ। আপনার মহান্ স্বাস্থ্য এখন কেমন?

ক। খুব ভাল। আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খ। আপনার মহিমান্বিতা পত্নী ভাল আছেন ত?

ক। আপনাকে ধন্যবাদ। কুঁড়ে বুড়ী ভাল আছে।

খ। আপনার কুমারতুল্য সন্তানগুলি কেমন আছে?

ক। আপনার অনুগ্রহের জন্য সহস্র ধন্যবাদ। দুরন্ত অপরিষ্কার হতভাগারা ভালই আছে।

খ। আমি এখন একটা পচা গলিতে বাস করিতেছি। আমার বাটী ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কার, আপনি যদি সহ্য করিতে পারেন, তবে এক দিন আমার গৃহে যাইয়া আমাকে সম্মানিত করিয়া বাধিত করিবেন।

ক। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিবার উপযুক্ত ভাষা পাইতেছি না। আমি শীঘ্রই আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, আমার এই অপদার্থ দেহ আপনার সম্মুখে লইয়া কৃতার্থ হইব।

রাজপথে শিশুর সহিত কথা কহিতে হইলেও বৃদ্ধ টুপি খুলিয়া তবে কথা কহিবেন। কোনও উচ্চস্থান হইতে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করা অভদ্রতা; সেই জন্য যে দিন সম্রাট বা কোনও উচ্চপদস্থিত ব্যক্তি পথে গমন করেন, সে দিন অধিবাসীদিগকে গৃহের দ্বিতলস্থ কক্ষ হইতে নামিয়া আসিতে হয়। লেখক ও তাঁহার এক বন্ধু এক দিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; সঙ্গে বন্ধুর অল্পবয়স্ক পুত্র। সেই সময় কোনও অভিজাতবংশীয়া মহিলা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বন্ধু পুত্রকে তুলিয়া ধরেন। পাহারাওয়ালা আসিয়া তখনই বালককে নামাইয়া দিতে আদেশ করিল।

জাপানীগণ প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত দুঃখের বাহ্যিক চিহ্নমাত্র কঠোরতার কঠিন আবরণে বিলুপ্ত করিতে চাহে। কেহ সন্তানের মৃত্যুর কথা বলিবার সময় জোর করিয়াও

কঠোরতা।

হাসিয়া থাকে। প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত জাপানীগণ জীবনকে ঘৃণা করে, এবং মরণ মঙ্গলাস্পদ বলিয়া মনে করে। ইহার কারণ, জাপানীদিগের মতে কেহ একাকী কিছুই নহে, সমস্ত পরিবার অবশ্য আবশ্যক—আর বৌদ্ধমতে, জীবনই যত অনিষ্টের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

জাপানে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০০০ আত্মহত্যা হয়। অতি সামান্য কারণে জাপানীরা আত্মজীবন নষ্ট করে। এমন কি, এক বৎসর অজন্মা হইয়া ধান্য দুর্মূল্য হইলেই লোকে আত্ম-

আত্মহত্যা।

হত্যা করিয়া কষ্টমুক্ত হয়। অধিক কি, শীত গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ, গ্রীষ্মাধিক্যের মত সামান্য কারণেও লোকে আত্মহত্যা করে।

প্রাচীন নিয়মানুসারে যোদ্ধাদিগকে সাধারণ লোকের মতে মৃত্যুদণ্ডে করা যাইত না। কিন্তু জাপানীগণ জীবনকে এতই তুচ্ছ বলিয়া মনে করে যে, তাহাদিগকে দণ্ডদান করা অতি সহজসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আপনার উদর বিদীর্ণ করিয়া আত্মহত্যা করা অতি সম্মানজনক ও সর্ব্বপাপক্ষয়কর বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন এ প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কোনও অভিজাতবংশীয় যদি সাম্রাজ্যের অহিতকরণেচ্ছু বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তবে তাঁহাকে একখানি ক্ষুদ্র তরবারি পাঠান হইত। তিনি আহারান্তে মাদুরে বসিয়া উদরের বামপার্শ্বে তরবারি বসাইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অবিলম্বে মৃত্যু না ঘটিলে, এক জন ভৃত্য তরবারির আঘাতে প্রভুর শিরশ্ছেদন করিত।

বিবিধ।

গ্ল্যাডষ্টোনের দৈনন্দিন জীবন।

যে জ্যোতিষ্ক বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া আপনার ভাস্বর কিরণে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অম্বর উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, সে জ্যোতিষ্ক আজ চিরান্ধকারে আপনার কিরণজাল সংবৃত করিয়াছে। অসাধারণ বাগ্মী, প্রগাঢ় পণ্ডিত, পীড়িতের সহায়, ধর্ম্মপ্রাণ গ্ল্যাডষ্টোন

সূত্রপাত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার আরব্ধ হয়। তখন জাপানে দশ লক্ষেরও অধিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল। যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল; অবশিষ্ট সকলেই নিহত হইয়াছিল। খৃষ্টানদিগকে খড় জড়াইয়া অঙ্গারস্তূপে ফেলিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত। ক্রশ ভাঙ্গিয়া সেই কাষ্ঠেও অনেককে দগ্ধ করা হইয়াছিল। পরিশেষে ত্রিশ সহস্র দেশীয় খৃষ্টান একটি সুবৃহৎ গৃহে গিয়া আক্রমণরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। চারি মাস আক্রমণরোধের পর তাহারা পরাজিত হইয়া সকলেই নিহত হয়। দেশ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম বিতাড়িত হইল। ইহার পর কেবল বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বিদেশীয়গণ পদার্পণ করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এমন কি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও জাপানের রাজপথপার্শ্বে এই ইস্তাহার দেখিতে পাওয়া যাইত,—

"যত দিন সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তপ্ত করিবে, তত দিন যেন কোনও খৃষ্টান জাপানে আসিতে সাহসী না হয়। সকলে এই কথা জানুক যে, যদি স্পেনের রাজা স্বয়ং, বা খৃষ্টানের ঈশ্বর, বা পরমেশ্বর স্বয়ং এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁহারও শিরশ্ছেদন হইবে।"

যাহা হউক, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন বিদেশীয়গণ জাপানে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তখন ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ যাইয়া দেখেন যে, কোনও কোনও পল্লীগ্রামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায় খৃষ্টধর্ম্ম তখনও বর্ত্তমান।

সিণ্টো ধর্ম্মই রাজ্যের অভিজাতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম। সিণ্টো ধর্ম্ম এক প্রকার পূজাপদ্ধতি-মাত্র। মিকাডোর আজ্ঞাপালনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, এখনও বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ প্রভাব। জাপানে কনফুমিয়ানিস্‌মেরও ভক্ত অনেক। আবার গত এক শত বৎসরের মধ্যে টেন্‌রিকিও নামক এক নবধর্ম্ম বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কৌতুকের বিষয় এই যে, জাপানে একধর্ম্মাবলম্বন অর্থে অন্যধর্ম্মত্যাগ নহে। বহু জাপানী একাধিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, কেহ কেহ প্রচলিত সকল ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

অন্যান্য ধর্ম্ম।

জাপানী কায়দায় ভদ্রতার মাত্রাধিক্য দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কাহাকেও কোনও উপহার দিতে হইলে বলিতে হয়, "এ জিনিষটা এতই সস্তা ও সামান্য যে, আপনার সম্মুখে আনিতে লজ্জা করে।" নিমন্ত্রিতদিগকে "উপযুক্ত রাজভোগ" দিয়া বলিতে হয়, "এত সামান্য ও অপরিষ্কার আহার্য্য আপনাদের পাতে দেওয়া অন্যায়। ক্ষমা করিবেন।" দুই জন বন্ধুতে পথে সাক্ষাৎ হইলে টুপি তুলিয়া নমস্কারান্তে কিরূপ আলাপ হয়, তাহার একটা নমুনা এখানে প্রদত্ত হইল,—

ভদ্রতার মাত্রাধিক্য।

ক। আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইবার সৌভাগ্য আমার বহুদিন হয় নাই।

খ। আপনার সহিত ইহার পূর্ব্ববার যখন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন আমি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম।

ক। আমিই রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম;—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

খ। আপনার মহান্ স্বাস্থ্য এখন কেমন?

ক। খুব ভাল। আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খ। আপনার মহিমান্বিতা পত্নী ভাল আছেন ত?

ক। আপনাকে ধন্যবাদ। কুঁড়ে বুড়ী ভাল আছে।

খ। আপনার কুমারতুল্য সন্তানগুলি কেমন আছে?

ক। আপনার অনুগ্রহের জন্য সহস্র ধন্যবাদ। দুরন্ত অপরিষ্কার হতভাগারা ভালই আছে।

খ। আমি এখন একটা পচা গলিতে বাস করিতেছি। আমার বাটী ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কার, আপনি যদি সহ্য করিতে পারেন, তবে এক দিন আমার গৃহে যাইয়া আমাকে সম্মানিত করিয়া বাধিত করিবেন।

ক। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিবার উপযুক্ত ভাষা পাইতেছি না। আমি শীঘ্রই আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, আমার এই অপদার্থ দেহ আপনার সম্মুখে লইয়া কৃতার্থ হইব।

রাজপথে শিশুর সহিত কথা কহিতে হইলেও বৃদ্ধ টুপি খুলিয়া তবে কথা কহিবেন। কোনও উচ্চস্থান হইতে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করা অভদ্রতা; সেই জন্য যে দিন সম্রাট বা কোনও উচ্চপদস্থিত ব্যক্তি পথে গমন করেন, সে দিন অধিবাসীদিগকে গৃহের দ্বিতলস্থ কক্ষ হইতে নামিয়া আসিতে হয়। লেখক ও তাঁহার এক বন্ধু এক দিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; সঙ্গে বন্ধুর অল্পবয়স্ক পুত্র। সেই সময় কোনও অভিজাতবংশীয়া মহিলা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বন্ধু পুত্রকে তুলিয়া ধরেন। পাহারাওয়ালা আসিয়া তখনই বালককে নামাইয়া দিতে আদেশ করিল।

জাপানীগণ প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত দুঃখের বাহ্যিক চিহ্নমাত্র কঠোরতার কঠিন আবরণে বিলুপ্ত করিতে চাহে। কেহ সন্তানের মৃত্যুর কথা বলিবার সময় জোর করিয়াও হাসিয়া থাকে। প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত জাপানীগণ জীবনকে ঘৃণা করে, এবং মরণ মঙ্গলাস্পদ বলিয়া মনে করে। ইহার কারণ, জাপানীদিগের মতে কেহ একাকী কিছুই নহে, সমস্ত পরিবার অবশ্য আবশ্যক—আর বৌদ্ধমতে, জীবনই যত অনিষ্টের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

কঠোরতা।

জাপানে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০০০ আত্মহত্যা হয়। অতি সামান্য কারণে জাপানীরা আত্মজীবন নষ্ট করে। এমন কি, এক বৎসর অজন্মা হইয়া ধান্য দুর্মূল্য হইলেই লোকে আত্মহত্যা করিয়া কষ্টমুক্ত হয়। অধিক কি, শীত গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ, গ্রীষ্মাধিক্যের মত সামান্য কারণেও লোকে আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যা।

প্রাচীন নিয়মানুসারে যোদ্ধাদিগকে সাধারণ লোকের মতে মৃত্যুদণ্ডে করা যাইত না। কিন্তু জাপানীগণ জীবনকে এতই তুচ্ছ বলিয়া মনে করে যে, তাহাদিগকে দণ্ডদান করা অতি সহজসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আপনার উদর বিদীর্ণ করিয়া আত্মহত্যা করা অতি সম্মানজনক ও সর্ব্বপাপক্ষয়কর বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন এ প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কোনও অভিজাতবংশীয় যদি সাম্রাজ্যের অহিতকরণেচ্ছু বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তবে তাঁহাকে একখানি ক্ষুদ্র তরবারি পাঠান হইত। তিনি আহারান্তে মাদুরে বসিয়া উদরের বামপার্শ্বে তরবারি বসাইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অবিলম্বে মৃত্যু না ঘটিলে, এক জন ভৃত্য তরবারির আঘাতে প্রভুর শিরশ্ছেদন করিত।

বিবিধ।

গ্ল্যাডষ্টোনের দৈনন্দিন জীবন।

যে জ্যোতিষ্ক বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া আপনার ভাস্বর কিরণে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অম্বর উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, সে জ্যোতিষ্ক আজ চিরান্ধকারে আপনার কিরণজাল সংবৃত করিয়াছে। অসাধারণ বাগ্মী, প্রগাঢ় পণ্ডিত, পীড়িতের সহায়, ধর্ম্মপ্রাণ গ্ল্যাডষ্টোন

আজ মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত। বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলকার্য্যে বহু বর্ষ যাপন করিয়া গ্ল্যাডষ্টোন আজ মরণের অঙ্কে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চারি দিক হইতে একটা ইন্দ্রপাতজন্য দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে। গ্ল্যাডষ্টোনের বহুবিধকার্য্যময় জীবনের ও তাঁহার কার্য্য সকলের সমালোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তাঁহার কন্যার লিখিত বিবরণ হইতে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের আভাস দিতেছি।

গ্ল্যাডষ্টোনের জীবনের মূলমন্ত্রই ছিল—"অতিরিক্ত অধিক কাজে হাত দিও না,—এক সময়ে একাধিক কার্য্যও করিও না। আবার যে কার্য্য করিবে, সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহা সম্পন্ন করিবে।" বাল্যকালে এক দিন গ্ল্যাডষ্টোন যখন অধ্যয়নরত, সেই সময় এক জন দাসী তাঁহার জন্য ঔষধ আনিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন ঔষধ লইয়া যাও। আমি একেবারে দুই কাজ করিব কেমন করিয়া?"

জীবনের মূলমন্ত্র।

গ্ল্যাডষ্টোন যে কার্য্য করিতেন ভাল করিয়াই করিতেন। সেই জন্য কি ধর্ম্মতত্ত্বে, কি ভাষাসম্বন্ধে, কি রাজনৈতিক তর্কে, যিনি তাঁহার সহিত যে বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছেন, তিনি গ্ল্যাডষ্টোনকে সেই বিষয়ে পরম পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ দিতেন।

গ্ল্যাডষ্টোন অতি সদালাপী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, কেবল শ্রোতার কার্য্য না করিয়া, তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইত।

কার্য্যের সময় কোনরূপ বাধা দিলে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। কিন্তু একবার তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আর তাঁহার কাছে বসিয়া কথা কহিলেও তিনি তাহা শুনিতে পাইতেন না। তিনি সঙ্কল্পিত কার্য্যে অখণ্ড মনোযোগ দান করিতেন। তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তবে উত্তর প্রদান করিতেন। তিনি যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, ক্রীড়াতেও তাঁহার সেইরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দৃষ্ট হইত। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের সকল কার্য্য সুনিয়মে শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইত। প্রভাতে আট ঘটিকার সময় তিনি পুস্তকালয়ে উপস্থিত থাকিতেন; তাহার পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিন পোয়া পথ দূরস্থ গির্জ্জায় সাড়ে আট ঘটিকার মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রতিদিন ঈশ্বরোপাসনা করিতেন।

তিনি যখন গৃহে থাকিতেন, তখন কোনও পুত্র বা কোনও কন্যা পিতার পত্র বাছাই করিতেন। প্রতিদিন নানাবিষয়সম্বন্ধীয় এত পত্র আসিত যে, গড়ে পত্রের একদশমাংশ-মাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইত; ইহার মধ্যে তিনি অর্দ্ধাংশের উত্তর দিতেন। তিনি যখন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন অবশ্য তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার পত্র বাছাই করিতেন। যেখানেই হউক না কেন, তিনি প্রভাতে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। দুই ঘটিকার সময় আহারান্তে তিনি আবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন ও প্রায় একঘণ্টা কাল কার্য্যের পর বৃক্ষচ্ছেদনে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার মতে, বৃক্ষচ্ছেদনে অতি অল্প সময়ে যথেষ্ট শারীরিক শ্রম করা হয়। জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর আর তিনি বৃক্ষচ্ছেদন করিতে পারিতেন না—সে সময়টা নবনির্ম্মিত পুস্তকাগারেই কাটাইতেন।

তিনি প্রতিদিনই কতকগুলি প্রকাশকের মূল্যতালিকা দেখিতেন ও কোন না কোন পুস্তক আনিতে পাঠাইতেন। সাধারণতঃ, তিনি এক সময়ে তিন বিষয়ের তিনখানি পুস্তক কাছে রাখিতেন। তাঁহার আপনার মতে, আরিষ্টট্‌ল, সেণ্ট অগষ্টাইন, ড্যাণ্টে ও বাট্‌লার, ইঁহাদিগের রচিত গ্রন্থ তাঁহার উপর প্রভূত প্রভাব সংস্থাপিত করিয়াছিল।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় চা পান করিয়া তিনি আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তিন চারি মিনিটেই তাঁহাদের বেশপরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইত। সন্ধ্যাকালে আহারান্তে তিনি পাঠ আরম্ভ করিতেন। পাঠকালে সময় সময় চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। একবার শয়ন করিতে পারিলে তিনি সকল ভাবনা দূর করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। প্রভাতে তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে হইত। এমন কি, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে পার্লামেণ্টে Home Rule বিলে পরাজিত হইয়াও গৃহে ফিরিয়া তিনি নিয়মমত আট ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলেন। রবিবারে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বিশ্রাম করিতেন। সে দিন তিনি কোনও বাজে বই পড়িতেন না। বিশ্রামবারে তিনি কোনও পীড়িত বা শোকতপ্ত বন্ধুর গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না।

সুনিদ্রা ও শ্রমনাশ।

সন্ধ্যাকালে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন প্রায়ই উপন্যাস পাঠ করিতেন। কাজ করিয়া শ্রান্ত হইলে তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া শ্রম দূর করিতেন।

একবার মন্ত্রিদলের গঠনকালে Home Rule সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিতেছিলেন, Psalm সম্বন্ধে কোনও রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে Oriental Congressএ পাঠ করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের রচনাও চলিতেছিল। রচনাকালে রচনা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। একবার একটি প্রবন্ধের রচনাকালে সামান্য কয়টি কথার জন্য তিনি দুই ঘণ্টাকাল হিউমের গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরেপাঠ করিতেন; কিন্তু তাঁহার রচনা দ্রুত সম্পাদিত হইত। প্রথম লিখিবার পরে তাঁহার রচনার বিশেষ সংশোধন আবশ্যক হইত না।

গ্ল্যাড্‌ষ্টোন বলিতেন যে, টেনিসনের সহিত তাঁহার প্রণয়ের প্রধান কারণ—উভয়েই আড়ম্বরবিহীন শ্রমশীল জীবন যাপন করিতে ভালবাসিতেন। জীবনের সায়াহ্নেও তিনি নবনির্ম্মিত পুস্তকাগারে স্বহস্তে পঞ্চবিংশতি সহস্র পুস্তক বিষয়-বিভাগ করিয়া সাজাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লর্ড রোজবেরী সত্যই বলিয়াছেন—"যে জাতি হইতে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের উৎপত্তি, হয় ত সে জাতি হইতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ জন্মিতে পারেন; কিন্তু যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন সে জাতি তাঁহার স্মৃতিতে ও তাঁহার আদর্শে পূর্ণ থাকিবে।" গ্ল্যাড্‌ষ্টোন আপনি বলিয়াছেন যে, "উপদেশ মর্ম্মরমূর্ত্তির মত;—আদর্শ রক্তমাংসময় মানবের সহিত উপমেয়।" জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটা দ্রব্যের আদান-প্রদান যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়েও বন্ধ থাকে না—সে কেবল উচ্চ জীবনের আদর্শের আদান-প্রদান।

দিনেকের শিশু।

মাতৃগর্ভচ্যুত শিশু—বৃন্তচ্যুত ফুল,
শুইল ধরণী-অঙ্কে হ'য়ে নিদ্রাকুল।
বারেক মেলিল আঁখি, ফেলিল নিশ্বাস,
কত জন্ম পরিচয় মুহূর্ত্তে প্রকাশ!

মরণ শিয়রে বসি, গেয়ে মৃদু গান,
আদরে যতনে দিল ঢাকি দু'নয়ান,
শোকে দুঃখে ভূমে পড়ি মূর্চ্ছিতা জননী
শুনে দূর ধরাপ্রান্তে শিশুপদধ্বনি!

হে মায়াবী, দাঁড়াইয়া বৈতরণী-কূলে
কি ভাবিছ মনে মনে আঁখি দুটি তুলে!
আলুথালু মতিচ্ছন্না ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে!
কি আশা ভরসা তোর পেয়েছে বাতাসে!

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি।

"সুবিচারসমাগম" পত্রের জুন মাসের সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত বাসুদেব রাও আপ্‌টে, বি. এ. মহোদয় "আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি" সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে, মুম্বই (বোম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীদানসমারম্ভ-(Convocation)-কালে লর্ড স্যাণ্ড্‌হর্ষ্ট বলিয়াছিলেন,—Under the ancient Hindu System the young Brahmin had to undergo a severe and long continued discipline of the will as well as of the mind before he was permitted to enter upon the duties of a secular life. The ideal it set before itself, with its reverence for teachers and the aged, its rules of self-denial and its minutely prescribed duties show at least that to the men who established it, education ment more than the imparting of knowledge. প্রবন্ধারম্ভে লেখক বলিয়াছেন, লর্ড স্যাণ্ড্‌হর্ষ্টের মুখে উল্লিখিত বাণী শ্রবণ করিয়া, প্রাচীন আর্য্যদিগের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হয়। তিনি মনুসংহিতা, মহাভারত, আপস্তম্বসূত্র, আশ্বলায়নসূত্র ও গোতমসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ আলোড়ন করিয়া যে তথ্যসংগ্রহে সমর্থ হন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই একত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

লেখক বলেন, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ। বর্ণব্যবস্থার অপেক্ষা আশ্রমব্যবস্থার সহিত প্রাচীন আর্য্যদিগের শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ছিল। আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই প্রথমস্থানীয় ও জ্ঞানোপার্জ্জনের মুখ্যকালরূপে পরিগণিত। বেদের (জ্ঞানের) অপর নাম ব্রহ্ম; এই কারণে বেদের অধ্যয়নকারিগণ (জ্ঞানোপাসকগণ) ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইতেন। উপনয়ন না হইলে বেদপাঠের অধিকার জন্মিত না। উপনয়ন শব্দের অর্থ গুরুগৃহে উপনীত করা। সপ্তম বর্ষে ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়নের কাল নির্দ্দেশ করিয়া, শাস্ত্রকারগণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। উপনয়নের পূর্ব্বে বেদ-শিক্ষারম্ভ নিষিদ্ধ হওয়ায়, কোমল বয়সে বিদ্যাভ্যাসের চিন্তা বালকদিগকে সন্ত্রস্ত ও জর্জ্জরিত করিতে পারিত না। স্পেন্সার প্রভৃতি আধুনিক তত্ত্ববেত্তাদিগের মতও এ বিষয়ে প্রাচীন ঋষিগণের মতের অনুরূপ। শিক্ষারম্ভকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রাদেশপালনে অবহেলা বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানগণের দৈহিক অবনতির অন্যতম কারণ। উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন ত্রৈবর্ণিক আর্য্য বালকগণ "দ্বিজ" বা পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত (জ্ঞানরাজ্যে লব্ধজন্ম) আখ্যায় অভিহিত ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে (জ্ঞানোপাসকের ব্রতে) দীক্ষিত হইতেন। উপনয়নের পর বিদ্যাভ্যাসের জন্য দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে থাকিয়া, সে কালের ব্রহ্মচারিগণ যেরূপ শিক্ষা পাইতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সহিত তাঁহাদিগের হৃদয় ও আত্মা মহনীয় আদর্শের দিকে ধাবিত হইত। এই কারণে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে (ছাত্রাবস্থাকে) ঋষিগণ ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রথম সোপান, সদাচার-বৃক্ষের আদিবীজ, জীবিতসাফল্যের মুখ্য সাধন, স্বর্গদ্বারের একমাত্র কুঞ্চিকা প্রভৃতি বিবিধ গৌরবব্যঞ্জক রূপকাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকুমার ষোড়শ, ক্ষত্রিয়সন্তান দ্বাবিংশতি ও বৈশ্যপুত্র চতুর্বিংশতি বৎসরের মধ্যে (গুরুগৃহে) উপনীত না হইলে, শিষ্টজননিন্দিত "ব্রাত্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইত। ব্রাত্যত্বপ্রাপ্তির ভয়ে সে কালে সকলেই বালকগণের (গুরুগৃহে) "উপনয়নসংস্কার" সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেন। অধুনা

আমাদিগের দেশে উপনয়নসংস্কার প্রহসনমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায়, সেকালের জ্ঞানগৌরব ও শক্তি সামর্থ্য উপকথার স্থান অধিকার করিয়াছে।

মনুসংহিতাদি গ্রন্থে ব্রহ্মচারীর যেরূপ নিয়ম, ধর্ম্মপালন ও গুরুগৃহে থাকিয়া যে সকল শ্রমজনক কার্য্য করিবার বিধান আছে, তাহা পাঠ করিলে, সেকালের ঋষিসমাজ শরীরকে সুদৃঢ়, নীরোগ ও উদ্যমশীল করিতে কিরূপ যত্নবান ছিলেন, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়। যে সকল বালক ঐ সকল নিয়মপালনে অমনোযোগিতা প্রকাশ করিত, ঋষিগণ তাহাদিগকে বিফলবিদ্য, ব্রহ্মযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যলাভের অযোগ্য ও নিরয়গামী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

মানসিক শিক্ষাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম, বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষা, বা লিখন, পঠন ও অঙ্কপাত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। ২য়, মনোনিগ্রহ বা চিত্তসংযম। বুদ্ধি-বিষয়ক শিক্ষাকে আজকাল আমরা যতটা প্রাধান্য দিয়া থাকি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ততটা প্রাধান্য দিতেন না। তাঁহারা চিত্তসংযমকেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। লেখক বলেন, প্রাচীনকালে লেখনকলা অপরিজ্ঞাত থাকায়, প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে লিখন, পঠন ও অঙ্কপাত প্রভৃতি শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, এরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু উক্ত কলা আবিষ্কৃত হইবার পরও যে তাঁহাদিগের, ইংরাজীতে যাহাকে The three R's বলে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এরূপ মনে হয় না।

উপনয়নের পর গুরুগৃহে বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষাক্রম কিরূপ ছিল, তাহার স্পষ্ট বিস্তারিত উল্লেখ কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইৎসিং নামক চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভ্রমণ-কারী স্বপ্রণীত ভারত-ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তকে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে,— গুরুগৃহে গিয়া "বিদ্যার্থিগণ প্রথম ছয় মাসে ৪৯টি মূল বর্ণ ও ১০০০০ যুক্তাক্ষর শিক্ষা করিত। তাহার পর আট মাসের মধ্যে তাহাদিগকে পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলি মুখস্থ করিতে হইত। সূত্রপাঠ শেষ করিয়া বালকেরা "ধাতুরূপ" ও "খিল" নামক পরিশিষ্টত্রয় অভ্যাস করিত। সপরিশিষ্ট ব্যাকরণ শেষ হইলে তাহাদিগের প্রথম ত্রৈবার্ষিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর শিক্ষার্থীদিগের ব্যাকরণভাষ্য-অধ্যয়নের কাল। এই আট বৎসর কাল ক্রমাগত পাঠ অভ্যাস করিয়া বালকগণের স্মরণশক্তি এরূপ তীব্র হইয়া উঠিত যে, তাহারা বড় বড় গ্রন্থ একবারমাত্র পাঠ করিয়া মুখস্থ বলিতে পারিত।" ইৎসিংএর বর্ণিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে বেদাধ্যয়নের উল্লেখ না থাকিলেও, উহা ইহার পর আরব্ধ হইত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। কারণ সর্ব্বজ্ঞানের আকরস্বরূপ বেদের অধ্যয়ন ভিন্ন সে কালে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। আট বৎসর ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিলে ও স্মরণশক্তি প্রখরতা প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অবশিষ্ট চারি বৎসরের মধ্যে বেদাধ্যয়ন শেষ করা অসম্ভব নহে।

ইৎসিং সেকালের ছাত্রগণের স্মরণশক্তির যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাদিগের বুদ্ধির সেরূপ প্রশংসা করেন নাই। ইহা হইতে লেখক অনুমান করেন যে, যাহাতে ছাত্র-গণের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হইতে পারে, সেকালের শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহার কোনও উপায়-অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞানলাভের সহিত বালকেরা যাহাতে সংযত-চিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইতে পারে, তৎপ্রতি প্রাচীন আচার্য্যগণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বালকগণকে শ্রদ্ধালু, সুরুচিসম্পন্ন, কষ্টসহিষ্ণু ও শুদ্ধচিত্ত করাই আর্য্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য যত দিন অক্ষুণ্ণ ছিল, তত দিন ভারতের গৌরবসূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে বিরাজ করিতেছিলেন। আপস্তম্ব বলেন, কলিযুগের ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রত-

নিয়মসমূহ যথাযথ পালন করে না বলিয়া, তাহাদিগের মধ্যে কেহ প্রতিভাশালী ঋষি বা বেদমন্ত্রের স্রষ্টা হইতে পারে না। লেখকের মতে, শ্রদ্ধালুতা প্রভৃতি গুণশিক্ষার উপায়াভাবই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ। রেভারেণ্ড হোয়াইটহেড সাহেব মনে করেন, এই কারণেই প্রাচীন গ্রীক জাতির অধঃপতন হইয়াছিল।

গুরুগৃহে অবস্থানকালে ছাত্রদিগের ভোজনাচ্ছাদনাদির ব্যয়ভার আচার্য্যগণই বহন করিতেন। কদাচিৎ কোনও শিষ্য ভিক্ষান্নসেবী হইলেও, বস্ত্র পাত্রাদি শিক্ষকের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইত। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের সাহায্যে কৃষিকর্ম্ম ও গোসেবা দ্বারা যাহা লাভ করিতেন, তাহাতেই সশিষ্যে সন্তুষ্টচিত্তে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও কখনও দেশের নরপতিগণের নিকট তাঁহারা অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন।

কোনও ছাত্র শিক্ষার্থীদিগের পালনীয় নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহার প্রতি কি প্রকার কায়িক দণ্ডের বিধান করা হইত, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায় না। গোতমসূত্রে শিষ্যের প্রতি কঠোর কায়িক দণ্ডের বিধান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, "বাচনিক তিরস্কারে কোনও ফল না হইলে, আচার্য্য সূক্ষ্ম রজ্জু বা ক্ষুদ্র বেত দিয়া তাহাকে স্বয়ং মৃদুভাবে তাড়না করিবেন—অপরের প্রতি প্রহারের ভারার্পণ করিবেন না। এই নিয়মের অপালনে, গুরুপ্রহারে যদি কোনও ছাত্রের অঙ্গহানি প্রভৃতি গুরুতর অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে রাজা আচার্য্যকে অভিযুক্ত করিয়া যথোচিত দণ্ড প্রদান করিবেন।"

শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে বালকগণের যেরূপ উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইত, অধ্যয়নের পরিসমাপ্তি হইলেও সেইরূপ একটি সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতে হইত। (সেই সংস্কারকে "সমাবর্ত্তন" বলে।) সেই সংস্কার সম্পন্ন করিয়া, যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা দিয়া, শিষ্য স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। দ্বাদশবর্ষান্তে শিষ্যকে বিদায়প্রদানকালে, আচার্য্য বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদকণ্ঠে শিষ্যকে যে উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা, বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীদানসমারম্ভকালে প্রদত্ত উপদেশের অপেক্ষা কোনও অংশ ন্যূন নহে। এই উপদেশের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ের ১১ অনুবাদক হইতে লেখক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়া গায়ত্রী ও ব্রতাচরণাদি শিক্ষা করিত। তাহার পর, তাহারা শাস্ত্রাভ্যাসে অধিক সময় অতিবাহিত না করিয়া, স্ব স্ব ব্যবসায়শিক্ষার জন্য যথাস্থানে গমন করিতে পারিত।

সদয়, শুদ্ধচিত্ত, সুবিদ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থাশ্রমীকে আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শাস্ত্রকার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত গুণগ্রামসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ না হইলেও আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইতেন। কোনও কোনও ক্ষত্রিয় নরপতি ব্রাহ্মণগণকে উপনিষদ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, সেকালের শিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য রক্ষিত হইত না। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এবং পণ্ডিতসভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবিচারে আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়া বুধমণ্ডলীকে আশ্চর্য্য ও চমকিত করিতেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন,—They (women) even had legetimate influnce upon politics and administration (ancient India pp 187) রাজকন্যাগণকে লিখন, পঠন, চিত্রবিদ্যা ও নৃত্যগীতকলাদি শিক্ষা দিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর একখানি প্রস্তরলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়চূড়ামণি সোমরাজের মহারাষ্ট্রশাসনকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী শবল দেবী রাজসভায় নানাশাস্ত্র-

কলাপারদর্শী, নৃত্যগীতব্যুৎপন্ন বিদ্বজ্জনসমাজে সঙ্গীতকলায় স্বীয় অসাধারণনৈপুণ্য দেখাইয়া সামাজিকদিগকে পরিতুষ্ট ও মহারাষ্ট্রপতির নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। (J. A. S. Bom, July 1892,) স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অধুনা আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কারের কত দূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ইহা হইতে সম্যক বুঝিতে পারা যায়।

উপসংহারে লেখক নবদ্বীপের সংস্কৃত টোলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এখনও নদীয়া অঞ্চলে প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণে, সংস্কৃত পাঠশালার স্থাপন করিয়া আচার্য্যগণ ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রদিগের ব্যবহারের উপর প্রাচীন আচার্য্যগণের ন্যায় তাঁহাদিগেরও বিশেষ লক্ষ্য থাকে। কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন পূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়নে জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন করিয়াছেন, এরূপ প্রৌঢ় ছাত্র এখনও ঐ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্যশিক্ষাপ্রণালীর অনুকরণে স্থাপিত এইরূপ পাঠশালা নদীয়া ভিন্ন ভারতের আর কোথাও বিদ্যমান নাই।

রাণী মা চৌধুরানী।

"মাসিক-মনোরঞ্জনে"র মে মাসের সংখ্যায় দেবী চৌধুরাণীর সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত হরি পুরুষোত্তম মটঙ্গে মহাশয় দেবীকে রাণী মা, গোরী মা ও রাণী মা চৌধুরাণী নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেবীর কাহিনী বলিতে গিয়া ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাই, হোলকার-রাজবধূ অহল্যা বাই ও পাশ্চত্য বীরাঙ্গনা জোয়ান অফ্ আর্কের কথা লেখকের মনে পড়িয়াছে। ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার জন্য সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বীরাঙ্গনাদিগের সহিত সমকক্ষতা করিবার যোগ্যা মনস্বিনী বীরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল ভাবিয়া, লেখক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন; এবং বঙ্গবাসীর কলঙ্কমোচনকারিণী এই মহিলার বীরত্বকাহিনী সাদরে ও সগৌরবে স্বদেশীয় পাঠকগণের করে উপহার দিয়াছেন। আমরাও বঙ্গীয় পাঠককে লেখকের বিবৃত কাহিনীর আভাসে পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সৌভাগ্যশালী নবাব রাজ্যশাসনের নিরর্থক ক্লেশভার ও দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন; এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে বৃত্তিগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা মানবজীবনের সার্থকতসম্পাদনের প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হন। কেবল নবাবকে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার অবসর প্রদান করিলে কোম্পানী বাহাদুরের অপক্ষপাতিতায় দোষস্পর্শ করিতে পারে ভাবিয়া, অথবা নবাবের রাজকার্য্যপরিশ্রান্ত সামন্তবর্গ, ওমরাহ ও সর্দ্দারগণকে জীবনের শেষ কয়টা দিন বিশ্রামসুখে অতিবাহিত করিবার অবসর প্রদান করিবার জন্য, মহামতি ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তাঁহাদিগকে সমশ্রেণীস্থ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। কিন্তু নবাব যেরূপ শান্তশীল ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সামন্তগণ সেরূপ সুশীল ছিলেন না। তাঁহারা বিদেশী বণিকের এই অযাচিত উপকার সহ্য করিতে না পারিয়া, ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। রাজনীতি-চতুর ইংরাজ বণিকের বুদ্ধিকৌশলে ও বাহুবলপ্রভাবে পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াও, বিদ্রোহিগণ সহজে বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা কোম্পানীর সৈন্যের সহিত সম্মুখসংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কূট যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইংরাজ বণিকেরা নবরাজ্যলাভচেষ্টায় এ দেশে যে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, সর্দ্দার ও সামন্তগণের বিদ্রোহে তাহা দ্বিগুণ ভীষণভাব ধারণ করিল। দেশময় উৎকট অশান্তি ও

ঘোর অরাজকতার ঘনচ্ছায়া বিস্তৃত হইতে লাগিল। চোর ডাকাতের উপদ্রবে লোকের পথ চলা ভার হইল; বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার ও লুণ্ঠনপিপাসায় নিরীহ প্রজাকুলের ধন প্রাণ রক্ষা করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। প্রজাগণ কাতরকণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তাহা শুনে কে? নবাব তখন দুর্ব্বল ও শক্তিসামর্থ্যহীন, ইংরেজ প্রজার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিহীন ও স্বোদরপূরণে উন্মত্ত! সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে অচিরকালমধ্যে বঙ্গ দেশের অধিকাংশ বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইল।

কিন্তু এই সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে একটি অতি বিস্ময়কর জিনিষ ছিল। একটি রমণী—বিশেষতঃ একটি কোমলশরীরা বাঙ্গালী রমণী, এই বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন! এই শৌর্য্যশালিনী বঙ্গীয় অবলার প্রকৃত নাম ধাম বর্ত্তমান লেখকের নিকট যেরূপ সম্যক অপরিজ্ঞাত, তাঁহার অনুবর্ত্তী বিদ্রোহীদিগের নিকটও তাহা সেইরূপ রহস্যাবৃত ছিল। রাণী মা, চৌধুরাণী ও গৌরীমা প্রভৃতি গৌরবসূচক নামে তিনি জনসমাজে পরিচিতা ছিলেন। সেই বিদ্রোহের পূর্ব্বে কেহই তাঁহার নাম শুনে নাই। তাঁহার সেই বিদ্রোহে যোগ দিবার কারণও কেহ অবগত ছিল না। অজ্ঞ লোকে তাঁহাকে ভূভার-হরণার্থ অবতীর্ণা দেবী বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তাঁহার যে কখনও পরাজয় হইতে পারে, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিত না। চৌধুরাণীর নাম শুনিলে সেকালের সাহসী পুরুষেরও অন্তর ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িত। এই শূর অবলার নামোল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় জননীগণ দুষ্ট বালককে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেন।

বিদ্রোহীদিগের নেতৃত্বগ্রহণ করিবার পর, অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই এই কৃতান্তোপমা বীর-রমণী প্রায় সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলেন। তথাপি সে দিকে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। চৌধুরাণী অচিরে আপনাকে বঙ্গ দেশের রাণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং দেশের দস্যুদলকে একত্র করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মহাসমরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইংরাজদিগকে এই পুণ্যভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, বঙ্গের অনেক বড় বড় জমিদার আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। রাণীর প্রবলতালাভের সংবাদ হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইলেও, তিনি রাণীমাকে সামান্য অবলাজ্ঞানে তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রাণীর দস্যুসৈন্যগণ সহসা একদিন কলিকাতার কোনও বর্দ্ধিষ্ণু বণিকের কুঠী আক্রমণ করিলে, হেষ্টিংসের ভ্রম দূরীভূত হইল!

রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া রাণীর সৈন্যেরা উপদ্রব করিতেছে দেখিয়া, হেষ্টিংস আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে রাণীর বিরুদ্ধে এক দল সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণের আদেশ করিলেন। ইংরাজ সৈন্যের সহিত সম্মুখসমরে বিদ্রোহিগণের নানা স্থানে পরাজয় ও ক্ষতি হইতে লাগিল। একদা বিদ্রোহিসৈন্য ভীষণ বেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু ইংরাজদিগের শিক্ষিত সিপাহী সৈন্যের সমক্ষে তাহারা অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে না পারিয়া, একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইংরাজসৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। বিদ্রোহী দল বহুক্ষণ গোলা গুলি, শর ও প্রস্তরখণ্ড বর্ষণ করিয়া বাহুবলে দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল; ইংরাজসৈন্য তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বিপুলবিক্রমসহকারে দুর্গাধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বিদ্রোহীদিগের একদল সৈন্য সহসা নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া ইংরাজদিগের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিল। ইহাতে ইংরাজসৈন্যের বিশেষ ক্ষতি হইলেও তাহারা হটিল না। প্রায় এক প্রহর কাল এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিতেছিল।

এ দিকে দুর্গাভ্যন্তর হইতে মধ্যে মধ্যে এক একটি অব্যর্থ গুলি আসিয়া ইংরাজদিগের এক একটি সৈন্যকে ইহলোক হইতে বিদায় করিতেছিল। এই অব্যর্থ অজ্ঞাত গুলিতে ইংরাজসৈন্যের যত অনিষ্ট করিয়াছিল, তত অনিষ্ট আর কিছুতেই করিতে পারে নাই। এই কারণে ইংরাজ সেনাপতি ভলণ্টিয়ার দল সঙ্গে লইয়া প্রাণনাশক গুলির নিক্ষেপককে বিনাশ করিয়া স্বীয় সৈন্যের ভয় দূর করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি সরোষে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, আবার উভয় দলের ঘোর সংগ্রাম বাধিল। বিদ্রোহীদিগের একটি সৈনিকও জীবিত অবস্থায় স্বস্থান হইতে অঙ্গুলিমাত্র বিচলিত হইল না—যথাস্থানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে স্বর্গলোকে চলিয়া গেল। যে অব্যর্থ গুলির গতিরোধের জন্য ইংরাজ সেনাপতি এত চেষ্টা করিতেছিলেন, পূর্ব্ববৎ অব্যাহতভাবে শত্রুসৈন্যের প্রাণসংহার করিতেছিল। ইংরাজ সেনাপতি দুর্গদ্বার অভিমুখে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া, বিদ্রোহী পক্ষের এক রাজপুত বীর সহসা উল্লম্ফন পূর্ব্বক সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন! আর এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পাইলে রাজপুতের হস্তে সেনাপতির ভবলীলা সাঙ্গ হইত; কিন্তু রাজপুত বীর সলক্ষে ইংরাজ সেনানীর নিকট উপস্থিত হইতে না হইতে এক সাহসী শ্বেত সৈনিক সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন প্রহারে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিল। পরক্ষণেই সকলে দেখিতে পাইল, রাজপুতবেশধারিণী চৌধুরাণীর রক্তবিপ্লুত দেহ ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ২২ ভাগ; বৈশাখ। এই সংখ্যা হইতে প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী"র সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছেন। বাইশ বৎসরের পর "ভারতী"কে বালিকা সাধনার বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। "ভারতী"র সহসা এ কুব্জভাব কেন? "দুঃসময়" নামক দুর্বোধ কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহাতে কবিত্বপরিচয় আদৌ নাই।—শব্দের দিকে লেখকের যেমন দৃষ্টি, ভাবের অভিব্যক্তির প্রতি তাঁহার তেমনি ঔদাসীন্য। শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসই যেন রচনাটির লক্ষ্য,—আর সিদ্ধহস্ত প্রবীণ কবির রচনায় mannerism নিতান্তই অসহ্য। "দুরাশা" একটি ক্ষুদ্র গল্প—আখ্যানবস্তু মনোরম; বর্ণনাকৌশল ও শব্দবিন্যাস অতি সুন্দর। সকলেই জানেন, "কণ্ঠরোধ" নামক প্রবন্ধটি টাউন হলে সিডিশন বিলের প্রতিবাদ-সভায় পঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র বাবুর এই রাজনৈতিক প্রবন্ধটির ভাষা "কাদম্বরী"কেও পরাজিত করিয়াছে। যুক্তি ও তর্কই রাজনৈতিক রচনার প্রাণ,—এবং তাহা সাধারণবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হওয়াই বিধি। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর 'কনককিঙ্কিণীকণিত বাণীর শিঞ্জিতধ্বনি' চটপটকরতালিলাভের অনুকূল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজনৈতিক প্রসঙ্গালোচনার উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। বক্তৃতার একটা বিশেষ ভাষা আছে, এবং থাকাও আবশ্যক;—আমাদের রাজনৈতিক রচনার ভাষাও কি এইরূপ 'জীমূতমন্দ্রবিনিন্দিনী' না করিলে চলিবে না? যাঁহারা শব্দশাস্ত্রের পারগামী, তাঁহাদের জন্য ভাবি না;—কিন্তু যাহারা নহিলে সভা হয় না,—অতঃপর সেই সাধারণ কেরাণীকুল ও ছাত্রবৃন্দ কি "প্রকৃতিবাদ" অভিধান বগলে করিয়া সভায় ছুটিবে?—তাহাদের যদি হাত যোড়া থাকে, তাহা হইলে কাহারা করতালি দিবে? মনে করিয়া

দেখুন,—পার্লামেণ্টের একটা বিলের আলোচনার সময় যদি কোনও সভ্য কবি স্থইন্‌বরণের ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহা কেমন শুনায়? আমাদের দেশে অনুকরণ বা হনুকরণ-বৃত্তি বড় প্রবল,—তাই এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া "সাহিত্যের" এতটা স্থান নষ্ট করিলাম। "কবিতা-হরিণী"-লেখকের কল্পনা দেখুন,—তাঁহার কবিতা-হরিণী "নব নব ভাবতৃণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া করিছে ভক্ষণ।" "বৃটিশ গায়েনা" একটি ভ্রমণ-বিবরণ; যদিও লেখকের লিপিনৈপুণ্য নাই,—কিন্তু বিষয়গুণে রচনাটি প্রীতিপ্রদ। "দিল্লীর চিত্রশালিকা" প্রবন্ধটিতে লেখক বিবিধ চিত্রের বিচিত্র সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণনবাহুল্যে প্রবন্ধটি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত,—এবং সেই জন্য ইহার অনেকটা সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। আর ক্রমাগত "ঈষন্নালিমমুখ আতুঙ্গ লাবণ্যরাশি" ও তত্তুল্য বিবিধ বর্ণনায় পাঠকালে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আমরা মনে করিয়াছিলাম, অন্ততঃ বাঙ্গালা গদ্য হইতে "শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে" চিরবিদায় লইয়াছে। তাহাকে সভ্যতার সূক্ষ্ম 'ক্রেপে' আপনাকে ঈষদাবৃত করিয়া নানা ভাবে পুনরায় আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আমরা একটু বিব্রত হইয়াছি। হায়! চিরযৌবনবরশূন্য এই মর জগতে পিশিতপিণ্ডপ্রিয় সৌন্দর্য্য-সমালোচকের কি গভীর নিরাশ্বাস, কি দুঃসহ নিরানন্দ! "শুনঃশেপের বিলাপ" একটি সুরচিত বৈদিক চিত্র। এবারকার "ভারতীর" প্রবন্ধাবলীর মধ্যে "শুনঃশেপের বিলাপ"ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রচয়িতার বিষয়নির্ব্বাচন, রচনাকৌশল ও আন্তরিকতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমরা সকলকে প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বৈদিক যুগের হোমগন্ধসমাকুল, সামগানমুখরিত আশ্রমের সুখদুঃখগাথা নিশ্চয়ই পাঠকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে। "ঐতিহাসিক ম্যালিসন" প্রবন্ধটি সংবাদপত্রবিশেষে প্রকাশিত ম্যালিসনসম্বন্ধীয় একটি সঙ্ক্ষিপ্ত উক্তির প্রতিবাদমাত্র;—আমরা ম্যালিসনের একটা মোটা-মুটি নক্সা দেখিবার আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু লেখক আমাদের অত্যন্ত নিরাশ করিয়াছেন। "বঙ্গভাষা" প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেনের রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" অবলম্বন করিয়া লিখিত। "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" প্রবন্ধটির বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "প্রসঙ্গকথায়" ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে নিরবচ্ছিন্ন গালাগালি ও অক্ষয় বাবুকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে। পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে আমাদের দুই চারিটি গন্ধহীন ফুল ডালি দিয়া সুখী হইতে পারি, কিন্তু মহেন্দ্র বাবুর জন্য কল্পিত গালিগুলি যথাপ্রযুক্ত মনে হইতেছে না।

তত্ত্ববোধিনী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "তিব্বতের সাধন-প্রণালী" প্রবন্ধটি পাঠ্যযোগ্য। লেখক এই সঙ্ক্ষিপ্ত রচনায় তিব্বতের ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির একটি স্থূল বিবরণ ও পরিচয় দিয়াছেন।

বামাবোধিনী। চৈত্র। "বামাবোধিনী"র জোয়ার ভাঁটা নাই,—একই ভাবে চলিতেছে। আমাদের মনে হয়, অন্ততঃ আর এক বিন্দু জীবনীশক্তির প্রয়োজন। "লবঙ্গলতা" বঙ্কিম বাবুর "রজনী"র লবঙ্গ-চরিত্রের সমালোচনা। প্রবন্ধটি সুরচিত। "গার্হস্থ্য প্রবন্ধ" উল্লেখযোগ্য। "সাধ্বী কৈলাসকামিনী" প্রবন্ধে প্রকাশ—"বামাবোধিনী-সম্পাদকের গুরুতর পীড়া এবং অন্যান্য কারণবশতঃ ১২৮৫ সালে পত্রিকা যখন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইনি নিজের অলঙ্কার বন্দক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বামাবোধিনীর পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেন। তদবধি ২০ বৎসর কাল ইনি বামাবোধিনীর কার্য্যভার বহন ও প্রকৃত অধ্যক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন।" এই পুণ্যবতী মহিলা বামাবোধিনী সম্পাদকের সহধর্ম্মিণী। ভগবান্ সম্পাদককে এই দুর্ব্বহ শোকে শান্তি দান করুন। বৈষম্যপূর্ণ জীবনপথে পতি-পত্নীর জীবনব্রতের এমন সাম্য সচরাচর দেখা যায় না।

মীরণের পরিণামরহস্য।

পলাশীযুদ্ধের রহস্যময় অভিনয়ের শেষ হইয়া গেলে, মীরজাফর, নবাব জাফর আলি খাঁ উপাধি ধারণ করিয়া, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করিলেন। তাহার পর সেই রাজ্যভ্রষ্ট, সিংহাসনভ্রষ্ট, হতভাগ্য সিরাজের নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডের অভিনয় আরব্ধ হইল। এই অভিনয় ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা মীরণের নাম ইতিহাসপাঠকমাত্রই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। উক্ত অভিনেতার কৃত অভিনয়ব্যাপার রহস্যময় বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারও পরিণাম সেইরূপ রহস্যে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই রহস্যোদ্ভেদের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

মীরজাফর সিংহাসনে উপবেশন করিলে,ইংরাজেরা সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের দাবী করিয়া বসিলেন। মীরজাফর প্রকাশ্য রাজকোষ হইতে সমস্ত দাবীর পূরণ করিতে পারিলেন না। সিরাজের গুপ্ত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া তিনি অনেক ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে হস্তচ্যুত করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অগত্যা ইংরাজদিগের প্রাপ্য অবশিষ্ট অর্থের জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব ছাড়িয়া দিতে হইল। তিনি শূন্য রাজকোষ লইয়া ও বাঙ্গলার দুইটি প্রধান প্রদেশ হস্তান্তরিত করিয়া অত্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগকে ইহার কারণ জানিয়া, তাঁহাদের প্রতি ক্রমে তাঁহার বিরক্তির সঞ্চার হইল। এই সময়ে ইংরাজেরাও আপনাদের অযথা ক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন; তাহাতে নবাবের বিরক্তি দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের সহিত নবাবের মনোমালিন্য ঘটায়, এবং ইংরাজেরা তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করায়, নবাব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সিরাজের ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধেও একটি ষড়যন্ত্রের সূচনা হইতেছে।

মীরজাফর কেবলমাত্র স্বীয় পুত্র মীরণকেই বিশ্বাস করিতেন। মীরণ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, এবং সকল বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করিতেন। মীরণ আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি পিতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরিণামে তাঁহাকেও সিরাজের দশা ভোগ করিতে হইবে। সেই জন্য তিনি বারংবার তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগি-

লেন। মীরণের এই সতর্ক হইবার পরামর্শ মীরজাফর একেবারে বিস্মৃত হন নাই। ইংরাজেরা পরিশেষে যখন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাসিমকে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যায় মসনদ প্রদান করেন, সেই সময়ে মীরজাফর দুঃখে কষ্টে অভিভূত হইয়া বলিয়া ফেলেন যে, "আমার পুত্র মীরণ পূর্ব্বেই আমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিল।" * মীরণ কেবল পিতাকে সতর্ক করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি নিজেও ইহার প্রতিকারের উপায়-অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মীরণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, বৃদ্ধ পিতা আর কত দিন জীবিত থাকিবেন, পরিণামে বাঙ্গলার মসনদ তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। পিতাও উপযুক্ত পুত্রের প্রতি একরূপ সমস্ত ভারই প্রদান করিয়াছিলেন। মীরণ অনেক চিন্তা করিয়া ক্রমে আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, ইংরাজেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, কিন্তু সহসা তাঁহাদের সহিত বিবাদ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কাজেই ধীরে ধীরে তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মীরণের মনে হইল যে, ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে আপনারাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া বসিতে পারেন, অথবা আর কাহাকেও তাহা প্রদান করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহারা ইংরাজদিগের ও তাঁহাদের পক্ষীয় দুর্লভরাম প্রভৃতির সহানুভূতি পাইত, তাহাদিগকেই তিনি অগ্রে চিরবিদায় দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জন্য সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা এবং তাঁহার মাতা ও মাতৃস্বসা মীরণের আদেশে নিহত হন। পাছে সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কা মীরণ ও মীরজাফর উভয়েরই মনে বলবতী হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণের সহিত যোগ আছে বলিয়া সিরাজের মাতা ও মাতৃস্বসা চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য হন। আরও কতকগুলি পুরাতন কর্ম্মচারী সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যিনি মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, মীরণ তাঁহার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার ভগিনীপতি ইতিহাসবিখ্যাত মীর কাসিম। মীর কাসিম অনেক দিন হইতে বাঙ্গলার মসনদের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; একমাত্র মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আপনার পক্ষকে অবাধ মনে করিতে পারিতেন না। মীরণ যে ইহা বুঝিতেন না, এমন নহে; তবে সহসা ইহার কোনও উপায় করিতে

* "My son Meeran forewarned me of all this."—Torens "Empire in Asia p. 44.

পারেন নাই বলিয়াই অনুমান হয়। ইংরাজদিগকে প্রভূতক্ষমতাশালী মনে করিলেও, মীরণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য তলে তলে আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে রাজ্যের সমস্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন; বিশেষতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সৈনিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত সৈন্য ক্রমে মীরণের যারপরনাই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া উঠিল। মীরণ নিজেও অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। প্রায়ই তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। মীরণের এইরূপ অসাধারণ সাহস, রাজ্যশাসনে অধ্যবসায়, সুন্দর রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা দেখিয়া, কূটবুদ্ধি ইংরাজ যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। প্রচলিত ইতিহাসে মীরণকে একটি গোঁয়ার রূপে চিত্রিত দেখা যায়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, মীরণের বেশ একটু রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল, এবং তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নৃশংস কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। মীরণের এই রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় চতুরপ্রবর ইংরাজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মীরণ ধীরে ধীরে আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিতেছেন, রাজ্যশাসনে বেশ দক্ষতা দেখাইতেছেন, সৈন্যদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষদৃষ্টি করিতেও ছাড়িতেছেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, হয় নিজেরাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া বসিবেন, না হয় আর কাহাকেও তাহা প্রদান করিতে হইবে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিটের নিকট লিখিত ক্লাইবের একখানি পত্র হইতে আমরা মীরণের প্রতি ইংরাজদিগের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারি। উক্ত পত্রে তিনি মীরজাফরের দুর্ব্বল রাজত্বের উল্লেখ করিয়া অতি সহজ ছলে বা কৌশলে নবাব হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। তাহাতে মীরণকে ইংরাজদিগের বৈরী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এবং মীরণ রাজ্যাধিকার পাইলে, ইংরাজদিগের পক্ষে নিরাপদ হইবে না বলিয়া লিখিত হয়। আরও লিখিত হয় যে, দুই সহস্র ইউরোপীয় চেষ্টা করিলে কোম্পানীকে রাজ্যভার গ্রহণ করাইতে পারে। * ইংরাজেরা আপনাদের

* "Where in he depicts the weakness of the Nawb's administration; hints that they could easily find a pretence for breaking with him; describes his son, Meerun, as so inimical to the English "that it would be

লেন। মীরণের এই সতর্ক হইবার পরামর্শ মীরজাফর একেবারে বিস্মৃত হন নাই। ইংরাজেরা পরিশেষে যখন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাসিমকে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যায় মসনদ প্রদান করেন, সেই সময়ে মীরজাফর দুঃখে, কষ্টে অভিভূত হইয়া বলিয়া ফেলেন যে, "আমার পুত্র মীরণ পূর্ব্বেই আমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিল।" * মীরণ কেবল পিতাকে সতর্ক করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি নিজেও ইহার প্রতিকারের উপায়-অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মীরণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, বৃদ্ধ পিতা আর কত দিন জীবিত থাকিবেন, পরিণামে বাঙ্গলার মসনদ তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। পিতাও উপযুক্ত পুত্রের প্রতি একরূপ সমস্ত ভারই প্রদান করিয়াছিলেন। মীরণ অনেক চিন্তা করিয়া ক্রমে আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, ইংরাজেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, কিন্তু সহসা তাঁহাদের সহিত বিবাদ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কাজেই ধীরে ধীরে তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মীরণের মনে হইল যে, ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে আপনারাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া বসিতে পারেন, অথবা আর কাহাকেও তাহা প্রদান করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহারা ইংরাজদিগের ও তাঁহাদের পক্ষীয় দুর্লভরাম প্রভৃতির সহানুভূতি পাইত, তাহাদিগকেই তিনি অগ্রে চিরবিদায় দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জন্য সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা এবং তাঁহার মাতা ও মাতৃস্বসা মীরণের আদেশে নিহত হন। পাছে সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কা মীরণ ও মীরজাফর উভয়েরই মনে বলবতী হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণের সহিত যোগ আছে বলিয়া সিরাজের মাতা ও মাতৃস্বসা চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য হন। আরও কতকগুলি পুরাতন কর্ম্মচারী সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যিনি মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, মীরণ তাঁহার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার ভগিনীপতি ইতিহাসবিখ্যাত মীর কাসিম। মীর কাসিম অনেক দিন হইতে বাঙ্গলার মসনদের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; একমাত্র মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আপনার পক্ষকে অবাধ মনে করিতে পারিতেন না। মীরণ যে ইহা বুঝিতেন না, এমন নহে; তবে সহসা ইহার কোনও উপায় করিতে

* "My son Meeran forewarned me of all this."—Torens "Empire in Asia p. 44.

পারেন নাই বলিয়াই অনুমান হয়। ইংরাজদিগকে প্রভূতক্ষমতাশালী মনে করিলেও, মীরণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য তলে তলে আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে রাজ্যের সমস্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন; বিশেষতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সৈনিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত সৈন্য ক্রমে মীরণের যারপরনাই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া উঠিল। মীরণ নিজেও অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। প্রায়ই তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। মীরণের এইরূপ অসাধারণ সাহস, রাজ্যশাসনে অধ্যবসায়, সুন্দর রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা দেখিয়া, কূটবুদ্ধি ইংরাজ যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। প্রচলিত ইতিহাসে মীরণকে একটি গোঁয়ার রূপে চিত্রিত দেখা যায়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, মীরণের বেশ একটু রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল, এবং তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নৃশংস কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। মীরণের এই রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় চতুরপ্রবর ইংরাজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মীরণ ধীরে ধীরে আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিতেছেন, রাজ্যশাসনে বেশ দক্ষতা দেখাইতেছেন, সৈন্যদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষদৃষ্টি করিতেও ছাড়িতেছেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, হয় নিজেরাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া বসিবেন, না হয় আর কাহাকেও তাহা প্রদান করিতে হইবে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিটের নিকট লিখিত ক্লাইবের একখানি পত্র হইতে আমরা মীরণের প্রতি ইংরাজদিগের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারি। উক্ত পত্রে তিনি মীরজাফরের দুর্ব্বল রাজত্বের উল্লেখ করিয়া অতি সহজ ছলে বা কৌশলে নবাব হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। তাহাতে মীরণকে ইংরাজদিগের বৈরী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এবং মীরণ রাজ্যাধিকার পাইলে, ইংরাজদিগের পক্ষে নিরাপদ হইবে না বলিয়া লিখিত হয়। আরও লিখিত হয় যে, দুই সহস্র ইউরোপীয় চেষ্টা করিলে কোম্পানীকে রাজ্যভার গ্রহণ করাইতে পারে। * ইংরাজেরা আপনাদের

* "Where in he depicts the weakness of the Nawb's administration; hints that they could easily find a pretence for breaking with him; describes his son, Meerun, as so inimical to the English "that it would be

হস্তে রাজ্যভার লইবার ইচ্ছা করিলেও সহসা তাহা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু মীরজাফর ও মীরণের হস্ত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে মীর কাসেম খাঁ মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বাঙ্গলার মসনদের প্রার্থী ছিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে ক্লাইব ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছিলেন, হলওয়েল তখন কলিকাতার গবর্ণর। মীর কাসেমের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, যেরূপে হউক, মীরণের ক্ষমতার হ্রাস করিতেই হইবে। কিন্তু এই পরামর্শে মীরণকে এ জগৎ হইতে চিরাপসারিত করিবার আয়োজন হইয়াছিল কি না, ইহাই এক্ষণে বিবেচ্য। ইতিহাস কিন্তু সে বিষয়ে কতটা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আমরা পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা পাইব।

ইংরাজ ও মীরণ উভয়ে উভয়কে অন্য চক্ষে দেখিলেও, কোন একটি রাজনৈতিক কারণের জন্য আপাততঃ উভয়কে মিলিত হইতে হইল। মীর জাফরের রাজত্বে অনেক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও বিহার প্রদেশ সাহজাদা আলিগহর (পরে বাদশাহ সাহ আলম) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সকল বহিঃশত্রুর দমন করা প্রথমে অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের শক্তি পৃথগ্‌ভূত হইলে বিশেষ কোনও ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি' হইল। কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তমরূপে লক্ষ্য রাখিলেন। পাটনা, পূর্ণিয়া প্রভৃতির বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তাকে দমন করিয়া, তাঁহারা সাহজাদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ক্লাইব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণেল ক্যালিয়ার্ড ইংরাজ সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মীরণ ও কর্ণেল সাহজাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পাটনার নিকট উপস্থিত হন। সেই সময়ে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা খাদেম হোসেন খাঁ সাহজাদার সহিত যোগ দিবার জন্য বিহারে উপস্থিত হইতেছিলেন। তিনি পাটনার নিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মীরণ ও কর্ণেল প্রথমতঃ তাঁহাকেই আক্রমণ করা উচিত মনে করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। খাদেম হোসেন জানিতেন যে, এই মিলিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু বর্ষার নদীপ্লাবনের জন্য তিনি পিছু হটিতে অসমর্থ

unsafe trusting him with the succession ; and that 2000 Europeans would enable the company to take the sovereignty upon themselves."—Torrens' Empire in Asia pp 42—43

হওয়ায় যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং একেবারে মীরণের সৈন্যের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। মীরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধে আহত হওয়ায়, এক্ষণে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ও কর্ণেলকেও বিপক্ষ পক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। কিন্তু শত্রুকে একেবারে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, অগত্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। খাদেম হোসেন পলায়ন করিয়া একটি জঙ্গলে আশ্রয় লন। সেইখানে তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল।

পরদিন রাত্রিতে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, সে সময় বর্ষাকাল। রাত্রি দশটা হইতে মুষলধারে বৃষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইয়া প্রলয়ের ন্যায় করিয়া তুলিল। মীরণ একটি বৃহৎ তাম্বুতে ছিলেন। ঝড়বৃষ্টির বেগবৃদ্ধি দেখিয়া তিনি দিলারখানি পাল নামে একটি ক্ষুদ্রাকার তাম্বুতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় দুই চারিটি স্ত্রীলোক থাকিত। সেদিন যে স্ত্রীলোকটি ছিল, তাহাকে তিনি অগ্রেই বিদায় দিয়াছিলেন। কেবল একটিমাত্র ভৃত্য সংবাহনক্রিয়ার জন্য ও এক জন কাহিনীকথক তাঁহার নিদ্রাকর্ষণের জন্য তাম্বুমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। ক্রমে ঝড়বৃষ্টির বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর প্রকৃতি কথঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইল যে, মীরণ ও তাঁহার অনুচরদ্বয়সহ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যখন তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তখন বজ্রাঘাত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কাজেই রাষ্ট্র হইল যে, বজ্রাঘাতেই মীরণের মৃত্যু হইয়াছে! যে কোনও কারণেই হউক, প্রথমতঃ কিন্তু মৃত্যুসংবাদ গোপন করিয়াই রাখা হয়, পরে বজ্রাঘাত বলিয়া রাষ্ট্র করা হয়। কিন্তু মীরণের পরিণাম যে কত দূর রহস্যময়, আমরা পরে তাহা দেখাইতেছি।

মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর সহিত আর একটি ঘটনার একটু বিশেষরূপ সম্বন্ধ আছে, এবং সেই জন্য উক্ত বজ্রাঘাতে মৃত্যু সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে অন্যরূপ মনে করিয়া থাকেন। মীরণের আদেশে যখন তাঁহার অনুচর কর্ত্তৃক সিরাজের মাতা আয়মানা ও মাতৃস্বসা ঘেসেটী সলিলগর্ভে চিরসমাহিত হন, সেই সময়ে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হয়।* কেহ কেহ বলেন যে, যে দিন তাঁহারা সলিলগর্ভে আশ্রয় লন, সেই রাত্রি-

* আমাদের কবি আবার ইহার উপর আর একটু রঙ্গ চড়াইয়া বলিয়াছেন,—"বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মীরণ।" প্রকৃত অভিশাপবাক্যে বিনা মেঘের কথা নাই।

তেই মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাহার এক মাস পরে মীরণের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অনুসন্ধানে ইহা স্থির হইয়াছে যে, তাঁহাদের মৃত্যুর ৯।১০ দিন পরে মীরণ মৃত্যুমুখে পতিত হন! তাঁহাদের সেই অভিশাপবাক্য মীরণের মৃত্যু ব্যাপারের সঙ্গে মিশাইয়া সাধারণের মনে বজ্রাঘাতেই মৃত্যু বলিয়া বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং মীরণের রহস্যময় পরিণাম গোপন করিবার এই একটি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তৎকালে অনেকের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, ইংরাজগণের মন্ত্রণায় মীরণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়; বস্তুতঃ বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। মীরণের মনে ইংরাজবিদ্বেষ বদ্ধমূল হওয়ায় ও তাঁহার স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী থাকায়, ইংরাজেরা তাঁহাকে চিরাপসারিত করিবার জন্য এইরূপ কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই সময় মীর কাসেমের সহিত তাঁহাদের গোপনে সন্ধি হয়, এবং মীর কাসেমও যে এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, ইহাও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ক্রমে ইংরাজদিগের ও মীর কাসেমের এই গুপ্ত মন্ত্রণা একমাত্র মীর কাসেমেরই স্কন্ধে পড়িয়া যায়। কারণ ইংরাজ আপনাদের সাফাই গাহিতে বড়ই দক্ষ। কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহারা কত দূর অব্যাহতি পাইবার যোগ্য, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবেন। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়া ইহাকে বজ্রাঘাতজন্য মৃত্যু বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার যুক্তিগুলি কত দূর সারগর্ভ, আমরা পরে দেখাইব। কিন্তু তিনিও লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সাধারণে, এমন কি, ইংরাজদিগের কর্ণেল, কাপ্তেন পর্য্যন্ত, এই ব্যাপারকে ঘোরতর সন্দেহজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। অনুবাদক বলেন যে, ঘেসেটী ও আমানার অভিশাপবাক্য মীরণের মৃত্যুসংবাদ পঁহুছিবার এক মাস পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সংবাদ প্রথমতঃ চাপিয়া রাখা হয়। আশ্চর্য্য হইলেও ইহা সত্য যে, মীরণের মৃত্যু ইংরাজদিগের, অর্থাৎ ইংরাজ গবর্মেণ্টের মন্ত্রণানুসারে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত হয়। কারণ, মীরণের বাক্যে ও কার্য্যে স্বাধীনতার ভাব প্রবল দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এইরূপ স্থির হয় যে, মীর কাসেম খাঁ সেই সময় হইতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ইংরাজ গবর্ণর হলওয়েলের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। যত দিন মীরণ জীবিত থাকিতেন, তত দিন পর্য্যন্ত

তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত না। এই জন্য তিনি এই চক্রান্তের তলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। (কারণ ইহাকে চক্রান্তই কহিত, বজ্রপাত নহে) এই সমস্ত ব্যাপার, রাত্রির ঝড় বৃষ্টি, অন্ধকার ও তাম্বুদাহের * সহিত মিশিয়া প্রকৃত ঘটনাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। বিশেষতঃ এ বিষয়ে স্বয়ং কর্ণেল ক্যালিয়ার্ডের সন্দেহ হওয়ায় লোকের মনে উক্ত ধারণা বলবতী হইয়া উঠে, এবং কর্ণেলের বিশ্বস্ত বন্ধু ও দ্বিভাষী লসিংটন কর্ণেল কর্ত্তৃক মৃতদেহপরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়া, প্রবেশাধিকার হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু কর্ণেলের পরিজনবর্গের মধ্যে অনেকে, এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ, বিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী কাপ্তেন কার্ণাক, ইহাকে তামস ব্যাপার (হত্যা) বলিয়াই অভিহিত করিয়াছিলেন। † ইহার

* তাম্বুদাহের বিষয়ে অনুবাদকের সহিত আমরা একমত নহি। মূল মুতাক্ষরীণে তাম্বুদাহের উল্লেখ নাই, আমরা পরে দেখাইতেছি।

† "We are certain that both the imprecation and speech were mentioned at Moorshoodabad, full thirty days before any inteligence reached the city of meern's death; and incredible as it may look at this distance of time, this piece of news was stifled at first; and what is singular, but true, that death was attributed to the machinations of the English, say, of the English goverment, that had at all times taken much umbrage at that aspiring spirit of independence, so conspicuous in Meerun's words, still more than in his actions. It was asserted, that Mir-Cassem-qhan, who had already made his treaty public, or private, with Holwell, governor of Calcutta; and who could not compass his end, so long as Miren should stand in his way, was really at the bottom of the whole contrivence, (for contrivance it was called and not lightening); and this, together with the storm and darkness of the night, as well as the burning of the tent was made use of as a curtain to conceal and colour the whole transaction. What gave a strong bias to the minds on that occasion is, that the colonel himself seemed to have his doubts; and that Lushington, his confident and in terpreter, whom he sent to inspect the body, was refused admittance. Moreover, it is well known, that several officers of the Colonel's family and amongst others, Captain Carnac, who held the first rank in it, and was unquestionably a man of entensive

পর অনুবাদক মহাশয় ইহাকে যথার্থতঃ বজ্রাঘাতে মৃত্যু বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা পরে তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়া তাহাদের উত্তরপ্রদানে চেষ্টা পাইব। এক্ষণে সাধারণে বিচার করিয়া দেখুন যে, অনুবাদক মহাশয়েরই লিখিত পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে মীরণের মৃত্যু সন্দেহ-জনক বলিয়া বোধ হয় কি না? বিশেষতঃ ইংরাজদিগের কর্ণেল, কাপ্তেন প্রভৃতিও যখন এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে একরূপ স্পষ্টতঃ হত্যা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন, তখন সাধারণে যে ইহাতে সন্দিহান হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অনুবাদক, ইংরাজ অর্থে এখানে ইংরাজ গবর্মেণ্ট, অর্থাৎ গবর্ণর ও তাঁহার সঙ্গীদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ ইংরাজ কাপ্তেন, কর্ণেল প্রভৃতি এই চক্রান্তের বিষয় জানিতেন না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস; নতুবা তাঁহাদের এ বিষয়ে সন্দেহ ও অনুসন্ধানের কথা তিনি উল্লেখ করিবেন কেন? ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, ইংরাজ কর্ণেল ও কাপ্তেনের অজ্ঞাতে এই চক্রান্তের আয়োজন হইয়াছিল। অন্ততঃ তাঁহাদের উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান ও সন্দেহ হইতে ইহাই বিবেচিত হয়। কিন্তু পরিশেষে সকলে মিলিয়া যে ব্যাপারটিকে চাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও কতকটা সত্য। ফলতঃ এ বিষয়ে যখন প্রধান প্রধান ইংরেজেরাও সন্দিহান হইয়াছিলেন, তখন আমরা অনুবাদক মহাশয়ের ন্যায় ঘটনাটিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া বজ্রাঘাতের সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। এ বিষয়ে আমরা আরও প্রমাণ দিতেছি।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মীরণের সহিত এক জন ভৃত্য ও জনৈক কাহিনীকথক শিবিরমধ্যে ছিল এবং তাহারাও মীরণের দশা প্রাপ্ত হয়। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, সে রাত্রির ঝড়বৃষ্টি কিছু ক্ষণ পরে শান্তভাব ধারণ করিলে, যে সকল ভৃত্য বাহিরের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত ভৃত্যদ্বয়কে বিশ্রাম দিবার জন্য তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মীরণ ও তাঁহার সেই অনুচরদ্বয় চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাহারা সেই দৃশ্য দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেও কোনরূপ গোলযোগ না করিয়া কয়েক-

knowledge, keen geninus. and much information spoke in strong terms of what they called this dark affair"—Mutakherin, English Translation; pp, 32-33. Translator's note.)

জন কর্ম্মচারীকে জাগরিত করেন। তাহারা সকলে নিঃশব্দে তাম্বুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মীরণের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাঁহার মস্তকে অনেকগুলি ছিদ্র রহিয়াছে। সেগুলি ৫।৬ টির কম হইবে না। উদরে ও পৃষ্ঠেও ৬।৭টি দাগ দেখিতে পায়, সেগুলি চাবুকের ক্ষতের ন্যায়। সে কালের সংস্কারানুসারে উপদেবতাগণের প্রভাবনিবারণের জন্য মস্তকের নীচে যে একখানি অস্ত্র রক্ষিত হইত, তাহাতেও দুই তিনটি ছিদ্র লক্ষিত হয়। কিন্তু মস্তকের নিকটস্থ শয্যার কাষ্ঠ অত্যন্ত বিশীর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।* মুতাক্ষরীণকার ইহাকে বজ্রাঘাতের চিহ্ন বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহার লিখনভঙ্গীতে ইহাই বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে বুদ্ধিমানের সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, বজ্রপাত কখনও নিঃশব্দে হয় না, নতুবা বহিঃস্থ ভৃত্যেরা তাহা জানিতে পারে নাই কেন? জানিতে পারিলে তাহারা পূর্ব্বেই কি ইহার অনুসন্ধান করিত না, এবং তাহা লইয়া কি শিবিরমধ্যে কোনও গোলযোগ হইত না? ভৃত্যেরা নিঃসন্দেহ শিবির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা বাহির কিংবা ভিতর হইতে তাম্বুদাহের কোনও চিহ্নই দেখিতে পায় নাই; মুতাক্ষরীণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বজ্রপাতে নিশ্চয় তাম্বুদাহ হইবার কথা, কিন্তু ভৃত্যেরা বাহির হইতেও অগ্নি জ্বলিতে দেখে নাই, নতুবা নিঃসন্দেহে তাম্বু মধ্যে প্রবেশ করিবে কেন? এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াও তাহার কোনও চিহ্নই দেখিতে

* "The rain and storm having closed after some time, the servants that wached without, and whose turn it was to relieve the two others that were on duty, came into the tent, and found Miren with those two unfortunate youths, plunged in the endless sleep of annihilation; and although such a sight did much surprise and frighten them, they recollected their minds enough to awaken some officers and some other persons, without tumult and noise. These getting silently into the tent, examined the body, found that it had no fewer than five or six holes on the head, with six or seven streaks on the belly and back; and these last looked like so many strokes, inflicted by an angry whip. On the sabre, which was close to his pillow, they discovered two or three holes, where the metal seemed to have run; but the wood of his bed towards his head was entirely rotten."—Mutaqherin, Translation, pp 127-28.

পায় নাই। অনুবাদক যে তাম্বুদাহের কথা লিখিয়াছেন, মূল মুতাক্ষরীণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় না। সুতরাং তাম্বুদাহের কথা যে কত দূর সন্দেহ-জনক, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিতেছেন। তাহার পর মৃতদেহের চিহ্নের কথা। কত লোক বজ্রাঘাতে মরিয়াছে, কিন্তু কাহারও মস্তকে ৫।৬টি ছিদ্র হইতে আমরা দেখি নাই, বা শুনি নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে, বজ্রপাতে মস্তকে ছিদ্র হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। বৈদ্যুতিক শক্তি নূতন ছিদ্র করিয়া কখনও কোন পদার্থমধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং মীরণের মস্তকের ছিদ্র কোথা হইতে আসিল? মুতাক্ষরীণকার বজ্রাঘাতে মৃত্যু বিশ্বাস করিয়া, মস্তক ও তন্নিম্নস্থ অস্ত্রে সাধারণ সংস্কারানুসারে ধাতুনির্ম্মিত বজ্র কর্ত্তৃক ছিদ্র হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মীরণের মস্তকে বস্তুতঃ যে ৫।৬টি ছিদ্র ছিল, তাহারও উল্লেখ করিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস যাহাই থাকুক, কিন্তু তাঁহার বর্ণনা কি আমাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে না? এক্ষণে আমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, মুতাক্ষরীণ-কারের বর্ণনা হইতে মীরণের মৃত্যু কি প্রকারে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়? বজ্রাঘাতে, না বন্দুকের গুলিতে, অথবা আর কোনও আঘাতে? অনেকে বলিতে পারেন যে, বজ্রাঘাত যেমন নিঃশব্দে হয় নাই, বন্দুক-চালনাও ত সেইরূপ হইতে পারে। তবে ইহাও বিবেচ্য যে, একটা সৈন্যশিবিরে কত কারণে কত দিকে বন্দুকের শব্দ হয়, তাহা সকলে লক্ষ্য করে না; এবং তাহা তাদৃশ কৌতূহলের বিষয়ও নহে। বিশেষতঃ, ঝড়বৃষ্টির শব্দের মধ্যে বন্দুকের শব্দ লীন হইতেও পারে, কিন্তু বজ্রাঘাতের শব্দ সকল শব্দকে অতিক্রম করিবেই করিবে। বৈজ্ঞানিকেরা যখন প্রমাণ দিতেছেন যে, বজ্রপাতে মস্তকে ছিদ্র হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, এবং মীরণের মস্তকে ৫।৬টি ছিদ্র ছিল, এবং অন্যান্য যথেষ্ট সন্দেহের কারণ দেখা যাইতেছে, তখন মীরণের হত্যাব্যাপার যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তৎকালীন প্রধান প্রধান ইংরাজ সেনানীর সন্দেহ এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ইংরাজ গবর্মেণ্ট ও মীর কাসেমের গুপ্ত পরামর্শে মীরণের অনুচরদিগের মধ্যে কোনও বিশ্বাসঘাতকের দ্বারাই হউক, অথবা কোনও গুপ্তচরের দ্বারাই হউক, এই নৃশংস ব্যাপার যে সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে ইংরাজ ও মীর কাসেম উভয়েই যে লিপ্ত ছিলেন, সে সময়ে লোকের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল।

কেবল মীর কাসেম কর্ত্তৃক এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইলে, তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সময় ইংরাজ তাঁহাকে দোষী করিতে কদাচ বিরত হইতেন না, এবং তাহা লইয়া বিলক্ষণ হুলস্থূল বাধাইতেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া কোনরূপ উচ্চবাচ্য হয় নাই, এবং বজ্রাঘাতে মৃত্যু রাষ্ট্র করিয়া, তাহাই বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করা হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুতাক্ষরীণের অনুবাদক মহাশয় কতকগুলি যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া উহাকে বজ্রাঘাত প্রমাণ করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার যুক্তিগুলি এই;—(১) বজ্রপাত ঘটার বিশেষ সম্ভব। (২) যে কেহ হত ও দগ্ধ হয়, তাহার দেহ বজ্রাহত দেহ হইতে দেখিতে বিভিন্নপ্রকার। (৩) তিন জন একইরূপে আহত হয়, এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ যাহা দেখিয়াছিল বা শুনিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। (৪) দেহটাকে সমস্ত দিন হস্তিপৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হয়, এবং সাধারণে মস্তক, পদদ্বয় ও সমস্ত দেহই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিল। (৫) কৌতূহল ও অনুসন্ধাননিবৃত্তির জন্য মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ সমাহিত করা হয় নাই, কিন্তু ছয় দিনের পরে (অর্থাৎ পাটনা হইতে রাজমহলে প্রেরিত হইয়া) বহু লোকের চক্ষের সমক্ষে মুসলমান-শাস্ত্রানুযায়ী কুড়ি ত্রিশ প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সমাহিত করা হইয়াছিল। (৬) মীর কাসেম এই চক্রান্তের জন্য পরিশেষে, এমন কি, তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পরও নিন্দিত হন নাই। (৭) এই জনপ্রবাদ ক্রমশঃ লয় পাইয়াছিল। ইংরাজদিগের প্রভুত্বে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। উপরে তাঁহার যুক্তিগুলির মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল। কিন্তু এগুলি কত দূর সারপূর্ণ, তাহা সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন। তাঁহার প্রথম যুক্তি অনুমানমাত্র। রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল, অতএব বজ্রপাতেরই সম্ভব। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বাহিরের ভৃত্যগণ বজ্রপাতের শব্দও শুনিতে পায় নাই, তাম্বুদাহও দেখিতে পায় নাই। বজ্রপাত হইলে শিবিরের অন্যান্য লোকেরাও জানিতে পারিত। নিঃশব্দে কখনও বজ্রপাত হয় না, ঝড়বৃষ্টি কেবল বজ্রপাতের সহায়ক নহে, হত্যারও সহায়ক; কারণ ঐরূপ রজনীতে ঐ প্রকার তামসব্যাপার ঘটিবার বিশেষ সুযোগ। দ্বিতীয় যুক্তিরও উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি যে, মীরণের দেহের চিহ্ন বজ্রাহত দেহের চিহ্ন হইতে পৃথক। বজ্রাহত ব্যক্তির মস্তকে পাঁচ ছয়টি ছিদ্র

থাকিতে পারে না ; কিন্তু মীরণের মস্তকে বস্তুতঃ তাহাই ছিল। তৃতীয় যুক্তিতে তিনি বলিতেছেন যে, তিন জন একইরূপে আহত হইয়াছিল ; হত্যা হইলে কি তাহা হইতে পারে না ? আর তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা যে প্রকাশ করে নাই, এ কথাই বা কে বলিল ? তাহা না হইলে এই ঘটনা সন্দেহজনক বলিয়া লোকের মনে ধারণা হইবে কি প্রকারে ? অবশ্য কোনও না কোনও প্রকারে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম যুক্তির উত্তর আমরা এক সঙ্গে প্রদান করিতেছি। উক্ত দুই যুক্তির মর্ম্ম এই যে, মৃতদেহ সমস্ত দিন হস্তি-পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিয়া সাধারণকে পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল। এবং পাটনা হইতে রাজমহলে আনীত হইয়া তাহা বহুলোকের চক্ষের সমক্ষে সমাহিত হয়। হত্যা হইলে অবশ্য মৃতদেহ গোপনের চেষ্টা হইত। বোধ হয়, তাঁহার যুক্তির ভাবার্থ এই, সাধারণ লোকে দেখিয়া তাহাকে হত্যা বলিয়া সন্দেহও করে নাই। অনুবাদক যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রকৃত নহে। মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে ঝুলাইয়া সাধারণকে পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেওয়া হয় নাই। বরঞ্চ ইহা মৃতদেহ নহে, কিন্তু রোগীর দেহ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মীরণের মৃত্যুসংবাদে পাছে সৈন্যদিগের মধ্যে গোলযোগ ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া কর্ণেল সাহেবের আদেশে মৃতদেহ হইতে নাড়ী প্রভৃতি বাহির করিয়া রোগীর দেহের ন্যায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। কিন্তু পরিশেষে লোকে মৃতদেহ বলিয়া বুঝিতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, নাড়ী সকল বাহির করিবার পর সে দেহ পূর্ব্বদেহ হইতে কি কিছু পরিবর্ত্তিত হয় নাই ? ঐরূপ একটি ক্রিয়া করিলে নিশ্চয়ই তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব। সুতরাং দেহে পূর্ব্ব রাত্রিতে যে চিহ্ন ছিল, ঠিক সেইরূপ চিহ্ন কি লোকে দেখিতে পাইয়াছিল ? তদ্ভিন্ন প্রথমতঃ তাহাদিগকে মৃতদেহ বলিয়া বিশ্বাস করিবারই অবকাশ দেওয়া হয় নাই। তাহার পর যখন রাজমহলে নানাপ্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়, তখন সে দেহ পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তজ্জন্যই তাহা রাজমহলে সমাহিত করা হয়। নতুবা সম্ভবতঃ তাহা মুর্শিদাবাদে আনীত হইত। গলিত দুর্গন্ধ দেহ দেখিয়া কেহ কি তাহার মৃত্যুচিহ্ন কেবল চক্ষুর দ্বারা বুঝিতে পারে ? ঐ মৃহদেহকে রোগীর দেহের ন্যায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ও দুর্গন্ধের জন্য রাজমহলে সমাহিত করা, মুতাক্ষরীণে স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। * সুতরাং অনুবাদ-

* „He (colonel) immediately adopted the opinion that this death ought to be kept secret ; and he ordered the entrails and other parts to be taken out of the body, and buried ; but the body itself to be carried about, as if Miren had been only sick. Next day he beat the general and marched off, the body being carried‘ stretched on the hoodah of an elephant. The feet hanging outwards, as those of a sick man, but that very moment it became public that it was only a dead body stretched on an elephant." * * *

"meanwhile Miren's body having been put into a coffin was carried rapidly upon chair-men's shoulders to the Ganges when it was put in a boat, and carrid down the river, as far as Radge-Mahal ; but the abominable stench that exhuled from it obliged the messengers to land it immediately and it was buried in a spot which now goes by the name of his monnment,—(Mutaqherin p. 123) ইহা অনুবাদক মহাশয়ের নিজেরই অনুবাদ। এগুলিও অন্ততঃ তিনি নিজে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিতেন।

কের উক্ত যুক্তি কত দূর সুসঙ্গত, সাধারণে তাহার বিচার করিবেন। ষষ্ঠ যুক্তির উত্তরও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজরাও সেই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কেবলই মীর কাসেমের নিন্দা হয় নাই। আর এ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার কথাবার্ত্তাই হয় নাই, ইহাই বা কে বলিল ? অনুবাদক মহাশয় ২৮। ২৯ বৎসর পরে সে কথা নিজ গ্রন্থে উল্লেখই বা কি করিয়া করিলেন ? নানা চেষ্টায় ইহাকে বজ্রাঘাত সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই অভিশাপবাক্যের সহিত মিলাইয়া, লোকের মনে বজ্রপাতের ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই পরিণামে মীর কাসেম ও ইংরাজ অব্যাহতি পাইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সপ্তম যুক্তিতে ক্রমশঃ প্রবাদটি যে লয় পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন, তাহারও উত্তর একই। বজ্রপাতের ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়ায় কাজেই তাহা ধীরে ধীরে লয় পাইয়াছিল। অবশ্য ইংরাজের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া কোন কোন প্রবাদের সৃষ্টি হইবার সম্ভব বটে, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ ক্ষমতাশালী, অন্ততঃ একটু কারণও না থাকিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন একটি প্রবাদের সৃষ্টি করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অনুবাদক মহাশয় যতই কেন বলুন না, ইংরাজদিগের প্রতি এ সন্দেহ কদাচ একেবারে দূর হইতে পারে না। সিরাজদ্দৌলার মাতা ও মাতৃস্বসার অভিশাপবাক্যের আবরণে তাহাকে বজ্রপাতে পরিণত করা হই-

য়াছে। সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন, আমাদের সিদ্ধান্ত একেবারে অমূলক কি না? মীরণের বৃদ্ধ পিতা পুত্রের মৃতদেহ আর দেখিতে পান নাই। দেহ মুর্শিদাবাদে আনীত হয় নাই; বিকৃত হওয়ায় রাজমহলে সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি রাজমহলের সরিফা-বাজারে অসংস্কৃত অবস্থায় তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মীরণের মৃত্যুতে মীরজাফর আপনাকে দক্ষিণহস্তশূন্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন; ইহার কিছু দিন পরে ইংরাজেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাসেমকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদ প্রদান করিলেন। অনেক দিন হইল, মীরণ এ জগৎ হইতে চির-বিদায় লইয়াছেন। কিন্তু আজিও মুর্শিদাবাদের নবাব-প্রাসাদে বাজপক্ষী হস্তে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, সেই রহস্যময় পরিণামের কথা স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দেয়।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

বৃষ্টি-রহস্য।

কুহেলিকা ও মেঘ, গঠন ও উপাদানে এক; তবে কুহেলিকা ভূপৃষ্ঠের নিকটে সমুদ্ভূতা হন, তপনতাপে বাতাসের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া অদৃশ্য হন। আর মেঘ দূরগগনে বায়ুর স্রোতে নানা রঙ্গে নাচিতে নাচিতে কখন শৈলমালার রচনা করে; কখন তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিরি-উপত্যকা কন্দর কান্তারে পরিণত করে; আদিত্যের আলোক মাখিয়া উত্তালতরঙ্গভঙ্গে ধরার জলধিকে উপহাস করে। কিন্তু জলধরের এ বাহাদুরী কত ক্ষণ? পরিশেষে সেই সাগরে আসিয়াই ত আশ্রয় লইতে হয়।

মেঘবাহী বায়ু আপন অপেক্ষা শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে বা অন্য কারণে কথঞ্চিৎ উত্তাপ হারাইলে, উহা আর মেঘ বহন করিতে পারে না। তখন মেঘকণিকা সকল পরস্পর মিশ্রিত হইতে থাকে। এই মেশামিশি ও ঘেঁসা-ঘেঁসির ফলে কণা বৃহত্তর আকার ধারণ করিলে, উহা বায়ুস্তরের বাধা অতিক্রম করিয়া ভূতলে পতিত হয়। ইহাই বৃষ্টি।

আর একরকম করিয়া বলি। ধরাতলের জলরাশি আর্দ্র ভূখণ্ড, জীবশরীর ও তরুত্বক হইতে বারিবাষ্পাকারে বাতাসে মিশিতেছে। জলের বাষ্প দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন বাতাসে অনেক উত্তাপ থাকে, তখন উত্তপ্ত

বায়ু বাষ্পাকারে পরিণত জলরাশিকে আপনার দেহে মিশাইয়া লইয়া আকাশ পানে উঠিতে থাকে। আকাশের উপরের বায়ু অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু অধিকতর উত্তপ্ত, এবং সেই জন্য "হাল্কা" বলিয়া উহা শীতলতর ও গুরুতর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া, তৈলের জলস্তর ভেদপূর্ব্বক উত্থানের ন্যায়, উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু উঠিতে উঠিতে শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে আপন উত্তাপ হারায়। কারণ, উত্তাপ সকল বস্তুতে সমতা রাখিবার জন্য সতত ব্যাকুল। উষ্ণদুগ্ধপূর্ণ এক পাত্রকে শীতলজলপূর্ণ পাত্রে নিমজ্জিত করিলে, দুগ্ধ শীতল হয়, এবং জল উষ্ণ হইয়া থাকে। উত্তাপ কমিয়া গেলে বায়ু জলীয়বাষ্প ধরিয়া রাখিতে অক্ষম হয়। তখন জলীয়বাষ্প ক্ষুদ্র কণিকার আকার ধারণ করিয়া মেঘ হইয়া বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে। বায়ু অধিকতর শীতল হইলে মেঘও বহন করিতে পারে না; তখন মেঘের কণা সকল একত্র মিশিয়া পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। নিপতিত হইতে হইতে জলকণা যদি উষ্ণ বায়ু স্পর্শ করে, তবে আবার জলীয়বাষ্প কিংবা মেঘ হইয়া যায়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শীতলতর বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন জলীয়বাষ্পবাহী উষ্ণতর বায়ু শীতল হইতে থাকে ও জলীয়বাষ্প মেঘ কিম্বা বারিকণায় পরিণত হয়, তখন ঐ শীতলতর বায়ুও উত্তপ্ত হইতে থাকে; তবে কেন জলীয়বাষ্প সেই নবোত্তপ্ত বায়ুর আশ্রয় গ্রহণ করে না? কিন্তু জ্ঞানময় ও দয়াময় বিধির বিধান অন্যরূপ। পরিমিতউত্তাপসম্পন্ন ক নামক বায়ুতে যদি ম পরিমিত জলীয়বাষ্প থাকে, এবং পরিমিতউত্তাপসম্পন্ন খ নামক বায়ুতে যদি প পরিমিত জলীয়বাষ্প থাকে, তবে ক ও খ বায়ুর সংমিশ্রণে যে বায়ুরাশি হইবে, তাহার উত্তাপের পরিমাণ ত হইবে বটে, কিন্তু ত পরিমিত উত্তাপসম্পন্ন বায়ু ম+প পরিমিত জলীয়বাষ্প ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না। বায়ুর উত্তাপ ২, ৫, ৮, ১১ ইত্যাদি পাটীগণিতিক অনুপাতে হ্রাস হয়; কিন্তু বায়ুর জলীয়বাষ্পধারণশক্তি ২, ৮, ৩২, ১২৮ ইত্যাদি জ্যামিতিক অনুপাতে কমিতে থাকে। এক ঘনফুট বায়ুর যখন উত্তাপ ৫০ ডিগ্রি, তখন উহাতে ৪·১ গ্রেণ জলীয়বাষ্প থাকে; ঐ বায়ুর উত্তাপ যখন ৭০ ডিগ্রি, তখন উহাতে ৮ গ্রেণ জলীয়বাষ্প থাকে। এই উভয় বায়ু একত্র মিশিলে তাহার উত্তাপ ৬০ ডিগ্রি হইবে; কিন্তু বিমিশ্রিত বায়ুর প্রতি ঘনফুটে ৫·৮ গ্রেণের অধিক জলীয়বাষ্প বিরাজ করিতে পারে না; সুতরাং এ দুই বায়ুর সংমিশ্রণে প্রতি ঘনফুটে ·২৫ গ্রেণ পরিমিত জলীয়বাষ্প মেঘরূপে পরিণত হইবে।

শীতলতর বায়ুর সহিত মিশিয়াই যে বায়ু শীতল হইয়া জলীয়বাষ্পধারণ-শক্তি হারাইয়া থাকে, তাহা নহে। তাড়িতশক্তিবলে অথবা শীতল শৈলমালা ও তজ্জাত অরণ্যের সংস্পর্শেও উষ্ণ বায়ু শীতল হইতে থাকে। এই জন্য পর্ব্বতের গাত্রে দূর হইতে মেঘ লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। বোধ হয়, এই জন্য আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মেঘ সকল পাহাড়ে শালপাতা খাইতে যায়।

ভূপঞ্জরের ও ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অসামঞ্জস্য, সমীরস্রোতের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিবিধ কারণে পৃথিবীর সকল স্থানে সমান বৃষ্টি হয় না, এবং এক স্থানেও বৎসরের সকল সময় সমান বারিপাত হয় না। মিশর দেশ, শাহারার মরুভূমি, পারস্যের ও মঙ্গোলিয়ার মালভূমি, আরবের পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি অনেক স্থানে আদৌ বৃষ্টি হয় না। উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বারিপাতের অত্যধিক অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়। খাসিয়া পর্ব্বতস্থিত চেরাপুঞ্জিতে প্রতি বৎসর পাঁচ শত হইতে ছয় শত ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে; আবার পশ্চিমে জাকোবাবাদের বার্ষিক বারিপাত সাড়ে চারি ইঞ্চির অধিক নহে। তথায় কোন কোন বৎসর কেবলমাত্র এক ইঞ্চিও জল হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতেও বারিপাতপরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সামান্য নহে। পশ্চিমঘাটের বৌরাদুর্গে ২৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; এবং তথা হইতে কেবলমাত্র ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী গোকাকে ২২ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। এক স্থানে প্রতিবৎসরই যে সমান বৃষ্টি হয়, তাহা নহে। দেখিয়া শুনিয়া যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে প্রদেশের বার্ষিক বারিপাত সমধিক, তথায় প্রায় প্রতি বৎসর সমপরিমিত বৃষ্টিই হইয়া থাকে; এবং যেখানে বারিপাত স্বল্প, তথায় বৎসর বৎসর বারিবর্ষণপরিমাণের বিলক্ষণ ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। দক্ষিণ মহাসাগরের জলীয়বাষ্প হিমগিরির পরপার তিব্বতে কদাচিৎ যাইতে পারে; হিমালয়ের গ্রেট রঞ্জিৎ উপত্যকা ও তাহার কিছু উত্তরবর্ত্তী স্থানে প্রায় এক শত ফুট জল হয়। নেপাল উপত্যকায় কাটামুণ্ডু নগরের বার্ষিক বারিপাত ৫৭ ইঞ্চি; তিব্বতে লে নামক স্থানে আড়াই ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না।

গ্রীষ্মের মনসুন বায়ুপ্রবাহ ভারতের অধিকাংশ জল আনয়ন করে। জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কয়েক মাসই বোম্বাই প্রদেশে বৃষ্টির মত বৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, পঞ্জাব, রাজপুতানা, হাইদ্রাবাদ, ডেকান, বেরার, গুজরাট, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিমোপকূল প্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে এই সময় অধিক বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বভাগ, কর্ণাট,

পূর্ব্বঘাট শৈল ও সিংহলের পূর্ব্বার্দ্ধে সে সময় বারিপাত হয় না। তথাকার বর্ষাকাল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত; সেই কয়েক মাস বঙ্গোপসাগরের উত্তরপশ্চিমাংশে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু বহিতে থাকে, এবং উত্তর-পূর্ব্ব মনসুন সমীর মন্দ মন্দ গতিতে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণার্দ্ধ ও কর্ণাট দেশে গিয়া উপনীত হয়। এ সময় বর্ষা দক্ষিণাভিমুখে গমন করে; অবশেষে ডিসেম্বর মাসের শেষে, যেখানে চিরবর্ষা বিরাজমানা, সেই বিষুব রেখার দুই পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে গিয়া মিশিয়া যায়।

ভারত গবর্মেণ্টের হাওয়া আপিস (Meteorological Department) নানা স্থানে যন্ত্র বসাইয়া জল ও বায়ুর গতি-ক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেই সকল স্থানের দর্শনফল প্রত্যহ তারযোগে বিজ্ঞানবিৎ সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট যাইতেছে। তিনি তাহা অনুধাবন করিয়া তাঁহার দর্শনফল সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন। তাহাতে নাবিকগণের যে পরিমাণ উপকার হইতেছে, কৃষককুলের সেরূপ হইতেছে না। তাহার কারণ এই যে, জলবায়ুর বিজ্ঞানের এখনও কিশোরকাল। বৎসরে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, কোন মাসে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, তাহা অনেকটা দৃঢ়রূপে জানুয়ারি মাসে বলিবার ক্ষমতা এখনও এই বিজ্ঞানের হয় নাই। অধ্যাপক ইলিয়ট ও পেডলার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ বিজ্ঞানের পুষ্টির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; এবং দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অন্ধকার ছিল, কিয়ৎপরিমাণে তাহার অপনয়ন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বৃষ্টিপাতের মোটামুটি নিয়ম ভিন্ন সূক্ষ্ম কারণসমূহের এখনও কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বহুকালের অধ্যবসায় ও পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন তাহা সাধিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশে বৃষ্টিসংক্রান্ত নানাবিধ প্রবাদ আছে। পৌষ মাসের বাতাস দেখিয়া কৃষকেরা আগামী বর্ষের বৃষ্টি কিরূপ হইবে, তাহার একটা অনুমান করিয়া লয়। পশ্চিম বঙ্গে ইহাকে "মাস শোধা" বলে। ইহা ব্যতীত খনা ও ডাকপুরুষের বচন বলিয়া অনেক পদাবলী লোকমুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি,—

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়,
আউলে বাউলে দিচ্চে বায়।
শ্বশুরকে বল বাঁধতে আল,
আজ না হয় হবে কাল।

১২৯৪ সালে "হিন্দুরঞ্জিকা" পত্রে পরাশরের একটি বচন প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এই,—

শীতলতর বায়ুর সহিত মিশিয়াই যে বায়ু শীতল হইয়া জলীয়বাষ্পধারণ-শক্তি হারাইয়া থাকে, তাহা নহে। তাড়িতশক্তিবলে অথবা শীতল শৈলমালা ও তজ্জাত অরণ্যের সংস্পর্শেও উষ্ণ বায়ু শীতল হইতে থাকে। এই জন্য পর্ব্বতের গাত্রে দূর হইতে মেঘ লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। বোধ হয়, এই জন্য আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মেঘ সকল পাহাড়ে শালপাতা খাইতে যায়।

ভূপঞ্জরের ও ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অসামঞ্জস্য, সমীরস্রোতের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিবিধ কারণে পৃথিবীর সকল স্থানে সমান বৃষ্টি হয় না, এবং এক স্থানেও বৎসরের সকল সময় সমান বারিপাত হয় না। মিশর দেশ, শাহারার মরুভূমি, পারস্যের ও মঙ্গোলিয়ার মালভূমি, আরবের পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি অনেক স্থানে আদৌ বৃষ্টি হয় না। উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বারিপাতের অত্যধিক অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়। খাসিয়া পর্ব্বতস্থিত চেরাপুঞ্জিতে প্রতি বৎসর পাঁচ শত হইতে ছয় শত ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে; আবার পশ্চিমে জাকোবাবাদের বার্ষিক বারিপাত সাড়ে চারি ইঞ্চির অধিক নহে। তথায় কোন কোন বৎসর কেবলমাত্র এক ইঞ্চিও জল হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতেও বারিপাতপরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সামান্য নহে। পশ্চিমঘাটের বৌরাদুর্গে ২৫১ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; এবং তথা হইতে কেবলমাত্র ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী গোকাকে ২২ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। এক স্থানে প্রতিবৎসরই যে সমান বৃষ্টি হয়, তাহা নহে। দেখিয়া শুনিয়া যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে প্রদেশের বার্ষিক বারিপাত সমধিক, তথায় প্রায় প্রতি বৎসর সমপরিমিত বৃষ্টিই হইয়া থাকে; এবং যেখানে বারিপাত স্বল্প, তথায় বৎসর বৎসর বারিবর্ষণপরিমাণের বিলক্ষণ ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। দক্ষিণ মহাসাগরের জলীয়বাষ্প হিমগিরির পরপার তিব্বতে কদাচিৎ যাইতে পারে; হিমালয়ের গ্রেট রঞ্জিৎ উপত্যকা ও তাহার কিছু উত্তরবর্ত্তী স্থানে প্রায় এক শত ফুট জল হয়। নেপাল উপত্যকায় কাটামুণ্ডু নগরের বার্ষিক বারিপাত ৫৭ ইঞ্চি; তিব্বতে লে নামক স্থানে আড়াই ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না।

গ্রীষ্মের মনসুন বায়ুপ্রবাহ ভারতের অধিকাংশ জল আনয়ন করে। জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত কয়েক মাসই বোম্বাই প্রদেশে বৃষ্টির মত বৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, পঞ্জাব, রাজপুতানা, হাইদ্রাবাদ, ডেকান, বেরার, গুজরাট, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিমোপকূল প্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে এই সময় অধিক বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বভাগ, কর্ণাট,

পূর্ব্বঘাট শৈল ও সিংহলের পূর্ব্বার্দ্ধে সে সময় বারিপাত হয় না। তথাকার বর্ষাকাল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত; সেই কয়েক মাস বঙ্গোপসাগরের উত্তরপশ্চিমাংশে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু বহিতে থাকে, এবং উত্তর-পূর্ব্ব মনসুন সমীর মন্দ মন্দ গতিতে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণার্দ্ধ ও কর্ণাট দেশে গিয়া উপনীত হয়। এ সময় বর্ষা দক্ষিণাভিমুখে গমন করে; অবশেষে ডিসেম্বর মাসের শেষে, যেখানে চিরবর্ষা বিরাজমানা, সেই বিষুব রেখার দুই পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে গিয়া মিশিয়া যায়।

ভারত গবর্মেণ্টের হাওয়া আপিস (Meteorological Department) নানা স্থানে যন্ত্র বসাইয়া জল ও বায়ুর গতি-ক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেই সকল স্থানের দর্শনফল প্রত্যহ তারযোগে বিজ্ঞানবিৎ সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট যাইতেছে। তিনি তাহা অনুধাবন করিয়া তাঁহার দর্শনফল সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন। তাহাতে নাবিকগণের যে পরিমাণ উপকার হইতেছে, কৃষককুলের সেরূপ হইতেছে না। তাহার কারণ এই যে, জলবায়ুর বিজ্ঞানের এখনও কিশোরকাল। বৎসরে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, কোন মাসে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, তাহা অনেকটা দৃঢ়রূপে জানুয়ারি মাসে বলিবার ক্ষমতা এখনও এই বিজ্ঞানের হয় নাই। অধ্যাপক ইলিয়ট ও পেডলার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ বিজ্ঞানের পুষ্টির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; এবং দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অন্ধকার ছিল, কিয়ৎপরিমাণে তাহার অপনয়ন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বৃষ্টিপাতের মোটামুটি নিয়ম ভিন্ন সূক্ষ্ম কারণসমূহের এখনও কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বহুকালের অধ্যবসায় ও পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন তাহা সাধিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশে বৃষ্টিসংক্রান্ত নানাবিধ প্রবাদ আছে। পৌষ মাসের বাতাস দেখিয়া কৃষকেরা আগামী বর্ষের বৃষ্টি কিরূপ হইবে, তাহার একটা অনুমান করিয়া লয়। পশ্চিম বঙ্গে ইহাকে "মাস শোধা" বলে। ইহা ব্যতীত খনা ও ডাকপুরুষের বচন বলিয়া অনেক পদাবলী লোকমুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি,—

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়,
আউলে বাউলে দিচ্চে বায়।

শ্বশুরকে বল বাঁধতে আল,
আজ না হয় হবে কাল।

১২৯৪ সালে "হিন্দুরঞ্জিকা" পত্রে পরাশরের একটি বচন প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এই,—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে নবম্যাং যদি বর্ষতি।
বর্ষত্যেব সদা দেবস্তত্রাবৃষ্টৌ কুতো জলং॥
শুক্লাষাঢ়নবম্যামুদয়গিরিতটীনির্ম্মলত্বং প্রয়াতে
স্বীয়ং কালং বিধত্তে খরতররকিরণো মণ্ডলাকারমুখ্যং।
জীমূতৈর্ব্বেষ্টিতোঽসৌ যদি ভবতি রবির্গম্যমানোঽস্তশৈলে
তাবৎ পর্য্যন্তমেব প্রনদতি জলদো যাবদস্তং তুলায়াঃ॥

এই পরাশরীয় শ্লোকের যে অনুবাদ লোকমুখে বিচরণ করিতেছে, তাহাও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা,—

আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা। পর্ব্বতে লাগে সমুদ্রের ফেনা।
তাতে আছে জলের লেখা॥ যদি বর্ষে মুষল ধারে।
যদি বর্ষে ইমি ঝিমি। মধ্য সমুদ্রে বগুলা চরে॥
শস্যের ভার না সহে মেদিনী॥ যদি সূর্য্য হেঁসে বসে পাটে।
যদি বর্ষে কণা কণা। চাষার গরু বিকায় হাটে॥

এরূপ অনেক বচন আছে। বিদুষী খনা অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার শ্লোক সকল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কোথায়, তাহার স্থির নাই। পরাশর ও খনা কোন প্রদেশের জন্য তাঁহাদিগের শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বৈষম্যে বারিপাতের প্রভূত ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিম গগনে মেঘের উদয় হইলে বৃষ্টি অনিবার্য্য; কিন্তু ঐ সময়ে জলপাইগুড়িতে পূর্ব্বাকাশের মেঘই বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। বৃষ্টিসংক্রান্ত যাবদীয় প্রবাদ ও শ্লোক সংগ্রহ করিয়া তাহার তথ্যনির্ণয় অধ্যবসায়সাপেক্ষ। আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বিজ্ঞানজ্ঞ গ্রাজুয়েট কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন না?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল বারিবৃষ্টির কথা কহিলাম। কিন্তু সময় সময় যে বারি ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ আকাশ হইতে ভূপতিত হয়, তাহার আলোচনা করিলাম না। মৎস্যবৃষ্টি, ভেকবৃষ্টি, প্রস্তরবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টি, ইত্যাদি আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ঘটনার বিষয় বারান্তরে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

ভাষা ও সাহিত্য।

ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়ে সমাজের উন্নতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কোন দেশের জাতীয় প্রকৃতি কি, তাহা বুঝিতে হইলে, অগ্রে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করা উচিত। সমাজের যখন যে অবস্থা ঘটে, জাতীয় সাহিত্য তখন সেই অবস্থার অনুরূপ বিষয়ে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। ইংলণ্ড যখন বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল, বিষয়বাসনার পঙ্কিলভাবে ইংলণ্ডবাসিগণ যখন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ইংলণ্ডে দূষণীয় নাটক ও সঙ্গীত প্রভৃতির কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। রাজসভায় এই কুপ্রবৃত্তিমূলক বিষয়ের আন্দোলন হইত; নাট্যশালায় এই কুচরিত্র ও কুদৃশ্যের আবির্ভাবে দর্শকগণ নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিত; প্রকাশ্য পথে, লোকালয়ে, বা বিপণীতে এই পাপাচার ও পাপময়ী কথা স্বকীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণভাবে রাখিত। সাহিত্যক্ষেত্রের কর্ম্মবীরগণের অসামান্য সাধুভাবে ও মহীয়সী প্রতিভায় এই প্রবৃত্তিস্রোত ক্রমে সঙ্কুচিত হয়। ইঁহাদের প্রতিপত্তিতে, ইঁহাদের গৌরবে, ইংলণ্ডের সাহিত্য প্রতিপত্তিশালী ও গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে।

এক সময়ে আমাদের সাহিত্যেও এইরূপ পঙ্কিলভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যাঁহাদের ক্ষমতায় উহা অপসারিত হইয়াছে, তাঁহারা অনন্তকীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এখন যাঁহারা তাঁহাদের পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের একাগ্রতা ও উৎসাহ আছে বটে, কিন্তু তাদৃশ ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য নাই। উত্তম পুরুষের প্রাধান্যে আত্মহারা হইলে যে সকল কুফলের উৎপত্তি হয়, এখন তৎসমুদায় প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। যাহা হউক, এই অহংজ্ঞানী লেখকগণ কখনও সাহিত্যক্ষেত্রের অধিনায়ক হইতে পারিবেন না। ইঁহারা যে সকল বিষয় রাখিয়া যাইবেন, তৎসমুদয় সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনের সহায় হইবে কি না, ভবিষ্যদর্শিগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, কখনও তাহার বিনাশ হয় না। নবীন লেখকগণের সমর্পিত বিষয়গুলি কালে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবে।

যাহা হউক, বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। এখন যে ভাবে সাহিত্যের গতি হইতেছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, উহার উন্নতির জন্য কতকগুলি অভাবের পূরণ করা উচিত। বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতিতে যেরূপ অলঙ্কৃত, ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে সেরূপ গৌরবযুক্ত নয়, ইহা অনেক দিন হইতে অনেকেই বলিয়া আসিতেছেন। এখন এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে বটে, কিন্তু চেষ্টার ফল পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাঁহারা উক্ত অভাবের উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহারা অভাবপূরণের প্রতিকূল বিষয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন না। কোন দুঃসাধ্য ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, অনেক প্রতিকূল বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। জাতীয় ভাষার পরিপুষ্টি ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-সাধন নিঃসন্দেহ দুঃসাধ্য ব্যাপার। সহজে ঈদৃশী সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধনার পথে যে সকল প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হয়, তৎসমুদায় দূর করিতে হইলে, যথোচিত ধীরতা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে ঘটনাপ্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক লিখিত হয়, সেই সকল পুস্তকের মধ্যে বিষয়বিশেষে পরস্পর সামঞ্জস্য থাকা উচিত। ইতিহাস লিখিতে হইলে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নামের উচ্চারণগত প্রকৃতি অনুসারে অক্ষরান্তর এবং ইতিহাসরচনার প্রণালী প্রভৃতি একরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সকল বিষয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের মধ্যে বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে ভাষা ও সাহিত্যের একটা বন্ধন থাকে না। নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে মূর্ত্তির অবয়বসংস্থান না হইলে, উহা মূর্ত্তি বলিয়াই গ্রাহ্য হয় না, এবং লোকেও উহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। হস্তের স্থলে যদি পদের সমাবেশ হয়, এবং পদ যদি হস্তের স্থান পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে ঐ দৃশ্য যেমন অপ্রীতিকর হয়, প্রণালীবিরুদ্ধ বিষয়ও সেইরূপ অশ্রদ্ধেয় ও অবজ্ঞেয় হইয়া থাকে। যে ভাষায় এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয় থাকে, সে ভাষাও অপরের সমাদৃত হয় না। কোনও কোনও স্থলে স্বেচ্ছাচারিতা মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা অমার্জ্জনীয়। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতার সংযমন আবশ্যক। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হয়, তৎসমুদয়ের পরিভাষা একরূপ হওয়া উচিত। কি প্রণালীতে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখিতে হয়, তাহার নির্দ্ধারণ করা বিধেয়। এ বিষয়েও স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া বিধেয় নহে।

ব্যক্তিসমষ্টির একীভূত চেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কোনও বিষয়ের আবিষ্কার বা কোনও বিষয়ে গ্রন্থপ্রণয়ন করা ব্যক্তিগত-চেষ্টাসাধ্য। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যকে সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করা ব্যক্তিগত চেষ্টার সাধ্য নহে। এরূপ স্থলে ব্যক্তিসমষ্টির সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। ভাষার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শব্দতত্ত্বের নির্ণয় করা, পরিভাষা প্রভৃতি স্থির করা, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ লিখিবার বিশেষ বিশেষ প্রণালী নির্দ্ধারণ করা প্রভৃতি কার্য্য দূরদর্শী অভিজ্ঞ লোকের সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন হইতে পারে। ইউরোপের "একাডেমিগুলি" এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ইউরোপে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ বিশেষ "একাডেমি" রহিয়াছে। এক "ফ্রেঞ্চ ইন্‌ষ্টি-টিউট্" কয়েক ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগ এক এক "একাডেমি" নামে প্রসিদ্ধ। এক "একাডেমি" ভাষা ও সাহিত্যের, অন্য "একাডেমি" ইতিহাসের, অপর "একাডেমি" বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। ভাষা ও সাহিত্যের "একাডেমি" দ্বারা ফরাসী ভাষা কিরূপ পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে, তাহা সহৃদয়সমাজের অবিদিত নাই। এইরূপ একাডেমি থাকাতেই, ফরাসী, ইংরেজী, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষাগুলি খরবেগে উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ "একাডেমির" একান্ত অভাব। এ পর্য্যন্ত বিদ্বন্মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় কোনও বিষয় প্রণালীবদ্ধ হয় নাই। আমাদের সাহিত্যসেবকগণ নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া যে জ্ঞানগরিমার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভাষা গৌরবান্বিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পরস্পরের একীভূত চেষ্টায় যাহা সিদ্ধ হইতে পারে, তদনুরূপ কোনও কার্য্য এ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পন্ন হয় নাই। প্রধানতঃ এই কারণে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সর্ব্বথা উচ্ছৃঙ্খলভাব প্রকাশ করিতেছে। তরণী কর্ণধারশূন্য হইলে যেমন ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হয়, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত গতির পরিচয় দিতেছে। স্বদেশে যাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের অধিনায়ক, তাঁহারা যদি স্বদেশীয় লেখকদিগকে অভিমত বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজ এ বিষয়ে যেরূপ সচেষ্ট রহিয়াছেন, অস্মদ্দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী সেইরূপ নিশ্চেষ্ট ভাব দেখাইতেছেন। ইহার ফল এই হইতেছে যে, ইউরোপীয় ভাষা উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া, জগতে প্রাধান্য লাভ করিতেছে; আমাদের ভাষা শিশুর হস্তে কর্দ্দমের ন্যায় শিথিল অবস্থায় রহিয়াছে। শিশু যেমন কর্দ্দম দ্বারা যাহা

ইচ্ছা তাহাই গড়িয়া ক্রীড়াসুখের অনুভব করে, আমাদের মাতৃভাষাও এখন লেখকদিগের সেইরূপ ক্রীড়ার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

যাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের সহিত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এক সূত্রে নিবদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহারা, বোধ হয়, ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে তাদৃশ প্রয়াসী নহেন। জ্ঞানের বিস্তার এবং ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন, পৃথক্‌ভাবে এই দুইটি বিষয়ের বিচার করা উচিত। জ্ঞানের বিস্তার যে কোনও ভাষায় হইলেই পৃথিবীর উপকার হইতে পারে। নিউটন আপনার গবেষণার ফল লাতিন ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কেবল লাতিন পাঠকদিগের মধ্যেই সেই অপরিমেয় জ্ঞানরাশি আবদ্ধ থাকে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যসমাজ সেই জ্ঞানরত্নে আপনাকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং যাবতীয় সভ্যসমাজের ভাষাতে সেই জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইতেছে। চীনের চিরপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন্‌থসঙ্গ স্বদেশীয় ভাষায় আপনার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার বিবরণ লিখিয়া গেলেও, উহা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যসমাজের অপরিজ্ঞাত থাকে নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, জ্ঞানবিস্তার যে কোনও ভাষাতেই হউক না কেন, জ্ঞানপিপাসুদিগের পিপাসার কখনও অপরিতৃপ্তি হয় না। কিন্তু যাঁহারা স্বদেশের হিতকামনা করেন, অগ্রে তাঁহাদের স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যকে সুশৃঙ্খল করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির নাম করিয়া, জ্ঞান বিস্তারের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাঁহারা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কেবল উদ্ভ্রান্তভাবে বিচরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা থাকে না। তাঁহারা যেমন ভাষা ও সাহিত্যকে সুনিয়মিত করিতে পারেন না, সেইরূপ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানবিস্তারেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। দুই নৌকায় পা দিলে মানুষের যে দশা ঘটে, তাঁহাদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। দুই দিক্ রক্ষণ করিতে গিয়া, তাঁহারা তরঙ্গময় জলে আত্মবিসর্জ্জন করেন। যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানবিস্তারের প্রয়াসী, ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন তাঁহাদের লক্ষ্যের মধ্যে গণ্য হয় না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স যখন এসিয়াটিক্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন জ্ঞানবিস্তারই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ দ্বারা যে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহা বোধ হয়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ভাষা ও সাহিত্যের শৃঙ্খলাসম্পাদন যে উক্ত সভার উদ্দেশ্য নয়, তাহা উহার নামেই পরিব্যক্ত হইতেছে।

আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মক্ষম নই; অভিজ্ঞতাতেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সমকক্ষ নই; তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখিয়াছেন; একটি বিষয়ের সহিত আর একটি বিষয়ের সংযোগ করিয়া, তাঁহারা কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের কর্ম্মনৈপুণ্য ও কর্ম্মক্ষমতা উভয়ই পরিস্ফুট হইতেছে। আমরা দীর্ঘকাল তাঁহাদের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত থাকিয়াও যে এইরূপ কর্ম্মপ্রবণতায় অভ্যস্ত হইতে পারিলাম না, ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে।

এখন ভাষা ও সাহিত্যকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া যথোচিত উদ্যম ও উৎসাহসহকারে যত্ন না করিলে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদ এখন নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে মেদভারাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়, বোধ হয়, পরিষদের কিয়দংশে বলক্ষয় হইয়াছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, পরিষদের সেই শক্তি আছে কি না, এখন তাহা সহৃদয়গণের বিবেচ্য।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সেকালের 'কলিকাতা গেজেট'।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে "কলিকাতা গেজেটে"র জন্ম হয়। মিঃ এফ্. গ্ল্যাডুইন নামক জনৈক ইংরেজ সম্পাদক, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতশাসনকর্ত্তার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, এই সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এখনকার মত সেকালের কলিকাতা গেজেটে কেবলমাত্র সরকারী সংবাদ পুঞ্জীকৃত হইত না। অন্যান্য সংবাদপত্রের ন্যায় ইহাতে নানাবিধ বিজ্ঞাপন ও পদ্যগদ্যময় সম্পাদকীয় ও পত্রপ্রেরকলিখিত বিবিধ প্রবন্ধ প্রকটিত হইত; তৎসঙ্গে অবশ্য অনেক জ্ঞাতব্য সরকারী সংবাদও দেখিতে পাওয়া যাইত।

শতবর্ষ পূর্ব্বে এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সচরাচর-প্রচলিত ইতিহাসে সম্যক জানিতে পারা যায় না। সেই জন্য ইতিহাসপাঠকদিগের নিকট পুরাতন কলিকাতা গেজেট বহুমূল্য বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন গেজেটের খণ্ডশঃ-প্রকাশিত সংখ্যাগুলি এখন আর সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহার সারসংগ্রহ করিয়া সিটন্‌কার সাহেব যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্ত দুর্লভ নহে। অবসরসময়ে তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অনেক পুরাকাহিনীর সন্ধানলাভ করা সম্ভব। এই প্রবন্ধে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

কলিকাতা গেজেটের সম্পাদকের স্বাধীনতা ছিল। তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও স্বাধীন মতামত প্রদান করিতে পারিতেন; কিন্তু সেকালের নিয়মানুসারে তাঁহাকে ইংরেজসরকারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে হইত। প্রথম প্রথম সম্পাদকীয় স্তম্ভে কেবল সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবেরই বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু কালক্রমে সকল প্রকার বিষয়েই সম্পাদক মহাশয় অল্পাধিক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সেকালে এখনকার মত পথঘাটের সুব্যবস্থা না থাকায় ডাকঘরের সুবন্দোবস্তও ছিল না; কলিকাতার সঙ্গে মফস্বলের অল্প কয়েক স্থানের সংযোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বর্ষাসমাগমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। এই সকল কারণে মফস্বলে পত্রপ্রেরণ করা বা মফস্বল হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া সকল সময়ে ঘটিয়া উঠিত না, এবং যখন ঘটিত, তখনও কোনও নিশ্চয় ছিল না। ডাকমাশুলের হার কিছু অধিক ছিল, এবং ছোট ছোট চিঠি ভিন্ন বড় বড় কাগজ বা পুলিন্দা পাঠাইতে হইলে, সপ্তাহে দুই এক দিনমাত্র বাঙ্গীডাকে তাহা পাঠাইতে পারা যাইত। চিঠির ডাকে ৯৷৷০+৪ ইঞ্চি আয়তনের চিঠি পর্য্যন্তই গৃহীত হইত, আয়তন তাহার অপেক্ষা বড় হইলে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বাঙ্গীডাকে প্রেরণ করিতে হইত। ২৷৷০ তোলা পর্য্যন্ত এক মাশুল, ৩৷৷০ তোলা পর্য্যন্ত তাহার দ্বিগুণ, ৪৷৷০ তোলা পর্য্যন্ত ত্রিগুণ, ৫৷৷০ তোলা পর্য্যন্ত চারিগুণ—এইরূপ হারে মাশুল নির্দ্দিষ্ট হইত, এবং স্থানের দূরত্ব-অনুসারে মাশুলের তারতম্য হইত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে যে কয়েকটিমাত্র ডাকঘর ছিল, তাহার নাম,—বারাকপুর, হুগলী, চন্দননগর, মুঙ্গের, পাটনা, বক্সার, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, ভাগলপুর, দিনাজপুর, রাজাপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কল্পী, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক এবং গঞ্জাম।

২৷৷০ তোলার চিঠি কলিকাতা হইতে পাঠাইতে হইলে, বারাকপুর, হুগলী ও চন্দননগরের জন্য এক আনা, বর্দ্ধমান ও মুরসিদাবাদের জন্য দুই আনা, রাজমহল ও ভাগলপুরের জন্য তিন আনা, দিনাজপুর ও মুঙ্গেরের জন্য চারি আনা, পাটনার জন্য পাঁচ আনা, বক্সারের জন্য ছয় আনা, এইরূপ হারে মাশুল দিতে হইত।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে হইলে অসুবিধার অন্ত ছিল না; কিন্তু পুলিশের নিকট আবেদন করিলে তাহারা ডাকের নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া দিত। একখানি আট-দাঁড়ী বজরার দৈনিক ভাড়া দুই টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তাহাতে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ গমন করিতে হইলে পঁচিশ দিনের ভাড়া গণিয়া দিতে হইত।

কলিকাতার পুলিশের উপর নগররক্ষার ও অন্যান্য কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তজ্জন্য সহরে একত্রিশটি থানা সংস্থাপিত ছিল। থানাগুলির নাম,—আর-মানী গির্জা, পুরাণা কেল্লা, চাঁদপালঘাট, লালদীঘী, ধর্ম্মতলা, ওল্ডকোর্ট-হাউস, ডোমতলা, আমড়াগলী-পঞ্চাননতলা, চীনাবাজার, চাঁদনী চক, টুরুলবাজার, ঝামাপুকুর, চকডাঙ্গা, সিমলাবাজার, লনলঙ্কা বাজার, মলঙ্গা-পটলডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, বৈঠকখানা, শ্যামপুকুর, শ্যামবাজার, পদ্মপুকুর, কুমারটুলী, যোড়াসাঁকো, মেছোবাজার, জানবাজার, ডিঙ্গাভাঙ্গা, সুতানটি-হাটখোলা, দয়েহাটা, হাঁসপুকুরিয়া, কলিঙ্গা ও জোড়াবাগান। প্রতি থানায় এক জন থানাদার ও এক জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকিবার ব্যবস্থা ছিল; ইহারা সকলেই বাঙ্গালী। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের তালিকায় দেখা যায়, থানাদার-দিগের মধ্যে ১৮ জন হিন্দু এবং সুপারিণ্টেণ্ডদিগের মধ্যে ৮ জন হিন্দু; অবশিষ্ট সমস্ত মুসলমান। এখনকার মত তখন থানায় ইংরেজ কর্ম্মচারীর বাহুল্য ছিল না।

সহরে ইংরেজদিগেরই প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা সকলেই ক্ষুদ্র নবাবের মত সাজসারঞ্জামে কালাতিপাত করিতেন। ইংরাজগৃহে যতগুলি দাস দাসী নিযুক্ত হইত, তাহার সংখ্যা গণণা করিলে এখনকার সাহেবেরাও বিস্মিত হইবেন। ইহাদের বেতন নিতান্ত অল্প ছিল না। ইংরাজেরা একবার ইহাদের বেতন কমাইবার জন্য কমিটি করিয়াছিলেন।

সেকালের ইংরাজদিগকে দায়ে পড়িয়া এ দেশের লোকের মত অনেক-গুলি আচার ব্যবহার অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে ধূমপানের কথাটাই

সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। একালের সাহেবেরাও ধূমপানে কম মজবুত নহেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের ধূমপানপ্রথার বড়ই বিরোধী। সেকালে ইহার বিপরীত ছিল। ইংরেজ ধূমপায়িগণ আমাদের মতই হুঁকার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কেহ কাহারও হুঁকায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। তজ্জন্য তাঁহারা বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণরক্ষা করিবার সময়ে আপন-আপন হুঁকা কলিকা বাঁধিয়া রওনা হইতেন। কেবল গবর্মেণ্ট হাউসের ভোজে হুঁকা প্রবেশ করিতে পারিত না, এবং কোন কোন প্রকাশ্য নাচ তামাসায় বা সভা সমিতিতে হুঁকা কলিকা নীচের তলায় রাখিয়া আসিতে হইত।

বিলাতী জিনিসের আমদানী অল্প ছিল। সময়ে সময়ে বিলাতী জিনিসের আমদানী হইত, এবং তখন তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কলিকাতা গেজেটে এক জন ইংরেজ মহিলা কবিতাচ্ছলে ইহার একটি সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—

"But stay,' let me reserve my rhyme,
To shew you how I spend my time.
After a sultry restless night
Tormented with the hum and bite
Of pois'nouis inseots out of number,
That here infests one's midnight slumber,
I rise fatigued, almost expended,
Yet suddenly when breakfast's ended,
Away we hurry with our fops
To rummage o'er Europe-shops ;
And when of Caps and Gauze we hear
Oh ! how we scramble for a share !"

ইংরাজদিগকে দায়ে পড়িয়া এ দেশের শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। সেকালে এ দেশে যে সকল পট্টবস্ত্র ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা বিলাতেও বহুমূল্য বলিয়া পরিচিত থাকায়, এতদ্দেশবাসী ইংরাজ নরনারী তাহাকে হতাদর করিতে পারিতেন না। তদ্ভিন্ন ইংরাজদিগের ব্যবহারোপযোগী অনেক জিনিস এ দেশেও প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সেকালের বাঙ্গালীরা শিল্পকৌশলের জন্য সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বা ইংরাজ নাবিকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে

এ দেশের শিল্পজাত দ্রব্য এত অধিকপরিমাণে লইয়া যাইতেন যে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য ঘোষণাপত্রের প্রচার করা আবশ্যক হইত।

ইংরেজেরা এ দেশে আসিয়া বাণিজ্যব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যার্ত্তন-কালে বিলাসবিভ্রমের পরিচয় দিবার জন্য এ দেশের কৃষ্ণকায় ভৃত্যবর্গকে বিলাতে টানিয়া লইয়া যাইতেন। কিছু দিন পরে তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়া পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইত ; অর্থাভাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। ইহার গতিরোধ করিবার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টার নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কেহ কৃষ্ণকায় ভৃত্য সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিলে, কোম্পানীর তহবিলে পাঁচ শত টাকা জমা দিতে হইবে। সেই হইতে হতভাগ্য বাঙ্গালী ভৃত্যবর্গের বিড়ম্বনা দূর হইয়াছিল। বাঙ্গালী ভৃত্য ভিন্ন ইংরাজদিগের বাটীতে মালয়দেশজ কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসও থাকিত ; তাহারা সময়ে সময়ে পলায়ন করায়, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইত।

ইংরাজেরা যেখানে পদার্পণ করেন, সেইখানেই ভজনালয় এবং নাট্যশালার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টির প্রতি সেকালের ইংরাজদিগের অধিকতর অনুরাগ ছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কিন্তু সেকালে কলিকাতায় ভজনালয়ের ন্যায় নাট্যশালারও যে সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, পুরাতন কলিকাতা গেজেটে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাট্যশালায় সাময়িক বৃত্তান্তমূলক নাটক ভিন্ন সেক্ষপিয়র-কৃত বিখ্যাত নাটকাদিরও অভিনয় হইত, এবং তদুপলক্ষে কলিকাতার ইংরাজ-মহলে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত।

পুরাতন কলিকাতা গেজেটে দুই চারিটি মামলা মকদ্দমার সংবাদও জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে একটি মকদ্দমা কিছু কৌতুকাবহ ও তাহার সহিত আমাদের ইতিহাসের সংস্রব আছে। মীর কাসিমকে সিংহাসন দান করিবার সময়ে তিনি প্রত্যুপকারস্বরূপ ইংরাজ সদস্যগণকে যে পুরস্কারবিতরণে প্রতিশ্রুত হন, কালক্রমে সেই পুরস্কারের অংশনির্ণয় লইয়া ইংরাজদিগের মধ্যে গৃহকলহ উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ণেল প্রিস্কো, মিঃ পেটি, মেজর বেভান্ এবং আণ্টনি শ্লোয়ান সাহেবের আড্‌মিনিস্‌ট্রেটার মিঃ জন মিলার বাদী হইয়া, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে

উক্ত পারিতোষিকের অংশনির্ণয়ার্থ মকদ্দমা উপস্থিত করেন। উভয় পক্ষেই সুযোগ্য কৌন্সলী তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের বিচারে বাদিগণ ডিক্রী প্রাপ্ত হন।

বিজ্ঞাপনস্তম্ভে যে সকল বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইত, তন্মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে। একটি বিজ্ঞাপন এইরূপ,—

Thursday, June 15th, 1786. For sale by Moore, Sanders, and Lacey, the Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon translated from the original Sanskreet, by Charles Wilkins, price one Gold Mohur.

চার্লস উইলিকিন্স নামক জনৈক ইংরেজ ভগবদ্গীতার ইংরাজি অনুবাদ করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভাপতি স্মিথ সাহেব উহা বিলাতে মুদ্রিত করিয়া এক মোহর মূল্যে বিক্রয়ার্থ এ দেশে পাঠাইয়া দেন। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুরোধে কোম্পানীর ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং লভ্যাংশ ও গ্রন্থসত্ত্ব অনুবাদককে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইংরাজেরা যেমন এক দিকে গীতার অনুবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অন্য দিকে অতি সামান্য কথা লইয়া পরস্পর দ্বন্দযুদ্ধ করিতেন, এবং তাহাতে অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেন।

ইংরাজের নামের প্রবল প্রতাপ এত দূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, ইংরাজের নামের দোহাই দিয়া দেশের লোকেও দেশের উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িতেন না। ইংরাজদিগের শুভদৃষ্টি লাভ করিয়া কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী নানা উপায়ে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধরগণ এখন দেশে গণ্যমান্য ও প্রতাপশালী হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া পূর্ব্বকাহিনীর অনুসরণ করা প্রীতিপ্রদ নহে। ইঁহারা নিজের বরকন্দাজগণকে কোম্পানীর সিপাহী ও লস্করের পোষাক পরাইয়া দেশের লোকের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। তাহার নিবারণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়।

"The Honorable the Governor General and Council having received information that a practice has gradually crept in amongst the Banians and other richmen of Calcutta, of dressing some of their servants in, or nearly in, uniform of the Ho'nble Company's Sepoys and Lascars, and that in this dress they became the terror of the common people, and often commit most oppressive acts, for which the Honorable Companys Sepoys and Lascars bear the odium;

Notice is, therefore hereby given that the honorable the Governor General and council forbid this practice in future.

By command of the Hon'ble Board.

Fort William. April 7th, 1786. } W. Bruere Secretary."

বাঙ্গালীরা কোম্পানীর সরকারে কেরাণীগিরি প্রাপ্ত হইয়া প্রথম হইতেই কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী সেরেস্তায় প্রথম প্রথম বাঙ্গালীগণ উচ্চ পদও প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহারা জমিদারী সেরেস্তার প্রচলিত রীত্যনুসারে প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত প্রায় অষ্ট প্রহরই প্রভুর কার্য্য সরবরাহ করিতেন। সুতরাং পার্ব্বোপক্ষে ছুটির জন্য এখনকার মত এত ধূমধাম ছিল না। রায় রাইয়ানের অনুরোধক্রমে ১১৯৪ সালের যে ছুটির তালিকা বাহির হয়, তাহা সবিশেষ কৌতুকাবহ;—অনেক বিষয়ে সেকালের হিন্দুসমাজের আচারব্যবহারাদির পরিচায়ক। উক্ত তালিকাটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

পর্ব্বদিন	তারিখ	যত দিন ছুটি
রথযাত্রা,	৫ আষাঢ়	১
উল্টা রথযাত্রা	১৩ আষাঢ়	১
রাখি পৌর্ণমাসী	১৪ ভাদ্র	১
জন্মাষ্টমী	২২।২৩ ভাদ্র	২
দুর্গাষ্টমী	৫।৬ আশ্বিন	২
মহালয়া	৭ আশ্বিন	১
দুর্গোৎসব	৩রা হইতে ৭ই কার্ত্তিক	৫
দেওয়ালী	২৬।২৭।২৮শে কার্ত্তিক	৩
উত্থান একাদশী	৮ অগ্রহায়ণ	১
পৌষসংক্রান্তি	পৌষের শেষদিন	১
বাসন্তী পঞ্চমী	৩ ফাল্গুন	১
শিবরাত্রি	২৬।২৭ ঐ	২
হোলী	১০ই হইতে ১৪ই চৈত্র	৫
বারুণী	৫ চৈত্র	১
চড়কপূজা	চৈত্রসংক্রান্তি	১
রামনবমী	১৪ বৈশাখ ১১৯৫	১
		মোট ২৯ দিন

সে কালের ছুটির তালিকাতে পর্ব্বদিনোপলক্ষে আপিসাদি বন্ধের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, তদনুসারে দুর্গোৎসব, হোলী ও দেওয়ালীরই প্রাধান্য সূচিত হয়। জনশ্রুতিও ইহার অনুমোদন করে। সেকালে কাহারও সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় দিতে হইলে, লোকে বলিত, অমুক "দোল দুর্গোৎসব" করিয়া থাকে। এই তিনটি উৎসবে সামাজিক সৌভাগ্যের পরিচয় প্রকাশিত হইত বলিয়া, লোকের টাকা হইলেই ইহার অনুষ্ঠান করিত, এবং ধনশালী জমীদারগণকে দোলমঞ্চ নামক অত্যুন্নত মন্দিরনির্ম্মাণে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতে দেখা যাইত। পর্ব্বোপলক্ষে কলিকাতার ধনকুবেরগণ যে সাহেবসেবা করিয়া থাকেন, তাহাও নিতান্ত আধুনিক নহে; সেকালেও দুর্গোৎসবে সাহেব সুবার নিমন্ত্রণ হইত, এবং তাঁহারা দুর্গোৎসবোপলক্ষে হিন্দুগৃহে যে সকল নাচ তামাসা দর্শন করিতেন, তাহার বর্ণনায় বিলাতের বন্ধুজনকে বিস্মিত করিতেন। এই সকল মজলিসে যে সকল বাইজী নৃত্যগীতে কলাবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিত, তাহারা অধিকাংশই মুসলমান রমণী। এক বার মহরম ও দুর্গোৎসব একই সময়ে সমুপস্থিত হওয়ায়, সে বৎসর মুসলমান বাইজীগণ হিন্দুগৃহে প্রতিমার সম্মুখে মহরমের পুণ্যতিথিতে নৃত্যগীত করিতে অসম্মত হয়; অনেক অর্থপ্রলোভনেও তাহারা স্বধর্ম্মের শাসন লঙ্ঘন করিতে সম্মত হয় নাই। সেবার দুর্গোৎসবে নৃত্যগীত তেমন জমাট বাঁধে নাই। ইংরাজেরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ;—মাতা ও পুত্র।

ইংরাজদিগের বিশ্বাস, মাতার ধর্ম্মজীবনের আদর্শে চরিত্রগঠন করিতে গিয়া রামকৃষ্ণ বিষয়বুদ্ধিহীন জড়ভরতে পরিণত হইয়াছিলেন; এবং তজ্জন্যই তাঁহার রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়াছিল! এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, তাঁহারা আর ঐতিহাসিকতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

রাণী ভবানীর ধর্ম্মজীবন ও রামকৃষ্ণের ধর্ম্মজীবন এক শ্রেণীর হইলেও, একরূপ ছিল না। মাতা আড়ম্বরহীন কর্ত্তব্যপালনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি একদিনের জন্যও রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন

না। পুত্র ধ্যান ধারণা পুরশ্চরণাদি আত্মোন্নতির শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সময়ে সময়ে সংসারে থাকিয়াও শ্মশানবাসী সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্ব্বকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।

মাতার জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনি যেন পরের জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—পরের জন্য ভাবিতে, পরের জন্য খাটিতে, পরের জন্য প্রাণপণ করিতেই তাঁহার পুণ্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। পুত্রের জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যেন আত্মোন্নতি ও মুক্তিলাভের জন্যই নিরন্তর লালায়িত।

মাতা পুত্রের উভয়ের জীবনেই ধর্ম্মের জন্য ঐকান্তিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত, তথাপি উভয়ের ধর্ম্মজীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু পার্থক্য থাকিলেও, উভয়ের জীবনেই রাজ্যরক্ষার্থ প্রজাহিতৈষণার অভাব ছিল না।

রামকৃষ্ণ যোগী, বিষয়বিরাগী, আত্মত্যাগী; হিন্দু সমাজের পূজনীয় মহাপুরুষ। রাণী ভবানী রাজান্তঃপুরবাসিনী, অতুলৈশ্বর্য্যশালিনী রাণী, অথচ নিয়ত পরহিতব্রতধারিণী, কল্যাণরূপিণী, দীনজননী মহাদেবী;—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই তাঁহার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

রাণী ভবানী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল; রামকৃষ্ণ যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষে এক অশ্রুতপূর্ব্ব নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে যুগের প্রবলাবর্ত্তে পড়িয়া ভারতবর্ষের লোকের বহুযুগার্জ্জিত শাসনপ্রতিভা ভাসিয়া গিয়াছিল। রামকৃষ্ণ বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী না হইয়া সংসারকীট হইলেও, রাজ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন না।

তথাপি রামকৃষ্ণ বীরের ন্যায় প্রতিকূল ঘটনাবলীর সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজ্যরক্ষার জন্য, প্রজারক্ষার জন্য, নাটোর রাজবংশের গৌরবরক্ষার জন্য, তিনি নবাগত ইংরাজ রাজের সঙ্গে যত কলহ বিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে জড়ভরত বলিয়া পরিচিত করা যায় না। বরং মনে হয়, রাজ্যরক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, রামকৃষ্ণ নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া পারলৌকিক সদ্গতিকামনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা রক্ষক, রামকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিকে তাঁহার অন্নে আজন্মপ্রতিপালিত ভৃত্যবর্গ, অপর দিকে তাঁহার

আশা ভরসা ও আশ্রয়ের আধার কোম্পানীর ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী,—দুই দিক হইতে এই দুই প্রবল শক্তি প্রচণ্ডবিক্রমে মুষলাঘাত করিয়া রামকৃষ্ণের রাজশ্রীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহারাজ রামজীবন ও মহারাণী ভবানীর সময়ে নাটোর রাজবংশের রাজ্যোন্নতি, তাহার ইতিহাসের সহিত মুসলমান নবাব ও নাটোর রাজমন্ত্রী দয়ারাম রায়ের নাম চিরসংযুক্ত; মহারাজ রামকৃষ্ণের সময়ে রাজ্যনাশ,—তাহার ইতিহাসের সঙ্গে কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও নাটোর রাজমন্ত্রী কালীশঙ্করের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

কালীশঙ্কর দত্ত যশোহর প্রদেশের এক জন দরিদ্র কায়স্থসন্তান, প্রতিভাবলে নাটোরের রাজমন্ত্রী হইয়া উত্তরকালে নড়াল জমীদারবংশের ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজের ইতিহাসে কালীশঙ্কর দস্যু-নামেই পরিচিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ জুন কালীশঙ্কর ও তাঁহার ভ্রাতা নন্দ দত্ত একখানি নৌকা লুঠ করিয়া নাবিকগণকে আহত করেন। যশোহরের কালেক্টার হেঙ্কেল সাহেব কালীশঙ্করকে ধরিয়া আনিবার জন্য কুতবুল্লা পদাতিকের অধীনে এক দল সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন। কালীশঙ্কর ১৫০০ লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে হেঙ্কেলের সিপাহীদলকে পরাজিত করেন। ইংরাজ পক্ষে দুই জন ধৃত ও ১৫ জন আহত হয়। কালক্রমে নন্দ দত্ত ধৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু নাটোর রাজবংশের মন্ত্রিপদে আসীন থাকায়, কালীশঙ্করকে কেহ সহজে ধরিতে পারিল না। কিছু কাল পরে কালীশঙ্কর ধরা পড়িয়াও ধনবলে সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হেঙ্কেল, রামকৃষ্ণ বা কালীশঙ্কর কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি লিখিলেন,—"নাটোরের মহারাজ ভূষণা থানার শাসনকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন; দস্যুদল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসামী ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে!" এই হেঙ্কেল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর হইতে রাজসাহীর জজ ও কালেক্টার হইয়া নাটোরে শুভাগমন করায়, সেই সময় হইতেই রামকৃষ্ণের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে বৎসর বৎসর নূতন কর ধার্য্য হইত বলিয়া, রাজা প্রজা কাহারও মঙ্গল হইত না। ক্ষুদ্র সম্পত্তির অধিকারিগণ অল্পদিনেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারাও পতনোন্মুখ হইয়াছিলেন। জনৈক ইংরাজ লেখক বলেন, "এই সময়ে কোম্পানী বাহাদুর যথাসাধ্য

শোষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জমীদারদলকে প্রজাপালন বা উন্নতিসাধনের জন্য কিছুমাত্র উৎসাহদান করিতেন না।" * ইহাতে প্রাচীন জমীদারবংশ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইতে লাগিল। দোষ কাহার? তৎসম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ লেখক স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজের দোষেই এই সকল সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল। †

এইরূপ অদৃষ্টবিড়ম্বনায় নিপতিত হইয়াও রামকৃষ্ণ যেরূপ ভাবে রাজ্য ও রাজসম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে, তাঁহার অলীক কলঙ্কে আস্থাস্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা ক্রমশঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়া, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

রোগ-শয্যায়।

১

প্রথম ফাল্গুনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত। বসন্তাগমে নবকিশলয়দলশোভিত তরুরাজির মধ্য দিয়া নদীর তরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণ সোহাগস্পর্শের মত বহিয়া যাইতেছে। খিদিরপুরের পোতাশ্রয়ে একখানা ইংলণ্ডযাত্রী ষ্টীমারে বিদায় লইবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে।

যাঁহারা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। জাহাজ হইতে বাষ্পোদ্গীরণের গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল। অদূরে যে ফিরিঙ্গী বালকটি কূলে বসিয়া মৎস্য ধরিতেছিল, সে তখন কেবল ছিপে টান দিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য একবার জাহাজের দিকে

* Government had, it must be acknowledged, given the Zamindors little encouragement to rely on its generosity; it had acted far too much in the character of landlord determined to get the utmost out of his lands.

† But the truth is that the English added to the native system precisely those elements which producted all the evils; namely, watchfulness to seize any opportunity for new demands and power to enforce the demands they made.

চাহিয়া বালক সদ্যোধৃত মৎস্যটিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তীরে একখানি গাড়ীতে কয়টি বঙ্গরমণী ছিলেন ;—তাঁহাদিগের নয়ন হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। মাতা, কন্যা, শ্বশ্রূ, পুত্রবধূ পরস্পরের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুরুষ অভিভাবকগণ আসিয়া অন্য এক-খানি গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাদের গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে এ গাড়ীখানিও গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

জাহাজের ডেকে দুইটি বাঙ্গালী যুবক দাঁড়াইয়া ছিল। এক জন গম্ভীর, তাহার স্বভবতঃ গম্ভীর মুখ আজ দুশ্চিন্তার ছায়াপাতে গম্ভীরতর হইয়াছে; দ্বিতীয় জন হাস্যপ্রফুল্লমুখ, চপল।

জাহাজ কূল ছাড়াইতে না ছাড়াইতে দ্বিতীয় যুবক প্রথম যুকের পৃষ্ঠে একটি অনতিতীব্র চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে! চল, কামরায় যাই।"

দ্বিতীয় যুবক কোনও উত্তর দিল না। তাহার দৃষ্টি সেই গৃহাভিমুখগামী শকটে নিবদ্ধ ছিল। তাহার সমস্ত হৃদয় যেন তাহার দৃষ্টিতে আসিয়া সেই শকটখানির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

প্রথম যুবক বলিল, "ইহার মধ্যেই এত ভাবনা। তুমি কেমন করিয়া তিন বৎসর বিদেশে থাকিবে! আমিও ত বিদেশে যাইতেছি। কই আমার ত কোনরূপ কষ্ট হইতেছে না!"

দ্বিতীয় যুবক গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমার অবস্থায় আর আমার অবস্থায় অনেক প্রভেদ।"

"তুমি যে স্ত্রীলোকের অধিক করিলে! যদি এখনই এত ভাবনা হয়, তবে তোমার পক্ষে ইংলণ্ডে না যাওয়াই উচিত ছিল। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' এখন আর ভাবিয়া কি হইবে!"

জাহাজ ততক্ষণে পোতাশ্রয় হইতে বাহির হইতেছিল। পোতাশ্রয়ের ফটক পার হইয়া সেই শকটখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয় যুবক বলিল, "আমি যে কিছু না ভাবিয়াই বিদেশে যাইতেছি, এমন কথা তোমাকে কে বলিল! পূর্ব্বে আমার ভাবা উচিত ছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এখন আমাকে ভাবিবার একটু অবসর না দেওয়াই কি তোমার একান্ত উচিত!"

এই উত্তরে বিরক্ত ও অপমানিত হইয়া, শ্যালক ললিতমোহন কামরায়

চলিয়া গেল। ভগিনীপতি সুকুমার সেই ডেকের উপর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

প্রিয়ভূমি কলিকাতার শেষ সীমারেখা যতই অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল, সুকুমারের হৃদয়ে পত্নী লাবণ্যময়ীর ও শিশুপুত্র বিনয়ের স্মৃতি ততই অধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। একটা অব্যক্ত যাতনা তাহার সমস্ত হৃদয় বেদনাচঞ্চল করিয়া তুলিল। যুবক কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিল।

শ্যালক ও ভগিনীপতি ব্যারিষ্টার হইবার আশায় একত্র দেশ ছাড়িয়া সুদূর ইংলণ্ডে যাইতেছিল। শ্যালক ললিতমোহন অবিবাহিত। ভগিনীপতি সুকুমার, পত্নী ও একবৎসরবয়স্ক পুত্র রাখিয়া বিদেশে যাইতেছিল।

সেই ডেকের উপর বসিয়া সুকুমার নানা কথা ভাবিতে লাগিল। তখন তাহার শ্যালক ললিতমোহন স্মোকিং-কামরায় একটা চুরুট ধরাইয়া সুকুমারের রূঢ় ব্যবহারে আহত আত্মসম্মানহানিজনিত মনোবেদনার লাঘব করিতেছিল।

ক্রমে কলিকাতার শেষ সীমারেখাও অদৃশ্য হইয়া গেল। শ্যামশোভাময় তটযুগশালিনী ভাগিরথীর বক্ষে জাহাজ ধূমোদ্গার করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

২

ইংলণ্ডে যাইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতা, নূতন সমাজ ও নূতন সঙ্গীর মধ্যে যুবক দুই জনের দিনগুলা যেন অনুকূল পবনে পালের নৌকার মত বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই সুদূর প্রবাসে ললিতমোহন যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সুকুমার বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনস্রোত হইতে ফিরাইতে পারে নাই। সুকুমার তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইত ; কিন্তু দূরগৃহে তাহার পিতামাতাকে উৎকণ্ঠিত করা উচিত মনে করিত না,—তাই তাঁহাদের এ কথা কিছু লিখিত না।

এক এক দিন সুকুমার অধিক তিরস্কার করিলে ললিতমোহন বলিত, "তোমাতে আর আমাতে অনেক প্রভেদ। তোমার স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তোমাদের সকল কাজ ভাবিয়া করা আবশ্যক। আমার সে সব কিছু নাই। আমার পক্ষে একটু আনন্দ-উপভোগের চেষ্টা আদৌ অন্যায় নহে।"

সুকুমার বলিত, "স্ত্রী পুত্রের প্রতি তোমার কোনও কর্ত্তব্য নাই সত্য ; কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও কি তোমার কোনও কর্ত্তব্য নাই!"

ললিতমোহন হাসিয়া বলিত, "সব জিনিসেরই দুইটা দিক আছে, জীবনেরও দুইটা দিক আছে। গম্ভীর দিকটা তোমার মত দার্শনিক পেচকের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্তচিত্তে অপর দিকটা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

চুরুট ধরাইয়া ললিতমোহন বেড়াইতে বাহির হইত। ব্যথিতহৃদয় সুকুমার আপনার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিত।

এক এক দিন ললিতমোহন সুকুমারকে দলে টানিতে চেষ্টা করিত। অকৃতকার্য্য হইয়া সে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "বিবাহিত লোক যেন জিয়ল মাছ; সে একবার বঁড়শী গিলাইতে পারে, তাহার হাত হইতে আর উদ্ধার পায় না; কিন্তু আর কেহ ধরিতে গেলেই সরিয়া যায়—এমনই পিচ্ছিল; জান ত—'বেঁধেছি লম্বা দড়ায়, ঘুরে ফিরে সেই খুঁটার গোড়ায়।' তোমাদের বন্ধনরজ্জু যতই দীর্ঘ হউক না কেন, খুঁটাটি ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।"

সুকুমার বলিত, "তোমার মত লোক দেখিয়াই ত সেক্‌স্‌পীয়ার লিখিয়াছেন,—

'ত্যজিও না দীর্ঘশ্বাস রমণীরা আর,
চিরদিন প্রবঞ্চক পুরুষনিচয়,
একপদ জলে, স্থলে অন্যপদ তার,
একে কভু স্থির নহে পুরুষ-হৃদয়।'

মধুকর-বৃত্তিটা ভাল নহে।"

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল; তৃতীয় বৎসরও শেষ হইয়া আসিল। শেষ পরীক্ষার সময় সুকুমার পীড়িত হইয়া পড়িল। ললিতমোহন পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইল।

যেদিন ললিতমোহন দেশে যাইবার জন্য যাত্রা করিল, সেদিন সুকুমার তাহার শূন্য কক্ষে একাকী বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। অদৃষ্টের কি দারুণ উপহাস! সে-ই দেশে ফিরিবার জন্য অধিক ব্যগ্র হইয়াছিল; আর আজ তাহাকেই বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইল! এখানে তাহার পাড়ার সময় শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই, শোকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই, মৃত্যুশয্যায় তৃষ্ণার্ত্ত হইলে মুখে একবিন্দু জল দিবার কেহ নাই। এতদিনে বিনয় কত বড় হইয়াছে, লাবণ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তাহাদের যেমন রাখিয়া আসিয়াছিল, যাইয়া আর তেমন দেখিতে পাইবে না। বিদায়কালে লাবণ্য-

ময়ীর অশ্রুবিপ্লুত মুখখানি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমার না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

৩

জাহাজে অন্য কোনও কাজ ছিল না; কাজেই ললিতমোহন সময় সময় আপনার কথা ভাবিত। একটু চিন্তা করিয়াই ললিতমোহন বুঝিল যে, বিদেশে সে যে টাকাটা অপব্যয় করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া তাহাকে তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। সে আরও বুঝিল যে, দেশে ফিরিয়া অদৃষ্ট-লক্ষ্মী যত দিন সুপ্রসন্ন না হয়েন, তত দিনও পৈত্রিক অর্থ ধ্বংস করিতে হইবে; সুতরাং পিতার প্রিয় হওয়াটা নিতান্তই আবশ্যক। বোম্বাই বন্দরে আসিয়াই সে "বেটী" "নেলি" প্রভৃতির প্রেমপত্রগুলা সাগরসলিলে নিক্ষেপ করিল; তাহার পর বোম্বাই পৌঁছিয়া হ্যাট কোট ছাড়িয়া ধুতি পরিল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া যখন সে পিতা মাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইল, তখন সকলেই বলিল যে, বিলাতফেরত ছেলের এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। জনকজননীর নিকট ললিতমোহন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

পিতা সুকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ললিতমোহন কৃত্রিম ব্যথিতভাবে বলিল, "তাহার কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। কুসঙ্গীর দলে পড়িয়া সে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সৎপথে আনিতে পারি নাই। আমার যে এত অধিক ব্যয় হইত, সে কেবল তাহারই জন্য। সে একটা বিপদে পড়িলে তখন আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিতাম না; যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে বিপন্মুক্ত করিতে হইত।"

ভগিনী লাবণ্যময়ী সেখানেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ললিতমোহন বলিল, "লাবণ্যের অদৃষ্টে যে কি আছে, বলিতে পারি না। এত করিয়াও সুকুমারকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না। পাছে আমার সঙ্গে দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়, এই ভয়ে এবার সে পরীক্ষাও দিল না।"

এমন বিনয়ী পুত্র যে কোনও কারণে মিথ্যা কথা কহিতে পারে, পিতা মাতার মনে এ বিশ্বাস ছিল না। কাজেই তাঁহারা পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেন।

লাবণ্যময়ী ছল ছল নেত্রে আপনার কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। পুত্র বিনয়কুমার তখন হর্ম্ম্যতলে বসিয়া একটা কাঠের ঘোড়া লইয়া খেলা করিতে-

ছিল। ব্যথিতা জননী তাহাকে বক্ষে লইয়া আবেগভরে তাহার মুখচুম্বন করিল; তাহার পর শয্যায় পড়িয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। জননীর অভিনব ভাব দেখিয়া পুত্র খেলা ভুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া লাবণ্যময়ী উঠিয়া বাক্স খুলিয়া স্বামীর পত্রগুলা বাহির করিল। সে এক একখানা করিয়া পত্রগুলা পাঠ করিতে লাগিল, আর তাহার ভাসা চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া পত্রের উপর চোখের জল পড়িতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, এ সব কি মিথ্যা কথা? ভালবাসা না থাকিলে কি কেহ এমন করিয়া লিখিতে পারে? সে আবার ভাবিল, দাদাই বা মিথ্যা কথা কহিবেন কেন?

লাবণ্যময়ী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে এত দিন যাহাকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে, আজ সহসা তাহাকে বেদীচ্যুত করিতে পারিল না। কেবল আত্মঘৃণায়, অভিমানে, বেদনায়, সেই কোমল হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সুকুমার স্থির করিয়াছিল, এবার পীড়া হইলেও পরীক্ষা দিতে হইবে। সে পরীক্ষার পাঠ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত ছিল। সময় সময় সে বাটীতে নিয়মমত পত্র লিখিবারও অবকাশ পাইত না। সুকুমারের পত্র আসিতে এই বিলম্বে লাবণ্যময়ীর হৃদয়ে সন্দেহাগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বেদনায় অভিমানে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। যেখানে আত্মসমর্পণ যত সম্পূর্ণ, সেখানে সামান্য কারণে বেদনাও তত অধিক; সেখানে সামান্য কারণে অভিমানও তত অধিক।

৪

পর বৎসর যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়া, পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, সুকুমার দেশে ফিরিল। কিন্তু সে গৃহে ফিরিলে যে আনন্দোৎসব দেখিতে পাইবে আশা করিয়াছিল, আসিয়া তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। ললিতমোহনের কথা শুনিয়া তাহার পিতা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাহার জন্য তিনি যেন অন্য পুত্রদিগের নিকট অপরাধী ছিলেন। তাহার জন্য অধিক অর্থব্যয় হয় বলিয়া, সুকুমারের ভ্রাতারা পূর্ব্ব হইতেই অসন্তোষ প্রকাশ করিত। ললিতমোহনের নিকট তাহার কথা শুনিবার পর হইতে, তাহাদের অসন্তোষগুঞ্জন ক্রমে কর্ণবধিরকর উচ্চনিনাদে পরিণত হইয়াছিল।

সুকুমার পিতার নিকট বা ভ্রাতাদিগের নিকট প্রত্যাশিত আদর পাইল না। তখন সে মনে করিল, আর যে যাহাই করুক, তাহাকে পাইয়া লাবণ্যময়ীর আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু হায়, মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না। সাক্ষাতের সময় লাবণ্যময়ী কুশলজিজ্ঞাসার উত্তরে কুশলজিজ্ঞাসা ভিন্ন অন্য কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুকুমার বড় আশায় হতাশ হইল। কি অভিমানে যে তাহার প্রেমময়ী পত্নী তাহার সহিত এই দীর্ঘ চারি বৎসরের সুখদুঃখের কথা কহিবার প্রলোভন সংবরণ করিল, কি দুঃখে যে সে তাহাকে প্রেমসম্ভাষণ করিবার ও তাহার প্রেমসম্ভাষণ পাইবার প্রবল বাসনা মনেই রুদ্ধ করিল, কি বেদনায় যে সে স্পর্শলোলুপ অধরখানিকে সংযত করিল, সুকুমার তাহা বুঝিল না। কাজেই পত্নীর ব্যবহারে সে বড় ব্যথিত হইল।

ইহার পরদিবস সুকুমারের কোনও বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন, "ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা কি সুন্দর দেখিলে?" সুকুমার উত্তর করিল, "ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর—পথের শোভা—কনককেশিনী, নীলনয়না পান্থরমণী, আর গৃহের শোভা—বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা গৃহিণী।"

লাবণ্যময়ী পার্শ্বের কক্ষেই ছিল। সুকুমারের কথা শুনিয়া তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না। সে মনে মনে ভাবিল, "যাহারা ইংরাজ-রমণীর মত হয় না, তাহারা জন্মে কেন?"

কয় দিন সুকুমার পত্নীর সহিত নানা কথা পাড়িল, কিন্তু লাবণ্যময়ীর অটলগাম্ভীর্য্য কিছুতেই দূর হইল না। সুকুমার লাবণ্যময়ীর এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। লাবণ্যময়ী কারণ বলিতে পারিল না, বলিবে মনে করিতেই, দুঃখে অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুকুমার ভাবিল, তাহার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মত তাহার পত্নীও তাহাকে উপেক্ষা করিতেছে। অথচ সে উপেক্ষিত হইবার কোনও উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। সুকুমারের হৃদয়বেদনা ক্রোধে পরিণত হইল।

শেষে এক দিন সুকুমার পত্নীকে বলিল, "আমি আসিয়া অবধি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আমার সহিত একত্রবাস তোমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আমি তোমার নিকট এরূপ ব্যবহার কখনও প্রত্যাশা করি নাই। আমার উপর যদি তোমার ভালবাসা না থাকে, তবে আমার

সহিত একত্রবাস যন্ত্রণাকর বটে। যদি তাহাই হয়, তবে তুমি বাপের বাড়ীতে গিয়া থাক, আমিও অন্যত্র যাই। তোমার যখন যে ব্যয়ের আবশ্যক হইবে, আমাকে জানাইও, আমি পাঠাইয়া দিব।"

শুনিয়া লাবণ্যময়ী ভাবিল, "তুমি দোষ করিলে, তুমিই আবার আমাকে তিরস্কার করিবে? আমি কি এমনই হেয়!" উচ্ছ্বসিত অভিমানে সে বলিল, "তবে তাহাই হউক।"

পত্নীর কথা শুনিয়া সুকুমারের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। কি বেদনায়, কি যাতনায়, তাহার পত্নী এই কথা বলিল, ঘটনাচক্রের কি আবর্ত্তনে তাহার মুখ দিয়া এমন কঠোর কথা বাহির হইল, সুকুমার তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইল না।

পরদিবস একটা গৃহের দুইটা ঘর ভাড়া করিয়া, সুকুমার দ্রব্যাদি লইয়া সেখানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পুত্র বিনয়কুমার বলিল, "বাবা! আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" সুকুমার তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, তাহার পর তাহাকে নামাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী চালাইতে বলিল,—পাছে কেহ তাহার নয়নে অশ্রু দেখিতে পায়। এই অনাদর উপেক্ষার মধ্যে তাহার বালক পুত্রই কেবল তাহাকে সমস্ত আদর দিয়াছিল। কি স্বাভাবিক আকর্ষণে যে বালক পিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব; কিন্তু পিতাকে পাইয়া বালকের আনন্দের আর অবধি ছিল না। সে সমবয়স্কদিগের সহিত খেলা করিবার প্রলোভনেও পিতার নিকট হইতে যাইতে চাহিত না।

সুকুমার চলিয়া গেলে, লাবণ্যময়ী আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিল। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার দোষ কি?"

৫

সুকুমার একটি গৃহের দুইটিমাত্র কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল, তাহাতেই তাহার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সবই সম্পন্ন হইত। বাটীর অবশিষ্ট অংশ আর এক জন বিলাতফেরতের দখলে ছিল। প্রথমে দিনকতক অর্থকষ্টে সুকুমার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। সুকুমারের প্রতিজ্ঞা ছিল, সে একটা "বড়লোক" হইবে; যাহাতে বিনয় তাহার পুত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে, এমন একটা

কিছু হইবে। সে বুঝিয়াছিল, তাহার মত দরিদ্রের পক্ষে যশোলাভের প্রথম সোপান, আপনার ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ। যেই জন্য সে আপনার ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুকুমার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিল যে, বিনয় সপ্তাহে এক দিন তাহার নিকট যাইবে। রবিবারে বিনয় পিতার নিকটে যাইত। সে দিন সকাল হইতে দ্রব্যাদি গুছান, সাজান প্রভৃতি কার্য্যে সুকুমারের আর অবসর থাকিত না; যেন কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার গৃহ দেখিতে আসিবেন।

বিনয় আসিলে সুকুমারের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। অন্য স্বজনগণের প্রতি তাহার স্নেহ ভালবাসা যতই বিদূরিত হইতেছিল, এই বালকের প্রতি তাহার স্নেহ ততই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। এই বালকই তাহার সমগ্র স্নেহরাশি অধিকার করিয়া বসিতেছিল।

৬

সুকুমারকে অধিক দিন দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিতে হইল না। তাহার এক পিতৃব্য পশ্চিমপ্রদেশে ওকালতি করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও সন্তান ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের মধ্যে সুকুমারেরই জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা প্রবল দেখিয়া, তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সুকুমারকে দান করিয়া গেলেন। দারিদ্র্যদুঃখ হইতে সুকুমার সহসা ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যে উপনীত হইল।

সুকুমার দেখিল, উদরান্নের জন্য তাহাকে আর পরিশ্রম করিতে হইবে না। সে মনে করিল, একটা কোন মহদনুষ্ঠানের জন্যই সে ব্যবসায়ের দাসত্বদশা হইতে মুক্তি পাইল।

সুকুমার উপবনবেষ্টিত একখানি রম্যগৃহ ও রাশি রাশি পুস্তক ক্রয় করিল। কিন্তু আপনার নূতন গৃহে গিয়া সুকুমার দেখিল, সংসারের জ্বালা অনেক প্রকার; সংসারের বাজার-খরচের হিসাব-পরীক্ষা হইতে বাগানের মালীর কার্য্যের তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত এমন অনেকগুলা খুঁটিনাটি কাজ আছে, যাহা করিতে বিরক্তি জন্মে, কিন্তু না করিলেও চলে না। এই সকল কার্য্যের জন্য সে তাহার এক পিতৃস্বসৃপুত্রকে আপনার নিকটে আনিয়া রাখিল। তিনিই সংসারের সকল কার্য্য দেখিতেন, সুকুমার আপনার অধ্যয়ন ও চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। অল্পদিনের মধ্যে সুকুমার গৃহস্বামী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে পিতৃস্বসৃপুত্র বিজয়চন্দ্রের অধীন হইয়া পড়িল, আর বিজয়চন্দ্র

কর্ম্মচারী হইয়াও গৃহকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইল। সুকুমারের সকল কার্য্যেই বিজয়চন্দ্র হুকুম চালাইত, এবং সুকুমারও নির্ব্বিবাদে তাহার হুকুম পালন করিত। বিজয়চন্দ্র তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে অধ্যয়ন ও চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত থাকিবার অবসর দিয়াছে, সুকুমার তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত।

যে দিন বিনয় তাহার গৃহে আসিত, সেই দিন কেবল সুকুমার আপনার বিষাদময় গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিত। সে দিন যেন তাহার হৃদয়ে নব উৎসাহ জ্বলিয়া উঠিত। সে দিন বালকের সহিত মিশিয়া সে আবার যেন বালক হইত। পিতাপুত্রে কত কথা, কত খেলা হইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিনয় জননীর কাছে ফিরিয়া যাইত। শূন্যগৃহের বিজনতা তখন সুকুমারের নিকট যেন দ্বিগুণ কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হইত। সুসজ্জিত গৃহের নানা দ্রব্যের মধ্যে বিনয় যে দিন যাহা চাহিত, সুকুমার তখনই তাহাকে তাহা দিত। এক দিন সুকুমার পুত্রকে গৃহের ছাতে লইয়া গেল। সেখান হইতে কলিকাতার শতসৌধছাদ দেখিয়া বিনয়কুমার কেবল "ওবাড়ীটা কাহার, ওটা কোন গির্জ্জা, ও গম্বুজটা কোন্ বাড়ীর" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল। অদূরে একটা গৃহের ছাদে একঝাঁক গৃহপারাবত দেখিয়া বিনয় বলিল, "আমাকে গোটাকতক পায়রা কিনিয়া দিবে?" সুকুমার বলিল, "কাল আসিয়া দেখিবে, আমি তোমার জন্য পায়রা কিনিয়া রাখিয়াছি। সকাল করিয়া আসিয়া পায়রা লইয়া খেলা করিবে।"

পর দিন সুকুমার আপনি যাইয়া বাছিয়া কতকগুলি সুন্দর পারাবত কিনিয়া আনিল। বিনয়ের জিনিস আর কাহাকেও দিয়া কিনিয়া আনাইলে তাহার তৃপ্তি হইত না।

রবিবারে বিনয়কুমার আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আমার পায়রা আনিয়াছ?" সুকুমার বলিল, "আনিয়াছি; দেখিবে চল।" পিতাপুত্রে গৃহপ্রাঙ্গনের এক প্রান্তে অবস্থিত পারাবতগৃহের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। নানা প্রকারের পারাবত দেখিয়া বিনয়ের বড় অনন্দ হইল। সে আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করের করতালিশব্দে পারাবতগুলি চমকিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বিনয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

পারাবতগৃহ হইতে ফিরিবার সময় বিনয় দেখিল, গৃহের সম্মুখে রাজপথে একটি ইংরেজ বালক অশ্ব ছুটাইয়া যাইতেছে। দেখিয়া বিনয় পিতাকে বলিল, "আমার অমনি করিয়া ঘোড়ায় চড়িতে ইচ্ছা করে।" সুকুমার বলিল,

"আমি তোমার জন্য একটা সুন্দর ঘোড়া কিনিয়া আনিব। তুমি এবার আসিয়া সেটায় চড়িবে।" বিনয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখে সেই হাসিটুকু দেখিবার জন্য সুকুমার আপনার সর্ব্বস্ব দিতে পারিত।

পরদিবস সুকুমার পুত্রের জন্য একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া আনিল। কিন্তু সেই দিনই তাহার জ্বর হইল। দুই দিন পরে নিউমোনিয়া প্রকাশ পাইল। নিউমোনিয়া-গ্রস্ত রোগীর নিকট অল্পবয়স্কদিগের আসা উচিত নহে জানিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্তে শুক্রবারে সে বিজয়চন্দ্রকে বলিল, "আজ একবার আমার শ্বশুরবাড়ীতে বলিয়া আসিও যে, রবিবারে বিনয় যেন এখানে না আইসে। আমি পীড়িত।"

৭

বিনয়চন্দ্র যখন সুকুমারের শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল, তখন বিনয়কুমার গৃহপ্রাঙ্গনে আর কয়টি বালকবালিকার সহিত খেলা করিতেছিল। বিজয়চন্দ্রকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ঘোড়া আনা হইয়াছে?" বিজয় বলিল, "হইয়াছে; কিন্তু তুমি এবার আমাদের বাড়ী যাইতে পাইবে না।" আগ্রহভরে বালক বলিল, "কেন?" বিজয় বলিল, "সুকুমারের অসুখ হইয়াছে।" বালকের মুখ গম্ভীর হইল; সে বলিল, "আমি বাবাকে দেখিতে যাইব।"

সুকুমারের শ্বশুর যে কক্ষে বসিয়া কাজ করিতেন, বিজয় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বিনয় সঙ্গে সঙ্গে গেল। বিজয়চন্দ্র সুকুমারের শ্বশুরকে সকল কথা বলিল। বিদায়কালে তিনি বলিলেন, "কাল যেন একটা সংবাদ পাই।" বিজয়চন্দ্র বিদায় লইল। বালক কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না; সে তাহার সহিত যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। শেষে বিজয়চন্দ্র বলিল, "আজ তোমার যাইবার দিন নহে। আমি ত আবার কাল আসিব; তখন যাহা হয় হইবে।"

বালক বিজয়কে ছাড়িয়া দিল। সে দিন আর খেলা করিতে গেল না।

পর দিন প্রভাতে সুকুমারের শ্বশুরালয়ে সংবাদ দিতে আসিয়া বিজয় দেখিল, বিনয় তাহার অপেক্ষায় গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।—বালকের মুখ গম্ভীর, বিষণ্ণ। বিজয়কে দেখিয়া সে ছুটিয়া রাস্তায় গেল,—জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেমন আছেন?" কোন উত্তর না দিয়া বিজয় সুকুমারের শ্বশুরের নিকট গেল। বিনয়ও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

সুকুমারের শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলে বিজয়চন্দ্র বলিল, "ডাক্তার বলিতেছেন—রোগীর অবস্থা Worse."

পার্শ্বের কক্ষে বিনয়ের এক মাতুল একটা অঙ্ক লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; বালক তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "worse মানে কি?" তিনি বলিলেন, "খারাপ।"

বালক অসিয়া বিজয়চন্দ্রকে ধরিল—সে সুকুমারকে দেখিতে যাইবে। কেহ তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে পারিল না। বালক কাঁদিতে লাগিল।

ছাড়াইবার অন্য উপায় না দেখিয়া বিজয় বলিল, "তোমার মাকে বলিয়া আইস।" সে ভাবিল—জননী পুত্রকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন।

বিনয় ছুটিয়া অন্তঃপুরে জননীর নিকট গেল। সে লাবণ্যময়ীকে বলিল, "মা, আমি বাবাকে দেখিতে যাইব।" লাবণ্যময়ী বলিল, "আজ তোমার সেখানে যাইতে নাই।"

বালক জননীর নিকট হইতে সরিয়া গেল। অভিমানে ও বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইল। সে বলিল, "আমি আর কখনও তোমার কাছে আসিব না, কখনও তোমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিব না। তুমি আমাকে যত ভালবাস, আমি বাবাকে তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। বাবার মরিবার সময় তুমি আমাকে একবার তাঁহাকে দেখিতে দিবে না; তবে হয় ত আমি মরিবার সময় তুমি আমাকে একবার দেখিতেও আসিবে না।"

একদিন জলধরধারাপাতে যেমন পর্ব্বত-অঙ্গে সুপ্ত নির্ঝরের বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি পুত্রের এই কথায় লাবণ্যময়ীর রুদ্ধ-বেদনারাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল,—তাঁহাকে দেখিবার জন্য এই বালকের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে; আর আমি রাক্ষসী তাঁহার পীড়ার কথা শুনিয়াও অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না!" লাবণ্যময়ী আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সেই অশ্রুজলে স্বামীর উপর তাহার সমস্ত অভিমান, সমস্ত ক্রোধ বিধৌত হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে লাবণ্যময়ী পুত্রকে বলিল, "চল, আমিও যাইব।"

বিনয়কুমার ছুটিয়া বহির্বাটীতে গেল। বিজয় তখন কেবল রাজপথ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিনয়কুমার তাহাকে ধরিল, বলিল, "চল; মাও যাইবে।" বিজয় ফিরিয়া আসিল।

সুকুমারের শ্বশুর জানিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিলেন, "লাবণ্যও যাইতে চাহিতেছে।"

লাবণ্যময়ী ও বিনয়কুমার সুকুমারকে দেখিতে যাইলে অপ্রত্যাশিত আনন্দে রোগীর পাছে অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কা করিয়া, বিজয়চন্দ্র সে বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে গেল। বিনয় তাহার সঙ্গে গেল;—পাছে বিজয় পলাইয়া যায়।

সকল কথা শুনিয়া চিকিৎসক বিজয়কে বলিলেন, "অপ্রত্যাশিত দুঃখাতিশয্যে যেরূপ অপকার হয়, অপ্রত্যাশিত আনন্দাতিশয্যে সেরূপ অপকার হয় না; বরং তাহাতে সময় সময় উপকার হইয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি কথাপ্রসঙ্গে রোগীকে পূর্ব্বে সকল কথা জানাইয়া তবে তাঁহাকে স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন। কারণ 'সাবধানের বিনাশ নাই।' তাহা হইলে আশঙ্কার আর কোনও কারণ থাকিবে না।"

বিজয়চন্দ্র সুকুমারের শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় বর্ষাধিকাল পরে লাবণ্যময়ী স্বামিসন্দর্শনে চলিল।

৮

লাবণ্যময়ী ও বিনয়কুমারকে কক্ষান্তরে রাখিয়া, বিজয় ভ্রাতার কাছে আসিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়াই সুকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা শুনিয়া বিনয় কি বলিল?"

বিজয় বলিল, "সে তোমার কাছে আসিবার জন্য ব্যাগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল,—কাঁদিতে লাগিল।"

সুকুমারের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে বলিল, "ডাক্তার কি বলিয়াছেন যে, একবার আমার কাছে আসিলেই তাহার অনিষ্ট হইবে? আমি কি মরিবার সময়ও একবার তাহাকে দেখিতে পাইব না? সে ভিন্ন জগতে আর কেহ আমাকে ভালবাসে না। সে ভিন্ন জগতে আমার আর কে আছে? তাহাকে দূরে রাখিয়া দেখাইও,—আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে একবার তাহাকে দেখাইও।"

বিজয় বলিল, "তুমি মরিবার কথা বলিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুকুমার বলিতে লাগিল, "আমার হাতবাক্সে আমার উইল আছে। আমার সর্ব্বস্ব আমি বিনয়কে দিয়াছি, যাহাতে

তাহার বিদ্যাশিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত হয়, তাহা করিও। আর সে বড় হইয়া যেন আমার এই গৃহে আসিয়া বাস করে। এই শূন্য গৃহে আমি আমার বেদনাক্লিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছি। বিনয় আসিয়া আমার এই গৃহে বাস করিবে, এই শূন্য গৃহে তাহার পুত্রকন্যার কলহাস্য মুখরিত হইবে, ইহাই আমার জীবনের একটা সুখের স্বপ্ন ছিল। জীবনে অনেক সুখের স্বপ্ন রচনা করিয়াছিলাম, একটিও সফল হয় নাই; বোধ করি, এ সুখস্বপ্নও সফল দেখিতে পাইব না।"

বিজয় আবার বলিল, "কেন মরিবার কথা বলিতেছ?"

সুকুমার কোনও উত্তর দিল না।

বিজয় বলিল, "সুকুমার! তোমার স্ত্রী যদি একবার তোমাকে দেখিতে চাহেন, আনিব কি?"

সুকুমার দুঃখের ম্লানহাসি হাসিল। সে বলিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? তিনি জীবনে আমাকে দেখিতে চাহেন নাই; আর আজ আমাকে দেখিতে আসিবেন! এক বার আসিলে হয় ত ভাল হইত। কেন যে এ মনোমালিন্য হইল, তাহা বুঝিতে পারি নাই। জীবনে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাই নাই, মরণের পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতাম। জানিতে পারিলে হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া যাইত। সে যাহাই হউক, বিনয়ের বিষয়ে যাহা বলিলাম, ভুলিও না।"

এই সময় কক্ষদ্বার হইতে কে ডাকিল, "বাবা!"

সুকুমারের ম্লান পাণ্ডুর মুখে আনন্দে রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বিনয় আসিয়াছে?"

বিজয়চন্দ্র বলিল, "তোমার স্ত্রী বিনয়কে লইয়া আসিয়াছেন।"

সুকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"তোমার স্ত্রী একবার তোমার নিকটে আসুন" বলিয়া, বিজয়চন্দ্র উঠিয়া গেল।

লাবণ্যময়ীর পিত্রালয়ের দাসীকে দিয়া তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া, বিজয় বিনয়কুমারকে তাহার ঘোড়া দেখাইতে লইয়া গেল।

৯

ধীরে ধীরে আসিয়া লাবণ্যময়ী স্বামীর শিয়রের কাছে বসিল।

সুকুমার বলিল, "আজ আমার মৃত্যুকালে তুমি যে অনাদর উপেক্ষা

ত্যাগ করিয়া একবার আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমি মরিলে বিনয়ের সকল ভার তোমার, তোমাকেই তাহার পিতামাতা উভয়ের কার্য্য করিতে হইবে।"

সুকুমার শুনিতে পাইল, কে তাহার শিয়রে বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সে বলিল, "একবার সরিয়া আসিয়া পাশে বসিবে? অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, হয় ত আর দেখিতে পাইব না।"

লাবণ্যময়ী আসিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিল। তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না, দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

সুকুমার বলিল, "কেন যে তুমি আমার সহিত এমন ব্যবহার করিলে, জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার কারণ জানিতে পারি নাই। যদি কখনও কোনও দোষ করিয়া থাকি, সে জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা করিও।"

লাবণ্যময়ী আর থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমিই অপরাধ করিয়াছি। তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে, কিন্তু আমি ত মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে ভুলিতে পারি নাই! তুমি আমার সর্ব্বস্ব—আমি কেন তোমার উপর রাগ করিয়াছিলাম? তুমি যাহাই কর, তুমি আমার স্বামী—ইহকালে পরকালে সর্ব্বস্ব। তুচ্ছ অভিমানে কেন এত দিন আসিয়া তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে পারি নাই? আমি গর্ব্বে অন্ধ হইয়া অভিমানকে প্রেমের অপেক্ষা অধিক যত্ন করিয়াছি। আজ আমি আমার ভুল বুঝিয়াছি। আমাকে ক্ষমা কর।"

লাবণ্যময়ীর কথা সুকুমারের নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল। সে বলিল, "তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কবে তোমাকে ভুলিয়াছিলাম?"

লাবণ্যময়ী বলিল, "দাদা আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিলাতে গিয়া তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে। তুমি যদি আর কাহাকেও ভালবাসিয়া থাক, তবু তুমি আমার স্বামী—আমি কেন তোমার উপর রাগ করিলাম?"

সুপ্ত সিংহ যেন সহসা জাগরিত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। লাবণ্যময়ীর কথা শুনিয়া রোগশয্যায় শয়ান সুকুমার চঞ্চল হইয়া উঠিল, উত্তেজিতস্বরে সে বলিল, "ললিত এই কথা বলিয়াছে! যাহার জন্য সেই সুদূরপ্রবাসে আমাকে লজ্জিত হইতে হইয়াছে, যে অর্থে আমার ব্যয়সঙ্কুলন হইত,—পাপের অপব্যয় হেতু তাহার দ্বিগুণ অর্থেও যাহার ব্যয়সঙ্কুলন হইত না,—যাহার অবৈধপ্রেমের

সাক্ষ্য অনেকগুলা পত্র এখনও আমার কাছে আছে, সেই আমার বিরুদ্ধে এই কথা বলিয়াছে! আপনার দোষ কাটাইবার জন্য মানুষ অপরের নামে এমন অপবাদও দিতে পারে! মানুষ এত নীচও হইতে পারে? আর দূরে থাকিলে নিতান্ত আপনার জনও মানুষকে এমন ভুল বুঝে!"

লাবণ্যময়ীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তপনোদয়ে তুচ্ছ কুজ্ঝটিকা যেমন অপসৃত হইয়া যায়, আজ এই কথায় স্বামীস্ত্রীর মনোমালিন্য তেমনই দূর হইয়া গেল। সুকুমার বুঝিল, লাবণ্যময়ীর দোষ নাই, দোষী ললিতমোহন। লাবণ্যময়ী বুঝিল, সুকুমার দোষী নহে, দোষী ললিতমোহন।

তাহার পর লাবণ্যময়ীর মুখ আবার গম্ভীর হইল।

আপনার হাতে পত্নীর হাতখানি লইয়া সুকুমার পূর্ব্বের মত করিয়া বলিল, "লাবণ্য! কি ভাবিতেছ?"

এত দিন পরে স্বামীর আদরে, স্বামীর সোহাগে, লাবণ্য এবার আনন্দের কান্না কাঁদিল। সে বলিল, "ভাবিতেছি, এত দিন তোমাকে কেন এ কথা বলি নাই? কেন এ সন্দেহ, এ অভিমান, এ বেদনা লইয়া কষ্ট পাইয়াছি?" এই বলিয়া উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে লাবণ্য আবেগময় চুম্বনে রোগশয্যাশায়ী সুকুমারের পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া দিল।

* * * * *

এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ সুকুমারের পক্ষে ঔষধের অপেক্ষা অধিক উপকারী হইল। সুকুমার শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল। এই আনন্দের সুখস্মৃতি তাহার রোগশয্যার যাতনা-স্মৃতিকেও সুখময় করিয়া রাখিল।

বকুল।

হেরি অনাদৃত তোরে এ বিজন বনে,
বকুল, আকুল প্রাণ কাঁদে রে বিরলে!
যতনে কুড়ায়ে তোরে দুলাইতে গলে
আসে না শিশুর দল, ঊষার কিরণে
ফিরে না বালিকা সব চপল চরণে
চিকণ মালিকাখানি পরিতে কুন্তলে,
ভরিয়া সুসাজিখানি সিক্ত পূতজলে
পূজারী লয় না গৃহে ইষ্টের পূজনে।
প্রবীণ বয়স মোর, শঙ্কিত হৃদয়ে
সদা করি বাস; সঁপিয়া এ কায়মন
অতি বৃদ্ধ বিজ্ঞতার বৃথা অভিনয়ে
মনের বাসনা মনে নিবারি আপন।
হায়! বাঞ্ছা জাগে তবু, সর্ব্ব-বিনিময়ে
পেতাম যদ্যপি সেই শৈশব-জীবন!

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং।



অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজপাঠকসমাজে অসাধারণ প্রশংসালাভের সৌভাগ্য রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর যেমন হইয়াছে, তেমন অতি অল্প লোকেরই হয়। তাঁহার কবিতার, ছোট গল্পের, গানের ও উপন্যাসের প্রশংসার আতিশয্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। লাহোরের একখানা সংবাদপত্রের যুবক সহকারী সম্পাদক যে অল্প দিনের মধ্যেই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এত সুখ্যাতিলাভ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ করি, কেহ কল্পনাও করেন নাই। তাঁহার এই অসাধারণ প্রশংসার কারণ আমরা ক্রমে অনুসন্ধান করিব।

লাহোরে অবস্থানকালে কিপ্‌লিং যে সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, তৎকালে মিষ্টার রবিন্‌সন্ সেই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে "ম্যাক্‌লুরস্ ম্যাগাজিন" পত্রে মিষ্টার রবিন্‌সন যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিপ্‌লিংএর প্রথম রচনার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

দশ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, লেখকের সহিত কিপ্‌লিং যখন প্রথম পরিচিত হয়েন, তখন তাঁহার মুখ বালোচিত কোমললাবণ্যপূর্ণ; কিন্তু অধিক দিন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিতে বসিতে প্রাপ্তবয়স্কগণ যেমন একটু 'কোলকুঁজো' হইয়া পড়েন, কিপ্‌লিং তখনই সেইরূপ একটু সামান্য কুব্জ ছিলেন। তিনি তখনও চশমা ব্যবহার করিতেন। তখন তাঁহার সকল কার্য্যেই বিশেষ ব্যস্ততা লক্ষিত হইত; তাঁহার সরস কথাবার্ত্তায় সকলে সন্তুষ্ট হইত।

দশ বৎসর পূর্ব্বে।

কালি ছড়ান কিপ্‌লিংএর একটা রোগ ছিল। গ্রীষ্মকালে তিনি একটা সাদা পেণ্টুলেন ও একটা পাতলা ভেষ্ট পরিয়া আফিসে কার্য্য করিতেন; দিবসের কার্য্যের পর যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, তখন তাঁহার পরিধেয় বসন বহু মসীচিহ্নে বিভূষিত হইত। কিপ্‌লিং আপনার পেন দোয়াতে অধিক দূর পর্য্যন্ত ডুবাইতেন, আবার তাঁহার সকল কাজেই ব্যস্ততা ছিল, কাজেই চারি দিকে কালি ছিটাইয়া পড়িত। কিপ্‌লিং কোনও কার্য্যের অনুরোধে সম্পাদকের কক্ষে প্রবেশ করিলেই, সম্পাদক তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিতেন; কারণ তিনি জানিতেন, কিপ্‌লিং সঙ্গে করিয়া এক কলম পূর্ণ করিয়া কালি আনিয়াছেন, তিনি কাছে আসিয়া স্বাভাবিক ব্যস্তভাবে টেবিলে কাগজ রাখিলে, বা কোনও কাজ করিলেই, কালি ছিটকাইয়া লেখকের গায়ে লাগিবে।

রচনার উপাদান সংগ্রহ করিতে কিপ্‌লিং কখনও শ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার City of Dreadful Night কল্পিত চিত্রমাত্র নহে। উক্ত রচনার উপাদান সংগ্রহ

করিবার জন্য, গ্রীষ্মকালের ক্লেশদায়ী নিশীথে কিপ্‌লিং স্বয়ং লাহোরের দুর্গন্ধপূর্ণ গলিতে গলিতে গুলির আড্ডায় ও পাপের গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার City of Two Creedsও তাঁহার কল্পিত চিত্র নহে। ভাষায় চিত্রাঙ্কনীপ্রতিভা কিপ্‌লিংএর প্রথম হইতেই ছিল; তিনি তাহার বিকাশের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন জাতি সম্বন্ধে কিপ্‌লিং সকল বিষয় অবগত আছেন। কিপ্‌লিংএর কবিতা আপনি আসিত। লাহোরের সাধারণ উদ্যানে ব্যাণ্ড বাদ্য শুনিয়া তাঁহার কবিতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। একবার একটা সুর মাথায় ঢুকিলে, সে সুরের উপযোগী কথার জন্য কিপ্‌লিংকে ভাবিতে হইত না, কথা আপনি আসিত।

রচনা।

ভারতবর্ষে ইংরাজ সমাজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনীষাসম্পন্ন মহিলার অভাব নাই। মহিলাসমাজে কিপ্‌লিং বিশেষ আদৃত ছিলেন। কাজেই তাঁহার উপর মহিলাদিগের প্রভাবও অল্প ছিল না। সিমলা শৈলে কোনও সেনাধ্যক্ষের পত্নী এখনও গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, কিপ্‌লিং তাঁহার প্রথম পুস্তকের উৎসর্গপত্রে যে লিখিয়াছেন, To the Wittiest woman in india, সে তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া। কিন্তু লোকে বলে, কিপ্‌লিং আপনার জননীকেই পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিপ্‌লিংএর আর এক জন বান্ধবী এখন মৃতা, তিনি কোনও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান উপন্যাস ও কবিতা-লেখকের পত্নী ছিলেন। কিপ্‌লিং ছাপাইবার পূর্ব্বে কোনও কোনও রচনা তাঁহাকে দেখাইতেন বলিয়া তিনি গর্ব্ব করিতেন। মহিলাচরিত্রে কিপ্‌লিংএর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এই সকল মহিলার সহিত পরিচয়ের ফল।

মহিলার প্রভাব।

কিপ্‌লিংএর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইলে, প্রবন্ধলেখক তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার ইচ্ছা করেন। তিনি Departmental Ditties পুস্তকের আটখানি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পত্রে সমালোচনার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সমালোচনা হয় নাই। বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে, কোনও বিজ্ঞাপনদাতা প্রকাশক সে গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রেরণ করেন নাই।

কবিতা-প্রকাশ।

এই প্রথম পুস্তক সম্বন্ধে কিপ্‌লিং স্বয়ং My First Book নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, লাহোরে সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় তিনি কবিতা লিখিতেন, এবং সংবাদপত্রেই প্রকাশ করিতেন। সংবাদপত্রে প্রবন্ধের অসংকুলান হইলে, তাঁহার নিকট কবিতা চাহিতে আসিয়া প্রেসের মানুষ বলিত, "এক আউর চিজ।" অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইবার পর, সেগুলি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লেখক শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও কোনও কবিতা সৈনিকদিগের এতই ভাল লাগিয়াছে যে, তাহারা সেগুলি গান করে। তিনি জানিতেন, প্রেসের লোকদিগকে কিছু দিলেই তাহারা আফিসের কার্য্যের পর তাঁহার পুস্তক ছাপিয়া দিবে; শেষে তাহাই হইল। কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা, ব্রাউন কাগজে বাঁধা, লাল ফিতা বাঁধা পুস্তক প্রকাশিত হইল। তিনি আপনি লেখক, আপনি প্রকাশক। রিপ্লাই পোষ্টকার্ডের এক দিকে পুস্তকের বিজ্ঞাপন ও অপর দিকে পুস্তক পাঠাইবার আদেশপত্র ছাপাইয়া, সেগুলি পাঠান হইল। ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, এমন কি, এডেন হইতে সিঙ্গাপুর, কোয়েটা হইতে কলম্বো, সর্ব্বত্র পত্র প্রেরিত হইল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণ বিক্রীত হইয়া গেল; দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালে এক জন প্রকাশক স্থির করা হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি কিছু পরিবর্দ্ধিতও হইল। তাহার পর প্রতি সংস্করণেই গ্রন্থখানি পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে লণ্ডনে ডাকাত বাঁধাই

হইয়া প্রকাশিত হইল। কিন্তু সেই ব্রাউন কাগজে বাঁধা প্রথম অবস্থার পুস্তকখানিকেই গ্রন্থকার অধিক ভালবাসিতেন।

ইহাই কিপ্‌লিংএর প্রথম পুস্তক প্রকাশের বিবরণ। ইহার পর গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার অর্থ ও যশ কিছুরই অভাব হয় নাই। কিপ্‌লিং তাঁহার এক একটা দীর্ঘ গল্পে প্রতি কথায় বার আনারও অধিক হিসাবে মূল্য পাইয়াছেন। কিন্তু এ দেশে সে কথা বলিয়া আর সাহিত্যসেবী পাঠককে কষ্ট দিব না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কিপ্‌লিংএর কবিতার উপাসকের অভাব নাই। অল্প দিন হইল, খ্যাতনামা আমেরিকান ঔপন্যাসিক হাওয়েল্‌স কোনও আমেরিকান পত্রে কিপ্‌লিংকে The laureate of that larger England whose wreath it is not for any prime minister to bestow. বলিয়াছেন। পূর্ব্বে কিপ্‌লিং ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগকেই প্রায় সঙ্গীতের বিষয়ীভূত করিতেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে "পিক্-মি-আপ্" পত্রে কতকগুলি হাস্যোদ্দীপক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। য়ুরোপের অনেকগুলি বিখ্যাত লোকের প্রতিকৃতিতে যিনি যে বিষয় লইয়া অধিক ব্যস্ত, তাঁহার মস্তিষ্কে সেই বিষয়েরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাতে কিপ্‌লিংএর মস্তিষ্কে এক জন ভারতবর্ষীয় সৈনিকের চিত্র প্রদত্ত হয়। নিম্নে সেই চিত্রখানি সন্নিবিষ্ট করিলাম।

কবিতা।



কিপ্‌লিং এখন নানা বিষয়ের কবিতা লিখিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতার সেই অশিক্ষিত-সৈনিক-মন-ভুলান গাম্ভীর্য্য-হীনতা আজও যায় নাই। ইংরাজী পাঠক-সমাজে কবি কিপ্‌লিংএর অসম্ভব আদরের একটা প্রধান কারণ, ইংরাজের জাতীয় সুখ দুঃখ, আশা অভিলাষ, এমন কি, জাতীয় দুর্ব্বলতার সহিতও তাঁহার সহানুভূতি। ম্যাথু আর্ণল্ড যাহাকে Spirit of insularity and contempt for foreign ideals বলেন, তাহা ইংরাজ চরিত্রে যেমন প্রবল, তেমন আর কুত্রাপি নহে। তাই ইংরাজ এত দিন আমাদিগকে শাসন করিয়া আজও আমাদের সহিত মিশিতে পারে না, আজও আমাদের চিনিতে পারে না। সম্প্রতি পুনার ব্যাপারে ও সিডিশন আইনে তাহার প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা ইংরাজের দুর্ব্বলতা; কিন্তু এই দুর্ব্বলতাকে ইংরাজ গর্ব্ব বলিয়া মনে করে। আপনার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা তাহার বড় গর্ব্বের ধন। কিপলিংও সেটাকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন। প্রবাসী ইংরাজের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন;—

করে বটে বাস তারা দেশ দেশান্তর;
হৃদয় তাদের কিন্তু রহে এক স্থানে;
জননীর মুখে শুনি—শিশুর অন্তর
সুদূর ইংলণ্ড তার দেশ বলি জানে

হৃদয়ের শোণিত দিয়া ইংরাজ জলযুদ্ধে যশ কিনিয়াছে। তাই সে যশ তাহার প্রাণের অধিক প্রিয়। ইংরাজ আজও এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে যে, জলযুদ্ধে তাহার সমান বল আর কাহারও নাই। কিরূপ দুর্ম্মূল্যে ইংরাজ এই যশ ক্রয় করিয়াছে, সে কথা কিপ্‌লিং লিখিয়াছেন ;—

সিন্ধুর আহার মোরা যোগায়েছি সহস্র বৎসর ;
এখনও সে ডাকিতেছে, আজও তার ভরেনি উদর।
একটি তরঙ্গ কোথা নাহি উঠে অর্ণব-জীবনে—
যেথায় ইংরাজ বীর না শুয়েছে মরণ-শয়নে।

শত শত বীর দেহ সাগরে দিয়াছি উপহার,
হয়েছে তা হাঙ্গরের, জলচর পক্ষীর আহার ;
দেহের শোণিত যদি বীরত্বের মূল্য হয়, তবে,
বীরত্বের পূর্ণ মূল্য ঢালিয়াছি আমরা অর্ণবে।

জাতীয় সুখ দুঃখ, আশা অভিলাষ, এমন কি, দুর্ব্বলতার সহিত এই সহানুভূতির জন্যই, গম্ভীর গীতোপযোগী গভীরোদাত্ত সুর না থাকিলেও, কিপ্‌লিংএর কবিতা ইংরাজ পাঠক-সমাজে এমন অসাধারণ আদর পাইয়াছে।

কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পেরও যথেষ্ট প্রশংসা হইয়াছে। আমাদিগের সাহিত্যে ছোট গল্প বড় অধিক দিন প্রচলিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়টি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আবার দুইটিকে বর্দ্ধিত করিয়া উপন্যাসে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্প দুইটি তাঁহার উপন্যাসের পার্শ্বে নিতান্ত ম্লান। মাসিকপত্রে মাসে মাসে ছোট গল্প দিবার চেষ্টা প্রথম "সাহিত্য" হইতে আরম্ভ। সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য আমরা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট গল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয় ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটি কয়েক ছত্রমাত্র অধিকার করিতে পারে ; ছোট গল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে "বুল্‌স্ আই"-লণ্ঠনের আলোক যেমন এক স্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোট গল্পরচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া, তাহাকেই সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারে সেই একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাই সে লণ্ঠনের আলোকের কার্য্য। তেমনই বিচিত্র সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, উত্থান পতন, সংঘাতময় জীবনে একটা ছোট ঘটনা, অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দানই গল্প রচনাকৌশলের কার্য্য। এই হিসাবে দেখিতে গেলে, প্রকৃত ছোট গল্পের আদর্শ ফরাসী সাহিত্যে পাওয়া যাইবে—ইংরেজী সাহিত্যে নহে। ফরাসী গল্প প্রকৃত শিল্প ; ইংরাজী গল্প শিল্পচাতুরীবিহীন বাক্যস্তূপমাত্র। ইংরাজী গল্প লেখকদিগের মধ্যে কেবল টমাস হার্ডি প্রভৃতি দুই চারি জন ছোট গল্পের রচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বহুদোষ সত্ত্বেও কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পগুলি প্রকৃত শিল্পকার্য্য।

ছোট গল্প কি ?

ছোট গল্পের আদর্শ।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে "ব্ল্যাক্‌উড্‌স ম্যাগাজিন" পত্রে কোনও লেখক কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পের

প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কিপ্‌লিংকে Star of Indiaয় ভূষিত করা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মহারাণী যদি ভারত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে কিপ্‌লিংএর পুস্তক কয়খানি পাঠ করিলে, তাঁহাকে আর কোনও পুস্তক পাঠ করিতে হইবে না। সেগুলি একত্র করিলে একখানা বড় উপন্যাসের সমান হইবে কি না সন্দেহ ; কিন্তু তাহাতেই ভারতসাম্রাজ্যসম্বন্ধীয় সকল তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

ছোট গল্পে কিপ্‌লিং।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কোনও ফরাসী পত্রে কিপ্‌লিংএর পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া মজো বেণ্টজন বলিয়াছেন যে, কেবল দুই তিন বৎসর হইতে লোকে কিপ্‌লিংএর নাম শুনিতেছে। কিন্তু ব্রেট হার্টের উজ্জ্বল রচনায় কালিফর্ণিয়ার প্রতি পাঠকের মনোযোগ যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিপ্‌লিংএর রচনায় তেমনই ভারতবর্ষের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে। ব্রেট হার্ট ও কিপ্‌লিং, উভয়েই আপন আপন বর্ণিত বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত। অদূরদর্শী স্তাবকগণ যুবক কিপ্‌লিংকে ডিকেন্সের সহিত একাসনে বসাইতে চাহে ! সেটা বড় ভুল। ডিকেন্স আপনার সৃষ্ট চরিত্রে আপনার আস্তিত্ব নিমজ্জিত করিতেন ; কিপ্‌লিং তাঁহার পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রগুলির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার অহংত্ব অত্যন্ত অধিক। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কিপ্‌লিংএর ক্ষমতার অভাব নাই।

ফরাসী সমালোচক।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে "ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রে মিষ্টার ফ্রান্সিস্ অ্যাডাম্‌স্ একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে কিপ্‌লিংএর পুস্তক সমালোচনা করেন। কিপ্‌লিংএর প্রশংসা করিয়া লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রচনার বিষয়ীভূত ভারতবাসীদিগের সহিত কিপ্‌লিংএর সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। যেন ইংরাজ কর্ত্তৃক বিজিত ও শাসিত হইবার জন্যই তাহাদিগের জন্ম। কিপ্‌লিং যেখানেই পারিয়াছেন, সেখানেই কুণো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মত ভারতবাসীদিগের নিন্দা করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার মত মস্তিষ্কের ক্ষমতাধিক্য থাকিলে, এক কিপ্‌লিংএর পুস্তক পাঠ করিলেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ জীবনের সকল কথা জানা যাইত। লেখক আরও বলেন, কিপ্‌লিং আজকালকার ইংরাজী গদ্য ভিন্ন আর বড় কিছু জানেন না ; কাজেই "কণ্টিনেণ্ট্যাল" লেখকদিগের শিল্পকৌশল তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহস্যমাত্র। সমালোচকের মতে, কিপ্‌লিংএর চরিত্ররচনার ক্ষমতাও অল্প। তাঁহার Soldiers Three পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রগুলি পুত্তলিকামাত্র। আজকাল লোকে লেখক ও শিল্পীদিগের চরিত্রচিত্রাঙ্কণী প্রতিভারই বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। এখন চরিত্ররচনাক্ষমতার অভাব প্রশংসার কথা নহে। কিপ্‌লিং এখনও তরুণবয়স্ক ; কিন্তু তাঁহার পর পর প্রকাশিত পুস্তকে রচনা-শক্তির ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয় না ; ইহা আদৌ আশাপ্রদ নহে।

"এডিনবরা রিভিউ"র সমালোচনা।

কয় মাস পূর্ব্বে "এডিনবরা রিভিউ" পত্রে কোনও সমালোচক কিপ্‌লিংএর রচনার সমালোচনা করিয়াছিলেন। সমালোচক কিপ্‌লিংএর পর্য্যবেক্ষণশক্তির ও বর্ণনাচাতুরীর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিপ্‌লিং যাহা দেখেন, তাহারই প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন। কি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজ, কি ভারতবর্ষীয় সমাজ, কি সৈনিক, কি নাবিক, কি কোনও পশু, কিপ্‌লিংএর বর্ণনায় সবই যেন চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। পর্য্যবেক্ষণ-কৌশল ও বর্ণনাশক্তির হিসাবে তাঁহার রচনার তুলনা নাই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কেবল এই দুই গুণ থাকিলেই সাহিত্যসেবকের ভাগ্যে স্থায়িযশোলাভ ঘটে

না। এখন পাঠকসমাজে কিপ্‌লিংএর রচনার প্রচুর আদর; কিন্তু সে সকল রচনায় কোনও সার্ব্বজনীন, চিরস্থায়ী বিষয় আলোচিত হয় না। সে সকল রচনার আলোচ্য বিষয় নিতান্তই বর্ত্তমান সময়ের; নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। সাহিত্য হিসাবে কিপ্‌লিংএর রচনার মূল্য অল্প। তদ্ব্যতীত কিপ্‌লিংএর রচনায় প্রচলিত কথা, এমন কি, সমাজের নিম্নস্তরের প্রচলিত ভাষা, অর্থাৎ Slang বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে পুস্তকে এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়, সে পুস্তক অধিকদিন টিকিবে কি না সন্দেহ। আমরা আজকাল এতই বাস্তবপ্রিয় বা বাস্তবপাগল হইয়া উঠিয়াছি যে, এইরূপ ভাষারও প্রশংসা করি। কিপ্‌লিংএর রচনায় কেবল বর্ত্তমান সময়ের দুই চারিটা ব্যাপার আলোচিত হয়। তাঁহার Plain Tales from the hills প্রভৃতি, এখন যতই আদৃত হউক না কেন, সে আদর ক্ষণস্থায়ী; কিছুদিন পরে লোকে আর সে সকল পুস্তক পাঠ করিবে না। কারণ, সে সকল পুস্তকে মানবচরিত্রের কোনও চিরস্থায়ী অংশ চিত্রিত হয় নাই,—তাহাতে সমাজের খেয়াল ও হুজুগ চিত্রিত হইয়াছে মাত্র। কিপ্‌লিং ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনার বিষয় চিরদিন লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে না; সাহিত্য হিসাবে তাঁহার রচনার মূল্য অল্প; তিনি আজকাল একটু যশ পাইবার আশায় সুদূর ভবিষ্যতে দীর্ঘকালস্থায়ী যশোলাভের আশাও ত্যাগ করিয়াছেন।

সমাজনীতি।

কাবুলে সামাজিক জীবন।

মহিলাচিকিৎসক কুমারী হ্যামিল্টন বহু দিন কাবুলে বাস করিয়াছেন। তিনি "লেডিস্ পিক্‌টোরিয়াল" পত্রে কাবুল সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সকল হইতে কাবুলের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারা যায়। সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমরা পাঠকদিগকে কাবুলের সামাজিক জীবনের চিত্র প্রদান করিবার চেষ্টা করিব।

যেরূপ দাসপ্রথার উচ্ছেদ করিবার জন্য ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, কাবুলের প্রচলিত দাসপ্রথা সেরূপ নহে। কাবুলে ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীদিগের অবস্থা শোচনীয় নহে। সেখানে ধনীর গৃহিণীগণ প্রায়ই অলস, কাজেই দাসীরাই গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা। এক জন ক্রীতদাসীর উপর গৃহস্থালীর সকল ভার থাকে। তাহার বেশের বাহার দেখিলে কেহ আর তাহাকে দাসী বলিয়া বুঝিতে পারে না। গৃহিণীর খাস্ চাকরাণীও ক্রীতদাসী। সে প্রভুর ও প্রভুপত্নীর বেশভূষার সকল ভার লয়। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কাবুলে দাসী গৃহকর্ত্তার বেশ গুছাইয়া রাখে মাত্র। স্বামীর বেশভূষায় সাহায্য করা, নমাজের পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে ও পদে জল ঢালিয়া দেওয়া, তাঁহার নমাজের আসন পাতিয়া দেওয়া প্রভৃতি, স্বামিসোহাগিনী পত্নীর কার্য্য। লেখিকা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছেন যে, প্রতীচ্য দেশবাসিগণ প্রাচ্যদেশবাসীদিগকে ঠিক বুঝিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। লেখিকার কোনও বন্ধুর জনৈক বুদ্ধিমতী দাসী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিত। সে বহুদিন তাঁহার নিকট ছিল, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্তাও হইয়াছিল। তাহার মনোভাব বুঝিবার জন্য এক দিন লেখিকা তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা জিনোরিয়া, তোমার আঘা যদি আবার বিবাহ করেন, তবে তুমি কি কর?"

ক্রীত দাস।

সে বলিল, "কি আবার করিব? এখনও যাহা করি, তখনও তাহাই করিব।"

"তখন তাঁহার এ সকল কার্য্য তাঁহার পত্নী করিবে, তুমি আর করিতে পাইবে না।"

"তাহাও হইতে পারে।"

"তোমার কি তাহা ভাল লাগে?"

"তাহাতে আর কি বিশেষ হয়?"

লেখিকা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "তোমার অবশ্য অত্যন্ত ঈর্ষ্যা হয়? কোনও স্ত্রীলোকই অপর কোনও স্ত্রীলোককে আপনার অধিকার দিতে চাহে না।"

জিনোরিয়া যেন কুপিতা হইল। সে উত্তর করিল, "যাহার বুদ্ধি আছে, সে পুরুষের জন্য কোনও স্ত্রীলোককে ঈর্ষ্যা করে না, বা তাহার সহিত কলহ করে না। আর এক জন স্ত্রীলোক আসিলেই কি আমার প্রতি তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে? পুরুষের হৃদয় তরঙ্গিণীতুল্য। যদি এখানে একটা কুক্কুর, ওখানে একটা উষ্ট্র স্রোতের জলপান করে, তবে তাহাতে কি স্রোতের কোনও পরিবর্ত্তন হয়? সে জন্য কি স্রোতের গতিতে কোনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে?"

প্রিয়তমকে আপনার অপেক্ষা এত উচ্চ মনে করিয়া আপনি অনুগত কুক্কুরের মত তাহার অধীন থাকিবার এই কল্পনা, ইংরাজ মহিলার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই কথায় বলে যে, 'যে দেশে যেমন আচার'।

বিদেশীয় লেখকগণের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহম্মদের মতে মহিলাগণ পশুর মত। পুরুষের সুখসাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যই তাহাদের জন্ম; পরলোকে মহিলার কোনও স্থান আছে কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ মহম্মদ কোথাও এমন কথা বলেন নাই।

মাতা ও পুত্র।

তবে মুসলমান সমাজে মহিলার যেরূপ অনাদর, তাহাতে লোকের এ কথায় বিশ্বাস করা আশ্চর্য্য নহে। মুসলমানগণ এখন কোরাণের ভাব গ্রহণ করিতে ত পারেই না, আবার অনেক মুসলমান কোরাণ পাঠও করে না। মুসলমানগৃহে মহিলাগণ অন্তঃপুরে অর্থাৎ "হারেমে" রক্ষিতা—সেখানে তাঁহাদের খাইবার পরিবার কষ্ট নাই সত্য, কিন্তু পশুও পশুশালায় যত্নে রক্ষিত হয়। কাবুলে পুত্র জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বালক জননীকে তাড়া দেয় ও আপনার টুপি প্রভৃতি আনিতে আদেশ করে। লেখিকার কোনও পরিচিত পরিবারে দুইটি বালক ছিল, বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। আমীর তাহাদের বড় ভালবাসিতেন। তাহাদের দুষ্টামির অন্ত ছিল না। গ্রীষ্মের শেষভাগে তাহাদের কোন-না-কোন অসুখ লাগিয়াই থাকিত। জ্বর, কাশি, বেদনা প্রভৃতি পীড়ায় তাহারা কষ্ট পাইত; ইহার কারণ সহজেই দেখা যাইত। কাবুলে বালকগণ এক ঘণ্টার অধিক অধ্যয়ন করে না। অধ্যয়নের পরেই এই দুইটি বালক বাটীর বাহির হইত—রৌদ্রে ছুটাছুটি করিত, পরস্পরকে জলে ফেলিয়া দিত, সিক্তবস্ত্র গাত্রেই শুকাইত, রৌদ্রে ঘোড়া ছুটাইত; লেখিকার গাড়ীর পশ্চাতে দৌড়িত, কাঁচা, পাকা, ডাঁসা ফল খাইত—ইত্যাদি। তাহারা যেন দুইটি আলেয়ার আলোক। বলা বাহুল্য, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার থাকিত না। তাহাদের দেখিলে কেহ কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিত না। লেখিকা তাহাদের জননীকে বলিয়াছিলেন যে, ছেলেরা অমন করিয়া বেড়াইলে তিনি আর তাহাদের চিকিৎসা করিতে আসিবেন না। জননী উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি কি করিব বলুন? আমার স্বামী সরকারী কার্য্যে সমস্ত দিন আফিসে থাকেন। কিছু খাইয়াই বালকদ্বয় ছুটিয়া বাহির হয়। আমি লোক পাঠাই বটে, কিন্তু সে লোক উহাদের খুঁজিয়া পায় না, পাইলেই বা কে উহাদের সঙ্গে সমস্ত সহরময় ছুটিয়া বেড়াইবে?" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। একটু বড় হইলে পুত্র আর জননীকে গ্রাহ্য করে না।

এইরূপ অত্যাচারে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকায় পুত্রগণ প্রায়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আবার সে দেশের জ্বরে অনেক সময় সবলগণই মরিয়া যায়। কাজেই কাবুলী জননীরা সন্তানের মৃত্যুতে অভ্যস্তা হইয়া পড়ে। আর বোধ করি, কাবুলী জননীর অপত্যস্নেহও কিছু অল্প। আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ধাত্রীর কাছে থাকে, তাহার পর পিতাই পুত্রদিগের পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়া থাকেন। তবে কাবুলী জননীদের সারাদিন কাটে কেমন করিয়া? অভিজাতবংশীয়াদিগের কোনও কার্য্যই নাই। তাঁহারা সন্তান পালন করেন না—লিখিতে বা পড়িতেও জানেন না। স্বামী মনে ভাবেন, পত্নী তাঁহার আশায় পথ চাহিয়া আছেন।

কিন্তু যদি "আশায় নিরাশা ফলে দুঃখ কামনায়" তবে কাবুলী পত্নীর আশায় তীব্র নিরাশা ও কামনায় তীব্র দুঃখই ফলিয়া থাকে। কারণ সময় সময় এমনও হয় যে, কোনও

পতিপত্নী।

পত্নীর পক্ষে কুড়ি একুশ দিন স্বামিসন্দর্শনলাভ হইয়া উঠে না। লেখক আমীরের বংশসম্ভূতা কোনও রমণীর কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বামী এক দিন মস্তকে ঔষধ লেপন করিয়া দরবারে আসিয়া উপস্থিত। লেখিকা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোকরাই ত যত অনিষ্টের মূল।" লেখিকা বলিলেন, "কেন, আপনার কোনও পত্নী কি আপনাকে প্রহার করিয়াছেন নাকি?" সর্দ্দার কোনও উত্তর প্রদান না করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। দরবারে লেখিকা এক জন রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন যে, এক জন সর্দ্দারকে তাঁহার পত্নী প্রহার করিয়াছেন।

আমীরের সমক্ষে কেহ মৃদুস্বরে কোনও কথা কহিলে আমীর কথাটা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা হইতেছে?" রাজকর্ম্মচারী কথাটা আরও একটু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেন। সর্দ্দার তখনই আহূত হইলেন; এবার সর্দ্দারকে সব কথা বলিতে হইল। তিনি তাঁহার কোনও পত্নীর সহিত বিংশতি দিবস সাক্ষাৎ করেন নাই। একবিংশতি দিবসে পত্নীর কক্ষে উপস্থিত হইয়া সর্দ্দার দেখেন যে, পত্নী তখন পোলাও আহার করিতেছেন। পলাতক ছাত্র যেমন স্কুলে গিয়া পুস্তক খুলিয়া বসে, সর্দ্দার তেমনই পত্নীর নিকটে গিয়া আহার করিতে বসিয়া গেলেন। পত্নীর মুখে ক্রোধভাব দূর হইল না। তিনি অস্থি হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামীকে দিতে লাগিলেন; স্বামী ভাবিলেন, এবার সহজেই গোল চুকিয়া গেল। কিন্তু তিনি তখনও পত্নীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই। অস্থি হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করা শেষ হইলে, পত্নী অস্থিখানা তুলিয়া স্বামীর মস্তকে প্রহার করিলেন। তাহারই ফলে সর্দ্দারকে মস্তকে ঔষধ লেপন করিয়া দরবারে আসিতে হইয়াছিল। ইহারই নাম "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল!"

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রার্থনা।

১

নদিয়ার পুরে আজি আনন্দ অপার,—
নীলাচল-পরবাসী নদিয়ার প্রভু আসি'
স্বগণ-সমাজ মাঝে উদিলা আবার;
তুমুল উৎসব-রব তরঙ্গে প্লাবিয়া সব
দিশি দিশি সে সংবাদ করিল প্রচার।

২

অসংখ্য আইল ধেয়ে বৈষ্ণবের দল;
সঙ্কীর্ত্তনে উতরোল উচ্চে 'হরি হরি'-বোল,
ছাইয়া অবনী ঊর্দ্ধে উঠে কোলাহল;—
এ সংসার পারাবার, প্রভু তাহে কর্ণধার,
কেন না নাচিবে প্রাণী উল্লাসে বিহ্বল?

৩

সাথে ল'য়ে অনন্ত সে জনতার রাশি,
সন্ন্যাসী ভিখারী-বেশে নিজ গৃহদ্বারদেশে
বিষাদে বিকল প্রভু দাঁড়াইলা আসি;
দেখিতে দেখিতে তাঁর দুটি পদ্ম-আঁখিতার
সহস্র স্মৃতির স্রোতে উঠে যেন ভাসি'।

৪

শৈশবের লীলাভূমি স্নেহের ভবন,—
সেই সে আঙ্গিনা মাঝে সে তুলসী-মঞ্চ রাজে,
দেবতার গৃহচূড়ে গরুড় কেতন,—
চির জনমের তরে নিরখি' ব্যগ্রতাভরে
প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রভু মোর কহিলা তখন;—

৫

"প্রণমামি জন্মভূমি, জননী আমার!
লাজিয়া সন্ন্যাসি-সাজ কত যুগ পরে আজ
মধুর মূরতি তব হেরিনু আবার!
জনমিয়া ভবতলে তোমারই প্রসাদবলে
পাইনু মা কৃষ্ণপ্রেম কামনার সার।

৬

"প্রণমামি শেষবার, বিদায় এখন!
তোমার পবিত্র ধূলি লইনু মা শিরে তুলি';
এই আশীর্ব্বাদ আজি কর বরিগণ,—
যেন এ প্রেমের ডোরে বাঁধি সে হৃদয়-চোরে,
পাই যেন বৃন্দাবনে কৃষ্ণ প্রাণধন।"

৭

সহসা করুণ কণ্ঠ উঠিল কাঁপিয়া,
উৎসারিত উৎস ছুটি' বিশাল নয়ন দুটি
বরিষার স্রোতে যেন দিল ভাসাইয়া ;
বিগলিত তনু মন কাঁদিল বৈষ্ণবগণ,
কোটি কণ্ঠে 'হরি-হরি' উচ্চে উচ্চারিয়া।

৮

কাঁদিয়া লইলা প্রভু অন্তিম বিদায় ;—
নদিয়ার নাট্যাগার হয় চির-অন্ধকার,
নদিয়া ভাসিয়া যায় নয়ন-ধারায় !
হেনকালে বজ্রাঘাত !— কে পড়িল অকস্মাৎ
প্রভু-পাদমূলে আসি পাগলিনীপ্রায় !

৯

নিবিড় বসনে ঢাকা আপাদ-কুন্তল ;
বিমলিন বেশবাস, চিররুক্ষ কেশরাশ,
তবু সে ঝলসে কান্তি কাঞ্চন তরল,
নদিয়ার চাঁদে হায়, হেরি অস্তমিতপ্রায়
নদিয়ার লক্ষ্মী কিরে হইলা চঞ্চল ?

১০

সমুখে সুন্দরী হেরি' সন্ন্যাসী নিমাই,
ধর্ম্মলোপ ভাবি' মনে রোষ করি' দু'নয়নে
"কে তুমি ?" কহিলা শুধু তাহারে সুধাই ;—
স্তম্ভিত সকল রব, স্তম্ভিত বৈষ্ণব সব
সবিস্ময়ে নির্নিমেষ দোঁহা পানে চাই' !

১১

বিস্ময়ে বিকল সবে, কে করে উত্তর ?
কারও মুখে নাহি বাণী, নীরব সহস্র প্রাণী
দাঁড়াইয়া চিত্রে যেন আঁকা কলেবর ;—
কতক্ষণে কর্ণে আসি' পশিল সুধার রাশি,
মর্ত্তে যেন নন্দনের ঝরিল নির্ঝর !

১২

"প্রথম আশ্রমে প্রিয় নিবাসে যখন
ছিলে তুমি বিশ্বরাজ ! সে গৃহ-মন্দির মাঝ
করিত যে দিবানিশি চরণ-পূজন ;
পাদপদ্ম-অভিলাষী আমি সে দাসীর দাসী,
হয় ত আজিও মনে হইবে স্মরণ।"

১৩

বৈশাখী প্রভাত সম প্রফুল্ল সরল
প্রভুর আনন, হায়, ঘনমেঘে ঢেকে যায়,
উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া উঠে মরমের তল ;

তবু আত্ম সম্বরিয়া কহিলা পাষাণ-হিয়া,—
"কি প্রার্থনা ? সন্ন্যাসীরে করিও না ছল।"

১৪

করুণ সে বাণী-বীণা বাজিল আবার,—
"হে ঠাকুর ! আজি মোর দুঃখের করহ ওর ;
প্রেমদানে ত্রিজগৎ করিলে উদ্ধার,
চির প্রেম-কাঙালিনী বিষ্ণুপ্রিয়া অভাগিনী
পড়িয়া কি র'বে শুধু ভবের মাঝার ?"

১৫

প্রিয়ার কামনা শুনি' কহিলা নিমাই,—
"পূর্ণ হ'ক মনস্কাম,— বিষ্ণুপ্রিয়া তব নাম,
হও তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া, এই শুধু চাই ;
জীবের সর্ব্বার্থসার কৃষ্ণ বিনা নাহি আর ;
শুন বাণী, কহি আমি কৃষ্ণের দোহাই।"

১৬

প্রভুর বচনে প্রিয়া প্রবোধ না পায় ;
পুনঃ কহে,—"হে ঠাকুর ! কহ কৃষ্ণ কত দূর ?
দাসীর পরাণ সে ত তাঁরে নাহি চায় ;
আমার নয়ন-আগে একমাত্র মূর্ত্তি জাগে,—
অন্তরে বাহিরে আমি নিরখি তোমায়।

১৭

"কিশোর শৈশব হ'তে তটিনী সমান,
সকল আকাঙ্ক্ষাচয় এক স্রোতে করি লয়
যে গৌরাঙ্গ-সিন্ধু পানে ছুটিয়াছে প্রাণ,
তাঁরে ত্যজি' অকস্মাৎ কোথা যেতে বল, নাথ ?
নারীর জীবন-বারি বহে কি উজান ?"

১৮

যতনে নিবারি প্রভু নয়নের জল,
প্রসন্ন-মানসে কয়, "হে সাধ্বী ! তোমারি জয় ;
সাধের সাধনা তব হউক সফল ;—
যাই এবে বৃন্দাবন দেহ আজ্ঞা হৃষ্টমন,
লহ এই বিরহের সান্ত্বনা-সম্বল।"

১৯

পাদুকা লইয়া প্রিয়া উঠিলা তখন ;
প্রণমিয়া ধীরে ধীরে বারেক পরশি' শিরে
চুম্বিয়া বুকের 'পরে করিলা ধারণ ;
আর না ফিরিয়া চায়, রাজরাজেশ্বরীপ্রায়
উচ্চ জয়ধ্বনি মাঝে পশিলা ভবন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ ; ১৩০৫।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "পুত্র-যজ্ঞ" একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। লেখক বোধ করি নূতন ব্রতী। "জুতা-আবিষ্কার" একটি অদ্ভুত ও উদ্ভট রচনা;—লেখকের বিদ্রূপরচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবির চেষ্টা 'কমিক' বটে! "শিক্ষাপ্রণালী" প্রবন্ধে পদে পদে লেখকের চিন্তাশীলতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, লেখক বিস্তারিতভাবে তাহার আলোচনা করিয়া সাধারণকে উপকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার একান্ত আবশ্যক। লেখক ত প্রবন্ধে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু এখন 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে?' "বেণো জল" প্রবন্ধে লেখক ভারতে বিদেশীয় পণ্যের প্রাদুর্ভাব ও দেশীয় শিল্পের অন্তর্ধানের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সর্ব্বসাধারণের আলোচনীয়। "সাহিত্যের সৌন্দর্য্য" প্রবন্ধে সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা আছে। এই নিবন্ধটির কতকটা 'কবিতা', কতকটা হেঁয়ালি, এবং সমস্তটাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। "ত্রিবাঙ্কুর—ভ্রমণকারীর নোট" সুপাঠ্য। "বাঙ্গালা বহুবচন" প্রবন্ধে লেখক আমাদের বহুবচনের উৎপত্তি ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়াছেন। "ঢাকা" একটি ভ্রমণকাহিনী—এক বিন্দু ইতিহাসের আমেজ আছে।

নব্যভারত। ষোড়শ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। "কি চাই, কি পাই?" সম্পাদকের রচনা। "নব্যভারত"-সম্পাদক অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, তাঁহার সমস্ত সুখদুঃখের সহিত পাঠকগণের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই, এবং তাঁহার যে কাঁদুনী বান্ধবদের হৃদয় বিগলিত করিতে সক্ষম, তাহা সাধারণ-সমাজে নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরসের সঞ্চার করিতে পারে। তিনি যেখানে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, অপরিচিত লোকের চক্ষে তাহাও যে ছদ্মবেশ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও সম্পাদকমহাশয়ের চিত্তে উদিত হয় না। সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছেন, "আমরা এই পনের বৎসর কেবল ভূতের ব্যাগার খাটিয়াছি। খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিয়াও যদি কিছু না পাইলাম, তবে আর কি হইল?" দুষ্ট লোকে বলে, "ভূতের ব্যাগার খাটিয়া" তিনি কিছু পাইয়াছেন, বরং লোকে প্রতি বৎসর তাঁহার এই ধরণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সত্য সত্যই "ভূতের ব্যাগার" দিয়া থাকে। এই উন্মত্ত প্রলপিতের প্রতিবাদ নিরর্থক ও অনাবশ্যক। "ফাহিয়ানের স্বদেশে প্রত্যাগমন" প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক। আরম্ভে লেখক বলিয়াছেন, "বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ তীর্থদর্শন এবং ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি চীনদেশ পরিত্যাগ করেন। তিব্বত, মধ্য এসিয়ার মরুভূমি এবং বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থানের চিরনীহারাবৃত দুরারোহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া গান্ধার, উদ্যান, এবং ক্ষুদ্রতর আরও কতকগুলি রাজ্যের মধ্য দিয়া বহু ক্লেশের পর তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তিব্বত, মধ্যএসিয়া, তাতার, আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি স্থান ভারতবর্ষেরই মত নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল দেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব। আফ্‌গানিস্থানের উত্তর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের নানা স্থানে ফাহিয়ান্ রথযাত্রার উৎসব দেখিয়াছিলেন। মধ্যস্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এবং তাহার উভয় পার্শ্বে দুই জন বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি রথোপরি স্থাপিত হইত। পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনরুত্থানসময়ে ইহারাই সুভদ্রা, কৃষ্ণ এবং বলরামরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু পাঠক সামুয়েল বীল (Samuel Beal) সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত

হিউয়েন্‌সঙ্গের গ্রন্থে ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তার জানিতে পারিবেন। ফাহিয়ান্ চতুর্দ্দশ বৎসরের পর সমুদ্রপথে ভারতীয় বাণিজ্যপোতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।" শ্রীমনোরঞ্জন গুহ "দেবগৃহে কথোপকথন" প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিবিধ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম "খলিফাদিগের বিবরণ" সংগ্রহ করিতেছেন। এই মসলেম লেখকের বঙ্গ ভাষায় অনুরাগ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গলাই যে বঙ্গদেশবাসীর মাতৃভাষা, এই প্রবন্ধের বিশুদ্ধ রচনায় তাহা সুপ্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "সাহিত্য-সংবাদ" নামটি সুপ্রযুক্ত ও অন্বর্থ হয় নাই, কিন্তু প্রবন্ধটি বিবিধ সুখপাঠ্য ও কৌতুকাবহ বিষয়ে পূর্ণ। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিসমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি রায়ের "বিলাতে বড়দিন" প্রবন্ধটির বিষয় চিত্তাকর্ষক; কিন্তু ভাষা যেমন উদ্ভট, তেমনই অদ্ভুত। বিকৃত, লাঞ্ছিত ও গ্রাম্যতাদোষে দূষিত করিলেই ভাষা সহজ বা সরল হয় না। লেখক পরমনিশ্চিন্তচিত্তে বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভাষার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রাদোষ দেখিয়া মনে হয়, বিলাতে বড়দিনের 'প্যাণ্টোমাইম্' দেখিয়া তিনিও মাতৃভাষা লইয়া এই নূতন 'প্যাণ্টোমাইম্' রচনা করিয়াছেন। শ্রীপতি বাবু দেশে থাকিতে বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের রচনা করিয়া আমাদের আনন্দিত করিতেন; তাঁহার তখনকার ভাষা ত এমন ছিল না। রায় মহাশয়ের মত প্রবীণ লেখকও কি বিলাতে পা দিয়াই মোচাকে 'কেলাকা ফুল' বলিতে আরম্ভ করিলেন?

বামাবোধিনী। ৩৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; বৈশাখ। "বামাবোধিনী" বিগত পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বঙ্গীয় নারীসমাজের সেবা করিয়া, এই সংখ্যায় ষট্‌ত্রিশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা সহযোগিনীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বিশেষ অভাব।

বামাবোধিনী। জ্যৈষ্ঠ। "বড়লোক কে?", "অদ্ভুত বৈরনির্য্যাতন, "গ্ল্যাডষ্টোন" প্রভৃতি প্রবন্ধ সুরচিত না হউক, সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। "দেবী কৈলাসকামিনীর জীবনী" পাঠ করিলে পাঠিকাগণ উপকৃত হইবেন। এই গৃহধর্ম্মরতা কর্ত্তব্যপরায়ণা মহিলার সহজ সরল জীবনপ্রণালী আলোচনার যোগ্য।

তত্ত্ববোধিনী। জ্যৈষ্ঠ। "আত্মসংযম", "নববর্ষ উদ্বোধন" প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ দ্বারা এবারকার "তত্ত্ববোধিনী" পরিপূর্ণ। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রের উপনয়ন ও "শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দ্ব্যশীতিতমজন্মোৎসবে"র স্পৃহনীয় ও মহনীয় 'তত্ত্ব' প্রকাশিত হইয়াছে। হায়, বর্ষীয়সী "তত্ত্ববোধিনীর" পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা ও এখনকার ঘোর দুর্দ্দশার কথা মনে হইলে দুঃখের অবধি থাকে না।

পূর্ণিমা। ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। "ত্রিমূর্ত্তি" একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। "বর্ণপরিচয়" প্রবন্ধটিতে লেখক বলেন, "ধর্ম্ম স্মরণ করিবার জন্যই পাটীগণিতে 'যোগ-বিয়োগ' 'কালী' কষা।" আমরা তাহা জানিতাম না! এখনও ছেলেরা "ক—য়ে কৃষ্ণ গ—য়ে গণেশ" ইত্যাদি শেখে বটে, কিন্তু তাহা যে ধর্ম্মশিক্ষার রূপান্তর, পাষণ্ড আমরা তাহাও কখনও মনে করি নাই! প্রহ্লাদ "ক—য়ে কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, কথক ঠাকুর এখনও তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সমুদায় বর্ণশিক্ষার্থী হিঁদুর ছেলে যে দিন পাঠশালে "ক" দেখিয়াই "কৃষ্ণ" স্মরণ করিয়া বনপ্রস্থানে উদ্যত হইবে, সে দিন আমাদেরও পাততাড়ি গুটাইতে হইবে ভাবিয়া, আমরা এখনই কৃষ্ণস্মরণ করিতেছি।

উৎসাহ। দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "পুণ্যাহ" নামক ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও আলোচ্য। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "সন্ন্যাসী" কৌতূহলের

উদ্দীপক। "হেমের অনধিকার" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির কোনও বিশেষত্ব নাই ; আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "যে আমার জননীরে" একটি সদ্ভাবপূর্ণ গান। বৈশাখ মাসের "উৎসাহে" আর একটু মাধুর্য্য আছে। "উৎসাহের" সমালোচক "প্রদীপে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "সঙ্গিনী" গল্পের ভাষার ভুল ধরিয়া বলিয়াছেন, "এগুলি অবশ্যই সুশিক্ষিত সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন।" ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ নাই। কিন্তু সমালোচক মহাশয় স্বয়ং "ভারতীর" সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছেন,—"নারী তাঁহারই পদতলগতা গললগ্নীকৃতবাসা সাচ্ছাদিতা সালঙ্কৃতা" ইত্যাদি। বোধ করি, শেষ তিনটি শব্দকে রক্ষা করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন ব্যাকরণ নাই! অন্যকে বিনামূল্যে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে 'নিজের চরকায় তেল দিলে' ভাল হইত না?

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান—"ভিখারী"। কবিবর কি সম্প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি অভিমান করিয়া হেঁয়ালি-উপদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ বিচিত্র অমর সঙ্গীতে বঙ্গভূমির কবিকুঞ্জ মুখরিত, তাঁহার সঙ্গীত-শিল্পের কি এই ক্রমবিকাশ? স্বাক্ষরের স্থলে রবীন্দ্র বাবুর নাম না থাকিলে, গানটি রবীন্দ্র বাবুর রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না। শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্রশেঠের "রাজা রামানন্দ রায়" অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশধর রায় "ভুগর্ভে"র পরিচয় দিয়াছেন। নববর্ষে "উৎসাহের" উন্নতির আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,—"যথা পূর্ব্বং তথা পরম্।"

হিন্দু পত্রিকা। বৈশাখ। এই সংখ্যায় "হিন্দু পত্রিকা"র পঞ্চম বর্ষ আরব্ধ হইল। "ভাষাপরিচ্ছেদ" দুই তিন পৃষ্ঠামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এত অল্প মাত্রায় প্রকাশিত হইলে কত দিনে শেষ হইবে? "হিরণ্ময় পুরুষ", "মায়াবাদ" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি আলোচনার যোগ্য।

হিন্দু-পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ। "বিষয়ীর অনুতাপ" একটি পদ্য; এক জন বিষয়ী পদ্যে অনুতাপ বা নাকি সুরে ক্রন্দন করিতেছেন! "হিন্দু-পত্রিকা"র এ বিড়ম্বনা কেন? "পরিব্রাজক সূক্তমালা"য় সুখতত্ত্বনিরূপণের চেষ্টা আছে।

ধর্ম্ম-প্রচারক। ২১শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। বহুকাল পরে অন্নাপূর্ণার চিত্রমণ্ডিত "ধর্ম্ম-প্রচারক" দেখিয়া কৃষ্ণানন্দ স্বামীকে মনে পড়িল! স্বামীজি চূর্ণ হইয়া যান, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান এখনও বিদ্যমান। এই সংখ্যায় "যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা"র অনুবাদে ব্যভিচারবিষয়ক দণ্ডের ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। মেকলে এখন এ বিষয়ে মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদির স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং ব্যভিচারবিশেষে শতপণাদি দণ্ডের ব্যবস্থা বিলুপ্ত ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন শাস্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা "ধর্ম্ম-প্রচারকের" অবিদিত নাই! তবে এখন আর এই কুৎসিত বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনায় ফল কি?

তত্ত্বমঞ্জরী। দ্বিতীয় ভাগ; প্রথম সংখ্যা। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশাদি প্রচার করা তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।" মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ দেবকে 'অবতার'-রূপে যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই।—কিন্তু পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী সকলের পক্ষেই পথ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তত্ত্বমঞ্জরী। দ্বিতীয় সংখ্যা। এই সংখ্যায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব" প্রবন্ধে পরমহংসদেবের বিষয়বিতৃষ্ণার পরিচায়ক দুই একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা। বৈশাখ। এই সংখ্যায় এই সাম্প্রদায়িক পত্রের সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত ও অষ্টম বর্ষ আরব্ধ হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের ও বৈষ্ণব সাহিত্যের

প্রচারের জন্য, এই পত্রের অভ্যুদয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশের যোগ্যতার আমাদের সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য যে যথেষ্ট উপকৃত, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। "বাসুদেব ঘোষের পদাবলী", "উড়িয়া ভাষায় গৌরসঙ্গীত", "শ্রীখণ্ডের বলরাম দাস" প্রভৃতি প্রবন্ধের আলোচনায় প্রাচীনকাব্যরসপিপাসু পাঠক তৃপ্ত হইবেন।

সৎসঙ্গ। পঞ্চম ভাগ, বৈশাখ; জ্যৈষ্ঠ। "সৎসঙ্গ" পূর্ব্বে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হইত। মধ্যে বহু দিন "সৎসঙ্গের" দর্শন পাই নাই। এক্ষণে বীরভূম জেলার কীর্ণাহার গ্রাম হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "রামকেলী" পাঠযোগ্য; গ্রামবিশেষের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় "বীরভূম" প্রবন্ধে উক্ত জেলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচলিত গল্পে ও প্রবাদে প্রবন্ধের কলেবর পরিপূর্ণ না করিয়া, ঐতিহাসিক তত্ত্বের নির্ণয়ে অধিকতর মনোযোগী হইলে প্রবন্ধটি আরও মনোজ্ঞ হইতে পারে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত "বৌমা" নামক একখানি তথাকথিত প্রহসনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "হিঁদুয়ানি"র প্রচার করিতেছেন। এই পরম হিন্দু সমালোচক বঙ্গসমাজে ও বঙ্গসাহিত্যে "সীতা" ভিন্ন আর কিছু দেখিতে চান না;—দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গসমাজে যে সীতার সঙ্গে শূর্পণখাও আছে, তাহাও তাঁহার ধর্ম্মদৃষ্টির অগোচর। ইঁহার মতে, বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত নারীচরিত্রই সীতার ছাঁচে ঢালা চাই; নহিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর! বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত "বিমলা", "শৈবলিনী" প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্র দেখিয়া ইনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছেন! গোবিন্দ বাবু অন্যত্র 'রুদ্রাক্ষমালা'র অনুসন্ধান করিবেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহাদের জন্য তাঁহার মুক্তার মালা গাঁথিয়া যান নাই।

প্রতিনিধি। তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। বৈশাখ; জ্যৈষ্ঠ। দুই বৎসর প্রকাশিত হইবার পর "উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি" নামক একখানি কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। এক্ষণে তাহাই "প্রতিনিধি" নামে পুনঃপ্রচারিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্তের রচিত "শ্রীচৈতন্যের কবিত্ব" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। লেখক বলেন, "গোস্বামী প্রভুগণের নিকট শুনা যায়, মহাপ্রভুর রচিত 'শ্রীগোপালচরিত্র' তাঁহার বাল্যকালের গ্রন্থ।" সময়ে সময়ে চৈতন্যদেব সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকরচনা করিতেন; প্রবন্ধলেখক তন্মধ্যেও দুই চারিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপসংহারে লেখক বলেন, "তিনি 'শিক্ষাষ্টকং' নামে আটটি শ্লোক লোকশিক্ষার জন্য রচনা করিয়াছিলেন। * * * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচলবাসকালে অধিকাংশ সময় কাব্যরসাস্বাদনে অতিবাহিত করিতেন। মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তখনই তাহা ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করিয়া পারিষদ ও অনুচরগণকে শুনাইতেন। * * * বোধ হয় এই সময়েই শ্রীভাগবতাষ্টকং, শ্রীকিশোরাষ্টকং, শ্রীবিশ্বমোহনাষ্টকং, শ্রীবিষ্ণুনৃত্যাষ্টকং, শ্রীপ্রেমরসায়নং, শ্রীরাধারসমঞ্জরী, শ্রীজগন্নাথাষ্টকং, শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশত নাম প্রভৃতি কবিতা তাঁহার শ্রীমুখারবৃন্দ (শ্রীমুখারবিন্দ?) বিনিঃসৃত হইয়াছিল।"

বীণাপাণি। পঞ্চম খণ্ড; প্রথম সংখ্যা। "সীতারাম রায়" শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। সীতারাম সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, আলোচ্য প্রবন্ধে তদতিরিক্ত কোনও অভিনব বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই। তবে এ পুনরুক্তি কেন?

বীণাপাণি। দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের "মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য" ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" আদ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। "বীণাপাণি" আবার তাহা পুনঃপ্রচারিত করিতেছেন কেন?

পুণ্য। ফাল্গুন ও চৈত্র। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "যৌবন-বিবাহ" আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দক্ষিণ দিক" প্রবন্ধটি গবেষণাপূর্ণ। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তানসেনের বিবাহ" সুখপাঠ্য। লেখক এইরূপে ক্রমে ক্রমে তানসেনের জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ করিলে, ভাষার চিরস্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সন্দেশ" ভাষাতত্ত্বের একদেশের আংশিক আলোচনা। "জলপথে কাশীযাত্রা" একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত;—যদিও রচনায় শিল্পচাতুরী নাই,—কিন্তু বিষয়টি অভিনব,—কৌতুকাবহ। পরিমাণবৃদ্ধি করিলে মন্দ হয় না। "পুণ্যে" তিন চারিখানি চিত্র আছে; আমরা চিত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ; কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে মনে হয়, একখানিও সাধারণের চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে না।

মুকুল। চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। নববর্ষে মুকুলের সমুজ্জ্বল বেশ ও সুন্দর শ্রী দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বিচারপতি বিহারীলাল গুপ্ত ও লোকান্তরিত সৈয়দ আহম্মদ, এই দুই জনের চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। উভয়ের জীবনচরিত হইতে "মুকুলের" বালকগণ শিক্ষালাভ করিবে। "বাঙ্গালীর বীরত্ব" প্রবন্ধে ঢাকার শ্যামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও তাঁহার বাঘের সহিত খেলার সচিত্র বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া বালক পাঠকগণের সহিত বয়স্কেরাও আনন্দ লাভ করিবেন। "কাজের ছেলে" নামক সচিত্র কবিতাটি বেশ হইয়াছে। "পশুবুদ্ধি" প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য; কিন্তু ভাষা সুখবোধ্য নহে। আশা করি, "মুকুল" উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অভাব মোচন করিতে পারিবে।

শিক্ষা। প্রথম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা। চৈত্র। একখানি ক্ষুদ্র পত্র—প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দেখি নাই, এবং এই চৈত্র সংখ্যার পর আর পাই নাই। বোধ হয়, এই পত্রিকাখানি শিক্ষার্থী ছাত্রগণের জন্য কল্পিত। "শিক্ষা"র প্রবন্ধের দৈন্য দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি।

নির্ম্মাল্য। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ। ভবানীপুর হইতে নূতন প্রকাশিত হইতেছে। সুপাঠ্য প্রবন্ধের যেমন অভাব, কবিতার তেমনই প্রাদুর্ভাব। "৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়" একটি কবিতা, অগ্রজের স্মরণার্থ "তবানুজ" শ্রীযুক্ত হরকুমার মুখোপাধ্যায় "মেজো দাদা গো আমার" ধুয়া ধরিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছেন। যেখানে মৃতের নাম সংযুক্ত, সেখানে স্বভাবতঃই সমালোচনা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা নীরবে এই কবিতার অত্যাচার সহ্য করিলাম। কিন্তু রমণীমোহন বসুর ধৃষ্টতা ও নীচতা অমার্জ্জনীয়। এই ব্যক্তি বঙ্কিম বাবুর একটি কবিতার কিয়দংশ নকল করিয়া "প্রিয়তমের প্রতি" শিরোনাম দিয়া নিজের রচনা বলিয়া মুদ্রিত করিয়াছে! এমন 'দিনে ডাকাতি' প্রায় দেখা যায় না।

প্রদীপ। বৈশাখ। "বিদায়" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান। গানটির ধুয়া—"সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে!" 'বাঁধন ছিঁড়িবার' আগেও তদুপলক্ষে গান বাঁধিতে হয়—কবিজননী বঙ্গভূমির এমনই সরস বাতাস! শ্রীমতী রাধারমণি দেবীর "শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি" গল্পটি মন্দ নহে। "রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের" চিত্রখানি সুন্দর; জীবনবৃত্তান্ত যদিও অসম্পূর্ণ, তথাপি সুপাঠ্য।

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "নবদ্বীপ" নামক কবিতাটিতে করিয়ের সহিত বিদ্রূপ মিশ্রিত করিবার চেষ্টা আছে। কবির চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, মনে হয় না। "আজকালকার স্কুলের ছেলেরা" শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসীর রচিত, আলোচনার যোগ্য। "সর্ সৈয়দ আহম্মদ খাঁ" প্রবন্ধটি পাঠ্যযোগ্য। চিত্রখানিও মন্দ নহে।

ভানুমতী।

৩।—অনাথা।

কয়েক দিন হইতে বড়ই গরম পড়িতেছিল। শরৎকালে এমন গ্রীষ্ম কেহ কখনও অনুভব করে নাই। সে উত্তাপও কেমন এক রকমের। প্রকৃতির কেমন এক প্রকার নির্ব্বাত নিষ্কম্প ভাব। বসুন্ধরা যেন কি এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রতপ্ত বাষ্পাকীর্ণা। সমুদ্রে সামান্য হিল্লোলমাত্র লক্ষিত হইতেছিল না। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময়ে, অনাথনাথ যেন স্থানে স্থানে গন্ধকের গন্ধ পাইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে মেঘ হইতেছিল। বেলা প্রহরাতীত হইলে সমুদ্রগর্ভ হইতে যেন ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর মেঘ উঠিতে লাগিল। এবং কেমন লিক লিক করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল। তিনি সেই ঋতুনুচিত গ্রীষ্ম অনুভব করিয়াই একটি দুর্য্যোগের আশঙ্কা করিতেছিলেন। এখন এই মেঘ দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল। অতএব এই মেঘের গতিক না বুঝিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন না, স্থির করিয়া, তিনি এক জন ভৃত্যের দ্বারা সেই বালিকা ও শিশুটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেদেনী নৌকায় ফিরিয়া ইতিমধ্যে তাহার মধুময় চরিত্রের আর একটি পালা অভিনয় করিতেছিল। অনাথনাথ ভানুমতীকে ২৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আরও কিছু বেশী চাহিতে বেদেনী তাহাকে অপূর্ব্ব মুখ-ভঙ্গী করিয়া, এবং তাহার কোটরস্থ চক্ষু ঠারিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিল। বালিকা কি যে করুণ স্নেহদৃষ্টিতে অনাথনাথের মুখের দিকে চাহিয়া হাত পাতিয়া রহিয়াছিল, সে ইঙ্গিত লক্ষ্য করে নাই, কিংবা তাহার অর্থ বুঝে নাই। এই অপরাধে নৌকায় ফিরিয়া সে আর এক প্রস্থ মার খাইয়াছে। বেদেনী,—"পোড়ামুখি! দেখিলি না বাবুটি বোকা। ॥০ গণ্ডার জায়গায় ২৲ টাকা দিল, তাহার উপর আবার ২৲ টাকা বকসিস্; চাহিলে আরও কিছু দিত। বোকা না হইলে কি বাজি দেখিয়া চখের জল ফেলে?" এই বলিয়া তিনি আবার শয্যা লইলেন। বালিকা চক্ষু মুছিয়া শিশুটির হাত ধরিয়া খাদ্য আনিতে বাজারে যাইতেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল। বেদেনীর মেজাজের আগুনে যেন জল পড়িল। সে বুঝিল, বোকা বাবুটির কাছে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। তখন সাদরে বালিকাকে বলিল,—"মা! তোরা যা। আমি বাজার করিতে যাই-

তেছি, কিন্তু বাবু হইতে আরও ২৲টি টাকা না লইয়া ফিরিস না। বাবু বড়লোক।”

বালক বালিকার সজল চক্ষু যেন আনন্দে হাসিল। তাহারা দুই জনে বাবুর বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে যে করুণা, যে দয়া ও যে স্নেহ দেখিয়াছিল, এমন তাহারা দেখে নাই। এমন স্নেহপূর্ণ মধুর কথা তাহারা শুনে নাই। তাহারা আবার তাঁহাকে দেখিবে, আবার তাঁহার কথা শুনিবে, অতএব তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বজরার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার বহুমূল্য সজ্জায় প্রথম তাহাদের চক্ষে ধাঁধা লাগিল। অনাথনাথ তাহাদের গায়ে হাত দিয়া কতই আদর করিলেন। তাহার পর তাঁহার স্ত্রী,—তাহারা ভাবিল, “ইনি কি মানুষ?” তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপ্রতিমা। মাতৃস্নেহ যেন তাঁহার মুখ হইতে জোৎস্নার মত ঝরিতেছে। এমন সুন্দরী, এমন স্নেহশীলা, তাহারা কখনও দেখে নাই। তিনি তাহাদিগকে একেবারে বুকে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। দরিদ্র বেদের ছেলে মেয়েকে এত দূর দয়া, এত দূর স্নেহ কি মানুষে করিতে পারে? তাহার পর তাঁহাদের একটি পুত্র,—সেটি কি ছেলে, না শরৎকালে প্রভাতকিরণ-মণ্ডিত কুসুমরাশি? তাহার সেই আয়ত চক্ষু, সরল স্নেহ-ভরা মুখ এবং সর্ব্বশেষ তাহার সেই মধুর কথা! সে তাহার পিতার একটি ক্ষুদ্র প্রতিচিত্রের মত। সে একেবারে ছুটিয়া আসিয়া বালিকার গলা জড়াইয়া তাহার কোলে বসিয়া কত মধুমাখা কথায় তাহার বাজির প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার নাম অমিয়। উভয়ের একই বয়স। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। অনাথনাথের পুত্রের খেলার ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। দুই শিশু চির-পরিচিত বন্ধুর মত খেলিতে লাগিল। শিশুর মত সরল সমদর্শী বুঝি মহাযোগীও নন। তাই বুঝি মহর্ষি খৃষ্ট বলিয়াছেন,—

“দেও ওই শিশুদের আসিতে নিকটে মম!
স্বর্গ রাজ্য তাহাদের, যারা শিশুদের সম।”

নৌকাতে নানাবিধ খাদ্য ছিল। অনাথনাথের পত্নী বড় আদরে দুটিকে খাওয়াইলেন। তাঁহাদের দুজনের দয়া তাঁহাদের জমিদারিতে প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রজাদিগকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাহাদের সুখে সুখী, তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন, এবং দুঃখের উপশম করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে দেবতার মত পূজা করিত।

এই দরিদ্র দেশে প্রজা-ভূম্যধিকারীর এই সম্পর্ক নিয়ম ছিল। এখন জটিল আইন ও আইন-ব্যবসায়ীদের কল্যাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া উঠিলেও, এখনও দুই এক স্থানে, বিশেষতঃ বুনিয়াদি জমিদারে, দৃষ্ট হয়।

বালক বালিকা আহার করিলে অনাথনাথ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমার নাম কি?”

উত্তর। ভানুমতী।

প্রশ্ন। তোমার অন্য কোন নাম নাই?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। এই বেদে কি তোমার পিতা?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তোমার পিতা তবে কে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তোমার মাতা কে?

উত্তর। জানি না।

বালিকা অধোমুখে অতিশয় করুণ বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিতেছিল।

প্রশ্ন। তুমি কোথায় ইহাদের সহিত মিলিত হইলে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তুমি কেন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে?

উত্তর। অদৃষ্ট।

অনাথনাথ শুনিলেন, বালিকা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নে বালিকার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়াছে, এবং তাহার মনে গভীর শোকের সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার পত্নীর নয়ন সজল হইল। অনাথনাথ আর তাহার পরিচয় লইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে একটি গান গাইতে বলিলেন, এবং নিজে হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন।

বালিকা। কি গাইব বাবা?

অনাথ। তুমি কি কীর্ত্তন জান মা?

উত্তর। জানি।

বালিকার বাবা সম্বোধনে অনাথনাথের কর্ণে, এবং তাঁহার মা সম্বোধনে বালিকার কর্ণে যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল। দুটি প্রাণ যেন সেই অমৃতের

সঙ্গে দ্রবীভূত, মিশ্রিত হইয়া গেল। বালিকা হারমোনিয়মের সঙ্গে অতি কোমল করুণ কণ্ঠে স্থানীয় কবি ত্রিপুরাচরণ রায়ের একটি গীত গাইতে লাগিল,—

১

বাছারে জীবন জুড়ানে! এস বস কাছে!
বেঁধেছি ধড়া চূড়া,
ও বাপ! গোঠের বেলা ব'য়ে গেছে।

২

বেণুর স্বরে ডাকছে বলাই,
আয় আয় আয়রে কানাই,
তুই বিনে যে যায় না রে গাই!
তোর পানে চেয়ে আছে।

৩

বাছারে! তোর মার মাথা খা,
গহিন বনে যাস্‌নে একা।
তুই বিনে প্রাণ যায় না রাখা,
তোর মুখ দেখে বাঁচে।

মাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাসে অনাথনাথের পত্নীর নয়ন অশ্রুজলে ছল ছল করিতে লাগিল। অনাথনাথ বলিলেন, "তুমি মা পদাবলী জান?"

উত্তর। জানি।

হারমোনিয়মে মধুর পদাবলীর প্রাণদ্রবকরী সুর বাজিয়া উঠিল। বালিকা তাহার সঙ্গে কণ্ঠ আরও কোমল, আরও করুণ করিয়া, গাইতে লাগিল,—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল। ইত্যাদি।

এবার অনাথনাথের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। গীত শেষ হইলে তিনি আত্মহারা হইয়া বজরার গবাক্ষপথে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ গীত যে প্রেমের উচ্ছ্বাস, সে অনন্ত প্রেম-সমুদ্র যেন তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার সরলা পত্নী পদাবলীর এই উচ্চ

প্রেমের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মাতৃপ্রাণে মাতৃপ্রেমের সরল ভাব প্রীতি প্রদান করিত। তিনি বলিলেন, "মা! তুই শ্যামা বিষয়ের গান জানিস?" বালিকা এক একবার তাঁহার মাতৃপ্রেমপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, এক একবার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, গাইতে লাগিল,—

মা! আমি তোর কি করেছি?
শুধু তোরে জনম ভরে মা বলে মা ডেকেছি।
চিরজীবন পাষাণীরে!
ভাসালি আঁখি-নীরে,
চিরজীবন দুখানলে দহেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে
চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
আমারে ত কোলে তুলে নিলি না;—
মা হারা শিশুটির মত,
কেঁদে বেড়াই অবিরত,
নয়নের জল মুছায়ে ত দিলি না,—
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে,
যদি মা, তোর জুড়ায় হিয়ে,
ভাল ভাল তাই তবে হোক, অনেক দুঃখ সয়েছি।

বালিকা তাহার করুণ কণ্ঠে চিত্তদ্রবকরী মূর্চ্ছনা খেলাইয়া তাঁহার মুখের দিকে কাতর ছল ছল বিস্মিত নয়নে চাহিয়া "মা" বলিয়া গাইতে ছিল। অনাথনাথের পত্নীর হৃদয় মাতৃপ্রেমোচ্ছ্বাসে আকুল হইল। তাঁহার ফুল্ল-কোকনদসন্নিভ কপোল বাহিয়া দুই প্রেমধারা বহিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে তিনি ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "মা! আমি তোর মা। আমি তোকে বুকে বুকে রাখিব, তোকে মেয়ের মত রাখিব, তুই আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবি না।" বালিকাও কাঁদিতে লাগিল।

অনাথনাথেরও অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বেদে শিশুটিও সজল চক্ষে তাঁহার পত্নীকে বলিল,—"মা! তুমি দিদিকে লইয়া যাও। দিদির বড় দুঃখ। দিদিকে মা বড় মারে।"

বালিকার মাথা অনাথনাথের পত্নীর বুকে। বালিকা শিশুটিকে বক্ষে লইয়া বলিল,—"হাঁরে গোপাল! তুই আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি?"

উত্তর। পারিব। তুমি ত আর মার খাইবে না। এই মা যে এমন করিয়া তোমায় আদর করিবে।”

অনাথনাথের শিশুও এমন সময়ে গোপালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া ও সস্নেহে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল,—

“গোপালও যাইবে, আমার সঙ্গে খেলিবে, আমাকে বাজি দেখাইবে। আমিও তোমাকে গোপালের মত আদর করিব। কেমন দিদি! যাইবে? বল, যাইবে!”

বালিকা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ বহুবার চুম্বন করিল, এবং তাহার চক্ষের জলে সে ক্ষুদ্র মুখখানি সিক্ত গোলাপ ফুলটির মত করিয়া তুলিল।

অনাথনাথের পত্নী আবার বলিলেন—“সত্যি মা! তুই যাবি?”

বালিকা অঞ্চলে নয়নের জল মুছিয়া বলিল, “মা”—সেই মা সম্বোধনে যে কি মধুরতা, কি প্রাণের অবেগই ঢালিল। বলিল, মা! এমন করুণাসাগর দেবদেবীতুল্য পিতা মাতা পাইব, তাঁহাদের চরণ সেবা করিব, অভাগিনীর পক্ষে ততোধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? কিন্তু মা, এই অন্ধ পিতার ও পাগলী মাতার উপায় কি হইবে? তাহাদিগকে এ সাগরে ভাসাইয়া কেমন করিয়া যাইব?

অনাথনাথ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—“কি! বাজিকর অন্ধ!”

বালিকা বলিল, “অন্ধ। অভ্যাসবশতঃ তিনি এমন কঠিন বাজি সকল এমন সুচারুরূপে করেন।”

৪—রণরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা। আকাশমণ্ডল
ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ ঘোরতর,
উঠিতেছে সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্তাল
মেঘের পশ্চাতে মেঘ; মহাদৈত্য মত,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে বেগে।
মহাকালী প্রকৃতির যেন মহাসেনা
ছুটিয়াছে মহাহবে প্রচণ্ড বিক্রমে।
কি যেন ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লব ভীষণ
আসন্ন করিতে বিশ্ব দলিত পেষিত!

অল্প অল্প বৃষ্টিধারা; থাকিয়া থাকিয়া
সবেগে বহিছে বায়ু উড়াইয়া ধরা;
ছুটাইয়া বেগে সিন্ধুগর্ভে ঘোরতর
কৃষ্ণমেঘছায়াচ্ছন্ন তরঙ্গের পর
তরঙ্গ বিশালতর লহরে লহরে।
স্তম্ভিতা প্রকৃতি-বক্ষে কি যেন উচ্ছ্বাস,
ঘোর বিশ্বসংহারক হইতে নির্গত
চাহিতেছে মহাবাতে মহা বরিষণে,
সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, ভীষণ গর্জ্জনে।

অমিয়কে কোলে লইয়া অনাথনাথের পত্নী একটি গবাক্ষের কাছে বসিয়া বিস্তৃতনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। অনাথনাথও বিস্তৃতনয়নে অধোমুখে গম্ভীরভাবে বজরার বক্ষে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া গবাক্ষপথে চাহিয়া, পত্নীর সঙ্গে কি গুরুতর পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই যে প্রকৃতির সেই ভীষণ ভাব অবলোকন কি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা বোধ হইল না। বজরা যে তরঙ্গাঘাতে টলিতেছিল, সেই টলন যে তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন, কি সেই তরঙ্গাঘাত যে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, এমন বোধ হইতেছিল না। শিশু অমিয়ও যেন তাহার কিছুই বুঝিতেছে না। সে কেবল তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া একবার তাঁহাকে বলিতেছিল, “হাঁ মা! উহাদিগকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল।” অন্যমনস্কা জননীর কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া আবার কাতরভাবে তাহার পিতাকে বলিতেছিল, “হাঁ বাবা! তুমি উহাদের সঙ্গে লইয়া চল, উহাদের বড় দুঃখ।” কিন্তু কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন? অজ্ঞাতকুলশীলা একটি বালিকাকে লইয়া গিয়া কি করিবেন? সে কি তাহার উপস্থিত জীবন ছাড়িয়া অন্য জীবন গ্রহণ করিবে? তাঁহারা কি তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন? বালিকাটিই বা কে? তাঁহারাও এই বিষয়েই পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রকৃতির বক্ষের মত তাঁহাদের হৃদয়ও কি এক অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন অশ্রুতে এবং আবেগতরঙ্গময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে চেষ্টা পাইতেছিল। শেষে একটি পরামর্শ স্থির করিয়া সেই বেদে ও তাহার প্রেমময়ী ভার্য্যাকে ডাকাইলেন। তখন দর্শকগণ চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।

বেদে প্রৌঢ়, দেখিতে যেন ভালমানুষ; আর বেদেনী তাহার ঠিক বিপরীত। তাহার গোবরে বর্ণ, স্থূল অঙ্গ, চক্ষু কোটরস্থ, নাসিকা বিপুল, কিন্তু অগ্রভাগের উপর দিয়া যেন কি একটা বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মুখের এমনি এক বিকট ভঙ্গী যে, বজরার মধ্যে অমিয় তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার মায়ের কোলে লুকাইল।

অনাথনাথ বেদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভানুমতী কি তোমার মেয়ে?"

সে উত্তর করিল, "না।"

বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া, বেদেনী তাঁহার প্রতি বড় প্রসন্না হইয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, বোকা বাবুটির তাহার ছেলে মেয়ের উপর একটা ভালবাসা হইয়াছে। তাহার সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধি। অনাথনাথের প্রশ্নমাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে, ভানুমতীর উপর অনাথনাথের বিশেষ চক্ষু পড়িয়াছে, এবং তিনি তাহাকে কোনরূপ বিশেষ আনুকূল্য করিবেন। সে যদি তাহার কন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারে, কিংবা তাহার উপর কোনরূপ বিশেষ অধিকার দেখাইতে না পারে, তবে সে সেই আনুকূল্যের ভাগ পাইবে না। অতএব সে বেদের উত্তরে মহা চটিয়া গেল। তাহার মেজাজটা স্বভাবতই পঞ্চমে বাঁধা থাকে, উহা একেবারে সপ্তমে উঠিল। সে সেই অপূর্ব্ব সানুনাসিক স্বরে তাহার অযোগ্য স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আহাম্মকের কথা শুন! তোর মেয়ে নয় ত কার মেয়ে রে?" তার পর অনাথনাথের পালা। সে তাঁহার দিকে তাহার বিকট মুখ ফিরাইয়া এবং তাহার একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিল, "আমার মেয়ে নহে ত কি তোমার মেয়ে? তোমার কথা শুনে যে গা জ্বালা করে।" তাহার পর আবার হতভাগ্য স্বামীর পালা—"কাণা না হ'লে কি এমন কথা বলে?" তাহার পর সে বুঝিল যে, কেবল তিরস্কার করিলে বাবু বিশ্বাস করিবেন না। 'আহম্মক' স্বামীর উত্তরটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তখন সে বলিল, "বাবু! তুমি ইহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ওর বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, তাতে আবার কাণা। এই যে চোখ দেখছ, এতে কিছুই দেখিতে পায় না। আমি হাড় কালী করিয়া, খাটিয়া, উহাকে খাওয়াই, তাহাতে উহার চলে। ও 'না' বলিল কেন, তা জান? মেয়েটি আমার পূর্ব্ব স্বামীর। তাই ওর মেয়ে নয় বলিয়াছে।" তখন আবার স্তম্ভিত স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওকে আপনার মেয়ে বলিতে যেন ওঁর লজ্জা হয়, পোড়া কপাল আমার! আমি এমন কাণার হাতেই পড়িয়াছি। আমার শরীরটা জ্বলিয়া

কাল হইয়া গেল।" ক্রমে সানুনাসিক স্বর বর্দ্ধিত হইয়া কৃত্রিম রোদনে পরিণত হইল, এবং অঞ্চলের দ্বারা কোটরস্থ চক্ষু দুটি মার্জ্জিত হইতে লাগিল।

অনাথনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কই, মেয়েটি ত তোমাদের মেয়ে—বলিল না। সে ত বলিল, তাহার মা বাপ কে, সে জানে না।"

একেবারে শিমুলস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বেদেনী ক্রোধে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কি! সেও আমার মেয়ে বলিয়া বলে নাই! তারও আমাকে মা বলিতে লজ্জাবোধ হয়, পোড়ার মুখী! আমি আসি, তুই কোন্ বাদশাজাদী, আমি এখনই ঝাঁটার চোটে পরিচয় লইব।"

রমণীরত্ন উঠিয়া যাইতেছিলেন, অনাথনাথ যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বভাবের সহিত বলিলেন, "যাইও না, ব'স! তুমি সকাল হইতে মেয়েটিকে দু'বার মারিয়াছ।"

সেই কণ্ঠ শুনিয়া ও সেই কর্ত্তৃত্বভাবাপন্ন মুখ দেখিয়া, সে কিছু ভীত হইল, এবং বসিয়া বলিল, "মারিব না? মারিব না? এমন পোড়াকপালী মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলাম। আমাকে যেখানে সেখানে গাল খাওয়ায়—ওর জন্যে আমার যেখানে সেখানে গঞ্জনা।" বেদেনী সানুনাসিক স্বরে কাঁদিতে লাগিল, এবং চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অনাথনাথের পত্নী মনে করিলেন, অভাগিনী যে পোড়াকপালী, তাহার আর সন্দেহ নাই। এমন দেবীতুল্য মেয়ে না হ'লে এমন পাপিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে?

কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া অনাথনাথ আবার সেইরূপ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার মেয়ে হউক, আর যার মেয়ে হউক, মেয়েটিকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি আমার বড় স্নেহ হইয়াছে। মেয়েটিকে আমাকে দিতে হইবে; তোমরা টাকা চাও টাকা দিব, জায়গা চাও, আমার এ জমিদারীতে জায়গা দিব। বাড়ী ঘর করিয়া দিব,—তোমরা যাহাতে আর এ ব্যবসা না করিয়া, এক জন ভাল গৃহস্থের মত থাকিতে পার।"

বেদে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে মেয়েটিকে বড় ভালবাসিত! অনাথনাথ জমিদার। তিনি মেয়েটিকে যখন এরূপ করিয়া চাহিতেছেন, তখন তাহাকে কত সুখেই রাখিবেন! তাহার নিজেরও বাড়ী, ঘর, জায়গা জমী করিয়া দিবেন। অন্ধের প্রতি ইহার অপেক্ষা দয়া আর কি

হইতে পারে? সে আনন্দে অধীর হইল, এবং কৃতজ্ঞতাসূচক গদ গদ কণ্ঠে বলিল,—"অন্ধ ভিখারীর প্রতি বাবুর এই দয়া! বাবুকে ঈশ্বর আরও বড়মানুষ করুন! বাবুর সোনার কলম, রূপার দোয়াত হউক!" তাহার আর বাক্য সরিল না।

বেদেনীও হাতে চাঁদ পাইল। সে বাবুটিকে আরও বোকা সাব্যস্ত করিল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এ চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, সোণার চাঁদ করিতে হইবে। "সে রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—ভাল দয়া! আমার পেটের মেয়েটি, আমার সাত রাজার ধনটি, এঁকে দিব, আর উনি আমাকে একটা ঘর আর একটু জমী দিবেন। কাজ নাই ওঁর দয়ায়। আমরা গরিব মানুষ, গতর খাটাইয়া খাইব। আমার মেয়ে থাকিলে আমি বাজি করিয়া কত টাকা পাইব! আমি লাখ টাকা পাইলেও আমার মেয়ে দিব না।" এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

অনাথনাথ বুঝিলেন, এ সহজ পাত্রী নহে। তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপে চলিবে না। তখন তিনি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া ক্রোধাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "বটে! তবে আমি তোকে লাখ টাকা খাওয়াইতেছি। তোর মত পাপিষ্ঠার এরূপ কন্যা কখনও হইতে পারে না। ভানুমতী আমাকে নিজে বলিয়াছে, তাহার পিতা মাতা নাই। আমি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইব।"

বেদেনী এত ক্ষণে বুঝিল, লোকটা তত বোকা নহে। আরও বুঝিল যে, গতিকটা ভাল নহে। আর ভানুমতীকে তাহার কন্যা বলিলে চলিবে না। তখন সে পটপরিবর্ত্তন করিয়া বড় প্রসন্নমুখে বলিল, "বাবু আপনি বড়লোক; আপনি রাগ করিবেন না। আসল কথা—মেয়েটি বড় সুন্দরী দেখিয়া বাজি শিখাইবার জন্যে অনেক টাকা দিয়া এক জন বৈরাগীর কাছ থেকে আমার পূর্ব্ব স্বামী কিনিয়া লইয়াছিল। আমার টাকার কি হইবে?"

অ। কত টাকা?

বে। ঢের টাকা।

অ। কত?

বে। ৫০০৲ টাকা।

অ। বেশ কথা; আমি তাহা দিব।

বে। তার পর তাহাকে এই ২০ বৎসর খাওয়াইয়াছি,—পরাইয়াছি। আমার সে খরচের টাকা কে দিবে?

অনাথনাথ এবার একটুকু হাসিলেন; কারণ মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। তথাপি তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাও আমি দিব।"

বে। তার পর এই ২০ বৎসর তাহাকে বাজি শিখাইয়াছি। আমার সে টাকা কোথায় পাইব?

অনাথনাথ তাহার জন্যেও টাকা দিতে স্বীকার করিলেন।

বে। তার পর সে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া বাজি করিলে—সে আরও ৩০ বৎসর বাজি করিতে পারিবে,—সে টাকাটা একবার হিসাব করিয়া দেখ।

অনাথনাথ তাও একটা হিসাব করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বে। তার পর এ সব টাকা আমাকে দিতে হইবে। তাহার উপর অন্ধকে দয়া করিয়া তুমি যেরূপ বাড়ী ঘর ও জায়গা জমী দিবে বলিয়াছ, তাহা তো দিবেই।

এত ক্ষণে এ পাপিষ্ঠার প্রাপ্য তালিকার শেষ হইল দেখিয়া, অনাথনাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল; কারণ তিনি বালিকাকে, এই পিশাচীর হস্ত হইতে, যেরূপে হউক, উদ্ধার করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমুদ্র ও আকাশ ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। বাজরা উলট পালট হইতে লাগিল। আকাশে বিকটাকার ঘনকৃষ্ণ মেঘ-খণ্ডের পর ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড ভীষণ বেগে ছুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে মেঘবিচ্ছেদে আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশের সেই নীলকৃষ্ণ বিচিত্রি আকৃতি এবং ঝড়ের ঘূর্ণ্যমান-ভাব লক্ষ্য করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন যে,—একটা ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা (cyclone), যাহা তিনি ২।৩ দিবস যাবৎ আশঙ্কা করিতেছিলেন, আগতপ্রায়। তিনি ব্যস্ত হইলেন, এবং কাল উপস্থিত কথার একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদিগকে টাকা, বাড়ী ও জমি দিবেন বলিয়া, বেদেনীকে বিদায় করিয়া বলিলেন,—"ঝড় বেশী হইলে তোমরা আমার কাছারীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিও।" তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার বজরার বন্ধনাদি দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শুনিলেন যে, বালিকা তাহার নৌকায় বসিয়া আকাশ-সমুদ্রের সম্মিলনের দিকে চাহিয়া—আর এক জন স্থানীয় কবির রচিত একটি গীত গাইতেছে—

১

কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে,
নাচে কালী রণরঙ্গিনী !
কালী বল, কালী বল,
নাচে কাল-বক্ষে কাল-কামিনী ;
নাচে কালী কাল-কলনী।

২

নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী
নাচিছে প্রকৃতি, করে ধ্বংস-অসি,
ছিন্ন শির, কি রুধির
প্লাবে শ্যাম অঙ্গ শ্যাম-অবনী !

৩

দুই কর লয়, দুই বরাভয়,
—লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,—
সদা শিব, ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

৪

প্রকৃতি উলঙ্গ মাতা বিবসনা,
ললাটে অনল, অঙ্গার-বরণা,
চারি ভুজ, ত্রিনয়ন,
ও মা ! ধ্বংসরূপে সর্ব্বব্যাপিনী।

৫

জরা ব্যাধি আদি বিকৃতা কিঙ্করী,
নাচে রণ-রঙ্গে ধ্বংস-সহচরী,
অট্ট হাস, কি উল্লাস,
ধরা শ্মশানে নৃমুণ্ডমালিনী।

৬

জন্মে চণ্ড মুণ্ড সৃষ্টি-বিবর্ত্তনে,
রক্তে পশুবীজ রক্তবীজ সনে,
কদাকার, দুরাচার
নাশি, সৃজিলে মানব, জননি !

৭

ঘোর অমানিশি, হৃদে ওমা আসি
নাচ রক্তবীজ—কাম ক্রোধ গ্রাসি,
চণ্ড—ক্রোধ, মুণ্ড দ্বেষ,
নাশি, কর, সুর-রাজ্য অবনী।

৫—দুর্গা।

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে প্রকৃত ঘূর্ণবাত্যা (Cyclone) বহিতে আরম্ভ হইল। ঝড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকিয়া থাকিয়া এরূপ বেগে বহিতে লাগিল, এবং তরঙ্গে অনাথনাথের বজরা তীরে এরূপ আহত হইতে লাগিল যে, আর উহাতে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী কাছারি-বাটীতে যাইবেন, স্থির করিলেন ; কিন্তু যাইবেন কিরূপে ? এরূপ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে যে, বজরা হইতে মুখ বাহির করিবার সাধ্য নাই। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঝড়ে বজরার গবাক্ষ উড়াইয়া নিতে লাগিল, এবং ভীষণ বিক্রমে ঝড় বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সম্মুখে বসন বিছানা যাহা পাইলেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা স্ত্রীকে আবৃত করিয়া ও আপনি ক্রোড়স্থ শিশু পুত্র সহ আবৃত হইয়া বজরা হইতে অতি কষ্টে অবতীর্ণ হইলেন, এবং কাছারির দিকে চলিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সাধ্য কি, এক পা অগ্রসর হইবেন ? ঝড় বেগে তাঁহাদিগকে এক দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গায়ের আবরণ ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা বন্দুকের গুলির মত শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, শেষে চলিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিন্ধুগর্জ্জনে ও ঝটিকাগর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন মহাবিক্রমে ধরা প্লাবিত করিতে সিন্ধু ঘোর গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই —এই ৪টা ৩৷৷০ টার সময়ই,—প্রায় চারিদিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। অবিরল বৃষ্টিধারায় যে ক্ষীণালোক আছে, তাহাতেও কিছুই দেখিতে দিতেছে না। তাঁহার ভৃত্য ও মাজিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে

ধরিল, এবং জড়াইয়া লইয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে জড় পদার্থের মত লইয়া চলিল। কাছারি, গ্রাম, পাহাড়, সমুদ্র, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টি এরূপ বেগে পড়িতেছিল যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য ছিল না। চক্ষে যেন কঙ্কর প্রবিষ্ট হইতেছে, ঝড়ের বেগে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেবল গর্জ্জনমাত্র লক্ষ্য করিয়া এবং উহা পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাছারি-বাটী সমুদ্রের তীরে বলিলেও চলে। তথাপি ঝড়ের বেগে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে, তিনি মৃতবৎ পত্নীপুত্র সহ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ আরও শুকাইয়া গেল। কাছারির গৃহ সকল নরনারী ও শিশুতে কোলাহল ও ক্রন্দনধ্বনিতে এরূপ পরিপূর্ণ যে, সেখানে দাঁড়াইবার স্থান নাই, কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি বুঝিলেন যে, প্রজাদের ঘর বাড়ী সকলই পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও তাঁহার মত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কাছারিতে আশ্রয় লইয়াছে। অনাথনাথকে দেখিয়া তাহারা সকলেই প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল, "বাবা! বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের কি উপায় হইবে?" কেহ বলিতেছিল,—"ওরে বাড়ী ঘর যাক্, এখন জান্ থাকিলে হয়।" কেহ—"আমার ছেলে কোথায় গেল," কেহ বা—"মেয়ে কোথায় গেল"—কেহ বা "আমার বুড়া মা বাপ কোথায় গেল"—বলিয়া হাহাকার করিয়া কাছারি হইতে তাহাদের অন্বেষণে উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইতেছে। অনাথনাথের কাছারি ও ছোট ছোট ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে। কেবল কয়েকখানি বড় ঘর আছে, কিন্তু ঝড়ের প্রত্যেক আঘাতে সশব্দে এরূপ কম্পিত হইতেছে যে, তাহাও যে বহুক্ষণ থাকিবে, এমন বোধ হইল না। অনাথনাথ পত্নীপুত্র সহ আর্দ্র বসনাদি ত্যাগ করিয়া ভৃত্যদিগের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া একখানি তক্তপোষের উপর বসিলেন। প্রজাদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া তখন তিনি আপনার বিপদ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম ভাবনা হইল, সেই অনাথা বালিকা ভানুমতীর জন্যে। তিনি বজরা ত্যাগ করিবার সময়ে বেদেদিগকেও কাছারিতে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করাইয়া তাহাদের কোনও খবর পাইলেন না। তিনি সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যদি কেহ সেই বেদেদের কি তাহাদের পুত্রকন্যা দুটিকে এখানে আনিতে পার, আমি ১০০৲ টাকা

পুরস্কার দিব।" কেহই সাহস করিল না। এক জন বলিল—"কর্ত্তা! তাহারা কি এতক্ষণ আছে? কোন্ কালে সে ছোটো নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে।" তিনি ক্রমে পুরস্কারের অঙ্ক বাড়াইলেন। কিন্তু কেহ কলে নীরবে শুনিল। তিনি তখন নিজে যাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে তাহারা বলে ধরিয়া রাখিল। বলিল,—"কর্ত্তা কি পাগল হইলেন? কোথায় কার বেদে, তাহাদের জন্যে আপনার প্রাণটা দিবেন?" তিনি প্রকৃতই আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া, তাঁহার পত্নী পুত্রের সাদনে কর্ণপাত না করিয়া, ছুটিলেন; কিন্তু গৃহের প্রাঙ্গনেই ঝড়ের বেগে এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেন যে, আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহাকে আবার তাঁহার ভৃত্য ও প্রজারা ধরিয়া গৃহে আনিয়া বসন পরিবর্ত্তন করাইল। তিনি বসিয়া, উহাদের কি হইল; কাছারি হইতে দূরবর্ত্তী প্রজাদের কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ৫টার সময় ঝড় ও বৃষ্টির বেগ এরূপ বর্দ্ধিত হইল, এমন অন্ধকার হইয়া উঠিল যে, তাঁহার কণ্ঠ তাহাকে রুদ্ধ হইল।

ঘোর অন্ধকার, ঘোরা নিশীথিনী,
যেন অপরাহ্ণ হইল অমার;
অভ্রান্ত কালের অভ্রান্ত গতিতে
যেন ঘোর ভ্রান্তি হইল সঞ্চার।
ঘোর গরজন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভৈরব বিক্রমে ঝটিকা ঘূর্ণিত;
রহিয়া রহিয়া, আসিছে যাইছে,
আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত।
ভীষণ আঘাত সহিতে না পারি,
হইতেছে যেন ঘন ভূকম্পন;
ঘোর হুহুঙ্কার, ঝড় বৃষ্টি মিলি,
ধরাধ্বংসকারী করিতেছে রণ।
ঝড়ের গর্জ্জন, সিন্ধু-আস্ফালন,
কি ঘোর আরাব উঠিছে ভাসি!
যেন ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী কালী,
নাচিছে তাণ্ডব ঘোর অট্টহাসি।

ঝলকে ঝলকে, সে ভীষণ হাসি,
ঝলসি বিদ্যুতে জলদ-নীলিমা,
ভাসে স্তরে স্তরে, ঘোর কৃষ্ণাকাশে,
দেখাইয়া কিবা ধ্বংসমূর্ত্তি ভীমা।
সমুদ্রের গর্ভে, উঠিছে জ্বলিয়া,
বাড়বাগ্নি মত অনলরাশি ;
রুদ্ধ ক্রোধানল, বক্ষ বিদারিয়া,
বসুধার যেন উঠিছে ভাসি।
সে ভীম আলোকে, বক্ষে জলধির,
কি মহাবিপ্লব দেখায় ভীষণ ;
পর্ব্বত-প্রতিম, কি তরঙ্গমালা,
করিছে ফেনিল সিন্ধু বিলোড়ন !
ঝটিকার সনে, যেন মহাসিন্ধু,
মাতিয়াছে মহা প্রলয় আহবে ;
অসংখ্য কামান, বজ্র সংখ্যাতীত,
গর্জ্জিতেছে যেন অবিরাম রবে।
উচ্চ গৃহাবলী, মহা মহীরুহ,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া তৃণযষ্টি মত ;
পড়িছে অসংখ্য, রথ রথী যেন,
ভৌতিক সংগ্রামে হইয়া হত।
কোথাও পতিত গৃহ, গৃহস্থিত
অনলে হঠাৎ উঠিছে জ্বলিয়া ;
করিছে ঝটিকা, কি কৌতুকক্রীড়া,
অগ্নিশিখা মেঘে মেঘে মাখাইয়া।
ঘন ঘন ঘোর, ঝটিকা-গর্জ্জন,
গুলিধারা মত বৃষ্টিবরিষণ ;
ঘন ভূকম্পন, মেঘ স্তরে স্তরে,
ঘন ঘন স্থায়ী বিদ্যুৎস্ফুরণ ;
মেঘে তরঙ্গিত অগ্নি ঘোরাকাশে,
অগ্নি নীলাম্বুধি-গর্ভে তরঙ্গিত ;

গৃহের পতন, বৃক্ষ-উৎপাটন,
ভৈরব আরাবে বিশ্ব বিলোড়িত।

আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। কালি কালীপূজা। অনাথনাথের কর্ণে ভানুমতীর সেই গীত যেন কি এক ভীম কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

"কি ভীষণরণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই মহামেঘপ্রভা সৃষ্টি-সংহারিণী ধ্বংসরূপিণী মহাশক্তি সৃষ্টি সংহার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন। সেই ঘোর অন্ধকার তাঁহারই বর্ণ। সেই ঝটিকা তাঁহারই গতি ও নৃত্য। ঝটিকার রহিয়া রহিয়া সেই ভীষণাঘাত তাঁহারই অসিপ্রহার। তাঁহারই পদদলনে সিন্ধু বিলোড়িত হইয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। মেঘস্তরে যে আলোক দেখা যাইতেছে, উহা তাঁহার নেত্রানল, এবং বারিধারা তাঁহারই লোলজিহ্বাবিগলিত রুধিরধারা। অনাথ-নাথ বুঝিতে পারিলেন যে, ঘূর্ণবাত্যায় সহস্র সহস্র লোক, সংহারকারিণীর গ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহাকে রুধিরপ্লাবিতা নরমুণ্ডমালিনী সাজাইতেছে। সমুদ্রে ও আকাশে আলোকরাশি দেখিয়া সকলের মনে সমধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ আলোক কিসের, কেহই স্থির করিতে পারিতেছিল না। কয়েক দিবস যাবৎ যেরূপ দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, অনাথনাথ যেরূপ গন্ধকের গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন, এখনও ঝটিকা যেরূপ গন্ধকের গন্ধ বহিয়া আনিতে-ছিল, তাহাতে তাঁহার বোধ হইল, ভূগর্ভস্থ গৈরিকাগ্নি সমুদ্রে নির্গত হইতেছে। আকাশেও তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রজ্জ্বলিত গৃহাগ্নিতে মেঘমালা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হইতেছে। স্থানে স্থানে যেন বিদ্যুদালোকে মেঘস্তর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিতেছে, এবং ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। ৫ টার সময় হইতে ঘোরতর অন্ধকার হইয়া ছিল। ৬ টার সময়ে ঠিক যেন অমাবস্যার নিশীথের মত অন্ধকার হইল ; এবং দক্ষিণ দিক হইতে এরূপ ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল যে, আর তাঁহাদের ঘরে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। যে কাছারি-ঘরে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য বৃক্ষের ২০০ খুঁটি ছিল। কিন্তু তথাপি গৃহখানি প্রত্যেক আঘাতে মড় মড় শব্দে কাঁপিতে লাগিল। প্রত্যেক আঘাতের পর ঝটিকা আবার ঘুরিয়া আসিয়া, যেন বল সঞ্চয় করিতে একটু বিরাম লইয়া, আবার সমধিক বিক্রমে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। যেন থাকিয়া থাকিয়া শত সহস্র মত্ত বারণ গৃহের দক্ষিণ দিকে

এক সঙ্গে আক্রমণ করিতেছে। বাঁশের নিবিড় দৃঢ় বেড়া ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির মত বৃষ্টির ফোঁটা তাঁহাদের গায়ে পড়িতে লাগিল, এবং গৃহে জলপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দারুণ শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশু পুত্রটির জন্যে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু ঘর যেরূপ কাঁপিতেছে, এবং প্রত্যেক আঘাতে পড়-পড় হইতেছে,—দক্ষিণ দিকে যেন শত সহস্র কামানের গোলা বর্ষিত হইতেছে,—অনাথনাথ আর এ ঘরে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অন্যগৃহস্থিত লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অন্য দুই একখানি ঘর, যাহা এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও পড়িয়া গেল। তখনই এই ঘরের লোকও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ঘর পড়িতেছে, ঘর পড়িতেছে, বাবু! বাহির হউন!" এবং জনতা পরস্পরকে দলিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। কত লোক পড়িয়া গেল, তাহাদের উপর দিয়া কত লোক চলিয়া গেল।

অনাথনাথ পুত্রটিকে বুকে লইয়া ও পত্নীকে বাম করে জড়াইয়া বহির্গত হইলেন, আর তখনই ঝড়ে ২০০ বৃহৎ কাঠের খুঁটি মধ্যভাগে তৃণবৎ ভাঙ্গিয়া গৃহখানি ভূতলশায়ী করিল। কয়েক জন ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, কয়েক জন মৃত্যুমুখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ ঝড়ে উড়িয়া গেল, কেহ শুনিল না। আর শুনিবেই বা কে? ঝটিকার ও সিন্ধুর মিশ্রিত ভৈরব নিনাদে পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে, বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারাও "হা ঈশ্বর! হা আল্লা!" রবে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কিন্তু কার আর্ত্তনাদ কে শুনে? তখন সকলেই আত্মরক্ষার জন্যে, আত্মীয়রক্ষার জন্যে ব্যাকুল। এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টিধারাও এরূপ বেগে পড়িতেছে যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য নাই; শরীরের অস্থিতে পর্য্যন্ত যেন সে ধারা প্রবেশ করিতেছে, এবং দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে। তাহাতে আবার রহিয়া রহিয়া শিলাবৃষ্টিও হইতেছে। লোকে পতিত বৃক্ষের ডালের নীচে, পতিত গৃহের চালের নীচে, যে যেখানে পারিল, আশ্রয় লইল। অনাথনাথও সপরিবারে একখানি চালের নীচে গেলেন, এবং পুত্রটিকে বুকে লইয়া পতিপত্নী সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন এরূপ গাঢ় অন্ধকার যে, হস্ত প্রসারিত করিলেও দেখা যাইতেছিল না। কেবল অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া হাতড়াইয়া, পতিত

চালের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কেবল কখন কখন সমুদ্রগর্ভে সেই ভীষণ অগ্নিশিখা, কখন কখন স্থায়ী বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত, ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তরমাত্র দেখা যাইতেছিল, এবং সেই আলোকে ভীষণ সংহারক্রীড়া নেত্রগোচর হইয়া হৃদয়ে আরও ভীতি সঞ্চারিত হইতেছিল। পতিপত্নী উভয়ে জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল শিশুটিকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিলেন।

রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময়ে সমুদ্র যেন ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর, এবং নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। তখন অনাথনাথ প্রথম হইতে যে সমুদ্রপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই আশঙ্কা আরও গুরুতর হইল। ঝড় তখন পশ্চিমসমুদ্রের দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া, সে আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠ তালুকা শুকাইয়া গেল। এ আশঙ্কা মনে উদিত হইবামাত্রই চারি দিকে লোকেরা "গর্গি! গর্গি!" বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং "চালে উঠ! গাছে উঠ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনাথনাথও পত্নী পুত্রকে লইয়া একটা চালের উপর উঠিলেন, এবং তখনই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল; এবং চালাখানি সেই সঙ্গে ভাসাইয়া নিল। অনাথনাথ একখানি উড়ানি দ্বারা তাঁহার পত্নী পুত্রকে আপনার দেহের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্বিতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া সে চালাখানি উল্‌টাইয়া দিল, এবং তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া ভীষণ বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অনাথনাথ খুব বলিষ্ঠ পুরুষ ও সন্তরণপটু ছিলেন। জলরাশির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই লক্ষ্মী-স্বরূপা পতিপ্রাণা পত্নী নাই। তরঙ্গে উড়ানি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় যেন ঝটিকা অপেক্ষাও বিরাট শব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইল; তিনি ডুবিয়া গেলেন। আবার যখন উঠিলেন, তখন একখানি কাষ্ঠ বেগে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বক্ষঃস্থ পুত্রটিকে ভীষণ আঘাত করিল। আঘাতে উভয়ে চীৎকার করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ঝড়ে ভাসিয়া গেল। তিনি বামহস্তে পুত্রকে ধরিয়া সন্তরণ করিতেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ হস্তে ও বক্ষে এরূপ ব্যথা অনুভব করিলেন যে, পুত্রকে ও আপনাকে রক্ষা করিবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহেও যেন মূর্চ্ছা সঞ্চারিত হইতেছিল। তিনি সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"কেহ যদি

আমার পুত্রটিকে রক্ষা কর, আমার সমস্ত বিষয় তাহাকে দিব।" এমন সময়ে দৈববাণীর মত তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—"বাবা! ভয় নাই, তুমি মাকে রক্ষা কর। আমি অমিয়কে রক্ষা করিব।" অনাথনাথ কেবল বলিলেন,—"মা! তুই কে? তুই কি সত্যই 'কমলে কামিনী দুর্গা'?" এমন সময়ে কর্দ্দমময় তৃতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল। নাকে মুখে কর্দ্দমাক্ত জল প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিল। অনাথনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

হেমাদ্রি।

হেমাদ্রি অতিপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তিনি "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" নামক অতিবিস্তীর্ণ স্মৃতিগ্রন্থ সংগৃহীত করেন। এই প্রশস্ত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সমগ্র প্রতিলিপি ভারতবর্ষের কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সুবিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহে নানাবিধ বিষয় অতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হেমাদ্রির পূর্ব্বতন অসংখ্য স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থ হইতে নানা স্থল প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির বিভিন্ন অংশ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। ব্রত, দান, কাল, শ্রাদ্ধ, তীর্থ, মোক্ষ ও পরিশিষ্ট নামে এই সকল খণ্ড পরিচিত। কাল ও শ্রাদ্ধের বিষয় পরিশিষ্ট খণ্ডেই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টখণ্ডে দেবতা ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ও বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের প্রথম ভাগে ব্রত, দ্বিতীয় ভাগে দান, তৃতীয় ভাগে তীর্থ ও চতুর্থ ভাগে মোক্ষ, বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। *

"চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" ভিন্ন হেমাদ্রি "মুগ্ধবোধ"-কার বোপদেবের প্রণীত "মুক্তাফল" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থের টীকা এবং বাগ্‌ভটের "আয়ুর্ব্বেদরসায়ন"-নামক ভৈষজ্যপুস্তকের ভাষ্য রচনা করেন, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

* Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan", P. 89.
Dr. Mittra's Notice of Sanskrit Mss, III. 349.
Proceedings of Asiatic Society of Bengal for 1884. p. 20.

কলিকাতার সুবিখ্যাত এসিয়াটিক সোসাইটীর অর্থব্যয়ে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'দানখণ্ড' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক, স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণির প্রতি এই গ্রন্থের সম্পাদনভার অর্পিত হয়। 'দানখণ্ড' ও 'ব্রতখণ্ডের' অধিকাংশ প্রচারিত হইবার পর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তদনন্তর ইহার সম্পাদকতার ভার পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রতি ন্যস্ত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রতখণ্ড' সমাপ্ত করিয়া, তাঁহারা 'পরিশিষ্টখণ্ডের' প্রকাশ আরম্ভ করেন। অদ্যাপি এই তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই।

হেমাদ্রি দক্ষিণাপথের অন্তর্গত দেবগিরি নগরে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবগিরির যাদববংশীয় মহারাজ কৃষ্ণদেব, মহাদেব ও রামচন্দ্র দেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির 'ব্রতখণ্ডের' আরম্ভে তিনি যাদববংশীয় নরপতিদিগের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানপূর্ব্বক 'পরিশিষ্টখণ্ডের' আরম্ভে আত্মপরিচয় বর্ণিত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বংশো হিমাংশোর্যযাতেঃ প্রসিদ্ধো যস্মিন্ স রাজা যদুরাবিরাসীৎ।
বভুব যস্মিন্নসুরাবতারভারাপহারায় পুরা মুরারিঃ ॥ ৩ ॥
বংশে তস্মিন্ কংসবিধ্বংসনস্য ক্ষৌণীপালো 'ভিল্লমঃ' প্রাদুরাসীৎ।
উদ্দামদর্পরিপুসর্পবিহঙ্গরাজঃ শ্রীভিল্লমাদবনিপোঽজনি 'জৈত্রপালঃ' ॥ ৪ ॥
তস্মাদভূদভিনবস্মরচারুমূর্ত্তিঃ কীর্ত্তেঃ পদং জগতি 'সিংহণদেব'-ভূপঃ।
অভবদবনিপালো 'জৈতুগি'র্নাম তস্মাৎ অসমসমরধীরদ্বেষিভূপালকালঃ ॥ ৭ ॥
স মহীপালো জনয়াম্বভূব 'কৃষ্ণং মহাদেব'-মহীপতিং চ।
হিতায় লোকস্য যথা পয়োধিশ্চিন্তামণিং কৌস্তুভমপ্যুদারং ॥ ৮ ॥
অথ প্রভাবাতিশয়েন লব্ধং বিভজ্য লোকাদ্বিতীয়াধিপত্যং।
ত্রিবিষ্টপং শাসতি কৃষ্ণভূপে ভুবং মহাদেবনৃপাঃ প্রশাস্তি ॥ ১২ ॥
আস্তে মণ্ডিতদণ্ডকাপরিসরঃ শ্রী-সেউণাখ্যঃ পরং
দেশঃ পেশলবেশভূষণ-বচোমাধুর্য্য-ধুর্য্যাকৃতিঃ।
তস্মিন্ দেবগিরিঃ পুরী বিজয়তে ত্রৈলোক্যসারশ্রিয়াং
বিশ্রান্তিঃ সুরশালিশৈলশিখরস্পর্দ্ধিষ্ণু-সৌধাবলিঃ ॥ ১৯ ॥
জগৎত্রয়ীগীতগুণপ্রশস্তিঃ শাস্তা সমস্তাবনিমণ্ডলস্য।
শ্রীমানিমামন্বয়রাজধানীং সোঽয়ং মহাদেবনৃপো বিভর্ত্তি ॥ ২০ ॥
সা সম্পৎ তদিদং যশো বলমিদং সোঽয়ং প্রতাপো মহান্

একৈকং পৃথিবীভৃতো ভুবি মহাদেবস্য লোকোত্তরং।
যস্য শ্রীকরণাধিপঃ স্বয়ময়ং হেমাদ্রিসূরিঃ পুরঃ
প্রৌঢ়প্রাতিভ-বর্ণ্যমান-বিলসদ্-বংশো ভৃশং শোভতে ॥ ২২ ॥

ভগবান চন্দ্রমা হইতে যদুবংশ উদ্ভূত হয়। চন্দ্রের পর বুধ, পুরূরবা, আয়ু, নহুষ, যযাতি ও যদু যথাক্রমে পৈতৃক রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। এই যদু হইতে যদুবংশ আবির্ভূত হয়। যদুবংশ প্রথমতঃ মথুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারাবতী নগরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সুবাহু। তিনি আপন চারি পুত্রের মধ্যে স্বরাজ্য বিভক্ত করিয়া লোকান্তরিত হন। সুবাহুর দ্বিতীয় পুত্র দৃঢ়প্রহার দক্ষিণাপথের আধিপত্য লাভ করিয়া, শ্রীনগরে রাজধানী সংস্থাপিত করেন। এই দৃঢ়প্রহার দেবগিরির যাদববংশের আদিপুরুষ। দৃঢ়প্রহারের পুত্র সেউনচন্দ্রের নাম অনুসারে, তাঁহার শাসিত রাজ্য সেউনদেশ নামে পরিচিত হয়। নাসিক হইতে দেবগিরি পর্য্যন্ত সেউনদেশ বিস্তারিত ছিল।

এই সেউনচন্দ্রের একবিংশতিম অধস্তন পুরুষ ভিল্লম। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে (১১০৯ শকাব্দে) মহারাজ ভিল্লমের দ্বারা দেবগিরি নগরী দণ্ডকারণ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দেবগিরিতে আপনার রাজধানীর সংস্থাপন করেন। দৃঢ়প্রহার হইতে ভিল্লম পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশতি জন যাদববংশীয় নরপতির নাম স্বরচিত ব্রতখণ্ডের আরম্ভে হেমাদ্রি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, ভিল্লমের ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রহারের আবির্ভাবকাল পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, অনুমান ৭৪০ খৃষ্টাব্দে যাদববংশ দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রাজী, যাদববংশীয় একখানি তাম্রশাসনের প্রথম বিবরণ প্রকাশ করেন। * ইহা ৯৯১ শকাব্দে (১০৬৯ খৃঃ) যাদবরাজ দ্বিতীয় সেউনচন্দ্রের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। এই শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, দৃঢ়প্রহার চন্দ্রাদিত্যপুরে রাজত্ব করিতেন। ইহা এক্ষণে চান্দোর নামে পরিচিত, এবং বর্ত্তমান নাসিক জেলায় অবস্থিত। ব্রতখণ্ডের উল্লিখিত 'শ্রীনগরী' তাম্রশাসনে 'চন্দ্রাদিত্যপুর' নামে বর্ণিত হইয়াছে। যাদবরাজ দ্বিতীয় সেউনচন্দ্রের সাহায্যে পরমর্দ্দিদেব কল্যানগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। চালুক্য সম্রাট দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল দেব ১০৭৬—

* Indian Antiquary for 1883 XII. 109—125.

১১২৬ খৃষ্টাব্দে (৯৯৮—১০৪৮ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কল্যাণ নগরে রাজত্ব করেন। এই চালুক্য সম্রাট বিক্রমাদিত্য কাশ্মীরের প্রমাণিক ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে পরমর্দ্দিদেব নামে বর্ণিত হইয়াছেন। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিদ্যাপতি বিহ্লণদেব এই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভুর কীর্ত্তি-কাহিনী 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর-নরপতি কলসদেব ও অনন্তদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

কাশ্মীরেভ্যো বিনির্যাতং রাজ্ঞেঃ কলসভূপতেঃ।
বিদ্যাপতিং যং কর্ণাটশ্চক্রে পর্মাড়িভূপতিঃ ॥—রাজতরঙ্গিণী; ৭—১৩৫।

সম্রাট বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৬ খৃঃ) পরমর্দ্দিদেব নামে হেমাদ্রির গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন।

সমুদ্ধৃতো যেন মহাভুজেন দ্বিষাং বিমর্দ্দাৎ পরমর্দ্দিদেবঃ।
আস্থাপি চালুক্যকুলপ্রদীপঃ কল্যাণরাজ্যোঽপি স এব যেন ॥—ব্রতখণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সেউনচন্দ্রের প্রপৌত্র মল্লুগি। এই মল্লুগির পৌত্র গোবিন্দরাজ সম্ভবতঃ মনুসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। মল্লুগির পুত্র ভিল্লমের রাজত্বকাল হইতে দেবগিরির আধিপত্য সবিশেষ বিস্তারিত হয়। ভিল্লমের পৌত্র সিংহণের অধিকার সমগ্র দক্ষিণাপথে প্রসারিত হয়। এই সিংহণের পৌত্র মহাদেবের মন্ত্রী হেমাদ্রি "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি"র রচনা করেন। ব্রতখণ্ডের উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টরূপে তাহার উপলব্ধি হইতেছে।

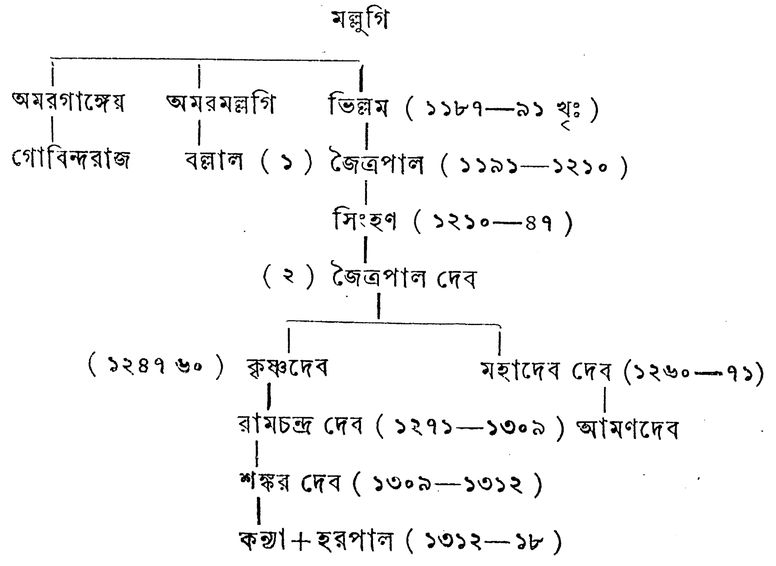

মহারাজ মহাদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র আমণদেব পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমণদেবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র রামচন্দ্রদেব দেবগিরির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই রামচন্দ্রদেব দক্ষিণাপথের যাদববংশীয় শেষ হিন্দু সম্রাট। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন খিলজী অষ্ট সহস্র মুসলমান সেনা সহ অতর্কিতভাবে দেবগিরির অভিমুখে ধাবিত হন। রামচন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বহুমূল্য উপহারপ্রদানে বিজেতা আলাউদ্দিনের সন্তোষসাধনে বাধ্য হন। দিল্লীশ্বরকে করদানে সম্মত হইয়া, রামচন্দ্রদেব বিজয়ী মুসলমান সেনাপতির হস্ত হইতে অক্ষতশরীরে নিষ্কৃতি পান। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে রাজা রামচন্দ্রদেব দিল্লীশ্বরের বার্ষিক করপ্রেরণে বিরত হন। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ত্রিংশৎ সহস্র সেনার সহিত আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করেন। রাজা রামচন্দ্রদেব পরাজিত হইয়া, বন্দিভাবে দিল্লীতে নীত হন। ছয় মাস পরে কারামুক্ত হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অনুমতি পান। তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীশ্বরকে বৎসর বৎসর রীতিমত কর দিতে থাকেন।

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র শঙ্কর দেব দিল্লীতে করপ্রেরণে বিরত থাকেন। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মালিক কাফুর পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করেন। শঙ্করদেব যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দেবগিরি দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়, এবং তাহার শাসনার্থ মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর, তাঁহার সাম্রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে শঙ্করদেবের ভগিনীপতি হরপাল দেব দেবগিরি হইতে মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে দূরীভূত করিয়া, পুনরায় হিন্দু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩১৭ খৃঃ দিল্লীশ্বর মুবারিক খিলজী স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে হরপাল বন্দী হন। মুসলমান সম্রাটের আদেশে বিরোধী হরপালের চর্ম্ম উত্তোলিত হইয়া, অতিনৃশংসভাবে তাঁহার বধকার্য্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে দক্ষিণাপথে হিন্দুসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া, মুসলমান অধিকার প্রসারিত হয়।

মন্ত্রিবর হেমাদ্রি চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষখণ্ডের আরম্ভে বিস্তারিতভাবে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আপনার প্রভু মহারাজ

মহাদেবের পিতা ও পিতামহের উল্লেখ করিয়া, আপনার বংশের পরিচয় দিয়াছেন। বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে হেমাদ্রির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কামদেব। হেমাদ্রি বাসুদেবের পৌত্র ও বামনদেবের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি স্বয়ং মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অতিবদান্য, ধার্ম্মিক ও সাহসী ছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে বহুতর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইতেন। ব্রাহ্মণভোজন না করাইয়া তিনি কখনও জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি মহারাজ মহাদেবের করণেশ্বর (প্রধান মন্ত্রীর) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। নিম্নে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষ খণ্ডের আরম্ভ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সিঞ্চণাদভবৎ প্রৌঢ়প্রতাপানল-দুর্জ্জয়ঃ। তনুজো বিজিতারাতি'র্জৈত্রপাল' ইতীরিতঃ॥
তস্মাদপি মহাদেবঃ পালিতাশেষভূতলঃ। বিজিতাশেষদিক্‌চক্রো বিক্রমৈকরসোঽভবৎ॥
ভূপেন তেনাথ কৃতোঽধিনাথঃ স্ফারশ্রিয়া শ্রীকরণে মনস্বী।
হেমাদ্রিনামাস্য চ বর্ণ্যমানং বংশং সমাকর্ণয়তি প্রকাশং॥
স্বাধ্যায়াধ্যয়নপ্রবীণ-ধরণীগীর্ব্বাণচূড়ামণিঃ
বংশে বৎসমুনের্মনোহরগুণগ্রামাভিরামাকৃতিঃ।
জজ্ঞে বামণসংজ্ঞকো বলিকথাগাথাসমুন্মীলিত-
প্রত্যগ্রাপ্রতিমপ্রভাবরুচিরাং যঃ প্রাপ লক্ষ্মীং পরাং॥
স প্রাসূত সুতং নবোজ্জ্বলকলাসম্ভারগোষ্ঠীমদং
ভূতক্ষীতগলোদ্‌গলন্নবরস-প্রহ্লাদি-বেদোদয়ং।
পুণ্যাবর্ত্তনসর্গসজ্জনমনঃসন্তোষবর্ষাম্বুদং
শশ্বদ্‌বেদরহস্যবস্তুরসিকং শ্রীবাসুদেবাহ্বয়ং॥
আসীত্তস্মাদভিনবসুধা-সোদরালাপলীলঃ
শীলাচারপ্রবরধিষণা-জোষিতাশেষলোকঃ।
সত্যাং বাচং ত্যজতি ন পুরা ক্বাপি যঃ শঙ্কটেঽপি
প্রজ্ঞারাশিঃ সুকৃতরসিকো নামতঃ কামদেবঃ॥
তস্মাদ্ বিস্ময়নীয়পুণ্যচরিতো হেমাদ্রিনামাজনি
প্রত্যগ্রাপ্রতিমপ্রভাববিকসদ্-বিশ্বোত্তরশ্রীনিধিঃ।
যোঽসৌ সর্ব্বকলাবিশারদশিরোরত্নাঙ্কুরো ভাস্বরঃ
সর্ব্বশ্রীকরণেশ্বরো নৃপমহাদেবস্য মান্যোঽভবৎ॥
জ্ঞাতুং নীতিরহস্যমস্য গুরুতাং যশ্চেহতে শিষ্যতাং
নূনং সোঽপি বৃহস্পতিঃ স চ কবির্য্যস্তেন সংস্পর্দ্ধতে।

সোঽয়ং চিত্রচরিত্রমান্যমহিমা মন্ত্রীন্দ্রচূড়ামণিঃ
হেমাদ্রির্ন নিনায় বিস্ময়রসং কং ধীরধুর্য্যং নরং ॥
শাস্ত্রং তেন সমস্তার্ত্তিনিঃশেষার্ত্তিনিবর্ত্তকং।
প্রণীতঞ্চ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিসমাহ্বয়ং ॥
ইহানুপূর্ব্বেণ বিনির্ম্মিতানি পঞ্চ প্রপঞ্চেন চ খণ্ডকানি।
ব্রতেষু দানেষু চ তীর্থসার্থে মোক্ষে চ শেষেঽথ তথার্থজাতে ॥
বহূনি শাস্ত্রানি বিমৃশ্য রচ্যতে শ্রাদ্ধস্য কল্পোঽয়মতিপ্রযত্নতঃ।
ইহোপনেয়ঃ সহসা ন কেনচিৎ দোষো লঘীয়ানপি বুদ্ধিশালিনা ॥
দানে দানবপুঙ্গবং বলিমথ দ্বৈপায়নং বাঙ্ময়ে
সর্ব্বানপ্যজয়ন্মুনীংস্তপসি যঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষে গুরং।
সোঽয়ং প্রারভতে পয়োধিতনয়াপ্রাণেশ্বরং সংস্মরন্
হেমাদ্রির্বিহিতং প্রয়োগমধুনা শ্রাদ্ধস্য বক্তুং সুধীঃ ॥—পরিশেষখণ্ড।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, হেমাদ্রি দেবগিরির মহারাজ মহাদেব-দেব, আমণদেব ও রামচন্দ্রদেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৬০—১৩০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই তিন জন নরপতি দেবগিরিতে রাজত্ব করেন। ইহা হইতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেবগিরি নগরে ব্রাহ্মণকুলে হেমাদ্রির জন্ম হয়। হেমাদ্রির ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা দেবগিরির যাদববংশীয় নৃপতিদিগের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় সংস্কৃতবিৎ উইলসন সাহেব হেমাদ্রিকে দেবগিরির অধীশ্বর বলিয়া অনুমান করেন। তদনুসারে স্বসম্পাদিত 'দানখণ্ডে'র সংস্কৃত ভূমিকায় পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি হেমাদ্রিকে প্রথমতঃ দেবগিরির নরপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পরে তিনি আত্মভ্রম সংশোধিত করেন। উইলসন সাহেবের ভ্রান্ত মতের প্রতি নির্ভর করিয়া, ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথম ভাগে, অধুনা স্বর্গগত, বিদ্যোৎসাহী ডাক্তার রামদাস সেন, হেমাদ্রিকে দেবগিরির অধিপতি বলিয়া পরিচিত করেন। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের তৃতীয় ভাগে তিনি নিজের ভ্রম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু রামদাস বাবু কালিদাসাদি অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় হেমাদ্রির সম্বন্ধেও নিশ্চিতরূপে কোনও কথা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। 'মুক্তাফল'-নামক গ্রন্থের পরিচয়প্রদানকালে, ডাক্তর মিত্র, হেমাদ্রিকে দেবগিরির রাজা বলিয়া ভ্রমক্রমে নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তর জলি সাহেব হেমাদ্রিকে মহাদেবের প্রধান মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু হেমাদ্রির সময়নির্ণয়ে ডাক্তর জলি ভ্রমে পতিত

হইয়াছেন। তাঁহার মতে, হেমাদ্রি ১২৫০ খৃষ্টাব্দে চতুর্বর্গচিন্তামণির রচনা করেন। পরিশেষ খণ্ডের অন্তর্গত 'কালনির্ণয়' নামক অংশের একখানি ১৪০২ শকাব্দের (১৪৮০ খৃঃ) লিখিত প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে ; ইহা নাগরাক্ষরে লিখিত। ইহা হইতে হেমাদ্রির অধস্তন সময় জানা যাইতেছে।

মহারাজ মহাদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র দেবের (১২৭১—১৩০৯ খৃঃ) সময়ে হেমাদ্রি বোপদেবের প্রণীত মুক্তাফলের টীকার রচনা করেন। এই রামচন্দ্রদেব ইতিহাসে রামরাজ নামে পরিচিত হইয়াছেন। হেমাদ্রির প্রণীত এই টীকার নাম "কৈবল্যদীপিকা"। ইহাতে তিনি বোপদেব গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের ও ভক্তিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন,—

"শ্রীবোপদেবস্য নিধের্গুণানাং জয়ন্তি তে তে ভুবি বাগ্‌বিলাসাঃ।
বিকুণ্ঠ্য যেষু স্বয়মীশ্বরোঽপি সর্ব্বজ্ঞশব্দং সমবৈতি রূঢ়ং ॥
তেন মুক্তাফলং তেনে যল্লোকমনুগৃহ্নতা।
তত্র টীকাং যথাবুদ্ধি কুর্ব্বে কৈবল্যদীপিকাং ॥
হেমাদ্রিঃ কটকে চক্রে রামরাজস্য বেশ্মনি ॥

ইতি শ্রীমৎপ্রৌঢ়প্রতাপচক্রবর্ত্তি-মহারাজাধিরাজ-সোমবংশোদ্ভব-রামরাজমন্ত্রিবর্য্য-হেমাদ্রিদেববিরচিতা-মুক্তাফলটীকা সমাপ্তা।—কৈবল্যদীপিকা। *

হেমাদ্রির সমসাময়িক বোপদেব গোস্বামী দেবগিরির রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এই বোপদেব "মুগ্ধবোধ"-নামক সুবিখ্যাত ব্যাকরণের রচনা করেন। ভবিষ্যতে বোপদেবের বিবরণ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

কুশীনগর।

কুশীনগর কোথায় ? যেখানে ভগবান শাক্যসিংহ নির্ব্বাণনগরীতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেখানে অশীতিপরবৃদ্ধ বুদ্ধ বিশাল দুই শালতরুর মধ্যে রোরুদ্যমান শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা উপসেবিত হইয়া অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সে কুশীনগর কোথায় ? যে স্থানে বহু শতাব্দী পরে পরমসৌগত মহারাজ অশোক প্রকাণ্ড এক নির্ব্বাণস্তূপ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পরে যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চীন, ব্রহ্ম, তিব্বত, শ্যাম, মলয় প্রভৃতি

* Dr. R. L Mittra's Notice of Sanskrit Mss.—IV. 67.

দূরবর্ত্তী দেশদেশান্তর হইতে ভগবানের অন্ত্যলীলাস্থলদর্শনার্থ সমুপাগত শত শত ভক্তের ভক্তি প্রীতি আকর্ষণ করিত, সে কুশীনগর কোথায়?

এখন সে স্থল নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। মহারাজ অশোক প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ যে নির্ব্বাণস্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে,—নির্ণয় করিবার আদৌ উপায় নাই। সে বিশাল স্তূপ, বোধ হয়, কালের করাল কবলে গ্রস্ত হইয়াছে; কতক ভগ্ন হইয়াছে; কতক মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়াছে; কতক নিবিড় দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি হইয়াছে!

কিন্তু সে ভগ্নস্তূপরাশিই বা কোথায়? এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; এখনও পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ। * এখনও দেশদেশান্তর হইতে ভক্ত সৌগতগণ ভগবানের লীলাস্থল পুণ্যভূমি ভারতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কোথায় তাঁহাদের ইষ্টদেবের সমাধিশয্যা, কেহই তাহা জানেন না। কেহই জানে না,—"কোথায় জগতের চক্ষুঃ" শেষ-নিদ্রায় মুদিত হইয়াছিল, কোথায় ভারতের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল।

ভারতবাসিগণ এ পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব্বতন জাতীয় গৌরবরক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করেন নাই। আমরা কেবল ভারতের ভূতপূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া মৌখিক বিলাপ পরিতাপ করি; কিন্তু যাহাতে পূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের পুনরুদ্ধার হয়, তজ্জন্য আমরা কেহই সামান্যমাত্র শ্রম ও স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখি নাই। এক জন সহৃদয় ইংরাজ ঐতিহাসিক এ জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডের প্রত্যেক পল্লীর ইতিহাস আছে, কিন্তু সমগ্র গ্রেট্ ব্রিটেন অপেক্ষা কত গুণ বৃহৎ যে ভারতবর্ষ, তাহার ইতিহাস নাই।" * বস্তুতঃ, পূর্ব্বকীর্ত্তির পুনরুদ্ধারে ইংরাজেরা যেরূপ অকাতরে যত্ন, স্বার্থত্যাগ ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা এ দেশের লোকের অনুকরণস্থল। তাহার শতাংশের একাংশও যদি ভারতবাসীর হইত, তবে এত দিনে ভারতের সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইত। এ প্রবন্ধেও যে মহানুভব বিদেশীর অদম্য উৎসাহ ও বিপুল স্বার্থত্যাগের কথা বর্ণিত হইবে, তাঁহার দৃষ্টান্তও ভারতীয়গণের সম্যক অনুকরণীয়।

প্রথমে কুশীনগরের দিকে ইউরোপীয়দের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আমরা ইউরোপীয়দের নিকট প্রত্নতত্ত্বের বিষয় শিখিয়া গুরুমারা টীকা লিখিয়া আমা-

* Sir W. W. Hunter,

দের অন্ধ আত্মাভিমানকে যতই স্ফীত করি না কেন, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কোনও দেশীয়ই পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারে অগ্রণী নহেন। যাহা হউক, বলিতেছিলাম যে, কুশীনগরের উপর ইংরাজের দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু দৃষ্টি পড়িলে কি হইবে? নির্ব্বাণনগরীর চিহ্ন যে কোথাও নাই। এত বড় বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যেও কুশীনগরের নামমাত্র নাই। পালি সাহিত্যে ভগবানের প্রধান লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পালি সাহিত্যেও তাহার কোনও ঠিকানা মিলিল না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্, পণ্ডিত ও মনীষিগণ হতাশ হইলেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত স্তানিশ্লে জুলিয়েঁ হিউঅ্যান্থস্যাঙ্গ নামক এক ভারতপর্য্যটক চৈনিক পরিব্রাজকের নাম শুনিতে পাইলেন। তিনিও আরও শুনিলেন যে, তিনি নাকি চীনভাষায় ভারতপরিভ্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া, এই অদম্য-উদ্যমশীল ফরাসী পণ্ডিত চীনভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। আজ কাল চীনভাষার আলোচনা সহজ হইয়াছে; লণ্ডন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষার শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। কিন্তু জুলিয়েঁর সময়ে চীন ভাষা শিখিবার পথ এত সুগম ছিল না। বিশেষতঃ, যে ভাষার বর্ণমালা শিক্ষার্থীর বিভীষিকাস্থল, অল্প সময়ের মধ্যে সেই দুরূহতম ভাষা আয়ত্ত করিয়া কিরূপে এই অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত নিজ ভাষায় উক্ত ভ্রমণপুস্তকের অনুবাদ করিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে, তমসাচ্ছন্ন ভারতের ইতিহাস-গুহা আলোকিত হইয়া উঠিল। এতকাল গাঢ়তম অন্ধকারে যে সব পুরাতত্ত্ব নিহিত ছিল, এই ভ্রমণকারীর ইতিহাসে শত সূর্য্যের আভায় তাহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই অমূল্য গ্রন্থের সন্ধান পাইয়া, পুরাবিদেরা, ঐতিহাসিকেরা, মনীষীরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

এই অনুরাগী উৎসাহশীল প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কেবল পাঠ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; দলে দলে পরিব্রাজক-বর্ণিত পথে ভারতের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারে ও অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। অনেক স্থলে হিওএন্থস্যাঙ্গ্-বর্ণিত যে সমস্ত নগরীর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইল। ভারত গভর্মেণ্টও সাতিশয় উদারতার সহিত এই পণ্ডিতদের সাহায্যের জন্য 'আর্কিওলজিকাল সর্ভে' নামক বিভাগের সৃষ্টি করিলেন। ভারতের প্রাচীন নগরীসমূহের বর্ত্তমান অবস্থার নির্ণয়, প্রাচীন ভগ্ন ও ভগ্নপ্রায় স্থাপত্য কীর্ত্তিগুলির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি এই বিভাগের কার্য্য

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। জেনারেল্ কনিংহাম এই বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। যদিও এই বিভাগের পণ্ডিতগণের গবেষণায় অনেক ভ্রম ঘটিয়াছে, তথাপি এই সকল ভ্রমও ক্ষমার্হ; কারণ, মনুষ্যজ্ঞানে ভ্রমই স্বাভাবিক। যাঁহারা এই বিভাগের প্রকাশিত 'আর্কিওলজিকাল সর্ভে রিপোর্টস্' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকদের পক্ষে, এই পত্রে প্রকাশিত রত্নরাজি কি অমূল্য।

যে জেনারেল্ কনিংহাম্ এই বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন, তিনি নিজে যেমন পণ্ডিত, তেমনই অধ্যবসায়শীল। নিজের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে সহকারীদিগকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন; ইঁহাদের কেমন অদম্য উৎসাহ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার একজন সহকারীর দৃষ্টান্তে তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রমাণিত হইবে। চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত সৌন্দর্য্যললামভূতা গয়া, বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু ভগবানের লীলাস্থল কপিলাবস্তু, বৈশালী, শ্রাবস্তী, কুশীনগর ইত্যাদি নির্ণয় করিবার কোনও উপায় হইল না। একে পরিব্রাজক চৈনিক মাপ "লী"তে দূরত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, কত "লী"তে মাইল গণ্য হইবে, পণ্ডিতদের মধ্যে তাহা লইয়া অনেক বিচার হইল। শেষে সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, ৬ "লী"তে এক মাইল গণনা করা হউক। তাহার পর আবার এই গণনায় হিউএন্থ্স্যাঙ্গ-বর্ণিত স্থান সকল যথাযথ নির্ণীত হইল না। যেখানে পর্ব্বত বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে বিশাল নগরী; যেখানে নগরের বর্ণনা, সেখানে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র; যেখানে অতলস্পর্শ নদীর বর্ণনা আছে, সেখানে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হওয়াতে, এই মনীষিগণ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পরিব্রাজক পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন; তিনি কিছু ম্যাপের সরলরেখা ধরিয়া ভ্রমণ করিবার সুবিধা পান নাই। অনেক স্থলে ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কালের মহিমায় অনেক মার্গ লুপ্ত হইয়াছে; আবার অনেক নূতন মার্গও তৎস্থানে প্রস্তুত হইয়াছে; অনেক নগরী জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছে; অনেক আবার নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্নতা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাহাতে বুদ্ধের শেষলীলাস্থল নির্ণীত হয় না।

তাঁহারা কিন্তু নিরাশ হইলেন না। দ্বিগুণতর উৎসাহে তাঁহারা অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় অন্ধকারে যেন কিঞ্চিৎ আলোক মিলিল! যাঁহারা ভগবানের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে

স্বীকার করেন যে, ভগবান আপনার নির্ব্বাণসময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া রাজগৃহ হইতে বৈশালীর অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। বৈশালীর সন্নিহিত বেলোয়া নামক স্থানে তিনি রোগাক্রান্ত হন। তথাপি তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে পরবুদ্ধ নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অবশেষে সেই বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত পথিক কাকুথ নদীর (কনিংহামের মতে আধুনিক বাষিয়ান্) জলে অবগাহন পানাদি করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূরে হিরণ্যাক্ষী-নদীতীরস্থ শালবনের অভ্যন্তরে, পুষ্পিত দুই বিশাল শালতরুর মধ্যদেশে, সেই পরিশ্রান্ত রোগকাতর পথিক তাঁহার চিরবাঞ্ছিত নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। *

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, বারাণসী বা রাজগৃহ খুঁজিয়া লওয়া দুঃসাধ্য হইল না। কিন্তু ইহার পরেই গোল। বারাণসী বা রাজগৃহ যেন নির্ণীত হইল, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী স্থান সকল নির্ণয় করিবার উপায় কি? ভগবানের অন্তিম লীলার অন্যান্য স্থান সকল কিরূপে নির্ণীত হইবে? এক উপায়, হিউয়্যান্থ্স্যাং-বর্ণিত পথের অনুসরণ। হিউয়্যান্থ্স্যাং কাশীনগরে আসিবার পূর্ব্বে, পিপ্পরিয়া বা পিপ্পলবন নামক এক স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন। এই পিপ্পলীবনে মৌর্য্যরাজদিগের নির্ম্মিত স্তূপ ছিল। মহারাজা অশোক এই স্তূপ ভাঙ্গিয়া সমাধিচিত্র নিষ্কাশিত করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাসে লিখিত আছে, মৌর্য্যরাজ-বংশের ধ্বংসের সময়, পূর্ণগর্ভা কোনও মৌর্য্য-

* কুশীনগরের বর্ত্তমান অবস্থানের সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে এত মতভেদ ও এত কলহ দেখা যায় যে, সেই বিভিন্ন মতবাদিগণের তর্কোত্থিত ধূলিজালে সত্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এমন কি, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণসময়ের গমনপথ সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ দেখা যায়। সে সব কলহের তর্কে পাঠকদের বিরক্ত করিতে চাহি না। এই সকল বিভিন্ন মতবাদ আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম ও প্রাচীন মত,—গোরখপুর জিলার অন্তর্গত কাশিয়াই কুশীনগর। অধ্যাপক উইলসন্ ইহার প্রতিপাদক ও জেনারেল কানিংহাম ও কারলীল প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। দ্বিতীয় ও নব্যমত এই যে, চম্পারণ বিভাগের অন্তর্গত বেথিয়ার নিকট লোরিয়া নন্দনগড় নামক স্থানই কুশীনগর। ডাক্তার ওয়াডেল্, স্মিথ্ প্রভৃতি এই মতের পরিপোষক। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশে এই প্রাচীন মত ও শেষাংশে নবীনমতের আলোচনা করিব। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত মত আছে, তাহার মধ্যে কেহ কুচবেহারে, কেহ হরিদ্বারে, কেহ কামরূপে, কুশীনগরের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ সুযুক্তির দ্বারা স্বমতের সমর্থন করিতে পারেন নাই, সুতরাং সে সব মত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত নহে। অতএব সে সব মতের আলোচনা নিরর্থক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

রাজ্ঞী এই পিপ্পলীবনে সদ্যঃপ্রসূত সন্তান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্র নাম্নী কোনও গোপরমণী সেই অসহায় শিশুকে পালন করেন। পরে এই শিশুই চন্দ্রগুপ্ত (চন্দ্রের গুপ্ত=রক্ষিত) নাম ধারণ করিয়া, মগধের সিংহাসনে সমারূঢ় হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কুশীনগর যেমন অজ্ঞাত, পিপ্পলবনও তদ্রূপ অজ্ঞাত। এই পিপ্পলবনে যাইবার পূর্ব্বে ভগবানকে অনোমা নদী উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই সেই বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ অনোমা নদী। জগতের দুঃখে দুঃখিত ভগবান সিদ্ধার্থ পৃথিবীর সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাহার তীরে মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন; একমাত্র সহচর প্রিয় সারথি ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন!—কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য সরিতের মধ্যে প্রকৃত অনোমা কিরূপে নির্ণীত হইবে? অনোমা উত্তীর্ণ হইয়া পথে রামগ্রামে আসিতে হইয়াছিল। রামগ্রাম হইতে শ্রাবস্তী। এই শ্রাবস্তী জীবিতাবস্থায় ভগবানের বড় প্রিয় স্থান ছিল। ইহা বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থল। কিন্তু কুশীনগরের পথে বৌদ্ধ-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে ৮।১০টি স্থানের নাম করা গেল, তাহাদের একটিরও স্থান নির্ণয় করিবার উপায় রহিল না। পরে কিরূপে ইহা নির্ণীত হইল ও কিরূপে মহাত্মা কার্‌লীল্ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া এই নির্ব্বাণমন্দিরের উদ্ধার ও পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন, বারান্তরে বলিব। *

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

---

* এই প্রবন্ধে যে সমস্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইল, বর্জ্জাইস অক্ষরের বৃহৎ ফুট্‌নোটে প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত হইবার ভয়ে যথাস্থানে উহাদের নাম দেওয়া হয় নাই। এ স্থলে প্রধান কতকগুলির নাম করা গেল। ১২৯০ সালের "বিভায়" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "কুশীনগর" প্রবন্ধ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক এমন সুন্দর প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই পাঠ করিয়াছি। প্রাচীন মতের সমালোচনায় আমরা কেবল তাঁহার পদানুসরণ করিয়াছি।—Arch. Survey Reports vol. XVII. Beal's Western World; Rockhill's Tibetan Buddhism; Beal's Life of Tahian Hiouen-tsang; Monier william's *Buddhism*. p. 424; Hardy's *Annal of Buddhism*; Rhys Davids' *Buddhism* p. 80; Canningham's *Ancient Geography of India* p. 430-1; Like's *The Popular Life of Buddha* p. 335; &c.

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ছোট গল্প।

ইতিপূর্ব্বে রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর কথায় আমরা ছোট গল্প সম্বন্ধে বলিয়াছি—"কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট গল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনার বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয় ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটা কয়েক ছত্রমাত্র অধিকার করিতে পারে; ছোট গল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে 'বুল্‌সআই' লণ্ঠনের আলোক যেমন এক স্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটি নাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোট গল্প-রচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাই সেই লণ্ঠনের আলোকের কার্য্য। তেমনই বিচিত্র সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ, উত্থানপতন, সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনা অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দান করাই গল্পরচনাকৌশলের কার্য্য।"

সম্প্রতি "নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রে মিষ্টার ওয়েড্‌মোর ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রবন্ধারম্ভেই লেখক বলিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল, কোনও প্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক বলিয়াছিলেন,—জীবনের রঙ্গমঞ্চে যাহারা বিফলমনোরথ, তাহারাই নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে বিশেষ প্রশংসিত হয়। এক জন সংবাদপত্রসেবক বলিয়াছেন,—পাঠকগণ বিদ্যা চাহে না; লিখিত বিষয়ে লেখকের বিদ্যা যত অল্প, তাঁহার রচনা পাঠকসমাজে তত অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে। থ্যাকারেও এক স্থানে বলিয়াছেন, পঞ্চাশোর্দ্ধে আর কাহারও প্রণয়ঘটিত উপন্যাস রচনা করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, তত দিনে প্রণয়-ব্যাপারে তাঁহার কিছু অধিক অভিজ্ঞতা জন্মে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, যাঁহারা উপন্যাসরচনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারাই ছোট-গল্প-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইবেন। কথাটা কি ঠিক? কখনই নহে। সাহিত্য-শিল্প-হিসাবে ছোট গল্প উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। ছোট গল্প নানা প্রকারের হইতে পারে। একটা কোনও বৃত্তান্ত, একটা গভীর গল্প, একটা চরিত্রবিবৃতি, একটা অদ্ভুত বৃত্তান্ত, একটা বর্ণনা, একটা কোনও নীচ-ব্যবসায়ীর দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। কিন্তু ছোট গল্প আর যাহাই হউক, উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নহে। 'সনেট' ও মহাকাব্য, এতদুভয়ে যত প্রভেদ, ছোট গল্প ও উপন্যাস, এতদুভয়েও তত প্রভেদ। এই কথাটা না বুঝাতেই অনেক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ছোট গল্পের রচনা নিতান্ত সহজ মনে করিয়া উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করিয়া মনে করিয়াছেন—ছোট গল্প রচনা করা হইল। দুই প্রকার রচনার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহারা 'শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া' বসেন। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদিগেরই যখন এমন ভ্রম হয়, তখন সাধারণ লোকের

ছোট গল্প ও উপন্যাস।

এরূপ ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা সাহিত্যশিল্পবিচারে অক্ষম,—যাঁহাদিগের বিশ্বাস,—উপন্যাস কেবল শ্রান্তি দূর করিবার জন্যই রচিত, তাঁহারা যে সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য বুঝিতে পারিবেন না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। যাঁহারা উপন্যাসপাঠকালে চিত্রিত চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল উপন্যাসের আখ্যানবস্তু (Plot) পাঠ করেন, তাঁহারা কিছুতেই ছোট গল্পের প্রশংসা করিতে পারিবেন না—তাঁহারা সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মাধুরী বুঝিতে পারিবেন না।

উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পে অধিক বৈচিত্র্য-বিকাশ সম্ভব। উপন্যাসের রচনাপ্রণালীত ছোট গল্পে ব্যবহৃত হইতেই পারে—তদ্ভিন্ন আবার আরও কতকগুলি রচনাপ্রণালী আছে, যাহা উপন্যাসের উপযোগী না হইলেও, ছোট গল্পে প্রযোজ্য। প্রথমে আমরা উপন্যাসে ও ছোট গল্পে সাধারণতঃ-ব্যবহৃত রচনাপ্রণালীর উল্লেখ করিব। সাধারণতঃ-অনুসৃত এই প্রণালীতে লেখক বর্ণিতবিষয়াভিজ্ঞ তৃতীয় ব্যক্তির মত রচনা করেন। অস্মদ্দেশে

রচনাপ্রণালী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর এক প্রকার রচনাপ্রণালীও অনেক সময় উপন্যাসে ও ছোট গল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সে প্রণালীতে লেখক বর্ণিত চরিত্র সকলের মধ্যে এক জন হইয়া বর্ণনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের "ইন্দিরা"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিষয়বিশেষে নিপুণ লেখকের হস্তে এই রচনাপ্রণালী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পেই এই রচনাপ্রণালী অধিকতর সহজে প্রয়োগ করা যায়। ডিকেন্সের মত পাকা লেখকও কেবল David Copperfield গ্রন্থে এই রচনাপ্রণালী ব্যবহার করিয়া সফল হইয়াছেন। বল্‌জাক্ এই রচনাপ্রণালীর প্রয়োগে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষমতাবিশিষ্ট লেখকগণ এই রচনাপ্রণালী ব্যবহার করিতে গিয়া কেবল গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার প্রশংসায় গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া থাকেন। উপন্যাসে ও ছোট গল্পে আর এক প্রকার রচনাপ্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহাতে গল্পের বিষয়ীভূত চরিত্র সকলের পত্রে গল্পাংশ বিবৃত হয়। সুদীর্ঘ উপন্যাসে এ প্রণালী অনেক সময় বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়;—এই প্রণালী ছোট গল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে লেখকদিগের পত্রে প্রত্যেকের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় সাহিত্যে বোধ করি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে "সাহিত্যে" প্রকাশিত "প্রাইভেট টিউটার" নামক গল্পই এইরূপ প্রণালীর সর্ব্বপ্রথম * ও * * * রচনা। অনেক সময় এই তিন প্রকার রচনাপ্রণালী মিশ্রিত করা হইয়া থাকে; তবে সেই মিশ্রণোৎপন্ন রচনাপ্রণালী উপন্যাসেরই বিশেষ উপযোগী। কেবল কথাবার্ত্তাতেও ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করিলে, নাটকের নিয়মাধীন হইতে হয়; অথচ নাটকের বিশেষ সুবিধা আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল কথাবার্ত্তায় গল্প শেষ করিলে যেন কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ডায়েরী হইতে উদ্ধৃতাংশের আকারেও ছোট গল্প লেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে লেখকের যেমন ক্ষমতার আবশ্যক, পাঠকেরও তেমনই ক্ষমতা আবশ্যক। যে পাঠক একবারমাত্র চক্ষু বুলাইয়া পাঠ শেষ হইল মনে করেন,—তাঁহার পক্ষে 'ডায়েরী'র আকারে লিখিত ছোট গল্প প্রীতিপ্রদ হইবে না।

* ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অধুনালুপ্ত "প্রবাহ" নামক মাসিকপত্রে "জয়চাঁদের চিঠি" নামক পত্রে রচিত একটি দীর্ঘ গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে বা পরে আর কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল কি না,—বলিতে পারি না।—"সাহিত্য"-সম্পাদক।

ছোট গল্পে যেখানে কথাবার্ত্তা প্রচলিত করিলেও চলে, সেখানেও অনেক সিদ্ধহস্ত লেখক কথাবার্ত্তা পরিহার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল্‌জাকের ছোট গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রণালী ছোট গল্পে বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও সৌন্দর্য্যসংবর্দ্ধক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, অন্য সকল প্রকার রচনার ন্যায় ছোট গল্পও লেখকের প্রতিভার উপর নির্ভর করে। ডোডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোট গল্পটির কথাই ধরা যাউক। সেটির আখ্যানবস্তু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পথের দুই পার্শ্বে দুইটি পান্থনিবাস—একটি কোলাহলহীন, বিষাদময়; অপরটি শব্দমুখরিত, উন্নতিশীল। প্রাচীন পান্থনিবাসের অধিকারী নূতন পান্থনিবাসে তাঁহারই পুরাতন অতিথিদিগের সহিত আমোদে মত্ত—ব্যবসা হারাইয়া নূতন পান্থনিবাসের কর্ত্রীর মায়ায় মুগ্ধ। আর পথের অপর পার্শ্বে কোলাহলহীন পুরাতন পান্থনিবাসে এক জন পরিত্যক্তা রমণী শূন্যহৃদয়ে শূন্য আলয়ে দিন কাটাইতেছে। তাহার অন্ধকারময় জীবনে আর বিন্দুমাত্র আলোকবিকাশ নাই। এই সামান্য গল্পটিকে ডোডের রচনাকৌশল কি মধুর, কি করুণ, কি হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে!

উপন্যাসে বা ছোট গল্পে স্বভাববর্ণনা অতিবিস্তৃত হওয়া অনুচিত; ঔপন্যাসিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ নহেন। তাঁহার পক্ষে প্রত্যেক খুঁটিনাটি দেখা অনাবশ্যক।

সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষে সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশ বিশেষ আবশ্যক। ভার্জ্জিল হইতে ব্রাউনিং অবধি প্রধান সাহিত্য-শিল্পিগণ এ কথা ভুলেন নাই। ছোট গল্পে ইহা আরও আবশ্যক।

সংক্ষেপ।

ছোট গল্পে যেখানে কথোপকথন ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রত্যেক কথার বিশেষ উপযোগিতা থাকা চাই। উপন্যাসে দুইটা বাজে কথা ব্যবহার করা চলে—ছোট গল্পে তাহা নিষিদ্ধ। সাধারণ পাঠক হয় ত সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু সমালোচকের, শিল্পীর চক্ষে তাহা ধরা পড়িবেই পড়িবে। সেই জন্য ছোট গল্প ধীরে ধীরে রচনা করা ও বহুবার সংশোধন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধারণতঃ উপন্যাসেই হউক, আর ছোট গল্পেই হউক, কথোপকথন ব্যবহার করা বড় সহজ নহে। হাস্যরসের অবতারণার সময় বরং কথোপকথন ব্যবহার করা চলে; কারণ, হাস্যরসের অবতারণায় দুই একটি বাজে বকুনিও অসঙ্গত নহে; কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের অবতারণায় অনেক সময় কথোপকথনব্যবহারে রচনার সৌন্দর্য্যহানি হইয়া থাকে।

নাটকের মত ছোট গল্পেও প্রতি ছত্র দর্শকের বা পাঠকের মনে বিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তবে নাটকে যে প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হইলে হয়, ছোট গল্পে সে ভাবও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল-

নাটক ও ছোট গল্প।

স্থায়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক। আবার এক হিসাবে নাটককারের অসুবিধা অধিক; কারণ, দর্শকদিগের মধ্যে সকল প্রকারের লোক থাকে; তাঁহাকে সকল দর্শকের মনস্তুষ্টিবিধান করিতে হয়। ছোট গল্পের লেখককে তাহা করিতে হয় না। তিনি ইচ্ছা করিলে কেবল সুশিক্ষিত পাঠকের জন্য রচনা করিতে পারেন।

আজ কাল অনেক লেখক রচনাকৌশলের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া থাকেন; তাহা ভাল ভিন্ন মন্দ নহে; কারণ সাহিত্যে কোনও রচনা স্থায়ী করিতে হইলে, তাহা সুলিখিত হওয়া আবশ্যক। রচনাকৌশলও সাহিত্য-শিল্পের একটা প্রধান অঙ্গ। তবে যাঁহারা কথার বাহার খুঁজিতে গিয়া ভাবদৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষার সৌন্দর্য্য বাড়াইতে গিয়া রচনা ফেনাইয়া অতিশয় বিস্তৃত করিয়া ফেলেন,—তাঁহারা প্রকৃত শিল্পীর রচনাকৌশলে অনভিজ্ঞ।

ছোট গল্পে মৌলিকতা ও আন্তরিকতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার আধিক্য হেতু পাপের প্রত্যেক পৈশাচিক খুঁটি নাটির বর্ণনা করেন, যাঁহাদের বর্ণিত চরিত্র পাপের পূতিগন্ধময়,—তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার কোনও কথা আছে কি? সে সকল "Dyspeptic pessimist"এর বাস্তবাদর্শপ্রিয়তা রোগবিশেষ। এই বিষয়ের বিচারকালে জর্জ্জ গিসিংএর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ফ্রান্সে এখন বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার বিকৃতাংশ অনাবৃত। গীদে মোপাসাঁ আপনি এই স্বতন্ত্র পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোপাসাঁর জীবনে বিষাদপ্রবণতার অভিসম্পাত ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে আপনার রচিত পথ আপনার পক্ষে সুগম ও অপরের পক্ষে আলোকোজ্জল করিয়াছিলেন। তাই যাঁহারা ছোট-গল্প-রচনায় তাঁহার অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহারা সফল হইতে পারিতেছেন না।

সাধারণতঃ যুবকগণই অধিক বিষাদপ্রবণ। তাই যুবক লেখকদিগের রচনায় বিষাদের অন্তঃসলিল প্রবাহ প্রবহমান থাকে। যৌবনের পর সংসারে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা জন্মিলে, তবে লেখকদিগের রচনা খাঁটি হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু অনেক সময় তাহাতে আবার উৎসাহের অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে তেজ দেখা যায় না।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

সুমেরু-সন্ধান।

সুমেরু প্রদেশ এখনও আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহার চিরতুষারাবৃত আবাদে মানবের পদচিহ্ন ধ্বনিত হয় না। অল্পদিন পূর্ব্বে ন্যান্‌সেন সুমেরু প্রদেশে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট পিয়ারীও বিগত দ্বাদশ বৎসরে চারি বার সুমেরু-সন্ধানে গমন করিয়া, সুমেরু প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানের নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের (Northward over the 'Great Ice') বর্ণনা অবলম্বন করিয়া আমরা সুমেরু প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

ধরণীর উচ্চাবচ বক্ষে সুমেরু প্রদেশের তুষার ও বরফের বিলম্বিত হারের গ্রীনল্যাণ্ড মধ্যমণিস্বরূপ। সেখানে বৈষম্যবৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। তথায় মধ্যরাত্রে সূর্য্যোদয় হয়, আবার দিবাদ্বিপ্রহরে নৈশান্ধকারব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়! সেখানে গগনমণ্ডল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আকাশের মত; আবার সেখানে চিরতুষার-ব্যাপ্তি। সেখানে কোনও কোনও গিরিগাত্রে প্রাচীনকালীন অগ্ন্যুৎপাত-চিহ্ন বর্ত্তমান, আবার কোনও কোনও পর্ব্বত চিরতুষারমুকুটে মণ্ডিত! গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যভাগ চিরতুষারসমাচ্ছন্ন—দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বাদশ শত মাইল ও প্রস্থে প্রায় পঞ্চশত মাইল। এই তুষারমরুর তুলনায় সাহারার মরুভূমি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এখানে জীব নাই,—উদ্ভিদ নাই—এককণা বালুকাও নাই। সেই বরফবিস্তারের মধ্যে কেবল তিনটি জিনিস পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, দিগন্ত-প্রসারিত তুষারাচ্ছন্ন ভূমি, অন্তহীন নীল নভোমণ্ডল, আর শ্বেতশীতল সূর্য্য। এই সঙ্কটশঙ্কিল প্রদেশে, পিয়ারী ও তাঁহার পত্নী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া নানা জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছেন। বহুদিনের অভিলষিতদর্শন সুমেরু প্রদেশে উপনীত হওয়াই তাঁহাদের অভিলাষ। সেই তুষারাচ্ছন্ন সমতল ভূমিতে কোথাও কোনও অসমতা লক্ষিত হয় না। যেন কোনও দানব শিল্পী সেই তুষাররাশি লইয়া একখানি সমতল খণ্ডে পরিণত করিয়া গিয়াছে।

গ্রীনল্যাণ্ড।

এই তুষারদেশে গ্রীষ্মকালে চারি মাস কাল সূর্য্যাস্ত হয় না। সাধারণতঃ দক্ষিণ ভাগে সূর্য্যকর যেরূপ উজ্জ্বল, এ দেশে মেঘহীন আকাশে সূর্য্যকর সেইরূপ উজ্জ্বল। কিন্তু বরফে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যকর এত তীব্র হইয়া উঠে যে, গ্রীষ্মকালে কেহ পথ চলিতে আরম্ভ করিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অন্ধবৎ হইয়া পড়িবে—আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। নিদ্রা যাইতে হইলে চক্ষের উপর কিছু বাঁধিতে হয়—নহিলে কেবল চক্ষের পত্রে আলোকের গতিরোধ হয় না। আবার যখন আকাশে মেঘোদয় হয়, তখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য নাই, আকাশ নাই, তুষার নাই, চক্রবাল নাই—সবই একাকার! চারি দিকে কেবল ধূসর অন্ধকার-বিস্তার। এই তুষারদেশে যখন বায়ু বহিতে আরম্ভ করে, তখন তুষারস্তূপ ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতে থাকে। তখন চারি দিক ভ্রাম্যমাণ তুষারে পূর্ণ হইয়া যায়, নিশ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

আলোকে ও আঁধারে।

তুষারদেশের তুষাররাশি বিদূরিত হইবার কোনও উপায় না থাকিলে, তুষারস্তূপ ক্রমে অসম্ভব অধিক হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে সেখানে যেমন তুষাররাশি উৎপন্ন হয়, তেমনই আবার তুষাররাশি নির্গতও হইয়া যায়;—নানা কারণে এই তুষাররাশি জন্মভূমি হইতে দূরে যাইয়া পড়ে, এবং সলিলে পরিণত হয়।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চিরতুষারদেশও মানব কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। এই বিপদসঙ্কুল দেশে ইহারা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়াও জীবিত থাকে। ইহারা সকল গণিয়া কেবল দুই শত তিপ্পান্ন জন মাত্র। ইহাদের না আছে শাসনপ্রণালী; না আছে ধর্ম্ম; না আছে মুদ্রা; না আছে মূল্যবোধ; না আছে লিখিত ভাষা; না আছে কোনও সম্পত্তি; কেবল আছে কিছু পরিধেয়, আর আছে কয়খানি অস্ত্র! ইহারা লবণাদি না দিয়াই মাংস আহার ও রক্তপান করিয়া জীবনধারণ করে, এবং বিহগাদির চর্ম্ম পরিধান করিয়া শীতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে। দেখিলে বোধ হয়, যেন ইতর প্রাণিগণের সহিত ইহাদিগের কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা বিশেষ বুদ্ধিমান। শিশুর পক্ষে চন্দ্রপ্রাপ্তির আশা যেমন, ইহাদের পক্ষে একখণ্ড কাষ্ঠ পাইবার আশাও তেমনই দুরাশামাত্র। এক জন এস্কিমো একখণ্ড কাষ্ঠের জন্য লেখককে তাহার কুক্কুর, "স্লেজ"শকট, প্রাণিলোম, সকলই দিতে চাহিয়াছিল। আর এক জন একখানি ছুরিকার জন্য লেখককে তাহার পত্নী ও দুইটি সন্তান দিতে চাহিয়াছিল। একটি স্ত্রীলোক একটি সূচের জন্য তাঁহাকে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিল।

এস্কিমো জাতি।

ইহারা ব্যবহারে শিশুর ন্যায় সরল, আহার বিহারে পশুর মত; কিন্তু ক্ষুধা, শ্রম ও শীত সহ্য করিতে ইহাদের সমকক্ষ নাই।

লেখকের মতে, এস্কিমোগণ মঙ্গোলীয়ান;—তাহারা সম্ভবতঃ সাইবিরিয়া হইতে মেরুপ্রদেশে আসিয়াছিল। তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনও পরিষ্কার সংস্কার নাই;—কেবল তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা আরও উত্তর হইতে আসিয়াছিল। ইহাদিগের কোনও শাসনপ্রণালী নাই। প্রত্যেকেই স্বীয় পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাহার যেখানে ইচ্ছা, বাস করিতে পারে। কেহ সীল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোনও জীব মারিতে পারিলে, তাহা তাহার নিজ সম্পত্তি; নহিলে তাহা সাধারণের সম্পত্তি। তথাপি লোকে অপরকে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া থাকে।

আমাদের মাপকাঠির মাপে ইহাদিগের নীতির আদর্শ আদৌ উচ্চ নহে। ইহাদের ব্যবহারে পত্নী একটা সম্পত্তিমাত্র—ইচ্ছামত পত্নী-বিক্রয়, বদল, বাঁধা দেওয়া, এমন কি, ধার

দেওয়াও চলে। ডোঙ্গা বা "সেুজ" শকটের যেমন আদর, পত্নীর আদরও সেইরূপ। তবে ইহারা শিশুদিগের প্রতি ও স্থবিরদিগের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বিবাহপ্রথা নাই। শৈশবেই বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে; বাগ্‌দত্তা বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, দলের কোনও বিপত্নীক তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে; তাহার পর বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আপনার বাগ্‌দত্তা বালিকাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করে। বিবাহের পর প্রথম দুই এক বৎসর যুবকযুবতী প্রায়ই বহুবার পত্নীর ও পতির পরিবর্ত্তন করে—যেন যেটি চাহিতেছে, ঠিক সেইটি পাইতেছে না। তাহার পর স্থির হইয়া সংসারী হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস বড় অদ্ভুত রকমের। ইহারা ভাল ভূত ও মন্দ ভূতে বিশ্বাস করে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহাদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোনও তথ্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কিঙ্কর সেনের গড়।

জনপ্রবাদমূলক গল্প।

অনেক দিনের কথা, বোধ হয়, আড়াই শত কি তিন শত বৎসর হইবে,—তখন মুসলমানের গৌরব-রবি ভারতের মধ্যাকাশে শোভা পাইতেছিল,—হুগলীর নিকট একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বাস করিতেন। কোনও কারণে হুগলীর ফৌজদার তাঁহার উপর বিরক্ত হওয়াতে, তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। হতভাগ্য বেচারা একটি শিশুপুত্র ও স্ত্রীকে লইয়া একেবারে পথের ভিখারী হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে, নবাব-সরকারে একবার ফৌজদারের বিপক্ষে জানাইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু নিরুপায় কায়স্থসন্তান নীরবে আপনার কপালে হাত দিয়া বলিতেন, "যদি বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে এমন স্থানে দাঁড়াইব যে, যাঁহার বিচারের উপর আর কেহ বিচার করিবার থাকিবে না।" সকলে মনে করিত, তিনি বাদশাহকে জানাইবার কল্পনা করিয়াছেন। কেন না, তখন দেশের লোকের কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইত,—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" ফলতঃ, দরিদ্র, পীড়িত কায়স্থসন্তান অল্পদিনের মধ্যেই সনাথা পত্নীকে অনাথা করিয়া জগদীশ্বরের সিংহাসনের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ ইহসংসার ত্যাগ করাতে তাঁহার আর দিল্লীশ্বরের নিকট জানাইবার সুবিধা হইল না। ইহার পর প্রায় ১২। ১৩ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

১

হুগলীর দক্ষিণে চন্দননগর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, অতি সামান্য একখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীরের সম্মুখে বসিয়া, একজন দ্বাবিংশবর্ষীয় তরুণ

যুবা স্বহস্তরোপিত গুটিকত বার্ত্তাকু বৃক্ষের গোড়ার ঘাস পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময় দূরে পথে শব্দ হইল,—"মাছ নিবি গো!"

যুবকও উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "কি মাছ—নিয়ে আয় না দেখি—"

ক্ষণ কাল পরে এক কৃষ্ণবর্ণা স্থূলকলেবরা ধীবরপত্নী সগর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী সহকারে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কে মাছ নেবে গো! এস না।"

যুবক উঠিয়া গিয়া এক পয়সার মাছ লইয়া বলিল, "একটু পরে এসে পয়সা নিয়ে যাস্, মা এখন স্নান করিতে গিয়াছেন।"

ধীবরপত্নী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে বলিল,—"দেখো বাছা, যেন আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু বলে ভাঁড়াভাঁড়ি করো না।"

মৎস্যবিক্রয়কারিণী চলিয়া গেল।

ক্ষণ কাল পরে যুবক দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, মাতা আর্দ্রবসনে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন। মাতা, পুত্রকে তত বেলাতেও উদ্যানে কর্ম্ম করিতে দেখিয়া, স্নেহমিশ্রিত রোষে বলিলেন,—

"কিঙ্কর! বেলা হ'ল, যা' না, স্নান করে আয় না। রাত্তির দিন গাছের গোড়ায় বসে বসে কি হবে, যা যা, বেলা অনেক হয়েছে।"

"মা! গাছগুলাতে একবার বেগুন ধরিতে আরম্ভ হ'লে ছয় মাসের তরকারি একেবারে ঘরে বাঁধা থাকবে। এক পয়সার মাছ নিয়েছি—মাছের ঝোল রাঁধ,—আমি স্নান করে আসি।"

কিঙ্কর, (যুবকের নাম কালীকিঙ্কর, কি রামকিঙ্কর, যা হয় একটা কিছু হইবে, মা এবং প্রতিবাসিবর্গ তাঁহাকে কিঙ্কর বা কিঙ্কর সেন বলিয়াই ডাকিতেন) খণিত্র রাখিয়া হাত পা ধুইয়া স্নানে গমন করিলেন; যাইবার সময় মাতাকে মাছের দামের কথা কিছু বলিয়া গেলেন না।

মাতা যথাকথিত মাছের ঝোল রাঁধিয়া ভাত চড়াইয়া দিয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া বসিয়া অন্যমনে বোধ হয় আপনার অতীত চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই মৎস্যবিক্রয়কারিণী আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "মাছের পয়সা দাও।"

কিঙ্করের মাতা অন্যমনস্কা ছিলেন। হঠাৎ ধীবর-রমণীর কর্কশকণ্ঠে চমকিতা হইয়া বলিলেন,—"কি গা?"

কিছু পূর্ব্বে একজন কলহপ্রিয়া রমণীর সহিত তাহার বেশ এক পালা হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য ধীবরপত্নী সপ্তমে চড়িয়া ছিল; এক্ষণে কিঙ্করের

মাকে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, এবং অতিশয় পরুষস্বরে কহিল, "কি গা? জান না? ন্যাকা আর কি! বেটা মাছ কিনে নবাবী করেন, আর মাগী দাম দেবার বেলা ন্যাকা হ'ন! কি গা?"

"কিঙ্কর মাছ কিনেছে, তা আমায় ত কিছু বলে যায়নি; তা' জেলেবউ! রাগ করিস কেন, আজ হাতে পয়সা নাই, আর একদিন আসিস্, পয়সা নিয়ে যাস্; আজ কাছে একটি পয়সা ছিল, একজন কাণা ভিক্ষা চাইলে—তাই তাকে দিয়ে এসেছি; তা, আর একদিন আসিস্।"

অন্য দিন হইলে ধীবর-রমণী এই কথাতেই হয় ত চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ পূর্ব্ব হইতেই সে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছিল; সুতরাং কিঙ্করের মাতার কোনও কথা কানে তুলিল না; হাত নাড়িয়া বলিল,—

"দান করে এসেছ, খয়রাত করে এসেছ, বেশ করেছ। আমি ত আর চখের মাথা খেয়ে তোমার কাছে ভিক্ষা করতে আসিনি, আমার পাওনা পয়সা দাও, না হলে মাছ ফিরিয়ে দাও। দুয়ের এক না নিয়ে যদি আমি উঠি, তবে আমি জেলের মেয়ে নই।"

"মাছ কোথায় পাব? সে যে রেঁধে ফেলেছি।"

"সেই রাঁধা মাছই নিয়ে যাব।"

অনেক কাকুতি মিনতির পর যখন কিঙ্করের মাতা কিছুতেই ধীবরপত্নীর মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন (পাঠক! অসম্ভব মনে করিয়া হাসিবেন না) বাস্তবিকই ঝোল হইতে মাছগুলি আনিয়া ধীবররমণীকে দিতে গেলেন। তখনও মনে মনে ভরসা ছিল, বাস্তবিক রাঁধা মাছ লইবে কি? কিন্তু ধীবরপত্নী অম্লানবদনে প্রাঙ্গণস্থ কদলীবৃক্ষ হইতে যখন একটু পত্র ছিন্ন করিয়া লইয়া মাছ লইতে অগ্রসর হইল, তখন কিঙ্করের মাতার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি ধীবরপত্নীকে এই দুর্ব্বলতা দেখিতে দিলেন না। ধীবরপত্নী মাছগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে কিঙ্কর স্নানসমাপন করিয়া আসিয়া আহারে বসিলেন। মাতা নীরবে ভাত ও মাছশূন্য মাছের ঝোল দিলেন। কিঙ্কর ভাত খাইতে খাইতে মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মাতা আর থাকিতে পারিলেন না; গলদশ্রু-লোচনে ধীবরপত্নীর বৃত্তান্ত সমস্ত বলিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিঙ্কর শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয়দমনের অভ্যাস ছিল। তিনি ক্রোধ দমন করিয়া সহাস্যে বলিলেন,

"মা! এ ত বড় মজা! আমাদের পয়সা দিতে হ'ল না, অথচ মাছের ঝোল খাওয়া হ'ল! আর সে জেলে মাগীরও রাঁধতে হ'ল না। মাঝে থেকে রাঁধা মাছ পেয়ে গেল। একটা জেলেনীর সঙ্গে এই রকম বন্দোবস্ত করিলে মন্দ হয় না; রোজ রোজ মাছের ঝোল খাওয়া হয়!"

মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া এত দুঃখেও একবার হাসিলেন।

কিঙ্করের আহার সমাপ্ত হইল, মাতার আজ আর আহার হইবে না; কারণ, আজ একাদশী। মধ্যাহ্নে মাতাপুত্রে অনেক কথা হইল। কিঙ্করের ইচ্ছা, বিদেশে গিয়া কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মাতা কোন্ প্রাণে ছাড়িয়া দিবেন? যে আট বৎসরের পিতৃহীন শিশুকে তিনি একাকিনী পিতা ও মাতা উভয়ের স্নেহে বুকে রাখিয়া বাইশ বৎসরের করিয়াছেন, আজ কোন প্রাণে ছার পয়সার জন্য সেই পুত্রকে বিদেশে পাঠাইবেন? যদি বিদেশে বাছার পীড়া হয়, তাহা হইলে কি হইবে? কে বাছার মাথার শিওরে বসিয়া একমনে গায়ে হাত বুলাইবে? যাহার চাঁদ-মুখে স্বর্গগত স্বামীর প্রতিকৃতি দেখিয়া তিনি জ্বলন্ত অগ্নিতে কথঞ্চিৎ শান্তিবারিসেচনে সক্ষম হইয়াছিলেন; সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে প্রিয়তমকে অনন্ত বিরহরজনীতে ক্ষণমাত্র বিদ্যুদালোকস্বরূপ পাইয়া আবার স্বপ্নভঙ্গে গাঢ়তর অন্ধকার দেখিয়া যে প্রাণের বাছাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিতেন; আজ কোন প্রাণে সেই কিঙ্করকে, সেই অন্ধের নয়ন, দরিদ্রের মান, সম্পদের স্বাস্থ্য ও বিপদের আশাকে—প্রবাসে পাঠাইবেন? অন্যে পারে পারুক, তিনি ত কিছুতেই পারিবেন না।

কিন্তু অবশেষে তিনিও পারিলেন! বুঝিলেন, জননীর অতিরিক্ত স্নেহ-বর্ষণে অনেক সময় পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি অঙ্কুর-অবস্থাতেই ভাসিয়া যায়; তাই তিনি নিজে পাষাণে বুক বাঁধিয়া অগত্যা কিঙ্করকে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন। তিনি জানিতেন, হুগলীর ফৌজদার জীবিত থাকিতে কিঙ্করের হুগলীতে কিছুই হইবে না। সুতরাং তিনি কিঙ্করকে যাইতে দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। পর দিন প্রভাতে কিঙ্কর যাত্রা করিবেন, স্থির হইল।

অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, আমাদের একটা অবশ্য-পালনীয় ব্যাপার অবাধে আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়, আমরা কিছুই জানিতে পারি না; আবার অকস্মাৎ সামান্য কোনও ঘটনায় আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্যটা যেন একেবারে আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। কিঙ্কর বাইশ

বৎসরের হইয়াছেন, কিন্তু কখনও যে তাঁহাকে মাতার স্নেহময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর সংসার-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কি মাতা, কি পুত্র, কাহারও মনে তাহা উদিত হয় নাই। কোন রকমে কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান হইলেই যেন তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, অবশ্য-কর্ত্তব্য ব্যাপার সিদ্ধ হইল, মনে করিতেন। আজ ধীবরপত্নীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে কিঙ্কর অকস্মাৎ জানিতে পারিলেন যে, সংসারটা কেবল মাতার স্নেহের আচ্ছাদনে, বনচ্ছায়ার অন্তরাল-প্রবাহিণী নির্ঝরিণীর ন্যায় নিঃশব্দে প্রবাহিত হয় না; মধ্যে মধ্যে দারিদ্র্যের ভীষণ শৈলে প্রতিহত হইয়া বিপদ-সঙ্কুল হইয়া ওঠে। আজ জানিতে পারিলেন যে, এই জনাকীর্ণা বসুন্ধরার ক্রোড়ে কেবল তাঁহারা দুই জন মাতাপুত্র ব্যতীত আরও অসংখ্য নরনারী বাস করে; এবং সহস্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ, সংঘর্ষ, অনিবার্য্য। ধনবল থাকিলে এই কঠিন সংঘর্ষ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও হইতে পারে।

সমস্ত দিন কিঙ্করের যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। উদ্যোগই বা কত? দুইখানি বস্ত্র ক্ষার-জলে সিদ্ধ করিয়া মাতা উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করিয়া দিলেন। দারিদ্র্যে পতিত হইয়া মাতাপুত্রে বড় কাহারও সংস্রব রাখিতেন না; সুতরাং বড় অধিকসংখ্যক প্রতিবাসীর নিকট বিদায় লইতে হইল না। শুনিতে পাই, অনেক বিধবার না কি একাদশীর রাত্রি আর প্রভাত হয় না। কিন্তু কিঙ্করের মাতার সেই রাত্রি মুহূর্ত্তমধ্যে শেষ হইল। প্রত্যূষে মাতার স্নেহাশ্রু ও আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত হইয়া, মাতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক "মধুসূদন! মধুসূদন!" স্মরণ করিতে করিতে কিঙ্কর কুটীর ত্যাগ করিলেন। পুত্র চক্ষের অন্তরাল হইবামাত্র জননী দুই হস্তে হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া কুটীরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া অশ্রুজলে ধরণী সিক্ত করিতে লাগিলেন। হায়! স্নেহময়ী মনে করিলেন, বুঝি অশ্রুজলে কঠিন মৃত্তিকা কোমল করিয়া দিলে বাছার পদে নিষ্ঠুর ধরণী আর আঘাত করিতে পারিবে না,—বাছার পায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না!

২

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। মাতা এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে তিন বারমাত্র পুত্রের সংবাদ পাইয়াছেন। তখন এক পয়সার পোষ্ট-কার্ড ছিল না; দুই পয়সার টিকিট ছিল না। দূরত্ব-অনুসারে ডাকের খরচের ন্যূনাধিক্য হইত। তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠাইতে হইলে, অন্ততঃ পঞ্চাশৎ মুদ্রা ব্যয় করিতে হইত।

মাতা প্রথম সংবাদ পাইলেন, কিঙ্কর বর্দ্ধমানে গিয়া রাজ-সরকারে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বড় সুবিধা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পত্র পাটনা হইতে, এবং প্রায়ই ঐ মর্ম্মে লিখিত। শেষ পত্র পাইলেন, কিঙ্কর দিল্লীতে গিয়া এক জন বৈশ্য সওদাগরের তরফে পাঁচ টাকা বেতনে মুহুরী নিযুক্ত হইয়াছেন। সংবাদ পাইয়া মাতার নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল।

ভীষণ দারিদ্র্যে প্রতিপালিত হওয়ায় কিঙ্কর বড় ধৈর্য্যশালী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও শারীরিক অঙ্গসৌষ্ঠবও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি স্বীয় প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। এমন কি, উভয়ে ভিন্ন বর্ণের না হইলে, প্রভুর একমাত্র কন্যা লছমনিয়ার পাণিগ্রহণও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না।

* * * * *

বাদশাহের জন্মতিথি নরোজা উপলক্ষে আজ সমস্ত দিল্লী একটি সুসজ্জিত নাট্যশালা বলিয়া বোধ হইতেছে। চারি দিকে কেবল আমোদ, কেবল প্রমোদ, কেবল রহস্য, কেবল কলহাস্য, কেবল আতর গোলাপ, ফুলের মালা, পানের দোনা। এমন কি, আজ রাজধানীমধ্যে কাহারও উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিবারও হুকুম নাই।

কিঙ্করের প্রভুর বাটী লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌয়ের গায়িকা ও নর্ত্তকী বড় বিখ্যাত। সেই জন্য আজ নরোজা উপলক্ষে লক্ষ্ণৌয়ের প্রধানা গায়িকা মতি বাই দিল্লীতে আসিয়া কিঙ্করের প্রভুর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছে। আজ সন্ধ্যার পর রাজ-প্রাসাদে তাহার 'মুজরা' হইবে। এ নৃত্যসভায় কিঙ্করের প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল।

রাজবাটীর প্রাঙ্গণে স্থানে স্থানে অনেকগুলি নৃত্যসভা হইয়াছে; এক এক জন ওমরাও বা উজীর এক একটি সভার অধ্যক্ষ হইয়াছেন। বাদশাহ যাহার নৃত্য গীতে পরিতুষ্ট হইবেন, সে আশাতীত পুরস্কার পাইবে, এবং সেই নৃত্যসভার অধ্যক্ষও বাদশাহের সুনজরে পতিত হইবেন।

সন্ধ্যার পর বাদশাহ হীরক মুক্তা মাণিক্যে অলঙ্কৃত ও মখমল সাটিন কিংখাপে সজ্জিত হইয়া, অনুচর-পরিবৃত বাসবের ন্যায়, এক নৃত্যসভা হইতে অপর নৃত্যসভায় গমন করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে "বহুৎ খুব!" "তাজ্জব!"

"কেয়াবাৎ!" "হাজার রূপেয়া" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া নর্ত্তকীদিগকে আপ্যায়িত ও পুরস্কৃত করিতেছেন। অদ্য বিশেষ নিয়ম, পুরস্কার-ধ্বনি উচ্চারিত হইবামাত্র গায়িকা সেই মুহূর্ত্তে পুরস্কৃত হইতেছে। এইরূপে সম্রাট ক্রমে ক্রমে মতিজানের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিঙ্করের প্রভু বৈশ্য সওদাগর এই সভার অধ্যক্ষ। বাদশাহকে দেখিবামাত্র তিনি নত-জানু হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বাদশাহ কিয়ৎক্ষণ মতিজানের গীত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারই উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত নিকটস্থ সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন। সওদাগর ও গায়িকা উভয়েই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

যখন মতিজান বাদশাহের পদতলে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইয়া জয়-জয়ন্তী আলাপ করিতে লাগিল, তখন সঙ্গীতরসজ্ঞ সম্রাটের নয়নদ্বয় হইতে দর দর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল; সমবেত সভ্যমণ্ডলী সকলেই রুদ্ধনিশ্বাসে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কোনও প্রশংসাবাদ নাই। জয়জয়ন্তীর পর মতিজান "মধুরেণ সমা-পয়েৎ" ভাবিয়া খাম্বাজ ধরিল। সম্রাটের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, জয়জয়ন্তীর পর খাম্বাজ, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যেন কোনও চিরবাঞ্ছিতের যুগযুগান্তরব্যাপী বিরহবেদনার অপনোদন করিয়া প্রিয়তমের সম্মিলন করিয়া দিল। বাদশাহ উল্লাসভরে উঠিয়া আপনার কণ্ঠহার মোচন করিয়া স্বয়ং গায়িকার গলদেশে লম্বিত করিয়া দিলেন, এবং নিকটস্থ অনুচরকে বলিলেন, "লাখেরাজ হাজার।"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন; মহামূল্য কণ্ঠহার, তার উপর হাজার বিঘা লাখেরাজ!

উজীর তৎক্ষণাৎ হাজার বিঘার দানপত্র লিখিয়া দিলেন, বাদশাহও তদুপরি নিজ পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে সওদাগর-ভবনে, মতিজান স্বীয় অভাবনীয় শুভাদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কিঙ্কর গিয়া মতিজানকে যথাবিহিত সম্ভাষণ করিয়া তাহার সৌভাগ্যে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরও চারি পাঁচ জন লোক তথায় উপস্থিত হইল। কিঙ্কর মতিজানকে বলিলেন,

"বাইজি! আমি কখনও বাদশাহের পাঞ্জা দেখি নাই; তোমার দানপত্র-খানা দেখি—বাদশাহি পাঞ্জা কি প্রকার।"

সাহাস্যে মতি বিবি বাদশাহের পাঞ্জা-যুক্ত দানপত্র বাহির করিয়া কিঙ্করের হাতে দিলে, কিঙ্কর তাহা দেখিয়া একে একে সকলেরই হস্তে এক এক-

বার দেখিতে দিলেন। অবশেষে কিঙ্কর পুনরায় সেই দানপত্র লইয়া আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়া সহসা লেখনী লইয়া কি দুই চারিটি কথা দানপত্রে লিখিয়া দিলেন। এক জন দর্শক ভিন্ন আর কেহই তাহা দেখিতে পাইল না।

যে দর্শক কিঙ্করের এই কার্য্য দেখিল, সে এক জন উজীরের অনুচর। তাহার প্রভু কর্ত্তৃক আনীতা গায়িকা বাদশাহের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহারা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে অনতিবিলম্বে গিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বীয় প্রভুর নিকট বর্ণনা করিল।

যথাসময়ে এই ব্যাপার বাদশাহের কর্ণগোচর হইল। অধিকন্তু, "বাদ-শাহী পাঞ্জার উপর কলম চালে, এমন বেয়াদবও আছে," এই বাক্যে বাদশাহ কিছু অপমান জ্ঞান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দস্তুর মত সওদাগর, মতিজান ও কিঙ্করকে তলব হইল। কি জন্য তলব, কেহ কিছুই জানে না। অনেকে মনে করিলেন যে, বাদশাহ আবার বোধ হয় মতিজানের সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন, সেই জন্য এই এত্তেলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সওদা-গরের ডাক হইবে কেন? বিশেষতঃ কিঙ্করের সহিত বাদশাহের কখনও চাক্ষুষ সন্দর্শন পর্য্যন্ত ঘটে নাই; এমন কি, কিঙ্করের অস্তিত্বও বাদশাহ অব-গত নহেন; তবে কেন অকস্মাৎ অসময়ে এই রাজ-আহ্বান?

কুশাগ্রধী কিঙ্কর যেন কতকটা বুঝিতে পারিলেন। বাদশাহী দানপত্রে নিজের দুই একটি শব্দযোজনা ভিন্ন বাদশাহের সহিত তাঁহার কোনও সূত্রে কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। সুতরাং সেই সূত্র লইয়া যাওয়া উচিত, এই বিবেচনায় মতিজানকে দানপত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

দানপত্র লইয়া যথাসময়ে তিন জনে সম্রাটের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবা-মাত্র বাদশাহ একেবারে বলিলেন, "সেই দানপত্র কোথায়? আনিয়াছ?"

বাইজি অতি বিনীতভাবে দানপত্র প্রদান করিলে, সম্রাট বলিলেন,

"কাহার এত সাহস, কে এত বেয়াদব যে, আমার পাঞ্জার উপর কলম চালিয়াছে?"

সওদাগর কিছুই জানেন না, সুতরাং নীরব; বাইজিও স্তম্ভিত! কিঙ্কর রাজপদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,

"সাহেন-সা শাহাজাদা! এই ভৃত্য বেয়াদবি করিয়াছে, আমার প্রভু বা গায়িকা কিছুই জানেন না; তাঁহারা নিরপরাধ।"

বাদশাহ আরক্তলোচনে ডাকিলেন,—"জল্লাদ!"

সভাস্থ সকলের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সওদাগর ও বাইজি ভয়ে মৃতপ্রায় হইলেন। কিঙ্কর সাহসে ভর করিয়া কহিলেন,

জাঁহাপনা! প্রাণ দিব, তাহাতে ভয় পাই না। কিন্তু আমার দোষের বিচার হউক; অগ্রে দানপত্রে রাজদৃষ্টি পতিত হউক, পরে যদি বিচারে প্রাণদণ্ড হয়, সহাস্যে রাজ-ইচ্ছা সম্পাদন করিব।"

যুবকের সাহসে বাদশাহ বিস্মিত হইলেন, এবং দানপত্র উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, বাদশাহী পাঞ্জার উপর লেখা আছে,—

"বেগর্ তক্ত্ জাফ্রাণ।" *

সম্রাট দৃষ্টিমাত্রই উহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রধান উজীরের সহিত কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সভাসদ্‌গণ বাদশাহের মুখমণ্ডলে সন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। বাদশাহ ক্ষণে ক্ষণে কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রধান উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"জাঁহাপনার প্রসাদে, আমি জাঁহাপনার রাজ্য সুদূর বঙ্গদেশে হুগলীর নিকটে বাস করি।"

"শোন বাঙ্গালী! তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শিতা দেখিয়া বাদশাহ পরম প্রীত হইয়াছেন। তিনি তোমার বেয়াদবী মাফ্ করিলেন, অধিকন্তু তোমায় পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করেন। তুমি কি পুরস্কার ইচ্ছা কর?"

কিঙ্কর আনন্দে হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন, পরে কথঞ্চিৎ সংবিত প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,

"আল্লার প্রিয়তম সেবক বাদশাহের অনুগ্রহে আমি স্বধর্ম্মে ও স্বদেশে থাকিয়া বাদশাহের সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার মনে করি।"

উজীর বাদশাহের সহিত ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি বাদশাহের অনুগ্রহে তোমার স্বদেশের ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে; ঈশ্বর তোমাকে কর্ত্তব্যপালনের উপযুক্ত করুন।"

* অর্থাৎ, রাজসিংহাসন বা রাজবাটী, এবং জাফরাণ-ক্ষেত্র ভিন্ন হাজার বিঘা। তক্ত=সিংহাসন ও জাফরাণ=জাফরাণ-ক্ষেত্র। সমস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে, যে স্থলে রাজবাটী ছিল, তাহা ও কাশ্মীরের জাফরাণ-ক্ষেত্র, এই দুই স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য। যদি মতি বাই এই দুয়ের কোনও স্থান, অথবা উভয়েরই কিছু কিছু প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সম্রাটের বিশেষ ক্ষতি হইবে বোধ করিয়া, কিঙ্কর এই পদটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

সভাস্থ সকলে রাজাদেশের এই অকস্মাৎ শুভ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কিঙ্কর নীরবে বাদশাহের পদতলে পতিত হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* * * * *

সুদূর বঙ্গদেশে হুগলীর দক্ষিণে সেই ক্ষুদ্র চন্দননগরের তৃণকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া, এক জন প্রাচীনা চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। রমণী বয়সে প্রাচীনা না হইলেও, তাঁহার জীর্ণ শীর্ণ দেহে বার্দ্ধক্যের প্রায় সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। নীরবে অনেকক্ষণ সূতা কাটিয়া রমণী জীর্ণ অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"বাছাকে আজ প্রায় তিন বৎসর দেখি নাই, তবুও বেঁচে আছি? মাগো!—"

এমন সময় কুটীরের পার্শ্বে পদধ্বনি হইল। রমণী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় গোরু আসিতেছে; পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এক জন যুবা ও তাঁহার পশ্চাতে কয়েক জন অনুচর। রমণীর নয়ন, বোধ হয়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছু হীনজ্যোতি হইয়াছিল, তাই লোক দেখিয়াই বলিলেন,

"কে গা?—"

নিমেষমধ্যে যুবা বৃদ্ধা জননীর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,

"মা মা! আমি তোমার কিঙ্কর।"

তার পর, সেই একাদশীর ভীষণ বিদায়-রজনী, আর এই মধুর সম্মিলনের প্রভাত!

* * * *

কিঙ্কর সেন যেখানে স্বীয় আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া চতুর্দ্দিক পরিখাবদ্ধ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানকে লোকে আজিও "কিঙ্কর সেনের গড়" বলে। গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে।

সাহিত্য-পঞ্জী।

কোন গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রিবর,
বঙ্গ-সাহিত্যের পাঁজী, কহ, পূর্ব্বপর।

বাঙ্গালা সাহিত্যের তরী বা তৃণ, বহু স্রোতে, বহুবিধ বাতাসে, বহু বন্দরে, উজান ও ভাটি ভাসিয়া, এই ১৩০৫ সালে, কোন পোর্টে আসিয়া পৌঁছিয়াছে? তরী বা তৃণ কোন 'পাণি'তে আসিয়া পড়িয়াছে? তের শত পাঁচের পোর্ট-তত্ত্ব ও পাণি-মাহাত্ম্য কি?—পঞ্জীফল কি? পঞ্জিকাকর্ত্তাদিগের কাছে প্রথম প্রশ্ন এই।

তরী, তৃণ, তৃণতরী, তৃণের তরী, বা তৃণ হইতে পরিণত, বিবর্ত্তিত, বর্দ্ধিত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ তরণী! অথবা ইহার কিছুই নয়;—ইহা কেবল রূপক?

রূপক কি কেবল রসাত্মক? আদপেই 'রিয়ালিটি'র খাঁটি বস্তুত্ব-ব্যঞ্জক নয়? শুষ্কই কি কেবল বৈজ্ঞানিক, সরস বৈজ্ঞানিক কি হইতে নাই?

তথাচ বলি, তরী অথবা তৃণ, 'শুলুফ' অথবা শৈবাল, বাঙ্গালা সাহিত্য—বাঙ্গালা ভাষা। দীন ভাবে বলিলে এবং ক্ষীণ করিয়া বলিলে তৃণ—শৈবাল। শ্রদ্ধা করিয়া, সম্ভ্রম রাখিয়া, বা সোহাগ ঢালিয়া বলিলে, তরী—তরণী। অর্থ উভয় দিকেই আসলকেই দেখায়। রূপক 'রিয়ালে'র ব্যত্যয় নয়। রূপক রিয়ালেরই মেদ-মাংস-অস্থি-শিরা-শোণিত-গন্ধ-রস-যুক্ত রূপ। কেবল রূপ নয়; রূপক আসলের অত্যন্ত-অভিব্যক্ত আত্মা।

শুষ্ক, সিক্ত, সবুজ, যেমনই হউক, তৃণ তৃণই বটে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে যদি তৃণ বা শৈবাল বল, তবে, তাহা না হয় সিক্ত এবং সবুজ এবং সুন্দরই বল।

কিন্তু, তরণী নানানতর। জাহাজও তরণী, ডিঙ্গিও তাই। পিনেস্, পাল্সী, বোট, বজরা, বালাম, গহু, সোড়ঙ্গা, সামপান, শুলুফ, স্কুনার, কত রকমেরই তরণী! বৃহৎ, অতি বৃহৎ, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রও আছে। মাঝারি আকারেরও বিস্তর। তামার, লোহার, কাঠের, বাঁশের এবং বেতের নৌকাও দেখি। সোণার তরীতে কখনও চড়ি নাই; স্বচক্ষে, সে তরী দেখি নাই। কিন্তু, তাহা, স্বপ্নভূমে ও সোহাগের চুমে নিশ্চয়ই আছে। সুন্দর, কুৎসিত, দ্রুত, অতিদ্রুত, মন্থর, অতিমন্থর তরণী। মালবোঝাই কিস্তি, ভারশূন্য ভরা ও

ভারের জন্য, বস্তুর অভাবে, ব্যালাষ্ট-পূর্ণ তরীও জলপ্রবাহে ও কাল-প্রবাহে চলে। প্রয়োজনীয়-পণ্য-পূর্ণ তরীর ন্যায়, প্যাসেঞ্জারী নৌকাও কত! হেটো নৌকা, ঘেটো নৌকা, গহনার নৌকা বিদ্যমান। "বাবু বৈদ্যবাটী, নৈহাটী" নৌকা তোমরা দেখিয়াছ। শশা, তরমুজ, কচু, কাঁচকলা, তরী তরকারীর তরণীও তরঙ্গবক্ষে বহিয়া আসে। যে নৌকা হইতে জেলেরা জলে বায়, তাহাও বিস্তর ও বহুতর। বৈদ্যুতিক পোত হইয়াছে কি না, জানা নাই। কিন্তু বাষ্পীয় তরী বহু আকারে বিদ্যমান। এখন শ্রীমতীকে কোন শ্রেণী-ভুক্ত করিবে?

আমাদের বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যকে 'শুলুফ' বলা মন্দ নয়। শুলুফ বিলাতি জাহাজ অপেক্ষা ছোট এবং দেশী বড় কিস্তি অপেক্ষা বড়। শুলুফ সুন্দর, সুদৃশ্য ও সম্ভ্রান্ত। শুলুফ শান্ত, অথচ শৌর্য্যবন্ত। শুলুফ, হালে ও পালে চলে; কাপ্তেন, কর্ণধার, কুলি, খালাসী বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন লোকে তাহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে। শুলুফ বেদম বোঝাই খায়, বড় বড় সমুদ্র বহিয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে ধায়, ব্রহ্মে, চীনে, জাপানে যায়; বিলাতে মার্কিণেও মনে করিলে, যাইতে পারে। শুলুফ সময়ে সময়ে, বিলাতি জাহাজের সঙ্গেও টক্কর দেয়; দেশী ও বিলাতি মাল গর্ভে পুরিয়া বড় বড় বাহির দরিয়া পাড়ী দিয়া আসে। শুলুফের চাল্ চটুল চঞ্চলও নয়, অতি মন্থরে মৃতও নয়; গম্ভীরে দ্রুত। পরন্তু, শুলুফ খাঁটী হিন্দুও নয়, শাফ যাবনিকও নয়; দুয়েতেই মিশ্রিত। আর, উহা আদৌ বিদেশী বাহন নয়, বিশুদ্ধ দেশী বস্তু। শুলুফ খাস বাঙ্গলার খাঁটী বাঙ্গালী বাহন ও বাঙ্গালীর বাঙ্গলা হাতের গঠন। শুলুফ চাটগাঁয়ের গৌরব।

কিন্তু চাটগাঁয়ের নাম শুনিয়াই যে তুমি চমকিয়াছ, আর চোখ টিপিতেছ? চারা নাই! কিন্তু, চমকান কেন; মাথা চুলকানই বা কেন; চোখ টেপা-টিপিই বা কিসের জন্য? চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই হয়; চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিলেও চলে। চাটগাঁ, বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালার কোনও গাঁয়েরই কম নয়। চাটগাঁ, একই নিশ্বাসে, পুরাতনে ও নূতনে, প্রায় কাহনখানেক কবির নাম করিতে পারে,—যাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী, এবং যাঁহাদের মধ্যে দেশ-বিদেশবিখ্যাত অনেকগুলি। চাটগাঁয়ের নৈসর্গিক গঠন, সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, মানুষকে স্বভাবতঃ কবি করিয়া দেয়। তাই বুঝি বা "বাইশ কবি"র একত্র কোলাকুলি। কর্ণফুলীর জলের ভিতর হইতে কবিতা-কুমুদিনী কটাক্ষ করে,

জলের তরঙ্গে ক্রীড়া করে। বাবু, চাটগাঁ শুনিয়া, মাথা চুলকাইও না, মুচকি হাসি হাসিও না। সবিশেষ না জান, সাহিত্যের কোনও একখানা পাঁজি খুলিয়া দেখ। শুলুফ-শিল্পের মত সাহিত্য-শিল্পেও চাটগাঁ গরীয়সী।

তা, চাটগাঁয়ের সাহিত্য সম্প্রতি সমালোচ্য নয়; চাটগাঁয়ের শুলুফের বিষয়ই বক্তব্য। অতএব তাহাতেই আবার ফিরে আসি।

শুলুফে, সেকালের আটচালা চণ্ডীমণ্ডপের সাবেক চাল আছে; আবার একালের হাল 'বল্‌রুমে'র চটক চাকচিক্য, লাস বিলাস বাহারও বেশ আছে। গাখোলা গাড়ু, গামছা, তেলের বাটী, তামাকের গুল, চণ্ডীমণ্ডপের আধ-ময়লা ধূতি এবং 'দোবজা'র মত, পরদা-'পার্টিসন'-বেষ্টিত 'বাথ্‌রুমের' তোয়ালে, সাবান, এসেন্স-শিশি, এবং আয়না 'ফনি' * আছে। সেই জন্যই শুলুফ বাঙ্গালা সাহিত্যের সুযোগ্য বাহন, বা স্বয়ংই সেই সাহিত্য। কেন না, তাহা গুদাম ও ক্যাবিন, কম্বল ও কেদেরা, গাড়ু ও বদনা, গায়ত্রী ও নেমাজ, নিরামিষ হবিষ্য ও খানা ডিনারের,—অপিচ, গুড়ুক ও সিগারের স্বদেশীয় ও সমীচীন সংমিশ্রণ। ফলতঃ, বাঙ্গালীর সাহিত্যটিকে ষোল আনা একটি এসেন্স-শিশি করিলে চলে না; কেবলমাত্র একখানি 'ফ্যাশ্যনেবল্ ক্যাবিন্' করিলেও কুলায় না। তাহার গৃহে, গুদামে, বা গর্ভে, ভুষি দ্রব্যের খুবই বেশী দরকার হয়। শ্রীমতীর অঙ্গে সময়ে সময়ে, পাকশালার কস্তাপেড়ে শাড়ী, এবং সীমন্তে সর্ব্বদাই অন্ততঃ এক বিন্দু সিন্দূর না থাকিলে, তাঁহাতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালী গৃহস্থালীর সম্ভ্রান্ত মহিলার ভাব থাকে না। বিবিয়ানী 'ব্রেস্‌লেট' দিতে পার, বড়ই ভাল। কিন্তু বাজু বালা বাউটী ও শাঁখা সিন্দূর কাড়িয়া লইয়া নেক্‌লেস্-বিলাসিনী বিধবা সাজান কর্ত্তব্য হয় না। সিন্দূরহীন কালা-পেড়েতে, বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালিনীতে বড় কুৎসিত ভাব আসিয়া পড়ে। ফলতঃ, অস্মদ্দেশীয় সাহিত্যে স্বভাবতই কতকটা আটচালার ও পাকশালার ভাব থাকাই চাই; নহিলে তাহাকে বাঙ্গালা বলিয়া এবং বাঙ্গালীর বলিয়া চেনাই যায় না; তাহাতে বাঙ্গালী ভদ্র সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ততা পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যে, নিছক 'বল্‌রুম্' বা বাবুয়ানী বৈঠকখানা, বাঁধা হুঁকা, বেলফুল, উলঙ্গ বেণী ও বায়োলেট বসন হইলে, নিছক কোচ কেদেরা, কাচের বাসন ও গদির উপর ধবধপে জাজিম হইলে যে ভাব আসিয়া পড়ে, তাহা বলিতে নাই। বাঙ্গালীর প্রণয়িনী বা পত্নী পৃথিবীতে জন্মিয়া কেবলমাত্র

* 'ফনি' বা 'হনি'—(চাটগাঁয়ে) চিরুণী, কাঁকুই।

পাক করিবে আর প্রসব করিবে, পুষ্পবাস লইলেই পতিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্রায়ণ ও মস্তকমুণ্ডনের যোগ্যা হইবে,—ইহা যাহারা বলিতেছে বলুক, আমরা বলি না। কৃষ্ণ কুন্তল, কৃষ্ণ কবরী, কুসুমগুচ্ছে কুসুমমালায় সদাই শোভিত দেখিতে চাই। চাই কি, পাকগৃহেও তরি-তরকারির সঙ্গে, এক কুসুমের নিশ্বাসে অপর কুসুমের নিশ্বাস মিশুক, উভয়ের পবিত্রতায় ও সরলতায় সংসারধর্ম্ম সার্থক হউক; বাঙ্গালা সাহিত্য সজীব হউক! বস্তুতঃ বাঙ্গালিনীতেই সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রস্ফুটিত হওয়া প্রয়োজন। নহিলে আর কোথাও তাহা প্রকৃত প্রস্ফুটিত হইবে না। বলিবে, "এটা বিষম বিলাতি ভাব?" তুমি, বুঝিতে পার না, তাই এমন কথা বল। কাস্তে হাতে আছে, ঘাস কেটে ঘর বোঝাই কর। কাব্য কবিতা, সাহিত্য সমাজ ও সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে মিছা প্রলাপ বকিও না। কাব্য-রাজ্যে প্রবেশ করিতে, উদার নির্লোভ সত্ত্ব-গুণসম্পন্ন ভাবুক ব্রাহ্মণ হওয়া প্রয়োজন। বামুনের পৈতা ও বেণের চিন্তা লইয়া তথায় যাওয়া যায় না। কাব্য-রাজ্য পার হইয়া ধর্ম্ম-রাজ্যে পৌঁছিতে হয়। উভয়ের একই দ্বার।

কাব্য সাহিত্যের অসম্মান করিতে বসি নাই। কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইবার পর সিন্দূরহীন কালাপেড়েতে আর কবিতা থাকে না। বাঙ্গালীর গৃহে তাহা বেজায় বিসদৃশ ভাব। তাহা বিলাতি কবিতা হইতে পারে, কিন্তু কদাচ বাঙ্গালা কবিতা নয়। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে তাহা যেমন অসম্ভ্রমকর, বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালা কবিতায়ও তাহা তেমনই কুৎসিত ও কলঙ্কের ছবি। বিদেশিনীর সীমন্তেও বঙ্গীয় সিন্দূর না দিয়া, তুমি তাহাকে সাহিত্য-সঙ্গিনী করিতে পার না। করিলে তোমার বাঙ্গালিত্ব যায়; বিদেশিনীরও অসম্মান হয়। তোমরা নামহীন ইতরের স্তরে নামিয়া পড়; তাহারই মধ্যে মিশিয়া যাও।

কেবল বাঙ্গালা কবিতাই বাঙ্গালা সাহিত্য নয়। সাহিত্যে কবিতা, অকবিতা, কুসুম কণ্টক, হাড় মাস, মিছরী মরিচ, সব জিনিসই থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর সম্ভ্রম দিয়া সম্মান করিয়া বলিতে হইলে, তাহাকে 'শুলুফ' বলাই শ্রেয়। সাহিত্যটির সব দিকের শরীর-গঠন গড়পড়তা একত্র লইয়া আদর করিয়াই আমরা তাঁকে শুলুফ বলিতেছিলাম। নহিলে, শ্রীমতী সর্ব্বত্রই যে শুলুফ, তা নয়।

ইনি ইদানীং নানা দিকে নানা আকারের তরণী। এক সহরের মধ্যেই

ইহাঁর আঠারো রকমের আকার। ভবানীপুর, খিদিরপুর অঞ্চলে এক-রকমের আকার; শোভাবাজার বাগবাজার অঞ্চলে আর এক রকমের। এক চিৎপুর রোডেই, হয় ত চৌদ্দ রকমের। যোড়াসাঁকোর মোড়ের মাথায় এক মূর্ত্তি, গলির ভিতর সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপ। পাথুরেঘাটায় আবার পৃথক আকার; বিডন ষ্ট্রীটে ও বটতলায় বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ। তার পর, কলুটোলা, কপালীটোলা অঞ্চলে অন্য কত রকম ঢঙ্। কর্ণওয়ালিসে কলেজ-ষ্ট্রীটে আবার (বটতলারই মত) রকম বিরকমের ঢপ ও ঢঙ্ যাইয়া ঢালোয়া মিশিয়াছে।

শ্রীমতী কোথাও সৌধপুরে প্রকাণ্ড পান্সী—পান্সীর পরে মাছরাঙ্গা রঙ্গের মিহি পাল। কোথাও মহাজনী নৌকা—রসিক নেয়ে—নামাবলীর হাল্। কোথাও চটুল চঞ্চল, একহারা অতিদ্রুত লাল ডিঙ্গি। কোথাও অতিমন্থরগতি বা একান্তগতিহীন গদুর গদু। 'শফরী-ফরফরায়তে'র সামনেই যেন আজন্ম-জঠুর পাষাণশৈল। ঠাকুরাণী কোথাও পুরাণ কাঠামে নবীন ঠাট। কোথাও জাপান-বার্ণিসে শিমুল কাঠ। কোথাও বিল্বপত্রী পতাকায় বেল্লিকের বোট। কোথায়ও বিবিয়ানি বাজরো—টুকটুকে ঠোঁট। কোথাও ফুলের তরী—ফিরিঙ্গি দাঁড়ী। কোথাও তিল তুলসী, কোসাকুসী ও কুশাসনে আধ-ঢাকা পিঁয়াজ রশুনের নৌকা—নেয়ে শুঁড়ী। শ্রীমতী কোথাও সাতাইশ শতপদী সরিষার ভরা, যেন অহিফেনের নেশায় নঙ্গর ফেলিয়া নিয়তই চক্ষু মুদিয়া আছেন। আবার, কোথাও, তাড়ীবোঝাই হেটো নৌকায় বত্রিশ দাঁড় বাহিয়া, সারিগানের বাহার উড়াইতে উড়াইতে উধাও ছুটিয়াছেন। কোথাও ইহাঁর ভগ্ন কিস্তিতে ধর্ম্ম খেয়া। কোথাও বাণিজ্যের বাতাস বুঝিয়া মাল ও প্যাসেঞ্জার নেয়া। সাহিত্য-তরী কোথাও খাল-অঞ্চলের 'খাজনা খেটে'। কোথাও বা বাঙ্গাল মাঝীর 'নাও'; কোথাও বাবুভেয়ের ময়ূরপংখী ভাউলে। কোথায়ও মেছুনীবেষ্টিত মাছের ডিঙ্গি। কোথাও শুঁটকী-মাছ-বোঝাই গাধাবোট। সমস্ত স্বরূপগুলি লইয়া আমরা শ্রীমতী সাহিত্য-তরীকে 'শুলুফ' বলিতে সাহসী হইয়াছি।

এ সবই কিন্তু রূপক। রূপক না রাখিতে চাও, রগড়াইয়া ফেল; নিঙ্গড়াইয়া লও। তাহাতেও নারাজ নহি।

কিন্তু, সেই রূপকেই আবার পৌনঃপুনিক প্রশ্ন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তরী,—বাঙ্গালা ভাষার তৃণ, কোন্ তীর হইতে প্রথম নামিয়াছিল? সেটি কি

আর্য্য-স্বর্গের মন্দাকিনীতীর,—হিন্দুতীর্থ, সভ্য-সলিলের শুভ্র সৈকত, অথবা অনার্য্য আরণ্য পর্ব্বতের অসভ্য অজ্ঞাত কালাপাণির কুৎসিত বেলাভূমি! সেখানে কি আর্য্য পিতামহগণের পবিত্র যজ্ঞোপবীতপ্রসূ কৃষ্ণসার সারাদিন ক্রীড়া করিত, অথবা বর্ব্বরের বন্য শূকরের পাল অষ্টপ্রহর পালে পালে চরিত? বাঙ্গালা ভাষা, সংস্কৃতের স্বর্গ হইতে, প্রাকৃতের পূত পুণ্য পীযূষপ্রবাহে, সটান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, অথবা বন্য বানরের কচকচি কিচিমিচি হইতে ক্রমে কলেবর পাইয়া, সংস্কৃতের সহবাসে, সাধে এবং সোহাগে, সভ্যা ভব্যা সম্পদশালিনী হইয়াছে? ঠাকুরাণীর রূপে, লাবণ্যে, রসে, রুচিতে ত নানান জাতির, নয় শত নিরনব্বই বর্ণের, বর্ণসঙ্করের, অপসদের, অপ্সর, কিন্নর, কিরাত নিষাদের, অনেকানেক যবন, ম্লেচ্ছ ও কল্প মল্লের সঙ্করাৎ-সঙ্কর বর্ণের শাসন-চিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, সর্ব্বপ্রথম কোন জীবের জিহ্বা-মূলে ইনি জন্মিয়াছিলেন, বা জাগিয়া উঠিয়াছিলেন? শ্রীমতী অদিতির বা দিতির দুহিতা? পুলহপুত্রী, অথবা প্রজাপতির পৌত্রী, কিংবা কদ্রুর কন্যা? কোন-বংশ-সম্ভূতা আজকার বাবু-সাহিত্যের বিবি বঙ্গভাষা?

আর্য্য ঠাকুরেরা উত্তরকুরু হইতে বঙ্গভাষা মুখে করিয়া বঙ্গে আসিয়াছিলেন, অথবা বঙ্গে আসিয়া বঙ্গভাষাকে পাইয়াছিলেন? বন্যা বাঙ্গালিনী বিদেশীর শাসনে, প্রলোভনে ও প্রণয়বন্ধনে পড়িয়া, বশীভূতা, আত্মবিস্মৃতা, পুনর্গঠিতা ও স্বগোত্রবর্জ্জিতা হইয়াছিল,—বিদেশীর বিক্রমে বন্দিনী, বৈভবে বিমুগ্ধা ও বিলাসে বিচলিতা হইয়া, বাঙ্গালিনী, বিদেশীর গৃহের দাসী হইয়াছিল, দাসী হইয়া, মার্জ্জিতা, সজ্জিতা, নিজত্ববর্জ্জিতা, অনুলোমবিবাহিতা হইয়াছিল, অথবা বাঙ্গালিনী বিদেশীর বিদেশ হইতে আনীতা, বেদমন্ত্রে বিবাহিতা বৈধ পত্নী? দাও পঞ্জিকাকার! প্রথমে এই সোয়ালের জবাব।

বাঙ্গালা ভাষার বীজ বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিল, বাঙ্গালাতেই ছিল, অথবা বিদেশ হইতে আসিয়াছিল? বাঙ্গালা বলিতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নয়, তাহা বুঝিলাম; স্বীকারই করিলাম। বিহার ও উড়িষ্যা বাদ দিয়া কেবল 'লোয়ার প্রভিন্সেস্' রাখিলাম; তাহা হইতেও আবার বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ 'ডিভিসন' বাহির করিয়া দিলাম। সাঁওতাল পরগণাও দিলাম। তবুও কি আদি বাঙ্গালা, 'প্রাইমেরি' বাঙ্গালী পাইব না! পাইবই বা কিরূপে? পশ্চিম বাঙ্গালা ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন,—পূর্ব্ববাঙ্গালা ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ। তবে বঙ্গ কই? বাঙ্গালী কে তখন ছিল? রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বীরভূম,

নদীয়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, জঙ্গল-মহল, রামগড়, পাচেটী, পালামো প্রভৃতি ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রকৃত বাঙ্গালা, প্রথম বাঙ্গলা, খাঁটী বাঙ্গালা নয়। পশ্চাৎ বাঙ্গলা হইয়াছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষও বাঙ্গলা নয়; তাহা এখনকার আসাম। পশ্চিমেও নয়, পূর্ব্বেও নয়, উত্তরেও নয়, দক্ষিণেও নয়, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ুতেও নয়, অধোতেও নয়, ঊর্দ্ধতেও নয়, বঙ্গসুন্দরী তবে ছিলেন কোথায়? সে বঙ্গ ছিল তবে এ বঙ্গের কোন অঙ্গে?

সুন্দরী কি তবে ছিলেনই না? অথবা ছিলেন কেবলমাত্র নামে? অথবা ছিলেন কেবল চাটগাঁয়ে, চাঁদপুরে, কুমিল্লায়, ত্রিপুরায়, আর ঢাকায়? কেন না, শুনি পূর্ব্ব-বঙ্গেই নাকি ছিল খাঁটী বঙ্গ, বিশুদ্ধ বঙ্গ। সেটা অবশ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষের পশ্চিমে বটে। কিন্তু, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি তবে বঙ্গ হইল কেন? আর হইলই বা কবে? কেবল বাঙ্গালরাই যদি খাঁটি বাঙ্গালী, তবে বাঙ্গালেরা বাঙ্গালী কেন? চাটগাঁ বা চাটগেঁয়েরা ত বাঙ্গাল, বদ্ধ বাঙ্গাল। কিন্তু, নদে শান্তিপুরে পশ্চিমে সোহুরেদেরই মত চাটগেঁয়েরাও বাঙ্গালকে বাঙ্গাল বলিয়া বিদ্রূপ করে; বরং বেশী রকম করে। চাটগাঁয়ে যে সব বাঙ্গালীর চৌদ্দ পুরুষেরও বেশী বাস, যাঁরা নিজে তথাকথিত বাঙ্গালের বাঙ্গাল, তাঁরাও ত বাঙ্গালকে উঠিতে বসিতে বেত্রাঘাত করেন। একি রহস্য! চাটগাঁয়ের বহুকালের প্রবাদবাক্য,—

"কি বলবো বাঙ্গালেরে, বুঝ্‌তে নারে ঠারে ঠুরে,
দু চার লাথি পেলে ঘারে, তবে বাঙ্গালে বুঝতে পারে।" *

এ কি বিভ্রাট! চাটগেঁয়েরা এই রূপে বাঙ্গালের বুকে মুখে লাথি মারেন। বলা বাহুল্য, পশ্চিমে বাঙ্গালী, বাঙ্গালের প্রতি এতটা বীভৎস ব্যবহার করেন না। কিন্তু, কথা এই যে, চট্টলীরাই যখন বাঙ্গালকে এমনই করিয়া লাঞ্ছনা করেন, তখন বাঙ্গাল কে, আর বাঙ্গালের উপর এই অত্যাচারই বা কেন? ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, যে সব চট্টলীদের সময় হইতে উল্লিখিত প্রবাদবাক্য চলিত হইয়াছে, তাঁহারা খাঁটী চট্টলী নহেন, পশ্চিম-বঙ্গ—পৌণ্ড্র, গঙ্গারাঢ়, গৌড়াদি প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া চট্টলে বসবাস করিয়াছিলেন, এবং আদিম চট্টলীদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া লাথি মারিতেছিলেন। ভাল, তাহাই যেন হইল। এবং ইহাও যেন বুঝাইল যে, পৌণ্ড্র গৌড়াদির লোক চট্টলে উপ-

* চট্টগ্রামের প্রবাদপুস্তক। চট্টগ্রাম জিলার বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে. ডি. এণ্ডারসন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১৮৯৭।

নিবেশী অধিবাসী হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালী হইলেন। অতি উত্তম কথা। কিন্তু গঙ্গারাঢ় গৌড়াদি গোটা দেশগুলা বাঙ্গালা হয় কেন, এবং সেই দেশগুলার সমস্ত লোকগুলা বাঙ্গালী হয় কেন?—যদি বাঙ্গালই বাঙ্গালী, আর পূর্ব্ব-বঙ্গই বাঙ্গালা? বঙ্গ ও বাঙ্গাল যদি এতই ঘৃণিত ও নিন্দিত, তবে গঙ্গাতীরের ও পশ্চিমের পাঁচ সাত গণ্ডা পৃথক পৃথক প্রদেশ সটান বঙ্গ ও বাঙ্গালী হইয়া পড়ে কেন? যখন,—

"বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু।"

তখন এ দুর্গতি কেন, এবং দুর্গতির পরেও এত দৌরাত্ম্য কেন? বাঙ্গাল যদি মনুষ্যই নয়, তবে একই টানে এত কোটী মনুষ্য—সভ্য সুমার্জ্জিত মনুষ্য, অমনুষ্য বা অবুঝ বাঙ্গাল, অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া, তখনই আবার বাঙ্গালকে দু' পা দিয়া থেঁতলায় কেন? এ কি বিসদৃশ ব্যাপার!

বলিবে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ওয়ালারা ও পুণ্যশ্লোক প্রাকৃতভাষীরা বাঙ্গালাতে আসিয়াই বাঙ্গালী হইয়াছে, আপনাদের ভাষার ঐশ্বর্য্য দিয়া বাঙ্গলা ভাষা বানাইয়াছে, অথবা অসভ্য বাঙ্গালকে আপনাদের সভ্য ভাষা দিয়াছে; বাঙ্গালকে বিজিত বশীভূত করিয়াছে, জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মশীল করিবার জন্য, সে কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কত পাঠ পড়াইয়াছে, তথাপি বাঙ্গাল সবিশেষ শোধরাইতে পারে নাই। অতএব উক্ত সংস্কৃতের সুসভ্য ও প্রাকৃতের পরিমার্জ্জিত পয়গম্বরগণ—পয়গম্বগণের বংশধরগণ, বঙ্গে বাস-জনিত বাঙ্গালী হইয়া গেলেও, বাঙ্গালার পূর্ব্বাধিবাসী বর্ব্বরদিগকে ও সেই বর্ব্বরদের বংশধরদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও ঘৃণা লাঞ্ছনা করিবেন বই কি? করিবারই ত কথা।

তোমার এ উক্তিতে যুক্তির একটা মহা আড়ম্বর ও আওয়াজ থাকিলেও, অজ্ঞাত আসল কাণ্ডখানা বুঝাইতে কিন্তু আট্‌কে যায়। কৈফিয়তটাতে কোনও দিকে কুলায় না। ফলতঃ, তুমি ঐ উক্তি করিতেই পার না। কেন না, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্তি, গঙ্গারাঢ় গৌড়াদি যখন পৃথক পৃথক প্রদেশই হইল, তখন তথাকার অধিবাসীরা পৌণ্ড্রী, গঙ্গারাঢ়ী ও গৌড়ী না হইয়া বাঙ্গালী 'কহলায়' কেন, বাঙ্গাল ও তখনকার বাঙ্গালী যদি এতই হেয়,—এতই অশ্রদ্ধেয় হয়?

বঙ্গ কোথায় ছিল? বাঙ্গাল কাহারা? আসল বাঙ্গাল, আদিম বাঙ্গাল কই? তাহাদের কেহই কি এখন একটিও নাই? তাহারা কি ক্রমে ধ্বংস

নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে! অথবা সভ্য উপনিবেশীদের অঙ্গে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে?

পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্য বঙ্গের বাঙ্গালীর বিবেচনায় এখন যাঁহারা বাঙ্গাল, তাঁহারাও দেখিতেছি, বাঙ্গাল-বিদ্বেষ্টা। ইহার তাৎপর্য্য কি? বাঙ্গাল কে?

পূর্ব্ব-বঙ্গের অতিপ্রান্ত সীমায় বসিয়া ইহা লেখা যাইতেছে। এখানে "বাঙ্গাল" কথাটার খুবই চলন। মুটে মজুর, চাষা ও মূর্খরাই বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণিত। তথাচ তাহাদিগকেই বা বিশুদ্ধ বাঙ্গাল বলি কেমন করিয়া? কারণ, এখানকার অধিবাসী, মুসলমান ও মগ। হিন্দু, শূদ্র, বৈদ্য, ব্রাহ্মণগণ উপনিবেশী। এখন বল, ইহাদের মধ্যে বাঙ্গাল্ কে? মগ মগই। ব্রহ্মের অধিবাসী; এখানে উপনিবেশী। অতএব নিশ্চয়ই বাঙ্গাল নয়—বাঙ্গালীও নয়। ইহাদের কথাও বাঙ্গালা নয়, কিছুই বাঙ্গালা নয়। তার পর, মগকে যেমন, মুসলমানকেও প্রায় তেমনই কখনও বাঙ্গাল বা বাঙ্গালী বলিতে পার না। মগ ও মুসলমান জাতীয় উপাধিই অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিতেছে যে, তাহারা, অর্থাৎ তাহাদের অতিদূর পূর্ব্বপুরুষেরা, বঙ্গদেশবাসী নয়; সুতরাং তাহারা (এক্ষণে কৃত্রিম বাঙ্গাল হইলেও) অকৃত্রিম বাঙ্গালই নয়। মগেরা বাঙ্গালা বলে না। মুসলমানেরা বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা বা বাঙ্গালে কথা কহে বটে,—কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙ্গালী বা বাঙ্গাল একের বা দুয়ের কিছুই নয়—হইতেই পারে না। ইহারা উভয়ই উপনিবেশীদের বংশাবলী। হিন্দুরাও তাই, অগ্রেই বলিয়াছি। এখন বল, যে বাঙ্গালের উপর বাঙ্গালের বিদ্রূপ এবং বিদ্বেষ, সে বাঙ্গাল কই—সে বাঙ্গাল কাহারা—সে বাঙ্গাল কোথায়?

এ অঞ্চলে "কৃষ্ণনগরী" বলিয়া এক আধ-ইতর শ্রেণীর হিন্দু আছে। তাহাদের জল চলে না, হুঁকা চলে। বামুনেও তাহাদের হুঁকায় মুখ দিয়া গুড়ুক ফুঁকে। কৃষ্ণনগরীরাও আসল বাঙ্গাল নয়, তাহারা বিশিষ্টরূপেই উপনিবেশী। তাহাদের সুদূর পূর্ব্বপিতামহেরা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই তাহারা কৃষ্ণনগরী। "ধরণী-ঈশ্বর" কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণনগরীরা উঠিয়া আসিয়া অগ্রে যাইয়া উপনিবাস পাতিয়াছিল আরাকানে। কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগরীরা কোন জাতি ছিল, জানি না। শুনি জল-চল হিন্দু ছিল। কিন্তু, আরাকানে আসিয়া "বৃষলত্ব" পাইয়াছিল; বোধ হয়, কিছু ব্রহ্মীকৃত হইয়াছিল; শুনি শূকর খাইয়াছিল। ক্রমে

তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। ক্রমে সে বংশের কতক চাট্‌গাঁয়ে চলিয়া আসে। মহীষখালী দ্বীপে ও অন্যান্য স্থানে আড্ডা করে। শুনি, সেখানেও না কি ইহারা সেকালে শূকর আহার করিত। কিন্তু, এখন আর করে না। এখন ইহারা বেশ ঝরঝরে, খরখরে হিঁদু। এদের বামুন আছে;—বৈদিক মন্ত্রে এদের পূজা পাঠ হয়; বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সংস্কার হয়। পোরইকোরার বিশিষ্ট বৈদ্য-বংশ রায়-কানুনগো বাবুদের বদান্যতায় এদের হুঁকা চলিয়াছে। চাটগাঁয়ের হুঁকায় হিঁদুয়ানি বাধে না। এই অত্যুপাদেয় শ্রান্তিহর শান্তিহর আরাম-আয়েস-আবল্য-দায়ক, দেবপ্রলোভনীয় দ্রব্যটি তথায় সার্ব্বজনিক, সার্ব্বজাতিক। ইহা অবশ্যই উদারতার পরাকাষ্ঠা। এই পেয় পদার্থে প্রভেদ নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র, নবশাখ, সকলেরই একই "ডাবা"। তাহার স্বর্গ-সুখদায়ক ছিদ্রে ন্যায়ালঙ্কার ও নরসুন্দর একত্র চঞ্চু স্পৃষ্ট করিয়া সুধা পান করে। জল-চল হিন্দু সজল হুক্কা ভরিয়া মুসলমানের হস্তে দেয়। মুসলমানের মুখস্পৃষ্ট হুক্কা স্পর্শ করিয়া তাহা পুনঃপুনঃ প্রস্তুত করিয়া দেয়। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান! চাটগাঁয়ে হুঁকা—চল, আর সচল দধি। মুসলমানের পাতা ও মথা দধিতে ব্রাহ্মণভোজনও হয়। এই দুইটি দ্রব্য ব্যতীত চাটগেঁয়েরা গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়ারও গোঁড়া। কিন্তু, আমরা, অজ্ঞাতে, বিষয়ের বহির্দ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত কৃষ্ণনগরীরাও বাঙ্গাল নয়। পুরাতন ভূগোল-পরিচয়ানুসারে তাহারাও পশ্চিমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনী বটে; কেন না, নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে তাহারা উঠিয়া আসিয়াছিল।

তবে বাঙ্গাল্ কে? বাঙ্গালা কোথায়? পূর্ব্ব বঙ্গই যদি পুরাতন বাঙ্গালা হয়, তাহার পূর্ব্বাধিবাসী বিশুদ্ধ বাঙ্গাল্ ত একজনও খুঁজিয়া পাই না।

বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা কহিলেই বাঙ্গাল হয় না। পশ্চিমে বাঙ্গালীদের সেটা বুঝিবার ভুল। এ ভুল—এই বিষম ভুল, বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—ইহা আশ্চর্য্য বটে!

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। "ডিটেক্‌টিভ্" নামক ক্ষুদ্র গল্পটির আখ্যানবস্তু সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। বিষয়নির্ব্বাচনে ও ঘটনার সমাবেশে নিপুণতার পরিচয় নাই। লেখকের লিপিকুশলতার অভাবে বর্ণিত ঘটনাগুলি নিতান্ত খাপছাড়া ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। গঠনকৌশল এমন দুর্ব্বল যে, বর্ণিত ঘটনাপরম্পরার দুই তিনটি স্তর অতিক্রম করিলেই পাঠকের সম্মুখ হইতে গল্পটির রহস্য-যবনিকা সহসা অপসৃত হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে অকালে পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহের অবসান হইয়া থাকে। বোধ হয়, লেখক নূতন ব্রতী। তিনি আখ্যানবস্তুর রহস্যরক্ষায় ও গল্পগঠনে বিফল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী প্রশংসনীয়। অল্প পরিসরের মধ্যে ডিটেক্‌টিভের সন্দিগ্ধ প্রকৃতি দক্ষতাসহকারে চিত্রিত হইয়াছে। মন্মথর চরিত্রও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ঘটনাবিন্যাসের দোষে তাহার আদ্যোপান্তে সঙ্গতি নাই। যে অতিসাবধান আত্মসংযত মন্মথ বুদ্ধিকৌশলে প্রতি পদে চতুর গোয়েন্দার অনুসন্ধান বিফল ও কৌতূহল উদ্দীপিত করিতেছে, সেই মন্মথ ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া আপনার প্রণয়দেবতার সাক্ষাৎলাভের যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিল, তাহা গল্পটির উপসংহারের পক্ষে আবশ্যক হইলেও, মন্মথ-চরিত্রের সহিত আদৌ তাহার সামঞ্জস্য নাই। এই সকল ত্রুটির অতিক্রম করিতে পারিলে, লেখক ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করিবেন। "বর্ষামঙ্গল" একটি উৎকৃষ্ট মনোরম কবিতা। কবি সুনিপুণ তুলিকায়, উজ্জ্বলকোমল বর্ণরাগে, প্রাবৃট-লক্ষ্মীর 'স্নিগ্ধসজল' ঘনশ্যামল শ্রী চিত্রফলকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে কত যুগযুগান্তের বিগত বর্ষার গাথা কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকে, সংস্কৃত কাব্যকাহিনীর প্রাবৃট-ঘনচ্ছায়া সুখস্বপ্নের মত হৃদয় আচ্ছন্ন করে। আমরা কবিতাটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে ;
নিখিল চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা!

"কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক্ স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা!
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা!

"আন্ মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় নব গীত কর রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী!
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী!

"স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী ;
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী ;
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী!

"যূথী পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলোনা,
নীপশাখে বাঁধ ঝুলনা!
কুসুম পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধ ঝুলনা!

"এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বন-বীথিকা!
গীতময় তরুলতিকা!
শতেকযুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা!
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।

"আমার ছাত্রাবস্থা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বীয় ছাত্রাবস্থা ও তদনীন্তন শিক্ষাপদ্ধতির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ ও অতিশয় চিত্তাকর্ষক। শ্রদ্ধাস্পদ বসু মহাশয় সরলহৃদয়ে সৎসাহসসহকারে উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"এইরূপ মাংস ও জলসংস্রবশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা মনে করিতাম।" যে শিক্ষায় সভ্যতা সম্বন্ধে এমন 'সর্ব্বনেশে' সংস্কারের বীজ অন্তর্নিহিত থাকে, তাহার কোথাও কোনও অঙ্গহানি ছিল, মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু সেই শিক্ষা হইতেই রাজনারায়ণ বাবুর মত নির্ভীক সত্যানুরাগী আত্মদোষোদ্ঘাটন-সাহসী চরিত্রবান পুরুষের উৎপত্তি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন হয় ত সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ শিক্ষিত সমাজের চক্ষে বিকৃতভাবে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু এইরূপ সত্যানুরাগ ও আত্মানুসন্ধানের দৃষ্টান্ত অধুনাতন শিক্ষিত সমাজে আদর্শস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। "পট্টবস্ত্র" প্রবন্ধে বাঙ্গলার বিনষ্ট রেশম-বাণিজ্যের অতীত ইতিহাস ও তাহার পুনরুদ্ধারের উপায় বিবৃত হইয়াছে। আশা করি, এই প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের অবধান আকৃষ্ট হইবে। "লাপ্লাটার প্রাণিতত্ত্ববিৎ" প্রবন্ধে "দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ হড্‌সন সাহেবের রচিত 'লাপ্লাটায় প্রাণিতত্ত্বসন্ধায়ী' এবং 'পাটাগোনিয়ায় অলস পর্য্যটন' নামক" গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন, "হায়! আমরা বৈরাগ্যমন্ত্রে পুরুষানুক্রমে দীক্ষিত; মানুষকেই মানুষ জ্ঞান করি না, তা পোকা মাকড় পশু পক্ষী তৃণ গুল্ম কত সামান্য।" বাঙ্গালী-চরিত্রে অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির অভাব, তাহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য;—কিন্তু সে বিষয়ে 'বৈরাগ্যমন্ত্র' বেচারার কতখানি অপরাধ, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ভারতীয় ঋষিগণের প্রচারিত 'বৈরাগ্য-মন্ত্র' ভারতবাসীর চরিত্রে কি কি বিশেষত্বের উৎপাদন করিয়াছে, এবং তাহা হিতকর না অহিতকর, লেখক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই বিচার্য্য বিষয়ের বিচার বা সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল পরিহাসমধুর বচনবিন্যাসের 'রসান' দিয়া, 'বৈরাগ্য-মন্ত্রের' প্রতি কুটী করিয়াছেন। যে সকল বিষয় মানবের ধর্ম্মসংস্কারের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা লইয়া এমনতর ছেলেখেলা না করিলেই শোভন হয়। "ব্রিটিশ গায়েনার কুলি" সুখপাঠ্য। "ব্যারিষ্টার" একটি নক্সা'। চিত্রকর আঁকিতে জানেন, কিন্তু চিত্র-বস্তুর নির্ব্বাচনে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় পাইলাম না। ব্যারিষ্টারের দারিদ্র্য ও তজ্জন্য তাহার লাঞ্ছনা লইয়া লেখক যে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। দারিদ্র্যের মধ্যে যে শূন্যগর্ভ বড়মানুষীর ভান দেখা যায়, তাহা বরং বিদ্রূপের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণা ও অভাবের জীবন্ত লাঞ্ছনা বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইলে, নিতান্ত নিষ্ঠুর আক্রমণ-রূপে প্রতীয়মান হয়।

মুকুল। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। "গ্লাডষ্টোন" প্রবন্ধটিতে ছয়খানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। প্রবন্ধটির ভাষা ও রচনাভঙ্গী বালকদের উপযোগিনী নহে। "মাছের বাসা" একটি সুখপাঠ্য সচিত্র

প্রবন্ধ। "জর্জ মুলারের" জীবনচরিত শিক্ষাপ্রদ। "আগ্নেয়গিরিদর্শন" একটি ক্ষুদ্র রচনা, কিন্তু সুপাঠ্য ও মনোরম। "পুষ্পময়ী" একটি সুমিষ্ট উপকথা।

উৎসাহ। আষাঢ়। "মাতার আহ্বান" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। রবীন্দ্র বাবু আজকাল স্বরচিত কবিতায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল ও কবিতা সার্থক হউক। "হেষ্টিংসের শিক্ষানবিশী" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের রচিত। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিশ্বরচনা" ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাসের "নীল", এই দুইটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সৎসঙ্গ। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের রচিত "বীরভূমি" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট হইতেছে। ভূ-প্রদক্ষিণ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেনের "হিন্দুধর্ম্ম" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। লেখক নিজে যদিও 'গোঁড়ামী' পরিহার করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনিও 'গোঁড়ামী'র সমর্থন করেন না।

স্বাস্থ্য। আষাঢ়। আমরা দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দেখি নাই। "স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ", "ছেলের অসুখ ও মাতার জ্ঞাতব্য", "দুগ্ধ" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পূর্ণ ও উপকারী। "প্লেগরোগ ও টীকার ফলাফল" সময়োপযোগী। আশা করি, "স্বাস্থ্য" ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

হিন্দু-পত্রিকা। আষাঢ়। "আমিত্বের প্রসার" ও "হিন্দু ও আর্য্য" প্রবন্ধ দুইটি পাঠযোগ্য। সম্পাদক এবার "গীতাভাস" নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের ভাষা আর একটু সহজ হইলে ক্ষতি কি?

নির্ম্মাল্য। আষাঢ়। "আকবর সাহ" প্রবন্ধটির বিষয়গুণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাববশতঃ নিরাশ হইতে হয়। লেখক 'বাজে বক্তৃতা' পরিত্যাগ করিয়া ঘটনাসংগ্রহে অবহিত হইলে, প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য হইতে পারে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের "অন্তিমে" ইতিশীর্ষক কবিতাটি সুরচিত, কিন্তু নিরাশার অন্ধকারে অত্যন্ত সমাবৃত।

কোহিনুর। প্রথম খণ্ড; প্রথম সংখ্যা। আষাঢ়। "আমাদের নিবেদনে" প্রকাশ,—"হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থ 'কোহিনুর' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। উদ্দেশ্য মহান্; আশা করি, সম্পাদক সফল হইবেন। হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাম্য বস্তু; যিনি এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণেও সিদ্ধিলাভ করিবেন, তিনি উভয় জাতির আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। "গ্লাডষ্টোন্ ও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা" ও "সোসলেম সমাজ-সংস্কার" প্রভৃতি প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট না হউক, পাঠযোগ্য। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধনির্ব্বাচনে অধিকতর অবহিত ও উত্তরোত্তর কৃতকার্য্য হইবেন।

পুণ্য। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। "স্ত্রী-শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "প্রাকৃত মহারাষ্ট্র" প্রবন্ধে মহারাষ্ট্র দেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেউস্কর মহাশয়ের লিপিকৌশলে ও গবেষণাগুণে "প্রাকৃত মহারাষ্ট্র" উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীমুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "কর্ম্মবীর গ্লাডষ্টোন্" প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। গ্লাডষ্টোনের ছবিখানি দেখিলে চেনা যায়, কিন্তু যথাযথ হয় নাই। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "আমিষ ভোজন" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। লেখক বলেন, "তিন দিক হইতে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শরীর-রক্ষার কথা, বিজ্ঞানের বিষয়; খরচের কথা অর্থশাস্ত্রের বিষয়, তার পর ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা।" এই তিন পথে বিচার বিতর্ক করিয়া উপসংহারে

লেখক বলিয়াছেন,—"মনুষ্য অভাবে প্রকৃতির নিয়োগে জীবনরক্ষার জন্য চিরকাল পশুমাংস ভোজন করিয়া আসিতেছে। ইহাতে এক হিসাবে অধর্ম্ম নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকল মনুষ্যের মতই নির্ব্বিকার চিত্তে মাংস ভোজন করিতেন; কেন না তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তাহাই মানবের প্রাচীন ধর্ম্ম। দেবতার প্রীতির জন্য পশুবলি হইত; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ইতিহাস; একেশ্বরবাদী ইহুদীরাও জেহোবার মন্দিরে বিবিধ প্রাণী হত্যা করিত। এই কারণে বৈদিক যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা। শস্যপূর্ণ ভারতভূমিতে কৃষিবৃত্তিপরায়ণ আর্য্যসন্তানের আর তেমন জীবহিংসার প্রয়োজন হয় নাই; জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্তঃকরণে নূতন ভাবের উদ্বোধন করিল। আশা করিতে পার, মনুষ্য বিজ্ঞানবলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হইবে যেদিন আর নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হইবে না, সেদিন সমগ্র পৃথিবীতে অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। এখনও মনুষ্যের সে অবস্থা হয় নাই। মনুষ্যকে জ্ঞানাভাবে ও শক্তির অভাবে অদ্যাপি প্রাচীন হিংস্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতীতের প্রতি ভক্তিপরায়ণ মনুসংহিতাকার মনুষ্যের প্রাচীন ধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। নূতন ধর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃতিকর্ত্তৃক বঞ্চিত দুর্ব্বল ক্ষুধার্ত্ত মানবকে এই পরমধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল। অগত্যা মনুসংহিতাকারের সহিতই বলিতে হয়,—

'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।"

"যোগিবর পবহারী বাবা" শ্রীমতী উমাশশী দেবীর রচিত। লেখিকা এই প্রবন্ধে গাজীপুরের সুপ্রসিদ্ধ পবহারী বাবার সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনবৃত্ত সঙ্কলিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব। তৃতীয় ভাগ; প্রথম সংখ্যা। আষাঢ়। "হেগেলের ভেদাভেদবাদ", "মুক্তি ও অনন্ত উন্নতি" দার্শনিকগণের উপযোগী। এই সংখ্যায় শঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদের সূচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সম্পূর্ণ হইলে এই অনুবাদ জ্ঞানার্থীর উপকারে আসিবে। এই সংখ্যায় The Presupposition of Psychology" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলা কাগজে ইংরাজী প্রবন্ধ কেন?

প্রদীপ। আষাঢ়। "বন্ধু-বৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর রচনা। বঙ্কিম যেমন লোকপ্রসিদ্ধ, তাঁহার কাহিনী তেমন সর্ব্বজনবিদিত নয়। বঙ্কিমের জীবনের কথা আমরা এত অল্প জানি যে, বঙ্কিম-প্রসঙ্গের কণামাত্রও আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বক্তা, তাঁহার মুখে বঙ্কিম-কাহিনী শুনিয়া সাধারণে নিঃসন্দেহ তৃপ্ত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর ও চন্দ্রনাথ বাবুর চিত্র আছে। চিত্র দু'খানি ভাল হয় নাই। "সমরু" শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের রচিত ঐতিহাসিক সন্দর্ভ; এই সংখ্যায় সূত্রপাত হইয়াছে। "চৈতালী সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য" শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের লিখিত। আলোচ্য প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কৃত "চৈতালিসমালোচনা"র প্রতিবাদ। তৃতীয় গ্যারায় লেখক বলিতেছেন, "সোণার তরী পাঠে আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।" এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। রমণী বাবু অনায়াসে 'নিজের ছাগল ল্যাজের দিকে কাটিতে' পারেন, তাহাতে কাহার কি আপত্তি? কিন্তু লেখক নিজে যে অধিকার সম্ভোগ করেন, অন্যকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে নিমেষের জন্যও সঙ্কুচিত নহেন। 'সোণার তরী' সম্বন্ধে লেখকের মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন; কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর "হিং টিং ছট্" নামক কবিতাটি পড়িয়া, "তর্ক-বৈচিত্র্যের" সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মনে যে ভাবের 'উদ্রেক'

হইয়াছিল, তাহা রমণী বাবুর মতে "বিকৃত ব্যাখ্যা।" রবীন্দ্র বাবুর কবিতা সম্বন্ধে রমণী বাবুর সহিত যাঁহাদের মতভেদ হয়, তাঁহারাই "উহার মর্ম্মগ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।" সাহিত্য-জগতে এমন কোন বিধি নাই, যাহার বলে সকলকেই রমণীমোহন-নামক মল্লিনাথের কৃত ব্যাখ্যাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। রমণী বাবু "সাহিত্যে"র এই নগণ্য সম্পাদকের প্রতি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন! "সাহিত্য"-সম্পাদক সম্বন্ধে লেখক দয়া করিয়া লিখিয়াছেন,—"সাহিত্য-সমাজপতি বলিয়া যাঁহারা পরিচিত হইতে অভিলাষী, তাঁহারাই যখন সহজে এরূপ একটা কবিতার অর্থবিভ্রাট ঘটাইতে পারেন;" ইত্যাদি। লেখক কোন্ সূত্রে অবগত হইলেন যে, এই দীনতম "সাহিত্য"-সম্পাদক সাহিত্য-সমাজপতি" বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী? বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষিত ছাত্রকে, এক জন অপরিচিত ভদ্রলোককে গালি দিবার জন্য মিথ্যা কথার ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এই শিষ্টাচার ও সৌজন্য তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বাবুর কাব্য, না তাঁহার নিজের সমাজ, কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? তাঁহার দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, সাহিত্য-সম্পাদক একটি সরল কবিতার অর্থবিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। কমা দিয়াও গানটি পুনর্ব্বার পড়িয়া দেখিলাম, এবং এখনও আমার বিশ্বাস, "মম হৃদয়-শয়ন মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে, মম অন্তরে থাকি থাকি" "কেবল কষ্টকল্পিত চর্ব্বিতচর্ব্বণ নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক"—যদিও রমণী বাবুর এই ধৃষ্টতার মত পরিমাণে তত অধিক নয়। লেখক রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনা হইতে বিবিধ অংশ উদ্ধৃত করিয়া, রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক আশা করেন, তাঁহার মত সকলেই রবীন্দ্রনাথের লিখিত বিন্দু ও বিসর্গ পর্য্যন্ত অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। নিধু বাবু গাহিয়াছিলেন,—"তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে," এবং "যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে।" সমালোচক তেমনই রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা দিয়া তাঁহার পদ্য রচনার সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত যে সর্ব্ববাদিসম্মত না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে যে পৃথিবীতে অন্যান্য বিবিধ মত বিদ্যমান,—রবীন্দ্রবাবুর অবলম্বিত বা প্রচারিত মতের বিরুদ্ধ মত যে অন্য সমালোচকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এ বিষয়ে রমণীবাবু সম্পূর্ণ অন্ধ। তিনি হেমেন্দ্রপ্রসাদের আরোপিত দোষের নিরাসার্থ যুক্তির অবতারণা করেন নাই,—প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর অভিমতমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর অভিমত রমণীবাবুর পক্ষেই প্রমাণ ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে—অন্যের পক্ষে নহে। এই 'সহজ' সম্ভাবনা ও 'সরল' সত্যটুকু রমণীবাবুর মস্তিষ্কে আদৌ উদিত হয় নাই, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। 'চৈতালি' সম্বন্ধে নিজের মত একান্তে রাখিয়াও অনায়াসে বলা যাইতে পারে, রমণী-বাবুর কৃত প্রতিবাদের ভিত্তি নাই। তিনি বলিয়াছেন, "চৈতালির রীতিমত সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতার বহির্ভূত।" লেখকের এ কথা সত্য। লেখক প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছেন,—"এ দেশে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার এখনও সমুচিত আদর হয় নাই! * * * নব্য বঙ্গে রবীন্দ্রবাবুর ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য না হইলেও তাঁহার প্রতিভার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে।" লেখকের এই উক্তির মধ্যেও অনেকটা সত্য আছে। নহিলে 'চৈতালি'-সমালোচনার এমন যুক্তিসম্পর্কশূন্য ভক্তিমাত্রসম্বল প্রতিবাদ আমাদিগকে দেখিতে হইত না। রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ নামক সেনাপতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। 'ভগবান! রবীন্দ্রনাথকে এমন ভক্তের কবল হইতে রক্ষা কর!'

কবিতাকুঞ্জ।

কুহুরব।

নবীন প্রভাতে আজি কানন-ভবনে
শুনি তোরে শুধু মোর পড়িছে স্মরণে
বিজন যমুনা-তটে তমালের ছায়
দ্বাপরের সে বিরহ-বিধুরা বালায়;
শ্রাবণ গগন সম নীল নবঘনে
আঁখি যা'র ছেয়েছিলি প্রেমের স্বপনে;
বরষি সুবাস সম বেদনা তরল
ঢেকে দিয়েছিলি যা'র মরমের তল;
নিভৃতে হৃদয়-দাহী অনলের প্রায়
প্রাণ যা'র ভরেছিলি রভস-তৃষায়;—
হায় কোথা সে কিশোরী? কোথা সে কিশোর?
কোথা বা ব্রজের কুঞ্জ, রজনী উজোর?
শুধু সে বিরহ-ব্যথা বজ্রের সমান
গলে পলে হানে আজি জগতের প্রাণ!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বর্ষান্তে।

আজ মনে পড়ে সেই হৃদয়-আকাশে
ধীরে ধীরে ফুটেছিল নবীন প্রণয়,
পূর্ণিমা নিশিতে সেই দক্ষিণা বাতাসে,
প্রাণে জেগেছিল কত আশা, কত ভয়!
তা'র পরে কত দিন গিয়াছে বহিয়া,
সুখে দুখে দু'জনার কেটেছে জীবন,
সে প্রেম অতীতে আজ গেছে মিশাইয়া
তাই সে দিনের স্মৃতি হয়েছে স্বপন।
আজ প্রাণে চেয়ে দেখি মরু চারিধার,
বিফল বাসনা কাঁদে হৃদয়-শ্মশানে;
সে প্রেম, সে সুখ, আশা, কিছু নাহি আর,
বেদনা জাগিছে শুধু কাতর পরাণে—
আজ কিছু নাহি,—ছিল সে দিন যেমন
তাই ঘৃণা আনিয়াছে প্রেমের মরণ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মৃত্যু।

সাড়া নাহি শব্দ নাহি আঁধার রজনী;
আজি মনে হয় মৃত্যু বুঝিবা এমনি!—
অস্তমিত জীবনের সায়াহ্ন-শয়নে
ঘন কৃষ্ণ পক্ষ মেলি মুদিত নয়নে
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস- আঘ্রাণ বিহীন
আসিবে মরণ-নিশা! ম্লানজ্যোতি ক্ষীণ
নিভে যাবে আঁখিতারা!—বিস্মৃতি-সলিলে
ডুবে যাবে প্রাণ-দীপ!—অসীম নিখিলে
পড়ে র'বে ছায়াখানি! তীর-তরু-তলে
নিশির শিশির সম কার আঁখিজলে
ভাসিবে নয়ন দুটি টের নাহি পাব!
অতলের তলে কোথা হ'তে কোথা যাব!—
স্বপ্ন হ'তে মৃত্যু, তার পরে জাগরণ
কাল-পারাবারে পুনঃ হইবে কখন!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ কথা।

আর কেন?—মরণের রথে
আমি রাণী দাঁড়ায়েছি এসে,
তুমি সুখে ফিরে যাও ঘরে,
আমি যাই অজানিত দেশে।

আর কেন দেখাতেছ সখি!
ও আনন—ম্লান শশধর,
পাছে ভুলি মরিবার সুখ,
তাই ডরে দুর্ব্বল অন্তর।

দেবী তুমি ফিরে যাও ঘরে,
সেথা তোমা ডাকে শত মুখে,
অধমের ভীষণ শ্মশান
দাঁড়ায়ে দেখিবে কেন দুখে?

এক দিন বাসন্তী সন্ধ্যায়—
সে যে আরও বহুদিন গেলে,
এইখানে এস ধীরে ধীরে,
অমনি করুণ দিঠি ঢেলে।

এইখানে রেখ পা দু'খানি,
ভূ লুটিয়া পড়িবে আঁচল,
অভাগার চিতা-রজঃ মাঝে,
দিও দুই ফোঁটা আঁখিজল।

জগতে তা জানিবে না কেহ,
কেবলি জানিবে ভস্মরাশি;
তাহে—সেই চিতাদগ্ধ প্রাণ
পুলকে হইবে স্বর্গবাসী।

শ্রীমানকুমারী বসু।

নদীতীরে।

দুরন্ত শিশুর মত খেলা-অবসানে
ঘুমায়ে পড়েছে যেন বিশাল তটিনী।
শোভিছে গগনে মেঘ রঞ্জিত বরণে;
বিহগ ফিরেছে নীড়ে, স্তব্ধ কলধ্বনি।
আর্দ্র বায়ু অলসেতে বহিছে সুধীরে,
শ্যাম সিক্ত বৃক্ষ হ'তে ঝরে বারিকণা।
সপ্তমীর অর্দ্ধচাঁদ আকাশ-উপরে,
একটি তারকা হায়! হারায় আপনা।
পর পারে সন্ধ্যালোক আসিছে ঘনায়ে,
শ্যাম তরু-শিরে স্পর্শে নীল মেঘরাশি।
মহানদী কিছু দূরে গিয়াছে মিশায়ে,
তটিনী গগনে যেন দোঁহে যায় মিশি।
একাকী দাঁড়ায়ে কূলে ভিজে আঁখিকুল
হৃদয়ে জনমে কত মোহময় ভুল।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কোকিল।

১
কেরে তুই পরী-পাখী, উঠিলি কুহরি?
শুধু তোরি তানে,
বসন্ত-আনন্দ এল কি যেন মায়ায়
প্রকৃতির প্রাণে!
লতার শ্যামল কায়
পুলক-পল্লবে ছায়;
ফুল আঁখি মেলি চায় তোরি মুখ পানে!

২
যুগযুগান্তর ধরি অনন্ত নূতন
ওই কুহু স্বর,
ধরার সৌন্দর্য্য যেন ওরি অমিয়ায়
হয় সুমধুর!
সলিল-প্লাবন সম
কল স্বর নিরুপম
ছাপি' বন, শ্রবণের তৃষা করে দূর!

৩
দক্ষিণ বাতাস বহে ফুল গন্ধ নিয়ে,
নিশি ভোর ভোর,
কনক-কুন্তল-খোলা ঊষার নয়নে
মৃদু ঘুম-ঘোর!
আধ-জাগা শিশু-ঠোঁটে
কি সুখ-হাসিটি ফোটে,
শিয়রে বকুল-ডালে 'কুহু' ডাকে তোর!

৪
রৌদ্র-পীত তপ্ত মাঠে চরিতেছে গাভী
দ্বিপ্রহর বেলা,
বসিয়া বাঁধের ধারে অশথ-তলায়
রাখাল একেলা;
কোথা হ'তে 'কুহু' তান
উলসিল তার প্রাণ,
বাঁশীতে ধরিল সুর ভুলে সব খেলা!

৫
মুকুলিত-আম্রবনচ্ছায়াঘন বাঁকা
গ্রামপথ দিয়ে
জলকে সাঁঝের বেলা চলে বধূ, কাঁখে
কলসীটি নিয়ে;
সহসা আড়াল থেকে,
কি 'কুহু' উঠিস্ ডেকে;
স্বপনে ফেলে সে বালা আপনা হারিয়ে!

৬
বিজন বসন্তরাতে সুপ্ত চন্দ্রালোকে,
মুক্ত বাতায়নে,
নবীন প্রেমিক দুটি বাঁধা বাহুপাশে
মিলন-শয়নে;
ওই মৃদু 'কুহু, কুহু',
এনে দেয় মুহু মুহু,
কি সুখ-সুধার নেশা দোঁহার নয়নে!

৭
গান সাথে মরে যাবে শত শত পাখী
চিরদিন ধরি',
প্রকৃতি চাবে না কারে, রবে শুধু বুকি
তোরে বুকে করি।
তুই নন্দনের কবি,
সঙ্গীতরাজ্যের রবি,
বাঁধা এ বিশ্বের বীণা 'কুহু'-সুরে তোরি!

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

মানবের সুখ।

জোনাকির ক্ষীণ আলো সম
মানবের সুখ এ ধরায়;
অন্ধকারে আলো করি ক্ষণ,
অন্ধকারে অমনি মিলায়।
অন্ধকারে ওই আলো সম
কেহ ফিরে তার পানে চায়,
আঁখি মুদে মোহের তন্দ্রায়
কেহ পরে করে হায় হায়!

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।



শ্রীনগেন্দ্র[illegible]।

শিশু-প্রকৃতি।

মানব-প্রকৃতির রহস্য কি জটিল! যতই আমরা সভ্য ও উন্নত হইতেছি, ততই যেন দুর্ব্বল ও অসহায় হইয়া পড়িতেছি। বাহ্য প্রকৃতিকে যতই করায়ত্ত করিতেছি, শরীর ও মানস প্রকৃতি ততই যেন দীন হীন হইতেছে। যখন বনে বনে ধনুর্ব্বাণহস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তখন প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল; তখন প্রকৃতি যেন স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এখন প্রকৃতিকে আমার অধীন করিতে যাইয়া প্রকৃতির সে স্নেহ যেন হারাইয়াছি, প্রকৃতি আমার বিমাতা হইয়া বসিয়াছেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট আগে পিতৃস্থানীয় ছিলেন, এখন কংগ্রেস করিয়া যেন তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি।

আগে জল বায়ুর পরিবর্ত্তনের সহিত আমার প্রকৃতির এত সংগ্রাম ছিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় এত কাতর হইতে হইত না, রোগের সংখ্যা এত ছিল না, প্রখরতা এত তীব্র হইত না। তখন কোমল হস্তে প্রকৃতি আমাকে পালন করিয়াছিলেন। যতই বসনের বিলাস, অশনের মাধুর্য্য, ঔষধের সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই কঠোরতর হস্তে প্রকৃতি আমাদের শাসন করিতেছেন। যখন অসহায় হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়দেশে শরণ লইয়াছিলাম, তখন প্রকৃতির আদরের সীমা ছিল না; এখন সাম্য মৈত্র স্বাধীনতা স্থাপন করিতে গিয়া, যাহা ছিল, তাহা হারাইয়াছি; যাহা ছিল না, তাহাও পাইলাম না।

ব্যাবৃত্তির উৎকর্ষে মানব-সন্তান জীবমণ্ডলীর শিরোমণি, কিন্তু সদ্যোজাত মানবশিশুর ন্যায় অসহায় অবস্থায় আর কোনও জীব-সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া সংসারসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না। কাহারও শীত-বাত-নিবারণের উপযোগী আচ্ছাদনে দেহ আচ্ছাদিত থাকে; কেহ আত্মরক্ষার উপযোগী আয়ুধ লইয়া জন্মগ্রহণ করে; জীবনরক্ষার উপযোগী আহারসঞ্চয়ের শক্তি অনেকের থাকে; টিকটিকী অণ্ড হইতে বাহির হইয়া, মশক-জন্ম লাভ করিলেই, আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যশিশুর মত নিরায়ুধ নিরাচ্ছাদন নিঃশক্তি আর কেহ নহে। পৈতৃক মানস শক্তির পরিমাণ নিকৃষ্ট জীবে সামান্য হইলেও, নিকৃষ্ট জীবশিশু পৈতৃক শক্তির যথেষ্ট সঙ্গে লইয়া

জন্মগ্রহণ করিতে পারে। পিতৃ-প্রাপ্ত মানস শক্তির তুলনায়, স্বোপার্জ্জিত মানস শক্তি নিকৃষ্ট জীবের সামান্য। মানবশিশুর অন্যরূপ। তাহার জন্মগ্রহণের সময় মস্তিষ্ককোষের আচ্ছাদন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ; যেন ছাদহীন গৃহ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসঞ্চালনের শক্তি সামান্য; চর্ম্ম কোমল; শীত-বাত-নিবারণের উপযোগী লোমাবরণ অকিঞ্চিৎকর; নখদন্তাদি আয়ুধ নগণ্য; মায়ের স্তন পান করিবার শক্তি না দিয়াই বিধাতা তাহাকে প্রেরণ করেন। এমন অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় কোন পিতা শিশুসন্তানকে বিদেশে পাঠাইতে পারেন? নিকৃষ্ট জীব-সন্তান সংসারসংগ্রামের উপযুক্ত শিক্ষা ও শক্তিলাভের জন্য, পিতা মাতার আশ্রয়ে সামান্যকাল অতিবাহিত করে; মানবকুমার অতি দীর্ঘকাল অতি যত্নে লালিত পালিত শিক্ষিত না হইলে, শৈশবেই ভবলীলায় উত্থাপন করে। সদ্যোজাত মানবশিশুর উপস্থিত মূল্যে কেহ কুকুর-শাবক বিনিময় করিবে না। মানবকুমার নিতান্ত অসহায় বলিয়া জননীর হৃদয়ে এত প্রভূত স্নেহ, দেহে এত প্রভূত শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে। পিতা মাতা উভয়ে তাই সমবেত যত্নে এত দীর্ঘকাল সন্তানের লালন পালন করেন। নিকৃষ্ট জীবে কেহ অণ্ড প্রসব করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়; পশুদের সন্তানপালনে মাতার সহায়তার তুলনায় পিতার সাহায্য সামান্য; পক্ষীদের [illegible] সাহায্য সমান, কিন্তু অনতিদীর্ঘ-কালস্থায়ী। এত দীর্ঘকালস্থায়ী ও [illegible] অতুলপরিমাণ স্নেহ দম্পতির হৃদয়ে সঞ্জাত না হইলে, মানবসমাজের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা ছিল না।

দম্পতির অতুল স্নেহে কাষ্ঠপুত্তলিকা জীবরাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারে না। অসহায় মানবশিশু কি বলে কালক্রমে জীবরাজ্যের শিরোমণি হয়, অনুসরণে অতীব আনন্দ। ধূলি কর্দ্দমে অন্ধকারে প্রোথিত সূত্র-পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর মূল, অষ্টাবক্র কদাকার দেহ, চিত্রপ্রায় নির্জ্জীববৎ পল্লব, তাহা হইতে কি করিয়া মনোমোহন পল্লব কুসুমের জন্ম হয়, সে কুসুমে অনুপম সৌরভ কোথা হইতে সঞ্চারিত হয়, অনুসরণে উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদের কি অতুল আনন্দ! তদপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর মাংসপিণ্ডে ত্রিজগৎ-ধারণক্ষম মহাশক্তিসম্পন্ন মানস হৃদয় কোথা হইতে মানবকুমার সংগ্রহ করে, অনুসরণে কাহার না আনন্দ হইবে?

মনুষ্যের পিতৃক্রমাগত প্রাক্তন শক্তি পশু পক্ষীর প্রাক্তন শক্তির ন্যায় সদ্যোবিকসিত না হইলেও, পরিমাণে ন্যূন নহে। পক্ষান্তরে, স্বোপার্জ্জিত শক্তি সদ্যোনিমীলিত হইলেও পরিমাণে অসামান্য, এবং মানবশিশুর মানস শক্তির

ক্রমবিকাশ অসীম অথচ আয়াসসাধ্য; ধীরগতি, অথচ পরিণামমঙ্গল হইলেও, মানব ও জীবের মানসশক্তির প্রকারভেদ নাই। এ সকল কথা মানবপ্রকৃতি দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে সম্যক আলোচিত হইয়াছে। শিশুপ্রকৃতির বিশেষত্ব এবং ক্রমোন্মেষের প্রকরণ কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

সকল দেশেই একটি কুসংস্কার প্রচারিত আছে যে, অসভ্যজাতি বড় সরল, সত্যবাদী ও প্রফুল্ল। অসভ্য প্রকৃতির সদ্যোজাত সন্তান, সুতরাং অনাবিল ও নিষ্কলঙ্ক। সভ্যতা কৃত্রিম; মানবপ্রকৃতি বিকৃত, অঙ্গহীন, বা কলঙ্কিত করিয়া ফেলে। এই কুসংস্কার শিশুপ্রকৃতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট প্রচারিত। শিশুরা সাধু, সরল, সত্যবাদী, শান্ত, বিনীত, কৃতজ্ঞ, কোমলহৃদয়, জিতেন্দ্রিয়। শিশুরা দেবত্বসম্পন্ন, দেবপ্রকৃতি। পৃথিবীর ধূলা কাদায় তাহাদের অনাবিল, স্বচ্ছ, প্রকৃতি কলঙ্কিত ও মলিন হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীর সংসর্গ ও দৃষ্টান্তে তাহাদের পতন ঘটে। আদি পিতামাতা দেবতা হইতে অভিন্ন। জ্ঞানপিপাসা ও সভ্যতাপ্রয়াস তাহাদিগকে স্বর্গ্যচ্যুত করে। অতীতের তিমিরময় গর্ভে সত্য-যুগ প্রতিষ্ঠিত। শিশুপূজা নানা দেশে প্রচলিত। বালগোপালের প্রতিকৃতি, বালখৃষ্ট, বালকের মুখে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবার চেষ্টা, শত শত জাতিতে দীপ্যমান; জগতের বাল্যইতিহাস কনকপটে চিত্রিত। মানুষ যদি চিরদিন বালক থাকিত, তবে জগতে বিবাদ বা অশান্তি, পাপ বা প্রলোভন, কিছুই থাকিত না। পুতুল লইয়া খেলা করিয়া, নন্দগোপালের ন্যায় নাচিয়া খেলিয়া দিন কাটিয়া যাইত। সকালে খেলা, দুপুরে খেলা, সন্ধ্যায় খেলা, সন্ধ্যার আঁধারে খেলা, আর খেলা যায় না, দেহ অবসন্ন, তবু খেলিবার বাসনার বিরতি নাই, তাই ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানে বলিতাম,—

"যারে রজনি তুই মরিয়া,
আমরা যতেক ভাই, হইলাম ঠাঁই ঠাঁই,
যারে রজনি! তুই মরিয়া।"

মান বা বিরহ, গোষ্ঠের মত মনোজ্ঞ কেহই নহে। ব্যাবৃত্তি পরিমাণে মনুষ্য শ্রেষ্ঠজীব। শৈশবে মানবসন্তানকে পূর্ব্বগত সকল জীবের জীবলীলার অভিনয় করিতে হয়। জীব-পর্য্যায়ে যে যত নিম্নে, তাহার পূর্ব্বগত জীব-শ্রেণী তত অল্প। মৎস্যশিশুকে শৈশবে যত জীবলীলার অভিনয় করিতে হয়, সর্পশিশুকে তাহার অপেক্ষা অধিক করিতে হয়। মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ, এ জন্য মনুষ্য-শিশুর পূর্ব্বগত জীবশ্রেণী অনেক অধিক। একাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নরমর্কট পর্য্যন্ত সমুদয়

জীব-পর্য্যায়ের জীবলীলা তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। অগত্যা মনুষ্য-শিশুর অসহায় শৈশবকাল দীর্ঘতম হইয়া পড়ে।

এই অসহায়তায় মানব-সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য জনকজননীকে যাদৃশ যত্ন করিতে হয়, অন্য কোন প্রাণীর তেমন করিতে হয় না। কর্ষণে শ্রীবৃদ্ধি। দীর্ঘতম অসহায় শৈশবে লালন পালন হেতু নর-জননীর স্নেহ মমতা যাদৃশী ব্যাবৃত্তি লাভ করিয়াছে, এমন আর কোন জীবের নহে। মনুষ্য শৈশবের দীর্ঘতার হ্রাস হইলে, মাতৃস্নেহের উৎকর্ষ হীন হইত। সুতরাং দীর্ঘ-শৈশবের অসহায়তা নরজাতির অবশ্যম্ভাবী ও কল্যাণকর।

শিশু-প্রকৃতির বিচিত্রতা সাধারণতঃ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। শিশুমাত্র সরল, শিশুমাত্র হাস্যমুখ, শিশুমাত্র অতি বিশ্বাসী ও সাধু, এই প্রকারের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের অন্তর্নিহিত। প্রথম চক্ষে সমতা যত প্রতিভাত হয়, অসমতা তত প্রতিভাত হয় না। সব সাহেবের চেহারা এক প্রকার, এজন্য কাছারীতে সাহেব অপরাধীকে সনাক্ত করিতে এত গোলযোগ হয়। গাছের সব পাতাগুলি একরকম। এ ভ্রম অবিচক্ষণতার ফল। অভিনিবেশ-সহকারে পরীক্ষিত হইলে প্রত্যক্ষ হইবে যে, একই বৃক্ষের কোন দুইটি পত্র অনুরূপ নহে, অল্পাধিক বিশেষত্ব প্রত্যেকের আছে। শিশুসম্বন্ধে এইরূপ। যাঁহাকে নিত্য অভিনিবেশসহকারে প্রতিপালন করিতে হয়, সেই জননী জানেন, তাঁহার দুইটি সন্তানের শৈশবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রূপ, বর্ণ, হাব, ভাবের বিশেষত্ব কিরূপ। বস্তুতঃ, একই দম্পতির কোন দুইটি শিশু একরূপ নহে। সুতরাং শিশুমাত্রকে সমভাবাক্রান্ত অনুমান করা ভ্রমমাত্র।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে আর একটি ভ্রম আছে। সদ্যোজাত শিশুর দেহ যেমন নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল, আমরা তাহার বিকাশশূন্য মনোবৃত্তি দেখিয়া মনে করি, তাহার মনটি তেমনি সাদা, নিষ্কলঙ্ক, লিপিশূন্য। অনেকের বিশ্বাস, সদ্যোজাতশিশুর মনটি একখানি পরিষ্কার সাদা কাগজের মত, একটি আঁখরের আঁচড়ও পড়ে নাই। এই জন্য শিশুমাত্রকে সমভাবাক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। সাংসারিক অবস্থার সংঘর্ষণে যত দিনে ভিন্নরূপে ব্যবস্থিত না হয়,—এবং সেইরূপে ব্যবস্থিত, বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হওয়া দীর্ঘকালসাপেক্ষ, এইরূপ মনে করিয়া, শিশুমাত্রকে সমাবস্থ কল্পনা করা হয়।

কিন্তু সদ্যোজাত শিশুপ্রকৃতি নববস্ত্রের ন্যায় নির্ম্মল আঁচড়শূন্য নহে। কাগজখানি দেখিতে সাদা বটে, কিন্তু অদৃশ্য কালীতে তাহার সকলই লিখা আছে; আগুনের তাতে তাতাইয়া লইলে দেখিবে, তাহার সকলই লিখা, নূতন কথা লিখিবার জায়গা অতি অল্পই খালি আছে।

আমাদের সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত ও পৈতৃক। বাহিরের বৈঠকখানা আমি নূতন তৈয়ার করাইয়াছি বটে, কিন্তু অন্দরের সেই পুরাতন দুটা কোঠাও আমার পৈতৃক সম্পত্তি। পৈতৃক ভিটায় আমি নূতন দালান, নূতন বাগান নির্ম্মাণ করি। দেহের অস্থিমাংস পৈতৃক, আর মন, সেটা কি স্বোপার্জ্জিত? অস্থিমাংসের সহিত শিশু পৈতৃক মানসিক প্রকৃতি উত্তরাধিকার করিয়া থাকে। দৈহিক ব্যাধি ও বলের ন্যায় পিতার মানসিক দোষগুণ, জ্ঞান বুদ্ধি, পৈতৃক দূর-দর্শন, কর্ষিত চিত্তবৃত্তি, শিশু উত্তরাধিকার করে। বিন্দুমেয় বীজমধ্যে বিশাল বটবৃক্ষের বৃক্ষত্ব যেমন নিহিত থাকে, যে হরকোষ ও গৌরীকোষের সম্মিলনে মানব-শিশু উৎপন্ন হয়, সেই দুইটি কোষ মধ্যে দুইটি পরিবারের লক্ষ লক্ষ পুরুষের গুণ দোষ সন্নিহিত থাকে। শিশুপ্রকৃতি লক্ষ পরিবারের অব্যাবৃত যুগফল। আলো তাপ ও সার পাইলে, বীজমধ্যস্থ বৃক্ষত্ব বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। শিক্ষা, সংসর্গ ও অবস্থার সম্মিলনে, লক্ষ পরিবারের প্রাপ্ত-ধন কালে প্রকাশ হইয়া পড়ে। পরিবারে শিক্ষা, বিদ্যালয়ে শিক্ষা, সমাজে শিক্ষা, অবস্থায় শিক্ষা, এ সকল শিক্ষা মূল প্রকৃতি কিছু বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। কিন্তু মৌলিক প্রকৃতির ধ্বংস হইবার উপায় নাই। তথাপি "জাতিমাহাত্ম্যং"। বিভিন্ন ধনে ধনবান শিশু-প্রকৃতি বিচিত্র হইবেই হইবে—কোন দুইটি শিশু সম্পূর্ণরূপে সমাবস্থ হইতে পারে না। বাঙ্গালীমাত্র মিথ্যাবাদী, এ কথা বলা যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ, শিশুমাত্র সরল বা সাধু, এ কথা বলাও তেমনি অযথা। তবে সাধারণ-প্রকৃতি দেখিয়া কোন একটি দোষগুণ বা লক্ষণ আরোপ করিতে হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

আশ্চর্য্য বৃষ্টি।

সময় সময় সংবাদপত্রে মসী-বৃষ্টি, রক্ত-বৃষ্টি, চন্দন-বৃষ্টি ও হরিদ্রা-জল-বৃষ্টির কথা পাঠ করা যায়। অতি অল্প দিবস হইল, নদীয়ার কোন কোন গ্রামে চন্দন-বৃষ্টি হইয়াছিল; গত বৎসর নেপালের কোন কোন স্থানে রক্ত-বৃষ্টি

হইয়াছিল। এই প্রকার অসাধারণ বর্ষণে সাধারণ লোকে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়। কিন্তু সে চিন্তা অমূলক।

১৮৬২ ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডে চারি বার মসী-বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম বৃষ্টি ১৮৬২ অব্দের ১৪ই জানুয়ারি হয়। রেভারেণ্ড জে. রাষ্ট তাঁহার "The Scottish Black Rain showers of 1862 and 1863" নামক গ্রন্থে এই আশ্চর্য্য বৃষ্টি-চতুষ্টয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৪ই জানুয়ারি প্রাতে সার্দ্ধ আট ঘটিকা পর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল ছিল। নয়টার সময় গগন মেঘময় হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূমময় ভয়ঙ্কর মেঘ ঘনঘটা করিয়া সমুদ্রের দিক হইতে আসিল। এবং দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই বারি-ধারার অধিকাংশ মসীময়। প্রায় দুই শত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই অদ্ভুত বৃষ্টি হইয়াছিল। রজকেরা বস্ত্র শুকাইতে দিয়াছিল; তাহাতে এরূপ কালীর দাগ লাগিয়াছিল যে, অতিশয় উত্তপ্ত জলে ধৌত করিয়া তবে কোন মতে সেই মসী-চিহ্ন তিরোহিত হয়। বস্ত্রে গন্ধকের গন্ধ হইয়াছিল। এক জন ফটোগ্রাফার এই বৃষ্টির জল ব্যবহার করায়, তাহার ফটোগ্রাফ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় মসী-বৃষ্টি ১লা মে কারলিউক নামক স্থানে, তৃতীয় বৃষ্টি ২০শে মে সেন্‌নস্ নামক স্থানে, এবং চতুর্থ বৃষ্টি ১৮৬৩ অব্দের ২৮শে অক্টোবর পুনরায় সেন্‌নস্ নামক স্থানে পতিত হইয়াছিল। এই সকল বৃষ্টির পর সাগরতীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডও পতিত হইয়াছিল। এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বায়ু প্রবহমান ছিল। অধ্যাপক চার্লস্ টমলিন্‌সন্ অনুমান করেন যে, ভিসুবিয়স-গিরি-প্রক্ষিপ্ত ধূম ও শিলাখণ্ড বায়ুবেগে স্কট্‌লণ্ডে আনীত হইয়া, বৃষ্টির কালে সাধারণ বারি-বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অনুমানের বিশেষ কারণও আছে। কারণ, ১৮৬২ সালের ১০ই জানুয়ারি ভিসুবিয়স ধূম উদ্গীরণ করে; এবং প্রথম বৃষ্টি ১৪ই জানুয়ারি পতিত হয়। পুনরায়, ২৮শে এপ্রেলের প্রদোষকালে উক্ত আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে; ইহার তিন দিন পরে কারলিউকে বৃষ্টি হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বৃষ্টির পূর্ব্বে আর কোথাও কোনও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল কি না, জানা যায় নাই।

ইউরোপের নানা স্থানে কখন কখন হরিদ্রাবর্ণ বৃষ্টির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই জলেও গন্ধকের গন্ধ থাকে। জর্ম্মনীতে যখন একবার এইরূপ বৃষ্টি হয়, তখন অনেকে সংগৃহীত জলে দেশলাই প্রস্তুত করিয়াছিল। কেহ কেহ

মনে করেন, ফুলের পরাগ বায়ুভরে উপরে উঠিয়া পড়িবার সময় বৃষ্টির জলে মিশ্রিত হইয়া উহাকে হরিদ্রাভ করে। ইহা কত দূর সঙ্গত, তাহা বলা যায় না। কারণ, যে বায়ুর তেজে ফুলের পরাগ আকাশের দূরদেশে উত্থিত হয়, তাহার তেজে সমগ্র পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প দূরও উঠিতে পারে। কিন্তু পুষ্পবৃষ্টি গল্পে ও পৌরাণিক কাহিনীতেই শুনিতে পাওয়া যায়; প্রত্যক্ষ দেখা যায় নাই।

১৮৪৪ অব্দের ১লা নবেম্বর প্যারি নগরে অগ্নিবৃষ্টি হয়; বৃষ্টি মৃত্তিকা স্পর্শ করিবামাত্র ধূম ও অগ্নি নির্গত হইয়া জলে ফস্‌ফরাসের বিদ্যমানতা প্রমাণিত করিয়াছিল। ১৮৪০ অব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর আলজিরিয়ায় যে প্রবল ঝড় হয়, সেই সময় দুই এক বিন্দু বারি কেশোপরি পতিত হইয়া উহাকে দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৩৯ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার দশ ক্রোশ দক্ষিণে সজীব-মৎস্য-বৃষ্টি হয়। ঐ বৎসর মে মাসে এলাহাবাদের নিকটও মৃত মীনের বর্ষণ হইয়াছিল। Hasted's History of Kent নামক গ্রন্থে কথিত আছে যে, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ষ্টান্‌ষ্টেড নামক প্রদেশে আকাশ হইতে বৃষ্টির সহিত মৎস্য পতিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও অনেক বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে এই প্রকার মৎস্য-বৃষ্টির কথা পাঠ করা যায়।

মূষিক ও ভেক-বৃষ্টিই বা না হইবে কেন? নরওয়ে দেশে একবার মূষিক-বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ভেক-বৃষ্টির কথা French Academy নামক ফরাসীস্ বিজ্ঞান-সমিতির পত্রে পাঠ করা গিয়াছে। ১৮০৪ অব্দের আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের নানা স্থানে ভেক-বৃষ্টি হইয়াছিল। লোকের মস্তকের উপর, পৃষ্ঠদেশে, বস্ত্রের মধ্যে, রমণীগণের গাউনের ভিতর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভেক বাহির করিতে হইয়াছিল।

রুষিয়ার অন্তঃপাতী জেভ্ নামক জেলায়, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর কীট-বৃষ্টির কথা Journal de St. Petersburg নামক পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিলাতের Royal Societyর ১৬৬১ অব্দের ২৬শে জুন তারিখের মিনিটে যে প্রকার বৃষ্টির উল্লেখ আছে, তাহা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইলে একপ্রকার ভালই হয়। উল্লিখিত আছে যে, ওয়ারিক নগর হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী টচব্রক্ নামক গ্রামে এক প্রকার শস্য-বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই শস্য অনেকটা

গোধূমের ন্যায়। স্যার হেন্‌রী পাকারিঙ্গের পুত্র মিঃ হেন্‌রী পাকারিঙ্গ, নভঃস্থলাগত এই শস্যের সামান্য পরিমাণ লইয়া আসিয়া ইংলণ্ডেশ্বরকে উপহার দিয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া ও উহার কাহিনী শুনিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন যে, বাইবেলোক্ত য়িহুদী-শিবিরে ম্যানা-বৃষ্টি অমূলক নহে।

স্বভাবতঃ ভীতিব্যঞ্জক এই সকল অসাধারণ বৃষ্টির কারণ সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা, শিশু জল-বায়ু-বিজ্ঞানের এখনও হয় নাই। নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল কারণ সচরাচর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে ;—

(১) ঘূর্ণি-বায়ু ও জলস্তম্ভ। (৩) বায়ুর উপাদান।
(২) কীটাণু ও উদ্ভিদাণু। (৪) আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ।

(১) বিপরীত গতিবিশিষ্ট বেগবান বায়ুপ্রবাহ পরস্পর সম্মিলিত হইলে ঘূর্ণি-বায়ু উৎপন্ন হয়। বায়ুপ্রবাহদ্বয়ের গতি ও বেগ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে করিতে দুই প্রধান গতির সৃষ্টি করে—আবর্ত্তন ও ভ্রমণ। প্রথম গতির ফল ঘূর্ণন ; কুম্ভকারের চক্রবৎ ভীম তেজে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভঞ্জন মৃৎ-সংলগ্ন কত দ্রব্য লইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হয়। কোন কোন সময় এমন বলশালী ঘূর্ণিবায়ু সংঘটিত হয়, যাহার বলে ভূপৃষ্ঠের অনেক ভারশালী দ্রব্যও গগনে উঠিয়া থাকে। দ্বিতীয় গতির ফলে ঘূর্ণিবায়ু এক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান না করিয়া, তথা হইতে অন্য স্থানে গমন করে ; সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠোত্তোলিত দ্রব্যরাজি লইয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। জলের উপর যাইয়া উপস্থিত হইলে, জল ও জলচর জীবকুল ও তরুলতা পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া আকাশপথে ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া যায়। বজ্রাঘাত প্রভৃতি বিবিধ কারণে ঘূর্ণিবায়ুর ধ্বংস হইলে তৎসহ-উত্থিত দ্রব্যরাজি আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়। ঘূর্ণি-বায়ুর ধ্বংস হইবার সময় আকাশের বায়ু-প্রবাহ সেই ঊর্দ্ধোত্থিত সামগ্রীনিচয় দূর দেশে লইয়া যায় ; এবং বৃষ্টির সময় বৃষ্টি-কণিকার সহিত মিলন-নিবন্ধন উপযুক্ত গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া আইসে। যদ্যপি কীট-পতঙ্গ বা মীন-শম্বুক, অথবা জলবাসী তরুকণা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তবে সেই সেই সামগ্রীর বৃষ্টি হইয়া থাকে। বায়ুস্তরে দীর্ঘকাল অবস্থানবশতঃ সেই সকল দ্রব্যের বর্ণ ও আকারের বিভিন্নতা হইতে পারে ; কাহারও কাহারও জীবননাশও বিচিত্র নহে। মানুষ ঊর্দ্ধে উঠিলেই শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে ; 'অন্যে পরে কা কথা ?'

উত্থিত ধূলিকণা পতনোন্মুখ বারিকণার সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বচ্ছ জলকে

বিবর্ণ করিয়া মসী বা রক্তের ন্যায় করিয়া তুলে। আমরা মনে করি, মসী-বৃষ্টি হইল—রক্ত-বৃষ্টি হইল। অধিক পরিমাণ ধূলি-কণা বারি-কণার সহিত মিলিয়া পতিত হইলে আমরা মনে করি যে, চন্দন-বৃষ্টি হইল।

(২) ঘূর্ণি-বায়ু বিনাশের পর আকাশ-পথে ভাসিতে ভাসিতে কীটাণু বারি-কণিকা আশ্রয় করিলেও উহাকে যে বিবর্ণ করিতে পারে, তাহাতে আর সংশয় নাই। আমাদের দেশের কত পুষ্করিণীর জল এই কীটাণু ও উদ্ভিদাণুর জন্য বিবর্ণ ও বিশ্রী। ঊর্দ্ধ-গগনে মেঘমালায় যে কীটাণু ও উদ্ভিদাণু জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। তাহাদিগের অনেকের গঠন ও আকার এরূপ যে, যে কারণে সূক্ষ্ম জল-কণা মেঘরূপে আকাশে বিচরণ করে, সেই কারণে তাহারাও পৃথিবীর আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া কিয়ৎকাল গগনমার্গে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে।

(৩) বায়ুতে যে কেবল অঙ্গারজান, উদজান ও যবক্ষারজান আছে, তাহা নহে। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় ও উদ্যম দিন দিন নব নব উপাদানের আবিষ্কার করিতেছে। তাড়িতশক্তির বলে বিচ্ছিন্ন বায়বীয় উপাদান বর্ষার জলের সহিত সম্মিলনে উহার অসাধারণত্ব উৎপাদন করিতে একবারেই যে পারে না, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায় ?

(৪) আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ ভূগর্ভের কত সামগ্রীকে আকাশপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় ; সেই সকল সামগ্রী বায়ুপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃষ্টির জল-কণায় মিশিতে পারে। নির্ম্মল জলকণার সহিত ফস্‌ফরাস প্রভৃতি মিলিত হইয়া উহাকে বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন ধাতবজলে পরিণত করিতে পারে। ফস্‌ফরাস্-মিশ্রিত জলকণা দীপ্তিশালিনী হয় ; গন্ধক-মিশ্রিত বারিতে উক্ত ধাতুর দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

ভানুমতী।

৬—রণক্ষেত্র।

চৈতন্য লাভ করিয়া অনাথনাথ দেখিলেন, এক কাষ্ঠখণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া তিনি তাহার উপর মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। ধীরে ধীরে উঠিয়া কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিলেন। কর-পদ সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন,

কর্দ্দমাবৃত দৃঢ়ভূমি। একি সমুদ্র-বেলা, না সমুদ্রগর্ভস্থ কোনও চড়াভূমি! তখন আকাশ নির্ম্মল। সেই ঘনঘটার চিহ্নমাত্র নাই। কদাচিৎ কোথাও দুই এক খণ্ড মেঘ নীল-সমুদ্রের চড়ার মত দেখা যাইতেছে। সেই ঘোর ঘূর্ণ-ঝটিকাও নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া শ্রান্ত পবনদেবের নিশ্বাসের মত এক একবার বাতাস বহিয়া যাইতেছে, এবং তাঁহার আর্দ্র দেহে দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া আছে। নক্ষত্রের অবস্থান অবলোকন করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। চারি দিক শান্ত, স্থির, নীরব, নিশ্চল। অনাথনাথের আবার ভানুমতীর সেই গীত মনে পড়িল,—

"কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

সেই তাণ্ডবনৃত্যের পর এই শান্তি! অনাথনাথ সেই ভীষণ ঝড় ও সেই ভীষণ দৃশ্য সকল তবে কি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন? না;—তিনি উলঙ্গ; পত্নীপুত্রহারা; অজ্ঞাত স্থানে নিপতিত ও শীতে কম্পিত; স্বপ্নই বা হইবে কেন? তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায় মা! তোর একি বিচিত্র পটপরিবর্ত্তন! সেই ঘূর্ণ-বাত্যার পর এই শান্তি! সেই ঘোর অট্টহাসির পর এই মৃদু হাসি! সেই ঘোর উল্লম্ফনের পর এই নিশ্চল ভাব! সেই সৃষ্টি-সংহারিণী মূর্ত্তির পর এই মোহন রূপ! হায় মা! তুই আমার সেই পতি-প্রাণা পত্নী এবং পিতৃপ্রাণপ্রতিম শিশু পুত্রকে গ্রাস করিয়া তোর এই মোহিনী শোভা দেখিবার জন্যে কি হতভাগ্য আমাকে জীবিত রাখিলি!" তিনি এবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এরূপ কাঁদিলেন, এবং বহুক্ষণ এরূপ ভাবিলেন। সেই রোদন, সেই চিন্তা, যে কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হয় নাই, কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেকক্ষণ তাঁহার হৃদয়েও যেন ঘূর্ণবাত্যা বহিল। অনেকক্ষণ রোদনের পর সেই বাত্যা ও বর্ষণ শেষ হইয়া হৃদয় কিছু শান্তভাব ধারণ করিলে, তিনি ভাবিলেন, তিনি যেরূপ রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার পত্নী ও পুত্রসহ সেই দুর্গতিহারিণী দুর্গারূপিণী ভানুমতীও ত রক্ষা পাইতে পারে। এই ক্ষীণ আশার সঞ্চারে হৃদয়ে ও দেহে ক্ষীণ শক্তিরও সঞ্চার হইল। তিনি চারি দিকে কতকগুলি চঞ্চল আলোক দেখিলেন। এ সকল কিসের আলোক? এ কি কোনও রূপ ভৌতিক আলোক? সিন্ধুসৈকতে তরঙ্গাভিঘাতে লবণাম্বুকণারাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া যে আলোক উৎপন্ন করে, একি সেইরূপ কোনও আলোক এই ঘূর্ণঝটিকার পর সমুদ্রগর্ভে কিম্বা সৈকতে ক্রীড়া

করিয়া বেড়াইতেছে? কিছুক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে অনাথনাথের বোধ হইল, যেন আলোকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছায়া দেখা যাইতেছে। আরও কিছুক্ষণ দেখিলে তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, যেন মানুষ আলোক লইয়া কি দেখিতেছে। ক্রমে ক্রমে দূর হইতে যেন মানুষের অস্ফুট আর্ত্তনাদও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার মত কি তবে আরও কেহ সমুদ্র-তরঙ্গে ও ঝটিকায় তাড়িত হইয়া আহত অবস্থায় এখানে পড়িয়া আছে? তাহাদের মধ্যে কি তাঁহার পত্নীপুত্র ও সেই অনাথা বালিকা থাকিতে পারে না? এ সন্দেহে তাঁহার শরীরে আরও বল সঞ্চারিত হইল। তিনি সেই উলঙ্গ অবস্থায় সে সকল আলোক লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহার পায়ে কি যেন ঠেকিল। তিনি স্বচ্ছ অন্ধকারে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—একটি মৃতমানব-দেহ। এইরূপে পদে পদে মৃত মানব ও গো মহিষ ছাগ, পালিত পশু পক্ষীর দেহ তাঁহার চরণে ঠেকিতে লাগিল। একটি দেহে পা পড়িবামাত্র লোকটি ক্ষীণকণ্ঠে বেদনাব্যঞ্জক চীৎকার করিল। কণ্ঠ স্ত্রীলোকের। অনাথনাথ চমকিয়া এক পা সরিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? উত্তরে একটি যবনী-নাম শুনিলেন। সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কোথায়?" অনাথনাথ উত্তর করিলেন,—"বলিতে পারি না।" তখন "হা আল্লা!" বলিয়া রমণী একটি বেদনা-ব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অনাথনাথ তাহাকে উঠিতে বলিলেন। সে আর উত্তর দিল না।—তিনি নিজে বসিয়া তাহাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, সেও তাঁহার মত উলঙ্গ। তাহাকে অতি কষ্টে তুলিয়া বসাইলে সে যেরূপ ভাবে পড়িয়া গেল, তাহাতে অনাথনাথ বুঝিলেন, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। যাইতে যাইতে কোথাও শিশুর ক্রন্দন, কোথাও রমণীর রোদন, কোথাও পুরুষের আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলেন। অনাথনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি একটি আলোকের দিকে ছুটিলেন। সে আলোকটি এবং সে আলোকধারীকে আনিয়া তিনি এই আর্ত্তদের কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না, দেখিবেন। কিন্তু আলোকের নিকট গিয়া যাহা দেখিলেন, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক জন মুসলমান একটা বাঁশের "বোঁধা" * জ্বালাইয়া মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিতেছে। এক স্থানে ২।৩ টা লোক একটা কাষ্ঠের সিন্দুক লইয়া টানাটানি করিতেছে। কেহ কেহ থালা, ঘটী, বাটি

* অনেকগুলি বাখারি একত্র বাঁধা। এ অঞ্চলে বোঁধা বলে।

ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য কুড়াইতেছে। অনাথনাথ বুঝিলেন যে, এ সকল মৃত-দেহ ও দ্রব্যাদি সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছে, এবং এ সকল তস্কর নিকটস্থ কোনও গ্রামবাসী। এক জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কোন স্থান?" সে এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"দেখছ না, তোমার শ্বশুরবাড়ী। এই যে এক শাশুড়ী পড়ে আছে।" এই বলিয়া সে একটা কর্দ্দমাক্ত স্ত্রীলোকের দিকে ছুটিল, এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে লাগিল। হাতের সোণার বালা খুলিবার জন্য সবলে টানিলে স্ত্রীলোকটি সংজ্ঞালাভ করিয়া যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন পাপিষ্ঠ তাহার মাথায় এক লাঠি প্রহার করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া আবার বালা ধরিয়া টানিতে লাগিল। অনাথনাথ আর সহিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহে মত্তমাতঙ্গ-বল সঞ্চারিত হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহারই হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে হাতের "বোঁধা" ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহার চীৎকার শুনিয়া আরও কয়েক জন তাহার পথ অনুসরণ করিল। অনাথনাথ সেই হতভাগিনীকে মা! মা! বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, হতভাগিনীর দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। তিনি সেই বোঁধার আলোকে খুঁজিয়া একখানি বস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন, এবং যাহারা জীবিত অবস্থায় রোদন করিতেছিল, তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি শুশ্রূষা করিবেন? কেহ সমুদ্রের লবণজল পান করিয়া দারুণ পিপাসায় জল চাহিতেছে। তিনি ভাল জল কোথায় পাইবেন? কেহ বলিতেছে,—"আমি কোথায়", কেহ "আমার পুত্র কোথায়", কেহ "আমার পতি কোথায়?" তিনি কি উত্তর দিবেন? কেহ উলঙ্গ অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছে, বসন চাহিতেছে। ভাসিয়া আসিয়া স্থানে স্থানে যে সকল বসন পড়িয়া আছে, তিনি কুড়াইয়া আনিয়া দিলেন। এক দিকে স্থানে স্থানে এই হাহাকার, অন্য দিকে স্থানে স্থানে তস্করদিগের আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথার বা অপহৃত বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি, মারামারি। হাতের বোঁধাও জ্বলিয়া গেল। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন, কি করিবেন? অনাথনাথ একখানি কাষ্ঠের উপর অবসন্ন অবস্থায় বসিয়া আপনার অবস্থা ভুলিয়া এই হতভাগ্যদের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আবার সেই বালিকার গীত যেন শূন্য হইতে তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ-না নয়নে, নাচে কালী রণ-রঙ্গিণী!"

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল। ঊষার প্রথম আলোকেই সেই ভীষণ রণরঙ্গিণীর সংহারক্রীড়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি একটি পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছেন। শত শত নর-নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ,—মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। সহস্র সহস্র গো মহিষ ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী, ভগ্ন গৃহ-খণ্ড ও গৃহস্থের নানাবিধ সম্পত্তি—সিন্দুক, পালঙ্ক, তৈজসপত্র, কাপড়, বিছানা পড়িয়া আছে। স্থানটি যেন একটি ভীষণ রণ-ক্ষেত্র। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি যেন মানুষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া একটি মহাপ্রলয় সাধিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ এ পর্য্যন্ত আসিয়া পর্ব্বত-মালায় প্রতিহত হইয়া ঝড়ের পর সরিয়া গিয়াছে, এবং পশ্চাতে এই ভীষণ দৃশ্য রাখিয়া গিয়াছে। যত দূর চক্ষে দেখা যাইতেছে, কেবল নর পশু পক্ষীতে. এবং ভগ্ন গৃহখণ্ডে ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদিতে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে তাঁহার মত দুই এক জন নর-নারী স্তম্ভিত অবস্থায় বসিয়া আছে। পশ্চাতে একখানি ঝটিকাবিধ্বস্ত গ্রাম দেখা যাইতেছে। অনাথনাথ উঠিয়া সেই গ্রামের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বৈরাগীর মত একটি লোক কয়েক জন রমণী ও বালক বালিকাকে লইয়া গ্রামের দিকে যাইতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজি! এ কোন্ স্থান?" বৈরাগী বলিল,—"বাবা! এ গ্রামের নাম চম্বল। ইহাতে আমার একখানি ক্ষুদ্র আখড়া আছে। গৃহাদি পড়িয়া গিয়াছে। ইহারা নানা স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। দেখি, যদি চাল তুলিয়া তাহার নীচে আশ্রয় দিয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারি। হরি হে! তোমার একি লীলা!"

অনাথনাথ বিস্ময়-বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন,—"চম্বল!" বাবাজি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন—"চম্বল।"

৭—প্রকৃতির কুরুক্ষেত্র।

সুবর্ণদ্বীপ সমুদ্র-তীরে। তাহার পশ্চিমে অনন্ত নীল ফেনিল দিগন্ত প্রসারিত মহা-পারাবার। তাহার পূর্ব্ব ও উত্তরে বিস্তীর্ণ মহেষ-খালি ও কুতুবদিয়া দ্বীপ-শ্রেণী। তাহার পূর্ব্বে প্রায় দুই ক্রোশ প্রশস্ত সমুদ্র-শাখা এবং তাহার পূর্ব্বতীরে চম্বল-গ্রাম। ক্রোশদ্বয়ব্যাপী গ্রামের পূর্ব্বে চম্বল-গিরিমালা। অনাথনাথ তবে কি সেই স্বল্পক্ষণের মধ্যে সমুদ্র-তরঙ্গে এত দূর ভাসিয়া আসিয়াছেন? এত গ্রাম, প্রান্তর, বিশেষতঃ একটি সমুদ্র-শাখা—তিনি কেমন করিয়া ভাসিয়া

আসিলেন? তাই তিনি চম্বল নাম শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান ঝটিকাতাড়িত-সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়া এরূপে গিরি-পাদমূলে পতিত হইয়া জীবিত থাকা ত সামান্য বিস্ময়ের কথা নহে। এ কি স্বপ্ন? একি কোনও অপদেবতার খেলা? একি আরব্য-উপন্যাস! এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কি কেহ কখন শুনিয়াছে, না শুনিলে বিশ্বাস করিবে? তাঁহার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ত সত্য হইতে পারে না? বৈরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাহার মুখে গ্রামের পরিচয়, কি বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? তাহা কেমন করিয়া হইবে? ঝটিকাবিধ্বস্ত হতভাগ্য নরনারী বৈরাগীকে যে এখনও দেখা যাইতেছে। সে তাঁহাকেও তাহার আখড়ায় যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু গ্রামের নাম চম্বল শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে এমন অভিভূত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, তাহার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। তিনি আরও দেখিলেন, বহুবিস্তীর্ণ শবক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার মত আরও জীবিত লোক আছে। তাঁহার সম্মুখে কেহ কেহ আত্মীয় স্বজনের অন্বেষণ করিতেছিল। তাহাদের মুখে শুনিলেন, তাহারাও তাঁহার মত কেহ মহেশখালি, কেহ কুতুবদিয়া, কেহ বহুদূরস্থ অন্যান্য গ্রাম হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখেও অদ্ভুত রক্ষার গল্প শুনিলেন। তখন তিনি নীলিমামণ্ডিত শান্ত প্রভাত-গগনের দিকে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত নয়নে চাহিয়া বলিলেন,—"কৃপাসিন্ধো! বিপদভঞ্জন! তুমি আমাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছ, আমার পতিপ্রাণা সরলা পত্নীকে ও আমার সুকুমার শিশু সহ সেই অনাথাকে কি সেরূপ রক্ষা কর নাই?" দর দর ধারায় তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি তাহাদের অন্বেষণে চলিলেন। রাত্রিতে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ঊষালোকে যাহা আরও স্ফুটতর হইয়াছিল, এখন দিবালোকে তাহার ভীষণ ছবি ভীষণতর হইয়া চারি দিকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—

যত দূর যাইতেছে নরনেত্রে দেখা—
আসমুদ্র গিরিতল—কালি সন্ধ্যাকালে
ছিল যাহা জনাকীর্ণ পল্লীতে প্রান্তরে
শ্যামশস্যসমাচ্ছন্ন, ছিল সুশোভিত
পাদপে, পল্লবে, গৃহে, চারু সরোবরে,—
রজনী-প্রভাতে এবে—বিস্তীর্ণ শ্মশান!

নাহি বাস-চিহ্ন, নাহি চিহ্ন পাদপের;
যত দূর যাইতেছে নরনেত্রে দেখা—
শবাকীর্ণ প্রেতভূমি, মহারণভূমি!
শবের পশ্চাতে শব, শবের উপরে!
সম্মুখে পশ্চাতে শব, দুই পার্শ্বে শব!
শরতের শস্যক্ষেত্র—শবক্ষেত্র এবে—
সারি সারি, স্তরে স্তরে, শব রাশি রাশি!
পশুপক্ষিশব সহ শব মানবের,
কীট পতঙ্গের শব, শব সংখ্যাতীত
শস্যক্ষেত্রে, সরোবরে, প্রাঙ্গণে, প্রান্তরে।
ভগ্নগৃহ-চালে শব, শব চাল-তলে,
ভূপতিত বৃক্ষগণ শব-সমাবৃত—
কত শব ডালে ডালে, শিকড়ে শিকড়ে!
নরনারী ফল যেন, শিশুগণ ফুল,
পাদপের শোচনীয় বিচিত্র বসন
বিজড়িত ডালে ডালে কালের কেতন।
ভাসিতেছে সরোবরে, প্লাবনে পূর্ণিত,
শবরাশি অগণিত, শব অজানিত।
শবে ক্ষুদ্র গৃহ গড় হয়েছে পূর্ণিত—
নর, ছাগ, গো, মহিষ, পড়ি স্তরে স্তরে!
যেই দীর্ঘ রাজপথ উত্তরে দক্ষিণে
গিয়াছে বহিয়া ভেদি' এই ধ্বংসভূমি,
করি অবরোধ সেই সমুদ্র-প্লাবন
হইয়াছে সমাচ্ছন্ন শবে অগণিত,
জালে যেন মৎস্যগণ। রয়েছে পড়িয়া
মহাকালী-কণ্ঠভ্রষ্ট মুণ্ডমালা মত,—
নাহি তিল স্থান তাহে নিক্ষেপিতে পদ।
স্থানে স্থানে কি করুণ দৃশ্য শোকময়!
কোথাও সন্তান বক্ষে পড়িয়া জননী,
মাতৃস্তন শিশুমুখে; কোথাও পড়িয়া

শিশু ভ্রাতা ভগ্নী দুটি গলায় গলায় !
গলায় গলায়, বুকে বুক, মুখে মুখ,
পড়িয়া কোথাও পতিপত্নী প্রেমময়ী ;
কোথা পুত্র, পৃষ্ঠে বৃদ্ধ জনকজননী !
কটিসহ দৃঢ়াবদ্ধ পত্নী সহ পড়ি
কোথাও শোকের ছবি প্রণয়ি-যুগল।
হায় ! হতভাগ্য যুবা বাঁচাইতে প্রাণ
প্রেয়সীর, এইরূপে আপনার প্রাণ
করিয়াছে বিসর্জ্জন ! অনিন্দ্যসুন্দর
যৌবনের প্রস্ফুটিত রূপ মনোহর
এখনো মৃত্যুর ছায়া করে নি হরণ।
প্রেম-আলিঙ্গনে যেন রয়েছে নিদ্রিত
যৌবনের সুখ-স্বপ্নে, হৃদয়ে হৃদয়,
মুখে মুখ, বেষ্টি গ্রীবা দুই ভুজলতা !
রমণীর কর্দ্দমাক্ত দীর্ঘ কেশরাশি
আবরিয়া উভয়ের উরস বদন,
করিতেছে হায় ! যেন লজ্জানিবারণ।
কোথাও মুমূর্ষু জীব মৃত্যুযন্ত্রণায়,
লবণাক্তজলপানে ঘোর পিপাসায়
করিতেছে ছট্‌ফট্। মৃত্যুমুখে কেহ
পতি, পত্নী, পুত্র তরে করে হাহাকার।
কোথাও বা নরনারী প্রেতমূর্ত্তি মত
নগ্ন, কর্দ্দমাক্ত, শির জানু-মধ্যে রাখি
রয়েছে বসিয়া স্তব্ধ, যেন বজ্রাহত।
কালের কি কুরুক্ষেত্র নয়ন-নিমিষে
হইয়াছে সংঘটিত, নর-চিন্তাতীত !
মানবের কুরুক্ষেত্র তুলনায় তার
বালকের ক্রীড়াভূমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর !

অনাথনাথ এই শোচনীয় চিত্তবিদারক দৃশ্য অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কোথায় কি জন্যে যাইতেছেন, কিছুই জানেন না। যাইতে যাইতে আর্ত্তের

শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে ভাসিয়া আসিয়া যে বসন পড়িয়া আছে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া নগ্নের নগ্নতা নিবারণ করিলেন। শবস্তূপের নীচে পড়িয়া যাহারা জীবিত অবস্থায় হাহাকার করিতেছিল, তাহাদিগকে বহু কষ্টে উদ্ধার করিতে লাগিলেন, এবং মুমূর্ষুকে শ্রীভগবানের নাম শুনাইয়া শান্তি দিতে লাগিলেন। জীবিতদিগকে নানারূপ সান্ত্বনার কথা, আশার কথা বলিলেন। কিন্তু ক্ষুধিত ও পিপাসিতকে কি দিবেন? আহার্য্য কোথাও কিছু নাই। পানীয় জলও অপ্রাপ্য। অসংখ্য পুষ্করিণী আছে। কিন্তু সমস্তই সমুদ্র-সলিলে প্লাবিত হইয়া ঘোর লবণাক্ত এবং নানাবিধ প্রাণীর মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া আবাসের কোনও চিহ্নমাত্র নাই। এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে কেহ দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারেন না,—এ মহাশ্মশানক্ষেত্র সন্ধ্যাকালে সমৃদ্ধিশালী গ্রামে সজ্জিত ছিল। কোথাও একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না ; ঝটিকাবেগে সমস্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। কোথাও বা এক স্থানের বৃক্ষ অন্য স্থানে, এক গ্রামের বৃক্ষ আর এক গ্রামে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বৃক্ষ কোথায় ছিল, অনেক স্থানে তাহা স্থির করিবার সাধ্য নাই। গৃহস্থদের বাড়ীর গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই ;—চাল, বেড়া, খুঁটি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, বাড়ীর ভিত্তি পর্য্যন্ত জলবেগে এরূপ বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, কাহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহাও চিনিবার উপায় নাই। এই সকল গ্রামে অনাথনাথের পরিচিত বহু সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী কাল সন্ধ্যার সময় ধনধান্যে ও বহু পরিবারে পরিপূর্ণ ছিল। আজ প্রাতে সে সকল আবাসের কোথাও বা দু একটা ভগ্ন খুঁটীর শেষভাগ, কোথাও বা পুষ্করিণীটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। পরিবারের মধ্যে কেহ বা বাড়ীতে স্থানে স্থানে, কেহ বা বাড়ীর বাহিরে স্থানে স্থানে, জলাশয়ে, গড়ে, মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামের শত শত লোকের মধ্যে ২।৪।১০ জন তাঁহার মত দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। তাহারা শূন্য ভিটায় মৃত পত্নী, পুত্র, মাতা পিতাকে লইয়া হাহাকার করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—"হা ভগবান! সকলেই গিয়াছে। আমাকে কেন রাখিলে?" রাশি রাশি অপরিচিত জনের মৃত দেহ কাহার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে! হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের শবে আচ্ছন্ন, মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর শবে পরিপূর্ণ! এই অপরিচিত লোকদের মধ্যে যাহারা অনাথনাথের মত জীবিত আছে, তাহাদের কেহ বা জানুর মধ্যে মাথা দিয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ়

আত্মহারা জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া আছে। অনাথনাথ জিজ্ঞাসা করিলে অবনত মস্তক তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেছে, কোনও উত্তর দিতেছে না। তাহাদের বাহ্যজ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়াছে। অন্য জীবিত জীব জন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। তাহাদের অগণিত শব মানব-শবের সঙ্গে পড়িয়া রহিয়াছে।

অনাথনাথ আপনার অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। প্রথম কিছু ক্ষণ এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু কত দেখিবেন, কত কাঁদিবেন? দেখিতে দেখিতে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল ও নয়নের জল অজ্ঞাতে শুকাইয়া গেল। স্বপ্নপরিচালিত লোকের মত যথাসাধ্য আর্ত্তের সেবা করিতে করিতে তিনি লক্ষ্যহীন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই ভীষণ শবক্ষেত্রে সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া অনাথনাথ তাঁহার পত্নী পুত্র ও সেই বালিকাকে জীবিত কি মৃত দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্বাহ্নের পর মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আসিল। অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্র ও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উন্মত্তের মত ভ্রমিতেছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অন্য সময় কেবল চঞ্চল ফেনমালায় শোভিত থাকে। আজি অচঞ্চল শবমালায় যেন মুণ্ডমালী সাজিয়াছে। নানা জীবজন্তুর অচঞ্চল শবমালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি ভীষণ ক্রীড়া করিতেছে! শবরাশির সঙ্গে এখানেও ভগ্ন গৃহ ও গৃহস্থের উপকরণ এবং কোথাও ভগ্ন নৌকাখণ্ড সকল পড়িয়া আছে। কাল অপরাহ্নে যে সমুদ্রগর্ভ অনাথনাথ নানাবিধ অর্ণব-যানে খচিত দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা কেবল ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে সেই গীতধ্বনি প্রবেশ করিল,—

"কি ভীষণ রণে দেখ না নয়নে নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

একি তাঁহার ভ্রান্তি? তিনি ত সমস্ত রাত্রি ভানুমতীর সেই গান শুনিয়াছেন। ঘোরারাবপূর্ণ প্রলয়ের মধ্যে তিনি অবিরাম ঘোরারাবী মহারৌদ্রী প্রলয়কারিণীর সেই রূপ নয়নে দর্শন করিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার সেই ঘোরা ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই গীত শুনিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াছেন। এ নিশ্চয় তাঁহার ভ্রান্তি। কিন্তু আবার তিনি সেই গীত শুনিলেন। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই স্ফুটতররূপে সেই শান্ত-সায়াহ্নে সমুদ্র-নিনাদে মিশ্রিত,

সমুদ্রানিলে বাহিত সেই মধুর গাম্ভীর্য্যময় রমণীকণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। সম্মুখে বেদের ক্ষুদ্র পট-গৃহের মত একটি কি যেন দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, ঝটিকার পর কেহ এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রমে বোধ হইল, সেখান হইতে সেই গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

৮—ভগবতী।

আশায়, আনন্দে, সেই আনন্দাশা-মিশ্রিত উৎসাহে, তাঁহার হৃদয়ে কি এক নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইলে কণ্ঠ যে ভানুমতীর, সে যে গীত গাহিতেছে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অনাথনাথ দেখিলেন, প্লাবনের ভাসা কাপড় ও যষ্টি কুড়াইয়া বালিকা একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বসিয়া শান্ত, বিষণ্ণ, গম্ভীর, উদাস কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল কি এক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া গায়িতেছে—

দুই কর লয়, দুই বরাভয়,
লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,
সদা শিব ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

এই মহা ধ্বংসক্ষেত্রই ধ্বংসকারিণীর ধ্বংসমূর্ত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যার স্থল। গীত শুনিয়া অনাথনাথের হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল। গীত ক্রমে বন্ধ হইল। ক্রমে সমুদ্র-নিনাদে সেই স্বরলহরী মিশিয়া গেল। কিছু ক্ষণ রমণী নীরব; অনাথনাথ চৈতন্যহীন জড়মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"হাঁ দিদি! আমাদের বাড়ীতে যে কালীর পূজা হইয়া থাকে, তুমি তাঁহারই গীত গাইতেছ? না?"

বালিকা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ দাদা! এ তাঁহারই গীত।"

"কাল যে এ ঝড় হইল, এত মানুষ মরিল, এ কি সব তিনিই করিলেন?"

"হাঁ ভাই! এ সকল তাঁহারই লীলা।"

শিশু একটি ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি আর একটি গীত গাও। তোমার গান আমায় বড় ভাল লাগে।"

বালিকা আবার সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া আর একটি গান আরম্ভ করিল।

আবার সেই শব্দ-সমাচ্ছন্ন বেলাভূমি, সেই সান্ধ্যরাগরঞ্জিত সমুদ্রগর্ভ ও সুনীল আকাশ ছাইয়া সেই করুণ মধুর কণ্ঠ ফুটিল, উঠিল, মিশিল। সেই সুধাময়ী বীণা নীরব হইলে কেবল সিন্ধুনিনাদমাত্র শুনা যাইতেছিল। আর সকলই নীরব। অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় শিশু-কণ্ঠ তাঁহারই শিশুপুত্র অমিয়ের। তবে অমিয়ও রক্ষা পাইয়াছে? তিনি জানু পাতিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া গলদশ্রু-নয়নে বলিলেন, "তোর কি অপূর্ব্ব লীলা! তোর ধ্বংস-ক্রীড়ায় মহা-মহীরুহ ও শৈলশৃঙ্গ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই ঝড়ে তুই এই ক্ষুদ্র শিশুকে রক্ষা করিয়াছিস্! দয়াময়ী মা!" অনাথনাথ কিছু ক্ষণ এইরূপে জননীর চরণে আপনার হৃদয়ের তরল ভক্তিধারা বর্ষণ করিয়া উঠিলেন, এবং তিনি এ সময়ে তাহাদের সম্মুখে যাইবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।—শিশুর ক্ষীণকণ্ঠে বুঝিলেন, সে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিলে তাহার হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিবে, দুর্ব্বল হৃদয় তাহা সহিতে পারিবে ত? তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শিশু আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

"দিদি! সত্যসত্যই আমি কালী-মার মুখ দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। কিন্তু মা বলিলেন, তিনিও মা। হাঁ দিদি! তিনি কি সত্যই মা?"

বা। হাঁ অমিয়! তিনি মা।

শি। তিনি মা হইয়া কেমন করিয়া এমন ঝড় করিলেন, এত মানুষ মারিলেন?

বা। তোমার মা কি তোমার উপর কখন রাগ করেন নাই, কখনও মারেন নাই? তিনি যেমন ঝড় তুলিয়াছিলেন, এখন আবার কেমন সুন্দর শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন! তিনি যেমন এত মানুষ মারিয়াছেন, তেমন তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।

শি। আমাকে ত রক্ষা করিয়াছ তুমি। তুমি কি তবে সেই মা? তুই যে দিদি দুর্গা-মার মত! তুই তেমনই সুন্দর, তোর মুখে তেমনই আদর! তুই আমাকে কত আদর করিস্!

বালিকা আবার প্রেমভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "না ভাই! তিনি তোমাকে রক্ষা না করিলে, আমি পারিতাম না। দেখ নাই, কত ভগ্নীর বুকে কত ভাই মরিয়া রহিয়াছে?

শি। না, দিদি, তুই আমার তেমন দিদি নহিস্।

বালিকা গলদশ্রু-নয়নে শিশুকে বুকে আঁটিয়া ধরিল, এবং শিশু পুষ্পনির্ম্মিত

দুই ক্ষুদ্র ভুজে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুষ্পনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি তাহার স্বর্ণ-সম বুকে লুকাইল। বালিকা গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "তুই ভাই! দেব-শিশু। তাই দেবী তোরে রক্ষা করিয়াছেন।"

আবার কিছুক্ষণ উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ হইয়া নীরব রহিল। বালক-বালিকার হৃদয়ে যে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই বুঝি স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারা। উভয়ে নীরব, কেবল সান্ধ্য-অনিল সন্ সন্ রবে জলকল্লোল বহিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে শিশু আবার বলিল, "দিদি! সমুদ্র সর্ব্বদা কি বলিতেছে?"

বা। অমিয়! আমার পিতা বৈরাগী ছিলেন। তিনি প্রায় বলিতেন, যিনি এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পারাবার নিরন্তর তাঁহারই প্রেম-গীত গাইতেছে। সমুদ্র কহিতেছে, আমার যেমন অনন্ত জল, প্রেমময় হরির তেমনি অনন্ত প্রেম। আমার বুকে যেমন কত ঢেউ খেলিতেছে, তাঁহার প্রেমেও সেরূপ কত ঢেউ উঠিতেছে, ফুটিতেছে, পড়িতেছে। তাহাতে এ সংসার জন্মিতেছে, চলিতেছে, মরিতেছে। এ সমুদ্রের কত শক্তি! কাল দেখিয়াছ, কেমন ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কত নৌকা, জাহাজ, দেশ, বাড়ী, ঘর উড়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হরিরও তেমনি শক্তি। সমুদ্র মানুষকে বলিতেছে—দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র; তোমার শক্তি, তোমার সংসার—কত অসার! অতএব সেই প্রেমময়, লীলাময় হরিকে ডাক, তাঁহার ভজনা কর।

শি। সেই হরি কে? আমাদের বাড়ীতে রাসের সময় যাঁহার পূজা হয়?

বা। হাঁ ভাই।

শি। সেই প্রহ্লাদ-চরিত্র যাত্রায় যিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি?

বা। হাঁ, তিনি।

শি। বড় সুন্দর! কেমন সুন্দর চূড়া! কেমন সুন্দর বাঁশী! তুমি তোমার ভাই গোপালকে কেমন সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইয়াছিলে! আমাকে তেমনই করিয়া সাজাইয়া দিবে? আমি তেমনই কৃষ্ণ হইতে পারিব কি? আমার বড় সাধ তেমনই কৃষ্ণ সাজি।

বালিকা ছল ছল নয়নে বলিল,—"তুমি তাহার অপেক্ষা সুন্দর সাজিতে পারিবে। সে ত তোমার মত সুন্দর, তোমার মত দেবশিশু ছিল না। সে যে গরীব দুঃখীর ছেলে। আমি তোমাকে সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইব। ভাই ভগ্নী

দু'জনে সুন্দর সংকীর্ত্তন করিব। তুমি সাজিবে কেন? তুমি যে নিজেই আমার—ঠিক কৃষ্ণটি!" এই বলিয়া বালিকা আবার তাহার মুখচুম্বন করিল।

শিশুর মুখ গম্ভীর হইল। সে অনেকক্ষণ নীরব হইয়া কি ভাবিল। পরে আবার বালিকার বুকে মুখ লুকাইয়া অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি! হরি কি প্রহ্লাদের মত আমার বাবাকে ও মাকে রক্ষা করিয়াছেন? আমি কৃষ্ণ সাজিলে কি রক্ষা করিতে পারিতাম না?" শিশু কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুজলে বালিকার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকার বহুক্ষণ-রুদ্ধ অশ্রু-ধারা শিশুর অঙ্গ সিক্ত করিতে লাগিল। বালিকা বলিল, "হরি বড় দয়াময়। তিনি বাবা ও মাকে অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। আমি যদি এত বৎসর এই বালিকার প্রাণ ঢালিয়া বৃথা না ডাকিয়া থাকি, তবে অবশ্য তিনি এই অনাথিনীর প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে ডাকিয়াছি, এবং বাবা ও মাকে রক্ষা করিতে বলিয়াছি। অমিয়! আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের দেখিব। বাবা আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিবেন।"

"মা!"—অনাথনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদনের বহির্ভাগে থাকিয়া—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মত এই পবিত্র দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বস্ত্রাচ্ছাদনের সম্মুখে গিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"মা ভগবতি! তুই আমার অমিয়কে রক্ষা করিয়াছিস্, এবং তোর বরে সেই দয়াময় হরি আমাকেও রক্ষা করিয়াছেন।"

বালক বালিকা উভয়ে প্রেমানন্দে এক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"বাবা!" যে এরূপ মহাপ্রলয়ের গ্রাসে পতিত হইয়া রক্ষা পায় নাই, সে এই প্রেম, এই আনন্দ বুঝিবে না। অনাথনাথ পুত্রকে বক্ষে লইয়া সাশ্রুনয়নে তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন। বালিকা সাষ্টাঙ্গে ভূতলপ্রণত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুশীতল কৃতজ্ঞতাবারি তাঁহার চরণকমলে ঢালিয়া দিল। তাহার পবিত্র চক্ষের জলে সৈকতবালুকা সিক্ত হইতেছিল। বালকও পিতার বুকে কমলকোরকনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া কাঁদিতেছিল। কিছু ক্ষণ উভয়ে নীরব। শিশু যেন কি কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু যেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। তাহার পিতৃদর্শনজনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই আশঙ্কার গাঢ়তর মেঘ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ছাইয়া ফেলিতেছিল। শেষে বহু চেষ্টার পর তাহার ক্ষীণ-কণ্ঠকে আরও ক্ষীণতর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! মা—কোথায়?" প্রশ্ন মুখ হইতে নির্গত

হইবামাত্র তাহার ক্ষুদ্র-হৃদয়ের ধৈর্য্যের বন্ধন ভাসাইয়া তাহার সমস্ত দিবসের রুদ্ধ-শোকস্রোত অমিতবেগে ছুটিল। বালক মুখ ফুটিয়া আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। অনাথনাথ আত্মশোক সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! যিনি আমদের তিন জনকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তোমার পুণ্যপ্রতিমা মাকেও অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনিও শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হই-বেন।" বালক আবার কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "উঃ! বুকে কত ব্যথা! বাবা! আমি দিদির কোলে যাইব। হাঁ বাবা! তিনি কে? আমার দিদি? আমাকে ত আমার দিদি রক্ষা করিয়াছে।"

অনাথনাথ শিশুকে আবার বালিকার কোলে দিয়া বলিলেন, "বাবা! সত্য সত্যই তোমার দিদি সেই ভগবতী। আমি এমন বালিকা দেখি নাই।"

শিশুর মুখে, তাহার সেই শোকের মধ্যে, মেঘের বিরামে জ্যোৎস্নার মত একটুকু আনন্দ দেখা দিল। সে প্রেমভরে তাহার সজল-বিস্তৃতনয়নে বালি-কার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা বার বার সেইরূপ সজল নেত্রে তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশু তাহার পর বহুক্ষণ সান্ধ্যছায়াসমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে রক্তজবা বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিলেন। সেই অবর্ণনীয়, অননুভবনীয় শোভা বালক অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিল। শিশু জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? ও কি সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে?"

অ। না বাবা! সমুদ্রের অন্য পারেও অনেক দেশ আছে, অনেক লোক আছে। সূর্য্য এখন সে সকল দেশে আলো দিতে যাইতেছে।

শি। বাবা! মানুষও কি সেইরূপ এক দেশ হইতে আর আর এক দেশ আলো করিতে যায়? আমার মাও কি সেইরূপ আর এক দেশ আলো করিতে গিয়াছে? হাঁ বাবা! আমি সে দেশ দেখিয়াছি। বড় সুন্দর দেশ। আমি দিদির কোলে শুইয়া শুইয়া সে দেশ অনেকবার দেখিয়াছি। সেখানে কেমন জ্যোৎস্না, কত ফুল, কেমন সুগন্ধ!—কেমন সুন্দর ফুলের উপর আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মত মা বসিয়া হাসিতেছেন। আমাকে "অমিয়! অমিয়!" বলিয়া ডাকিতেছেন। সেই যাত্রার প্রহ্লাদের মত কত সুন্দর সুন্দর ছেলে, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, কেমন ফুলের পোষাক পরিয়া মার চারি দিকে গায়ি-তেছে, নাচিতেছে! আর মার মাথার উপর বাবা! আমাদের বাড়ীর রাসের

সেই কৃষ্ণ বসিয়া কি সুন্দর বাঁশী বাজাইতেছেন। মা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ঐ দেখ কেমন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। মা! মা!

শিশু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিল। অনাথনাথের ও বালিকার মুখ গম্ভীর—বড় গম্ভীর হইল। অনাথনাথ শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, খুব জ্বর। ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" শিশু "বাবা!" বলিয়া অতি ক্ষীণ মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিল, এবং বলিল,—"উঃ! বুকে বড় ব্যথা।" অনাথনাথ বুঝিলেন যে, ঝটিকা-প্লাবন-সময়ে শিশু বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াছে। বালক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার নয়ন মেলিয়া বলিল,—"দিদি! আমার মা আমাকে প্রহ্লাদ সাজাইয়া একটি গান গায়িতেন ও আমাকে গায়িতে শিখাইতেন। তুই সেই গানটি জানিস্? তুই একবার সেই গানটি গায়িনি? আমি উঠিতে পারিতেছি না, তেমন করিয়া নাচিতে পারিব না। আমিও তোর সঙ্গে গাইব।" বালিকা তাহার সেই অমৃতময় কণ্ঠে সান্ধ্য সৈকতবেলা অমৃতাকীর্ণ করিয়া সেই গানটি গায়িতে লাগিল, এবং অমিয়া তাহার অমিয়পূরিত কণ্ঠে সেই সঙ্গে গায়িতে লাগিল।—

"তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।
মনের সাধে ও আমার মন খেল না হরিনামের খেলা।"

অনাথনাথ এ গীত অনেকবার শুনিয়াছেন। মাতা পুত্রের এ গীতাভিনয় অনেকবার দেখিয়াছেন। কিন্তু গীতটি এমন মধুর, এমন পবিত্র, এমন প্রাণ-দ্রবকারী তাঁহার আর কখনও বোধ হয় নাই। তিনি আত্মহারা হইয়া এই গীত শুনিতে লাগিলেন। গীত ধীরে ধীরে সমাপ্ত হইল। বালিকা নীরব হইলেও শিশু ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে ক্ষুদ্র হাতে ক্ষুদ্র তালি দিয়া ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। তাহার নয়ন মুদ্রিত, মুখ শান্ত,—প্রস্ফুটিত কুসুমনিভ শোভা পাইতেছিল। ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে গীত শেষ হইল। তালি বন্ধ হইল। হাত দুখানি হইয়া পড়িল। শিশু নীরব হইল; সে তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে চলিয়া গেল। বালিকা ডাকিল,—"দাদা! দাদা!" উত্তর পাইল না। অনাথনাথ ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" উত্তর পাইলেন না। শিশু তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে চলিয়া গেল। অনাথনাথ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালিকাও সে মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে মূর্চ্ছিত হইল। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর হইয়া এই পবিত্র দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল।

চুণার।

শীতের পর বসন্তের মত,—বিরহের পর মিলনের মত, কার্য্যভারপূর্ণ ক্লান্তিকর অনেক দিনের পর পূজার অবকাশ। সেকালে যেমন প্রাবৃট-গগনে নবঘন দেখিলে প্রবাসী দূরগৃহে ফিরিতে ব্যাকুল হইত, একালে তেমনই পূজার অবকাশ পাইলে ভ্রূকুটীকুটিলমুখ সহর ছাড়িয়া শ্যামশোভাময় পল্লীগ্রামে যাইতে ইচ্ছা করে। এবার ভাবিয়া স্থির করিলাম, চুণারে যাইব। অন্নভুক বাঙ্গালী কোন কালেই বীর নহি—তথাপি এবার যে কথা, সেই কাজ। দ্রব্যাদি গুছাইয়া চুণারে উপস্থিত হইলাম।

চুণারে আমরা অনেকগুলি বাঙ্গালী জুটিয়াছিলাম—সর্ব্বসমেত আট জন। আমাদের মধ্যে বিংশতিবর্ষীয় যুবক হইতে ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ, কোন স্তরেরই লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিঘ্ন হয় নাই। অবশ্য যিনি ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ, তিনি সময় সময় আপনার বয়সোপযোগী গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাঁহার সাধুচেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল হইত।

বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি ধারাবাহিকরূপে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার প্রয়াস পাইব না; কেবল চুণারের কয়েকখানি চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিব।

অনেক দিন পরে পশ্চিমে যাওয়ায় চুণারের সামান্য সামান্য দ্রষ্টব্য দ্রব্যগুলিও আমার অতি সুন্দর বোধ হইয়াছিল। চুণারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজপথটি প্রভাতী বা সান্ধ্য ভ্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এক দিন প্রভাতে আমরা সেই পথে কেল্লার অভিমুখে চলিলাম। পথের বামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবমন্দির সংস্থাপিত। সেগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। তখন নানাবর্ণরঞ্জিত-শাটী-পরিহিতা কুলললনাগণ জাহ্নবী সলিলে স্নানান্তে এক এক ঘটী গঙ্গোদক লইয়া একে একে সেই মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করিতেছে ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তির মস্তকে "জল চড়াইতেছে", অর্থাৎ জলপাত্রের জল ঢালিয়া দিতেছে। বলা বাহুল্য, তাহারা পরমভক্তিভরে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেছিল। আমি ভাবিলাম, ভক্তিই যদি মুক্তির উপায় হয়, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী অপেক্ষা ইহাদের মুক্তির পথ অধিক সহজ ও সরল। সত্যসত্যই ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের এমন সম্বন্ধ নহে যে,

বিলাসীর উপযোগী পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া প্রার্থনা-মন্দিরে সুমধুর গীত-ধ্বনির সহিত আমাদের প্রার্থনা মিশ্রিত না করিলে তিনি আমাদের অন্তরের নিবেদন গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ভক্তির জুয়ার আমাদিগকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে, না অবনতির দিকে অগ্রসর করিতেছে? আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন আমি আর ইংরাজরাজ্যে নাই, বহু দিন পূর্ব্বে, প্রাচীনকাব্যের বর্ণিত হিন্দু-রাজত্বকালের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এ যেন সেই সময়ের দৃশ্য।

আমার মনে যখন এইরূপ ভাবোদয় হইতেছিল, তখন আমরা চুণারদুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। গঙ্গাবারি-বিধৌতমূলদেশ একটি অনতি-উচ্চ কিন্তু দুরারোহ শৈলশিখরে দুর্গটি নির্ম্মিত। টার্ণারের ন্যায় চিত্রকরও, বোধ করি, এ দুর্গটি অঙ্কিত করিতে ব্যগ্র হইতেন—এমনই স্থানে ইহা নির্ম্মিত। আমার গড়মান্দারণের কথা মনে পড়িল। আমার মনে হইল, কোন অনির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বকালে কোন বিরহ-বিধুরা দুর্গেশনন্দিনী এই দুর্গাভ্যন্তরে গঙ্গামুখী কোন কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া কোন জগৎসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। গঙ্গার তরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণে তাঁহার সূক্ষ্মকারুকার্য্যবহুল অঞ্চল মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইত, আর তাঁহার মাল্যাভরণভূষিত অলক হইতে মৃদু গন্ধ উত্থিত হইয়া সমস্ত কক্ষ সৌরভে সুবাসিত করিয়া তুলিত। হায়—চুণারদুর্গ এখন কিনা জেলখানারূপে ব্যবহৃত হইতেছে! উৎসবানন্দের দিনে সেই গীতবাদ্য, দুর্গ-প্রাকারে সেই দীপমালা, দুর্গশিরে সেই অনিল-বিকম্পিত কেতন; আশঙ্কার সময় দুর্গপ্রাচীরে সশস্ত্র প্রহরীর কোষনিবদ্ধ অসির ঝনৎকার, তাহার করধৃত বর্ষার ফলকে সূর্য্যকরের খেলা, সে সকলই এখন অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমরা সকলে যাইয়া গঙ্গাতীরে বসিতাম। চারি দিকে দৃশ্য বড় বিমোহন;—সম্মুখে জলবেণীরম্যা ভাগীরথী তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া যাইত, বামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দূরত্ব হেতু নীল দেখাইত—যেন মেঘের কোলে আরও ঘন মেঘ; পশ্চাতে সুদূরপ্রসারিত প্রান্তরে সান্ধ্যছায়া-পাতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীতপটু, তাঁহারা গায়িতে আরম্ভ করিতেন। সেই কলনাদিনী নদীর তীরে সেই স্বরলহরী, আর চারি দিকের সেই মোহন দৃশ্য, যেন কোন স্বপ্নলোকের রচনা করিত। চন্দ্রোদয় হইলে আমরা ঝিল্লীমন্ত্রমুখরিত প্রান্তর পার হইয়া গৃহে ফিরিতাম।

চুণার হইতে অল্প দূরে বিন্ধ্যাচলের মধ্যে "দুর্গাকোহ" নামক একটি পাহাড় আছে। সেখানে একটি মন্দিরের মধ্যে দুর্গামূর্ত্তি সংস্থাপিত। মহাষ্টমীর দিন আমরা সেই মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। ক্রমে যখন নীল পাহাড়-শ্রেণী সবুজ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন আমরা পথশ্রম সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম। আমার বিশ্বাস, এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোনও দস্যু-দলের আরাধ্যা ছিলেন, এবং হয় ত এই দেবীর উদ্দেশে এই মন্দিরে কত নরবলি হইয়া গিয়াছে! মন্দিরটি এমনই স্থানে অবস্থিত যে, বাহির হইতে তাহার চিহ্ন-মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না,—অত্যন্ত নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে তবে দেখা যায়। পূর্ব্বে যে এই মন্দিরের গমন-পথ নির্ণয় করা লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখনও ভাল পথ নাই। একটা বিশুষ্কপ্রায় নির্ঝরের প্রস্তরময় বক্ষের উপর দিয়া যাইতে হয়। বর্ষাকালে গমনের পথ থাকে কি না সন্দেহ। দুই পার্শ্বে ঘন বন। বনমধ্যে শেফালিকা তরুরাজি; এই তরু-শ্রেণী লক্ষ্য করিয়া শেফালি-বিকীর্ণ বনপথে মন্দীরসমীপে উপনীত হইতে হয়। দেখিলেই একটা উপন্যাসবর্ণিত দস্যুদলের উপাসিতা দেবীর মন্দির বলিয়া মনে হয়। মন্দিরটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত,—চূড়াবিহীন। মহাষ্টমীর দিন বহু লোক সেই প্রাচীন দেবীমূর্ত্তির পূজা করিতে আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে দিন সেই বিজন বনে দুই চারিখানা মিষ্টান্নের ও ফুলের দোকানও বসিয়া-ছিল। মন্দিরে আসিয়াই সহসা বিগ্রহ দেখিবার সুবিধা নাই। খানিকটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আঁকা-বাঁকা পথে মন্দির-দ্বারে উপনীত হইতে হয়। দ্বারটিও অদ্ভুত রকমের—একটি মানুষ হামাগুড়ি দিয়া কোনরূপে সেই দ্বার-পথে মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে পারে। তখন বিগ্রহের দর্শনলাভ হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে ঘনান্ধকার। বিগ্রহের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ দেখিলাম; কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিশ্চিত যশোলাভের আশায় নিশ্চিত মৃত্যুলাভ করিতে সাহস করিল না। এই বিজন বনে নরহত্যার সংঘটন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

মন্দিরের এক জন ভৃত্যের নিকট দ্রব্যাদি রাখিয়া আমরা পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে উঠিলাম। খানিকটা বন পার হইয়া একটা বৃক্ষবিরল স্থানে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, এই সানুভূমিতে সময়ে সময়ে বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল হরিণের দল ও ময়ূরের ঝাঁক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এ সানুভূমির শোভা কল্পনীয় বটে—বর্ণনীয় নহে। পাহাড়ের উপর উঠিলে আর সেই মন্দির দৃষ্টিগোচর হয় না।

সানুদেশে দাঁড়াইয়া দেখিলাম,—নিম্নে তালীবনশ্যাম সমভূমি বিস্তৃত, তাহার উপর দিয়া "রেলরোড" চলিয়া গিয়াছে; দূরে তরঙ্গরঙ্গিণী গঙ্গা রজতসূত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; আর তাহারই কূলে চুণার সহর,—যেন বালকের খেলা-ঘর; অপর দিকে বিন্ধ্যাচলের বৃক্ষলতাবহুল শ্যাম-শৃঙ্গচয় আপনাদের মহিমাগর্ব্বে দণ্ডায়মান। যেন কবিতার রাজ্য—যেন স্বপ্নের দেশ!

কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর ক্লান্তদেহে আমরা মন্দিরতলে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া মন্দিরপার্শ্ববাহী নির্ঝরের নির্ম্মল নীরে স্নান করিয়া, সঙ্গে যে খাবার ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলাম না। এই নির্ঝরসংলগ্ন একটি কুণ্ড আছে; সেটি এরূপ ভাবে গঠিত যে, দারুণ গ্রীষ্মে নির্ঝর শুকাইয়া গেলেও কুণ্ডে প্রচুর জল সঞ্চিত থাকে। সুতরাং মন্দিরের পার্শ্বে প্রস্তরময়কক্ষবাসী দিগকে কখনও জলকষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

আমরা যখন গৃহাভিমুখগামী হইলাম, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। আমারা যখন সেই প্রখর-প্রভাকর-কিরণতপ্ত তালতরুশোভিত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বাল্যকালে তালতরুশালী মরুমধ্যে ভ্রাম্যমাণ শ্রান্ত আরবদিগের যে সকল চিত্র দেখিয়াছিলাম, সেই সকল চিত্রের কথা মনে পড়িতে লাগিল। শ্রান্তদেহে বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা গৃহে ফিরিলাম।

ইহার পর দিনই আমরা চুণার ত্যাগ করি।

অভাগিনী।

১

কলিকাতার একটি বৃহৎ রঙ্গালয়ের অভিনয় শেষ হইয়া গেল। অভিনয়ের, অভিনেতৃগণের ও অভিনেত্রীদিগের সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতে করিতে দর্শকগণ রঙ্গালয় হইতে গ্যাসালোকে আলোকিত, পথিকসঙ্কুল রাজপথে আসিয়া পড়িল। সেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ইংরাজী-বেশধারী দুই জন বাঙ্গালী যুবক ও অর্দ্ধ-ইংরাজী-বেশধারিণী একজন বাঙ্গালী মহিলা রাজপথে দণ্ডায়মান একখানা ব্রাউনবেরি শকটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহিস শশব্যস্তে শকট-দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। তাঁহারা শকটাভ্যন্তরে উঠিতেছেন,

এমন সময় অদূরে কে বলিল, "দিদি, যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সে ঐ যায়। যত কষ্ট, যত কলঙ্ক আমার; বুঝি যত পাপও আমার। ভগবানের বিধান দেখ!"

রঙ্গালয়ের পার্শ্বেই একখানা জীর্ণ খোলার ঘরের দ্বারে দুই জন হতভাগিনী পাপের প্রলোভনস্বরূপ হইয়া সেই প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়াছিল। এক জন প্রৌঢ়া; অপর জন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা,—দেখিলে বোধ হয়, এক সময় তাহার রূপলাবণ্যের অভাব ছিল না—হয় ত তাহাই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। এখনও তাহার মুখে রূপের অবশেষ আছে; কিন্তু পাপের ছায়াপাতে লাবণ্য বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। তাহার নিদ্রানল নয়ন কোটরগত, তাহাতে শ্রান্তির ভাব বড় পরিস্ফুট। তাহার পার্শ্বেই তাহার একটি লোমশ কুক্কুর দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্রাউনবেরির আরোহীদিগের মধ্যে মিষ্টার হীরালাল সান্ন্যালকে দেখাইয়া বলিল, "দিদি, যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল—সে ঐ যায়। যত কষ্ট, যত কলঙ্ক আমার; বুঝি যত পাপও আমার। ভগবানের বিধান দেখ!" এই পরিবর্ত্তিত বেশেও সে আজ হীরালালকে চিনিতে পারিয়াছিল। বেশপরিবর্ত্তন করিয়া পুলিশের চক্ষে ধূলি দেওয়া চলে; কিন্তু যাহার সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, তাহাকে ভুলাইতে পারা যায় না।

অভাগিনীর কথা শুনিয়া হীরালাল মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল—সে কণ্ঠস্বর যেন সে পূর্ব্বে কোথাও শুনিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সে তাড়াতাড়ি শকটাভ্যন্তরে উঠিয়া বসিল। গাড়ীর ভিতর ম্লান আলোকে তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে কেহ এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

শকটাসনে বসিয়া মিস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "এই যে সকল হতভাগিনী মদ্য-পান করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে মাতলামী করে, পুলিশ কি ইহার কোন প্রতিবিধান করে না?"

মিস্ মুখার্জ্জির ভ্রাতা বলিলেন, "ইহাই বর্ত্তমান কালের সভ্যতার একটা প্রধান কলঙ্ক।"

তাঁহার প্রেমিক মিষ্টার সান্ন্যাল সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিল না। সে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিল। বহুদিনপূর্ব্বপরিচিত একখানি কোমল মুখের স্মৃতি, আর আজ রঙ্গালয়-পার্শ্বে দৃষ্ট একখানি পাপছায়াব্যাপ্ত মুখের কথা তাহাকে বড় ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল।

মিস্ মুখার্জ্জির গৃহগমন-পথেই হীরালালের আবাসগৃহ। অন্য দিন হইলে সে মিস্ মুখার্জ্জিকে গৃহে রাখিয়া বিদায় লইয়া আপনার গৃহে ফিরিত। আজ সে তাহা করিল না; শারীরিক অসুস্থতার ওজর করিয়া আপনার গৃহদ্বারেই শকট হইতে অবতরণ করিল।

মিস্ মুখার্জ্জি লক্ষ্য করিলেন,—হীরালালের মুখ বড় গম্ভীর—যেন সে কোন যন্ত্রণাদায়ক চিন্তায় ক্লিষ্ট।

মিস্ মুখার্জ্জির পিতা একজন স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার। হীরালাল সম্প্রতি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। হীরালালের সহিত মিস্ মুখার্জ্জির বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছে; এখন কেবল বিবাহ-সাধনা অর্থাৎ "কোর্টশিপ" চলিতেছে; পাকাপাকি কিছুই স্থির হয় নাই।

২

সেদিন রাত্রিকালে হীরালাল ঘুমাইতে পারিল না। তাহার কেবল বোধ হইতে লাগিল, যেন সে শয্যাপার্শ্বে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছে, যেন কে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। কক্ষের অন্ধকারমধ্যে সে যেন রঙ্গালয়-পার্শ্বে দৃষ্ট সেই অভাগিনীকে দেখিতে পাইতে লাগিল। হীরালাল উঠিয়া দীপ জ্বালিল—কক্ষের অন্ধকার যেন শ্বাসরোধকারী বলিয়া তাহার অনুভূত হইতে ছিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর প্রভাতে হীরালাল মাথাধরা বোধ করিতে লাগিল। স্নানাদির পর সে ভাবিল, দিনকতকের জন্য কোথাও বেড়াইয়া আসিবে, তাহা হইলেই এ দুশ্চিন্তা দূর হইয়া যাইবে। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে, দিনকতকের জন্য বরাহনগরে মাতুলপুত্র মহিমচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিবে। বাল্যকালে সে মাতুলালয়ে থাকিয়াই বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিল—তাহার পর ইংলণ্ডে প্রবাসকালেও সে মাতুলের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। সে মহিমচন্দ্রকে লিখিয়াছিল যে, তাহার শরীর অসুস্থ, তজ্জন্য সে দিন কতক সহর ছাড়িয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবে।

হীরালালের পত্র পাইয়া পর দিবস মহিমচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়ার পর দেখা—মহিমচন্দ্র আসিয়াই ভ্রাতার সহিত কোলাকুলি করিলেন। যেখানে সত্যসত্যই প্রাণের টান থাকে, সেখানে বিদেশীয় বেশে বা বিজাতীয় ভাষায় মনের প্রকৃত ভাব ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

দুই ভ্রাতায় অনেক কথা হইল। অতীতের কথা, বর্ত্তমানের কথা—নানা-

কথার পর মহিমচন্দ্র বলিলেন, "চল, আজই যাওয়া যাউক। বাবার মৃত্যুর পর তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও নাই; মা সে জন্য কত দুঃখ করেন। তুমি যাইবে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া মা বড় চিন্তিতা হইয়াছেন। তোমার অসুখ হইবে না ত হইবে কাহার? শরীরের উপর কত অত্যাচার সহে বল!"

হীরালাল বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে ও কথা বলিও না। শরীরের উপর আমার কোন অত্যাচার নাই।"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, "তোমাদের সমস্ত জীবনটাই শরীরের উপর অত্যাচার। উপযুক্ত নিদ্রা হইতে না হইতে প্রভাতে উঠিয়া কিছু আহার করিয়া রোগী থাকুক আর নাই থাকুক একবার ঘুরিয়া আসিবে; তাহার পর বেলা পড়িতে না পড়িতে 'ভিজিট', 'রিটার্ণ-ভিজিট', ইত্যাদি; ইহার পর বাটীতে ফিরিয়া চখে-মুখে জল দিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতে 'ইভনিং-পার্টি' প্রভৃতি আছে; ইহার পর আবার রাত্রিতে নাচ, 'পার্টি' প্রভৃতি আছে,—গৃহে ফিরিতে রাত্রি দুইটা কি তিনটা বাজে। ইহার উপর আবার এক রাশ মাংসভক্ষণ ও মদ্য-পান। শরীরে আর কত সহিবে?"

হীরালাল ভ্রাতার কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সেই দিন হীরালাল ভ্রাতার সহিত তাঁহার গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রাসাদোপম গৃহে চলিয়া গেলেন।

মাতুলালয়ে আসিয়া ইংরাজী পোষাকের খোলস ত্যাগ করিয়া হীরালাল বড় আরাম বোধ করিলেন; বহুদিন মাংসাহারের পর বাঙ্গালীর ডালভাত তাঁহার নিকট অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

৩

মহিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রযত্নে ভ্রাতার আরামবিধানে চেষ্টিত হইলেও, বরাহনগরে আসিয়া হীরালাল শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। যে দুশ্চিন্তার জন্য তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এখানেও সে চিন্তা হইতে অব্যাহতি ছিল না। চিন্তার স্থান মানব-হৃদয়ে;—স্থানপরিবর্ত্তনে সকল সময় তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। আবার এখানে তাঁহার দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল। এখানেই বিনোদিনীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ; এখানেই তিনি সেই সরলা প্রোষিতভর্ত্তৃকার হৃদয়ে প্রেমোদ্রেক করিয়াছিলেন; এখান হইতেই সে তাঁহার আশায় গৃহ, পরিজন সকল ত্যাগ করিয়া, পাপ-পথের পথিক হইয়াছিল। এখানে হীরালালের দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল।

প্রভাতে ও অপরাহ্নে বীচিভঙ্গবহুল নদীবক্ষে তরণী বাহিয়া শীকরশীতল সমীরসেবন, সর্ব্বদা ভ্রাতার সহিত নানা মধুর আলাপ, কিছুতেই তাঁহার হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তার ছায়া দূর হইল না।

একাকী থাকিলেই তাহার বোধ হইত, যেন সে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছে। নিশিতে সহসা নিদ্রাভঙ্গে তাহার বোধ হইত, যেন কে প্রতি-হিংসা-জ্বালা-দীপ্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—সে চাহিয়া দেখিত—কোথাও কেহ নাই!

হীরালাল দিন দিন শীর্ণকায় হইতে লাগিল; আর তাহার শীর্ণ আননে চক্ষু দুইটি জ্বালাময় দীপ্তি লাভ করিতে লাগিল। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে জীবনের সেই ভীষণ ভ্রমের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিত না।—প্রথমে নদীতীরে সহসা সেই যৌবন-প্রারম্ভপদার্পিতার সহিত সাক্ষাৎ;—হৃদয়ের কোন কোণে কোথাও আরও অগ্রসর হইবার জন্য কৌতূহল;—যুবতীর হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার;—সেই জ্যোৎস্নালোকসমুজ্জ্বল নিশিতে যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ;—তাহার জন্য যুবতীর গৃহত্যাগ—সে সকলই তাহার মনে পড়িত। যুবতী তাহার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিবার পর সে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। তাহার পর এত বর্ষ গিয়াছে,—সে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার পর—রঙ্গালয়-পার্শ্বে জীর্ণকুটীর-দ্বারে সেই পরিবর্ত্তিত পাপ-ছায়াব্যাপ্ত আনন!

এই সকল স্মৃতি হীরালালের হৃদয়ে ভীষণ যন্ত্রণা জ্বালাইয়া তুলিত। এই দুশ্চিন্তা-জ্বালাই নরক;—মানবের কল্পনাসৃষ্ট শারীরিকযন্ত্রণাগার নরক ইহার নিকট তুচ্ছ।

হীরালাল বরাহনগর হইতে পলাইতে চাহিল; ভাবিল, হয় ত অন্যত্র গেলে একটু সুস্থ হইতে পারিবে। কিন্তু মহিমচন্দ্র তাহাকে এত শীঘ্র যাইতে দিতে চাহিলেন না। অগত্যা হীরালাল সেখানেই রহিয়া গেল।

৪

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এখনও নৈশ অন্ধকার চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই। বরাহনগরের প্রান্তে এক জন রমণী নদীর দিকে যাইতেছে; তাহার সঙ্গে একটি লোমশ কুক্কুর নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছে। আমরা আপনার পাপে লিপ্ত হইয়াও পাপীকে ঘৃণা করি;—পাপীকে যত ঘৃণা করি, পাপকে তত ঘৃণা করি না; পশুরা বোধ করি পাপকে ঘৃণা করে, কিন্তু তাহারা আমাদের মত পাপীকে ঘৃণা করে না। আমরা সৃষ্টির শীর্ষস্থানে অবস্থিত,—আমরা উত্তম,—তাহারা অধম।

সেই দিন রঙ্গালয়ের অভিনয়ান্তে হীরালালকে দেখিবার পর হইতে এ কয় দিন বিনোদিনী কেবল কাঁদিয়াছে, কেবল ভাবিয়াছে। পাপের প্রতি তাহার কোনও আকর্ষণই ছিল না। যখন যৌবনপ্রারম্ভে সে হীরালালকে ভালবাসিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তখন সে সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা। আসিয়া দেখিল, আর ফিরিবার উপায় নাই; বুঝিল, যে ভ্রম করিয়াছে, সমাজের চক্ষে তাহা অমার্জ্জনীয়,—রমণীর পক্ষে তাহা সংশোধনের আর উপায় নাই। তাহার পর—পিচ্ছিল পাপ-পথ হইতে ফিরাইবার কেহ না থাকিলে, প্রায় কেহ ফিরিতে পারে না;—বিনোদিনীও ফিরিতে পারে নাই।

এ কয় দিন ভাবিয়া ভাবিয়া বিনোদিনী কি স্থির করিয়াছিল। যেখানে তাহার পিত্রালয় ছিল, আজ সে সেইখানে আসিতেছিল। গ্রাম-প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র নালা। বর্ষার পর দুই তিন মাস তাহাতে একটু জল থাকে, তাহার পর জল শুকাইয়া গেলে তৃণগুল্মাদি জন্মে। এখনও সে নালায় একটু জল বাধিয়া ছিল। এক জন রমণী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নালা পার হইতেছিল; জননী কৌতুকচ্ছলে পুত্রকে জলে ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল, পুত্র ভয় পাইয়া জননীকে ধরিতেছিল; তখন জননী হাসিতে হাসিতে পুত্রের মুখচুম্বন করিতেছিল, শিশুও ভয় ভুলিয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার ব্যর্থ নারী-জীবনে সন্তানের স্পর্শ সুখ-লাভ হয় নাই। জগতে তাহার আপনার বলিবার কেহ নাই! তাহার রুদ্ধ অপত্যস্নেহ গৃহপালিত কুক্কুরকে ভালবাসিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। সন্তানের স্নেহস্পর্শলাভের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

রমণী নালা পার হইয়া গেল।

বিনোদিনীও ধীরে ধীরে নালা পার হইল। তাহার পালিত কুক্কুরটিও সাঁতার দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নালা পার হইয়া অপর পারে উপনীত হইল।

সান্ধ্য অন্ধকার চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। বিনোদিনী গ্রাম-প্রান্তে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িল।

৫

ক্রমে নিশা গভীর হইল; কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চন্দ্র আকাশে উদিত হইয়া রজত-কিরণ ছড়াইতে লাগিল। বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া বিনোদিনী সুপ্তগ্রামের

মধ্য দিয়া গ্রামের অপর প্রান্তে নদীকূলে যেখানে তাহার পিত্রালয় ছিল, সেখানে গেল। এখন সেখানে আর গৃহ নাই; কেবল শূন্য ভিটা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। এখন বামে অদূরে সুপ্তগ্রামে সকল কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, সম্মুখে নদী মন্দস্রোতে বহিয়া যাইতেছে, দক্ষিণে ও পশ্চাতে বৃক্ষ-বিরল প্রান্তরে ঝিল্লীরব উঠিতেছে। সেই ভিটার উপর বসিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল,—হয় ত তাহারই জন্য ঘৃণায় লজ্জায় তাহার পিতা মাতা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,—কোন্ বিদেশে,—আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে দূরে না জানি তাঁহাদের কি হইয়াছে! সেই শূন্য ভিটার মৃত্তিকার উপর পড়িয়া বিনোদিনী অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তাহার নেত্রে অশ্রু বাহির হইল—বিনোদিনী কাঁদিতে লাগিল। পিতা মাতার সেই সুখময় সংসারের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। শৈশবের, বালিকা-বয়সের, যৌবনারম্ভের সেই সুখময় জীবনের কথা ভাবিয়া বিনোদিনী ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। তাহার পর—এই ঘৃণিত পাপের জীবন! হীরালালের সহিত সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা তাহার মনে পড়িল—বিনোদিনী শিহরিয়া উঠিল।

বিনোদিনী সেই সকল কথা ভাবিতে লাগিল, আর বালিকা-বয়সে একবার-মাত্রদৃষ্ট স্বামীর মূর্ত্তি তাহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে দিব্য জ্যোতিশ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাকে মৃতা ভাবিয়া একটা শৃগাল তাহার নিকট পর্য্যন্ত আসিল; কিন্তু পার্শ্বেই কুক্কুরটিকে দেখিয়া চলিয়া গেল।

বিনোদিনী বহুক্ষণ কাঁদিল; কত ক্ষণ কাঁদিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই,—চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রালোক ম্লান হইয়া আসিতেছে। উঠিয়া সে অদূরে প্রবাহিতা জাহ্নবীর কূলে আসিয়া দাঁড়াইল। কুক্কুরটি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল—সে এখন তাহার চরণে আপনার লোমশ তনু ঘর্ষণ করিল। বিনোদিনী চাহিয়া দেখিল;—সে কুক্কুরের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

কুক্কুরটির দিকে চাহিয়া বিনোদিনী বলিল, "তোকে আর কাহার কাছে রাখিয়া যাইব? জগতে কাহাকেও বিশ্বাস নাই।" সে আপনার অঞ্চল হইতে একাংশ ছিন্ন করিয়া লইল। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ইষ্টকের মধ্যে একখানি কুড়াইয়া লইয়া অঞ্চলের ছিন্ন অংশ দিয়া কুক্কুরটির গলে বাঁধিয়া দিল; তাহার পর তাহাকে তুলিয়া বেগে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। শূন্যে একটি বক্র রেখা অঙ্কিত করিয়া চীৎকার করিয়া কুক্কুরটি জলে পড়িল;—শব্দ করিয়া চারি দিকে জল ছিটাইয়া পড়িল। হতভাগ্য মরণাহত জীব উঠিবার জন্য একবার প্রাণপণ

চেষ্টা করিল; তাহার মস্তকের অগ্রভাগ জলের উপর দেখা দিল; তাহার পর ইষ্টকের ভারে সে ডুবিয়া গেল। জলে কয়েকটি বুদ্বুদ উঠিল—কতকগুলি বৃত্ত কূলের দিকে আসিতে আসিতে ক্রমেই বৃহৎ হইতে হইতে মিলাইয়া গেল। নদীস্রোত আবার পূর্ব্বের মত বহিতে লাগিল।

বিনোদিনীর হৃদয় যন্ত্রণাকুল হইয়া উঠিল সে নদীকূলে বসিয়া পড়িল। নদীর তরঙ্গমালা তাহার পদতল স্পর্শ করিতে লাগিল। তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার অশ্রুর উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—নেত্রে আর অশ্রু আসিল না। তাহার পূর্ণ আননে অশ্রুহীন উজ্জ্বল নয়নদ্বয় সর্পিণীর মস্তকস্থিত মণির মত জ্বলিতে লাগিল। সেই ম্লানচন্দ্রালোকবিভাষিত নিশাশেষে, জন-সমাগমবিহীন প্রান্তর-প্রান্তে নদীতীরে তাহাকে যেন প্রেতলোকবাসিনী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বিনোদিনী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—শরীরের সমস্ত বল একত্রিত করিয়া সে নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িল। চারি দিকে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কতকগুলি বড় বড় তরঙ্গ উঠিয়া নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার পর আবার নদী পূর্ব্বের মত কলকলনাদে বহিতে লাগিল।

৬

পরদিন প্রভাতে মেঘমুক্ত গগনে অম্লানোজ্জ্বল সূর্য্যোদয় হইল। প্রভাতী-স্নানের পর হীরালাল ও মহিমচন্দ্র একখানি ছোট নৌকায় গঙ্গাবক্ষে জল-পথে বাহির হইলেন। শরতের প্রভাতে রৌদ্র উপভোগ-যোগ্য মধুর,—শুধান্ত কাটা হইয়া গিয়াছে, নদীর দুই কূলে কৃষকের গৃহে গোলা পূর্ণ—গৃহপ্রাঙ্গণে শিশুদিগের আনন্দ-কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। তরণী উজান বহিয়া চলিতে লাগিল।

সহসা মহিমচন্দ্র দেখিলেন, দূরে কি একটা ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি মাঝিদিগকে একটু বেগে নৌকা বাহিতে আদেশ করিলেন। সকলে সেই অসমান পদার্থটার দিকে চাহিয়া রহিল। নৌকা একটু অগ্রসর হইলেই বুঝা গেল যে, গঙ্গার মন্দ স্রোতে একটি শবদেহ ভাসিয়া আসিতেছে। তরণী আর একটু অগ্রসর হইলে মহিমচন্দ্র বলিলেন, "স্ত্রীলোক।"

হীরালাল চমকিয়া উঠিল। সে বলিল, "শব দেখিয়া আর কি হইবে? চল, ফিরিয়া যাই।"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, "যদি অল্পক্ষণ ডুবিয়া থাকে, তবে হয় ত বাঁচাইতে পারা যাইবে। চল, দেখা যাউক।"

তরণী অগ্রসর হইল। হীরালাল সভয়ে দেখিল—বিনোদিনীর মৃতদেহ;—নয়ন মুক্ত, সে নয়নে এখনও পৈশাচিক দৃষ্টি আছে। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল।

একজন মাঝি বলিল, "এখনও বাঁচিয়া আছে না কি!"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, "কূলে আন্; দেখা যাউক।"

হীরালাল আর থাকিতে পারিল না। তরী হইতে লাফাইয়া পড়িল। মহিমচন্দ্রও তাহার সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পড়িলেন।

৭

মহিমচন্দ্র বহু কষ্টে হীরালালকে তীরে তুলিলেন। তত ক্ষণে মাঝিরাও সেই মৃতদেহ তীরে তুলিয়াছিল।

হীরালাল প্রথমে পলাইতে চেষ্টা করিল। মহিমচন্দ্র তাহাকে ধরিলেন। সে একবার বিনোদিনীর মৃতদেহের দিকে চাহিল। তাহার বোধ হইল, যেন বিনোদিনী মরণের পরপার হইতে প্রতিহিংসা-জ্বালা-দীপ্ত পৈশাচিক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

সে দুই করে চক্ষু ঢাকিয়া বলিল, "আর দেখিতে পারি না—আর দেখিতে পারি না।"

* * * * *

ইহার পর হীরালাল উন্মাদ-রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। এখনও সময়ে সময়ে মহিমচন্দ্রের গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে,—"আর দেখিতে পারি না—আর দেখিতে পারি না।"

কাব্য-কথা।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক স্কট্ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সমালোচক কার্লাইল বলিয়াছেন,—"There is nothing spiritual in him; all is material, of the earth, earthy. He does not wrestle with the great Mystery of existance. In his heart there was no gospel-tidings burning to be uttered." মানবের

এই রহস্যপূর্ণ জীবন-সমস্যার কথা যাঁহার হৃদয়-মনকে আন্দোলিত করিতে পারে না, যিনি উহার কোনওরূপ মীমাংসা লইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হন না, কার্লাইল তাঁহাকে কবি-শ্রেণীমধ্যে উচ্চাসন দিতে প্রস্তুত নহেন। বাস্তবিক, যিনি দুর্লভ কবি প্রতিভার অধিকারী হইয়া কেবল "বসন্ত-ভূষিতা বসুন্ধরা" আর "সেই মুখখানি" লইয়া কালাতিপাত করেন, তিনি যে স্বীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছেন না, ইহা সুসমালোচকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে কখনও কখনও এরূপ দুই এক জন অজাতশ্মশ্রু সমালোচক দেখা দেন বটে, যাঁহারা যৌবনের বিলাস-বিহ্বল সমুচ্ছল প্রেম সঙ্গীতকেই কাব্যের চরমাদর্শ মনে করেন। মানবের সমগ্র জীবনের সমালোচনাই কবির কার্য্য। সুতরাং, কি শৈশব, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, প্রকৃত কবির চক্ষে কিছুই উপেক্ষার বিষয় নহে। আমরা যৌবনের বিরোধী নহি,—প্রত্যুত চিরযৌবনের পক্ষপাতী। প্রেম-সঙ্গীতের প্রতিও আমাদের বিশেষ কোনও বিরাগ নাই। তথাপি উক্তরূপ সমালোচনা দেখিলেই কেমন একটা সন্দেহের উদয় হয়। অবশেষে আমাদের মনে ফরাসী লেখকের সেই প্রসিদ্ধ কথাগুলি জাগিয়া উঠে,—"Clear it is, my good young man, that you are only eighteen; let us hear what you have to say at forty." কার্লাইলের মতানুসরণ পূর্ব্বক আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিদিগের প্রতি একবার পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার প্রয়োগ করিয়া দিতে চাহি। বিদ্যাপতি হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রাচীন কবিকুল আমাদিগকে এ বিষয়ে বড় বেশী সাহায্য করিতে পারেন না। বৈষ্ণব কবিদল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় থাকিলেও, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র যে অনেক স্থলেই অবিমিশ্র জড়তায় পরিপূর্ণ, এ বিষয়ে বোধ হয় সকলেই আমাদের কথায় সায় দিবেন। আর বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতি অনুরাগের আধিক্যবশতঃ আমরা তাঁহাদের জড়ভাগ উপেক্ষা করিলেও, কার্লাইল বোধ হয় তাঁহাদের কবিতায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরই অধিকতর বিকাশ দেখিতে পাইতেন। তাঁহাদের রচনার ভিতর অনেক স্থলে চুম্বন ও পরিরম্ভনের এত ছড়াছড়ি যে, ঘোরতর আধ্যাত্মিকব্যাখ্যাবাদীকেও পরাজয় মানিতে হয়। তবে, প্রাচীন কবির পক্ষে একটা কথা এখানে বলা যাইতে পারে। কার্লাইল যে আধ্যাত্মিকতা ও জীবনসমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন, সে জিনিষটা আদৌ সেকালের নহে। একালেই তাহার বিকাশ। প্রাচীন কবির দল হয় ত তাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে এ বিষয়ে এত দূর নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, ইহার

কাব্যোপযোগী গুরুত্ব আদৌ অনুভব করিতেন না। কার্লাইলের Everlasting Yea বা Everlasting Nay আমাদেরই নিকট অনেক সময় অপূর্ব্ব প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা শুনিলে হয় ত উহাকে 'চবৈতুহি'-বৎ প্রত্যাখ্যান করিতেন।

সুতরাং প্রাচীনের দল কার্লাইলের অনুমোদিত পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ না হইলেও, উহা তাঁহাদের পক্ষে তাদৃশ নিন্দার কথা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এখানে ইন্দ্রিয়পরতার সমর্থন করিতেছি না। ইন্দ্রিয়পরতা, সেকালেরই হউক বা একালেরই হউক, সর্ব্বকালেই সমান নিন্দনীয়। কেহ কেহ ভারতচন্দ্রের সময়কার সমাজ ও সাধারণ মতের আলোচনা করিয়া, কবির অপরাধ তাঁহার পাঠক-বর্গের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ সমালোচনায় কবির গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় না। আমরা বড় জোর একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি,—"আহা, ভারতচন্দ্র যদি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার পঙ্কিল প্রবাহে ভাসিয়া না যাইতেন!" কিন্তু ইহা করুণারই অভিব্যক্তি,—হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত সাধুবাদ নহে।

প্রতিভাশালী পুরুষগণ আপন আপন সময়ের দ্বারা কিয়দংশে নিয়মিত হইলেও চিরদিন উহার অগ্রবর্ত্তী। ব্যক্তিবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠতার সম্বন্ধে সন্দিহান হইবারই কথা। সুতরাং যাঁহারা উপরি-লিখিত যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া আপনাদের উপাস্য কবির জয় ঘোষণা করিতে চান, তাঁহাদের একটু সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাচীনের দল ছাড়িয়া দিয়া, আধুনিক যুগের অগ্রণী, বঙ্গের কাব্যবীর মধুসূদনেও কার্লাইল-প্রোক্ত আধ্যাত্মিকতার কোনও সন্ধান পাই না। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, তাঁহার রচনায় পার্থিবতার বাহুল্য থাকিলেও তিনি তাঁহার মহাকাব্যে কুত্রাপি কুরুচি বা কুনীতির প্রশ্রয় দেন নাই। মেঘনাদবধ-পাঠে কাহারও হৃদয়-মন কলুষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার হস্তে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা-স্বরূপ রাম ও লক্ষ্মণের নির্য্যাতন দেখিয়া আমাদের জাতীয় ভাব সংক্ষোভিত হইলেও, আমরা তাঁহার মেঘনাদের বীরত্বে সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়ি। কিন্তু বঙ্গের প্রিয় কবি তাঁহার বীরাঙ্গনা-নির্ব্বাচনে যে দুই একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরা তাহার কোনও প্রকার মার্জ্জনা দেখিতে পাই না। "বীরাঙ্গনা"-বর্ণিত "তারা" বা "অহল্যার" চরিত্র কবির অনবধানতার ফল বলিয়া ধরিয়া লইলেও, উহারা তাঁহার পবিত্র কাব্যের দুরপনেয় কলঙ্ক। কামুকতার পরিণাম না দেখাইয়া কেবল উহার সাফল্যমাত্র বর্ণনা করিলে কাব্যের উদ্দেশ্য একবারে বিফল হইয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিবর হেমচন্দ্রের হৃদয়ই আধুনিক যুগের এই জীবন-সমস্যার আবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম উদ্বেলিত হইয়া উঠে। হেমচন্দ্রের প্রথম বয়সের "চিন্তাতরঙ্গিণী" হইতে তাঁহার শেষ বয়সের "দশমহাবিদ্যা" পর্য্যন্ত ইহার পরিচয়-স্থল। এতদ্ভিন্ন বহুতর খণ্ডকবিতাতেও ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার "জীবন-মরীচিকা", "গঙ্গার মূর্ত্তি" প্রভৃতি উল্লিখিত হইতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমালোচকগণ যাহাকে "The malady of the age" বলেন, কবির বাঙ্গালী যুবাও সেই পীড়ায় পীড়িত। তরুণ-বয়স্ক কবি তখন এই নবীন ব্যাধির ঔষধনির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার কাব্যের নায়ককে আত্মহত্যা দ্বারা ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "দশমহাবিদ্যার" কবি আত্ম-বিশ্বাসানুসারে এই ঠোর সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি আশ্বাস দিতেছেন—

"না হও নিরাশ, ওরে ভক্তিমান!
মোচন আছে রে আপদের।"

পরন্তু—

"জীব-জন্মে ভয় কি রে? জগদম্বা জননী!

জীবজন্ম অশেষ দুঃখের নিদান, সন্দেহ নাই। কিন্তু এক দিন সে অশেষ দুঃখেরও অবসান হইবে। যত দিন তাহা না হয়, এস, আমরা জীবন-মরণের অধিষ্ঠাত্রী সেই জীব-জননীর উপর নির্ভর করিয়া স্বধর্ম্ম-সাধনে নিরত হই। জীবন-সমস্যার এই মীমাংসা যে অতি সহজ ও সরল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস যে, "দশমহাবিদ্যা"-পাঠে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী-যুবক উদ্বেল চিন্তা-সমুদ্রের কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ জন্য আমরা কবিকে আন্তরিক প্রশংসাবাদ করিতেছি। আশা করি, তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে বিলুপ্ত হইলেও, একমাত্র "দশমহাবিদ্যা" তাঁহাকে চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে অমর করিয়া রাখিবে।

হেমচন্দ্রের পর বাঙ্গালা-সাহিত্যের কবি, নবীনচন্দ্র। ইনি প্রথম জীবনে যৌবন-বৃত্তি লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ইঁহার লেখনীমুখে যৌবন ও ভোগের কথা ছাড়া আর কোনও কথাই বড় একটা শুনা যাইত না। তৎপরে ইনি "পলাশীর যুদ্ধ" ও "রঙ্গমতী" কাব্যে দেশের দুর্দ্দশায় কাঁদিয়া বীণাপাণির

চরণে পূর্ব্বকৃত অপরাধভঞ্জনের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি ইহার লেখনীর গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের বরাবর এই আশা ছিল যে, নবীন বাবুর নবীন কাব্যত্রয়ে মানবের জীবন-গত বিবিধ সমস্যার এক সুসঙ্গত ও সমীচীন মীমাংসা দেখিতে পাইব। কিন্তু কবি ইহাদের ভিতর, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, বিশ্বাস ও যুক্তিমূলক এত বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাহাদের একটা সুশৃঙ্খল সমন্বয় করিতে পারা যায় না। আমরা কথাটা কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। পাঠকবর্গ যদি ইহার প্রমাণ দেখিতে চান, তবে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করিবেন। পণ্ডিতবরের সহিত সর্ব্বাংশে একমত হইতে না পারিলেও, আমরা তাঁহার পুস্তকখানি আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি। মূল গ্রন্থত্রয়ের আলোচনা করিয়া এবং পাঁড়ে মহাশয়ের সমালোচনা দেখিয়া, নবীন বাবুর শেষ বয়সের সাহিত্য-সন্তানগুলি যে কোনও কালে লোকানুরাগ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, কবির "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র", বা "প্রভাস" বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত না হইলেও, এবং বাঙ্গালী পাঠকেরা চিরদিন তাঁহাকে কেবলমাত্র "পলাশীর যুদ্ধের" কবি বলিয়া পরিচিত করিলেও, কবির আক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই। তিনি এই গ্রন্থত্রয়ে কৃষ্ণনাম করিবার যে অজস্র অবসর পাইয়াছেন, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথ ই বাঙ্গালার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবি। কারণ, মকদ্দমার সময় অর্থসামর্থ্য থাকিলে উকীল হেম বাবুকে এখনও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাব্যরসের পিপাসা হইলে তন্নিবারণার্থ কবি হেমচন্দ্রের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে কবি বিহারীলাল যে নূতন সুর প্রবর্ত্তিত করেন, রবীন্দ্র বাবু তাহাকেই বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। শিষ্যের বিশালতা অবশ্য গুরুতে [illegible]ল না। কিন্তু এই বিশালতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলীতে কাল[illegible]-উল্লিখিত জীবন-রহস্য বা Gospel-tidings এর কথা বড় বেশী শুনা যায় [illegible]। তাঁহার সুকুমার লেখনী স্ত্রীপুরুষপ্রেমের বিলাসলালসাময় বিবিধ চি[illegible]ঙ্কনের যেরূপ উপযোগী, অপর কোনও বিষয়ের বর্ণনায় সেরূপ নহে। আমরা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার করিতেছি না। তাঁহার পার্থিব তা যে আধ্যাত্মিকতাকে

পরাজিত করিয়াছে, কেবল সেই কথাই বলিতেছি। এখানে তিনি নিজেই নিজের নিকট পরাজিত। নতুবা, অনেক সুকবি যে বিষয়ের সান্নিধ্যে পৃথিবী ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তিনি সেখানেও আধ্যাত্মিকতার অতলতলে প্রবেশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরাজ কবি বায়রণের সমুদ্র-সম্বোধনের সহিত আমাদের কবির "সমুদ্রের প্রতি" শীর্ষক কবিতার তুলনা করা যাইতে পারে। কাহারও মনে ক্লেশ-উৎপাদনের ভয়ে দেশীয় দৃষ্টান্ত দিলাম না; নহিলে তাহারও অভাব নাই।

আমরা নিম্নে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অস্থিরতার বর্ণনা একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ ও পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস,
নাহি জানে কি যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে।"

এ বর্ণন বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। "The malady of the age". এর এরূপ জীবন্ত ছবি অন্যত্র দুর্ল্লভ। কেবল, "এ পাশ ও পাশ" এই দুইটা ছন্দোহীন কথায় কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ হইয়াছে, স্বীকার করি।

হেমচন্দ্রের ন্যায় তত দূর আশান্বিত না হউন, রবীন্দ্রনাথ একবারে নিরাশ্বাস নহেন। রবীন্দ্রনাথ "আরও কোথা? আরও কত দূর?" অথবা "হয় ত ঘুচিবে দুঃখ-নিশা" এইরূপ প্রশ্নাত্মক বা সন্দেহাত্মক বাক্যে উপসংহার করেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে প্রসারিত-করে আমাদের উদ্বেলিত হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার সাহস হয় না। তা' না হউক, তাঁহারও গভীর অভয়-বাণী বড় অল্প উৎসাহপ্রদ নহে,—

"জীবন-কণ্টক-পথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিয়লস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে। তার পরে দীর্ঘপথ-শেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্ত পদে রক্ত-সিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে

দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্ন বদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্ত-কণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্ম-পরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখগ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।"

যিনি এরূপ আশার কথা শুনাইতে পারেন, তিনি যে চির-নিগৃহীত বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বায়ুর অল্পতা।

আধুনিক সভ্যতার উন্নতি এবং লোক-সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত জীবনী-শক্তিপোষক প্রাকৃতিক ভাণ্ডার ক্রমেই শূন্য হইয়া যাইতেছে। ভূগর্ভস্থ কয়লার আজকাল যে প্রকার অসম্ভব ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে অপর ব্যবস্থা না হইলে, সম্ভবতঃ ইন্ধনাভাবে অনেক কল-কারখানার কার্য্য অদূর ভবিষ্যতেই স্থগিত রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে অধিক চিন্তার বিষয় কিছুই নাই,—সর্ব্বশক্তির আধারভূত মহিমাময় সূর্য্য শক্তিহীন না হইলে, মানব-বুদ্ধিপ্রভাবে সূর্য্যের নানা শক্তি, অনায়াসেই কয়লার অভাব পূরণ করিতে পারিবে। অধুনা সুবিজ্ঞ বিজ্ঞান্‌বিদ্‌গণ বলিতেছেন, আজকাল বায়ুর যে প্রকার অপব্যবহার হইতেছে, তাহাতে সম্ভবতঃ দূর ভবিষ্যতে, স্বাস্থ্যকর বায়ুর অভাবে, পৃথিবী জীবশূন্য হইবে। জগতে বায়ুর ভাণ্ডার ক্ষয়শীল,—এই জন্য এই ভয়ানক প্রশ্নটি সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রমুখ আচার্য্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

বায়ুর প্রধান উপাদান অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্পই জীবগণের প্রাণ-স্বরূপ। প্রাণিগণ শ্বাসগ্রহণকালে, অক্সিজেন্ বাষ্প শরীরস্থ করিয়া জীবনধারণ করে, এবং প্রশ্বাস কার্য্য দ্বারা কার্‌বণিক আসিড্ নামক এক বিষাক্ত বাষ্প আকাশস্থ বায়ুতে পরিত্যাগ করে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও, ঠিক্ এই প্রকার কার্য্য হয়;—অগ্নিসংস্পর্শে বায়ু বিশ্লিষ্ট হইয়া তাহার প্রধান উপাদান অম্লজান বহ্নিভোজ্য হইয়া পড়ে,—এবং প্রাণ-বায়ুর পরিবর্ত্তে, অগ্নি উক্ত কার্ব্বণিক এসিড বাষ্প উদ্গিরণ করে। অক্সিজেনের এই অবিরাম ক্ষয়পূরণের উপায়

আছে,—নচেৎ অল্পকাল মধ্যে জগৎ প্রাণিশূন্য হইত। অতীব ক্ষুদ্র তৃণ হইতে, বিশাল বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ উদ্ভিদ নিয়তই এই ক্ষয়পূরণ করিতেছে। উদ্ভিদগণ তাহাদের শ্বাসযন্ত্র দ্বারা জীবপ্রশ্বাসজাত সেই বিষাক্ত বাষ্প গ্রহণ করে, এবং তাহা হইতে দেহপোষক অঙ্গার নামক পদার্থ শরীরস্থ করিয়া, নির্ম্মল অক্সিজেন বাষ্প প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে। এই প্রথায় বায়ুর নির্ম্মলতা রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিতগণ বলিতেছেন,—উদ্ভিদের এই ক্ষয়-পূরণশক্তির একটা সীমা আছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত ধরাপৃষ্ঠস্থ নানা স্থানের বৃহৎ অরণ্য সকল যেরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে যে সেই শক্তি ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে,—তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। পক্ষান্তরে, লোকবৃদ্ধি ও কলকারখানার উপদ্রবে, ক্ষয়সীমা ক্রমিক বিস্তার লাভ করিতেছে। এই জন্যই পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, দূর ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর বায়ুর অভাবে বর্ত্তমান সৃষ্টির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রশ্নটি লইয়া, অনেকদিন অবধি বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সম্প্রতি লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সমবেত হইয়া, পৃথিবীর সমগ্র জীব দ্বারা অম্লজান বাষ্পের কত ক্ষয় হইতেছে, তাহার একটা স্থূল হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। স্থূলতঃ পৃথিবীতে ১৪৪ কোটি লোকের বাস। প্রত্যেক ব্যক্তি শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা অহোরাত্রে প্রায় দেড় পাউণ্ড অম্লজান বাষ্প নষ্ট করে। এই অনুপাতে প্রতিবৎসর কেবল মানবজাতি দ্বারা ৪০ কোটি টন্ অক্সিজেন নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীতে প্রায় ১০৪ কোটি গবাদি প্রাণী বর্ত্তমান; ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্যে, মনুষ্যব্যয়িত অম্লজান অপেক্ষা অনেক অধিক বাষ্পের ক্ষয় হয়। এই হিসাবে প্রতি বৎসর সার্দ্ধ সাতষট্টি কোটি টন্ অম্লজান নষ্ট হইতেছে। কলকারখানার অগ্নি দ্বারা কত অম্লজানের ক্ষয় হয়, তাহারও গণনা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তিন টন্ পরিমিত পাথুরিয়া কয়লা দগ্ধ করিতে প্রায় আট টন্ অম্লজানের আবশ্যকতা হয়; সমগ্র জগতে প্রতিবৎসর প্রায় ২৫০ কোটি টন্ কয়লা বা অপর ইন্ধন দগ্ধ হইয়া থাকে,—এই অনুপাতে প্রতিবৎসর অক্সিজেনের সমবেত ক্ষয় প্রায় ৯২৩ কোটি টন্ হইয়া পড়ে। অরণ্যাদি ধ্বংস করায়, অম্লজান-উৎপত্তির যে বাধা হইতেছে, তাহা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু তাহার একটা স্থূল ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলেন, বায়ুর এই ক্রমিক অল্পতা বৃদ্ধি পাইলে, শীঘ্রই ইহার কুফল ফলিবে—অন্যথা অগ্নিপ্রজ্বলন ও অরণ্যাদিধ্বংস নিবারিত না হইলে আর রক্ষা নাই।

যমজকৌতুক।

কোন কোন রমণীর গর্ভে এককালে দুইটি শিশুর জন্ম হয়। কখন কখন দুইটিই পুত্র বা কন্যা হয়; কখন একটি পুত্র এবং অন্যটি কন্যা হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে যমজসন্তানোৎপত্তির কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়িত-রূপে নির্ণীত হয় নাই। আমাদের বঙ্গান্তঃপুরের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবাদ এই যে, সতী-দাহে স্ত্রীপুরুষ একত্র ভস্মীভূত হইয়া জন্মান্তরে একত্রই মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। এ যুক্তির খণ্ডন কিম্বা ইহার প্রতিবাদ করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নাই; এবং অন্য দেশের রমণী-সমাজে এরূপ কোন অমোঘ যুক্তি আছে কি না, তাহাও আমাদের অবিদিত।

যমজের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কোন বিলাতী লেখকের রচনা হইতে যমজ-সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কৌতুকজনক তথ্য সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রকাশ করিতেছি।

যমজ সন্তানদ্বয়ের (তা পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক) স্বাস্থ্য এবং মনোভাব প্রায়ই অভিন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায়, এক জনের যে রোগ হয়, শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে, অন্যটিও তাহাতে আক্রান্ত হয়; এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ইংলণ্ডের কোন পল্লীতে একবার দুইটি যমজের জন্ম হয়। তন্মধ্যে একটি তাহার পিতার সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; কিছু দিন পরে হাম-জ্বর হইয়া সে তিন সপ্তাহকাল শয্যাগত থাকে। তাহার যে ভাই ইংলণ্ডে ছিল, অল্প-কাল পরে তাহারও হাম-জ্বর দেখা দিল। যাহা হউক, পরে এই রোগ হইতে উভয়েই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

কয়েক মাস পরে ইংলণ্ডবাসী ভ্রাতাটি মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হইল। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে তাহার অভিভাবক সংবাদ পাইলেন যে, তাহার ভারত-প্রবাসী ভ্রাতারও ঠিক সেই প্রকৃতির মস্তিষ্ক-বিকার হইয়াছে। এই উভয় ভ্রাতার স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না; সাত বৎসর পরে অভিন্ন রোগে এক দিনেই উভয়ের মৃত্যু হয়।

লেখক বলেন, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যমজ-সন্তানদ্বয়ের উভয়েই সমরোগে আক্রান্ত হইলে, হয় ত তাহা কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের পৈতৃক

রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু যমজ না হইলে সন্তানগণের অন্ততঃ এক জনেরও তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করা অসম্ভব নহে।

লেখক আর দুইটি যমজের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা ভাই বোন। পরস্পরের প্রতি তাহাদের অসাধারণ স্নেহ ছিল, তাহারা উভয়ে যেন এক দেহের বিভিন্ন অংশ, একজনের যে কোন পীড়া হউক, এমন কি মাথাটি পর্য্যন্ত ধরিলে অন্যে নিজের দেহে তাহা অনুভব করিতে পারিত। উভয়ে এক স্থানে বাস করিলেও অন্ততঃ মনে করা যাইত যে, সহানুভূতিবশে এক জন স্ব-শরীরে অন্যের অসুখ অনুভব করে। কিন্তু বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইত না, এবং তাহারা শতাধিক মাইল ব্যবধানে বাস করিত; তাহাদের মধ্যে যে চিঠিপত্র চলিত, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত, উভয়ের শরীর এক সময়েই সুস্থ বা অসুস্থ থাকিত। এবং এক-জন অন্যকে প্রায়ই লিখিত, "আজ বোধ করি তোমার শরীর ভাল নাই।" "আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখন আমাকে পত্র লিখিতেছ।"

ভাই লণ্ডনে থাকিত, আর ভগিনীটি কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে বাস করিত। একদিন অপরাহ্ণে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় ভাই একখানি গাড়ী হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আঘাত এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে, কোন সন্নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে তাহাকে কয়েক দিন শয্যাগত থাকিতে হয়। ইতি-মধ্যে তাহার বাসার ঠিকানায় তাহার ভগিনীর নিকট হইতে একখানি পত্র আসে, পত্রখানি সেই দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা লেখা। অন্যান্য কথার পর সে ভাইকে লিখিয়াছে, "জস্, তুমি কি বাতের কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছ? আজ বিকাল হইতে আমার বামপদে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, এ বেদনার কোন কারণ অনুমান করিতে পারিতেছি না, ইহা বাত নয় ত?" অবশেষে এই বালিকার পদের বেদনা এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাকে অগত্যা শয্যাবলম্বন করিতে হইল; ভ্রাতার অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেও সে এই আকস্মিক বেদনার জন্য তাহাকে দেখিতে লণ্ডনে আসিতে পারে নাই। যাহা হউক, বালিকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভ্রাতার আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া নিজের পদের বেদনার কারণ বুঝিতে পারিল; কয়েক দিন পরে উভয়ের বেদ-নাই আরোগ্য হইয়াছিল।

কিন্তু এই যমজদ্বয়ের জীবনের একটি ঘটনা অতীব বিস্ময়জনক। কিছু-কাল পরে ট্রান্সভালে ভাইটির মৃত্যু হয়। তখন সকলেই মনে করিল, শীঘ্র হউক

যমজকৌতুক।

কোন কোন রমণীর গর্ভে এককালে দুইটি শিশুর জন্ম হয়। কখন কখন দুইটিই পুত্র বা কন্যা হয়; কখন একটি পুত্র এবং অন্যটি কন্যা হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে যমজসন্তানোৎপত্তির কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়িত-রূপে নির্ণীত হয় নাই। আমাদের বঙ্গান্তঃপুরের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবাদ এই যে, সতী-দাহে স্ত্রীপুরুষ একত্র ভস্মীভূত হইয়া জন্মান্তরে একত্রই মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। এ যুক্তির খণ্ডন কিম্বা ইহার প্রতিবাদ করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নাই; এবং অন্য দেশের রমণী-সমাজে এরূপ কোন অমোঘ যুক্তি আছে কি না, তাহাও আমাদের অবিদিত।

যমজের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কোন বিলাতী লেখকের রচনা হইতে যমজ-সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কৌতুকজনক তথ্য সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রকাশ করিতেছি।

যমজ সন্তানদ্বয়ের (তা পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক) স্বাস্থ্য এবং মনোভাব প্রায়ই অভিন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায়, এক জনের যে রোগ হয়, শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে, অন্যটিও তাহাতে আক্রান্ত হয়; এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ইংলণ্ডের কোন পল্লীতে একবার দুইটি যমজের জন্ম হয়। তন্মধ্যে একটি তাহার পিতার সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; কিছু দিন পরে হাম-জ্বর হইয়া সে তিন সপ্তাহকাল শয্যাগত থাকে। তাহার যে ভাই ইংলণ্ডে ছিল, অল্প-কাল পরে তাহারও হাম-জ্বর দেখা দিল। যাহা হউক, পরে এই রোগ হইতে উভয়েই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

কয়েক মাস পরে ইংলণ্ডবাসী ভ্রাতাটি মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হইল। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে তাহার অভিভাবক সংবাদ পাইলেন যে, তাহার ভারত-প্রবাসী ভ্রাতারও ঠিক সেই প্রকৃতির মস্তিষ্ক-বিকার হইয়াছে। এই উভয় ভ্রাতার স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না; সাত বৎসর পরে অভিন্ন রোগে এক দিনেই উভয়ের মৃত্যু হয়।

লেখক বলেন, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যমজ-সন্তানদ্বয়ের উভয়েই সমরোগে আক্রান্ত হইলে, হয় ত তাহা কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের পৈতৃক

রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু যমজ না হইলে সন্তানগণের অন্ততঃ এক জনেরও তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করা অসম্ভব নহে।

লেখক আর দুইটি যমজের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা ভাই বোন। পরস্পরের প্রতি তাহাদের অসাধারণ স্নেহ ছিল, তাহারা উভয়ে যেন এক দেহের বিভিন্ন অংশ, একজনের যে কোন পীড়া হউক, এমন কি মাথাটি পর্য্যন্ত ধরিলে অন্যে নিজের দেহে তাহা অনুভব করিতে পারিত। উভয়ে এক স্থানে বাস করিলেও অন্ততঃ মনে করা যাইত যে, সহানুভূতিবশে এক জন স্ব-শরীরে অন্যের অসুখ অনুভব করে। কিন্তু বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইত না, এবং তাহারা শতাধিক মাইল ব্যবধানে বাস করিত; তাহাদের মধ্যে যে চিঠিপত্র চলিত, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত, উভয়ের শরীর এক সময়েই সুস্থ বা অসুস্থ থাকিত। এবং এক-জন অন্যকে প্রায়ই লিখিত, "আজ বোধ করি তোমার শরীর ভাল নাই।" "আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখন আমাকে পত্র লিখিতেছ।"

ভাই লণ্ডনে থাকিত, আর ভগিনীটি কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে বাস করিত। একদিন অপরাহ্ণে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় ভাই একখানি গাড়ী হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আঘাত এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে, কোন সন্নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে তাহাকে কয়েক দিন শয্যাগত থাকিতে হয়। ইতি-মধ্যে তাহার বাসার ঠিকানায় তাহার ভগিনীর নিকট হইতে একখানি পত্র আসে, পত্রখানি সেই দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা লেখা। অন্যান্য কথার পর সে ভাইকে লিখিয়াছে, "জস্, তুমি কি বাতের কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছ? আজ বিকাল হইতে আমার বামপদে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, এ বেদনার কোন কারণ অনুমান করিতে পারিতেছি না, ইহা বাত নয় ত?" অবশেষে এই বালিকার পদের বেদনা এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাকে অগত্যা শয্যাবলম্বন করিতে হইল; ভ্রাতার অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেও সে এই আকস্মিক বেদনার জন্য তাহাকে দেখিতে লণ্ডনে আসিতে পারে নাই। যাহা হউক, বালিকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভ্রাতার আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া নিজের পদের বেদনার কারণ বুঝিতে পারিল; কয়েক দিন পরে উভয়ের বেদ-নাই আরোগ্য হইয়াছিল।

কিন্তু এই যমজদ্বয়ের জীবনের একটি ঘটনা অতীব বিস্ময়জনক। কিছু-কাল পরে ট্রান্সভালে ভাইটির মৃত্যু হয়। তখন সকলেই মনে করিল, শীঘ্র হউক

বিলম্বে হউক, তাহার ভগিনীও নিশ্চয় মারা পড়িবে। এরূপ ভাবিবার কারণও ছিল। ভ্রাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বালিকার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গেল; এমন কি, তাহার উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। কিন্তু বালিকার মৃত্যু হইল না, সে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিল, অবশেষে খুব হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস, ভ্রাতা মৃত্যুর পর তাহার রোগপ্রবণতা ও দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিয়া নিজের স্বাস্থ্য এবং বলটুকু দান করিয়া গিয়াছে।

যমজদ্বয়ের আকারের অভিন্নতা চিরপ্রসিদ্ধ। পুত্র ও কন্যা হইলে মুখাবয়বের সৌসাদৃশ্যই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু উভয়ে যদি পুত্র বা কন্যা হয়, তাহা হইলে তাহাদের আকারগত পার্থক্যের প্রভেদ করা অনেক সময়েই দুরূহ হইয়া উঠে।

দুইটি যমজ আকারে এরূপ অভিন্ন ছিল যে, তাহাদের পিতামাতারও গোলমাল বাধিত। তাহাদের স্বরূপনির্ণয়ে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, এ জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র আকার বা বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করান হইত। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইত, এক জন অপর অপেক্ষা আধ ইঞ্চি লম্বা এবং অতি সামান্য কালো। কিন্তু এই পার্থক্য সহসা কাহারও নজরে পড়িত না, তাই তাহারা দু' ভাই পরস্পরের পরিচ্ছদ পরির্ত্তনপূর্ব্বক সময়ে সময়ে কৌতুক করিত। অন্য লোক দূরের কথা, ইহাতে তাহাদের আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং পিতামাতা পর্য্যন্ত প্রতারিত হইত।

একবার দেড় মাসের জন্য ইহাদের এক জন ম্যাঞ্চেষ্টারে এবং অন্যটি লিড্‌সে স্থানান্তরিত হয়। একদিন এক জন স্থানীয় রেলওয়ে-ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়া দ্বারদেশে সম্মুখেই তাহার যমজ ভ্রাতাকে দেখিতে পায়; এই দ্বিতীয় ব্যক্তির তখন সেখানে উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং দ্বারভ্রমে হয় ত কোন বৃহৎ আয়নার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তাহারা উভয়েই যুগপৎ পশ্চাতে হটিয়া যায়!

এই ভ্রাতৃদ্বয় একবার আর এক কীর্ত্তি করিয়াছিল। তাহারা দু জনেই স্বতন্ত্র আফিসে কেরাণীগিরি করিত। এক দিন কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা পরস্পর অদল বদল করিয়া আফিসে গেল; প্রথমে কেহই তাহাদের এই ছলনা ধরিতে পারে নাই, কিন্তু দু জনের হস্তাক্ষর অভিন্ন না হওয়ায়, বিশেষতঃ এক জনের অভ্যস্ত কর্ম্মে অন্যের পারদর্শিতা না থাকায়, অবশেষে তাহারা ধরা পড়িয়া গেল। এই দুইটি প্রতিবন্ধক না থাকিলে, তাহাদের

আফিসের অধ্যক্ষ কিংবা কর্ম্মচারিগণ কখন এই রহস্যের ভেদ করিতে পারিত না।

আর একবার দুই যমজ ভগিনী লইয়া বড় গোল হইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে অকৃতিগত এতই সাদৃশ্য ছিল যে, তাহাদের গর্ভধারিণী পর্য্যন্ত তাহাদের লইয়া ভয়ানক ভুল করিয়া বসিয়াছিল। এই ভ্রমও অল্প রহস্যজনক নহে।

অতি শৈশবাবস্থায় যখন তাহারা কথা কহিতে পারিত না, সেই সময়ে তাহাদের মা তাহাদিগকে ঘরে শয়ন করাইয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছিল। মা ফিরিয়া আসিয়া দেখে, শয্যা হইতে কে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র চুরী করিয়া লইয়াছে; দেখিয়া সে চোরের সন্ধানে ছুটিল, এ দিকে মেয়ে দুটি উঠিয়া বসিয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। তখন কাহারও দেহে বস্ত্র ছিল না, উভয়ের মূর্ত্তি অভিন্ন, সুতরাং মা ফিরিয়া আসিয়া দু জনের মধ্যে কোন্‌টি কে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু এত দিনও এ ভ্রম নিরাকৃত হয় নাই।

কিন্তু এখানেই এই 'ভ্রান্তিবিলাসের' শেষ নহে। মনে করুন, এই বালিকাদ্বয়ের একটি নাম 'এলিস'। এলিসকে তাহার কোন আত্মীয় বড় ভালবাসিতেন; কয়েক বৎসর হইল, অষ্ট্রেলিয়ার প্রবাসে এই আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে; মৃত্যুকালে তিনি এলিসের জন্য কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, এ সম্পত্তি কাহার হস্তগত হইবে? যদি উভয়েই আমি 'এলিস' বলিয়া আদালতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তরাধিকারী কে, তাহা নির্ণয় করিতে হাকিমের চক্ষুঃ স্থির হইয়া যাইবে, এবং কোন উকীল ব্যারিষ্টারের কূটতর্কে তাঁহার কিছুমাত্র সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সেকালের কাজীর বিচারেও এ রহস্যের নির্ণয় হওয়া কঠিন। লেখক বলেন, এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া একখানি উৎকৃষ্ট হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের অবতারণা হইতে পারে।

শিশু।

[স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগ-রচিত।]

হৃদয়ে পাষাণ-রাশি সরাইয়া সুকোমল করে,
কে তুই নিঝর-ধারা ঢেলে দিলি হৃদয়-কন্দরে ;
অন্ধকার জীবনের সরাইয়া গাঢ় তমোরাশি,
ঊষার আলোক প্রাণে কে তুই রে জাগাইলি আসি ?
স্নেহ-করে জড়াইয়া, স্নেহ-সুধা করাইয়া পান,
কে তুই বিশ্বের প্রাণে খুলে দিলি এ নিরুদ্ধ প্রাণ ?
চাহি নি সংসার পানে, নিদারুণ বিতৃষ্ণা তাহায়,
তুই আধ "মা মা" বলে সংসারেতে বাঁধিলি আমায় !
কি দিয়ে, কি হাসি দিয়ে হাসালি এ বিশুষ্ক জীবন,
কি বলে বাঁধিলি তুই এ আমার উদাসীন মন ?
ওই ক্ষুদ্র মুখে তোর স্বরগের চারু ছবিখানি,
প্রশস্ত ললাট ওই প্রতিভার খনি অনুমানি।
মরি কি চাহনি চারু, চারু মুখে সোহাগের হাসি,
নবনীত কচি তনু কে বলিবে কেন ভালবাসি ?
কবে কোন্ শুভক্ষণে দুখময় হতাশ জীবনে,
ফুটিলি নক্ষত্র তুই হৃদয়ের আঁধার গগনে !
শীতের দারুণ নিশি পোহাইল কিসে কোন্ দিন,
নিবিড় কুয়াসা তার আলোকেতে হয়ে গেল লীন।
পাখী-কলরবে করি পরিপূর্ণ অবনী অম্বর,
প্রভাত-আলোক নিয়ে তুই এলি উজলিতে ঘর।
থাক তবে থাক শিশু এ আঁধার বুক উজলিয়া,
ওই মুখ পানে চেয়ে এ সংসার দেখিব চাহিয়া ;
ওই মুখ পানে চেয়ে বিলাইব স্নেহ ভালবাসা,
হৃদয়ে ফুটিবে পুন নির্ব্বাপিত কত সুখ আশা।
ও নিঃস্বার্থ স্নেহনীরে ভাসাইয়া এ হৃদয় মন,
ওই চারু মূর্ত্তিখানি বুকে লয়ে যাপিব জীবন।

মহারাষ্ট্রে সাহিত্য।

শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্ত ;—বংশ-পত্রিকা-সমালোচন।

হারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপক ছত্রপতি শ্রীশিবাজী মহারাজ যে ভোঁস্‌লে বংশে অবতীর্ণ হইয়া-লেন, সেই ভোঁস্‌লে বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয় বখর-লেখকগণ, মুসল-ন তওয়ারিখ-রচয়িতৃগণ ও ইংরাজ ইতিহাস-সংকলয়িতৃগণ যাহা লিখিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত ানও মহারাষ্ট্রীয় লেখক তৎসমুহের সমন্বয় পূর্ব্বক ঐতিহাসিক মীমাংসা করিবার জন্য বান্ হন নাই। এই কারণে, বর্ত্তমান প্রস্তাবলেখক বঙ্গদেশের ন্যায় দূরদেশে থাকিয়া, ক্ত মহারাষ্ট্ররাজবংশের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ ইয়াছেন, তদবলম্বনে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দুইটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিচারের জন্য মহারাষ্ট্রীয় ঠকসমাজের সমক্ষে স্থাপিত করেন। ঐ প্রবন্ধদ্বয় পুণা হইতে প্রক ত "ভারতবর্ষ" মক ঐতিহাসিক মাসিকপত্রের ৪র্থ ও ৫ম (মাঘ ও ফাল্গুনের) প্রকাশিত । তৎপাঠে উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েক জন মহারাষ্ট্রীয় লেখক ভোঁস্‌লে বিবরণ ন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হন। প্রথমতঃ, উক্ত পত্রের সু হৃদ্বর ক্ত দত্তাত্রয় বলবন্ত পারসনীস মহাশয় ও তৎপরে "কৃ, বি, ওকর"- থাক্ষরকারী কোনও লেখক, ঐ পত্রে সমালোচ্য বিষয় স ওপর তত্ত্ব প্রকাশ রন। আমরা এ স্থলে যথাক্রমে ঐ সকল আলোচনার মর্ম্ম ত করিতেছি।

"ভোঁস্‌লে বংশের আদি পুরুষ কে ?" এ সম্বন্ধে 'কাল ক তিহাস-সংগ্রহ' নামক মাসিক-ত্রর অন্যতম সম্পাদক ৺জনার্দ্দন বালাজী যে বংশপত্রিকার সংগ্রহ ও প্রকাশ রয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে,—"ভোঁ শর আদিপুরুষ শিবরাও চিতোড়কর চিতোড়ের পূর্ব্বনিবাসী) উদয়পুরে তন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল,—১ম রাও, ২য় উদয়সিংহ, ৩য় ভীমসিংহ । বাদশাহের মেওয়াড় (মিবার) আক্রমণ-লে রামরাও ও উদয়সিংহ যুদ্ধে ন। তৃতীয় ভীমসিংহ তত্রত্য রাজা উদয়-হকে ভোঁস্ নামক দুর্গে লইয়া যান। এই কারণে তাঁহার 'ভোঁস্‌লে' এই উপাধি ত হয়।

"ভীমসিংহের (ভোঁস্‌লের) বংশে যাঁ হারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নাম-মালিকা —(১ম শিবরাও, ২য় ভীমসিংহ) ৩য় । বিজয়ভানু, ৪র্থ খেলকর্ণ, ৫ম জয়কর্ণ, ৬ষ্ঠ মহাকর্ণ, রাজা শিব, ৮ম বাবাজী ভোঁস্‌লে, ম মালোজী ভোঁস্‌লে, ১০ম রাজা শাহাজী, ১১শ পতি শিবাজী—শকস্থাপনকর্ত্তা।"

এই বংশতালিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভোঁস্‌লে বংশের আদিপুরুষ উদয়পুরে কারতেন। তাঁহাকে "চিতোড়- কর" বলায়, "পূর্ব্বে চিতোড়ে তাঁহার বসতি ছিল," এই তত্ত্ব সূচিত হইতেছে। যুদ্ধকে যে তিনি রাণা উদয়সিংহকে ভোঁস্ দুর্গে আশ্রয়গ্রহণে াহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে ও তিনি রাণার বিশ্বস্ত সহচর বা অনুচরবর্গের অন্যতম ন বলিয়া বোধ হয়। ইহার অধিক তৎসম্বন্ধে আর কোনও বৃত্তান্ত এই বংশপত্রিকা ত জ্ঞাত হওয়া যায় না।

এই বংশপত্রিকাখানি ৺মোড়ক মহোদয় কর্ত্তৃক "কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ" পত্রে প্রকাশিত ও দুই একজন প্রথিতনামা মহারাষ্ট্রীয় লেখক কর্ত্তৃক স্বগ্রন্থে উদ্ধৃত হওয়ায়, জনসাধারণের নিকট ইহার যোগ্যতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং সেই কারণেই বোধ হয়, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর প্রণীত শিবাজীর জীবনীতেও উহা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা এই বংশপত্রিকাটিকে অবিশ্বাসার্হ ও কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ, (১ম) এই বংশতালিকাখানি অতি আধুনিক—খৃঃ ১৮৩৬ অব্দে অর্থাৎ গ্রাণ্ট্ ডফ্ প্রণীত History of the Marathas প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পরে রচিত। (২য়) ইহার রচয়িতার নাম ও তাঁহার লিখিত বিবরণের ঐতিহাসিক আধার (Authority) সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। (৩য়) সাতারার রাজকীয় দপ্তরে শিবাজীর বংশধরের নিকট এ সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন ও অতিবিশ্বসনীয় কাগজপত্র সযত্নে রক্ষিত আছে, তদবলম্বনে সাতারার মহারাজের সুপ্রসিদ্ধ চিটনবীস ৺মহ্লার রামরাও চিটনীস, ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে যে শিবাজীর বখর রচনা করিয়াছেন, তাহার লিখিত বংশতালিকার সহিত সমালোচ্য তালিকার ঐকমত্য নাই। (৪র্থ) যে মেওয়াড় (মিবার) প্রদেশ হইতে শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষেরা দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন, সেই মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তি প্র[illegible] বিষয়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহারও সহিত ইহার বহু বিরোধ [illegible]। (৫ম) মহারাজ শিবাজীর পিতামহ মালোজী ভোঁসলে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে [illegible]বন, এ কথা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। মোগল সম্রাট আকবর সাহ ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] ও ধ্বংস করেন, ইহাও সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং আকবরের চি[illegible]ণকালে মালোজীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল। কিন্তু সমালোচ্য বংশপত্রিকার লেখক মালোজীর ৮ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী শিবরাও আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন! আকবর কর্ত্তৃক চিতোড়-বিধ্বংসের পর উদয়পুর স্থাপিত হয়। শিবরাও উদয়পুরবাসী বলায়, মালোজীর ও তাঁহার সমকালীনত্ব সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে! এই সকল কারণে উদ্ধৃত বংশপত্রিকার প্র[illegible] করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

কোনও কোনও বখরে নেপালের [illegible]ংহের সহিত ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষের সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। ঐ আখ্যায়িকা [illegible]ন্তকিম্বদন্তী ভিন্ন কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। বন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর টড্-প্রণীত রাজস্থানের অংশবিশেষ পাঠে অবগত হইলাম আখ্যায়িকা নিতান্ত ভিত্তিশূন্য নহে। তদনুসারে নেপাল রাজবংশ ও মহারাষ্ট্র রাজবংশ একই মূল পুরুষ হইতে উৎপন্ন—উভয় একই রাজবংশের ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থাপিত দুইটি শাখা মাত্র। এ কথা স্বীকার করিলে উক্ত আখ্যায়িকা হইতে শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষদিগের বিবরণ সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না। এ কারণে তাহার আলোচনায় লেখনীক্ষয় না করিয়া, সাতারার রাজকীয় দপ্তর হইতে প্রাপ্ত বিবরণের সত্যাসত্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

সাতারার রাজকীয় দপ্তরে শিবাজীর সময়ের অনেক আসল কাগজপত্র এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। সেই সকল কাগজপত্রের সাহায্যে শিবাজীর দুইখানি বখর রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যেখানি মহ্লার রামরাও চিটনীস কর্ত্তৃক সাতারার [illegible]জের আদেশে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সেইখানি অতীব বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত [illegible]কে। এই বখর সম্বন্ধে গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব লিখিয়াছেন;—এই বখর Comp[illegible] ginal memoranda, and oth[illegible] nals or Copeis of many aut[illegible] itten or transcribed by (Mulhar Rao's) ancestors ns highly distinguished

he courts of Raigurh, Ginjee and Satara, and Shivaji's instructions to Officers and departments are very complete and satisfactory." দ্বিতীয় বখরখানি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৺বিষ্ণু গোপাল ভিড়ে চিটনীস কর্ত্তৃক "সাতারার দপ্তরের বিশ্বস্ত বিবরণ অবলম্বনে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কাগজ-পত্রাদির সাহায্যে রচিত।" [ইহা স্যার বার্টল ফ্রিয়ার মহোদয়ের অনুরোধে লিখিত হইয়াছিল। ইংরাজ সরকার যখন সাতারার রাজ্য খাস করেন, সেই সময় ফ্রিয়ার সাহেব তত্রত্য রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসের অনেক উপকরণ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি সমূহ পোতমগ্ন হইয়া সমুদ্রগ্রাসে পতিত হইয়াছে!] ভিড়ে মহোদয়-কৃত বখরে ভোঁসলে বংশের যে উৎপত্তি-বিবরণ সংকলিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে ঈষৎভ্রান্তিদুষ্ট হইলেও, স্থূলতঃ মহ্লার রাওয়ের বিবৃত বিবরণের সহিত তাহার ঐক্য আছে। তাঁহারা উভয়েই শিশোদে-বংশোদ্ভূত চিতোড়ের মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের ঔরসপুত্র রাণা অজয়সিংহকে ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন সৌন্দর্য্য-সার-প্রতিমা পদ্মিনীকে লাভ করিবার দুরাশায় মত্ত হইয়া চিতোড় নগর ধ্বংস করিলে, মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের পুত্র আরসসিংহ ও সজনসিংহ (সজ্জনসিংহ) সেই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। কিন্তু গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয় চিটনীসের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন,—"From them (the Bhonslas) it is *pretended* that the founder of the Maratha Nation (Shivaji), as hetherto known to us, drew his lineage."

চিটনীস-যুগলের লিখিত বিবরণ কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, তাঁহারা স্বীয় প্রভুর—মহারাষ্ট্র-রাজ্য-সংস্থাপকের ও তাঁহার বংশধরগণের—তুষ্টিসাধন ও বংশগৌরববর্দ্ধনের জন্য চিতোড়ের মহারাণার সহিত তাঁহাদিগের আদিপুরুষের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন কি না, তাহার নির্ণয় করিতে হইলে, প্রকৃতে মেওয়াড়ের (মিবারের) রাজকুলাখ্যান-লেখকগণের মতামত অনুধাবনীয়। এই কারণে ভোঁসলেগণের উৎপত্তিবিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা মহামতি টড সাহেবের প্রণীত "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" হইতে এ স্থলে সংকলন করিয়া দিতেছি।

মেওয়াড়ের (মিবারের) রাজচরিতাখ্যায়ক ভট্টগণের মতে, মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে মেওয়াড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি তখনও অপ্রাপ্তব্যবহারাজন বলিয়া, তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন যেরূপে চিতোড়ের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই বিশ্রুত আছে।

পদ্মিনীর ও চিতোরের রক্ষার জন্য শ্রীচিতোড়-ভবানীর আদেশে মহারাণা স্বীয় একাদশ পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সহ সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন। মহারাণার দ্বাদশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র রাণা অজয়সিংহ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। এই কারণে ও পরলোকের—শিশোদে-কুলের—পিণ্ডলোপ-নিবারণের জন্য মহারাণা তাঁহাকে নগনদবনানীসমাকীর্ণ দুর্গম "কৈলওয়াড়া" নামক প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবার আদেশ করিলেন। এইরূপে প্রাণরক্ষা করা রাজপুত্রের অভিপ্রেত ছিল না; কিন্তু, তিনি এ বিষয়ে পুনঃপুনঃ স্বীয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, পরিশেষে তাঁহাকে পিত্রাদেশপালনে বাধ্য হইতে হইল। এই দুর্বৃত্ত আলাউদ্দীনকে তাহার অবিমৃশ্যকারিতার ও ক্রূরতার প্রতিফল দিবার জন্য পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে সসৈন্যে কৈলওয়াড়া অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। এ দিকে রাজপুত ও পাঠানগণের যে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইল, তাহাতে অশেষ ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইল, পদ্মিনীর কুসুমসুকুমারদেহ পাপিষ্ঠ আলার হস্তগত না হইয়া পবিত্র জহর-ব্রতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল, রাজপুতগণের ইন্দ্রভুবনতুল্য মনোহর, উচ্চ প্রাসাদমালায় সজ্জিত চিতোড়নগর "বে-চিরাগ" হইল! এই দুর্ঘটনা ১৩০৩ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয়।

অনন্তর রাণা অজয়সিংহ কৈলওয়াড়ার দুর্গম দুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক পাঠানদিগকে চিতোড় হইতে বিতাড়িত করিবার আয়োজন ও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সময়ে রাণাদিগের পুরাতন শত্রু ভীলগণ পুনঃপুনঃ কৈলওয়াড়া আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। রাণা অজয় স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হামিরের শৌর্য্যবলে অচিরে ভীলবিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মানবলীলার শেষ হয়। জ্যেষ্ঠত্ব ও শূরত্ব নিবন্ধন তিনি মৃত্যুকালে হামিরকে রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রদান করিয়া যান।

রাণা অজয়সিংহের পুত্র সজনসিংহ রাজ্যের অংশ পাইবার জন্য অন্তর্ব্বিপ্লবের সূচনা করিতে পারেন, এই আশঙ্কায়, হামির তাঁহার নির্ব্বাসনের আদেশ প্রচার করেন। সজনসিংহও হামিরের সহিত অকারণ কলহে শক্তিক্ষয় করা অপেক্ষা বাহুবলে অন্যত্র প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া, দাক্ষিণাত্য অভিমুখে প্রস্থান করেন। তথায় কালক্রমে তাঁহার বংশে এক অতি প্রখ্যাত মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া, পিতৃভূমির প্রতি যবনদিগের অত্যাচারের যেন প্রতিফল প্রদানের জন্য, সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত করিবার ব্যবস্থাবিধান করেন। টড সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন, Sujan Singh was the ancestor of *Shivaji*, the founder of Satara throne, *whose lineage is given in the chronicles of Mewar.*

মেওয়াড়ের রাজকুলাখ্যান-লেখকদিগের গ্রন্থে, শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণের যে বংশাবলী টড সাহেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পাদটীকায় এইরূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন,—১। মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ, ২। অজয়সিংহ, ৩। সজনসিংহ, ৪। দলিপজী, ৫। সিবজী, ৬। ভোরাজী, ৭। দেবরাজ, ৮। উগ্রসেন, ৯। মাহলজী, ১০। খেলুজী, ১১। জনকোজী, ১২। সত্তুজী, ১৩। সাম্বাজী, ১৪। শিবাজী ছত্রপতি, ১৫। সাম্ভাজী, ১৬। রাজারাম।

মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে বিবৃত ভোঁসলে বংশের উৎপত্তির এই বিবরণের সহিত মহ্লার রামরাও চিটনীস-প্রণীত বখরে বর্ণিত বৃত্তান্তের প্রায় সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। অতএব তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপ্রকৃত বা প্রভুবংশের তুষ্টিসাধন ও গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য লিখিত, এরূপ সন্দেহ করিবার কোনও কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মহ্লার রাও চিটনীসের মতে, শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণের বংশতালিকা এইরূপ—১। মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ, ২। মহারাণা সজন (সজ্জন) সিংহ, ৩। দিলীপসিংহ, ৪। সিংহজী (টডের সিবজী), ৫। ভোসাজী (টডের ভোরাজী), ৬। দেবরাজজী, ৭। ইন্দ্রসেন (টডের উগ্রসেন), ৮। শুভকৃষ্ণজী, ৯। রূপসিংহজী, ১০। ভূমীন্দ্রজী, ১১। ধাপজী, ১২। বরবটজী, ১৩। খলকর্ণ বা খলাজী, (টডের খেলুজী), ১৪। জয়কর্ণ (টডের জনকোজী কি?), ১৫। সম্ভাজী, ১৬। বাবাজী বা শিবজী, (১৫৩৩ খৃঃ জন্ম) ১৭। মালোজী (ছত্রপতি শিবাজীর পিতামহ) ১৫৫২ খৃঃ জন্ম।

বিষ্ণু গোপাল ভিড়ে মহাশয়ের গ্রন্থে লিখিত বংশতালিকায় কতিপয় গুরুতর ভ্রম সংঘটিত

হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে এই কয়টি নাম পাওয়া যায়, ১। মহারাণা সজনসিংহ, ২। দিলীপ সিংহ, ৩। সিংহাজী, ৪। ভোসাজী, ৫। দেবরাজজী, ৬। খেলকর্ণ, ৭। মালকর্ণ (টডের মাহলজী? ৮। রাজা শিব, ৯। বাবাজী, ১০। মালোজী।

"ভারতবর্ষ" পত্রের সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া (৫ম সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—"আমরা সাতারার ছাত্রপতিগণের দপ্তর হইতে দুইখানি বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে প্রথমখানি প্রতাপসিংহ মহারাজ (১৮০৮ খ্রীঃ—১৮৩৯ খ্রীঃ) বহু প্রাচীন কাগজপত্র অবলম্বনে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সাতারার মহারাজগণের মধ্যে ইঁহার ন্যায় ইতিহাস-রসিক নরপতি আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচিত বংশপত্রিকার একটি অনুলিপি বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টার্সগণের নিকট প্রেরিত ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় বংশপত্রিকাখানি, ১৮৪৮ খৃঃ সাতারারাজ্য কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক স্বরাজ্যভুক্ত হইলে, সাতারার শেষ নরপতির জ্যেষ্ঠা মহিষী শ্রীমতী সগুণা বাঈ তাহা পুনরুদ্ধারের আশায় ভারতেশ্বরীর নিকট যে 'মেমোরিয়াল' বা আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত গ্রথিত ছিল। এই উভয় বংশপত্রিকার মধ্যে দুই এক স্থলে নাম-সম্বন্ধে সামান্য অনৈক্য (তাহাও ইংরাজী বর্ণমালার বৈশেষত্ব-জনিত বলিয়া বোধ হয়) ভিন্ন আর কোনও পার্থক্য নাই।" [এই বলিয়া সম্পাদক মহাশয় মহারাজ প্রতাপসিংহের রচিত বংশাবলী সমগ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।] এই বংশাবলীর সহিত চিটনীস-ধৃত বংশতালিকার বহুল ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই কারণে আমরা এ স্থলে উক্ত উভয় তালিকার কেবল অনৈক্য স্থলগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

মহারাজ প্রতাপসিংহের বংশতালিকায় মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের অধস্তন ৪র্থ পুরুষ সিংহজীকে "শিবাজী", ১১শ পুরুষ বরবটজীকে "বরহটুজী," ১২শ পুরুষ খেলকর্ণ বা খলাজীকে "খেলোজী" ও ১৩শ পুরুষ জয়কর্ণকে "কর্ণসিংহ" বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম নামটি মহারাজের বংশতালিকায় যেরূপে লিখিত আছে, তাহা নিঃসংশয়ে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, উহার সহিত টডের তালিকোক্ত "সিবজী" এই নামের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তা ছাড়া, মহ্লার রাও চিটনীসের মূল গ্রন্থ "মোড়ী" নামক যে বর্ণমালায় লিখিত, তাহাতে "ব" ও "হ" এই দুই বর্ণের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, ইহার মুদ্রাঙ্কণকালে 'সিবজী' নাম্নে "সিহজী" বা "সিংহজী" পঠিত ও মুদ্রিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই বকার ও হকারের অত্যধিক সাদৃশ্যবশতঃ, 'বরবটজী' স্থানে 'বরহটজী', অথবা 'বরহটজী' স্থানে 'বরবটজী' হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। চিটনীসের 'খলাজী' অপেক্ষা টড ও প্রতাপসিংহের "খেলোজী" নাম সমধিক বিশুদ্ধ বোধ হয়। ইতঃপূর্ব্বে "বি, কৃ, আচার্য্য কালগাঁওকর"-নামস্বাক্ষরকারী যে লেখকের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি সোলাপুরের নিম্বালকর বংশের কোনও পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক বংশপত্রিকা "ভারতবর্ষের" ৭ম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও খলাজীর পরিবর্ত্তে "খেলোজী" নামই দৃষ্ট হয়। খেলোজীর অপর নাম যে খলকর্ণ না হইয়া "খেলকর্ণ" ছিল, তাহা ভিড়ে প্রণীত ও ৺ মোড়ক মহোদয়ের সংগৃহীত বংশপত্রিকা হইতে প্রতিপন্ন হয়। চিটনীসের জয়কর্ণকে প্রতাপ সিংহের বংশতালিকায় "কর্ণসিংহ" বলা হইয়াছে। কিন্তু ৺মোড়ক ও ভিড়ে, ইঁহাদিগের উভয়ের গ্রন্থেই যখন তৎপরিবর্ত্তে "জয়কর্ণ" নামই দৃষ্ট হয়, তখন চিটনীসের তালিকায় উল্লিখিত নামই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয়।

এক্ষণে বংশতালিকার নামাবলীর সমালোচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বখর-বর্ণিত এতৎসংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। রাণা সজনসিংহ হামির কর্ত্তৃক

পিতৃরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইবার পর তাঁহার বংশধরগণ যেরূপে মহারাষ্ট্র দেশে উপনীত ও প্রতিষ্ঠিত হন, তাহার বৃত্তান্ত মল্লার রাও চিটনীসের গ্রন্থে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।—

"মহারাণা অজয়সিংহের পুত্র সজনসিংহ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথমতঃ সোন্ধওয়াড়া নামক প্রদেশে উপনীত হইয়া ঐ রাজ্য অধিকার করেন। তথায় তাঁহার বংশধরেরা চারি পুরুষ পর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ প্রদেশে যবনবিপ্লব সংঘটিত হইলে, রাণা সজন সিংহের বংশের একটি শাখা-পরিবার তথায় অবস্থান পূর্ব্বক অবশিষ্ট সকলে নানা দেশে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সেই বিপৎকালে ভোঁসাজী রাণার পুত্র দেবরাজজী মহারাষ্ট্র দেশে আগমন করেন ও তাঁহার অপর পুত্র নেপাল অভিমুখে প্রস্থিত হন। মহারাষ্ট্রে আসিয়া দেবরাজজী ও তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাদিগের পিতৃ-পুরুষ ভোঁসাজী রাণার নামানুসারে 'ভোঁসলে' এই উপাধির দ্বারা আখ্যাত হইলেন। দেশের তাৎকালিক অবস্থানুসারে সময়োচিত আত্মরক্ষণী নীতি অবলম্বন করিয়া, দেবরাজজী গঙ্গা (গোদাবরী) ও ভীমা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে পালেগারী (যাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে, রাজদ্রোহক কর দিতে অস্বীকৃত হয়, এবং যথাসাধ্য অপরের নিকট হইতে করসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে; তাহাদিগকে মহারাষ্ট্র দেশে 'পালেগার' (Polygar) ও তাহাদিগের কার্য্যকে 'পালেগারী' বলে) করিয়া উদ্দাম স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেশে দিন দিন যবনদিগের প্রাবল্য বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাকে তাঁহাদিগের অধীনতায় সিঙ্‌ণাপুরের পাটিলের (গ্রামরক্ষকের—গ্রামের চীফ্ মাজিষ্ট্রেটের) কার্য্য গ্রহণ করিতে হইল। সিঙ্‌ণাপুরের শিবমূর্ত্তিকে তাঁহাদিগের কুলদেবতা চিতোরের 'একলিঙ্গ' দেব ও তুলজাপুরের 'ভবানী' দেবীকে 'শ্রীচিতোড়-ভবানী' জ্ঞান করিয়া তিনি নিষ্ঠার সহিত, তাঁহাদিগের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বংশধরেরা ক্রমশঃ খানবট, হিংগণী, বেরডী, দেউল গাঁও, বেরুল (ইলোরা), বাস্‌ও মুঙ্গী (প্রতিষ্ঠান) প্রভৃতি গ্রামের পাটিলের সত্ত্ব ক্রয় করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা ও সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। (উল্লিখিত গ্রাম গুলি মহারাষ্ট্রের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী দৌলতাবাদের সমীপে অবস্থিত।) * * * ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পিতামহ মালোজী ভোঁসলে আহম্মদনগরের সুলতানের অনুগ্রহে পুণা অঞ্চলে জাইগীর প্রাপ্ত হন। ইহার পর হইতে পুণা প্রদেশ ভোঁসলে বংশের প্রধান বাসস্থানে ও পরিশেষে মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানীতে পরিণত হয়।"

রাণা সজনসিংহ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সর্ব্বপ্রথম যে প্রদেশে গিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন, যবনোপদ্রবের জন্য যে প্রদেশ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক ভোঁসাজী রাণার পুত্র দেবরাজজী দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভোঁসলে নামে পরিচিত হন, সেই "সোন্ধওয়াড়া" প্রদেশ কোথায়, কোন্ অব্দে ভোঁসলে বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং কোন্ সময়েই বা তথা হইতে পলায়ন করেন, এ পর্য্যন্ত কোনও লেখক তাহার নির্ণয়ে যত্নবান্ হন নাই। আমাদের বিবেচনায়, চিতোড়ের প্রায় শত মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত "লুণাওয়াড়া"র সমীপে "সোন্ধ" নামক যে ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে, তাহাই বখর-বর্ণিত "সোন্ধওয়াড়া" হওয়া সম্ভব। "ওয়াড়া" শব্দের অর্থ গ্রাম বা নগর। রাজওয়াড়া, মোরওয়াড়া, ঝুঞ্ঝওয়াড়া, ধারওয়াড়া প্রভৃতি তদঞ্চলস্থিত বিবিধ গ্রাম-নগর-বাচক শব্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, "সোন্ধ" ও "সোন্ধওয়াড়া" অভিন্ন, (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানপুর, এই দুইটি যেরূপ অভিন্ন, সেইরূপ) বলিয়াই বোধ হয়। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে হামির রাজ্যারোহণ করেন। অতএব ঐ অব্দেই সজন সিংহ সোন্ধওয়াড়া প্রদেশে গমন করেন, এইরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। শত বর্ষে চারি পুরুষের জীবনকাল অতিবাহিত হয়,

স্বীকার করিলে, সজন সিংহের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ দেবরাজজীর মহারাষ্ট্রাভিমুখে প্রস্থানের কাল উহার এক শত বৎসর পরে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। ইতিহাসে দেখিতে পাই, গুজরাথের সুভাদার আহম্মদ শাহ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ সজন সিংহের পিতৃরাজ্যপরিত্যাগের ১০৫ বৎসর পরে) মালব জয় করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। বহু যত্নের পর তদ্বিষয়ে তাঁহার সফলতা লাভ হইয়াছিল। বোধ হয়, আহম্মদ শাহের এই অভিযানের সময়, মালব ও গুজরাথের মধ্যস্থানে অবস্থিত সোন্ধওয়াড়া প্রদেশ যবনসৈন্য কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া থাকিবে, এবং সেই উপদ্রবের সময়েই দেবরাজজী দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকিবেন; তাহার ভ্রাতা এই সময়েই নেপাল গমন করেন।

বখরকার চিটনীস বলেন, ভোঁসাজী রাণার পুত্রপৌত্রগণ মহারাষ্ট্রে গিয়া "ভোঁসলে" উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু টডের গ্রন্থে এই প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম দৃষ্ট হয় না। তাঁহার মতে দেবরাজজীর পিতার নাম ভোরাজী। দেবনাগরী "র" ও "স" এই দুই বর্ণের আকৃতিগত ঐক্যের বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, টড মহোদয় হয় ত, মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে লিখিত "ভোসজী" (মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ ভোসাজী) স্থানে "ভোরাজী" পাঠ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, দেবরাজের পিতার নাম যে ভোসাজী ছিল, ইহাই আমাদিগের নিকট সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভোঁসলে শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি ও বিষ্ণুগোপাল ভিড়ে ও মহারাজ প্রতাপ সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত বংশতালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও, ভোসাজী নামই বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

মহারাষ্ট্রীয় তালিকার সহিত রাজপুত (টডের) তালিকার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, দেবরাজজীর পরবর্ত্তী পুরুষগণের নামের সম্বন্ধে উভয় বংশতালিকার মধ্যে প্রায় ঐকমত্য নাই। এই অনৈক্য স্থলে কোন্ তালিকার নামাবলী ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য করা উচিত? "আচার্য্য কালগাঁওকর" বলেন,—"দেবরাজজীর পরবর্ত্তী নাম সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় বখর-লেখকের উক্তিই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, দেবরাজ ও তাঁহার বংশধরগণ উত্তর-ভারতের শেষ সীমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রের সুদূর অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিলে, মেওয়াড়ের ভাট-গণের পক্ষে তাঁহাদিগের বংশ-বিবরণ জ্ঞাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে, মহারাষ্ট্রে আসিয়া যাঁহারা নানা স্থানে পাটিলের সত্ত্বাদি ক্রয় করিয়া বসতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যথাযথ বিবরণ কিয়ৎপরিমাণে সংগ্রহ করা মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সময় নানা স্থানের প্রাচীনগণের মুখে শ্রুত পূর্ব্বকাহিনী ও পুরাতন বংশপত্রিকাদি সংগৃহীত ও তদবলম্বনে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম-মালিকা প্রস্তুত হইয়া সাতারার রাজ-দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। ফলতঃ, টডের বংশ-তালিকার প্রথম ৭।৮টি নাম যেরূপ বিশুদ্ধ ও ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তৎপরবর্ত্তী পুরুষের নামগুলি সেরূপ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।" আচার্য্য কালগাঁওকরের এই উক্তি আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে সমর্থনীয় বোধ হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বীয় প্রবন্ধের স্থলান্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি অনুমান করেন, "ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময়েই মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে ভোঁসলে বংশের উৎপত্তিকাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। সেই মহোৎসব-কালে রাজপুতানা হইতে অনেক ভাট রায়গড়ে আগমন পূর্ব্বক উদয়পুরের রাজবংশের ও তদ্বংশোদ্ভব শিবাজী মহারাজের গুণগ্রাম ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিয়া, বহু পুরস্কার লাভ করিয়া থাকিবেন, ইহা অসম্ভব নহে।" এইরূপ যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আচার্য্য

সহাশয় মেওয়াড়ের রাজকুল-চরিতাখ্যানমূলক গ্রন্থসমূহে বিবৃত ভোঁসলে বংশের উৎপত্তি-বিবরণকে (সুতরাং চিটনীস-লিখিত বৃত্তান্তকেও) অনৈতিহাসিক ও পুরস্কারলুব্ধ ভাটগণের কল্পনাপ্রসূত বলিবার সাহস করিয়াছেন।

কালগাঁওকর আচার্য্যের এই অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত ও আপাত-রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, আমরা উহাকে প্রকৃত ঘটনা হইতে বহুদূরবর্ত্তী বলিয়া মনে করি। কারণ, যদি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময়েই ভট্টকবিগণ কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র-পতির প্রদত্ত পুরস্কারের লোভে ভোঁসলেগণের উৎপত্তিকাহিনী-সংবলিত-বংশাবলী রচিত হইয়া মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে উহার সহিত মহারাষ্ট্রীয় বখরসমূহের সম্পূর্ণ বা বহুল ঐক্য থাকিত—দেবরাজের পরবর্ত্তী পুরুষগণের নামাবলীর সহিত সাতারার রাজদপ্তরের প্রাচীন কাগজপত্রাবলম্বনে রচিত বংশাবলীর এত বৈসাদৃশ্য থাকিত না, আমরা এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি। শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশাবলী কীর্ত্তন করিয়া যাহারা তাঁহার নিকট হইতে "বক্‌শিস্" আদায় করিয়াছিল বলিয়া আচার্য্য মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, তাহাদের নিকট যে পুরস্কার-দাতার পিতা ও পিতামহের নাম সম্যক্ অজ্ঞাত থাকিবে, ইহা আমরা সম্ভবপর মনে করিতে পারি না। শিবাজীর পিতার নাম শাহাজী ও পিতামহের নাম মালোজী ছিল, এ কথা অনৈতিহাসিক বলিবার উপায় নাই। তাঁহারা যে সকল শৌর্য্যবীর্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ শিবাজীর শত্রুপক্ষীয় ইতিহাস-লেখকগণের "তওয়ারিখ" গ্রন্থেও বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। অথচ এই দুই জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরপুরুষের নাম সম্বন্ধে মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তি-লেখকগণ যে শোচনীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন, ছত্রপতি শিবাজীর পিতার নাম সম্ভাজী ও তাঁহার পিতামহের নাম "সত্তুজী"! (টডকৃত রাজস্থান দেখুন)। শিবাজীর পিতা ও পিতামহের নাম সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান এইরূপ, তাহারা বংশবর্ণনা করিয়া শিবাজীর নিকট হইতে কত 'বক্‌শিস্' আদায় করিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য! যাঁহারা দেবরাজজী ও শিবাজী ছত্রপতি এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী দ্বাদশ পুরুষের মধ্য ছয় জনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ছয় জনকে কল্পিত নামে বিভূষিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে শিবাজীর রাজ্যাভিষেককালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার নির্দেশমত বংশপত্রিকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর বোধ হয় না।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেককালে তাঁহার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, বারাণসী-নিবাসী পণ্ডিত-শিরোমণি গঙ্গাভট্ট এইরূপ মীমাংসা করেন যে, যে সমস্ত রাজপুত-পরিবার দাক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা "মারাঠা" (এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, দাক্ষিণাত্যে "মারাঠা" শব্দ মহারাষ্ট্রবাসিমাত্রকে না বুঝাইয়া ঐ মহারাষ্ট্র দেশের কেবল ক্ষত্রিয়সমাজকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,) নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং রাজপুতগণের ন্যায় তাঁহা-দেরও শাস্ত্রানুসারে ছত্রচামরাদি-রাজচিহ্ন-ধারণ ও রাজ্যাভিষেকাদি সংস্কার সম্পন্ন করিবার অধিকার আছে। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেকালের জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, কোটা, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের রাজপুত নরপতিগণ যে কোনরূপ সন্দেহ বা আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই, ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, জাতি সম্বন্ধে রাজপুতানার বংশ-ভিমানদৃপ্ত রাজপুতগণ কিরূপ স্পষ্টবাদী, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত রাজপুত-রাজন্যবর্গ যে সে সময়ে মারাঠাগণের অধীন ছিলেন, তাহাও নহে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা, বিশেষতঃ মেওয়াড়ের "হিন্দুসূর্য্যগণ" যে কেন এ বিষয়ে প্রতিবাদ

করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, ভট্টকবিগণকে আপনাদিগের কুলাখ্যান-গ্রন্থে কোনও প্রকার অগৌরবকর কথা প্রক্ষিপ্ত করিবার অবসর কেন প্রদান করিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। টড মহোদয় যে সকল উপকরণ গ্রন্থের অবলম্বন করিয়া রাজস্থানের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই অম্বরপতি জয়সিংহ, মেওয়াড়াধিপতি রাণা রাজসিংহ ও তাঁহার পুত্রের আদেশে ও তত্ত্বাবধানে রচিত হইয়াছিল। চিতোড়ের রাণা-বংশের সহিত ভোঁসলেগণের সম্বন্ধবিষয়িণী আখ্যায়িকা নিরবচ্ছিন্ন কবিকল্পনা হইলে, রাণাগণের তত্ত্বাবধানে রচিত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে কখনই স্থান প্রাপ্ত হইত না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ছত্রপতি শিবাজী যে ভোঁসলে বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা যে রাজপুতস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বংশ হইতে উৎপন্ন, উহা যে চিতোড়ের রাজবংশের বিশুদ্ধ ঔরস শাখা-মাত্র, সে বিষয়ে মেওয়াড়ের ও মহারাষ্ট্রের রাজকুলাখ্যানলেখকদিগের মধ্যে মতভেদ নাই। এই কারণে ঐ তত্ত্বটুকু আমরা অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐতিহাসিক অর্ম্মি, তাঞ্জোরস্থিত শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বংশধরের দপ্তরের কাগজ-পত্র অবলম্বনে ভোঁসলেগণের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত বিবরণের সহিত সাতারার মহ্লার রাও চিটনীসের সঙ্কলিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ডগলাস প্রভৃতি কয়েক জন লেখকও ছত্রপতি শিবাজীকে চিতোড়ের মহারাণাদিগের ঔরস বংশধর বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি অনেক বৈদেশিক ইতিহাসলেখক এ বিষয়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মিল্, ডফ্, স্কট, ওয়েরিং, কর্ণেল ডৌ, স্কট জোনাথন, কাফি খাঁ প্রভৃতি লেখকগণ ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষকে উদয়পুরের রাণাদিগের দাসীপুত্র বা গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত মহারাষ্ট্রীয় প্রবন্ধে আমরা অতিবিস্তারিতভাবে এই ভ্রান্তমতের খণ্ডন করিয়াছি। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কেবল দুই একটি কথা বলিব।

ভোঁসলে বংশকে গূঢ়োৎপন্ন বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাফি খাঁ ও স্কট জোনাথনের উক্তিই বিচারযোগ্য। কারণ, ইঁহাদের গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অপর লেখকগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত। কাফি খাঁর অপেক্ষাও স্কট জোনাথনের গ্রন্থোল্লিখিত বিবরণ, শিবাজীর সমসাময়িক জনৈক হিন্দুলেখকের লেখনীপ্রসূত বলিয়া, সমধিক আলোচ্য। বুন্দেলখণ্ডে দতিয়া নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। তত্রত্য ভূপতি দলপৎ রায় দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাপতি (সর্দ্দার) ছিলেন। তিনি সম্রাটের দাক্ষিণাত্য অভি-যানের প্রত্যেক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। সেই বুন্দেলা সর্দ্দারের অধীন জনৈক কারকুন (কেরাণী) পারস্য ভাষায় উক্ত অভিযানের একটি "হকীকত" বা বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। দলপৎ রায়ের পৌত্রের নিকট হইতে স্কট জোনাথন সাহেব সেই গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ Aurungzeb's Operations in the Deccan নামে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে শিবাজীর বংশবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—"শিবাজীর প্রপিতামহ বাগ ভোঁস্‌লা উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের (!) এক হীনজাতীয়া দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খানদেশের সুভেদার রাজা আল্লিমোহনের অধীনতায় কার্য্য করিতেন। কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই আল্লিমোহনের মন্ত্রী ও প্রতি-নিধি হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুভাদারের মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া পুণার নিকটস্থিত কতিপয় গ্রামের "পাটিলকী" সত্ব ক্রয় করেন। তাঁহার চারিটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে মালোজী ও বম্বজী ভোঁসলে, লুখজী যাদব রাওয়ের অধীনতায় চাকরী

গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালোজী হইতে 'সাতারকর ভোঁসলে' ও বম্বজী হইতে 'নাগপুরকর ভোঁসলে' বংশের উৎপত্তি হয়।"

কাফিখাঁর লিখিত বিবরণের মর্ম্মও এই উপন্যাসের প্রায় অনুরূপ। আকবর কর্ত্তৃক যখন চিতোড় নগর বিধ্বস্ত হয়, তখন মালোজী ভোঁসলের বয়স ১৫ বৎসর ছিল, এ কথা পাঠক অবগত আছেন। পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সের সময় (অর্থাৎ চিতোড়-ধ্বংসের ১০ বৎসর পরে) মালোজী যাদব রাওয়ের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে উপন্যাসোল্লিখিত ঘটনাবলীর সংঘটন, বিশেষতঃ (মালোজীর যৌবনকালে) ভীমসিংহ নামক কোনও কল্পনাপ্রসূত নরপতি কর্ত্তৃক মালোজীর পিতার জন্মদান (!) কিরূপে সম্ভবে, তাহা আমরা ধারণা করিতে অসমর্থ। অথচ মিল্, ওয়েরিং প্রভৃতি ইতিহাসলেখকগণ এই উপন্যাসকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! এই উপন্যাসে আরও অনেক ঐতিহাসিক ভ্রম আছে; স্থানাভাবে তৎসম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিলাম।

এখন তর্ক উঠিতে পারে, বুন্দেলা কারকুনের লিখিত বিবরণ যখন শিবাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই লিখিত ও উক্ত কারকুনের দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সংগৃহীত, এবং হয়ত অওরঙ্গজেবের শিবিরে যে সব মারাঠা যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ বিবরণ সংগৃহীত, তখন তাহার মূলে কিছু সত্য নিহিত থাকা সম্ভব। অন্ততঃ ভোঁসলে-বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে সেকালের লোকের মধ্যে যে কোনও প্রকার অগৌরবকর আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, তাহা বুন্দেলা কর্ম্মচারী ও কাফি খাঁর গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা এইরূপ যুক্তিবাদের পক্ষপাতী, তাঁহারা অবশ্যই রাজস্থানের ভট্টলেখকগণের প্রতি অনৃতবাদিত্বের আরোপ করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের সহিত মেওয়াড় প্রদেশে গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সকল ভ্রমের নিরাস হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

টডের গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাণা রায়মল্ল ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে মেওয়াড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তদীয় ভ্রাতা রাণা কুম্ভ, স্বীয় পুত্র কর্ত্তৃক ছুরিকাঘাতে বিনষ্ট হইবার পর হইতে, রায়মল্লের সমূহ চেষ্টা সত্ত্বেও, মেওয়াড় রাজ্যের বিনষ্ট সুখ শান্তি পুনরাগত হইল না। রায়মল্লের পুত্রদ্বয় সিংহাসনের অধিকার লইয়া যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহাতে মেওয়াড়ের অশান্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংগ্রামসিংহকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায়, পিতা রায়মল্ল কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন, এবং পরিশেষে দেশান্তরে গিয়া স্বীয় ভগিনীর প্রদত্ত বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভক্ষণে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্রোহের ও বিবিধ বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করেন। অতঃপর চিতোড়ের সিংহাসনে যথাক্রমে মহারাণা সংগ্রামসিংহ ও তৎপুত্র রাণা রত্ন অধিষ্ঠিত হন। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে রাণা রত্নের মৃত্যু হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ "বিক্রমজিৎ" রাজা হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিক্রমজিতের দুর্ব্ব্যবহারে রাজপুত সর্দ্দারগণ রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। সংগ্রামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের "শীতল সেনী" নাম্নী দাসীর গর্ভজাত "বনবীর" নামে এক পুত্র ছিল। বনবীর ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বিক্রমজিতের পদচ্যুতিকালে তদীয় কনিষ্ঠ উদয়সিংহ ৬ বৎসরের বালক ছিলেন বলিয়া, সর্দ্দারগণ বনবীরের প্রতি মেওয়াড়ের শাসনদণ্ড পরিচালনের ভারার্পণ করেন। রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিয়া বনবীরের দুর্বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি উদয় সিংহকে বিনাশ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বীরধাত্রী পান্নার অনুপম আত্মত্যাগে বালক উদয়সিংহ যেরূপে রক্ষিত হন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নহে। উদয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিলে, বনবীরকে

রাজ্যচ্যুত স্বীকার করিয়া রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে দক্ষিণাপথাভিমুখে পলায়ন করিতে হয়। রাজপুতানার ভট্টগণের মতে, ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। বনবীরের সন্তানসন্ততিগণ দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া ভোঁসলে উপাধিধারণ ও কালক্রমে নাগপুরে রাজ্য সংস্থাপন করেন।"

এই বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চিতোড়ের রাজবংশের যে শাখা-পরিবারদ্বয় দুই বিভিন্ন সময়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্র দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ মেওয়াড়ের রাজকুলাখ্যান গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক্ লিখিত আছে। পূর্ব্বে চিতোড় হইতে মহারাণাদিগের যে ঔরস-বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত আপনাদিগের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিবার জন্য পশ্চাদাগত বনবীরের সন্ততিগণ ভোঁসলে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রাচীন ভোঁসলেগণ খৃঃ ১৪ শতাব্দীর প্রারম্ভে চিতোড় ত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। সুতরাং খৃঃ ১৮ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুন্দেলা কারকুন ও কাফি খাঁর গ্রন্থরচনাকালে, তাঁহাদিগের আদিবৃত্তান্ত জনসমাজের, বিশেষতঃ মোগলগণের বা তদনুগত দূরদেশস্থিত মারাঠাগণের বিশেষ পরিজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না, এরূপ অনুমান আমরা করিতে পারি। পক্ষান্তরে, ছত্রপতি শিবাজীর কার্য্যকলাপে ভোঁসলে নামের প্রতি সে সময়ে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ও বনবীরের বংশধরগণ অল্পদিনমাত্র মহারাষ্ট্রে আসিয়া ভোঁসলে নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের গূঢ়োৎপত্তির কাহিনীই সাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ সেকালের মারাঠাবিদ্বেষী মোগলগণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে। তদ্ভিন্ন কাফি খাঁ ও বুন্দেলা কারকুনের মত বৈদেশিক লেখকের পক্ষে প্রাচীন ও আধুনিক বা ঔরস ও কৃত্রিম ভোঁসলে শাখাদ্বয়ের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, তাহা জানিবার সম্ভাবনাও অল্প ছিল। এই সকল কারণে তাঁহারা প্রাচীন ভোঁসলেগণের উৎপত্তির বিবরণ অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইয়া এবং উভয় ভোঁসলেকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া, নবাগত ভোঁসলেগণের গূঢ়োৎপত্তিবিষয়িণী আখ্যায়িকার সহিত ছত্রপতি শিবাজী ভোঁসলের আদিপুরুষের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ফলতঃ, সাতারকর ও নাগপুরকর ভোঁসলেদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজপুতানার বিশেষজ্ঞ রাজপ্রশস্তিলেখকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য, অথবা বৈদেশিক বুন্দেলা কারকুন ও কাফিখাঁর ভ্রান্তিসঙ্কুল বর্ণনায় নির্ভর করিয়া নাগপুরকর (কৃত্রিম) ভোঁসলে বংশের সহিত ছত্রপতি শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধ কল্পনা করা ঐতিহাসিক-যুক্তিসম্মত, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

উপসংহারকালে একটি বিষয়ের প্রতি আমাদিগের মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহারাষ্ট্রের সাতারা রাজবংশের আদিপুরুষ মেওয়াড়ের বাপ্পা রাওলের প্রতিষ্ঠিত বংশতরুর একটি প্রাচীন ও বিশুদ্ধ ঔরস শাখা হইতে সম্ভূত, এ কথা যেরূপ স্বীকার্য্য, চিতোড়ের "হিন্দু সূর্য্যগণ" প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ হইতে সমুৎপন্ন, এ কথাও সেইরূপ প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয়ের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যেমন সূর্য্যকিরণের প্রচণ্ড প্রভাবে সমুদ্রের জল কিয়দ্দিবস নভোদেশে মেঘরূপে বাস করিতে বাধ্য হইয়া কালক্রমে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে বৃষ্টিরূপে পুনরায় সমুদ্রেই নিপতিত হয়, সেইরূপ খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে শালিবাহন বংশের শাসনকালে মহারাষ্ট্র দেশে যে রাষ্ট্রবিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহার অদম্য প্রতাপে মহারাষ্ট্রের শিশোদে-উপাধি-ধারী প্রাচীন রাজবংশ স্থানভ্রষ্ট হইয়া সাতপুড়া ও বিন্ধ্যাদ্রির শৈলকাননসমাচ্ছন্ন শান্তিস্নিগ্ধ প্রদেশের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক মেওয়াড়

প্রদেশ আক্রমণ করেন; এবং আপনাদের বাহুবলে ও পবিত্রতার প্রভাবে রাজপুত জাতির শ্রদ্ধাসম্মানভাজন ও শিরোভূষণরূপে অবস্থান করিয়া, কালক্রমে যবনোপদ্রবসম্ভূত বিপ্লবের ফলে পুনরায় পিতৃভূমি মহারাষ্ট্রে সমাগত হয়েন। ফলতঃ, খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে যে রাজবংশ আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে সেই রাজবংশ আত্মরক্ষণমানসে পুনর্ব্বার প্রাচীনা মাতৃভূমির স্নেহতপ্ত ক্রোড়ে পুনরাগত হইয়া যথাসময়ে জননীর দুঃখাশ্রু মার্জন পূর্ব্বক স্বদেশবান্ধবগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

এই মনোরম প্রসঙ্গের সুললিত বর্ণনা মল্হার রামরাও চিটনীসের গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। এই আখ্যায়িকার সহিত মহারাষ্ট্র ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় স্বীয় ইতিহাসে উহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ আখ্যায়িকা নিতান্ত অলীক-জনকল্পিত বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে; কিন্তু "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" এই বাক্যানুসারে ঐ আখ্যায়িকার মূলে কোনও মহার্হ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ, উত্তরভারতের রাজপুতগণের মধ্যে এইরূপ এক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র রাজবংশ হইতেই রাজপুতানার অনেক প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ভট্টগণ মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তি গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, "চিতোড়ের মহারাণা বংশের আদিপুরুষ পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদেশে গোদাবরী-তীরে 'তিলতিলপট্টন' (ভট্টগণের মতে মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাজধানী দেবগিরি বা দৌলতাবাদেরই প্রাচীন নাম 'তিলতিলপট্টন') নামক নগরের অধিপতি ছিলেন; পরে ১৯১ বিক্রমাব্দে (১৩৫ খ্রীঃ অঃ) রাষ্ট্রবিপ্লবকালে [ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, শালিবাহনবংশীয় নরপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি ও শ্রীপুলোমবি (১৩০ খৃঃ—১৪০ খ্রীঃ অঃ) মহারাষ্ট্র দেশের ক্ষত্রিয়গণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য যে মহাসংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সংগ্রামকালে] স্বদেশত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিন্ধ্যপ্রদেশে ও পরে মেওয়াড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।"

রাজস্থানের ছত্রিশকুলের রাজপুতগণের উৎপত্তিবিবরণ টড সাহেবের গ্রন্থে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ ছত্রিশ কুলের অন্তর্গত অনেক রাজপুত-পরিবার আদৌ নর্ম্মদার দক্ষিণতীরনিবাসী, এমন কি, কতিপয় পরিবার গোদাবরী নদীর তীরস্থিত "মুঙ্গি পৈঠন" (মহারাষ্ট্রপতি শালিবাহনের রাজধানী প্রতিষ্ঠান) নগরের আদিম অধিবাসী ছিলেন। রাষ্ট্রকূট (রাঠোড়) মৌর্য্য (টড-প্রোক্ত মোরি') কদম্ব, নলওয়াড়, শিলার প্রভৃতি উপাধিধারী, প্রাচীন প্রস্তরলিপিতে বর্ণিত মরাঠা পরিবারসমূহ রাজপুতস্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং তাঁহাদিগেরই দ্বারা "রাও," "রাণা," বাঈ ও কুলস্বী প্রভৃতি শব্দ ঐ প্রদেশে নীত ও রাজপুতগণের মধ্যে প্রচলিত হয়, এরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। টডের রাজস্থান ও ডাঃ ভাণ্ডারকরের প্রণীত Early History of Deccan Down to the Mohemedan Conquest গ্রন্থ হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলে, মারাঠা বংশ হইতে রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় কুল সকলের উৎপত্তিবিষয়ক বথরোক্ত আখ্যায়িকার সত্যতা বহু পরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতকার বলেন, "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলং"। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকে রাজপুতানার রাজপুত্রগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিবেচনায়, ভাগবতকারের উক্তি (যদি নিতান্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে) কেবল আর্য্যাবর্ত্ত

সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। কারণ, মহারাষ্ট্র দেশের উপর যে মগধপতি নন্দের কোনও প্রভুতা ছিল, এ কথার প্রমাণাভাব। পক্ষান্তরে, মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশ কালক্রমে রাষ্ট্র-বিপ্লবাদি ব্যাপার হেতু স্বদেশত্যাগে বাধ্য হইয়া বিলুপ্তক্ষত্রিয় আর্য্যাবর্ত্তে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, চিতোড়, জয়পুর ও যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক রাজপুত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, মহারাষ্ট্রীয় বখরে ও রাজপুতানার ভট্ট-গ্রন্থে বর্ণিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, ইহা কোনও ক্রমেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। টড মহোদয় শক জাতির সহিত রাজপুতগণের যে শোণিতসম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কিরূপ দুর্ব্বল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এল্-ফিন্‌ষ্টোন সাহেবের ইতিহাস পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। মনুসংহিতাদি প্রাচীন গ্রন্থের মতে যে সকল ক্ষত্রিয় প্রাচীনকালে আর্য্য দেশে গিয়া সংস্কারবিহীন বা ব্রাত্য-ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহারা "শক জাতি" নামে পরিচিত হয়। সুতরাং রাজপুত জাতির সহিত প্রাচীন শক জাতির দুই একটা আচার ব্যবহারের যদি ঐক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার, বা উভয় জাতির মধ্যে শোণিতসম্বন্ধ কল্পনা করিবার, কোনও কারণ নাই। উল্লিখিত তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি না থাকায়, ইংরাজ লেখকগণ মারাঠা ক্ষত্রিয়দিগের কোনও কোনও আচারে, প্রাচীন শকদিগের রীতি নীতির নিদর্শন দেখিতে পাইয়া, তাঁহাদিগকেও শকবংশীয় বলিতে ত্রুটী করেন নাই। ফলতঃ, ধীরভাবে মারাঠা বখরের বৃত্তান্তের সহিত রাজপুত ভট্টগণের উক্তির ও আর্য্যশাস্ত্রাদির তুলনা পূর্ব্বক পর্য্যালোচন করিলে, টড্-প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের যুক্তি শিথিলমূল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

মেরী করেলি।

ইংরাজী-সাহিত্যামোদীর নিকট মেরী করেলির নাম অপরিচিত নহে। অধুনাতন ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার কল্পনার বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারিত সত্যসকলের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির আবিষ্কারকল্পে তাঁহার প্রয়াস ও সমাজের নিন্দনীয় বিষয় সকলের প্রতি তাঁহার তীব্র আক্রমণ—এই সকলই তাঁহার যশোমন্দিরের সোপান। সম্প্রতি "ষ্ট্রাণ্ড্ ম্যাগাজিন্" পত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

লেখক যখন মিস্ করেলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি লণ্ডনের বাসগৃহ ছাড়িয়া লিনকনসায়ারে উড্‌ল্যাণ্ডস্পা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। মে মাসের প্রথম দিন মিস্ করেলির জন্মদিন। লেখক সেই দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। লেখক তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী মাধুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমোদ প্রমোদ।

আমোদ প্রমোদের কথায় মিস্ করেলি লেখককে বলিয়াছিলেন,—তিনি গীতবাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন; কিন্তু কন্‌সার্ট অথবা সঙ্গীতসম্মিলনী তাঁহার ভাল লাগে না। মুক্ত বায়ুতে অথবা নদী বা হ্রদবক্ষেই সঙ্গীত তাঁহার সমধিক প্রিয়। তাঁহার মতে, গানের অপ্রত্যাশিত অংশটুকুই গানের সৌন্দর্য্য। শ্রেণীবদ্ধ আসনে উপবিষ্ট শ্রোতাদলের মধ্যে বসিয়া সাদা 'টাই' ও কাল কোট পরিহিত গায়কের অথবা 'নিম্নবক্ষ'-সান্ধ্যবেশপরিহিতা গায়িকার উচ্চ সঙ্গীত, তাঁহার পক্ষে বিরক্তিজনক।

তাঁহার মতে ইহা সঙ্গীত-নামের উপযুক্তই নহে। 'কন্‌সার্টের' ন্যায় তিনি রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখিতেও ভালবাসেন না। হিমশীতল রজনীতে থিয়েটার দেখিতে যাওয়া অপেক্ষা স্বীয় গৃহে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া সুন্দর চিন্তাপূর্ণ পুস্তক পাঠ করা তাঁহার পক্ষে অধিক প্রীতিপ্রদ। এই প্রসঙ্গে লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি অভিনয়কে শিল্প-কলা বলিয়া মনে করেন কি না? তাহার উত্তরে তিনি বলেন, যদিও অভিনয়কে শিল্প-কলা বলা যায়, তাহা হইলেও ইহা কলাবিদ্যার অতি অধঃস্তরে অবস্থিত। অভিনয় অপরের অনুকরণমাত্র; বানরেও মানুষের অতি সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে। সুতরাং এই অনুকরণে অভিনেতা আপনাকে বানরের সমশ্রেণীস্থ করে। তিনি বাস্তব মানব ভালবাসেন, কিন্তু অনুকরণ বা 'হনুকরণ' তাঁহার নিকট বড় বিরক্তিকর।

তাঁহার প্রিয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে মিস করেলি বলেন, তাঁহার কোন বিশেষ প্রিয় গ্রন্থকার নাই; তবে স্কট ও ডিকেন্‌স্ তিনি বিশেষ পছন্দ করেন। আধুনিক সমালোচকদের ন্যায় তিনি সমসাময়িক লেখকদিগের দোষ বাহির করিতে ভালবাসেন না। তিনি তাঁহাদের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যেই সন্তুষ্ট। রডিয়ার্ড্ কিপ্‌লিংএর ছোট গল্প তাঁহার ভাল লাগে বটে, কিন্তু তিনি কিপ্‌লিংকে—অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত—কবি বলিতে স্বীকৃত নহেন। তিনি বলেন, কিপ্‌লিং নিজে বুঝেন যে, তাঁহার কবিতা কেবল ছন্দোবদ্ধ রচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মিস্ করেলি স্বীয় পুস্তকের সমালোচকদিগের সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি প্রথমে তাঁহাদের আক্রমণ করেন নাই। তাঁহারাই প্রথমে ঢিল ছুড়িয়াছিলেন। কাজেই তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। যখন তাঁহার Romance of two Worlds পুস্তক সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিল, তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'সাহিত্যিক' সাধারণের সহৃদয়তা ও আন্তরিকায় তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল ও আশা ছিল—তাঁহারা নব-ব্রতীকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সে বিশ্বাস শীঘ্র নষ্ট হইয়া গেল। সমালোচকেরা তাঁহার পুস্তক পাঠ না করিয়াই, তাহার অতি তীব্র ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইল। এইখানে পাঠক, একটু রহস্য দেখুন। ইংলণ্ডে লেখককে সমালোচকদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, আর এ দেশে সমালোচককেই লেখকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়! অবশ্য, সাধারণে মনে করে, স্থির ও সহিষ্ণুভাবে অপরের আক্রমণ সহ্য করাই স্ত্রীলোকের কাজ—কিন্তু তাঁহার তাহা সহ্য হয় না, তিনি সে মতাবলম্বিনী নহেন। তিনি তাঁহার আপনার জন্য যত না হউক, সমগ্র নারীজাতির জন্য বাধ্য হইয়া পুরুষদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অনেকে এত নীচমনা ও হীনচরিত্র যে, অনেক সময়ে তাহারা এরূপ আক্রমণের যোগ্য নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এ কাজ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে একটা অবান্তর শুভ ফললাভ হইয়াছে—জনসাধারণে নীচবৃত্তিপ্রণোদিত সমালোচকের কার্য্যপ্রণালী অবগত হইয়াছে। কথায় কথায় তিনি Sorrows of Satan গ্রন্থে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।—সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—"এই পুস্তক সমালোচিত হইবার জন্য কোন সমালোচকের নিকট প্রেরিত হইবে না। যদি কেহ সমালোচনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণের ন্যায় ক্রয় করিতে হইবে; অথবা কোন পুস্তকালয় হইতে লইতে হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, তাঁহার আর কোন পুস্তক কখনও সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইবে না। পুস্তক সমালোচনায় দেখা গিয়াছে, সমালোচকেরা তাঁহার পুস্তক না পড়িয়া সমালোচনা করেন

মিস্ করেলি ও সমালোচক।

সুতরাং পুস্তক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে সমালোচনা লিখিবার কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যুত ইহাতে তাঁহার প্রকাশকের অনেক খরচ বাঁচিয়া যাইবে। তিনি বলেন, Barabbas ও Sorrows of Satan, এই দুই পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রীত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষ খণ্ডের উপর বিক্রয় হইয়াছে, আরও হইতেছে। ইহাদের মধ্যে Barabbas সমালোচিত হইয়াছিল, আর Sorrows of Satan সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয় নাই।

আধুনিক লেখকদের সহিত পরিচয়ের কথায় তিনি বলেন,—সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার বড় কাহারও সহিত পরিচয় নাই। তবে কার্য্যোপলক্ষে Sir walter Bessnt ও অন্যান্য অনেকের সহিত চিঠি লেখালেখি হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত ও সুপরিচিত লোকদের মধ্যে কেবল মৃত রাজকবি টেনিসন্ আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে আমার প্রশংসা করিয়া এক-খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে মিঃ ক্লিফোর্ড হ্যারিসনের লেখা আমার বড় ভাল লাগে। তিনি এখন সাধারণ্যে সুপরিচিত নহেন। Sorrows of Satan গ্রন্থের অন্যতম নায়িকা Mevis Clare চরিত্রে আমি আপনার চিত্র আঁকিয়াছি—এই অলীক জনরবের মূল Review of Reviews সম্পাদক মিঃ ষ্টেড। মিঃ ষ্টেড পরে আপনার এই ভ্রমের সংশোধন করিয়াছেন। মিঃ মারে My Contemporaries in Fiction নামক পুস্তকে উক্ত ভ্রমপূর্ণ জনরবের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। আমি তাঁহার কোন রচনা পড়ি নাই। তিনি যেমন আমার পুস্তক পাঠ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে লিখিয়াছেন, মেভিস্ ক্লেয়ারের মূল আমি নিজে, তাঁহার কোন পুস্তক পড়িয়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে উক্তরূপ মত প্রকাশ করিতে পারি না। অতি অন্তরঙ্গ পরিচিত ব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকাশ করা নিতান্ত অন্যায়।

মিস্ করেলি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ হইতে অনেক পত্র পাইয়া থাকেন। তাহাদের সংখ্যা দেখিয়া লেখক বিস্মিত হইয়াছিলেন। মিস বলেন,—ইহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর লেখা আমার একটা কাজ হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের জিজ্ঞাসায় তিনি বলেন, পত্রগুলি অনেক প্রকারের। ইহাদের কতকগুলি প্রেমপত্র। সেগুলি পড়িবামাত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। অনেকে আপনার জীবনকাহিনী পত্রে বিবৃত করিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। অবশ্য, এই সকল পত্রের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। অনেকে আবার আমার পুস্তকের অনুবাদ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখে। আর এক সম্প্রদায়ের পত্র লেখক আছে, তাহারা বড় বিরক্তিকর। তাহারা আমার স্বাক্ষরের জন্য বড় ব্যগ্র। ইহাদের কিছুতেই হঠাইবার যো নাই। আমি অনেক স্বাক্ষরহীন পত্র পাইয়া থাকি। সেগুলি প্রায়ই গালাগালি-পূর্ণ। এই সকল পত্রলেখকদের বিশ্বাস, আমি সবেগে নরকের পথে অগ্রসর হইতেছি। কতকগুলি পত্র আবার বেশ আমোদ প্রদান করে। সে বৎসর শীতকালে যখন আমি স্কটলণ্ডে বাস করিতেছিলাম, তখন কেহ কেহ তাহাকে মৎস্যাদি পাঠাইতে আদেশ করিত। অতি অল্প দিন হইল, কেপকলনি হইতে আমি একখানি পত্র পাইয়াছি, সেখানি এইরূপ,—"প্রিয় মিস্ করেলি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার একখান পুরাতন বেহালা আমাকে পাঠাইবেন। আমার একখানার বিশেষ আবশ্যক আছে; কিন্তু আমার মাতার কিনিয়া দিবার সঙ্গতি নাই; আমি একখানি পুস্তকে আপনার ঘরের ছবি দেখিয়াছিলাম, তাহাতে একখানি বেহালা ও একটি হার্পি ছিল। তার পর হইতে আমি মনে করিয়াছি, আপনার নিকট একখানি বেহালা চাহিব। আশা করি,

মিস করেলি ও তাঁহার পত্রলেখকগণ।

আপনি ইহাতে বিরক্ত হইবেন না।" অনেকে আবার আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক ও কৌতূহলোদ্দীপক পত্র সকল ভারতবর্ষ হইতে আসে। অনেক দেশীয় রাজা ও মহারাজা আমাকে প্রায় পত্র লেখেন। তাঁহাদের Barabbas বড় ভাল লাগে। ইহা হিন্দুস্থানীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

মিস্ করেলির নূতন পুস্তক।

তাঁহার নূতন পুস্তকের কথায় মিস্ করেলি বলিয়াছেন, এ বর্ষে আমার কোন নূতন পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। আমি যদি বেশ সুস্থ থাকি, (কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি বড় অসুস্থ ছিলেন) তাহা হইলে আগামী বর্ষে বসন্তকালে আমার নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইবে। আমার অসুখের পূর্ব্বে তাহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার সাতটি পরিচ্ছেদমাত্র লিখিত হইয়াছে। আমার নূতন পুস্তকের নাম আপনাকে বলিতে পারি না। আমার প্রকাশকেরা পাণ্ডুলিপি পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুস্তকের নাম জানিতে পারেন না। তবে আপনাকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আকারে ইহা Barabbas বা Sorrows of Satanএর মত হইবে। আমার নূতন পুস্তকের নাম The Sins of Christ, এ জনরব মিথ্যা। কিন্তু তাঁহার নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলে ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহার উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবেন।

তিনি প্রাতে দশটা হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত লিখনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। অনেক সময় ভ্রমণকালে পুস্তকের আখ্যানবস্তু স্থির করিয়া লয়েন। পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেন; এখন একজন লিপিকার রাখিয়াছেন। পাণ্ডুলিপি সংশোধিত হইলে টাইপ-রাইটিং দ্বারা তিন খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হয়। একখানি লেখিকার নিকট থাকে। একখানি ইংলণ্ডে ও অপরখানি আমেরিকায় প্রকাশকের নিকট প্রেরিত হয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "গ্লাড্‌ষ্টোন" প্রবন্ধটিতে অনেক 'বাজে' কথার সঙ্গে কাজের কথাও আছে। "কংগ্রেস্ ও কন্‌ফারেন্স্" শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসের রচিত। লেখকের বক্তব্য কি, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মার "ধর্ম্মাত্মা গ্লাডষ্টোন" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত গ্লাডষ্টোন সম্বন্ধে বাঙ্গালা মাসিকে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই খবরের কাগজের 'কলম' হইতে আমদানী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিও তদ্রূপ। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি রায় এখনও "বিলাতে বড়দিন" লিখিতেছেন—তাঁহার স্বরচিত নূতন বঙ্গভাষায়। "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা"র মধ্য হইতে আমরা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "অময়ের যাত্রা" নামক স্নেহপূর্ণ রহস্যকবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম।

কোনমতে ভাঙা ঢোল করি আহরণ,
বলে,—'মোর হস্তে তোর নিশ্চয় নিধন।'
সন্ধ্যায় আহার-অন্তে, বীরমদে মাতি,
না হেরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী, মত্ত রণোন্মাদে,
অময়, লইয়া লাঠি, ফুলাইয়া ছাতি,
দ্বারে শত্রু অনুমানি করে মুষ্ট্যাঘাত।
খুকিরে গর্জ্জিয়া বলে,—'অরে দুরাত্মন!'
আচম্বিতে করপদ্ম দিয়া রক্তপাত।
ভীরু কন্যা বলে, 'দাদা, নাহি চাই রণ।'
উচ্চৈঃস্বরে সৈন্যগণ বীর-সহ কাঁদে।
ভয়ে শুষ্কমুখে বসে ভূমে জানু পাতি
গৃহিণী দিলেন আসি যা-কত অবাধে।
তথাপি নিস্তার নাই, ভূমে মারি লাথি,
ব্যথায় ফোঁপায় বাছা শুয়ে সারারাত।

এবার স্থানাভাবে অন্যান্য সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।



শ্রীযুক্তা স্বর্ণ কুমারী দেবী।

KUNTALINE PRE

কৌমার।

যৌবনোদ্গমে যৌনসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জীবমাত্রেই অতিমাত্র প্রবল। ব্যগ্রতা ও অধীরতা বিষয়ে ক্ষুৎপিপাসার অব্যবহিত নিম্নেই বোধ হয় এই দুর্দ্দমনীয়া প্রবৃত্তির স্থান। সঙ্গমকাল সমাগত হইলে, এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রায় সকল শ্রেণীর জীবেরই পুরুষেরা অধীর, উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত, ভীষণ হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জীব-জগতে উন্মত্ত চেষ্টা, নিদারুণ প্রতিযোগিতা ও মরণান্তক যুদ্ধের লোহিত প্রবাহ নিয়ত প্রবহমান। অতি শান্তপ্রকৃতি, নিরীহ, ভীরু জীবও তাহাদের সঙ্গম-ঋতুতে স্ত্রীলাভের জন্য মরিয়া হইয়া উঠে, এবং প্রাণান্তপণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করে। যে দুর্ব্বল, যে রুগ্ন, যে অন্য কোনরূপে অক্ষম, বা জীবনসংগ্রামের অনুপযোগী, তাহার ভাগ্যে কাজেই স্ত্রীলাভ ঘটে না, বা বহুবিলম্বে ঘটে; কিন্তু সক্ষম জীব ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌনসম্মিলনে বিরত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাণিজগতে, এক মনুষ্যজাতি ছাড়া আর কোথাও নাই।

ধর্ম্মবিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস, শারীরিক পবিত্রতা বিষয়ে ভ্রান্ত সংস্কার, এবং ইন্দ্রিয়জয় সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, অনেক সময়ে এবং অনেক দেশে, মনুষ্য, ধর্ম্ম বা দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া দাম্পত্যসম্বন্ধসংস্থাপনে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকিয়াছে, এবং এখনও থাকে বটে; কিন্তু প্রাপ্তযৌবনে বা তৎপূর্ব্বে দাম্পত্যসম্বন্ধসংস্থাপন করাই মনুষ্যজাতির সাধারণ ও সনাতন প্রথা।

কোন বিশেষ কারণ বা অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক না থাকিলে, অসভ্য মানব যৌনসম্মিলনে কখনও বিরত হয় না। অনেক স্থলে, ইচ্ছা না থাকিলেও, সমাজনিয়মে বাধ্য হইয়া বিবাহবন্ধন বাঁধিতে হয়। বলিতে কি, এমন অনেক জাতি ও সমাজ আছে, যাহাদের মধ্যে কেহ বিবাহ না করিলে, তাহাকে সমাজমধ্যে অপদস্থ, উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হয়। সমাজের এক জন বলিয়া তাহাকে কেহ গণ্য করে না, এবং সামাজিক কোন ব্যাপারে তাহার মতামতও গৃহীত হয় না। এমনও সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বিবাহিত পুরুষ, বয়োজ্যেষ্ঠ অবিবাহিত পুরুষের অকারণেও প্রকাশ্য অবমাননা ও লাঞ্ছনা করিবার অধিকারী, এবং

সেই লাঞ্ছিত পুরুষ কখনও সেই লাঞ্ছনার প্রতিবিধান বা প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না।

বচেল সাহেব বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বন্য মানব কখনও অবিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন করে না। মান্‌ভিঙ্গো জাতির মধ্যে কেইলিয়ে সাহেব এমন একটিও যুবতী স্ত্রীলোক দেখিতে পান নাই, যাহার বিবাহ হয় নাই—সুরূপাই কি, আর কুরূপাই কি, সকলেই পতিযুক্তা। বার্থ সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি অবিবাহিত শুনিয়া পশ্চিম প্রদেশবাসী তুয়ারগেরা ইহা তাঁহার বিশেষ দোষের কথা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল; প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যে অবিবাহিত থাকিতে পারে, এরূপ অসম্ভব ব্যাপার তাহাদের ধারণার অতীত। ডাকেটো জাতির সম্বন্ধে প্রেস্কট সাহেব লিখিয়াছেন,—"ইহাদের মধ্যে একটিও অবিবাহিত পুরুষ আমি দেখি নাই ও থাকার কথা শুনি নাই। তাহাদের এতটা আত্মসম্মান ও স্ত্রীজাতির সম্ভ্রমবোধ আছে যে, তাহারা কেহই অবিবাহিত থাকে না।" আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের অনেক স্ত্রীলোকের বিবেচনায়, কৌমার এবং মৃত্যু একই কথা। চারুয়া জাতির সম্বন্ধে আজারা সাহেব বলেন যে, দাম্পত্য-মিলনের আবশ্যকতা অনুভব করিলেই ইহারা অবিলম্বে বিবাহ করে। ইয়াগান জাতির পুরুষদিগের মধ্যে মূক ও অসমর্থ লোক ব্যতীত আর সকলেই বিবাহ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পতিবিহীন অবস্থায় থাকে না বলিলেই হয়—বৈধব্য ঘটিলেও কালবিলম্ব না করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে। অষ্ট্রেলিয়াতে সকল বালিকারই অতি অল্প বয়সে বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হইয়া যায়, এবং ইতিপূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে অবিবাহিত ষোড়শী কখনও দেখা যাইত না। ইউরোপীয় উপনিবেশসংস্থাপনের পর হইতে, ইহাদের এই চিরন্তন প্রথা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উত্তর কুইন্‌স্‌লণ্ডে নানা কারণে অনেক যুবা পুরুষকে বিবাহের জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হয় বটে, কিন্তু কেহই অবিবাহিত থাকে না—অগ্র পশ্চাৎ সকলেরই বিবাহ হয়। সাঁওতালদিগের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষ সমাজমধ্যে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই ঘৃণাস্পদ। তাহারা তাহাকে যে নামে অভিহিত করে, তাহার অর্থ—অমানুষ বা 'নামরদ', এবং সমাজে সে তস্করের প্রায় সমশ্রেণীস্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। কাফিরদিগের মধ্যে সামাজিক বা গার্হস্থ্য কোন ব্যাপারে অবিবাহিত পুরুষের কোন কথা চলে না। ত্রিপুরায় বিবাহ না করিলে কেহ গণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। ফিজিয়ানেরা এমনও বিশ্বাস করিত যে, পত্নীহীন অবস্থায়

হার মৃত্যু হয়, নাঙ্গানাঙ্গা নামক দেবতা তাহার স্বর্গগমনের পথ রোধ রেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অসভ্য মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও যৌনসম্মিলনে রত হয় না। এ কথা সাধারণতঃ সত্য হইলেও, এ নিয়মের ব্যতিক্রম- ল যে একেবারে নাই, এমন কথা বলা যায় না। এস্কিমো জাতির শাখা- বিশেষে এমন দুই দশটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা চিরকুমারী ইয়া পুরুষোচিত বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পক্ষান্তরে, ানিয়াগ্‌মুট, আলুট্‌ এবং উত্তর আমেরিকার আরও কোন কোন সম্প্রদায়ের ধ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন পুরুষকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বশ ধরাইয়া স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহারাও স্ত্রীজনোচিত বৃত্তি চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করে। কিন্তু এরূপ স্বাভাবিকতার স্থল এত বিরল যে, ধর্ত্তব্যের মধ্যে না গণিলেও চলে।

অসভ্য মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌনসম্মিলনে বিরত হয় না বটে, কিন্তু স্থল- বিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে জীবন বা জীবনের কিয়দংশ পত্নীহীন অবস্থায় াপন করিতে হয়। যেখানে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানে অনেক লোককে যে পত্নীহীন থাকিতে হইবে, ইহা ত পড়িয়াই আছে। যেখানে ল্য দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়, সেখানে যে মূল্যসংস্থানের জন্য অনেককে ীলাভের জন্য প্রাপ্তযৌবন হইয়াও অল্পাধিক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে, হা অবশ্যম্ভাবী। যে অন্ধ, যে মূক, যে অচিকিৎস্য-রোগগ্রস্ত, যে অঙ্গহীন, য বিকলেন্দ্রিয়, যে ক্লীব, তাহার বিবাহ হয় না, হওয়া উচিতও নহে। কিন্তু এ সকল কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নয় বলিয়া উল্লেখমাত্র করিয়া নিবৃত্ত হইলাম।

যে নিয়ম অসভ্য সমাজে, উচ্চ সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন সমাজেও সেই নিয়মই দেখা যায়। চীন দেশের বিবাহপ্রণালী দেখ। ডাক্তার গ্রে লিখি- াছেন,—"বলিষ্ঠ হউক, দুর্ব্বল হউক; সুরূপ হউক, কুরূপ হউক; বয়ঃপ্রাপ্ত ইলেই বিবাহ করিবার জন্য পিতামাতা কর্ত্তৃক পুত্র কন্যা আদিষ্ট হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বা কন্যার অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, পিতামাতা তাহা দেবনিগ্রহ বলিয়া মনে করেন। সেই জন্য, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ ইলে, অবিলম্বে বিবাহ দিবার জন্য পিতা মাতা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠেন। বিবাহটা এতই আবশ্যক যে, মৃতেরও বিবাহ হয়। যে সকল বালক বালিকার

অকালে মৃত্যু হয়, তাহাদেরও প্রেতাত্মার উদ্দেশে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।” কৌমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কি ভয়ঙ্কর আপত্তি, মনে কর দেখি!

কোরিয়া রাজ্যে অবিবাহিত পুরুষকে কেহ ‘মানুষ’ বলে না। যতই কেন বয়স হউক না, সেখানে অবিবাহিত পুরুষের অভিধান—‘ইয়াটো’। কথাটা চৈনিক। চীন ভাষায় ইহার অর্থ—অবিবাহযোগ্য কন্যা। পুরুষের সম্বন্ধে এ কথা ব্যবহৃত হওয়া কতটা অবজ্ঞাসূচক, মনে কর দেখি! শুদ্ধ তাহাই নহে—চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের বিবাহিত তরুণ, অবিবাহিত প্রবীণকে প্রকাশ্য-ভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, প্রহার পর্য্যন্ত করিলেও, সেই প্রবীণ বাক্যের দ্বারাও তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ নহে। পারস্য দেশে অকলঙ্কিত-চরিত্রা বিংশতিবর্ষবয়স্কা স্ত্রীলোককে কখনও কুমারী দেখা যায় না; অবিবাহিত প্রবীণ পুরুষও দুর্লভ। মিসর দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষ, সঙ্গত কারণ না দেখাইয়া অবিবাহিত থাকিলে, তাহাকে দুর্নামগ্রস্ত হইতে হয়। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানেরা বিবাহকে অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে।

আমাদের সমাজে, সন্ন্যাসী ব্যতীত আর সকলের পক্ষেই বিবাহ অবশ্য-করণীয়। শুধু কর্ত্তব্য নহে; ধর্ম্ম। ইহা কেবল বিধিবিহিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপায়ীভূত চুক্তি নহে; ইহা একটা সংস্কার—সর্ব্বপ্রধান সংস্কার; স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র সংস্কার। সুতরাং আমাদের সমাজে (ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরৎদিগকে ইহার মধ্যে ধরিতেছি না) কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই যে বিশেষ প্রতিবন্ধক ব্যতীত অবিবাহিত থাকে না, ইহা না বলিলেও চলে।

ইউরোপীয় সভ্যতার একটা ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইউরোপে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে; কেহ কেহ চিরজীবন থাকে। ইউরোপীয় সমাজতত্ত্বাধ্যায়ীরা সোদ্বেগে নির্দ্দেশ করিতেছেন যে,—এই প্রবৃত্তির বেগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; বিবাহের বয়সও বাড়িয়া যাইতেছে; জনসংখ্যার অনুপাতে অবিবাহিতের সংখ্যাও বাড়িতেছে। তবে নগর অঞ্চলে, এই বেগ যেরূপ প্রবল এবং ক্রমে প্রবলতর হইতেছে, পল্লী অঞ্চলে সেরূপ নহে। পল্লী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, এবং অবিবাহিতের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

পল্লী-সমাজে স্ত্রীলোক সংসারযাত্রার সাহায্যকারিণী। গৃহকার্য্য সকলই

তাহারা নিজে করে—রন্ধন, বয়ন, সীবন, সন্তানপালন, বস্ত্র ধৌত প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সকল কাজই তাহারা স্বহস্তে করে। এতদ্ব্যতীত কৃষি-ক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্য করে, গোমেষাদিপালনের ভার গ্রহণ করে, নদী হইতে মৎস্য ধরিয়া আনয়ন করে। ইউরোপেও পল্লীবাসিনীরা লক্ষ্মীরূপিণী। সেই জন্য তাহারা অবিবাহিতা প্রায় থাকে না, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই লোকের বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। সেই জন্যই রুষিয়ার শ্রমজীবিগণ পুত্রাদির বিবাহ, যত অল্প বয়সে পারে, দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করে। তাহাদের বিবাহও যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

নগরাঞ্চলেও বিবাহপরাঙ্মুখতা সঙ্গতিহীন অপেক্ষা সঙ্গতিশালী সমাজেই অধিক। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সহজেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ, ইউরোপীয়েরা অত্যধিক ব্যক্তিগত-স্বাধীনতাপ্রিয়; কোন প্রকার বন্ধনে বাঁধা পড়িতে তাহারা সহজে চাহে না। যে সকল স্থলে বিবাহটা বন্ধনমাত্র নহে, বরং জীবনযাত্রার প্রকৃত উপায়, সে সকল স্থলে বিবাহবিষয়ে যে লোক ব্যগ্র, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। যে স্থলে ইহা কেবল বন্ধন, সে স্থলে যে লোক বিবাহপরাঙ্মুখ হইবে, ইহা ত পড়িয়াই আছে। অনুবাদ ঠিক হয় না বটে, তথাপি ইউরোপে যাহাদিগকে ‘জেণ্টল্‌মেন্’ বলে, তাহাদিগকে আমরা এই প্রবন্ধে ভদ্রসমাজই না হয় বলিলাম। ইউরোপীয় ভদ্রসমাজের রমণীরা বড় বিলাসপরায়ণা—অন্ততঃ আমরা যাহাকে বিলাস বলিয়া মনে করি, তাহাদের তাহা প্রয়োজনীয়ের মধ্যে। ইহাদিগকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলে প্রায়শঃ সহধর্ম্মিণী, সংসারযাত্রার সঙ্গিনী, আনা হয় না; সহশায়িনী আনা হয় মাত্র। ইহারা প্রায়শঃ গৃহের লক্ষ্মী নহে; শয়নমন্দিরের অপ্সরো-মাত্র। ইহারা স্বামিগৃহে নবশোণিতসঞ্চার করে না, শোণিত শোষণ করে মাত্র। যাহারা পিতৃগৃহ হইতে যৌতুকস্বরূপ অর্থ লইয়া না আসে, তাহারা ভূতের বোঝা হইয়াই আসে। নূতনত্বের সঙ্গে সঙ্গে রূপ যৌবনের মোহ কাটিয়া যায়। তখন ভূতের বোঝাটা বড়ই ভারি বলিয়া বোধ হয়। তাই ইউরোপীয় সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে ইহার জন্য বড় কাতর হাহাকার শুনিতে পাওয়া যায়। ভূতের বোঝা ঘাড়ে করিবার পূর্ব্বে লোকে যে ইতস্ততঃ করিবে, দশ দিন বিবেচনা করিবে, দশ দিন বিলম্ব করিবে, হয় ত জন্মের মতন পিছাইয়া পড়িবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

আরও অনেক কারণ আছে। ইউরোপীয়েরা অনেকটা আত্ম-স্বাচ্ছন্দ্য-

কামী, আত্মসুখপ্রিয়। আপনি ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব, এতদন্বেষণ তাহাদের স্বভাব। অমন হিমপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে আত্মরক্ষার জন্য আত্মান্বেষী হইতেই হইবে—ইহা তাহাদের দোষ বলিতেছি না। সুতরাং ইহাদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহ অধিক ব্যয়সাধ্য। বিবাহ করিলে, স্ত্রীকে নিজের ও তাহার পদোপযোগী অবস্থায় রাখা আরও ব্যয়সাধ্য। তার পর, পুত্রকন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া আরও বহুব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং ইউরোপে দেখা যায় যে, উমেদারী (Courtship) শেষ করিয়াও এবং দত্তবাক্ হইয়াও স্ত্রী এবং পুরুষ অনেক দিন অবিবাহিত থাকে। এরূপ অবস্থায় থাকাই বিবেচকের কাজ। ইউরোপীয় 'ভদ্রসমাজের' বিবাহে যে অযথা বিলম্ব হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

আর একটা গুরুতর কথা আছে। পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়কেই আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিলে, বিবাহব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটিবেই। শিক্ষিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কি স্ত্রী, কি পুরুষ, আপনার মনের মতন একটা আদর্শ ঠিক করিয়া বসিয়া থাকে—বাঞ্ছনীয় সঙ্গিনী সম্বন্ধে, জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে, সংসার-সুখ সম্বন্ধে, একটা আদর্শ গড়িয়া বসিয়া থাকে। সংসারের হিসাবে, সে কল্পনার আদর্শটা প্রায়ই বড় উচ্চ হইয়া থাকে। উচ্চ আদর্শানুরূপ স্ত্রী বা পুরুষ পৃথিবীতে সুলভ নহে। কাজেই এরূপ সমাজে বিবাহ হইতে বহুবিলম্ব হয়—স্থলবিশেষে একেবারেই হয় না। ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল, ইউরোপ। আমাদের দেশেও যাহারা ইউরোপীয় জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বহু প্রাচীন কাল হইতে একটা সংস্কার মনুষ্যজাতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। সংস্কারটা এই যে, স্ত্রীপুরুষের শারীরিক মিলন, সুতরাং বিবাহপ্রথা, অপবিত্রতা ও কলুষতার আধার। এরূপ সংস্কার কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল, তাহার বিচারের এ স্থল নহে; কিন্তু সংস্কারটা যে মনুষ্যসমাজে বহুকাল আছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই সংস্কারবশেই বুদ্ধদেবের জন্ম স্বভাবাতিরিক্ত রূপে বিবৃত হয়। এই কারণেই যিশুখৃষ্টের গর্ভধারিণী কুমারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এখনও যে সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধেও বলা যায় যে, এই অস্বাভাবিক নিষেধ এই অতি প্রাচীন সংস্কারের ফলস্বরূপ। কেন না, তত্তৎ ধর্ম্মের আদিগুরুগণ জনসাধারণের জন্য

এমন কঠোর আজ্ঞা প্রদান করেন নাই। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়সেবা দুঃখের কারণ; অতএব ইন্দ্রিয়জয় করা কর্ত্তব্য। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা ধর্ম্মযাজক ও যাজিকাদের পক্ষে বিবাহ ব্যাপার একেবারেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যিশুখৃষ্ট স্বয়ং বহুবিবাহ পর্য্যন্ত কোথাও নিষেধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্য সেণ্ট্‌পল্ বিবাহকে 'অনিবার্য্য অমঙ্গল' বলিয়াই ধরিয়াছেন। তিনি করিন্থিয়ানদিগকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে,—"যে আপনার কুমারী কন্যাকে স্বামিসংযুক্তা করে, সে ভালই করে; কিন্তু যে না করে, সে আরও ভাল কাজ করে।" লোকে বলে, বাঁশের অপেক্ষা কঞ্চি দৃঢ় হয়। এই কথার ফলে, রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যে ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে বিবাহটা একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া জোর জবরদস্তি দ্বারা মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে গেলে যে বিষময় ফল ফলে, ইউরোপের 'মধ্যযুগে'র সন্ন্যাসিনী-আশ্রমের (Nunnery) বৃত্তান্তে তাহা নারকী উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে পাপচিত্র আঁকিবার প্রবৃত্তি নাই; প্রয়োজনও নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সেক্‌স্‌পীয়র।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সেক্‌স্‌পীয়র মানবতার কবি,—তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনাশক্তি।

মানবতা কি? এই প্রশ্নের আমরা এইরূপ উত্তর পাইয়াছি। মানবতা দেবত্ব ও পশুত্বের অদ্ভুত সমন্বয়, মানবের বিশাল সমগ্রতা; মানব-প্রকৃতি সপ্তকের প্রকাণ্ড সমষ্টি। এই মানবতার বিরাট চিত্র সেকস্‌পীয়রের কল্পনা-দর্পণে যথাযথ প্রতিভাত হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি মানবতার কবি।

এ কথা আমরা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সম্প্রতি এ কথাটা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেক্‌স্‌পীয়র যদি মানবতার কবি হয়েন, তবে তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনা-শক্তি। এই সিদ্ধান্তই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলীর আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, চরিত্র-চিত্রণে তিনি সিদ্ধহস্ত। বোধ হয়, জগতের কোন কবিই এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নহেন। চরিত্রাঙ্কনেই তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণ বিকাশ। সেকস্‌পীয়র কি ভাবে মানব-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন?

সেক্‌স্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে, প্রথমতঃ চমৎকৃত হইতে হয় তাঁহাদের সুসম্পূর্ণতায়। যেন তাঁহার কবিসৃষ্টি বিধিসৃষ্টির সমব্যাপক। কোন অংশ বিকৃত অপর্য্যাপ্ত অঙ্গহীন নহে। মানবতার পূর্ণ প্রতিকৃতি—মানুষের দেবত্ব ও পশুত্ব, তাহার ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, তাহার নীচতা ও উদারতা, তাহার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও অবসাদময় নৈরাশ্য, সর্ব্বোৎসর্গী আত্মত্যাগ ও আত্মম্ভরী স্বার্থপরতা, বিশ্ববিজয়ী প্রেম ও মোহান্ধ ইন্দ্রিয়পরতা, উন্মুক্ত সরলতা ও সংমোহন কাপট্য—সকলই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের কোন অংশ বাদ দেওয়া তিনি সঙ্গত ভাবেন নাই। সেই জন্য মানুষকে সকল অবস্থাতেই চিত্রিত করিয়াছেন—মানবের উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, ভাল মন্দ, সকল বৃত্তিরই ছবি ফুটাইয়াছেন।* তাঁহার চক্ষে কোনটিই পরিত্যাগের যোগ্য নহে। এমন কি, যে সকল বৃত্তি মানসিক ব্যাধি, দুর্ব্বলতা অথবা ব্যামোহের ফল, সেগুলিও সমান দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ইহাকেই চরিত্রাঙ্কনের সুসম্পূর্ণতা বলিতেছি।

আর চরিত্র-চিত্র সুসম্পূর্ণ বলিয়াই কোথাও সত্যের অপলাপ হয় নাই। এমন যথাযথ চিত্রণ অন্য কবির কাব্যে দুর্লভ। মানব-প্রকৃতি বাস্তবপক্ষে যেমন, সেকস্‌পীয়র তাহার ঠিক তেমনই ছাঁচ তুলিয়াছেন। কোথাও অতিরঞ্জিত বা বিকৃত বর্ণন করেন নাই। কোথাও একটি রেখারও সংযোগ বা বিয়োগ করেন নাই। তাঁহার লক্ষ্য স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন নহে। † দর্পণে যেমন মুখের অবিকল প্রতিবিম্ব পড়ে, তাঁহার নাটকে সেইরূপ মানব-প্রকৃতির যথাযথ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। মনুষ্য-

* He finds in man nothing that he would care to lop off. He accepts nature & finds it beautiful in its entirety. He paints it in its littlenesses its deformities, weaknesses, its excesses, its irregularities & in its rages. He exhibits man at his meals, in bed, at play, drunk mad, and sick.

Taine's English Literature, Vol I. Shakespere.

† He sees things as they are with their ugly & beautiful details by imitative sympathy.

জীবনের কোন ব্যাপারই, কোন ঘটনাই, ছাঁটিয়া ফেলিবার যোগ্য নহে। জীবনে ঠিক যেমন ভাবে ঘটে, ভাল হউক মন্দ হউক, শ্লীল হউক অশ্লীল হউক, উচ্চ হউক নীচ হউক, সেই ভাবেই তাঁহার নাটকে চিত্রিত দেখি। অতএব তাঁহার চরিত্রচিত্রণ যে সত্যনিষ্ঠ যথাযথ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আর যথাযথ বলিয়াই সে চিত্র সর্ব্বত্র সুসঙ্গত। চরিত্রের অসঙ্গতি অমিল অস্বাভাবিকতা, সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে কোথাও লক্ষিত হয় না। যাহার মুখে যে কথা সাজে না, সেকস্‌পীয়র কখন তাহাকে সে কথা বলান না। যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্ভবে না, সেকস্‌পীয়র কখন তাহাকে সে কার্য্য করান না। প্রত্যেক চরিত্রের যাহা বীজশক্তি—যে শক্তির বশে প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চেষ্টা নিয়মিত হয়, কল্পনা ধ্যান দ্বারা সেকস্‌পীয়র সেই শক্তির ধারণা করিয়া লয়েন, এবং তাহা হইতে প্রতি কথা, প্রতি কার্য্য, প্রতি চেষ্টার কার্য্য-কারণ-ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকল বাস্তব নরনারীর ন্যায় সর্ব্বত্র সুসঙ্গত। কবি মধুসূদন বীররসের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের মুখে—

'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে;
যুদ্ধসাধ তখনি ত্যজিনু * *
মূর্খ যে ঘাঁটায় সখে হেন বাঘিনীরে।'

ইত্যাদি বাক্য বসাইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস ব্রীড়াময়ী জানকীকে নরপুরুষের প্রেম-ভিক্ষার্থিনী শূর্পণখার লজ্জাহীনতায় হাসাইয়াছেন। সেকস্‌পীয়রে আমরা কখন এরূপ অসঙ্গতি দেখিতে পাইব না। যে যেমনটি, সেকস্‌পীয়র তাহাকে ঠিক সেই মত কথা বলান, সেইমত কার্য্য করান, সেইমত চেষ্টায় নিযুক্ত করেন। সেকস্‌পীয়রের নাটকে যে সকল অশ্লীলতা গ্রাম্যতা অশিষ্টতার সমাবেশ দেখিতে পাই, বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সে সমস্তই চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষার নিমিত্ত।

সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক জারভাইনস এ বিষয়ে লিখিয়াছেন, 'লোকে যাহাকে

* Numbers of the errors of taste in Shakespere have turned out to be striking touches of character; the esthetic deformities imputed to his poetry have proved the moral deformities of certain of his persons; and what had been denounced as a fault was found to be an excellance—

Gervinus.

রুচিভঙ্গের উদাহরণ ভাবিত, অধুনা তদ্দ্বারাই সেক্ষপীয়রের চরিত্র-চিত্রণের অদ্ভুত কারিগরি সপ্রমাণ হইয়াছে। যাহা তাঁহার কাব্যের অঙ্গবিকৃতি বিবেচিত হইত, তাহাই তৎসৃষ্ট চরিত্রবিশেষের সুসঙ্গত নৈতিক বিকার সাব্যস্ত হইয়াছে। আর যাহা দোষ বলিয়া নিন্দিত হইত, তাহা সম্প্রতি গুণে পরিণত হইয়াছে।'

সেকস্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রাবলীর আর একটি বিশেষত্ব, তাহাদের বৈচিত্র্য। জগতের কোন কবিই বোধ হয় এত প্রকারের চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এক বিধিসৃষ্টি ভিন্ন আর কোথাও এত বিবিধ বিচিত্রতা নাই। কালিদাসের দুষ্মন্ত, পুরুরবা, অগ্নিমিত্র, একই ধরণের নায়ক। মিলটনের সয়তানে যে সুর, স্যাম্পসনে তাহার প্রতিধ্বনিমাত্র। বাইরণের ম্যানফ্রেড, করসেয়ার, লারা, জিয়র, একই ধাতুর লোক। অথচ সেকস্‌পীয়র শত শত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটি এক প্রকৃতির ব্যক্তি নহে। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও সকলেরই নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে। এ বিষয়ে সেকস্‌পীয়রের কতটা কৃতিত্ব, মানব-চরিত্র বিষয়ে তাঁহার কিরূপ সূক্ষ্ম ভেদজ্ঞান, তাহার উত্তম প্রমাণ পাই 'কিং লিয়রে'। যাঁহারা সেকস্‌পীয়রের এই মহানাটক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, একই প্রকৃতি ও অবস্থাপন্ন লিয়র ও গ্লষ্টরকে তিনি কেমন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; একই প্রলয়ংকরী বিনাশশক্তির আধার গণারিল ও রিগন ভগিনীদ্বয়কে কেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন; আর একই পিতৃপ্রেমের অধিকারী করডিলিয়া ও এডগারকে সমান ভাবে নির্য্যাতনগ্রস্ত করিয়াও কেমন বিচিত্রভাবে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র দেখা যায়। অন্য কবিরা স্বজাতীয় চরিত্রকে সমান করেন; সেকস্‌পীয়র একাধারে সমজাতীয়তা ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করেন। মারকিন সমালোচক হাড্‌সন্ যথার্থই বলিয়াছেন,—'সেকস্‌পীয়রের চরিত্রসৃষ্টিতে পুনরুক্তি দোষ নাই। স্বজাতীয় চরিত্রের মধ্যে সমানতা আছে বটে; কিন্তু কোন দুইটি চরিত্রই অস্বতন্ত্র নহে। প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে।'

ব্যক্তিগত চরিত্র-চিত্রণ-বিষয়ে যাহা বলা হইল, চিত্তগত ভাব-সমূহের

* There is no repetition among them; though there are some striking family resemblances, yet no two of them are individually alike.
Hudson vol. I 167.

সঙ্কন-বিষয়েও ঐ কথাই বলা যায়। একই ভাব—প্রেম, হিংসা, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতির সূক্ষ্ম প্রভেদ তিনি এমন দক্ষতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে প্রদর্শিত করিয়াছেন, যে তাহার আলোচনায় বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না। দেস্‌দিমোনার প্রতি ওথেলোর অবিশ্বাস, ইমোজেনের প্রতি পস্থুমাসের অবিশ্বাস, এবং হারমিয়োনির প্রতি লিয়নটিসের অবিশ্বাস—এ তিনে কত প্রভেদ! ম্যাকবেথের লোভ, তৃতীয় রিচার্ডের লোভ ও ইয়াগোর লোভ কত বিভিন্ন! রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়, ফার্ডিনন্দ মিরান্দার প্রণয়, ফ্লারিজেল পরদিতার প্রণয়, এবং ব্রুটস পোরসিয়ার প্রণয় এক হইয়াও কত অন্য। এইরূপ অন্যান্য বৃত্তির সম্বন্ধেও দেখা যায়।

কোন একটি চিত্র তুলিতে ফুটাইতে হইলে, প্রথমে তাহার বিষয় হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে হয়। তবে সেই চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। সেকস্‌পীয়রের চিত্রফলকে আমরা যেরূপ উদ্ভাসিত চিত্রসমূহের সাক্ষাৎ পাই, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি সেই বিবিধ চিত্রের প্রতিরূপ হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যাঁহার চিত্তে এত বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ভাব, নিরুদ্বেগে একত্র বসতি করিতে পারিত, তাঁহার কি বিপুল অপক্ষপাতিতা! কি অপরিসীম উদারতা! (The perfect even handedness of Shakespere's representations) 'কেলিবন ও টিটেনিয়া এবং মিরন্দা; বটম ও থিসিয়ুস এবং প্রসপেরো; পেরোলিস ও হটসপার এবং পঞ্চম হেনেরি; ডোল টিয়ার শিট ও ইসাবেলা; মিসেস্ কুইকলি ও ভলামনিয়া;—সকলই এক কল্পনা-প্রসূত।' * সর্ব্বত্র সমান আত্মীয়তা, সমান ধীর স্থির প্রশান্ত ভাব! কেহই তাঁহার সহানুভূতির সীমার বহির্ভূত নহে। এডমণ্ড ও ইয়াগোও বোধ হয় নহে। আর্য্যঋষিরা যাহাকে উপেক্ষা বলিতেন, ইংরাজিতে Tolerance শব্দে তাহার কতকটা আভাষ দেওয়া যায়, মহাকবি সেকস্‌পীয়রের তাহা স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সেই জন্য যাহাকে নৈতিক কঠোরতা—অসহিষ্ণুতা বলে, সেকস্‌পীয়রে তাহার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরাজ সমালোচক হ্যাজলিট †

* With all natures he is kin. From Caliban to Titania Miranda; from Bottom to Theseus Prospero; from Parolles to Hotspur Henry; from Doll Tearsheet to Isabella; Mrs Quickley to Volumnia, he ranges with equal power at will—Furnival.

† Shakespere was the least moral of all writers; for, morality commonly so called is made up of antipathies; and his talent consisted

ঠিকই বলিয়াছেন,—'লেখকদিগের মধ্যে সেকসপীয়র সর্ব্বাপেক্ষা কমনীতি-শালী। কারণ, যাহাকে নৈতিকতা বলা যায়, তাহা অসহিষ্ণুতার নামান্তর। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা মানব প্রকৃতির সহিত সর্ব্বত্র সহানুভূতিযুক্ত—উচ্চ নীচ উত্তম অধম সকল অবস্থায় সহিষ্ণু।' সেকসপীয়র জানিতেন যে, কেহই নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা মন্দ নহে। সকলেই দোষ গুণ, উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে।

তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

The web of our life is of a mingled yarn ; our virtues would be proud if our vices whipped them not ; and our faults would despair if they were not cherished by our virtues.

আমাদের জীবনপট বিমিশ্রসূত্রগ্রথিত। আমাদের গুণভাগ দোষাহত বলিয়াই গর্ব্বান্ধ হইতে পায় না। আমাদের দোষভাগও গুণপুষ্ট বলিয়াই নিরাশার বশবর্ত্তী হয় না।

সেই জন্য সেক্‌স্‌পীয়র অতি বড় পাপিষ্ঠের প্রকৃতিতেও একটুক সদ্‌গুণের সৌরভ মিশাইয়াছেন। তাঁহার ইয়াগো ফলসট্যাফ্ ক্লিওপেটরা দানব দানবী নহে—একবারে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নহে। তাঁহার হ্যামলেট প্রসপেরো ইমোজেন নিখুঁত দেবত্বের অবতার নহে,—সম্পূর্ণ মানবতার অতীত নহে। অধিকাংশ কবির অবলম্বিত প্রণালী ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহারা হয় দেবের না হয় দানবের সৃষ্টি করেন। নরনারী গড়িতে পারেন না।

সেক্‌স্‌পীয়রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মারলোর সৃষ্ট ব্যারাবাস বা ট্যামারলেন নিরবচ্ছিন্ন দানব। অন্য দিকে রিচার্ডসন প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট পেমিলা বা গ্রাণ্ডিসন সম্পূর্ণতঃ দেব ; ইহাদিগের মধ্যে কেহই মানুষ নহে। দেবত্ব ও পশুত্বের যে দৈব রাসায়নিক সংযোগে মনুষ্যত্ব—সে মনুষ্যত্ব এ সকল চরিত্রে নাই। সেই জন্য ইহাদিগকে অস্বাভাবিক অপ্রকৃত মনে হয়। ইহারা যেন মাটীর প্রতিমা, অথবা প্রস্তরমূর্ত্তি। রক্তমাংসে গঠিতদেহ মানুষ মানুষী নহে। এক কথায় ইহারা নির্জ্জীব।

সেক্‌স্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রসমূহের এক অদ্বিতীয় লক্ষণ, তাহাদের সজীবতা। তাহারা প্রাণময় জীবন্ত নরনারী। মাটীর প্রতিমা বা প্রস্তর মূর্ত্তি নহে। তাহারা এতই সজীব যে, মনে হয় যেন তাহাদের শরীর বিদ্ধ করিলে রক্ত

in sympathy with human nature in all its shapes degrees, elevations depressions :— Haz litt, English stage.

পাত হইবে। * অন্য কবিরা কোন একটি ভাব বা চিত্তবৃত্তিকে মানুষের মুখস পরাইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করান ; প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদের মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তাহারা বাস্তব নরনারী নহে ; নরনারীর ছবিমাত্র। অর্থাৎ, ঐ সকল চরিত্র কাম, ক্রোধ, লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষা বা প্রতিহিংসার সাকার মূর্ত্তি—সজীব প্রাণশালী মানুষ নহে। মারলো কবির 'ব্যারাবাস' সুধুই লোভের উপাদানে গঠিত ; তাহার প্রকৃতিতে অন্য মনুষ্যবৃত্তি নাই। তাঁহার টেমারলেন নিরবচ্ছিন্ন দুরাকাঙ্ক্ষার অবতার ; তাহার নির্ম্মাণে অন্য মাটির সমাবেশ নাই। বেন জনসনের বোবাডিল কেবল দেহধারী মূঢ়তা ; তাহার গঠনে অন্য দোষ গুণ নাই। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে ঐ জাতীয় যে সকল চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাহাদের তুলনায় ইহারা কৃত্রিম মানুষ, রক্তমাংসগঠিত নহে। সাইলক ও ব্যারাবাসে কত প্রভেদ! ক্লোটন ও বোবাডিলে কত অন্তর! ট্যামারলেন ও তৃতীয় রিচার্ডে কত ব্যবধান! একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। সেক্‌স্‌পীয়র চরিত্রের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভিতর হইতে গড়িয়া তুলেন। মারলো প্রভৃতি কবির প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করেন না ; বাহ্য আকার মানুষের মত করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। সেই জন্য তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্র অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট নহে। তাহাদের ভিতর খড় মাটি বা ভূষিতে পূর্ণ, এবং বাহিরটা মনুষ্যচর্ম্মাবৃত। এক কথায় সেক্‌স্‌পীয়র চরিত্রের মূলতত্ত্ব—বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। অন্য কবির অবলম্বন একটি অস্থায়ী ভাব, চেষ্টা, বা চিত্তবৃত্তি। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, সেক্‌স্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রে একটা বিপুলতা, একটা বিচিত্রতা, একটা হ্রাস বৃদ্ধি জোয়ার ভাঁটার ভাব আছে। তাহারা স্থিতিশীল, অথচ পরিণামী। তাহারা স্থির, অথচ চলিষ্ণু। তাহাদের পরিচয়ে মনে হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের একটা ভূত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তি আছে। তাহারা বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ নহে। †

* 'If you prick them, they well bleed'
It would see in man not a general passion—ambition anger or love ; not a pure quality happinessavarice folly, but a character.—Taine.

† There is a certain vital limberness and ductility in them. Thus they have to our minds a past & a present and even in what we see of them at any given moment there is involed some thing both of history and prophecy,—Hudson.

সেকস্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রের সজীবতার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, জীবন্ত নরনারীর ন্যায় তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট মতান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন চরিতাখ্যায়ক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও মতে তিনি নরদেব; কাহারও মতে তিনি শোণিতলোলুপ পিশাচ; আর কাহারও মতে তিনি ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয়। এরূপ মতভেদ হইবার কারণ এই যে, সমগ্র নেপোলিয়নকে আমরা কেহই দেখিতে পাই না। নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও শিক্ষা অনুসারে এক জন এক দেশ, অপর জন অন্য দেশ দেখি। সেই জন্য দর্শকের মধ্যে এত মতভেদ হয়। সেক্‌স্‌পীয়র্‌-সৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দেখা যায়। এক হ্যামলেটের চরিত্র ধরুন। কোন সমালোচকের মত,—তিনি দারুণ পাষণ্ড। কেহ বা তাঁহাকে দেবত্বের এক রতি হ্রস্ব ভাবেন। কাহারও বিবেচনায় তিনি প্রতিকূল ঘটনা-স্রোতে ভাসমান, ইচ্ছাশক্তিহীন, দুর্ব্বল তৃণ। আর কেহ বা তাঁহাকে পুরুষকার ও ইচ্ছাশক্তির অবতার বিবেচনা করিয়াছেন। এরূপ মতভেদের একমাত্র কারণ, হ্যামলেট চরিত্রের সজীবতা। অন্য কবির রচিত চরিত্র সম্বন্ধে ত এরূপ হয় না। ব্যারাবাসকে সকলেই একবাক্যে সঞ্চয়স্পৃহার প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করেন। বোবাডিলে সকলেই মূঢ়তার চিত্র অঙ্কিত দেখেন। টেমারলেনে সকলেই দুরাকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ দেখিতে পান। জগতের নর-নারীর ন্যায় সেকস্‌পীয়রের অধিকাংশ চরিত্রই জটিল—কয়েকটি চরিত্র একবারেই গহন। হ্যামলেট ক্লিয়োপেটরা ফলষ্ট্যাফ্‌ প্রভৃতির রহস্যোদ্ভেদ অতীব দুঃসাধ্য। এরূপ বুঝিবেন না যে, সেকস্‌পীয়রের কোন চরিত্রেরই তথ্য নির্ণয় করা যায় না। জগতে যেমন অনেক নরনারীর চরিত্রবৃত্তান্ত তাহাদের বদনে অঙ্কিত থাকে, যে দেখে, সেই বুঝিতে পারে; সেকস্‌পীয়রেও সেইরূপ নরনারীর অসদ্ভাব নাই। আবার জগতে যেমন অনেক মনুষ্য আছে, যাহাদের জীবনসমস্যার নির্ণয় করা অতি সুকঠিন ব্যাপার; সেকস্‌পীয়রেও সেইরূপ আছে। এরূপ থাকিবার কারণ, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের সজীবতা।

সেক্‌স্‌পীয়র কি ভাবে মানবচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা তাহার কতকাংশের পরিচয় পাইলাম। আমরা দেখিলাম (১) তাঁহার চিত্র সুসম্পূর্ণ; বিকৃত অপর্য্যাপ্ত, বা অঙ্গহীন নহে। (২) তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ সত্যনিষ্ঠ, যথাযথ। (৩) এবং সর্ব্বত্র সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক। (৪) তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলী বিবিধ বিচিত্রতায় পূর্ণ (৫) এবং তাহার চিত্রণে আমরা মানব-চরিত্র বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্মভেদজ্ঞানের পরিচয় পাই। (৬) সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদার অপক্ষপাতিতা এবং অপরিসীম উপেক্ষাভাবে বিস্মিত হইতে হয়। (৭) এবং ধারণা হয় যে, তাঁহাতে অসহিষ্ণুতা বা নৈতিক কঠোরতার লেশমাত্র নাই। তিনি সর্ব্বত্র সমান সহানুভূতিশালী। (৮) তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহ প্রাণময় জীবন্ত নরনারী, এক কথায় তাহারা সজীব মনুষ্য। (৯) তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করেন—চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলেন। (১০) সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে একটা বিচিত্রতা একটা বিপুলতা একটা হ্রাস বৃদ্ধির ভাব আছে। তাহারা বর্ত্তমানে সীমান্বিত নহে; তাহাদের জীবনের একটা ভূত ইতিহাস ও ভাবী পরিসমাপ্তি আছে। সেকসপীয়র-কৃত চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে উপরে যে সকল সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার যাথার্থ্য অনুভব করিবার জন্য তাঁহার নাটকাবলীর পুনঃ পুনঃ আলোচনা আবশ্যক। তাহা করিলে ঐ সূত্রগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। প্রবন্ধান্তরে আমি কয়েকটি চরিত্রের সবিস্তারে বিশ্লেষ করিয়া ঐ সূত্রসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। তখন বোধ হয় সেকস্‌পীয়রকে 'মানবতার কবি' বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তিনি কোন্ প্রতিভাবলে, কি অমানুষীশক্তিপ্রভাবে মানবতার বিরাট ভাব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং মানবতার বিপুল চিত্র তাঁহার নাটকে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

রাজা বীরবল।

অদ্য এখানে যাঁহার প্রসঙ্গ করিতেছি, তিনি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার পাঁচটি নাম আমাদের পরিজ্ঞাত। যথা,—(ক) বীরবল; (খ) বীরবর; (গ) মহেশ দাস; * (ঘ) ব্রাহ্মণ দাস; † (ঙ) কব-রায়।

প্রথম ও দ্বিতীয়টি, প্রকৃতপ্রস্তাবে নাম নয়। উহারা তাঁহার শারীরিক বল-বিক্রমপ্রকাশক ও গুণদ্যোতক সংজ্ঞা—বিশেষণমাত্র। এক প্রকার উপাধি

* "মাসির" এই আখ্যার প্রচারকর্ত্তা।

† ঐতিহাসিক বদাওনী, উক্ত নামে তাঁহাকে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।

বলিয়া বুঝিলেও চলিতে পারে। "বীরবর" অর্থে শূর-শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকেই "বীরবল" অভিধানে সম্বোধন করা যায়, যিনি বীর-বৎ বলবান্—গুণবান্। আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, "বীরবর" এবং "বীরবল" একার্থদ্যোতকও বটে।

সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণিক নিয়মানুসারে "র" এবং "ল"—আর "ড়" (ড) এবং "ল" অভিন্নার্থ, একই। * বিশদীকৃত করি।

১। "রোম"; ২। "লোম"; ৩। "ঈড়ে"; ৪। "ঈলে"।

তৃতীয় নামই, তাঁহার যথার্থ নাম। চতুর্থ সংজ্ঞা, ভক্তি ও বিনয়ের পরিচয় করিয়া দেয়। পঞ্চম বা সর্ব্বশেষ আখ্যার বিষয়, এই প্রবন্ধের উপযুক্ত স্থানে বিবৃত হইবে।

যখন যে নাম উপযোগী ও সুবিধাজনক বোধ করিব, সেই নামেই আমাদের নায়ক উল্লিখিত হইবেন।

এতক্ষণে প্রকৃত ইতিবৃত্তে উপনীত হইতেছি। দেখা যাউক, তিনি কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিপ্র-বংশে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মহোচ্চ—মহোন্নত—শাখা, তিনি সমলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। বীরবল, দ্বিজ না হউন, "দ্বিজবন্ধু" † বটেন। "দ্বিজবন্ধু" অর্থে ভূদেব-বন্ধু—ব্রাহ্মণের বান্ধব নয়। "দ্বিজবন্ধু" পারিভাষিক শব্দ। উহার অর্থ—পাতিত্যদোষ-কলুষিত নিম্ন স্তরের ভুসুর। "ভাট"-সম্প্রদায়ী পতিত ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার উৎপত্তি হয়।

ভাটগণ, মধ্য যুগের পুরাবৃত্তবেত্তা। তাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতকারক ঐতিহাসিক। রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, প্রধান রাজকর্ম্মচারী, অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত বংশ, কিংবা ভদ্রমহাশয়গণের সঙ্গীত—তান, মান, সুর লয়ে—স্তুতিগীত করাই, ঐ সম্প্রদায়ের লোকের উপজীবিকা। এই জন্য তাঁহারা তেমন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ নহেন।

কবিতায় বা গীতিকায় গুণবান্ জনগণের যশঃকীর্ত্তন, তাঁহাদের প্রধান

* "ড-লয়োর-লয়োরভেদঃ"।

† "দ্বিজবন্ধুগণ" "শ্রুতির" শ্রবণ, পঠন ও পাঠনে বঞ্চিত। ঐ মহোচ্চ অধিকার তাঁহাদের নাই। প্রমাণ,—

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
তদর্থং ভারতঞ্চক্রে কৃপয়া পরয়া মুনিঃ॥"—ভাগবত।

র্য্য। অদ্যাপি বঙ্গদেশেও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা, ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ বিবৃত অবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহাদের উচ্ছেদ হয় নাই।

কাল্পী তাঁহার জন্মস্থান। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের শেষ সীমায় ঝান্সী। ান্সীর সীমাসান্নিধ্যে 'কাল্পীর' অবস্থানভূমি।

মহেশ দাসের শৈশবজীবনী, আর দারিদ্র্যকাহিনী—অভিন্ন পদার্থ। কের বর্ণনার অভ্যন্তরে অপরটি নিহিত—লুক্কায়িত। কিন্তু আবাল্য বুদ্ধি াহার চিরসহচরী। শৈশবের মুখচ্ছবি, মতিমত্তার মহান্ সাক্ষী। অনুভব-ক্তি প্রথম বয়স হইতে অতি প্রখরা,—নিরতিশয় যুক্তিমতী।

অক্‌বরের রাজত্বের প্রথম ভাগেই—সম্রাটের দরবারে ব্রাহ্মণ দাসের থমাগমন। * স্বল্প সময়ের ভিতরেই গুণগ্রাহীরা তাঁহাকে চিনিয়া লেন। তিনি না কি ঈশ্বরানুগৃহীত ছিলেন। তাই, প্রকৃতিপ্রাপ্ত বংপ্রদত্ত কতিপয় সদ্‌গুণে তিনি প্রথমাবধি বিভূষিত হইয়াছিলেন। রিহাসপটুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সঙ্গীতের সুন্দর সুরে সুশোভন স্তুতিগীতির বৃত্তি প্রভৃতি সুকোমল সুকুমার বিবিধ গুণের জন্য তাঁহাকে লোকে আদর রিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। নৈসর্গিক সামর্থ্যের এমনই মাহাত্ম্য—ই মহত্ত্ব ও গুরুত্ব! তাহা না হইলে কি অপরিচিত-কুলশীল, অজ্ঞাতনামা ক এত অল্প দিনেই উচ্চ হইতে নীচ—তাবৎ শ্রেণীর—লোকের প্রশংসাভাজন প্রিয়পাত্র হইতে পারে? তাঁহার হিন্দী কবিতাও সর্ব্বসম্প্রদায়সমাদৃতা। র্থ গুণবানের নিকট মহা গুণাবলীর পুরস্কার আছে। মহাসন্তুষ্ট সম্রাট্, এত-নর পর তাঁহাকে "কব-রায়" উপনাম উপহার দিলেন। বস্তুতঃ, ধন-রত্ন পেক্ষা এই উপহারের মূল্য অধিক। "কবরায়" অর্থে 'রাজ-কবি'। তিনি দুজাতীয়—সুতরাং বীরবল, রাজকবি হইলেন। †

সম্রাটের এতাদৃশ শ্রেণীর হিন্দু কর্ম্মচারী অনেকে ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা তান্ত স্বল্প নয়। প্রসঙ্গক্রমে একটি দৃষ্টান্ত দিবার কৌতূহল জন্মিল। কবরের অনুগ্রহে "জোতিক রায়" রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিশারদ, এই মহনীয় াধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনিও হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি।

* বদাওনী।

† এ পর্য্যন্ত অক্‌বরের দুইটি "রাজকবি" আমাদের সমীপে সমুপনীত হইলেন,—
(ক) ভৈজি। তিনি মুসলমান। অতএব তাঁহাকে মুসলমান "রাজকবি" এই ায় আহ্বান করিতে হইবে। "মালিক উচুয়ারা", অপর উপাধি;—অর্থ—"কবীন্দ্র"।
(খ) অপর রাজকবি হিন্দু বীরবল।

কব-রায়, বাদশাহের বড়ই বিশ্বস্ত বান্ধব। তিনি "রাজকবি" এবং "রাজ-দূত"। উভয়ের কার্য্যই, পরম-পূত। বিশ্বস্ত না হইলে, অন্যের উপর উল্লিখিত শেষোক্ত গুরুভার সমর্পণ করা যায় না। তাঁহার সংসর্গ, সম্রাটের পরিতৃপ্তির আধার। বীরবরের নৈসর্গিক গুণে অকবর চির-আকৃষ্ট। কব-রায়, অকবরের নিত্য সঙ্গী, চিরানুচর, সদাসহচর ও একান্ত অনুগত সখা। তদীয় সাহায্য ও বুদ্ধির সাহায্য, সম্রাটের সকল কালেই গ্রাহ্য—শিরোধার্য্য।

বীরবর নগরকোট, জায়গীর স্বরূপ, সম্রাটের সকাশ হইতে সাদর উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বদাওনী, সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, বীরবরের জন্যই এই অনার্য্য কার্য্যের অভিনয়। এটি অকবরের অষ্টাদশ-বর্ষীয় বিষয়সংক্রান্ত ঘটনা। * অতঃপর তিনি "রাজা" এই বাঞ্ছনীয় উপাধিতে শোভিত হয়েন। এখন হইতে তিনি "রাজা" উপনাম সহ একতম প্রকৃত নামে আহূত হইবেন।

অকবর কর্ত্তৃক জয়চাঁদের অবরোধসংবাদ, "নগরকোটে" পৌঁছিলে, জয়চাঁদের অপত্য বুধচাঁদ † প্রভূত প্রযত্ন ও অশেষ আয়াসে রাজা বীরবলকে বন্দী করিলেন। তাঁহার ধারণা ও প্রতীতি জন্মিয়াছিল, পিতা চিরকারাবাসেই সংসার হইতে অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই বিদ্রোহিতার মূলীভূত হেতু। বীর পিতার উপযুক্ত পুত্র—বীরসন্তান বুধচাঁদ বটেন। জয়চাঁদ, পুত্রের বীরোচিত কার্য্যে মহোল্লাস প্রকাশ করিতে না পারুন, মনে মনে বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ প্রয়াসেও উহা সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন কি না, জানি না।

রাজন্যমণ্ডলে ও শূরসমাজে বুধচাঁদের বীরত্বের বিজয়ভেরী, শ্রবণভেদী রবে বাজিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মান ও সমাদরের ধুমধাম পড়িয়া গেল।

* মতান্তরে উহা সপ্তদশ রাজ্যাব্দের ঘটনা। নগরকোট-রাজ জয়চাঁদকে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে রাজদরবারে বিদ্যমান থাকিতে হইয়াছিল। দৈবগতিকে সম্রাট তাঁহার উপর বিরক্ত হয়েন। তাঁহার ক্রোধে একের সর্ব্বনাশ, অপরের মহোল্লাস। বড়লোকের কোপে সময়ে কত শত লোকেই উপকৃত হইয়া থাকেন। জয়চাঁদ, কারাক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। এ দিকে বীরবলের অদৃষ্টে জায়গীর-প্রাপ্তি ঘটিল।

† ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে নামটির বর্ণযোজনায় বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। বোধীচাঁদ, বদীচাঁদ ও বুধচাঁদ,—তিন প্রকারের বানানে নানা লোকে মতবৈষম্য প্রকটিত করিয়াছেন। মূলে যে নামের প্রসঙ্গ করিলাম, তাহার প্রামাণিকতায় আপত্তি বা অসম্মতির কারণ নাই।

বীরবর, বুধচাঁদের ষড়যন্ত্রে অবরুদ্ধ,—এই সমাচার, রাজদরবারে সম্রাটের গোচর হইবামাত্র, তদবস্থায় প্রতীকারার্থ হুসেন কুলী খাঁর উপর বীরবরের বিজয়-লক্ষ্মী পুনরায়ত্ত করিবার আদেশ হইল। ইব্রাহিম কুলী খাঁর আক্রমণে হোসেন কুলী খাঁ নগরাবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, সুতরাং বীরবলকে জায়গীরের অধিকারে হতাশ হইতে হইল।

পত্তন ও আহমদাবাদ আক্রমণার্থ ৯৮১ হিজরা ২৪শে রবিয়াল (২য়) তারিখে রাজা বীরবল সম্রাটের সমভিব্যাহারী হইলেন।

রাজা বীরবলের বীরত্বের এক নিদর্শন দিবার অভিলাষ হইতেছে। চারি হাজার পাঁচ শত অশ্বাধ্যক্ষ জৈনযাও, যখন ইসুফজৈইস্‌গণকে দমন করা অসম্ভব মনে করিয়া, একদা অতিরিক্ত সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন, অকবর, সে বার প্রিয়বন্ধু বীরবরকে ও হাকিম আবদুল ফৈতের সঙ্গে কতিপয় সেনা দ্বারা অভিযানানুকূল্যের জন্য প্রেরণ করেন। জয়শ্রীও তাঁহাদের আবির্ভাবে শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজদৌত্যই, তাঁহার প্রধান নিত্যকৃত্য। অকবরের একবিংশ রাজ্যাব্দের রায়লনকরণের সঙ্গে তিনি একবার দূনগরপুরে প্রেরিত হয়েন। ঐ যাত্রার উদ্দেশ্য—রায়লনকরণের কন্যাকে অকবরের অন্তঃপুরে আনয়ন। ঐ অব্দেই বীরবল ও জৈন কোকা, রাজা রায়চাঁদকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। কোন্ সময় যে তাঁহাকে সম্রাটের প্রয়োজন হইবে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। সেই নিমিত্ত রাজদরবারে বীরবলের সান্নিধ্য প্রায় সর্ব্বদা আবশ্যক হইত। তবে মধ্যে মধ্যে অন্দর বাহিরেও তাঁহাকে গতিবিধি না করিতে হইত, এমন নয়। তিনি অবারিতদ্বার ছিলেন—সর্ব্বত্রই তাঁহার গতিবিধি ছিল।

আর একবার জৈনখাঁ কোকার সঙ্গে বিজর ও সয়োডের ইসুফ্‌জৈস্‌গণের পক্ষে অভিযানের প্রয়োজন হয়। আবুলফাজল্ ও বীরবর—এই বীরযুগলের মধ্যে কাহাকে নেতৃত্ব প্রদত্ত হইবে, ইহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল। অবশেষে সমাংসিত হইল, সুরতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হউক। কিন্তু দৈবের কর্ম্ম বড়ই বিষম। শেষোক্তের নামে সুরতি পড়িল। অগত্যা একান্ত অনিচ্ছাসহকারে, নিয়মতন্ত্র হইয়া, সম্রাটকে প্রিয়তম বান্ধবের সংসর্গবিচ্ছেদে সায় দিতে হইল। কেন না, নিয়মরক্ষাই—নিয়মকর্ত্তার অদ্বিতীয় কার্য্য।

ইয়ুসুফ্‌জাইস্‌গণের সহিত সম্রাটের যে সমর হইয়াছিল, সেই সূত্রে অকবর পক্ষে ৮,০০০ অষ্ট সহস্র সেনা নিহত হয়। বিস্তর বীরপুরুষ রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন

করেন। এই ব্রাহ্মণ মহেশদাসও প্রাণভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার কিন্তু নিস্তার হয় নাই। তদবস্থাতেই, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। ৯৯৪ হিজিরায় শফর মাসে * এই শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। গোঁড়া-বিদ্বেষ্টা বদাওনী, গাত্রজ্বালায় লিখিয়াছিলেন,—সারমেয়শ্রেণীতে বীরবল স্থান পাইয়াছেন। এইরূপ লিপিভঙ্গীর কারণ কি? বদাওনী তাহাতে বলেন,—বীরবর, জীবৎকালে যে সকল উৎকট উৎকট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই শোচনীয় ঘটনা তাহারই বিষময় পরিণাম। বীরবর ব্যতিরেকে অপরাপর অনেক উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারীও নিধন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অকবর, বীরবরের জন্যই বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। সম্রাটের কাতরতার কারণ এই, তাঁহার মৃতদেহ, অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তিনি পরিশেষে নিজেই এই মনে করিয়া আত্মপ্রবোধ দেন যে, এক্ষণে বীরবর স্ববশীভূত—বিমুক্তাত্মা। সুতরাং অনলসংযোগে তাঁহার শরীরের আর অপর সৎকার বা সংস্কার নাই বা হইল? বহ্নি-স্পর্শে তাঁহার আর অধিক কি উপকারের আশা? আবুল্ ফাজলের লিখিত "মখটুবাতে" পুস্তকেও, কোন পত্রী দ্বারাও, অকবরের শোকের গভীরতা ও মাত্রা অনুমিত হইতে পারে।

বদাওনীর গ্রন্থে বীরবরের উপর সম্রাটের অসাধারণ অনুরক্তি ও আসক্তির পরিচায়ক এক ঘটনা স্থান পাইয়াছে। মূল ঘটনাটা কিন্তু অমূলক।

একবার জনরব উঠিল, রাজা বীরবল, পার্ব্বত্য প্রদেশে যোগী ও সন্ন্যাসীর বেশে ঐ দুই সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হইয়া পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র সম্রাট ভাবিয়া লইলেন, বুঝি বা ক্ষোভে, ভয়ে বা লজ্জায়, বীরবর আত্মসংগোপনে তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। অন্যবার প্রবাদ হইল,—কালিঞ্জরে (নিজ-জাইগীরে) তিনি যামিনীযোগে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন। ইহাতে সম্রাটের শোকসিন্ধু দ্বিতীয়বার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অকবরের এক কালেক্টর বলিয়া পাঠান,—এক ক্ষৌরকার বীরবলের স্বীয় শরীরের আহত স্থলে তৈল মর্দ্দন করিতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহাকে রাজদরবারে প্রেরণ করিতে আদেশ হইল। অবশেষে মিছামিছি—একজন পথিক বীরবল বলিয়া ধৃত ও বিনাশিত হইলে পর, ঘটনায় যবনিকা

* শফর, হিজিরা অব্দের দ্বিতীয় মাস।

পতন হইল। সর্ব্বশেষে সপ্রমাণ হইল,—সর্ব্বৈব অসত্য। লাভের মধ্যে কালেক্টরকে কষ্ট ভুগিতে হয়। সে না কি কারাবাসে বাস করিয়া অশেষ ক্লেশ পাইয়াছিল!

অকবর যে নব ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠিত করেন, ১৮ আঠার জন সভ্য, তাহার অন্তর্নিবিষ্ট। তন্মধ্যে ১৭ সপ্তদশ ব্যক্তি মুসলমান;—একমাত্র রাজা বীরবলই হিন্দু। সকলেই কিন্তু সুশিক্ষিত—সদ্বিদ্যাবান্।

ইহাদের সংক্ষেপে পরিচয় দিবার অভিলাষ হইতেছে। তাহাতে বিস্তর বৃত্তান্ত জানা যাইবে। ৪, ৫ এবং ৬ সংখ্যক ব্যক্তির বৃত্তান্ত, "আইন-ই-অকবরি" পুস্তকে নিবদ্ধ আছে। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবরণ, ঐতিহাসিক "বদাওনী" কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

অকবরের নব-ধর্ম্ম-মতে যে ১৮ আঠার সদস্য অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ বিবৃত হইল।

১। শৈখ মুবারক;—নাগর-নিবাসী। তিনি একজন বিদ্বান্ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি। আবুল ফাজল ও ফৈজি তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্র।

২। শৈখ আবুল ফাজল;—শৈখ মুবারকের তনয়। অকবরের প্রধান মন্ত্রী। "অকবরনামা" * নামক ভাগত্রয়বিশিষ্ট ঐতিবৃত্তিক পুস্তকরচক। উত্তম যোদ্ধা।

৩। শৈখ ফৈজি;—শৈখ মুবারকের পুত্র। অকবরের রাজকবি।

৪। জাফরবেগ ওসেফ্ খাঁ;—কোয়াজ্ উইন্ অধিবাসী। কবি, অথচ ইতিহাস-বিৎ।

৫। কোয়াসিমি কাহি;—একজন কাব্যকার।

৬। আবদুশ-শমদ্;—রাজ-চিত্রকর ও কাব্যকার।

৭। আজম খাঁ কোকা—মুসলমানের পবিত্র তীর্থ মক্কা। মক্কা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি অকবরের নব-প্রচারিত ধর্ম্মমত-সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়েন।

৮। মুল্লা শা মুহম্মদ্;—শাহাবাদবাসী। একজন ঐতিহাসিক।

৯। শুফি অহম্মদ;—বৃত্তান্ত অপ্রাপ্ত। তবে নামের অগ্রেই "শুফি" দেখিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

১০। শদর জহাঁ;—রাজ-ব্যবহারাজীব—সম্রাটের উকীল।

১১। পুত্র (নাম অপ্রাপ্ত);—বিবরণ অজ্ঞাত।

১২। পুত্র (নাম অপ্রাপ্ত): বিবরণ অজ্ঞাত।

* ইহারই তৃতীয় ভাগ, "আইন-ই-অকবরি" সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ।

১৩। মীর শরফ ;—আমুল-নিবাসী। অক্‌বর তাঁহাকে বঙ্গদেশে ঐ নব-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৪। সুলতান খওয়াজা ;—এক সদর।

১৫। মীর্জা জানী ;—সর্দ্দার—প্রধান রাজপুরুষ।

১৬। টকী ;—সুষ্টারবাসী। কবি। দ্বিশতী,—দুই শত সেনার নায়ক, এই উপাধিধারী।

১৭। শৈখজাদা গোসালা ;—বারাণসী-নিবাসী।

১৮। বীরবর ;—ইঁহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণনের নিমিত্তই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। সুতরাং অপর পরিচয় অনাবশ্যক।

(ক) সম্রাটের ধর্ম্মমতপরিবর্ত্তনেও, বীরবলের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা তন্নিবন্ধন তাঁহার যে অধিক কার্য্যকারিতা ছিল, তদ্বিষয়িণী ঘটনা শুনিলে সকলেরই আমাদের বর্ণনায় উত্তম প্রতীতি জন্মিবে। বীরবলের সংসর্গে, তদীয় যুক্তিপরামর্শে, তাঁহাকে "সৌর" (সূর্য্যোপাসক) হইতে হয়। তিনিই বাদ-শাহের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া দেন, ভাস্কর দেবতাই সকল বস্তুর আকর। শ্যামল সমতল ক্ষেত্রের শস্য-সমূহ, তুচ্ছ বা মহোচ্চ তৃণ-গুচ্ছ, পাদপরাজির ফল সকল, প্রান্তরের উদ্ভিজ্জাদির পরিপক্কতার কারণই কিরণমালী দিবাকর। ভূলোক যে আলোক পায়, তাহাও রবির কৃপায়। সর্ব্বপ্রকার জীবের জীবনই, দিনমণির অনুগ্রহসাপেক্ষ। ইত্যাদি কারণপরম্পরার জন্যেই এই জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যমণি জ্যোতিষ্মান্ ভগবান্ ভাস্কর, শ্রদ্ধার আকর,—পূজার আস্পদ। সূর্য্য দেব, পূর্ব্ব প্রদেশে সমুদিত হয়েন, অতএব উহাই পবিত্র দিক্। পূর্ব্বাস্য হইয়া দেবদেবের বন্দন আরাধন করিলে চিত্তপ্রীতি জন্মে। পূর্ব্ব দিকের অপর অভিধা—উদয়াচল। পশ্চিম দিক্ অস্তাচল-সংজ্ঞায় বিদিত। এই জন্য অস্তাচল, দেবার্চ্চনের তত অনুকূল নহে। ধর্ম্মকর্ম্মসম্পাদনের পক্ষে পূর্ব্ব দিক্ যেমন প্রশস্ত, তদ্বিপরীত দিক্ তাদৃশ প্রশস্ত বিবেচিত হইবে কেন? রবির ন্যায় বহ্নি ও বায়ু, পাষাণ ও পাদপ, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পদার্থ প্রভৃতিও আমাদের আরাধ্য। গো ও গোময়, পুণ্ড্র ও যজ্ঞসূত্র, অর্থাৎ—তিলক ও উপবীতও, ঐ হেতুই অবজ্ঞেয় নয়।

বীরবরের যুক্তিতর্কমূলক ঐ মতামত, এক উপাদেয় দ্রব্য বলিয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও তার্কিক,—সকল জ্ঞানাপন্ন কর্ত্তৃক এক-বাক্যে অনুমোদিত হইল।

(খ) সম্রাট্, কোন সময়ে রাজা বীরবলকে ফতে উল্লার সমক্ষেই বলিলেন—"আমি যথার্থই বিস্ময়াবিষ্ট হই, বুদ্ধিমান্ লোকেও কেমন করিয়া অবাস্তব ঘটনায় বিশ্বাস করে! মুহূর্ত্তমধ্যে শয্যাত্যাগ ও তৎক্ষণাৎ শূন্য-পথে গগনমণ্ডলে গিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে ৯০,০০০ নব্বই হাজার কথা কহিয়া পুনরায় শয্যায় উপস্থিতি! শয্যা কিন্তু গাত্রোত্তাপে পূর্ব্ববৎ ঈষদুষ্ণ রহিয়াছে! এই সব অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞানবান্ লোকে কি করিয়া বিশ্বাস করে?"

(ঘ) একদা ধর্ম্মান্দোলনে শভাজ অতিশয় উত্তেজিত হয়েন। তিনি ধর্ম্ম-আলোচনায় একাংশ গ্রহণ করিবামাত্র বীরবর উপহাসবচনে তাঁহাকে তিরস্কার করেন। শভাজও প্রত্যুত্তরে অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু মহা-সহিষ্ণু বীরবর তাহাতে বাঙ্‌নিষ্পত্তিমাত্র করিলেন না। সম্রাট্ কিন্তু অসন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—"বিষ্ঠাপূর্ণ পাদুকা তোমার মুখে কেমন করিয়া প্রবিষ্ট হইল?"

এই সুযোগে বদাওনী মহাশয় বীরবলকে 'নরকীয় সারমেয়' এই সুমধুর সম্বোধনে আহ্বান করিয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন! সমদর্শিতা, ইতিবৃত্ত-লেখকের এক মহাগুণ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বদাওনীতে সে মহাগুণের প্রত্যাশা দুরাশামাত্র।

(ঘ) আর এক ঘটনায় ধর্ম্মালোচনার আভাস পাইতেছি। দৃষ্ট হইবে, বীরবর ধর্ম্মচর্চ্চার মধ্যবিন্দু।

নাগর প্রদেশস্থ শেখ মোবারক, অক্‌বর সমক্ষে বীরবলকে বলেন,—"আপ-নাদের ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন স্থলবিশেষে প্রক্ষিপ্ত অংশ রহিয়াছে, আমাদের 'কোরাণেও' তাহার অভাব নাই। এই কারণনিবন্ধনই কোন জাতীয় ধর্ম্মপুস্তকে নিঃসংশয় প্রত্যয় স্থাপিত করা দুর্ঘট।" সম্রাট্ বা বীরবর, ঐ বাক্যের কোন প্রতিবাদ বা সদুত্তর করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই।

এই প্রণয়ীর প্রতি পাতশার পক্ষপাতিত্ব বড় বেশী। এক দৃষ্টান্তেই তাহা সুব্যক্ত হইবে।

কোন সময়ে সম্রাট্, স্বয়ং কতিপয় কুলটাকে প্রশ্ন করেন, কাহাদের কর্ত্তৃক প্রথমে তাহারা অসতীর পথে পদার্পণ করিয়াছে। তাহাদের কথায় জানা গেল,—বহুবিভবশালী ব্যক্তিগণই ঐ কুকার্য্যের মূলে ছিলেন ও আছেন। তাঁহাদের কাহারও শারীরিক শাস্তি হইল,—কেহ কেহ বা তিরস্কৃত হইলেন। অন্যেরা দুর্গে অবরোধদশায় অনেক কাল যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। কাহারও ভাগ্যে অপর গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল। এই অপরাধীদের

ভিতর বীরবরও ধরা পড়েন। তিনি না কি অক্‌বরের অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একতম,—বিশেষতঃ তিনি আবার ধর্ম্ম-মত-চতুষ্টয়ের অনুশীলনে সিদ্ধ, সুতরাং তাঁহার দোষ, সবিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু তাঁহার গুরু অপরাধের দণ্ডবিধান, বিপরীত মতই হইল।

যখন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের উপর অক্‌বরের আজ্ঞায়, কারাদণ্ড, কায়-দণ্ড, বাগ্‌দণ্ড, অর্থদণ্ড প্রভৃতি প্রদত্ত হয়, তৎকালে কারপরগণাস্থিত জায়গীরে বীরবর অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ ব্যাপার, তাঁহার শ্রবণগোচর হইলে, তিনি যোগী সাজিবার উপক্রম করিতেছিলেন; কিন্তু অভয় পাইয়া সম্রাটের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন।

রাজা বীরবল বদান্যতায় যেরূপ খ্যাতিমান্ হন, সঙ্গীত-নৈপুণ্যেও সেই-রূপ। কবিতাপ্রণয়নেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য, রসাত্মক বড় বড় কবিতা, সরস বচন, হাস্যজনক রহস্য, পরিহাসোদ্দীপক কৌতুক ইত্যাদি, অদ্যাবধি হিন্দুস্থানের সহৃদয় বিবুধনিচয়ের নিকট সমাদৃত। আর তাঁহার গানের গুণ-গণনা করিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

তাঁহার বিরোধিগণের মধ্যে ঐতিহাসিক বদাওনী, শভাজ খাঁ ও অপরাপর কতিপয় যবন ধার্ম্মিকগণই—প্রধান। তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণের কারণ, নিদর্শন-হীন নয়। তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার—বীরবলের প্রভাবেই অক্‌বরের ইস্‌লাম-ধর্ম্মে বিরতি—অনাসক্তি। তদর্থেই তাঁহারা বিজাতীয় বিদ্বেষপরায়ণ। ফলতঃ, তাঁহারা রাজাকে আদৌ ভালবাসিতেন না—বরং অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন।

"লালা" তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অন্য পুত্রাদির পরিচয় অপরিজ্ঞাত। লালা দ্বিশত অশ্বের অধিনায়কতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অমিতব্যয়িতা দোষে তাঁহার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়। লোকে বলপূর্ব্বক তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলে, তিনি পথের ভিখারী হইলেন। বিত্তবঞ্চিত হইয়া সংসার তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ফকির সাজিলেন। কোথায় আমীরী, আর কোথায় ফকিরী! কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! তদবধি সন্ন্যাসি-সজ্জা ও দারিদ্র্যচর্য্যা, তাঁহার অবলম্বনীয় হইল।

পার্থিব বস্তুর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ঘুচিল। অক্‌বরের ৪৬ রাজ্যাব্দে লালার সংসার-বিরতি। এই বৈরাগ্য, অযোগ্য কারণে কি অযোগ্য অবস্থায় সংঘটিত হয় নাই। অধীনতাত্যাগ ও স্বাধীনতাসম্ভোগ, তখন তাঁহার লক্ষ্য-স্থল হইয়াছিল। *

* অক্‌বরনামা, তৃতীয় ভাগ।

জলাঞ্জলি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ হরশঙ্কর পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "হেমচন্দ্র, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হই-য়াছি, তুমি আমার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র; তোমার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি কাশীবাসী হইব, মনঃস্থ করিয়াছি। বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু রাখিয়া গেলাম, সযত্নে রক্ষা করিও; অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিলে তোমা-দেরই কষ্ট পাইতে হইবে—আমি আর কয় দিনই বা আছি। মনে সাধ ছিল—তোমাদের জন্য কত কি করিব; কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমাদের শরীর মন যাহাতে ভাল থাকে, তাহাই করিও। আর দেখিও বাবা, তোমার ছোট ভগ্নী হৈমবতীর যেন কোন রকম কষ্ট না হয়—তাহার কোন কষ্টের কথা শুনিলে আমি আর এ বৃদ্ধ বয়সে বাঁচিব না! বধূমাতাকে বলিয়া দিবে, তিনি যেন হৈমবতীকে আপনার মত দেখেন। জামাতা বিপিনের পড়াশুনা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। নিয়ম মত চিঠিপত্র লিখিও—আর কি বলিব—তোমরা সুখে থাকি-লেই—আমার সুখ।"

হৈমবতীকে জন্মদান করিয়াই হরশঙ্করের স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হরশঙ্কর একাধারে জনকজননী হইয়া কন্যাটিকে বুকে করিয়া মানুষ করেন। কন্যা যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার আকৃতি প্রকৃতি ততই তাহার মাতার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যখন বয়স দশ কি এগারো বৎসর, তখন মেয়েটিকে দেখিলে মনে হইত, যেন তাহার মায়ের মুখ অবিকল ভাবে কে তাহার মুখে বসাইয়া দিয়াছে। চলন চালন, ধরণ ধারণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কণ্ঠস্বর, হাসি, সকলই তাহার মায়ের মত। হরশঙ্কর অনেক সময়ে অবাক হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য;—দেখিতে দেখিতে মৃত সহধর্ম্মিণীর সহস্র পূর্ব্বস্মৃতি সুখে দুঃখে মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। মাতৃহারা ক্ষুদ্র বালিকা কি মন্ত্রবলে কি বৃহৎ সৃষ্টিছাড়া স্নেহ-আকর্ষণে বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় কাড়িয়া লইল, তাহা জ্ঞানের অগোচর।

হৈমবতী চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহার বিবাহের জন্য বৃদ্ধের

বিপরীত ভাবনা উপস্থিত হইল। বিবাহান্তে কন্যা যে পরগৃহে গিয়া বাস করিবে, ইহা ভাবিলেও বৃদ্ধের কষ্ট বোধ হইত। মনে মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন, কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে ঘরে রাখিবেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর হরশঙ্কর এক ভদ্র গৃহস্থের রূপবান পুত্রের সহিত খুব সমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং জামাতাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিলেন। আহার পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে হরশঙ্কর পুত্র হেমচন্দ্রের সহিত জামাতার সমান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুত্রকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পকেট-খরচা দিতেন—জামাতারও তাহাই করিয়া দিলেন।

বিবাহের দুই বৎসর পরে হৈমবতীর এক পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করিল। বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নূতন বিষয় সম্পত্তি পাইলে লোকের মনে যত না সুখ হয়, বৃদ্ধ ততোধিক সুখী হইলেন।

কিছু বড় না হইতেই শিশু আর বুড়ার কাছ-ছাড়া হইত না—বৃদ্ধ সমস্ত ক্ষণ তাহাকে কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। "এটা দাও, ওটা দাও" করিয়া ছেলেটি বৃদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। "দাদা, গগ যাব"—অমনি গাড়ী জুতিতে বলিয়া বুলোকে (ছেলেটির আদরের নাম ছিল "বুলো") লইয়া বৃদ্ধ রাস্তায় একটু ঘুরাইয়া আনিতেন। হরশঙ্কর তামাক খাইতে বসিলে বুলো তাঁহার মুখ হইতে নল কাড়িয়া লইত—নিজে হাতে করিয়া দাদার মুখে নল পূরিয়া দিত—সে ধরিয়া থাকিবে আর দাদাকে তামাক খাইতে হইবে। শিশুর কাছে হার মানিয়া বুড়া একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন!

বিপিন কালেজে চলিয়া গেলে, হৈমবতী বৃদ্ধ পিতার আহারের আয়োজন করিত। কখনও কখনও সক করিয়া পিতার জন্য স্বহস্তে ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া আনিত। আহারের সময় ছেলেটিকে কোলে করিয়া পিতার নিকট আসিয়া বসিত। দাদা আসনে আসিয়া বসিলেই বুলো গম্ভীরভাবে বলিত, "দাদা কাবে, কাও" যেন তাহার আজ্ঞার অপেক্ষায় দাদা এতক্ষণ বসিয়াছিলেন। দাদা কিছু মুখে তুলিয়া দিলে অমনি সে তাড়াতাড়ি বলিত, "বালো"—অর্থাৎ "আরো দাও"। শিশুর আধ-আধ মিষ্ট কথাতে বৃদ্ধের নীরস প্রাণও যেন আনন্দে নৃত্য করিত।

পুত্রের নিকট হরশঙ্কর যেদিন কাশী যাইবার কথা উত্থাপিত করিলেন, তাহার পরদিন যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিলেন। আত্মীয় স্বজন সকলে

আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হৈমবতী বিষাদক্লিষ্ট সরল সুন্দর মাতৃমুখে আসিয়া যখন পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন বৃদ্ধের দুই চক্ষু বাষ্পে ভরিয়া উঠিল। হৈমবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ মনের কষ্ট চাপিয়া কন্যার মস্তকের উপর শীর্ণ হাতখানি রাখিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মা, কাঁদিও না, তুমি চিরসুখী হও, আমার এই একমাত্র প্রার্থনা।" বুলো দাদার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমি গগ যাব।" হৈমবতী—পাছে পিতার মনে কষ্ট হয়—ছেলেটিকে অনেক কষ্টে ভুলাইয়া লইল। বৃদ্ধ অন্ধকার মনে আস্তে আস্তে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। সোনার পুরী অন্ধকার হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরশঙ্কর চলিয়া গেলে তাঁহার অভাব হৈমবতী ও তাহার পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিতে লাগিল। হৈমবতী নানা উপায়ে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিত। সে মনকে বুঝাইত—পিতা সুখে থাকিলেই আমার সুখ—পশ্চিমে থাকিলে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর ভাল থাকিবে—চিঠি-পত্রেও ত তাঁহার সংবাদ পাইব—ইত্যাদি। হাজার প্রবোধ সত্ত্বেও পিতার অদর্শনজনিত দুঃখ হৈমবতীকে ছাড়িল না। কিন্তু শিশুর কাছে প্রবোধও নাই, সান্ত্বনাও নাই; বিচারও নাই, তর্কও নাই। সে মনে করিল, হঠাৎ এ কি হইল—দাদা কই, কোথায় গেল। সকালে দাদার পরিবর্ত্তে যখন ঝি আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন সে মনে মনে ভারি অপমানিত বোধ করিল। দাদা নাই, কাহার মুখে নল পূরিয়া দিবে, কে পাখী দেখাইবে, কে 'গগ' চড়াইবে? তাহার ভারি কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া সে দাদামহাশয়ের ঘরে ঢোকে, আর "দাদা গগ গেছে, চলি গেছে" বলিয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া আসে। তাহার খেলা বন্ধ হইল, খাওয়া বন্ধ হইল—সে দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। শিশুরা কষ্ট হইলে কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল মনে মনে গুম-হাইতে থাকে; সেই জন্য মনের কষ্টে তাহাদের শরীর একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। হৈমবতী ছেলেকে ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুতেই আর দাদাকে ভুলিতে পারিল না!

ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে হরশঙ্করের অবর্ত্তমান হেতু সংসার একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা বৃদ্ধ থাকিতে এতদিন চুপ্‌চাপ্ করিয়াছিল—কিছুই করিতে পারিত না; কিন্তু এক্ষণে তাহার সমস্ত রুদ্ধ আক্রোশ অতিনিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুর থাকিতে হৈমবতীর সর্ব্বাপেক্ষা আদর যত্ন ছিল, তাহার অপেক্ষা হৈমবতীর গহনাপত্র অনেক বেশী, সে নিঃসন্তান আর হৈমবতী পুত্রবতী—হিংসায় ক্রোধে লাবণ্য এতদিন জ্বলিয়া পুড়িত। এক্ষণে সে ঝাল ঝাড়িতে লাগিল। প্রত্যেক বিষয়ে হৈমবতীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ করিল। এমন কি, নির্দ্দোষ শিশু বুলোও তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইল। "মাসীমা! মাসীমা!" করিয়া বুলো লাবণ্যের কোলে উঠিতে চাহিত, কিন্তু লাবণ্য তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না। পাছে স্বামীর পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, সেই জন্য হৈমবতী এ সকল বিষয়ে তাঁহাকে কিছুই জানিতে দিত না। নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিত। পিতাকেও এ সব বিষয়ে কিছুই লিখিত না। পথের ভিখারিণী হইলেও নিজের কষ্ট জানাইয়া পিতার মনে কষ্ট দিবে, হৈমবতীর এমন প্রকৃতিই ছিল না।

লাবণ্য হৈমবতীকে জব্দ করিবার জন্য যখন বুলোরও দুধের ভাগ কমাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন হৈমবতী স্বামীকে এ সকল বিষয়ে আর না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। বিপিন শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইল, কিন্তু সে আর কি করিবে, তাহার কি ক্ষমতা—পরের অনুগ্রহে তাহার জীবনযাপন! সে কিছুই বলিল না, কেবল অক্ষমের চিরসম্বল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিবে না—ফাষ্টআর্ট্‌স্ পাশ করিলেই কোন উপায়ে একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া আলাদা হইয়া থাকিবে।

লাবণ্য স্বামীর নিকট হৈমবতীর নামে রাতদিন অভিযোগ আরম্ভ করিল। হেমচন্দ্র তাহাতে বড় একটা কান দিত না। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া বহু বৃষ্টির উপর্য্যুপরি আঘাতে বৃহৎ অট্টালিকাও ভূমিসাৎ হইয়া যায়—লাবণ্য জপাইতে জপাইতে ক্রমে হেমচন্দ্রের মন ভগ্নীর বিরুদ্ধে ফিরাইয়া লইল, এবং শেষে এমনি একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে হেমচন্দ্র রীতিমত ভগ্নীদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন রাত্রে হেমচন্দ্র আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে আসিলে লাবণ্য

চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া কহিল, "ওগো, শুনেছ, পাশের বাড়ীর মতি হালদার তার স্ত্রীকে বলেছে,—কর্ত্তা উইলে অর্দ্ধেক বিষয় ঠাকুরঝির নামে লিখে দিয়েছেন। এই একটু আগে হালদারের স্ত্রী এসে আমাকে বলে গেল। তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায় বল!" শুনিয়া হেমচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইল,—"বল কি, সত্যি নাকি!" মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার অন্তর হইতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল—হৈমবতী তাহার পরম শত্রু, এবং যে কোন উপায়ে তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, ইহাই তাহার মনে জাগিতে লাগিল। মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিল,—এত দিন কেন সে লাবণ্যের কথা শুনে নাই। রাত্রে ঘুম হইল না।

পরদিন ভোর না হইতে হইতে সরকারকে ডাকিয়া হেমচন্দ্র বলিয়া দিল, "আমার বিনা অনুমতিতে বিপিন কিংবা হৈমবতীকে এক পয়সাও দিবে না—দি দাও, তৎক্ষণাৎ তোমায় দূর করিয়া দিব। তাহার পর হেমচন্দ্র বিপিনের মাষ্টারকে ছাড়াইয়া দিল, তাহার পকেট-খরচা বন্ধ করিয়া দিল, এবং পিতাকে চিঠি লিখিল—কুসংসর্গে পড়িয়া বিপিন মাটি হইয়া যাইতেছে—পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কাহারও কথা শোনে না; মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছে। এই সকল কারণে তাহার পকেট-খরচা বন্ধ করিয়া দিয়াছি; ইত্যাদি। উত্তরে বৃদ্ধ হরশঙ্কর লিখিলেন, "হেমচন্দ্র, জামাতার কথা শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত এক্ষণে মৃত বলিলেই হয়,—তোমার উপর সমস্ত ভার দিয়াছি। তুমিই আমার স্থানীয়। যাহাতে বিপিন সৎপথে আইসে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। দেখিও, অতি সাবধানে বিবেচনা পূর্ব্বক স্নেহের সহিত সকল কার্য্য করিবে। হৈমবতী কিংবা জামাতার মনে যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কার্য্য কখনও করিও না।" হৈমবতী, বিপিন, কাহাকেও কিন্তু বৃদ্ধ এ সকল বিষয়ে কিছু লিখিলেন না।

হেমচন্দ্র যখন সমস্ত খরচ বন্ধ করিয়া দিল, হৈমবতী তখন আপনার গহনা বিক্রয় করিয়া আবশ্যক খরচপত্র চালাইতে লাগিল। ক্রমে সব নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একদিন অপরাহ্নে বিপিনচন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হৈমবতী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "আমার বুলোর গা যেন আগুনের মত তাতিয়াছে,—সারাক্ষণ সে কাঁদিয়া খুন হইতেছে, মাথা চালাইতেছে,—বরফ আনিতে বল, যাও শীঘ্র ছুটিয়া ডাক্তারকে লইয়া আইস।" শুনিয়া বিপিনের

রক্ত জল হইয়া গেল। ডাক্তারের ভিজিটের টাকা কোথায় পাইবে,—কাহাকে কি বলিবে, কে তাহার কথা শুনিবে! হৈমবতী তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট কানের ফুল দুইটি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল। ঘরের মধ্যে কালেজের বইগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চটি জুতা পায়ে বিপিন পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কানের ফুল দুইটি এক জায়গায় পঞ্চমুদ্রায় বাঁধা দিয়া ডাক্তারের গৃহমুখে তীরবেগে চলিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাস্তায় একে একে গ্যাসের আলো জ্বালাইয়া দিল। আকাশে তারার আলো ফুটিয়া উঠিল। সহরের রাস্তা—কোথাও ব্যাণ্ড বাজাইয়া বরযাত্রী খুব সমারোহে বাহির হইয়াছে; কোথাও পাঁচ ইয়ারে মিলিয়া গলা ধরাধরি করিয়া হাস্যকলরবে চলিয়াছে; কোথাও গৃহপ্রকোষ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি মুখরিত হইতেছে; কোথাও আটচালার মধ্যে কেহ ভোজবাজি তামাসা দেখাইতেছে; প্রতি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব দৃশ্যপট। কিন্তু বিপিনের চক্ষের সম্মুখে সকলই ভাসিয়া গেল; সে দেখিয়াও কিছু দেখিতে পাইল না। তাহার মনে শুধু জাগিতেছে আপনার দারিদ্র্য ও প্রিয়তম পুত্র বুলোর অসুখের কথা। সে একমনে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে বিপিন, ডাক্তারের বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল! আসিয়া শুনিল, ডাক্তার বাবু বাড়ী নাই, রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন, কখন্ ফিরিবেন, তাহার ঠিক নাই। হতাশ্বাস হইয়া বিপিন ডাক্তারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। এই ডাক্তারের উপর বিপিনের প্রগাঢ় বিশ্বাস; ইনিই তাহাদের বাড়ীর সকলকে দেখিতেন। যত দেরী হইতে লাগিল,—কালো মেঘের ন্যায় একটার পর একটা ভাবনা আসিয়া বিপিনের হৃদয়-আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—একেলা হৈমবতী ছেলেটিকে লইয়া না জানি কি করিতেছে, বিনি চিকিৎসায় ছেলেটি বুঝি মারা গেল। বিপিন একবার ওঠে, একবার বসে; গাড়ীর শব্দ শুনিলেই বাহির হইয়া আইসে। রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাড়ী ফিরিলেন। বিপিন ডাক্তারকে সবিশেষ জানাইল। তিনি কহিলেন, "আমি এইমাত্র আসিয়াছি, আহারাদি করিয়া খানিক পরে যাইব।" বিপিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ডাক্তার মহাশয়, আপনার দুটি পায়ে পড়ি দয়া করে একবারটি চলুন—বুলো যায় যায়।" ডাক্তার অগত্যা বিপিনের সঙ্গে চলিলেন।

ডাক্তারকে লইয়া বিপিন যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সকলে আলো নিবাইয়া যার ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছে। কেবল হৈমবতী একলা পুত্রের শিয়রে সিয়া আছে। বাড়ীতে ঢুকিয়া বিপিনের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল।

রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বিপিনকে কহিলেন, "অবস্থা ড় ভাল দেখিলাম না, এই ঔষধ লিখিয়া দিতেছি—দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবে। আর সমস্ত ক্ষণ মাথায় বরফ ঘষিয়া দিবে।" এই বলিয়া প্রেসক্রিপশন্ রিয়া পকেটে চারিটি মুদ্রা পূরিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

প্রেস্‌ক্রিপসন্‌টি হাতে করিয়া বিপিন অন্ধকারে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া চে নামিয়া আসিয়া সরকারকে উঠাইয়া কহিল, "সরকার মশায়, বুলো যায় য়, দুইটি টাকা দিয়া দয়া করে' এই ওষুধটি আনাইয়া দাও—আমি যেমন রে পারি, কাল তোমাকে টাকা ফিরাইয়া দিব। তোমায় জোড় হাত করি ইটে কর।" সরকার মশায় দুইটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে রুক্ষস্বরে উত্তর রিল, "আমি টাকা পাব কোথায়? ঘর থেকে কি এনে দেব! বাবু এক পয়াও দিতে বারণ করেছেন, আমি কিছুই দিতে পারব না। তোমার জন্য আমি ক শেষে চাকরি খোয়াব!" শুনিয়া সমস্ত রক্ত বিপিনের মাথায় উঠিয়া গেল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পাষণ্ড, র্ম্মম, তুই কুকুরের অধম।" গোলমাল শুনিয়া হেমচন্দ্রের ধুম ভাঙ্গিয়া গেল। তনি নীচে নামিয়া আসিলে সরকার তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া দিল। নিয়া হেমচন্দ্র বিপিনকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গালি দিল। ত্তরে বিপিনও হেমচন্দ্রকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল। তখন হেমচন্দ্র বিপিনের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিল, এবং দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, বিপিনকে যেন কখনও বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া না হয়।

সেই রাত্রির শেষে দুই একবার "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিয়া বুলো মায়ের কালে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নাহারে পুত্রশোকে স্বামীর ভাবনায় মৃতপ্রায় হইয়া হৈমবতী দুই মাস কাটাইল।

ইহার মধ্যে একদিনও বিপিন বাড়ীতে আসে নাই। তবে পাশের বাড়ীর তি হালদার একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে তাহাকে হরশঙ্করের বাড়ীর দরজার কাছে

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

হৈমবতী মনে মনে ঠিক করিল, আর এক মাস দেখিয়া তবে পিতাকে সংবাদ দিবে।

একদিন সকাল বেলায় কাশীর বাড়ীর রকের উপর বসিয়া বৃদ্ধ হরশঙ্কর তামাক খাইতে খাইতে বাড়ীর কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে পুলিশের সবইন্সপেক্টর একটি লোককে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কহিল, "মশায়, এই লোকটিকে কি চিনিতে পারেন? ইনি বিনা টিকিটে কেমন করিয়া কলিকাতা হইতে বেনারস আসিয়াছেন। ষ্টেশনে ইহার নিকট টিকিট চাহিলে ইনি পকেট হইতে একটি দেশেলায়ের বাক্স বাহির করিয়া দেন। পুলিশে ইহাঁকে ধরে। একজন ভদ্রলোক বলিলেন যে, 'ইনি হরশঙ্কর বাবুর জামাতা'—তাই ইনস্পেক্টর বাবু আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

শুনিয়া হরশঙ্কর কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুলিশ কর্ত্তৃক আনীত লোকটির মুখের কাছে মুখ আনিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে অনেক ক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, একি! বিপিন! এমন বেশ, এমন চেহারা কেন! কি হইয়াছে? বাড়ীর সব ভাল ত? হৈমবতী বুলো ভাল ত!" পাছে শোক না সহ্য করিতে পারেন, তাই বুলোর মৃত্যুর কথা তাঁহাকে কেহ শুনায় নাই। বিপিন বৃদ্ধের মুখের পানে প্রায় পনের মিনিট হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "বুলো, ওষুধ।"

হরশঙ্করের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বিপিনের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

টিকিটের দাম দিয়া হরশঙ্কর পুলিশের লোককে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার পর বিপিনকে ভাল করিয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইলেন। বুড়ার আর সে দিন খাওয়া হইল না। সমস্ত ক্ষণ জামাতাকে কাছে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

হরশঙ্কর বিপিনকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহারই উত্তরে সে বলে, "বুলো, ওষুধ।" বৃদ্ধ বিপিনের হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, হয় ত মদ খাইয়া মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; আবার ভাবিলেন, না, তাহা নহে। ঠিক খবর জানিবার জন্য তিনি

মতি হালদারকে চিঠি লিখিলেন। উত্তরে মতি হালদার বুলোর মৃত্যুসংবাদ, হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক বিপিনের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া, সকলি খুলিয়া লিখিল।

চিঠি পাইয়া হরশঙ্কর শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। দুই একদিন পরে কোন একটি নিকট আত্মীয়কে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তাঁহার উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া, বিপিনকে তাঁহার সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আত্মীয়টিকে মাসিক এক শত টাকা বেতনে ম্যানেজার স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রকে লিখিলেন, "তুমি আমার ত্যজ্য-পুত্র হইলে, তোমার আর মুখ দেখিতে চাহি না। বিষয় সম্পত্তি সমস্ত হইতে তুমি বঞ্চিত হইলে। উইলে সমস্তই হৈমবতীকে দিলাম।" সত্য সত্যই এক উইল করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হৈমবতীর নামে লিখিয়া দিলেন। একটা বাক্সে পুরিয়া উইলটা হৈমবতীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন!

বৃদ্ধের আর বেশী দিন সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। এক মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার কাশীলাভ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিপিন যখন বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল, তাহাকে দেখিয়া হৈমবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে যখন সংজ্ঞালাভ হইল, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের ভার যখন ঈষৎ লঘু হইল, উঠিয়া স্বামীর নিকট গিয়া বসিল। তাঁহার সেই মলিন রেখাঙ্কিত মুখ, অস্থিপঞ্জরসার দেহ, অর্থহীন চাহনি দেখিয়া হৈমবতীর প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বিপিন অনেক ক্ষণ একদৃষ্টে হৈমবতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, যেন সে সকলই বুঝিতে পারিতেছে, কি বলিতে চাহে, কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া "বুলো, ওষুধ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হৈমবতী আর আপনাকে রাখিতে পারিল না। স্বামীর পদতলে লুটিয়া পড়িয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

দিনের পর দিন যায়। মনের কষ্ট চাপিয়া হৈমবতী স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর আপনার ঘরে বসিয়া হৈমবতী অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে হেমচন্দ্র আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

দেখিল, হৈমবতী কাঁদিতেছে। অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হেমচন্দ্র বলিল, "হৈম, না বুঝিয়া অনেক দোষ করেছি, মাপ কর্। বাবা তোকেই সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন—আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই, আমাদের জন্যে কি কিছু সংস্থান কর্‌বিনে?" হৈম চক্ষু মুছিয়া কহিল, "দাদা, আমার আর কে আছে! বাবা ছিলেন তিনি গেলেন, বুলো বিনি চিকিৎসায় চলে গেল, স্বামীর ত এই অবস্থা। সকলি ত জলাঞ্জলি দিয়াছি, বিষয় লইয়া আর কি করিব? ওর খোরাক পোষাক চিকিৎসার জন্য লেখাপড়া করে একটা ভাল বন্দোবস্ত করে দাও; আমি সকলি তোমাকে দিতেছি।" এই বলিয়া বাক্স হইতে উইল বাহির করিয়া হেমচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল, "এই উইল ছিঁড়িয়া ফেল; তা হলেই ত বিষয়সম্পত্তি তোমার হইল।"

ভগ্নীর নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া হেমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

হৈমবতী সকলে জলাঞ্জলি দিয়া শেষে কিছু দিন পরে রোগশয্যায় আপনাকেও জলাঞ্জলি দিল।

মৌর্য্য-সম্রাট অশোক।

প্রথম প্রস্তাব।

একজন জর্ম্মান লেখক বলিয়াছেন,—অধিকসংখ্যক লোক যাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং অধিকসংখ্যক লোক সসম্মানে যাঁহার নামোল্লেখ করে, তাঁহাকেই যদি অধিক যশস্বী বলিতে হয়, তবে অশোক, শার্লেমেন্ ও জুলিয়স সীজারের অপেক্ষাও অধিক যশস্বী। (১) ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গগনে অশোক প্রখর প্রভাকরের সহিত উপমেয়। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারে ও পৌরাণিক কুজ্ঝটিকায়, তাঁহার জ্যোতিঃ ও প্রখরতা, দোষ ও গুণ, সকলই সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই অন্ধকার যথাসম্ভব দূর করিয়া পৌরাণিক অংশ হইতে ঐতিহাসিক অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশ আক্রমণ করেন, তখন একজন নীচকুলোদ্ভব যোদ্ধা মগধ রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া

(১) Koppen Die Religiondes Buddha.

উঠে। মগধরাজের সহিত যুদ্ধে অপারগ হইয়া সে আলেক্‌জাণ্ডারের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। আলেক্‌জাণ্ডার তাহাকে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কথিত আছে, তাহাকে বিনাশ করাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল। যাহা হউক, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ বৎসরে মাসিডনাধিপতি বিজিত রাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন সেই নীচকুলোদ্ভব যোদ্ধা ক্রমে ক্রমে গ্রীক্ প্রতিনিধিদিগকে পরাভূত করিয়া সমস্ত পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করে। কিছু দিন পরে (সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩১৫ বৎসরে) সে মগধ আক্রমণ করে। মগধের রাজা (পৌরাণিক মতে নন্দ) যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েন। সেই যোদ্ধার নাম চন্দ্রগুপ্ত (গ্রীক্ Sandrakeuptos)। হিন্দু পৌরাণিক মতে তিনি নন্দের এক নীচকুলোদ্ভবা দাসীর পুত্র; চাণক্যের সাহায্যে মগধ-বিজয় ও নন্দের বিনাশ সম্পন্ন করেন। (২) বৌদ্ধ কিম্বদন্তীর মতে, চন্দ্রগুপ্ত মোরিয় নগরের রাণীর পুত্র এবং মোরিয় নগরের রাজবংশ বুদ্ধদেবের স্ববংশীয় কতকগুলি শাক্য যুবক হইতে উদ্ভূত। (৩) যাহাই হউক, চন্দ্রগুপ্ত একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত একাতপত্রাধীন করেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দর্শনে সিরিয়ার গ্রীক্ সম্রাট সেলিউকস্ (Seleucus) মেগাস্থিনিসকে তাঁহার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই চন্দ্রগুপ্তই মৌর্য্য সম্রাটদিগের কুলপতি।

সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৯১ বৎসরে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। হিন্দু ও বৌদ্ধ পৌরাণিক মতে, তাঁহার নাম বিন্দুসার; গ্রীক মতে তাঁহার নাম অমিত্র কেটিস (Amitra Chates = সংস্কৃত অমিত্রকেতু বা শত্রুবিনাশক)। গ্রীক্ বিবরণে দেখা যায় যে, সিরিয়ারাজ দূতরূপে এণ্টিওকস্‌কে (Antiochus) ও মিসর-রাজ দ্বিতীয় টলেমি (Ptolemy II) দূতরূপে ডায়নিসিয়াস (Dionysius ও বোধ হয় বাসিলিসকেও (Basilis) তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। (৪) বিন্দুসার সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়, তাহা সামান্য ও অনিশ্চিত। তিনি যে পিতার অর্জ্জিত সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া

(২) বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটক দ্রষ্টব্য।

(৩) Beal's Si-Yu-Ki or Hiuenthsang's Travels. p. XVII and 128 note 29.

(৪) Weber's History of Indian Literature. p. 251 note.

যায় না। অধিকন্তু কিম্বদন্তীতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে হইলে বলিতে হয় যে, পৈতৃক সম্পত্তি সংরক্ষা করিতেই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বৌদ্ধ কিম্বদন্তী মতে পঞ্জাবে তক্ষশীলাস্থ জনগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য মগধরাজ জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসিমকে প্রেরণ করেন। সুসিম তৎকার্য্যে অপারগ হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ অশোক সসৈন্যে যাইয়া নানা উপায়ে বিদ্রোহ দমন করেন। তদবধি পিতার আদেশে পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অশোক তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পঞ্চনদ প্রদেশে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। (৫)

বিন্দুসারের মৃত্যুকাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতৃসিংহাসনের জন্য ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হয়। অশোক তখন পঞ্চনদ প্রদেশে রাজপ্রতিনিধি। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাভূত করিয়া তিনিই সিংহাসন অধিকার করেন। পূর্ব্বে তাঁহার কি নাম ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণে তাঁহার অশোক (পালী অশোক; চীন ও-যু-কিঅ) নামেরই উল্লেখ দেখা যায়। খোদিত লিপিতে প্রিয়দর্শিন্ নামই দৃষ্ট হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনই এই রচনার আলোচ্য বিষয়। সে জীবনীর ঐতিহাসিক অংশ অশোকের নানা গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপি (অনুশাসন) হইতে উদ্ধৃত হইবে।

অশোকের রাজ্যকাল চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

১ম। রাজত্বের প্রথমাংশ নবম বৎসর পর্য্যন্ত।

২য়। রাজত্বের দ্বিতীয়াংশ (প্রথম গিরিলিপিমালা) পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত।

৩য়। রাজত্বের তৃতীয়াংশ (স্তম্ভলিপিমালা) সপ্তবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত।

৪র্থ। রাজত্বের শেষাংশ (অবশিষ্ট গিরিলিপিমালা)।

অশোকের রাজত্বের প্রথমাংশ কিম্বদন্তীজালে এরূপ বিজড়িত যে, তৎকালের বিবরণের জন্য ঐতিহাসিককে প্রধানতঃ কিম্বদন্তীর উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কথিত রাজত্বের প্রথমাবস্থায় তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিলেন। শুনা যায়, অভিষেককালে তিনি তাঁহার অধিকাংশ ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে বিনাশ করেন, এবং সাধারণ জনগণের শাসনার্থ রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি "নরক" (কারাগার) নির্ম্মাণ করিয়া চণ্ডালবৎ উগ্রস্বভাব এক ব্যক্তিকে তাহার রক্ষক নিযুক্ত করেন। লোক

(৫) Beal's Si-Yu-ki. Vol. I. p. 140 note 52.

ধরিয়া তাহাদিগকে তপ্ত কটাহে দগ্ধ করা ও বৃহৎ উদূখলে চূর্ণ করাই সেই প্রহরীর কার্য্য ছিল। (৬) তিনি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, এবং রাজত্বের প্রথম কয় বৎসর নানা দিগ্বিজয়ে অতিবাহিত করেন। এই দিগ্বিজয়কালীন যুদ্ধে তিনি শত্রুসেনা ও শত্রুপুরবাসীদিগকে বিনাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে কলিঙ্গ যুদ্ধের বিবরণে তাহার যথেষ্ট আভাস্ পাওয়া যায়। অশোক স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে কলিঙ্গ জয় করেন। তাহাতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক বন্দী হয়; লক্ষ লোক (যুদ্ধে) নিহত হয়; ও তাহার অনেকগুণ লোক বিনষ্ট হয়।" (৭)

প্রথম অবস্থায় অশোক যে কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এমন বোধ হয় না; হয় ত নামমাত্র হিন্দু ছিলেন। বৌদ্ধ-কিম্বদন্তীমতে, প্রথম প্রথম তিনি বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়িত করিতেন; তাঁহারই আদেশে বুদ্ধ-গয়ার মহাবোধিদ্রুম কর্ত্তিত হয় (৮) এবং তিনিই কপিলবস্তুর সন্নিকটস্থ রাম গ্রামে বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ সংস্থাপিত আটটি স্তূপের মধ্যে সাতটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ প্রদান করেন। (৯) অশোক বাহিরে যেমন ছিলেন, গৃহেও তেমনই ছিলেন; তাঁহার শুদ্ধান্ত বিবাহিতা মহিষী ও অবিবাহিতা প্রণয়িনীতে পূর্ণ ছিল। তিনি মাংসপ্রিয় ছিলেন। ১ নং গিরিলিপিতে প্রকাশ,—পূর্ণ সুপথ্যের জন্য দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর পাকশালায় অনুদিন বহু প্রাণিবধ হইত।" (১০) অশোক অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন। রাজ্যের নানা ভাগে গমনকালে তিনি শিকার করিয়া সময় কাটাইতেন। অষ্টম গিরিলিপিতে প্রকাশ,—"বহুদিন পূর্ব্বে দেবপ্রিয় যখন বিহারযাত্রা করিতেন, তখন মৃগয়া ও তাবৎ অন্যান্য অভিরমণীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। (১১)

প্রথম বয়সে অশোক কিরূপ লোক ছিলেন, এই সকল বিবরণ হইতে

(৬) Beal's Fa-hian in Si-Yu-ki, ch XXXII and Hiuenthsang Vol. II pp. 86-7.

(৭) Dr. Buhler's Epigraphia Indica vol. II. pp. 466-4. ডাক্তার বুলারের পাঠ সমীচীন বলিয়া সাধারণতঃ তাঁহার ধৃত পাঠেরই উল্লেখ করা যাইবে।

(৮) Beal—Si-yu-ki II. p. 117.

(৯) Fahian ch XXIII, XXVI.

(১০) Epigraphia Indica Vol. II. pp. 448-9.

(১১) Epigraphia Indica Vol II. pp. 456-7.

তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। তিনি বীর্য্যবান, দুর্দ্দমনীয়চেতা, প্রভূতপরিশ্রমকুশল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক,—প্রকৃত রাজপদের যোগ্য ছিলেন। এরূপ লোক ঘটনাচক্রে মায়ামমতাহীন সুখমদমত্ত দানবও হইতে পারে, করুণাময় পরহিতব্রতী ঋষিও হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় ঘটনাচক্রে অশোক অনেকটা দানবতুল্যই হইয়াছিলেন। এরূপ হইবার কতকগুলি কারণও দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, তখন তাঁহার বয়স অল্প," (অভিষেককালে ত্রিংশ বর্ষের অধিক নহে, সম্ভবতঃ পঞ্চবিংশতির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ) কাজেই বুদ্ধি অপরিপক্ক, কিন্তু ভোগাভিলাষ ও ক্ষমতাভিলাষ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, অভিষেকের পূর্ব্বে কিছু দিন তিনি তক্ষশীলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; যাঁহারা সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, বা সর্ লেপেল গ্রিফিনের রণজিৎ সিংহের জীবনীর মত পঞ্চনদ প্রদেশের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, পঞ্চনদ প্রদেশে বা তৎপশ্চিমস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে মনুষ্য-জীবনের মূল্য অতিসামান্য বলিয়াই বিবেচিত হয়; সেখানে হত্যা, বিদ্রোহ, যুদ্ধ, ভ্রাতৃবিবাদ প্রভৃতি এমনই সাধারণ যে, কেহ প্রাণিবধে কুণ্ঠিত হয় না। এরূপ দেশের শাসনকর্ত্তার পক্ষে নির্দ্দয় হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। তৃতীয়তঃ, অশোক সহজে রাজ্যলাভ করেন নাই; দুর্জ্জয় যুদ্ধে ভ্রাতৃবর্গকে জয় করিয়া তবে পিতৃসিংহাসন স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় অশোকের ন্যায় দুর্দ্দমনীয়চেতা লোক মমতাশূন্য ও ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া পড়িবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ আছে কি? অশোকের জীবনের প্রথমাংশের সহিত খ্রীষ্টিয়ান সাধু সেণ্ট অগষ্টাইনের জীবনের প্রথমাংশের প্রভূত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয়াংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এ অংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রধানতঃ গিরিলিপিমালার উপর নির্ভর করিতে হইবে। প্রথম গিরিলিপিমালায় তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্তের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানসমূহের পর্ব্বতে সে সকল গিরিলিপি পাওয়া গিয়াছে;—

১। কাশ্মীরের পশ্চিমে সোয়াত অধিত্যকায় সাহাবাজগাড়ি;

২। পেশোয়ারের নিকট কপুর্দ্দিগিরি;

৩। গুজরাটের পশ্চিম ভাগে গিরনার;

৪। বোম্বাই প্রদেশে টানা জিলায় সুপারা;

৫। মান্দ্রাজ প্রদেশে গঞ্জাম জিলায় চিল্কা হ্রদের দক্ষিণভাগে জৌগড়;

৬। উড়িষ্যার পুরী জিলায় ভুবনেশ্বরের নিকটে চিল্কা হ্রদের উত্তরে ধউলী;

৭। উত্তর-পশ্চিমবিভাগস্থ ডেরাডুন জিলায় কানসী।

৮। মানসেরা।

ধর্ম্মলিপিগুলির সংখ্যা সর্ব্বসমেত সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ, তবে জৌগড় ও ধউলীতে দুইটি অধিক। সুপারায় কেবল অষ্টম লিপির অর্দ্ধাংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। (১২) ধর্ম্মলিপিগুলি সম্ভবতঃ অশোকের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে খোদিত হয়। সেগুলি সর্ব্বত্রই এক প্রকারে প্রচারিত; ইহাতে অনুমান হয় যে, সেগুলি রাজধানীতে রচিত হইয়া সীমান্তবর্ত্তী সহরসমূহে প্রেরিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লিপিতে অশোকও এ কথা কতকটা স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ লিপি হইতে গিরিলিপির সময় ও অশোকের রাজ্যপরিমাণ কতকাংশে বুঝা যায়। ত্রয়োদশ লিপিতে প্রকাশ,—

"বিজয়ের মধ্যে এই (বিজয়) দেবপ্রিয় (প্রিয়দর্শী) মুখ্য বিজয় (বলিয়া মনে করেন) যথা ধর্ম্ম বিজয়; তাহা দেবপ্রিয় পাইয়াছেন। এখানে (নিজ রাজ্যে) ও সর্ব্ব অপরান্ত দেশে—ছয় শত যোজন দূরে যেখানে আংটিয়োকো নামক যোনরাজ ও সেই আংটিয়োকোর পর যেখানে চারি রাজা আছেন) তুরময়ে নাম, আংটিকিনি নাম, মক নাম, আলিকসুদরো নাম, দক্ষিণে চোড়, পান্ত, তাম্বপংনিয় পর্য্যন্ত এবং হিড় রাজা ও। (১৩)

পণ্ডিতবর লাসেনের মতে (১৪)

আংটিয়োকো—দ্বিতীয় আণ্টিয়োকস (Anteochus II.) সিরিয়ারাজ (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ২৪৭)

তুরমেয়—দ্বিতীয় টলেমাস (Ptolemaeos II.) মিসর-রাজ (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ২৪৬)

আংটিকিনি—আণ্টিগোনস্ গোনেটস্ (Antegonus gonatus) মাসিডনাধিপতি (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ২৩৯)

মক—ম্যাগস্ (Magos) কিরিনি-রাজ (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ২৫৮)

---

(১২) Epigraphia Indica vol III. p. 136.

(১৩) Epigraphia indica vol II. pp. 463-5.

(১৪) Lassen's Indis. Aterthum Bd II. p. 254 f. l. c. ep. Ind. II p. 471.

আলিকসুদরো—অ্যালেকজাণ্ডার (Alexander) ইপায়ারস্ রাজ (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ২৬২-২৫৮)

দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মলিপি সকল খোদিত করিবার আজ্ঞাপ্রদানকালে মক ও আলিকসুদরো জীবিত ছিলেন। অতএব, প্রথম গিরিলিপিমালার সময় খ্রীঃ পূঃ ২৬০—৫৮ ধরা যাইতে পারে। খৃঃ পূঃ ২৫৭ পর তাহাদিগের সময় নির্দ্ধারণ করা যায় না।

এই সকল ধর্ম্মলিপি হইতে রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে অশোকের সাম্রাজ্য-বিস্তার অনুমান করা যায়। উত্তরে হিমাচলের পাদদেশস্থ জঙ্গল (টেরাই), পশ্চিমে ভারতভূমির বর্ত্তমান সীমা ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে ১৯ ডিগ্রি অক্ষরেখা বা গোদাবরীর উত্তরাংশ, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদ। সাম্রাজ্যসংলগ্ন নিম্নলিখিত নৃপতি ও স্বাধীন জাতিগুলির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।—

পশ্চিমে বাষ্টিয়াধিপতি যোনরাজ আংটিয়োক ও হিড়রাজ; দক্ষিণে সত্য-পুত্র, (কঙ্কণ ?) কের-পুত্র, (মালাবার উপকূল) চোড়, পাণ্ড্য ও তাম্রপর্ণী (সিংহল)। অপরান্ত জাতি সকলের মধ্যে—যবন, কাম্বোজ, গান্ধার, রষ্টিক, পিতিনিক, বিশ, বজ্রি, নাভিতি, ভোজ, অন্ধ্র ও পুলিন্দ। (১৫)

দেখা যাইতেছে, রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে বর্ত্তমান ভারতের দশ আনারও অধিক অশোকের অধীন ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কোন নৃপতি যে এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার মধ্যে কতটা তাঁহার পৈতৃক, এবং কতটা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

তিনি যে অভিষেকের আট বৎসর পরে (অর্থাৎ নবম বৎসরে) কলিঙ্গ জয় করেন, এ কথা তিনি স্বয়ং ত্রয়োদশ লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, দাক্ষিণাত্য ভাগ ও পশ্চিম সীমান্তের কতকগুলি জনপদ অশোকই অধিকার করেন। তিনি যে রাজ্যবিস্তারে শৌর্য্য ও সমরনিপুণতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "মহালকে হি বিজিতং বহু"—মহারাজ্যে বহুদেশ জয় করিয়াছি, চতুর্দ্দশ লিপির এই গর্ব্ব ভিত্তিহীন নহে।

অশোক রাজ্যের শাসনপ্রণালী কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান সহর "মহামাত্য" নামে আখ্যাত রাজ-

(১৫) ২য়, ৫ম ও ১৩শ লিপি দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মচারিগণের অধীনে থাকিত। (১৬) সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন "প্রাদেশিক" নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রাদেশিকগণ কতকটা মোগল সুবাদার বা ইংরাজ কমিশনারের মত ছিলেন। কতকগুলি প্রদেশ একত্র করিয়া এক একটি রাজ্য গঠিত হইত; রাজ্য "রাজ্জকের" অধীনে থাকিত। (১৭) ধউলীর ও জৌগড়ের গিরিলিপিতে প্রকাশ যে, সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা,—পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা ও তোসলি। উজ্জয়িনীর, তক্ষশীলার ও তোসলির শাসনভার এক একজন রাজবংশীয় "কুমারের" হস্তে ন্যস্ত থাকিত। (১৮) এতদ্ব্যতীত, সকল সমাচার জ্ঞাত হইবার জন্য সম্রাট "প্রতিবেদক" নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা প্রজা ও অমাত্যগণের গূঢ় কার্য্যাবলী সম্রাটকে জানাইত। (১৯) অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বৎসরে) অশোক এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর সৃষ্টি করেন। তাহারা "ধর্ম্মমহামাত্য" নামে অভিহিত। তাহাদিগের ক্ষমতা-বস্তার অসাধারণ। ধর্ম্মপ্রচার ও অন্যায়-সংশোধনকল্পে তাহারা সাম্রাজ্যের সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিত। এই মহৎ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যথাযথ উপায় অবলম্বনের ক্ষমতাও তাহাদিগের ছিল। রাজপুত্রগণের, এমন কি, তাঁহাদিগের অবরোধবর্ত্তিনী মহিলাগণের উপরেও তাহাদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণপ্রতাপে প্রযুক্ত ছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

(১৬) Dr. Grierson's translation of M. Senart's article. Ind. Aut. 1890. pp. 83, 85, 96—7.

(১৭) তৃতীয় গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

(১৮) M. Senart. Ind. Aut. 1890. pp. 85, 96.

তোসলি সম্ভবতঃ উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটে অবস্থিত ছিল।

(১৯) ষষ্ঠ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

(২০) পঞ্চম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

ভেক।

অবয়বের গঠন ও স্বভাব দেখিয়া প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জীব-জগতে মীন ও সরীসৃপের মধ্যদেশে ভেকের স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন। শৈশবে ইহারা মৎস্যের ন্যায় জলে বাস করে; জলচর জীবের ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে। বড় হইলে জল ছাড়িয়া স্থলে আইসে, এবং স্থলচর প্রাণিগণের ন্যায় ফুসফুস দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে। ভেকমাতা ডিম্ব প্রসব করে। ভেকশিশু অণ্ড হইতে বাহির হইয়া ঈষৎ বক্র ও দীর্ঘ আকার ধারণ করে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের লাঙ্গূল, সম্মুখের পদদ্বয় ও সর্ব্বশেষে পশ্চাতের পদদ্বয় বহির্গত হয়। এইরূপ কিয়দ্দিবস জলবিহারের পর তাহাদিগের লাঙ্গূল খসিয়া যায়। এইরূপে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে, উহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া ভেকরূপ ধারণ করে।

দক্ষিণ ফ্রান্স্ ও ইতালীর অনেক প্রদেশে ভেকমাংসভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে। এই জন্য, ইংরাজ জাতি সমগ্র ফরাসীদিগকে "ভেকভুক" বলিয়া গালি দিয়া থাকেন। এই ভেকভুকদিগের মধ্যে এক জন গ্রন্থকার ভেকমাংসের রসালতার উল্লেখ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভেক নানাজাতীয়। তন্মধ্যে কোন কোন জাতীয় ভেক ভীত বা ক্রুদ্ধ হইলে শরীর হইতে এক প্রকার বিষাক্ত তরল পদার্থ বাহির করে। এই নিমিত্ত তাহারা ভেকভুকদিগের সযত্নে পরিহার্য্য।

অতিরিক্তশীতপ্রধান দেশ ভিন্ন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বড় বড় সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভেক নাই। তাহার কারণ এই যে, আমাদিগের দেশের এক জাতীয় ভেক ভিন্ন আর কোনও ভেক সমুদ্রের লবণাম্বু সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং মহাদেশ হইতে উহাদিগের দ্বীপান্তর-প্রয়াণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে, বিনা ভাড়ায় জাহাজে চড়াইয়া উহাদিগকে দ্বীপান্তরে লইয়া গেলে, উহাদিগের জাতি যায় না; বরং নূতন দেশে উপনিবেশী হইলে, ভেকজাতির বংশবৃদ্ধির ঘটাটা কিছু বাড়িয়া থাকে। এই প্রকারে মেদেরা, এজোর্স্ ও মরীচ দ্বীপে ভেকের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঐ সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ, পিপীলিকা প্রভৃতি কীট নষ্ট করিয়া কৃষিকার্য্যের উপকার করিবে, এই আশায় ভেকগণকে লইয়া গিয়া এক্ষণে বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে, এদেশেও ভেকদিগের কীট-

ভোজনপ্রবৃত্তি বিদিত ছিল; এজন্য সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগের আখ্যা 'মণ্ডূক'।

যে জাতীয় ভেক যেরূপ বর্ণ-বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে বিচরণ করে, তাহাদিগের বর্ণও তদনুরূপ হইয়া থাকে। পানায় আবৃত জলে যে ভেক বিচরণ করে, তাহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ হরিৎ; কদলীদলগত-কীটকুলভোজী ভেক স্বর্ণাভ; শৈবাল-সমাচ্ছন্ন প্রাচীরের পার্শ্বে যে ভেক নিরন্তর বিরাজ করে, তাহার বর্ণও প্রাচীরানুরূপ ধূমল। এই বর্ণবৈচিত্র্য জীবনসমরে ভেক-কুলের পরম সহায়। ইহারা বিচরণভূমির বর্ণে বর্ণ মিশাইয়া ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকে। ভেক-ভক্ষক কোনও প্রাণী তখন সহজে ভেককে চিনিতে পারে না; সুতরাং শত্রুর কবল হইতে বাঁচিয়া যায়। পক্ষান্তরে, যে সকল প্রাণী ভেককুলের ভক্ষ্য, তাহারাও ছদ্মবেশী ভেকদিগকে চিনিতে পারে না; সুতরাং ভেকগণ, অনায়াসে তাহাদের শিকার করিয়া জীবনধারণ করে। কিন্তু এই অঙ্গরাগ বিভিন্নতা কি তাহাদিগের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল? অথবা পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিক প্রয়াসের ফল? এই শেষোক্ত কারণে,—ক্রমবিকাশ-প্রণালীর অধ্যাপকগণ যাহাকে 'ন্যাচ্‌রাল্ সিলেক্‌শন্' বলেন—সংঘটিত বলিয়া বিবেচিত হয়। জীব-জগতে প্রাণীতে প্রাণীতে, প্রাণীতে তরুতে, এবং তরুতে তরুতে যে অবিরাম জীবনসংগ্রাম নীরবে চলিতেছে, তাহার নিমিত্ত সকলেই নিরন্তর প্রস্তুত। এই মহারণে কেহ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সম্মুখ-সমরে আগুয়ান্; কেহ বা বালি-বধের ন্যায় গূঢ় নীতির অনুসরণে তৎপর; আবার কেহ বা রাক্ষসী মায়ার মোহজাল বিস্তার করিয়া শত্রুশাসনে প্রবৃত্ত। রাক্ষসী মায়ার সহিত বর্ণবৈচিত্র্যের তুলনা করা অসঙ্গত নহে। জীবন-সংগ্রাম ব্যাপারে, আমার মনে হয়, দুইটি পৃথক বুদ্ধি কার্য্য করে। ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও জাতিগত বুদ্ধি। মৃগকে ধরিবার নিমিত্ত সিংহ ধাবিত হইলে, মৃগের তৎস্থানে পলায়নচেষ্টা তাহার ব্যক্তিগত বুদ্ধির ফল; এবং তাহার পদচতুষ্টয়ের দ্রুতপলায়নোপযোগিনী গঠনপ্রণালী মৃগজাতির জাতিগত বুদ্ধির ফল। জাতিগত বুদ্ধির সত্ত্বা সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির অজ্ঞাত। কথাটা শুনিতে নূতন হইলেও, সাধারণ্যে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। আশা করি, সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন। যাহা হউক, ভেকগণের বর্ণবৈচিত্র্য যে জীবন-সংগ্রামের জন্য, তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইবে না। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ভীত বা কোপান্বিত হইলে কোন কোন ভেকের গাত্র হইতে বিষাক্ত তরল পদার্থ নির্গত হয়;—তাহাও জীবনসংগ্রামের জন্য। কারণ,

এই জাতীয় ভেককে পোষ মানাইয়া তাহাকে হস্তে ধারণ করিলে তাহার বিষ-বহিষ্করণবৃত্তি দেখা যায় না।

বাস্তবিক ভেকও পোষ মানে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পোনান্ত এক পালিত ভেকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সে একদা কোন কারণে এক গৃহস্থের সোপানশ্রেণীর নিম্নে আশ্রয় লইয়াছিল। গৃহবাসী দয়াপরবশ হইয়া তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ক্রমে উহা এমন পোষ মানিয়াছিল যে, লোকে উহার গায়ে হাত বুলাইলেও পলাইবার চেষ্টা করিত না। পরিবার যখন ভোজনে বসিতেন, তখন তাহাকে টেবিলের মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া কীটপতঙ্গাদি প্রদত্ত হইত। যখন সকলে ভোজন ব্যাপারে প্রবৃত্ত, তখন ভেকবর কখনও অনন্যমনে কীটকুলনাশে ব্যস্ত থাকিত, কখনও বা ইতস্ততঃ স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত—বুঝি বা গৃহস্থের হাস্যকৌতুকে যোগদান করিবে। এইরূপে, মানবসহবাসে সে ছত্রিশ বৎসর বাঁচিয়াছিল। একদিন একটা কাক তাহার একটি চক্ষু বিদ্ধ না করিয়া দিলে, বোধ হয়, ভেকটি আরও অধিক দিন বাঁচিতে পারিত। নয়ননাশের পর হইতে তাহার ভোজনে অনিচ্ছা জন্মে; এবং তাহার পর সে শুকাইয়া শুকাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভেকের পরমায়ু সম্বন্ধে নানা লোকে নানা জল্পনা করিতেন। পর্ব্বত কাটিতে কাটিতে জীবন্ত ভেক প্রাপ্ত হওয়ায় অনেকে অনুমান করিতেন যে, ভেক বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে শৈলগঠনকালে উহার অভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার বাক্‌লাণ্ডের পরীক্ষায়, এরূপ অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, ভেক যে মনুষ্যের সমান বাঁচিতে পারে, তাহাতে সংশয় নাই। আহার না করিয়া ও সামান্য মাত্রায় নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিয়াও উহারা অনেক দিন জীবনধারণ করিতে পারে। কোনও কোনও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে গভীর মৃত্তিকাতল হইতে মৃতবৎ ভেকদেহ পাওয়া যায়; তাহা জলে নিমজ্জিত করিলে উহাতে জীবনের সকল লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

ভেকদেহে মাংস ও পেশীর সহিত চর্ম্ম শিথিলভাবে সংলগ্ন থাকে; এই জন্য, ভেকগণ, মাংস ও চর্ম্মের ব্যবধানস্থলে বায়ু গ্রহণ করিয়া দেহ ইচ্ছামত স্ফীত করিতে পারে। চর্ম্মের এই প্রকার সংস্থান নিবন্ধন, প্রহারিত হইলে ভেকগণ অধিক কষ্ট অনুভব করে না। উহাদিগের অপূর্ণ মস্তিষ্ক অবলোকন করিয়া কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, ভেক আদৌ শারীরিক কষ্ট অনুভব করে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক দয়ালু বৈজ্ঞানি-

কও ইহাদিগের শরীর খণ্ডিত করিয়া, অথবা ইহাদিগের গাত্রে তড়িতপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া, নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

আমাদিগের দেশের কোন কোন স্থানে এক প্রকার ছোট ছোট ভেক দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তাহাদিগের পক্ষ নাই, তথাপি তাহারা আপনাদিগের শরীর বায়ুপূর্ণ করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে এরূপ ভাবে লাফাইয়া পড়ে যে, তাহা অবলোকন করিলে মনে হয়, যেন উড়িয়া গেল। উহাদিগের লম্বা লম্বা পদপ্রান্তে সংলগ্ন হংসাদির ন্যায় সংযুক্ত নখর (?) উড্ডয়ন কার্য্যের সহায়তা করে। জীবতত্ত্বের গ্রন্থে যে উড্ডীয়মান ভেকের বিবরণ পাঠ করা যায়, তাহাদিগেরও লম্বা লম্বা সংযুক্ত নখর।

ভেক ডাকে কেন? বিশদরূপে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন হইলেও, অসঙ্কুচিতচিত্তে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এ ডাকের সহিত প্রেমের কোন না কোন সম্বন্ধ আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির পূর্ব্বে ভেক রব করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বর্ষাকালই তাহাদিগের সঙ্গম-ঋতু। ভেকবধূগণকে ডাকিবার জন্যই ভেকবরগণ যে জলাশয় মুখরিত করেন না, তাহা কে বলিবে? বিহঙ্গিনীকে সম্ভাষণ করিবার জন্যই যখন বিহগ কাকলী-সুধাধারায় দিগন্ত প্লাবিত করে, তখন ভেকগণের রবের কারণও যে তদনুরূপ নহে, তাহা কে বলিবে?

কোন কোন জাতীয় ভেকের জিহ্বা নাই। তাহারা কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির করে। ভেকদিগের স্ত্রীগণ অপেক্ষা পুরুষগণের স্বর অধিক তীব্র। কোন কোন ভেকবধূর আদৌ স্বর নাই। তাহাদিগের স্বামিগণ, বোধ হয়, সুখে ঘরকন্না করিয়া থাকে; তাহাদিগকে আদৌ গৃহিণীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না!

সন্তানপ্রতিপালনে কোন কোন জাতীয় ভেক-দম্পতির অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখা যায়। গুয়ানো ও ব্রেজিল দেশে একপ্রকার ভেক বাস করে; তাহাদিগের অণ্ড প্রসূত হইলে, পুরুষ ভেক উহা তাহার স্ত্রীর পৃষ্ঠোপরি স্থাপন করে; স্ত্রীভেক তৎক্ষণাৎ তাহা বহিয়া লইয়া জলমধ্যে গমন করে। তথায় ডিম্বগুলি তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া গিয়া স্ফোটক উৎপন্ন হয়। সেই স্ফোটকের অভ্যন্তরে কিছু দিন থাকিয়া ডিম্বগুলি ফুটিয়া বাহির হয়। তখন ভেকমাতা জলবাস পরিহার করে। ফ্রান্স্ ও সুইট্‌জারলণ্ড দেশে একপ্রকার ভেক আছে; সেই জাতীয় পুরুষ ভেক স্বীয় পশ্চাদ্ভাগের পদে ডিম্ব রক্ষা করিয়া, তাহা ফুটাইয়া থাকে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম।

অবসরসময়ে হিমালয়-ভ্রমণকাহিনীর যে দুই একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতাম। সৌভাগ্যক্রমে Asiatic Researchesর একাদশ খণ্ডে এই বদরিকাশ্রম-ভ্রমণকাহিনী পাঠ করি। Captain Webb প্রমুখ তিন জন ইংরেজ, এই বৎসর হইতে ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে, হিমালয়-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে যাহা দেখিয়াছিলেন, উল্লিখিত পত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আজ "সাহিত্যে"র পাঠকগণের জন্য সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সারভাগ সঙ্কলিত করিলাম।

"বদরিনাথ সহর ও দেবমন্দির পুণ্যসলিলা অলকনন্দার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই সুন্দর উপত্যকা দীর্ঘে দুই ক্রোশ, এবং ইহার পরিসর কোন স্থানেই অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক নহে। এই উপত্যকার ঠিক কেন্দ্রস্থলে বদরিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যভাগ দিয়া অলকনন্দা ধীরগতিতে বহিয়া যাইতেছে। এই উপত্যকাভূমির দুই পার্শ্বে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায়, চিরতুষারমণ্ডিত নর ও নারায়ণ পর্ব্বত সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতদ্বয়ের আপাদমস্তক তুষারময়।

"বদরিনাথ সহরে সবেমাত্র কুড়ি পঁচিশখানি ক্ষুদ্র কুটীর। এই সকল কুটীরের অধিকারী—পাণ্ডাগণ এবং নারায়ণের অল্পসংখ্যক সেবায়েত। মন্দির হইতে সোপানশ্রেণী নামিয়া একেবারে অলকনন্দার জলে মগ্ন হইয়াছে। বদরিকাশ্রমের নাম শুনিলে সাধারণের মনে যে সহস্রাধিক বৎসরেরও অধিক দিনের কথা মনে হয়, পুরাকালের মুনিঋষিগণের সময়েও বদরিকাশ্রম বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জনসাধারণের মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, বদরিনাথের মন্দির দর্শন করিলে আর সে বিশ্বাস থাকে না। যে মন্দিরের জন্য অগণিত অর্থরাশি সংগৃহীত হইয়া থাকে, সে মন্দির এমন সামান্য ও এত অল্প দিনের নির্ম্মিত যে, দেখিয়া ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মন্দিরটি ৪০।৫০ ফিটের বেশী উচ্চ নহে। তবে যে সুন্দর স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই জন্য এই মন্দির সমস্ত উপত্যকাভূমির উপর যেন সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

"জনপ্রবাদ এই যে, বদরিনাথের মন্দির মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত নহে; স্বয়ং স্বর্গশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এই মন্দিরের নির্ম্মাতা। কিন্তু দেবহস্তের নির্ম্মিত হইলেও, প্রবল ভূমিকম্প সহ্য করিবার ক্ষমতা মন্দিরের ছিল না। সুতরাং এখন দেবতার শিল্পচাতুর্য্যের উপর মানব শিল্পীর সাহায্যের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। তবে মানুষের হাতে পড়িয়া দেবমন্দিরের এমন জীর্ণসংস্কার হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক বলিয়া মনে হয়; তাহার প্রাচীনত্ব একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে।

"নারায়ণ-দর্শনের অনুমতি পাইয়া আমরা যখন মন্দিরের বাহিরে সমাগত হইলাম, তখনও মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। অনর্থক সেখানে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আমরা মন্দিরের সোপানশ্রেণী দ্বারা নীচে নামিতে লাগিলাম। অল্প দূর নীচে নামিয়াই আমরা একটি বাঁধানো কুণ্ড বা জলাধার দেখিতে পাইলাম। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রত্যেক দিকে ৩০ ফিটের অধিক হইবে না। এই কুণ্ডের আচ্ছাদনস্বরূপ একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর আছে; কিন্তু তাহার প্রাচীর নাই, কয়েকটি কাষ্ঠের বিমের উপরে ছাদ রহিয়াছে। এই কুণ্ডের নাম তপ্তকুণ্ড। এই ভয়ানক শীতে পর্ব্বত-হৃদয় হইতে একটি গরম জলের ঝরণা বাহির হইয়াছে; মন্দিরের অধ্যক্ষগণ সেই ঝরণাকে এই কুণ্ডে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহারই সন্নিকটে আর একটি ঝরণার জল অতি শীতল; সে ঝরণাকেও এই কুণ্ডে প্রবাহিত করা হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ঝরণার জল এমন গরম যে, তাহা ব্যবহারের অনুপযুক্ত; তাই ব্রাহ্মণগণ সেই উষ্ণ জলের সঙ্গে শীতল জল মিশাইয়া যাত্রিগণের স্নানের উপযুক্ত করিয়া এই কুণ্ডের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাত্রিগণ স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে এই কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণের লজ্জাশীলতারক্ষার জন্য কুণ্ডের কিয়দংশ কোন প্রকারে আবৃত করা মন্দিরের অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্য মনে হয় নাই। আমরা এখান হইতে বহির্গত হইয়া আরও একটু নীচে নামিলাম। সেখানে আবার আর একটি কুণ্ড; ইহার নাম সূর্য্যকুণ্ড। এ কুণ্ডের জলও গরম; কিন্তু যাত্রিগণ আর এ কুণ্ডে স্নান করে না। অলকনন্দার তুষারশীতল জলে স্নান করিয়া শীতের প্রকোপে যখন যাত্রীদের শরীর অবসন্ন হয়, তখন তাড়াতাড়ি তাহারা এই সূর্য্যকুণ্ডের উত্তপ্ত জল আপনাদের গাত্রে ছিটাইয়া দেয়। তাহাতে কতটা পুণ্য হয়, বলিতে পারি না; তবে শরীর যে একটু তাজা হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সূর্য্যকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে আরও অনেক কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতে স্নান করিলে বিভিন্ন প্রকারের পুণ্য সঞ্চিত

হইয়া থাকে। যাত্রিগণের অর্থ যত হ্রাস পাইতে থাকে, তাহাদের পুণ্যও তত অধিক সঞ্চিত হয়। গৃহে ফিরিবার সময়ে যদি হিসাব করিয়া দেখে, তাহা হইলে যাত্রিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারে যে, এ পথ স্বর্গগমনের সরল পথ হইলেও, স্বল্পব্যয়ে এ পথে স্বর্গে যাওয়া যায় না। প্রত্যেক কুণ্ডেই ব্রাহ্মণগণ পুণ্য বিতরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু সে পুণ্য সংগ্রহ করিবার জন্য অধিকপরিমাণ অর্থ দক্ষিণা দিতে হয়; এবং সেই অর্থের পরিমাণ যাহার যত অধিক, স্বর্গদ্বার তাহার তত নিকটবর্ত্তী। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থমহিমায় এমনই মুগ্ধ যে, তাহাদের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কেও এ সব চাতুরী আদৌ উদিত হয় না।

"আমরা সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া নদীর কিনারায় যাইতেছিলাম, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাহুল মহাশয় আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রাহুল, নারায়ণের মন্দিরের প্রধান সেবায়েত। আমরা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতে লাগিলাম। তপ্ত কুণ্ডের নিকটে একটি অনাবৃত স্থানে আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য একখানি শুভ্রবস্ত্র আস্তীর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহারই উপরে, একপার্শ্বে একখণ্ড সুন্দর কার্পেটের আসন রাহুল মহাশয়ের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমারা সেখানে পঁহুছিয়া দেখিলাম, তিন চারি জন চোপদার রৌপ্যনির্ম্মিত আশা সোটা হস্তে অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে স্বয়ং রাহুল মহাশয়; তাঁহার পশ্চাতে ময়ূরপুচ্ছরচিত-বীজনধারী একজন ভৃত্য; সর্ব্বশেষে নারায়ণের পূজক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। রাহুল মহাশয়ের পরিধানে সবুজ সাটিনের বস্ত্র; গায়ে তুলা-ভরা সাটীনের জামা; কটিদেশে একখণ্ড উৎকৃষ্ট শ্বেতবর্ণের শাল কোমরবন্ধ-রূপে ব্যবহৃত; মস্তকে রক্তবসনের উষ্ণীষ এবং পদযুগলে চিত্র বিচিত্র বিনামা; তাঁহার দুই কর্ণে দুইটি প্রকাণ্ড স্বর্ণবীরবৌলি, তাহাতে বহুমূল্য প্রকাণ্ড কয়েকটি মুক্তা গ্রথিত; গলদেশে মুক্তার মালা; হস্তে বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণবলয়; দুই হস্তের প্রায় দশটি অঙ্গুলিতেই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক। আমরা মনে করিয়াছিলাম, জটাবল্কলধারী ভস্মবিভূষিত যোগী সন্ন্যাসী দর্শন করিব; তৎপরিবর্ত্তে বিলাসিতার চরম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তীর্থশ্রেষ্ঠ বদরি-নারায়ণের উপযুক্ত সেবায়েতই বটে।

"যথাযোগ্য সম্ভাষণের পরে প্রায় পনের মিনিট তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্ম্মকথা অতি অল্প। তৎপরে

তিনি আমাদিগকে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিলেন। বাহিরের গেটের নিকটে উপস্থিত হইলে আমরা পাদুকা খুলিয়া রাখিতে আদিষ্ট হইলাম। আমাদিগের তাহাতে আপত্তি ছিল না; দেবমন্দিরের অবমাননা করা আমরা কর্ত্তব্য মনে করি নাই। সেই স্থানে পাদুকা রাখিয়া আমরা পাঁচ ছয়টি সোপানের উপর আরোহণ করিলাম। সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র দ্বার। রাহুল মহাশয় আমাদিগকে সে দ্বার অতিক্রম করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াই নারায়ণ-দর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। সেই ক্ষুদ্র দ্বারের অপর পার্শ্বেই একটি অনতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠ; তাহার পরে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি দ্বার; সেই দ্বারের অপর পার্শ্বে মঞ্চোপরি নারায়ণ-দেব উপবিষ্ট। নারায়ণের মস্তকে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ। তাঁহার সম্মুখভাগে দুই তিনটি প্রদীপ ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতেছে। তাহাতে গৃহের অন্ধকার দূর হওয়া দূরে থাকুক, স্বয়ং নারায়ণের মূর্ত্তিই অস্পষ্টতর হইয়া গিয়াছে। নারায়ণের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণরৌপ্যবিনির্ম্মিত অলঙ্কারে বিভূষিত। আমাদের মনে হইল, গৃহমধ্যে এরূপ ক্ষীণ আলোক জ্বালিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে নারায়ণের মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য যাত্রিগণের নিকট অধিক বোধ হইবে। উজ্জ্বল দিবালোকে, অথবা প্রদীপের আলোকে সমস্ত দেখিতে পাইলে, যাত্রিগণের প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক না হইতে পারে। এই ভয়ে পূজক মহাশয়েরা গৃহ এমন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছেন। অন্ধকারে দেখিয়া যত দূর অনুমান করা যায়, তাহাতে বোধ হইল, নারায়ণ প্রায় তিন ফিট উচ্চ। সমস্ত শরীর বস্ত্রালঙ্কারে সমাবৃত। সুতরাং মুখ ও হস্তদ্বয়ের কিয়দংশ দেখিয়া যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে বোধ হইল, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নারায়ণের মূর্ত্তি গঠিত। নারায়ণের বামে দক্ষিণে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান, কিন্তু দ্বারের সঙ্কীর্ণতা, গৃহমধ্যের অন্ধকার ও আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদিগের ভাগ্যে তাঁহাদের সকলের দর্শনলাভ ঘটিল না।

"নারায়ণদর্শন শেষ হইলে আমরা প্রতিগমনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ একখানি প্রকাণ্ড রৌপ্যনির্ম্মিত থালা আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া ধরিল। বুঝিলাম, নারায়ণকে কিঞ্চিৎ দর্শনী দিতে হইবে। রাহুল মহাশয় আমাদিগকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার আশা ছিল, আমাদিগের নিকট হইতে প্রচুর দক্ষিণা আদায় হইবে। আমাদিগের অর্থসংস্থান তেমন অধিক ছিল না; এবং অধিকপণে

স্বর্গগমনের সুগম পথের অন্বেষণও তখন তেমন আবশ্যক মনে হয় নাই। তথাপি দেবতার না হউক, সেবায়েত মহাশয়ের সন্তুষ্টির জন্য আমরা সেই রৌপ্যপাত্রে ১০০ শত রৌপ্যমুদ্রা দর্শনী দিলাম। নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না, তিনিই জানেন; কিন্তু সেবায়েৎ মহাশয়গণ যতদূর প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাহা চরিতার্থ হয় নাই, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

"যে তীর্থস্থান ও দেবমন্দির দর্শন করিবার জন্য আমরা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইলাম। তবে আমাদের মনে একটি বিশেষ ভয় দিল,—এতকালের মধ্যে হিন্দু ব্যতীত অপর কোন জাতি নারায়ণ-দর্শন করিতে পায় নাই; আমরা কোনও প্রকারে যদি দেবমন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করি, তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের কারণ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এখন আর সে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। এই পবিত্র তীর্থে আমাদের ন্যায় বিধর্ম্মীর সমাগমে নারায়ণের দেবত্বের কোনও হানি হয় নাই। একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমরা তিন জন মন্দিরদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নারায়ণদর্শনের অধিকার পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গী মুসলমান খানসামাগণকে মন্দিরসীমাতেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ আমাদের আর একটি অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমরা যেন পুণ্য তীর্থস্থানে কোনপ্রকার জীবহত্যা না করি; আমাদের আহারের জন্য যদি নিতান্তই জীবহত্যার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমরা যেন দূরস্থান হইতে তাহা সম্পন্ন করিয়া আনি। আমরা তীর্থসীমার মধ্যে আমাদের বস্ত্রাবাসে বসিয়া হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ করিলে, তাঁহাদের কোনও আপত্তি ছিল না। বাহুল্য, আমরা যে কয় দিন বদরিকাশ্রমে ছিলাম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবহির্ভূত আচরণ যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছিলাম।

"ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যে সকল দেবমন্দির বর্ত্তমান, তাহার মধ্যে বদরিনাথেরই দেবোত্তর সম্পত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গড়োয়াল ও কমায়ুনের রাজা এই পর্ব্বতপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দেবসেবার জন্য প্রায় সাত শত গ্রাম দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত দেবতার অনেক অর্থ সঞ্চিত আছে। শ্রীনগরের রাজা বা অন্যান্য লোকের যখন অর্থের আবশ্যক হয়, তখন তাঁহারা দুই চারিখানি গ্রাম বন্ধক রাখিয়া, নারায়ণের সঞ্চিত অর্থ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার বন্ধকী সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-

গণের হস্তেই দেবসেবার ভার ন্যস্ত আছে। নারায়ণের দেবোত্তর গ্রামসমূহের অবস্থা ভাল। আমরা যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়াছিলাম, সে সমস্ত গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। নারায়ণের সহরে দ্রব্যাদি বড়ই দুর্ম্মূল্য। দোকানঘর বেশী নাই; যে দুই একখানি আছে, তাহাতে অগ্নিমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়। মন্দিরের দেবতাগণকে দক্ষিণান্ত করিয়া যাত্রিগণের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই দোকানদারগণই আত্মসাৎ করে। সুতরাং যাত্রীরা বেশীদিন আর নারায়ণে বাস করিতে পায় না। শুনিয়াছি, অনেক যাত্রী ভিক্ষায় নির্ভর করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে; অথবা অনাহারে এই পর্ব্বতপথে জীবন শেষ করিয়াছে। আর একটি কথা আছে;—যে দুই চারি জন দোকানদার আছেন, তাঁহারা না কি নারায়ণের সেবায়েত-দলের ব্রাহ্মণ; তাঁহারা যাত্রীদিগকে বলেন যে, এই দোকান হইতে যে লাভ হয়, তাহা নারায়ণের সেবার জন্যই অর্পিত হয়; সুতরাং ধর্ম্মপিপাসু যাত্রিগণ অধর্ম্ম ও পাপের ভয়ে জিনিসপত্রের দরদাম করিতে পারে না। তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব নারায়ণের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া,—ভিক্ষাপাত্রহস্তে বদরিকাশ্রম ত্যাগ করে।

"বদরিকাশ্রমে তিনপ্রকারে দক্ষিণা দিতে হয়। প্রথম, স্বয়ং দেবতার প্রণামী; দ্বিতীয়, তাঁহার ভোগের জন্য; তৃতীয়, রাহুল মহাশয়ের। রাহুল মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, অনেক অর্থশালী যাত্রীও দেবতাকে প্রতারিত করিবার জন্য অতিহীন ও দরিদ্রের বেশে এখানে আসিয়া থাকে, এবং অতি অল্প ব্যয়েই স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করাইয়া লয়। আমাদের কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থস্থানে আসিয়া যে দেবতাকে ঠকাইবে, তাহা বোধ হয় না। তবে পাণ্ডামহাশয়গণের অনুচিত প্রার্থনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটু দরদস্তুর করিলেও করিতে পারে। তবে শুনিয়াছি, এখানকার পাণ্ডাগণ অন্যান্য তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণের ন্যায় অতিশয় অর্থলোলুপ নহে। আর একটি কথাও বক্তব্য;—এখানে যাত্রিগণ দক্ষিণার পরিমাণানুসারে প্রসাদ পায়। দক্ষিণদেশীয় সওদাগর ও শ্রেষ্ঠীগণই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর্শনী দিয়া থাকে, এবং তাহাদের আহারের জন্য নারায়ণের উৎকৃষ্ট প্রসাদ প্রেরিত হয়। যাহা হউক, অন্য যাত্রীরাও প্রসাদে বঞ্চিত হন না; কারণ, যদিও তাঁহারা নারায়ণের মন্দির হইতে তেমন আহারদ্রব্য পান না, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে পরলোকে স্বর্গধামে অক্ষয়সুখলাভের

নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করিয়া দেন। আমাদের জন্য স্বর্গবাস বা অক্ষয় সুখের আশীর্ব্বাদ হিন্দু ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার; ব্রাহ্মণগণ বা তাঁহাদের দেবতারা হিন্দুর জন্য এ সকল ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কোন প্রকারেই তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গগমনের ব্যবস্থাপত্র বা পরোয়ানা পাইব না; তাঁহাদের স্বর্গে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অথচ এতগুলি টাকা দক্ষিণা দিলাম, তাহার জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু পাওয়া উচিত! পরলোকের দিকে যখন আমাদের আশার কিছুই নাই, তখন অন্ততঃ ইহলোক কিঞ্চিৎ লাভ হওয়া উচিত। রাহুল মহাশয় ও তাঁহার পার্শ্বচর ব্রাহ্মণগণ এ কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই সেই দিন অপরাহ্নে রাহুল মহাশয় আমাদিগের পটমণ্ডপে কিছু উপহার পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের তিন জনের জন্য উৎকৃষ্ট বসন্ত রঙ্গের তিনটি মস্‌লিনের পাগড়ী। তিনি আরও অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন আমরা নারায়ণের সম্মানার্থ সেই পাগড়ী মন্দির মধ্যে ব্যবহার করি। শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্মান-প্রদর্শন আর হইতে পারে না। আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে নারায়ণের পুরোহিত-প্রদত্ত পবিত্র উষ্ণীষ মস্তকে পরিধান করিলাম; ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

"প্রতিদিন প্রাতঃকালে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, এবং বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যাত্রিগণ নারায়ণদর্শন করিতে পায়। তাহার পর দেবতার মধ্যাহ্নের আহার প্রস্তুত হয়; সুতরাং তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। দেবতা আহার করিয়া হিন্দু প্রথা অনুসারে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। সূর্য্যাস্তের পরে আবার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কোন কোন দিন অল্পক্ষণ পরেই দেবতার নিদ্রাকর্ষণ হয়, কোন দিন বা বিলম্ব হয়; অর্থাৎ যাত্রীর পরিমাণ অনুসারে নারায়ণকে নিজ আহার-নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অপর কোনও ধাতুতে নির্ম্মিত পাত্রে নারায়ণের ভোগ হয় না। যখন অধিক যাত্রিসমাগম হয়, তখন দেবতার আহার ও পরিচ্ছদের বিশেষ পারিপাট্য হইয়া থাকে। তাহার পর যখন প্রখর শীত নামিয়া আইসে, যখন পর্ব্বতগাত্র শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, যখন তুষাররাশি নারায়ণের মন্দির গ্রাস করিতে অগ্রসর হয়, তখন নারায়ণকে দীর্ঘ কালের জন্য নিদ্রার অবসর দিয়া, সেবায়েতগণ যোশীমঠে পলায়ন করেন।

"ঠাকুরের অলঙ্কার, মণি মুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্র সকল মন্দিরমধ্যেই একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ থাকে। একবার নাকি সেই ভয়ানক শীতকালে (বোধ হয় সেবার বরফ কম পড়িয়াছিল) একদল পর্ব্বত-

বাসী বরফ কাটিয়া মন্দিরের দ্বার ভগ্ন করে, এবং মন্দিরমধ্য হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, জহরত প্রভৃতি এগার মন দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে। গ্রীষ্মাগমে দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে চুরীর কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, এবং অল্পায়াসেই চোরগণ ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, এ প্রকার ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের জন্য তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

"এখানকার সমস্ত ব্রাহ্মণ দক্ষিণদেশীয়। কোনও বিবাহিত ব্যক্তি এখানে দেবসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না। এই জন্য এখানে সকলেই অবিবাহিত থাকে। কিন্তু এই কয় মাস কষ্টে সৃষ্টে এখানে অবস্থান করিয়া যখন তাঁহারা যোশীমঠে ফিরিয়া যান, তখন আর তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমের দিকে দৃষ্টি থাকে না। আমরা অল্প সময় তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমরা চিকিৎসাবিদ্যাও জানি, এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই ঔষধের জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ব্যাধির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের স্বভাবেরও পরিচয় পাইয়াছিলাম। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং রাহুল মহাশয় আমাদিগের নিকট হইতে যে পীড়ার জন্য ঔষধ লইয়া গেলেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, কেবলমাত্র নারায়ণই তাঁহার উপাস্য দেবতা নহেন; তিনি শিলাময় নারায়ণ অপেক্ষা শরীরিণী দেবীগণের সেবায় অধিকতর অনুরক্ত। বর্ত্তমান রাহুলের নাম শ্রীনারায়ণ রাও, বয়স অনুমান বত্রিশ বৎসর। ইনি নেপাল দরবার কর্ত্তৃক এই পুণ্য তীর্থের সেবায়েত নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, ধর্ম্ম বা চরিত্রের বলে এই যুবক এমন পবিত্র কার্য্যের ভার পান নাই, অর্থবলে বা অন্য উপায়ে এই কার্য্য তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। লোকটি বেশ রাজার মত সুখে আছে!

"মেঘমুক্ত দিনে এখান হইতে কেদারনাথের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বদরিনাথ ও কেদারনাথের মন্দির একই পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত; উভয়ের মধ্যে ১৩।১৪ মাইল, ব্যবধান। কিন্তু এ পথে গমনাগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোনও পথ নাই; সমস্ত বৎসর পর্ব্বত তুষারমণ্ডিত থাকে। সুতরাং বদরিকাশ্রম হইতে কেদারনাথে যাইতে হইলে, যাত্রিগণকে যোশীমঠ ঘুরিয়া দশ বারো দিনে তথায় যাইতে হয়। কেদারের পথ অতিভয়ানক; আজ শুনিলাম, তিন চারি শত যাত্রী এ বৎসর ঐ পথে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

হৃদয়-বীণা।

১

এ বীণা বাজে না বুঝি আর!
আজীবন প্রাণপণে
বাঁধি যারে সযতনে
সাধিনু শতেক সুরে তার,—
হায় গো! আজিকে মোর
দুঃখের নাহিক ওর,—
সে বীণা বাজে না বুঝি আর!

২

করিয়াছি কত-না যতন!—
সহিয়াছি শতবার
শোকের শাসন-ভার,
জীবনের মরণ-পীড়ন;
তবু এ বুকের 'পরে
অসীম সোহাগ-ভরে
বীণাখানি করেছি বহন।

৩

চারিদিকে হাসি কোলাহল;
সুখের সরসী-গায়
প্রমোদ-প্রতিমা প্রায়
নাচে কত লহরী তরল!
আমি তারি মাঝখানে
আপন মরম-গানে
ব'সে আছি আপনি বিহ্বল।

৪

শত লোক শত কাজে ধায়;—
রতন-ভূষণ ধন
সুখ-স্বার্থ অগণন,
শত মান-অভিমান তা'য়;
গরবে সমাজ-শিরে
বিহরে বিচরে ফিরে
কুবেরের প্রহরীর প্রায়।

৫

আমি তা'র কিছুই চাহি না;—
এ সংসার যা'র লাগি'
নিশিদিন রহে জাগি'
আমি তা'র কিছুই মাগি না;
শুধু নিরজনে বসি'
মানস-নিকুঞ্জে পশি'
দীন আমি বাঁধিয়াছি বীণা।

৬

রচিয়াছি নন্দন-নিলয়;—
কত মন্ত্র মহাতান
আশার আনন্দ-গান,
কল্পনার কুসুম-নিচয়;—
সে সব এ ভব-বাসে
কেমনে প্রকাশি ভাষে?
তাই সদা মনে জাগে ভয়।

৭

বৃথা বুঝি, বৃথা এ সাধন;
এই বাঁধা বীণাখানি
কে বাজাবে নাহি জানি,
কে গাঁথিবে প্রাণের বেদন;—
কবির হৃদয়-তার
অঙ্গুলী-আঘাতে কা'র
ঝঙ্কারিয়া করিবে কূজন!

৮

আজি মুক্ত প্রসন্ন আকাশ;
শারদ মাধুরী মাখি'
কাননে ডাকিছে পাখী,
উথলিছে শেফালীর বাস;
এমন সরল প্রাতে
সরল প্রকৃতি সাথে
জেগে উঠে গাহিবার আশ।

৯

কোথা তুমি কমল-ভূষণা!
ভক্তের বাসনা-রাশি
বিফলে মা যায় ভাসি,
এস অয়ি সফল বাসনা!
মানসী এ বীণা মোর
কোলে তুলে দিব তোর,
এস মা গো মানস-আসনা!

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

নিয়তির শাসন অনতিক্রমণীয়। নিয়তির প্রতিকূলতা করিতে সামান্য মানবের শক্তি নাই। মানুষ যাহা ভাবে, নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। অল্প দিন হইল, গিরিজাপ্রসন্ন, স্ব-প্রণীত গৃহলক্ষ্মীর দ্বিতীয় ভাগের পুনর্মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে না হইতেই, তিনি নিয়তির অপ্রতিবিধেয় বিধির বলে ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

গ্রন্থকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অল্পদিনমাত্র কর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার জীবনী না লেখাই ভাল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি বিশেষত্ব ছিল। এই বিশেষত্ব বুঝিলে মানুষ সংসারে আপনার গন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে পারে। অল্পদিন মাত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্রে থাকিলেও, গ্রন্থকার আপনার বিশেষত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জীবনী কোন কোন বিষয়ে লোকের শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে।

বরিশাল জেলার সিদ্ধকাটী গ্রামের বৈদ্য রায় চৌধুরী বংশ ধনে মানে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কুলগৌরবে বৈদ্যদিগের মধ্যে যেরূপ সম্মানিত, সম্পত্তি ও সৎকর্ম্মেও সেইরূপ সম্ভ্রান্ত। এই প্রসিদ্ধ বংশে সিদ্ধকাটীর নিজ বাটীতে ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে গিরিজাপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁহার পিতামহ দুর্গাগতি রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন। পিতা মথুরানাথ রায় চৌধুরীও নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্নের বয়স যখন ৫।৬ বৎসর, তখন তিনি একদা ১৭।১৮ হাত উচ্চ গৃহের ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যান। এরূপ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাঁহার জীবনের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। বিধাতা বোধ হয়, তাঁহার চরিত্রগত মাধুর্য্যের নিদর্শন দেখাইবার জন্যই তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন প্রথমে বাসগ্রামের বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা করেন, তৎপরে বরিশাল জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েন। বরিশালে পাঠকালে ১২৮৪ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার পিতামহ দেহত্যাগ করেন। এই বৎসর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহার পর তিনি কলি-কাতার সিটি স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন।

সিটি কলেজ হইতেই এফ্. এ. পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে বরিশালে, শেষে কলিকাতা হাইকোর্টে, ওকালতি আরম্ভ করেন।

গিরিজাপ্রসন্নের পঠদ্দশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। ওকালতিতে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। অনুরাগের অভাবপ্রযুক্ত তিনি উহাতে প্রতিপত্তি লাভ করিতেও প্রয়াস পান নাই। নিজের বৈষয়িক কর্ম্মেও তাঁহার তাদৃশী আসক্তি পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, নিষ্ঠাবান্ গৃহী ও নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী ছিলেন। গত বৈশাখ মাসে যখন কলিকাতায় প্লেগের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তখন তিনি সপরিবারে বাড়ীতে গমন করেন। বাড়ীতে থাকিলেই তাঁহাকে অগত্যা বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত। ঐ সময়ে তিনি আমাদিগের নিকটে লিখিয়াছিলেন—"বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত লইলেই অনেক সময়ে মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমাকেও এখন মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে।" ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে তিনি যে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, এই উক্তিতেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যখন বরিশালে ওকালতি করিতেছিলেন, তখন ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর তিনি ধর্ম্মানুশীলনে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হয়েন।

পঠদ্দশাতেই গিরিজাপ্রসন্ন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। বি. এ. পরীক্ষা দিবার সময়ে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ গৃহলক্ষ্মীর সূত্রপাত হয়। তিনি যখন বি. এল্. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তদীয় প্রধান সমালোচনা-গ্রন্থ "বঙ্কিমচন্দ্রে"র আরম্ভ হয়। প্রথমে তাঁহার একজন বন্ধু "গৃহলক্ষ্মী" লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শেষে তিনি স্বহস্তে সমুদায় ভার গ্রহণপূর্ব্বক উহা সাঙ্গ করিয়া তুলেন। বি. এল্. পরীক্ষার সময়ে তিনি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের একটি চরিত্রের বিশ্লেষণপূর্ব্বক প্রবন্ধ লিখেন। এইরূপে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগত সমুদয় চরিত্রের বিশ্লেষণে "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রস্তুত হয়। শেষবার কলিকাতায় অবস্থিতিকালে গিরিজাপ্রসন্ন তাঁহার একজন বন্ধুর সহিত একটি ছাপাখানা করেন। শেষে তিনি স্বয়ং ছাপাখানার যাবতীয় কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং উহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়েন। এই সময়ে গৃহ-

লক্ষ্মীর দ্বিতীয় ভাগ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় ভাগ প্রণীত ও তাঁহার ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি "হিতকথা" নামে একখানি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থেরও রচনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বলিখিত "কয়েকখানি পত্র" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছিল। তিনি উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক "দম্পতির পত্রালাপ" নাম দিয়া উহা পুনঃপ্রকাশিত করেন।

গৃহলক্ষ্মীর যথোচিত আদর হইয়াছে, এবং "গৃহলক্ষ্মী" অস্মৎসমাজে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীরই কার্য্যসাধন করিতেছে। গিরিজাপ্রসন্ন রচনাকুশল। তাঁহার রচনায় যেরূপ কোমলতা, সেইরূপ মধুরতার সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু কেবল রচনাকৌশলেই "গৃহলক্ষ্মী" সমাদৃত হয় নাই; সমাদরের অন্য কারণ আছে। সেই কারণ—গ্রন্থকারের প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি। নারীজাতিকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইতে হইলে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপদেশ দিতে হয়। যিনি প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরম ভাগবত নহেন, তৎকর্ত্তৃক এই মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। গিরিজাপ্রসন্ন ধর্ম্মভাবে উদ্ভাবিত হইয়া, প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর গুণাবলী দেখাইয়াছেন। "বঙ্কিমচন্দ্র" এবং "দম্পতীর পত্রালাপ"ও এইরূপ ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক। চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব কিরূপে পরিস্ফুট হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে প্রধানতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি সুনীতি ও ধর্ম্মভাবের দিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থাবলী তদীয় ভগবদ্ভক্তিপরায়ণতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অদ্বিতীয় নিদর্শনস্বরূপ। এই ভক্তি ও নিষ্ঠাই তাঁহার বিশেষত্ব, এবং এইরূপ বিশেষত্ব তাঁহার চরিত্রের যেরূপ উৎকর্ষের পরিচায়ক, অপরের পক্ষেও সেইরূপ সুনীতির উদ্দীপক।

গিরিজাপ্রসন্নের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া, কয়েক মাস পরে গতাসু হয়। অদৃষ্টচক্রের এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব আবর্ত্তন দেখিয়া, তিনি অদৃষ্টপরীক্ষার জন্য জ্যোতিষের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ফলিতজ্যোতিষে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি কোষ্ঠী দেখিয়া, ফলাফল বলিতে পারিতেন, এবং স্বয়ং কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেও জানিতেন। তাঁহার গৃহলক্ষ্মীতে তদীয় জ্যোতিষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মচর্য্যায় সে সকল বহিরঙ্গ অন্তঃশুদ্ধির প্রধান সাধন, গিরিজাপ্রসন্ন তৎসমুদয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মসম্মত সমস্ত আচার যথাবিধি পালন করিতেন। প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যোপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, মাসবিশেষে ও বারবিশেষে

হবিষ্য, একাদশী, অমাবস্যা, ইহার কোনটিই তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না। সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ঊষাকালে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া গীতাখানির আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে করিতে বাসাবাড়ীতে ফিরিতেন, তৎপরে পূজা ইত্যাদির সমাপন করিয়া, বৈষয়িক কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। স্বপাকভোজন তাঁহার একটি প্রধান নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। বৈশাখ ইত্যাদি মাসে হবিষ্যকালে তিনি স্বপাকভোজন করিতেন। উপবাস বা ব্রতাদির সংযম ও পারণ সময়েও তাঁহাকে স্বপাকভোজন করিতে দেখা যাইত। গঙ্গাস্নানে তিনি গাড়ীতে যাইতেন না, জামা ইত্যাদিরও ব্যবহার করিতেন না; নিজ হস্তে গরদের যোড় ও গামোছা লইয়া, খালিপায়ে কলিকাতা—চাঁপাতলার বাসাবাড়ী হইতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন। পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য যেন তাঁহার নিত্যসহচর ছিল। বাড়ীতে থাকিলে গঙ্গাস্নান হয় না বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন না। যৌবনের মধ্যাবস্থাতেই তিনি এইরূপ আচারপরায়ণ হইয়া ভগবানে চিত্তস্থাপন করিয়াছিলেন। যে বয়সে মানুষ বিলাসী ও ভোগাভিলাষী হয়, তিনি সেই বয়সেই চিত্তসংযম ও ঈশ্বরনিষ্ঠার একশেষ দেখাইয়াছিলেন। এই সৌখীনতার সময়ে—সংসারের এই পাপপঙ্কিল ক্ষেত্রে এরূপ দৃশ্য দুর্লভ।

গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রীতি ও স্বজনস্নেহে গিরিজাপ্রসন্নের প্রকৃতি বড় মধুর ছিল। বঙ্কিম বাবুকে তিনি গুরুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন; নিজের প্রেস বঙ্কিম বাবুর নামে অভিহিত করিয়া, তিনি এই ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বে তাঁহার একজন পরম বন্ধুর একটি কন্যা সাংঘাতিক পীড়ায় দেহত্যাগ করে। বন্ধুর বাসাবাড়ী ভবানীপুরে। গিরিজাপ্রসন্ন প্রত্যহ চাঁপাতলা হইতে ভবানীপুরে যাইতেন। তিনি সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাত্রিদিন বন্ধুকন্যার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। তিনি যে এত শীঘ্র অনন্তপদে লীন হইবেন, ইহা তাঁহার আত্মীয়গণ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার দেহ যেরূপ সবল, সেইরূপ সুস্থ ছিল। তিনি সহসা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুঘটনা বড় আকস্মিক—বড় শোচনীয়—বড়ই ভয়প্রদ। প্লেগের আতঙ্ক উপস্থিত হইলে, তিনি যে কলিকাতা হইতে সপরিবারে বাড়ী যান, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাড়ীতে থাকিলে গঙ্গাস্নান হয় না, অধিকন্তু বৈষয়িক কর্ম্মের আতিশয্যে ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত হয়, এই

জন্য তিনি দেশের একটি চাকরকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবণ মাসের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। শেষে তাঁহার দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র লেখা পড়ার জন্য বাড়ী হইতে তাঁহার নিকটে আইসে। ইতঃপূর্ব্বে সীতানাথ নামক একজন আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী তাঁহার বাসাবাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া, কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেন। তিনিও বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, গিরিজাপ্রসন্নের বাসায় থাকেন।

১২ই ভাদ্র (১৩০৫) সীতানাথের জ্বর হয়; ক্রমে নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসক রোগপরীক্ষাপূর্ব্বক উহা নিউমোনিক প্লেগ বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি না কি রোগীকে হাঁসপাতালেও পাঠাইতে কহিয়াছিলেন। যাহা হউক, সীতানাথ রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। ১৫ই ভাদ্র প্রাতঃকালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। গিরিজাপ্রসন্ন সৎকারের জন্য নিমতলা শ্মশানঘাটে গমন করেন। তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের বাসায় সজাতির মৃত্যু হইয়াছে, অতএব তাঁহার সৎকারের সময় নিজের উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই তিনি কর্ম্মচারীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

যে দিন সীতানাথের মৃত্যু হয়, সেই দিনই গিরিজাপ্রসন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ও চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে যাত্রা করেন। কিন্তু কাল তাঁহাকে ছাড়িল না। যে সর্ব্বসংহারক রোগ সীতানাথের জীবন হরণ করিয়াছিল, বাড়ীতে ২০শে ভাদ্র গিরিজাপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সেইরূপ রোগে দেহত্যাগ করিল। ঐরূপ রোগে তাঁহার চাকরটিরও মৃত্যু হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রের পীড়ার সময়ে তিনিও ঐরূপ রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার মমতা ছাড়িয়া গেল। তিনি চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ২০শে ভাদ্র রাত্রিতে তাঁহার জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা গেল। তৎপর দিন নিউমোনিয়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। ক্রমে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল; কিন্তু জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। গিরিজাপ্রসন্ন এই অবস্থায় ২২শে ভাদ্র প্রাতঃকালে তিনটি কন্যা ও একটি শিশু পুত্র রাখিয়া, অনন্তপদের ধ্যান করিতে করিতে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ছয় দিন পরে ঐ দুরন্ত রোগ তাঁহার মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীরও সর্ব্বদেবময় পতির অনুগমনের সহায় হইল। দেখিতে দেখিতে জলবিম্বগুলি একে একে অনন্ত সাগরের জলরাশিতে মিশিয়া গেল।

সহযোগী সাহিত্য।

সমালোচনা।

সাহিত্যের শালতামামি।

বর্ষান্তে সেরেস্তার হিসাব নিকাশের মত সাহিত্যেরও একটা হিসাব নিকাশ করা যাইতে পারে। কোন কোন সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র সে চেষ্টা করিয়াও থাকেন; অর্থাৎ, সমগ্র বৎসরে প্রকাশিত নানাবিধ পুস্তকের সমালোচনা করিয়া, সমালোচ্য বৎসরের বিশেষত্ব বিচার করেন।

"একাডেমী" পত্রে ১৮৯৭ সালের ইংরাজি সাহিত্যের যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। লেখক বলেন যে, বৎসরের প্রারম্ভে প্রকাশকগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সাধারণ পাঠকের পুস্তকপাঠস্পৃহা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। তিনি ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—প্রথমতঃ, লোকে পররাষ্ট্র-নীতি লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, মহারাণীর হীরকজুবিলীর আনন্দোন্মাদে তাহাদের অন্য চিন্তা ডুবিয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে হেমন্তের প্রারম্ভে একেবারে রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

লেখক বলেন যে, সাময়িক সাহিত্যের পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, চলনসই পুস্তক অনেক বাহির হইলেও, ভাল পুস্তক প্রায়ই প্রকাশিত হয় না। প্রকাশিত পুস্তকের অধিকাংশের উদ্দেশ্যই অর্থোপার্জ্জন, অথবা যাঁহারা দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য, অধ্যাপক-পদ-লাভ। গ্রন্থকারগণ বিক্রয়াধিক্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন, অতএব তাঁহাদিগকে সাধারণ পাঠকের খেয়াল অনুসারেই পুস্তক লিখিতে হয়। সে খেয়ালও বড় বিভিন্ন প্রকারের এবং সদাই পরিবর্ত্তনশীল। অতএব নানাপ্রকার রুচি লইয়া পুস্তকগুলির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। চিরস্থায়ী হইবার উপযুক্ত পুস্তক আদৌ প্রকাশিত হয় না বলিলেও চলে। লেখক বলেন যে, সাধারণ পাঠক যখন পয়সা দিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িবে, তখন কোনও বুদ্ধিমান লোক যদি তাহাদের মনের মত লিখিয়া সদুপায়ে দুই পয়সা রোজগার করিতে পারেন, তাহাতে আপত্তি কি? এইরূপ বুদ্ধিমান লেখকগণ যে আমাদিগকে আদৌ সন্তুষ্ট করিতে পারেন না, তাহাও নহে; তবে গ্রন্থরচনা ব্যবসায়ের জিনিস নহে। পক্ষান্তরে, রচনার প্রকৃত লক্ষ্য—জ্ঞানবিস্তার। বাস্তবিক, সাহিত্যসেবকগণ সকল কষ্ট সহ্য করিয়াও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতিসাধনে পরাঙ্মুখ নহেন। দু' দশ বৎসরে একখানি পুস্তকের প্রকৃত সারবত্তা প্রতিপন্ন হয় না। তবে কয়খানি পুস্তক সেই দু' দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে? লেখক বলেন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে খান বারও যদি টিকিয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট।

উপক্রমণিকা।

এ বৎসর প্রতীচ্য সাহিত্যের কবিতাকুঞ্জে কুসুমের সংখ্যা বড়ই বিরল। 'জুবিলী'-গাথা সম্বন্ধে "একাডেমী"র এই সমালোচক বিশেষ কিছু বলিতে অনিচ্ছুক; কারণ, সেগুলি সাময়িক উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতামাত্র। ইহাদের মধ্যে মিষ্টার ফ্রান্সিস্ টম্‌সনের কবিতাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার টম্‌সনের আর একখানি কবিতা-পুস্তক New Poems কবিতার রাজ্যে উচ্চস্থানলাভের যোগ্য। এই খণ্ডকাব্যে রচনাকৌশল বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই নূতন কবির রচনায়

কাব্য।

এখনও স্থানে স্থানে কৃত্রিমতা, শ্রুতিকঠোরতা ও দুর্ব্বোধতা পরিলক্ষিত হইলেও, তাঁহার কবিত্বের উচ্ছ্বাস, আন্তরিকতা ও মনোহারিতা পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। মিষ্টার লায়নেল্ জন্‌সনের "আয়র্লণ্ড" নামক কবিতাপুস্তকে তাঁহার বিদ্যাবত্তা, চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। মিষ্টার আর্থার সিমন্সের "আমোরিস ভিক্‌টিমা" অতি কোমলভাবে বর্ণিত হইলেও একেবারে অসার। অজ্ঞাতনামা "A. E." স্বাক্ষকারীর "The Earth Breath" নামক পুস্তকে কবিতার সাধারণ ঐন্দ্রজালিকভাব বিশেষরূপে বিদ্যমান। ইহা কুহেলিকাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাময় সঙ্গীতের তরঙ্গের মত, পাঠককে স্বপ্নের রাজ্যে উপনীত করে। মিষ্টার থিয়োডোর ওয়াট্‌স্ ডাণ্টনের "Coming of Love" পড়িয়া লেখক বড় নিরাশ হইয়াছেন। মিষ্টার ওয়াটস্ ডাণ্টন্ কাব্যরসসায়রে মগ্ন ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কবিতা লেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার কবিতায় তাঁহার নিজের প্রভাব বই অন্যের প্রভাব দৃষ্ট হয় না। মিষ্টার লুগালিয়ের ওমার খাইয়ামের কবিতার অনুবাদ, মিষ্টার আল্‌ফ্রেড্ অষ্টিনের "Conversion of Winckelmaun" নামক একটি চলনসই কবিতা, এবং নবীন কবি মিষ্টার হেনরী নিউবেণ্টের "Admirals All" নামক কবিতাও উল্লেখযোগ্য। অন্য ভাল কবিতার অভাবে, "একাডেমী" পত্রের লেখক, পাঠককে মেরেডিথ. মিসেস্ ব্রাউনিং ও মিষ্টার অষ্টিন্ ডব্‌সনের পুনঃপ্রকাশিত কবিতাগুলি পাঠ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

এ বৎসর উৎকৃষ্ট কবিতাও যেমন বিরল, উচ্চ দরের সমালোচনাও তদ্রূপ। লেখক বলেন, মিষ্টার হেন্‌লী কৃত রবার্ট বার্ন্‌সের সমালোচনা অত্যন্ত গবেষণাপূর্ণ। মিষ্টার হেন্‌লীর সহিত যাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের নিকটেও হেন্‌লীর রচনার ওজস্বিতা পদে পদে প্রশংসিত হইবে। হেন্‌লীর সমালোচনায় বার্ন্‌সের রচনাবলী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হেন্‌লী, সমালোচ্য কবিতাগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং সাহিত্যের রাজ্যে তাহাদের একটা স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন। যত দিন হেন্‌লীর মত প্রতিভাশালী আর একজন সমালোচক বার্ন্‌সকে অন্য ভাবে প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন, তত দিন বার্ন্‌সকে হেন্‌লীর বর্ণিত বার্ন্‌স্ বলিয়াই অনেকে বুঝিবেন। মিষ্টার র‍্যালে "Style" সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীয় বক্তব্য বিষয় উপমায় অলঙ্কৃত করিয়া দৃঢ়ভাবে ও বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। মিষ্টার র‍্যালের উপর মেরিডিথের অত্যন্ত প্রভাব।

সমালোচনা।

উপন্যাস-আলোচনার-প্রারম্ভে লেখক বলেন, এলিজাবেথের সময় নাটক যেমন তদানীন্তন সাহিত্যের বিশেষত্ব ছিল, তেমনই আধুনিক সাহিত্যের বিশেষত্ব—উপন্যাস। কাব্যের মত মনোজ্ঞ ও হৃদয়স্পর্শী না হইলেও, উপন্যাসে উদারতা ও সার্ব্বজনীনতার অভাব নাই। এ বৎসর উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। মিষ্টার মেরিডিথের কোনও নূতন উপন্যাস প্রকাশিত না হওয়ায় লেখক বড় দুঃখিত হইয়াছেন। মিষ্টার টমাস্ হার্ডির "The well Beloved" নামক নবপ্রকাশিত উপন্যাস তাঁহার অশ্লীলতাপূর্ণ "Jude" নামক পুস্তকের ন্যায় অশ্লীল নয়। কিন্তু বক্ষ্যমাণ পুস্তকখানি উচ্চদরের উপন্যাস নহে। "St. Ives" মিষ্টার ষ্টিভেন্সনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট "Romance" হইতে পারিত; কিন্তু ষ্টিভেন্সন এখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এবং তাঁহার "Romance" লিখিবার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না। রডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর "Captains Courageous" উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার হেনরী জেম্‌সের ক্ষমতা তাঁহার "The Spoils of

উপন্যাস।

Poynten" এবং "What Maisie Knew" পুস্তকদ্বয়ে অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি জগতের কলুষিত বিষয়বাসনাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ, এবং সৌন্দর্য্য ও "Unspotted Soul"কে স্বর্গের উচ্চতম সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মিষ্টার গিসিং, মিষ্টার জেম্‌সের মত লিপিকুশল না হইলেও, "The Whirlpool" তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। তাঁহার উচ্চ নৈতিক আদর্শ এবং উৎকৃষ্ট আখ্যানবস্তু বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে জীবনের মলিন চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মিষ্টার গিসিং যে নিপুণ চিত্রকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চিত্র আদর্শানুরূপ। অতঃপর লেখক অনেকগুলি উপন্যাসের কেবল নামোল্লেখ করিয়াছেন। উপন্যাস-সমালোচনার উপসংহারে লেখক বলেন যে, উপন্যাস উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতেছ। আধুনিক সমাজের সমস্যা হইতেছে "উপন্যাস", এবং প্রহেলিকা হইতেছ "অবসাদ!"

লেখকের মতে, উপরি-উক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় অবধানযোগ্য পুস্তক অত্যন্ত বিরল। জীবনচরিত-প্রকাশের খেয়াল আজও কমে নাই। বিক্রয়লব্ধ মুদ্রায়, অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকেরই মুদ্রাঙ্কণব্যয়ের সঙ্কুলন হয়। বলিতে গেলে, একরূপ অকারণে অত্যন্ত সাধারণ লোকের বড় বড় জীবনচরিত অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এগুলি সাধারণতঃ আত্মীয় স্বজনের গর্ব্ব-পরিতৃপ্তির উপাদান। আবার যাঁহাদের জীবনচরিত বাস্তবিকই লিখিবার উপযুক্ত, তাঁহাদের জীবনের ও কার্য্যের এমন সব তুচ্ছ ঘটনা ও ভ্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয় যে, তাহাতে অনিষ্ট বই ইষ্টের আশা অতি অল্প।

জীবনচরিত।

ম্যাডাম ডারমেস্‌টেটারের "রেণা-চরিত" ও কাপ্তেন মেহানের "নেল্‌সনের জীবনী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুত্র-লিখিত "টেনিসনের জীবনচরিত" ঘটনার অংশে অত্যুৎকৃষ্ট ও অত্যাবশ্যক। লেখকের মতে, লর্ড রবার্টসের "Forty-one yeas in India" বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

অবশেষে লেখক বিবিধপ্রকার পুস্তকের এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এ স্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "বিদেশী বাঙ্গালী—পাণ্ডাচার্য্য" কৌতূহলের উদ্দীপক সুপাঠ্য রচনা। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "সাহিত্য-সংবাদ" সকলেরই পাঠ করা উচিত। এই নিবন্ধে, শব্দতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্ম্ম, মানব-তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের নবাবিষ্কৃত তথ্যের ও অভিনব মতবাদের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইতেছে। বিষয়বিবেচনায় নামটি কিন্তু অন্বর্থ হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "পঞ্চদশ বর্ষ গত" ইতিশীর্ষক কবিতাটি পরিবর্ত্তমান সংসারচক্রের অবিকল ছবি। সম্পাদক মহাশয়ের রচিত "ব্রাহ্মসমাজের দুটি রত্ন—বীর দ্বারকানাথ ও ঋষি রামতনু" পড়িয়া আমরা বিচিত্র রস উপভোগ করিয়াছি। প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বীর ও ঋষির বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতে না পারি, সম্পাদক মহাশয়ের সাধুতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। কথায় বলে, 'প্রদীপের নীচেই অন্ধকার!' কথাটি নিতান্ত মিথ্যা নহে। "নব্যভারতের" সম্পাদক তাহার উত্তম উদাহরণ। তিনি যে প্রবন্ধে বীর দ্বারকানাথের

সাহস ও স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করিতেছেন, সেই প্রবন্ধেই, কাহারও নাম না করিয়া, উদ্দেশে গালি দিয়া কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন। যে প্রবন্ধে ঋষি রামতনুর বিনয় দেখিয়া নিজে বিগলিত হইয়াছেন, সেই প্রবন্ধেই অবান্তরভাবে আত্মপ্রশংসা ও সাধারণভাবে পরনিন্দার অবতারণা করিয়া ঔদ্ধত্য ও অবিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ বিরুদ্ধ রসের একত্র সমাবেশে প্রবন্ধটি প্রহসনের ন্যায় হাস্যজনক সুতরাং রমণীয় হইয়াছে। "প্রফুল্লমুখী" "ভারতী" পত্রে প্রকাশিত হীরেন্দ্র বাবুর "প্রফুল্ল" প্রবন্ধের প্রতিবাদ। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর রচিত "প্রফুল্লমুখী" প্রকাশিত হইল, কিন্তু হায়! গিরিজাবাবু আজ কোথায়? "সাহিত্যে"র পাঠক, অন্যত্র তাঁহার সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৫ম ভাগ; দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রাবণ। এবার "চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী" প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিলাম। প্রাচীন কাব্য প্রভৃতির উদ্ধার পরিষদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মনে করি,—এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সম্পাদক মহাশয় আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "উপসর্গের অর্থবিচার" প্রবন্ধের প্রথমাংশ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বক্ষ্যমাণ সংখ্যায় তাহার অবশিষ্ট অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। "উপসর্গের অর্থবিচারে"র মত গবেষণাপূর্ণ 'মৌলিক' প্রবন্ধ, কেবল পরিষদের কেন, ভাষার গৌরব। যে প্রতিভার আলোকে উপসর্গের দুষ্প্রবেশ ও অন্ধকার অতীত-ইতিহাস এমন উজ্জ্বল ও সুপ্রকাশ হইয়াছে, তাহা জাতির গৌরব। স্বল্প পরিচয়ে উপসর্গবিচারের পরিচয়প্রদান অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষার সহিত যাঁহাদের সংস্রব আছে, এই প্রবন্ধের সবিশেষ আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক।

ভারতী। শ্রাবণ। "দেবীপ্রতিমা" একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তু সামান্য, কিন্তু লেখক ভাষার ছটায় ও অলঙ্কারের ঘটায় গল্পটি বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। লেখক সংস্কৃতশব্দ-বিন্যাসে প্রাচীন আচার্য্যগণের অনুগামী, কিন্তু তাঁহার রচনাপ্রণালী আধুনিক সাহিত্য-শিল্পের অনুগত: এমন সংস্কৃতবহুল ভাষা প্রচলিত সাহিত্যে বহুকাল দৃষ্টিগোচর হয় নাই। লেখকের শব্দচয়ন সুন্দর, গ্রথনকৌশল মনোরম;—উভয়ই ক্ষমতার পরিচায়ক। এখনকার কালে এরূপ ভাষার উপযোগিতা আছে কি না, তাহা পরীক্ষাধীন। বক্ষ্যমাণ গল্পেই দেখা যাইতেছে, ভাষার গুরুভারে রচনা অনেক স্থলে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; কষ্টকল্পনার প্রকোপে ও ভাষার বাহুল্যে অলঙ্কারের সুষমা, ভাবের উচ্ছ্বাস আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর, গল্পটি রমণীয়। "দেবীপ্রতিমা" মুখরোচক চাটনী; ইহার দ্বারা ক্ষুধার শান্তি হয় ত সম্ভাবিত নয়, কিন্তু মুখ বদলান চলিতে পারে। সে হিসাবে ইহা বিলক্ষণ প্রশংসনীয়। "আচারে যুক্তি" চিন্তাপূর্ণ সন্দর্ভ। যাঁহারা ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহেন, এবং ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে গালি দিয়া সর্ব্বাগ্রে সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেন, তাঁহাদের পক্ষে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি প্রকৃষ্ট পথ্য। "আচারে যুক্তি"র আদ্যোপান্ত অনুসরণ করিয়া বোধ হয়, "আধুনিক সমাজদ্রোহী বৈরাগ্যধর্ম্মপ্রচারকগণের বুদ্ধিদোষে হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংসারদ্বেষের একটা যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন" লেখকের এই সিদ্ধান্ত অযথার্থ নহে। "বস্ত্ররঞ্জন বিদ্যা"র আলোচনা প্রার্থনীয়। "সাময়িক সাহিত্যে" "সাহিত্যের" সমালোচনাস্থলে মাননীয় "ভারতী"-সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ শিষ্টাচারের পরিচয় দিয়াছেন। ফাল্গুন-চৈত্রের "সহযোগী সাহিত্যে" প্রসঙ্গক্রমে অস্মদ্দেশের লেখক ও সমালোচকের অহিনকুলভাবের বিষয়ে সাধারণভাবে দুই এক কথা বলা হইয়াছিল। "ভারতী"র সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, ব্যক্তিবিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে। তথাপি তিনি "সহযোগী সাহিত্যে"র লেখককে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিতে লজ্জিত হন নাই। 'টুপী ব্যক্তিবিশেষের মাথায়

'ফিট্' হইয়া বসিলে টুপীওয়ালা বেচারা কি করিতে পারে?' স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার প্রতিবাদের ভাষা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—"মেছোহাটার ভাষা এত দূর পৌঁছে না," * তাঁহার আক্রমণের নমুনা নূতন করিয়া না দিলেও চলে। আমরা কবি-বরের এই 'চাপানে'র 'উতোর' গাহিতে বস্তুতই অসমর্থ।

হায়েনের অনুবাদ।

প্রেমিকা।

স্বপ্নশ্রান্তা ফুল্ল কুমুদিনী
হ্রদ হতে চাহে ঊর্দ্ধ পানে,
তা'র পানে চেয়ে আছে চাঁদ
প্রেমব্যথা বহিয়া পরাণে।

লাজে ভয়ে নতদৃষ্টি বালা,
চেয়ে দেখে সেই নীল জলে
ম্লানজ্যোতি প্রণয়ী তাহার
আছে পড়ে তার পদতলে।

আশঙ্কা।

ঝর ঝর ঝরে বারিধার,
খরবেগে ঝড় বহে যায়,
বিধুরা সে বালিকা আমার
না জানি সে রয়েছে কোথায়!

অলস স্বপনজাল লয়ে
গেহে তার একেলা বসিয়া,
চাহিছে সে আকুল আঁধারে
অশ্রুময় নয়ন মেলিয়া!

নাগিনী।

দেখ গান মোর গরলেতে ভরা;
বিষহীন হবে তা কেমনে?
বিষময় করেছ যে তুমি,
ওগো যাহা কিছু আছে এ জীবনে!

দেখ গান মোর গরলেতে ভরা;
কেমনে তা হ'বে বিষহীন?
হৃদে মোর রয়েছে নাগিনী;
আছ তুমিও সেথায় নিশিদিন।

শূন্য।

তোমার ও দুটি ব্যাকুল নয়ন
মোর পানে আর নাহি ত চেয়ে,
চারি দিকে মোর রয়েছে কেবল
নিশীথ-শীতল আঁধার ছেয়ে।

সকলি গিয়েছে, গিয়েছে যখন
নিবিয়া প্রেমের মধুর বাতি,
শূন্য কেবল চারিদিকে মোর
আবর' আমারে আঁধার রাতি!

মধুমাসে।

কুসুম-মুকুল হরষে আকুল
মধুময় মধুমাস;
বুঝিনু তখন মধুরে কেমন
হৃদে ফুটে প্রেমবাস।

বিহগেরা সব ঢালে মধুরব
মধুময় মধুমাস;
আকুল ভাষায় বলেছিনু তায়
আমার প্রাণের আশ।

প্রলোভন।

যেখানে ঝরিয়া পড়ে মোর আঁখিজল,
সেখানে বিকশি' উঠে ফুল শত শত;
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে ভেদি হৃদিতল
কোকিলের কাকলিতে হয় পরিণত।

আমারে বাসিলে ভাল হবে লো তোমার,
মধুর মধুরতম ফুটে যত ফুল
বাতায়নপথে তব গাবে অনিবার
সুমধুর কলকণ্ঠ কোকিলের কুল।

* প্রচার; প্রথম বৎসর, অগ্রহায়ণ-সংখ্যা, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

সাহিত্য; নবম বর্ষ; সপ্তম সংখ্যা।

মোহনলাল।

ছদিন হইল, আমি "নবজীবনে" "বঙ্গে ইংরেজাধিকার" এই শিরোনাম
য়া, কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ঐ প্রবন্ধমালা শেষে মৎপ্রণীত "ভারত-
সঙ্গ" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। বাঙ্গালায় ইংরেজের আধিপত্যস্থাপন-
সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, আমি উক্ত প্রবন্ধমালায়
ইরূপ পরিচয় দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। এখন গবেষণাকুশল
লেখকগণ সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন।
ক জন অতীতদর্শী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়া,
তিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। সিরাজের চরিত্র এখন যে ভাবেই চিত্রিত হউক
কেন, উহার একাংশ যে কলঙ্কের কালিমায় সমাচ্ছাদিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ
াই। সিরাজ তরুণবয়স্ক যুবক। সুশিক্ষায় তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত হয় নাই,
য়োদর্শনে তাঁহার বিচারশক্তি বলবতী হইয়া উঠে নাই, স্থিরতায় বা
াম্ভীর্য্যে তাঁহার সকল কার্য্যেরও সুশৃঙ্খলা ঘটে নাই। এই অপরিণতবুদ্ধি,
দূরদর্শী ও অস্থিরপ্রকৃতি যুবক যে ইংরেজের সহিত ব্যবহারে অনেক স্থলে
য়-মার্গের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার যথোচিত প্রশংসার বিষয়।
াহাতে অনেক গুণ সমাহিত ছিল, কিন্তু সুশিক্ষা ও চিত্তসংযম সহায় না
ওয়াতে, তৎসমুদায় সর্ব্বাংশে পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি যদি সুশিক্ষিত সংযত-
চিত্ত ও সুপথে পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র যেরূপ উজ্জ্বল,
সেইরূপ লোকের অনুকরণীয় হইত। অকবর যে বয়সে সাম্রাজ্যশাসনে উদ্যত
য়েন, সিরাজও সেই বয়সে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদ
াহণ করেন। বয়সের সমতা থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বহু
বষম্য ছিল। কথিত আছে, যৌবনে অকবরের চরিত্র তাদৃশ প্রশংসনীয় ছিল
া। অকবর ক্রোধী ও অসংযতচিত্ত ছিলেন। তিনি উজবেক সর্দ্দারদিগকে
হস্তীর পদে দলিত করিতে আদেশ দেন। তাঁহার আদেশে এক জন সর্দ্দারকে
হস্তীর পদের সহিত শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া, লাহোরের রাজপথ
য়া, লইয়া যাওয়া হয়। তিনি ক্রোধের আবেগে এক জন সামান্য ভৃত্যকে
বনা অপরাধে প্রাসাদের উচ্চ চূড়া হইতে নীচে ফেলিয়া দেন। খোসরোজের
প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি নীতিশূন্য উদ্দাম চরিত্রের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয়েন

নাই। তিনি রাজা মানসিংহকে মর্ত্ত্যলোক হইতে অপসারিত করিবার জন্য বিষাক্ত মোদক প্রস্তুত করিয়াছিলেন; শেষে ভ্রমক্রমে সেই মোদকভক্ষণে নিজেই সাংসারিক ভোগসুখের ক্ষেত্র হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হয়েন। এরূপ হইলেও, সম্রাট্ অকবর ইতিহাসে চিরগৌরবান্বিত। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাঁহার শাসনশৃঙ্খলা, তাঁহার সমদর্শিতা, তাঁহার সৌম্য প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া থাকেন। তিনি মরু প্রান্তরে জন্মগ্রহণ করেন; ঘোরতর দুর্দ্দশার মধ্যে তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। এই দুর্দ্দশা তাঁহাকে কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত পরিচিত করিয়া তুলে। এবং কষ্টসহিষ্ণুতার বলেই তাঁহার অপরিসীম সৌভাগ্যের উদয় হয়। সিরাজউদ্দৌলা কষ্টসহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হয়েন নাই। অত্যাদর ও অতিস্নেহে তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি বিলাসস্রোতে ভাসমান হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল ভাবের একশেষ প্রদর্শন করেন। সিরাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর 'আলালের ঘরের দুলাল'।

এই আলালের ঘরের দুলালের প্রসঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অনেকগুলি লোকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ ও অস্মদ্দেশীয়গণ উভয়েই এ সময়ে আপনাদের অদৃষ্টের পরীক্ষার জন্য এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ের চরিত্রই পরিস্ফুট হইয়াছিল। উভয়েই আপনাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের আশা সমভাবে ফলবতী হয় নাই। ইংরেজ আপনার বুদ্ধিকৌশলে রত্নসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছেন; অস্মদ্দেশীয়গণ ইহাঁদের সহিত মিলিয়া কত দূর ন্যায়পরতা রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সহৃদয় ঐতিহাসিকগণের বিবেচ্য। আলালের ঘরের দুলাল আপনার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ে প্রতিবেশীর শান্তিভঙ্গ করিতে পারেন, অপরিণত বয়স, অসম্পূর্ণ শিক্ষা ও অসৎসংসর্গের বিষয় বিচার করিলে, তাঁহার এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কিয়দংশে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রবীণ পুরুষ এই আলালের সর্ব্বনাশসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা চিরকাল কলঙ্কপঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়া থাকিবেন। এ বিষয়ে ইংরেজ যেমন কলঙ্কিত হইয়াছেন, অস্মদ্দেশীয়গণও সেইরূপ কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়াছেন।

কিন্তু ইহার মধ্যেও দুই এক জন আপনাদের অপূর্ব্ব প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দুই এক জনের বিশ্বস্ততা নিবিড় তমোরাশি ভেদ পূর্ব্বক স্বকীয় ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিয়াছে। আবুল ফজেল, তোড়ল মল প্রভৃতি মন্ত্রিগণ অক-

রের প্রাধান্য ও গৌরব অব্যাহত রাখিতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। রজাফর্, জগৎ শেঠ, মহাতাব্ চাঁদ প্রভৃতি কর্ম্মাধ্যক্ষগণ হতভাগ্য সিরাজের র্ব্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই ষড়যন্ত্রকারিগণ সিরাজের পার্শ্বে থাকিয়াই, বিশ্বস্ততার ভাণ করিয়া, অবিশ্বস্ত ভাবের একশেষ দর্শন করেন। কিন্তু সিরাজের পার্শ্বে আর এক জন ছিলেন। ইনি বিশ্বস্ততায় সর্জ্জন দেন নাই, প্রভুভক্তির অবমাননা করেন নাই, আত্মসুখবৃদ্ধির আশায় রদেশীয়েরও শরণাপন্ন হয়েন নাই। এই প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মোহনলাল।

"রেয়াজস্ সলাতিন" নামক গ্রন্থে মোহনলালের যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, এখন তৎসম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছে। সলাতিন-কার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোহনলাল কায়স্থ ছিলেন। তিনি যে সিরাজের হস্তে আপনার ভগিনী সমর্পণ করিয়াছিলেন, সলাতিনে তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। সিরাজ যখন বাঙ্গালার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন নাই, তখনও মোহনলাল তাঁহার এক জন প্রধান কর্ম্মচারীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতে যাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার প্রতি অনুরাগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সিরাজ মোহনলালের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু অনুরাগের পরিচয় দিতে গিয়া, তিনি অসমীক্ষ্যকারিতা প্রকাশ করেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কম ছিল। তিনি যদি প্রিয়পাত্রের পদগৌরব বুঝিয়া, অনুরাগের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যে কাহারও বিরক্তি জন্মিত না। কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল অপরিণামদর্শী ছিলেন। তিনি নবাব হইয়া মোহনলালকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দিয়া বহুসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যের অধিনায়ক করিলেন, এবং দরবারের যাবতীয় প্রধান ব্যক্তিকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তৎপ্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে আদেশ দিলেন। কেহ কেহ এই আদেশানুসারে কার্য্য করিলেন। কিন্তু মীরজাফর নবাবের আদেশপালনে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। নবাবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নবাব আলিবর্দ্দীর সময় হইতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তিনি নবাবের প্রধান আত্মীয়, প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। মোহনলালের ন্যায় একজন সামান্য কর্ম্মচারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, তাঁহার নিকট নিরতিশয় অবমাননাজনক বলিয়া বোধ

হইল। তিনি এইরূপ অবমাননাকর আদেশে এরূপ অসন্তুষ্ট হইলেন যে, নবাবের নিকট গিয়া, তৎপ্রতি সম্মানপ্রদর্শনেও কিছু দিন নিরস্ত রহিলেন।

এ দিকে মোহনলাল নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। যদি গাম্ভীর্য্য বা সুশিক্ষা অবলম্বনস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে উন্নতপদমূলক অসামান্য প্রাধান্য ও ক্ষমতা সহসা লোকের চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। মোহনলালেরও এইরূপ মতিভ্রম ঘটিল। অনুরাগীর অনুগ্রহে মোহনলাল উচ্চপদ লাভ করিয়া অসঙ্গতভাবে আপনার ক্ষমতার পরিচালনায় উদ্যত হইলেন। তিনি আপনার আত্মীয় স্বজন ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। পুরাতন কর্ম্মচারিবর্গ অপসারিত হইলেন। মুতাক্ষরীণকার সৈয়দ গোলাম হোসেন একটি প্রধান রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। মোহনলাল তাঁহাকে কহিলেন, তিনি যদি মাসিক দুই শত টাকা বেতনের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নবাব-সরকারে থাকিতে পারেন, নচেৎ তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। তেজস্বী গোলাম হোসেন সম্মত হইলেন না। তিনি আপনাদের পবিত্র তীর্থ মক্কায় যাইবার ছল করিয়া হুগলীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সিরাজের চরিত্র কলঙ্কের রেখাপাতে কালীময় হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু মোহনলাল গর্ব্বিত এবং আত্মক্ষমতার বৃদ্ধিতে আত্মম্ভরী হইলেও, বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। প্রভুভক্তিতে তিনি অবিচলিত ছিলেন, প্রগাঢ় বিশ্বস্তভাবে তিনি কর্ত্তব্য-পথে অটলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রতিপালকের হিতকামনায় তিনি সর্ব্বক্ষণ সংযত ভাব, একাগ্রতা ও যত্নের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। যে বিপুল ষড়যন্ত্রের অভিঘাতে সিরাজের অধঃপতন হয়, মোহনলাল তাহার মধ্যে ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত মীরমদন ও মোহনলালের বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই উভয় বীরপুরুষই সেই ঘোরতর বিপত্তিময় স্থলে সেই কুচক্রিগণের অপূর্ব্ব চক্রান্তজালের বিকাশক্ষেত্রে হতভাগ্য সিরাজের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিলেন। কথিত আছে, মীরমদন চক্রান্তকারীদিগের কুপরামর্শে একবার বিচলিত হইয়াছিলেন। যখন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়, তখন কর্ত্তব্যপথে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল। শেষে তিনি আপনার অসাধুভাবের দমন করেন। কিন্তু মোহনলালের চরিত্র এ বিষয়ে যেরূপ কলঙ্কশূন্য, সেইরূপ

উজ্জ্বল! মোহনলাল কখনও প্রভুপরায়ণতায় বিসর্জ্জন দেন নাই। প্রভুর অনিষ্টজনক কর্ম্মসাধনে কখনও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বক্ষণ অটল, অপরাজেয় ও অনমনীয় ছিলেন। কথিত আছে, ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াই তিনি নবাবকে মীরজাফরের প্রাণনাশের পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মীরজাফর নিহত হইলে আর কেহ ইংরেজের সহিত সম্মিলিত হইয়া, তদীয় প্রভুর সর্ব্বনাশসাধনে সাহসী হইবে না। কিন্তু সিরাজ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। মীরজাফরের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে তাঁহার অভিরুচি হয় নাই। অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণমতি যুবকের এইরূপ সদাশয়তা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। এ স্থলে কলঙ্কলিপ্ত মীরজাফরের পার্শ্বে সিরাজের উজ্জ্বলতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।

রেয়াজস্ সলাতিনে মোহনলালকে যে ভাবে দেখা যায়, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। মোহনলালের শত অপরাধ থাকিতে পারে, কিন্তু যে গুণ মানবহৃদয়ের একটি প্রধান ভূষণ, মোহনলালের হৃদয় সেই গুণে অলঙ্কৃত ছিল। মোহনলাল সেই গুণেই সহৃদয়সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

সাহিত্য-পঞ্জী।

কলিকাতা-ওয়ালারা, হুগলী-তট-বাসীরা, পূর্ব্ব বাঙ্গালার (উত্তর-বাঙ্গালারও বটে এবং দক্ষিণ-বাঙ্গালারও কোন নয়?) বাঙ্গালে কথা শুনিয়া যে হাসেন—বাঙ্গালে কথা লইয়া যে বিদ্রূপ করেন, সেটা তাঁদের আত্মাভিমানের, অজ্ঞতার, অথবা কূপমণ্ডূকত্বের ফল। নহিলে, কলিকাতার 'ককনী'র কথা যদি বাঙ্গালা কথা হয়, কর্ণফুলীর ও মেঘনার মাঝীদের কথাও বাঙ্গালা কথা বটে। একের কথা অপরের কর্ণে যেমনই বাজুক,—একের কথা অপরের কাছে যতই অবোধ্য হউক, উভয়েরই এক ভাষা বই দুই ভাষা নয়। পরন্তু, কলিকাতার ককনী ও কলিকাতা অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি বাঙ্গাল না-হন, তবে ঢাকা ও চাটগাঁর অজপাড়াগেঁয়েরাও বাঙ্গাল নয়,—অন্ততঃ বেভাঁজ বাঙ্গাল নয়। চাটগাঁ যদি বাঙ্গাল হয়, চুঁচুড়াকেও বাঙ্গাল বলিতে বাধা কি? কথার আওয়াজ ও উচ্চারণটা আসলে আর কিছুই নয়, কেবল কাণের অভ্যাস ও মনের খট্‌কা। যে আওয়াজের ও যে উচ্চারণের কথাটা বা কথাগুলা যাহারা চিরকাল, আজন্ম শুনিয়া আসিতেছে, সেই আওয়াজ ও উচ্চারণই তাদের

কাণে ভাল লাগে, মিষ্ট লাগে, উপযুক্ত বোধ হয়। তাহার বিপরীত হইলেই হাসি পায়, অবোধ্য ও বিসদৃশ বোধ হয়। অতএব বলা অতিরিক্ত যে, কলিকাতা হাবড়া হুগলী চুঁচুড়াই যে চাটগাঁ, চাঁদপুর, ঢাকা ও নোয়াখালীর উচ্চারণ আওয়াজে হাস্য-রস-অবতারণার অধিকার পাইয়া অহরহ সেই অধিকার ব্যবহার করিতেছেন, তাহা নয়। সে অধিকার ও অধিকারের অভিনয় ও ব্যবহার—দুই দিকেই সমভাগে বিভক্ত। নোয়াখালি চাটগাঁয়, হুগলী চুঁচুড়ার, নদে শান্তিপুরের, নৈহাটী হালিসহরের অধিবাসীরাও হাবড়া কলিকাতা অঞ্চলের কথা শুনিয়া হাস্য-রসে ভাসে, অভিনয় করে।

কলিকাতা অঞ্চলের লোক একাকী এ অঞ্চলে আসিলেই বুঝিতে পারিতেন, এ কৌতুক কি? উপস্থিত লেখক নিজে সম্প্রতি সে কৌতুকের বিষয়ীভূত। কেবল কৌতুকের বিষয়ীভূত নয়, মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্টে ক্লিষ্ট। এ পক্ষের উচ্চারিত সভ্যজনানুমোদিত বাক্যাবলী এ অঞ্চলের ইতর শ্রেণীর একান্ত অবোধ্য। তাহার একরতি ইহারা বুঝে না; শুনিয়া বিস্মিত হয়; মনে মনে বিদ্রূপ করে। মান্য করে বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। তাদের পুরুষ "পোলারা" পশ্চাতে যাইয়া হাসে। কিন্তু, "মাইয়ে-পোয়ারা" মুখের উপরেই মর্ম্মান্তিক মধুর হাসি হাসিয়া দুই পার্শ্বে "সারক্যাষ্টিক্" কটাক্ষ রাখিয়া যায়। আমরা যেন যথার্থই একটি জানোয়ার, কলিকাতার 'জু' হইতে বে-অব্-বেঙ্গলের জঙ্গলে পলাইয়া আসিয়াছি!

মনে হয়, কেন হায়! বাঙ্গাল হইলাম না, কেন আজন্ম বাঙ্গালে কথা শিখিলাম না। এখন শিখিতে চেষ্টা করি, কত কসরত করি। কিন্তু, একে আর হইয়া যায়। তাহাতেও লোকে হাসে, হাততালি দেয়। ইচ্ছা হয়, 'বে-অব-বেঙ্গলে' ঝাঁপ দিই। দোভাষী দ্বারা বিষয়-কর্ম্মই চলে। বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্দ্য, সামাজিকতা ত আর চলে না। প্রণয় প্রেমের ব্যাপারেও দোভাষার দোটানা তরজমায় চলে না। কিন্তু সংসারে সে সবই ত আছে!

ফলতঃ আমার কথা যতই মার্জ্জিত, মোলায়েম, সভ্য, সুন্দর এবং সাধু ভাষা ও সংস্কৃতসৌরভিত হউক, এখানে—এ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ইহা নিষ্ফল। অতএব কুৎসিত। নিষ্ফল, কেন না ইহা কেহই বুঝে না। ইহা কেহই বুঝে না, কাজেই ইহা তাহাদের কাহারও কাণে ভাল শুনায় না, ইহা কাহারও মনে ধরে না। কাজেই আমার কথা ইহাদের কাছে কুৎসিত। যাহা সফল, তাহাই সুন্দর; যাহা নিষ্ফল, তাহাই কুৎসিত।

সফলতাতেই সৌন্দর্য্য। নিষ্ফলতাই অসুন্দর, কুৎসিত। utilityতেই beauty; unutilityতে ugliness। ইহা অগ্রে কেবল কেতাবে পড়িয়াছিলাম। অধুনা কার্য্যক্ষেত্রে দায়ে পড়িয়া বুঝিতেছি।

কিন্তু, পুনর্ব্বার এ পক্ষ বিষয়ের বাহিরে, ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পঞ্জীর তিথি নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহগণ হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

"সাহিত্য"-পত্রের 'টু-দি-পয়েণ্ট'-প্রিয় সম্পাদক-যুবক নিশ্চয়ই এ পক্ষের মস্তিষ্কের উপরে অকাল-ভীমরতির আবির্ভাবের আভাস দিয়া, আন্তরিক বেদনাপূর্ণ আক্ষেপপত্র পাঠাইবেন! কিন্তু, প্রিয় সম্পাদক, তুমি আপাততঃ তাহা না পাঠাইয়া, যদি প্রলোভন সংবরণ করিতে পার, তবে, বাহিরের বাজে বাক্যগুলা বরং মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইও না। অথবা তোমার প্রেসের প্রেতবর্গকে কহিয়া দিও, এ পক্ষের প্রলাপগুলাকে পঞ্চীকৃত করিয়া দেয়;—যদিও তাহা পঞ্জিকা বই গঞ্জিকা নয়।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী লইয়াই বড় বড় বিশারদদের বিষম বিবাদ;—বাঙ্গালা ভাষা ত তাহার পরের পর্য্যায়! পঞ্জিকা-কার অগ্রে বল, আদি বঙ্গ কোথায়, মূল বাঙ্গালী কে? তাহার পর গণিয়া কহ, কোন জাতির বায়ুকোষে বাঙ্গালা ভাষার বীজ ছিল ও কাহা হইতে সর্ব্বাগ্রে বাহির হইয়াছিল?

অদ্যকার সম্মার্জ্জিতা, সংস্কৃতশব্দালঙ্কারশোভিতা, বিলাতি-'ইডিয়ম'-অভিসারিকা বিধুমুখীর বীজ, দ্রাবিড়ীয়, কোলীয়, সাঁওতালীয়, বা নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত?

কাঁঠালপাড়ার পুরাণ পাঁজীর মতে, শ্রীমতী সংস্কৃত হইতে উত্থিতা বা সংস্কৃতের গর্ভজাতা; অতএব প্রাকৃতের কন্যা নহেন, কনিষ্ঠা ভগিনী। কেহ কহেন কন্যা, কাহারও মতে কনিষ্ঠা ভগিনী! অতি রমণীয় সম্বন্ধনির্ণয় বটে!

কাঁঠালপাড়ার মতে, আর্য্য ঠাকুরেরা এ দেশে আসিয়া এদেশীয়দিগকে আর্য্যী-কৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং এদেশীয়দের অনার্য্যবস্তুমাত্রই এক গণ্ডুষে উদরস্থ করিয়া, আর্য্যপক্ক পদার্থ দ্বারা অনার্য্য-(বঙ্গ?)-ভূমি পরিপূরিত করিয়াছিলেন। অনার্য্যদের আদিম (বাঙ্গালা?) ভাষাটাও সেই গণ্ডুষে তাঁহাদের উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃত, অর্থাৎ সংস্কৃতাম্বিকা বা সংস্কৃতাত্মজা বাঙ্গালা দেবী, তাহার (শূন্য?) তক্তে বসিয়াছিলেন। অতএব তিনি অনার্য্যা নহেন; আর্য্যা—খাঁটী আর্য্যা।

প্রমাণ, বস্ত্রালঙ্কার, বাক্যের ছটা,—ক্রিয়াকর্ম্মের ঘটা—কি নয়? পোশাক,

তৈজসপত্র, এষ্টেট্, আসবাব, সবই ত আর্য্যপক্ক—সুমার্জ্জিত, সংস্কৃত-সুবাসিত। ইহার অস্থি মজ্জা শিরা ধমনী, সবই ত সংস্কৃত। তবে, পেটের ভিতর, পেটরার ভিতর, শিকের উপর, কুলুঙ্গির ভিতর, ধামা ঢাকা, সরা চাপা, চালের বাতায় গোঁজা, ন্যাকড়ায় বাঁধা, উনুনের পিঠে, বালিসের নীচে, জানালার খোপে, তোসকের তলে, লেপের খোলে, ঢেঁকির গড়ে, ধুচুনীর ধড়ে, কোঁচ্তার মাথায়, কুলার গায়, খুকীর খোঁপায়—এখানে ওখানে যেখানে সেখানে যে ঐ যা তা কত কি সব অসংস্কৃত রকমের দেখিতে পাও,—ওগুলো কিছু নয়। উহারা "দেশজ",—অতিশয় ইতর কথা। বঙ্গভাষার এখন এমন রূপ যে, উহাদের নাম ধরিতে লজ্জা করে। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে?

যেখান থেকেই আসুক, ওগুলা আজও খুব গুলজার। আদিম কালের আর্য্য গণ্ডূষ, বোধ করি, উহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে নাই, তাই আজও আছে। তার পর, এ আমলের এঙ্গলো-আর্য্য পিয়ালার পৌনঃপৌনিক "পেগ্"ও উহাদিগকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না। তাই, বোধ করি, বরাবরই থাকিবে।

যাহা দেশজ নয়, তাহা নিশ্চয়ই বিদেশজ। অতএব সংস্কৃত বিদেশজ। ফারসী, উর্দ্দু, আর্‌বী, ইংরেজী, স্পেনিশ, পোরটুগিজ প্রভৃতিরই মতই বিদেশজ; বলা বাহুল্য, এ স্থলে আর্য্যত্ব ও অনার্য্যত্বের কথা নয়;—ভাষা-ভগিনীদের 'এরিয়ান্' ও 'সেমিটিক' বংশত্ব বাদ দিয়াই এখানে কথা। এ স্থলে দেশজ বিদেশজেরই কথা। বিদেশজ মহাশয় বা মহাশয়ারা, বোধ হয়, বাঙ্গালা নহেন—নিশ্চয়ই বাঙ্গালা হইতে পারেন না। আরবী, ফারসী, ইংরেজী, অবশ্য বাঙ্গালা নয়। অতএব বিদেশজ সংস্কৃতও বাঙ্গালা নয়। সংস্কৃত বা তাহার আত্মজ বা অপভ্রংশ। বাঙ্গালা তবে বিদেশজ না হইয়া দেশীয় কেন, বাঙ্গালা কেন, বাঙ্গালা কিসে, বাঙ্গালা কবে হইতে? পঞ্জিকাচার্য্যদিগকেই প্রশ্ন করিতেছি।

বিদেশজ মহাশয়রা বা বিদেশিনী ঠাকুরাণীরা অগ্রে অবশ্য এ দেশে কেহই ছিলেন না। থাকিলে আর বিদেশজ হইবেন কেন? তাঁরা ক্রমে আসিয়া জুটিয়াছেন। কেহ বসবাস করিতে, কেহ ব্যবসা করিতে, কেহ বশীকরণ করিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইতে কেহই আসেন নাই। মারিতে, মথিতে, দংশিতে, দলিতে, শাসিতে, শোষিতে,

নিজড়াইতে, উপড়াইতে আসাই অল্লাধিকপরিমাণে সকলের উদ্দেশ্য ছিল। আজ ইংরেজেরা যদি শাসিতে ও সভ্য করিতে আসিয়া থাকেন, আদিম আর্য্যেরাও এখানে এসেছিলেন তাহাই করিতে, এবং করিয়াছিলেনও তাহাই। তাঁদের শাসনে এবং সভ্যীকরণে, বশীকরণে ও আর্য্যীকরণের পেষণে, দেশীয়দের আদিম ও অপ্রাপ্তবিকাশ ভাষাটি পর্য্যন্ত পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। এবং তাহার পদ অধিকার করিয়াছিল আর্য্য সভ্যতার সন্তান—সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বিকৃতি। জিজ্ঞাস্য, সেই ভাষার সেই বিকারই কি বাঙ্গালা?

যদি তাহাই হয়, সংস্কৃতের প্রাকৃতের সেই বিকারের নাম বাঙ্গালা হইল কেন? তাহার নাম গৌড়ী, পৌণ্ড্রী, রাঢ়ী বা আর কিছু হওয়াই ত উচিত ছিল। হইলেও পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালদিগের নামে তাহা বিশেষিত, পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুরের বলবীর্য্যে—রাজসম্মানের খাতিরে কি? কিন্তু, বিক্রমপুর ত বড় সেদিনের নয়। বিক্রমপুরের বহু পূর্ব্বেই ত উহার জন্ম। তখন ও তাহার পরেও ত পূর্ব্বাঞ্চলের ন্যায় পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ খণ্ডেও স্বস্বপ্রধান স্বাধীন রাজা ছিলেন। অতএব উক্ত বিকৃতির বাঙ্গালা নাম হইল কেন? অথবা তিপূর্ব্বে উহার আর কোন নাম ছিল?

দেখা যাইতেছে, যাঁহাকে ও যাঁহাদিগকে লইয়া এখনকার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা ভাষায় যাঁর এবং যাঁহাদের এখন একাধিপত্য, একছত্রত্ব, তিনি নিজে বাঙ্গালী নহেন; তাঁদের কেহই বিশুদ্ধ বাঙ্গালী নন। তাঁহারা সকলেই প্রবাসী বা উপনিবেশী, বা ভাগ্যপরীক্ষাপরায়ণ ভবঘুরে পর্য্যটক। তখনকার এই আর্য্য ভূমে সংস্কৃত স্বয়ং সবিশেষ ভাবে তৎপর্য্যায়ভুক্ত। তিনি নিজে 'বিদেশজ'। তবে কি "দেশজ" বলিয়া আজও এ দেশে যে কতকগুলি কথা চলিত আছে, যাহাদিগকে সংস্কৃত-চঞ্চু ও সাধুভাষী ভট্টাচার্য্যগণ, ইতর, গ্রাম্য, অন্ত্যজ বা অশ্লীল বলিয়া উপহাস করেন, তাহারাই কি আদিম কালের আসল বাঙ্গালা? দেশজগুলিই কি মৃত ও বিলুপ্ত বাঙ্গালার ভগ্নাবশেষ? পরন্তু এই "দেশজদের" দেশ কোথা? পূর্ব্ববঙ্গ বাঙ্গাল রাজ্য, এখন তাহাও ঠিক বলিতে পার না। পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, সব দিকে ত "দেশজ" আছে; সাধারণ দেশজ আছে; তা ছাড়া এক একটি প্রদেশের স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ "দেশজও" আছে। সবই এখন ঢালোয়া বাঙ্গালা বটে।

পূর্ব্ববঙ্গই যদি বঙ্গ, বাঙ্গালেরাই যদি বাঙ্গালী, "দেশজই" যদি সাবেক বাঙ্গালা বুলি,—তবে পূর্ব্ববঙ্গে, বাঙ্গালদের মধ্যেই (বাঙ্গাল কিন্তু এখন আর নাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে শাফ হইয়া গিয়াছে) দেশজ বুলি খুব বেশী বেশী থাকা উচিত। কিন্তু, তা নয়। বাঙ্গালদের ভিতর দেশজ অবশ্য বিলক্ষণ আছে; কিন্তু খুবই যে বেশী আছে, তা নয়। অন্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী নাই। বরং বাঙ্গালদের মধ্যেই সংস্কৃতের ও সাধুভাষার বাড়াবাড়ি বেশী। চাটগাঁয়ে অতি ইতরশ্রেণীর লোকেরাও সচরাচর কথোপকথনে বলে—"মেঘাবর্ত্ত", "জ্বরাংশ" "ভাণ্ড," "আষ্ট" ইত্যাদি সন্ধিসমাসযুক্ত আরও অনেক আনকোরা সংস্কৃত কথা। বিভক্তি ও ক্রিয়া পদাদিতেও সংস্কৃতের সুস্পষ্ট ছায়া পড়ে। "দিয়ম", "খায়ম", "দিবাম", "পাঠাইবাম", "ন দিয়ম" ইত্যাদির খুব চলন।

ঠাকুরাণীর ঠাটের কাঠামের অঙ্গের, আভরণের পৌণে ষোল আনা অংশেরও অধিক এখন সংস্কৃত বটে। অতএব সংস্কৃত রূপেই যে ইনি সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, ইহা বলা বিচিত্র নয়। কাঁঠালপাড়ার পুরাণ পাঁজিতে দেখা যায়, পঞ্জীকর্ত্তা প্রত্যক্ষের উপর খড়ি পাতিয়া প্রত্যক্ষেরই গণনা করিয়াছিলেন। অতীতের গণনা আজও কেহ করিয়াছেন কি? উক্ত পঞ্জিকায় "বাঙ্গালা ভাষার অপর একটি অনার্য্য মূল" কথিত হইয়াছে; গণিত হয় নাই। সে মূল কিরূপ, সেই মূলই কি আসল ও আদি মূল নয়? কিন্তু হায়! আর্য্য মহাপ্রভুরা সে মূল প্রায় উৎপাটন করিয়া ছাড়িয়াছেন!

শ্রীমতীর উপর সংস্কৃতের এবং সাধুভাষার এতটা আধিপত্য কি আদি কাল হইতেই এইরূপ? আদি কাঠামখানা কি একেবারেই অপ্রাপ্য? কোন্ তৃণে কাহারা কাঠাম প্রস্তুত করিয়াছিল? ভাষার তৃণ কবে সাহিত্য-তরী হইয়া ভাসিয়াছিল? আর্য্য আসিয়াই ভাসাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তরীও তিনি গঠিয়াছিলেন বটে। কিন্তু, অনার্য্য তৃণ কি একেবারেই স্পর্শ করেন নাই? অথবা আর্য্যতরীর তুরঙ্গ-তুফানে অন্যান্য তৃণ অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছিল? একই দিনে তলাইয়াছিল, অথবা ক্রমে ক্রমে ডুবিয়াছিল? অথবা দুই একই হইয়া ভাসিয়াছিল; তার পর অনার্য্য-প্রভুরা আর্য্য-তৃণ অশুচি অপবিত্র বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। অথবা যোগ্যের উদ্বর্ত্তন ও অযোগ্যের মরণের বৈজ্ঞানিক নিয়মে তাহারা মারা গিয়াছে?

অনার্য্য তৃণ ত্যাগ করিয়া আর্য্যতরীতেই উঠ। তরী ত বহু বাতাসেই

ভাসিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছ বাতাস। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বাতাস। দেশী ও বিলাতি বাতাস। বহু বাতাস, তরীর রূপও বহু বটে। সকল রূপই কি সংস্কৃতসন্ধিসমাসশব্দালঙ্কারময় রূপ? অনার্য্য আমল অকৃত্রিম খাসল আমল। আদি অনার্য্য আমলের রূপ কিরূপ ছিল? তার পর—তার বহু পর বৌদ্ধ আমলে? পুনর্ব্বার হিন্দু আমলে? তার পর মুসলমানী বাদশাহী আমলে? তখনও সবই কি সংস্কৃত মূর্ত্তি?

আ! বাদশাহী আমল! বাদশাহী আমলে—পাঠান আমলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের Renaissance; ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যরাজ বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে বলিয়াছেন "রোশ্‌নি";—পাঠানী আমলে বাঙ্গালা কাব্যে বৈষ্ণব রোশনি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল বটে। বৈষ্ণব ঠাকুরেরা নামাবলী রসকলির "রভসে" ব্রজবুলির মৈথিলীর মাখন গালিয়া, মধু ঢালিয়া, অমিয়া ছানিয়া, নিছনি জুড়াইয়া, অতি উপাদেয় পীযূষের এক অপূর্ব্ব প্রবাহে কৃষ্ণ-প্রেমের ময়ূর-পুচ্ছী ছুটাইয়াছিলেন। সে চমৎকার রোশ্‌নি বটে। কিন্তু সেই বৈষ্ণব-গীতের পদগুলি কি বাঙ্গালা? না পাঁচমিশালী? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিশুদ্ধ বিদ্যাপতি কি বাঙ্গালা? বাঙ্গালীর বাঙ্গালা? বাঙ্গালার বাঙ্গালা? আদপেই বাঙ্গালা? গোবিন্দ দাসের গীত কি বাঙ্গালা? বাঙ্গালীর লেখা, হিন্দি, উর্দ্দু, মাগধী, মৈথিলী যদি বাঙ্গালা হয়, তবে বাঙ্গালীর লেখা ইংরেজীকেও বাঙ্গালা বলিতে বাধিবে না। সেবার "নিছনি" লইয়া বহু পালা নাচ গান হইয়াছিল, কিন্তু, ঐ পদটা কোথাকার, কবেকার, কোন ভাষার, ওস্তাদী ও শাগরেদী দলের কেহই কিন্তু অনভিজ্ঞ দর্শক ও শ্রোতাদিগকে বুঝান নাই। যাহা হউক, বৈষ্ণব রোশনির নিছনিটুকুকেও যদি জোর করিয়া একান্তই বাঙ্গালা বলিতে চাও, তবুও সে বাঙ্গালারও পৌণে ষোল আনা সংস্কৃত নয়।

কিন্তু বৈষ্ণব রোশনির ভাষা যে ভাষাই হউক, তাহা কুঞ্জকুটীরের ভাষা, নীড়াকক্ষের ভাষা, নায়কনায়িকার কাণে কাণে কথোপকথনের ভাষা; তাহা কাহারও কাজ কর্ম্মের ভাষা নয়, বিচার আচারের ভাষাও নয়; সে ভাষা সদরে আদৌ অব্যবহার্য্য; অন্দরেও তাহার ব্যবহার অতি বিরল। বৈষ্ণব সাহিত্য, সাহিত্যের খাস ফুলবাগানে ফুটিয়াছিল; কিন্তু, তদ্দ্বারা কি সাহিত্যের, কি সংসারের, সদর ও সাধারণ স্থান আলোকিত হয় নাই।

বাদশাহী আমল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আমরা তাহার বহু পূর্ব্বের আমলে, অনৈতিহাসিক আমলে, এবং সমাজ ও সাহিত্যের আমলে, বাঙ্গালা

ভাষার কি কি রূপ মূর্ত্তি ছিল, তাহারই সন্ধান—তাহারই প্রশ্ন করিতেছিলাম। কিন্তু তাহারও বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ, হিন্দু ও আদি আর্য্য আমলেরও বহু পূর্ব্বে; ঠাকুরাণী ছিলেন বটে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারি কালেরই গণনা করা পঞ্জিকাকারদের কর্ত্তব্য। এখন, বাদশাহী আমলটাই প্রায় তাঁদের উপজীব্য। বর্ত্তমান যুগেরও পাঁজী নাই। সাহিত্যের সাম্বৎসরিক পাঁজি হয় না কেন? দিন-পঞ্জিকা, মাস-পঞ্জিকা, বৎসর-পঞ্জিকা আবশ্যক। জ্যোতিষের পাঁজি ত আছেই; অনেক জীবনবীমা, জলবীমা, অগ্নিবীমার পাঁজি হয়; পাটের কলের পঞ্জিকাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের পাঁজি, তৈল পাঁচনের পাঁজি, পাঁজি কিসের নাই? নাই কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের। সেটা কি এতই সামান্য জিনিস? কেন? সে ক্ষেত্রে, সে চক্রে, গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র, রবি শশী রাহু কেতু, দেব দেবারি, রাজা রাণী, পাত্র মিত্র, মেম্বর, মিনিষ্টার, আফিস বেহারা, লীডার স্পীকার, জলাধিপ, ফলাধিপ, ঋতু, পক্ষ, রাশি, মঘা, অশ্লেষা, ত্র্যহস্পর্শ, তন্ত্রধর, তল্পীদার, সবই ত আছেন; এবং তাঁদের পরিক্রমণ, পরিবর্ত্তন, নবনির্ব্বাচনাদিও আছেন, তাঁদের দ্বিরাগমন, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নিষ্ক্রমণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়নাদিও আছে। তবে তাঁহাদের পঞ্জিকা নাই কেন?

বাদশাহী আমলে, বা সে আমলের কোনও আমলে, বৈষ্ণব রোশনি নিয়ারা নিধুবনে ফুটিলেও, মহাশয়গণ মার্জ্জনা করিবেন, বাদশাহী আমলে শ্রীমতী বাঙ্গালা ভাষা বিবি ফার্শী উর্দ্দুর একজন বাঁদী ছিলেন। শ্রীমতী সদর মোকামে এবং অন্দরমহলেও বটে, বিবিদ্বয়ের বাঁদীত্ব করিতেন। ফারসী ছিলেন বড় বিবি, 'বেগমে খাস'; আর উর্দ্দু ছিলেন ছোটী বিবি, 'বেগমে আম্'। বাঙ্গালা ছিলেন বাঁদী। "করিমা ববক্স" তখন বাঙ্গালীর বাহির দলিজে আচকান পিনিহিয়া, তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া আলবোলায় গোলাপী গুড়ুক টানিত, কোপ্তা কাবাব খাইত। ক খ গ ছিল নোক্তাদার "করিমার" ঘৃণিত গোলাম। বড়মানুষ হিন্দু বাঙ্গালীমাত্রই প্রায় ছিলেন মুন্সীজী। এখনকার যেমন "মিষ্টার", তখনকার তেমনি মুন্সী ছিল শিক্ষার ও সম্মানের সরকারি বেসরকারি মানদণ্ড; চূড়ান্ত 'ডিপ্লোমা'। মিঞাজীরা মুন্সীজী 'কোচ্' করিতেন। হিন্দু তনয়েরা পাজামা আবা আঁটিয়া, মাথায় মুসলমানী টুপি টেড়া করিয়া পরিয়া, সর্ব্বাঙ্গ দোলাইয়া, কণ্ঠ তালু কাঁপাইয়া "করিমা" আওড়াইত। আর বড় বড় কাল কাল তক্তীর উপর মোটাখতের কলম দক্ষিণ হইতে বামে বুলাইয়া লিপি

শিল্পের শিক্ষা করিত। ক্বচিৎ কোনও বিশিষ্ট বংশের হিন্দু বালক "গণপতি সহায় সুমতি" বলিয়া তান্ত্রিক তালপত্রের উপর যন্ত্র কবচ, ক, খ, লিখিত কি না সন্দেহ। প্রায় সকলেই তখন নবাবী বুটিদার নখ ও নোক্তাদার "বড়ি কাফ্" "ছোটি কাফের" করতপ করিত। ক, খ, তাহার বহু পশ্চাতে পায়ে পায়ে চলিত। বস্তুতই তখন "বিস্‌মোল্লা" "গণপতিকে" ও "নারায়ণং নমস্কৃত্য"-কেও বটে, প্রায় গ্রাস করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ও বড়মানুষ ব্রাহ্মণের পোয়ারা টোল চৌপাড়ী প্রায়ই মাড়াইত না। কায়স্থসন্তানগণ তাহার কাছেও ঘেঁসিত না! বৈদ্যের পুত্রেরা নিদানমতে নাড়ী টিপিবার ইচ্ছা হইলেই সেথায় যাইয়া স্বরসন্ধি হলসন্ধি শিখিত। নহিলে নোক্তা ধরিয়া মুন্সী মোক্তার হইত। টোলে যাইত কেবল গুরু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণের বালকেরা। কিন্তু সেখানেও বাঙ্গালার আদর এমনি ছিল যে, সে কথা বলিবার নয়। বাঙ্গালা তথায় ছিলই না বলিলেও বলা যায়। চৌপাড়ীতে বাঙ্গালার শিক্ষা কখনও ছিল কি না, জানি না। কিন্তু তখন ছিল না; এখনও নাই। বাঙ্গালাকে অপদস্থ করিতে চাই না। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিজ্ঞান-সত্য ব্যক্ত করাই বাসনা। অতএব বলিতে বাধ্য, বাঙ্গালা বাদশাহী সেরেস্তা কাছারীতে ছিলেন বাঁদী; সংস্কৃত টোলে চৌপাড়ীতে ছিলেন চেড়ী। চৌপাড়ী অপেক্ষা কাছারিতে বরং তাঁর কিছু ইজ্জত ছিল—নিম্নতম স্থানে ফারসীর ফরাশ হইতে খুব দূরে, গারদ ও কঞ্চিখানার কাছে, তাঁর একটু তবু দাঁড়াইবার স্থান ছিল। কানুনগো সেরেস্তায় কিছু বাঙ্গালা ছিল। গ্রাম্য পাটোয়ার, শিকদার ও মালগুজার-দের বস্তার ভিতর বাঙ্গালা বসিতে পাইতেন। পাটোয়ারেরা উর্দ্দু পারসীর কাছ থেকে 'কিতাবৎ' ও 'কায়দা' কর্জ্জ করিয়া লইয়া বাঙ্গালাকে দিয়াছিল। পাটোয়ারেরা বাঙ্গালাতে পাট্টা দিত ও কবুলিয়ৎ লইত। তাহাদের অধিকাংশ কথা, রচনার কায়দা এবং হিসাবের 'কিতাবৎ' সবই কিন্তু ফারসীর। শ্রীমতীর সেই এক মূর্ত্তি! জিজ্ঞাস্য—সেটি কি সংস্কৃতাত্মিকা আর্য্যময়ী মূর্ত্তি? অথবা শুদ্ধ "সেমেটিক"? নমুনা আজও আছে। পঞ্জিকা-কার পরীক্ষা করিতে পারেন। জরীপ সেরেস্তাতেও বাঙ্গালা ছিল। চিঠা, পৈঠা, একোয়াল ও জমাবন্দী এক প্রস্থ করিয়া বাঙ্গালায় হইত। পাটোয়ায়, শিকদার ও তহশীলদারেরা সেহা, সুমার, করচা, আবরজা বাঙ্গালায় লিখিত। জমা-ওয়াশিল-বাকি বাঙ্গালায় হইত। তোডরমলের প্রসিদ্ধ * "ওয়াশীল তুমার জমা"ও বোধ করি বাঙ্গালায় এক প্রস্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। কাছারি

কম্পাউণ্ডের কোণে বাঙ্গালার তবুও কিছু কার-কারবার ছিল। কিন্তু, চৌপাড়ীতে সে চাষই ছিল না। চৌপাড়ীর ন্যায়-স্মৃতি-সাহিত্য-বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যেরা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, অবজ্ঞায় ওষ্ঠ উল্‌টাইয়া বাঙ্গালাকে বলিতেন "ভাষা"। ভাষা মানে অপভাষা, উপভাষা, অতি ইতর অসার কথা; মূর্খ ও বর্ব্বরের ব্যবহৃত বাক্য! ভট্টাচার্য্যেরা নিজে যে সে বাক্যের ব্যবহার করিতেন না, তা নয়; অথচ ঐরূপ বলিতেন,—আজও বলেন। বাঙ্গালার প্রতি বিদ্বেষ সত্বেও বিদ্যাবাগীশদের বাঙ্গালা বলিতে হইত; অন্দরে অনুস্বারে কাজ চলিত না। আর অনুস্বার বিসর্গে, বাঁধা বুলি ব্যতীত সব কথা কহা সহজও ছিল না। ভট্টাচার্য্যদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা কেহ বুঝিতে পারিত না। বুঝিতে পারিলে লেখক ভট্টাচার্য্যের বিদ্যার গৌরবের লাঘব হইত। ভট্টাচার্য্য-ভাষা বুঝিতে পদে পদে অমরাদি কোষ, মাহেশ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়ের ফাঁকি, পুরাণের প্রহেলিকা—অনেক পাঁজি পুঁথি ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হইত। সাধারণ লোকে ভট্টাচার্য্য ভাষার হেঁয়ালি ত বুঝিতই না। পণ্ডিতেরাও নিমন্ত্রণপত্র বুঝিতে পাঁচ সাত দিন ভাবিয়া মরিতেন। কখন কখন তাহা একেবারেই অবোধ্য হইলে, বোধশক্তির অধিকতর উন্মেষের জন্য ইষ্টদেবীর নিকট হত্যা দিতে হইত, এমনও শুনা গিয়াছে। কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা, ভট্টাচার্য্য-রচনা অবোধ্য, অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হওয়াই ছিল নিয়ম। ভট্টাচার্য্যদের বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে হাসির গল্প অনেক আছে। তাঁদের কথাবার্ত্তার বাঙ্গালারও সেরূপ কাহিনী বিরল নয়। ফলতঃ, ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা শ্রীমতীর আর এক মূর্ত্তি। তাহা সংস্কৃতও নয়, বাঙ্গালাও নয়, মধ্যস্থলে এক উৎকট ব্যাপার। শ্রীমতীর সে মূর্ত্তির সহিত তাঁর সেরেস্তার মূর্ত্তি "মোকাবিলা" করিলে, দুইটি দুই বিপরীত "পোল" হইতে পঁহুছিয়াছে, ইহাই প্রতীত হয়। পাশাপাশি দুই দেহের একে একে বা একত্র পরীক্ষা করিয়া দেখ, কোনটি কোন মেরুর। অবোধ্যতায় উভয়েই ঊনিশ বিশ;—তাহাই উহাদের পরস্পরের সাধারণ স্বরূপ; নইলে আর সবই স্বতন্ত্র। একটি—ভট্টাচার্য্যের ভাষাটি, যদি আগা গোড়া কেবল হেঁয়ালির হাঙ্গাম ও সাঙ্কেতিক কথার কচকচি না হয়, তবে তাহা কতক হেঁয়ালী, কতক হদিস, কতক ন্যায়ের অন্যায় ফাঁকি, কতক লিপিকার্য্যের অসার কৌশল, এবং কতকাংশ অথবা সমানে সবখানি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দের সহিত অসরল জটিল বাঙ্গালা বিভক্তির উদ্ভট উৎকট গাঁথুনি;—যাহার অন্বয়

সমন্বয় নাই, বা হওয়া দুষ্কর। নিরেট ছিদ্রহীন অক্ষরশ্রেণী অমাবস্যার অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে; তাহার সহিত মনুষ্যের মুখের ভাষা ও মনের ভাব, ভয়ের কাহারও পরিচয় নাই; তাহার মধ্যে তাহাদের প্রবেশেরও পথ নাই। অপরটির—শ্রীমতীর বৈষয়িক সেরেস্তার চেহারাটির, চারি ভাগের তিন ভাগের বেশী যাবনিক "জবান", ফারসী "লব্‌জ", অবশিষ্টের কতক কতাবতী কথা, কতক "দেশজ" ইতর শব্দ, এবং ক্বচিৎ কিছু কিছু সংস্কৃত প্রাকৃত বাক্যের যোজনা, বিভক্তি কোথাও বাঙ্গালা, কোথাও উর্দ্দু। ওচ্ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ প্রায় কোথাও নাই। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, র্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়ানির্বিশেষে, সটান দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া একই 'সেন্‌টেন্স্' লিয়াছে। ইহাও অবশ্য বাঙ্গালা বটে।

এই দুই আকারের দুই রকম বাঙ্গালা সেকালের সদরি বাঙ্গালা। একটি বিদ্যাবত্তার বাঙ্গালা; অপরটি বিষয়কর্ম্মের বাঙ্গালা। ইহা ব্যতীত পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালা কিন্তু নিশ্চয়ই একটি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, পণ্ডিতি বাঙ্গালা সকল ব্যবহারেরই বহির্ভূত ছিল। পরন্তু কতাবতী বাঙ্গালায় গৃহস্থালী ও দৈনিক জীবনের কাজ চলিত না। সুতরাং এই দুই অনিবার্য্য ব্যবহারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাঙ্গালার আবশ্যকতা ছিল, এবং তাহার অস্তিত্বও ছিল। কিন্তু, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ঠিক বলা যায় না। কারণ, তাহার সমগ্র ও সর্ব্বাঙ্গ আমরা এ আমলের লোক দেখি নাই। তাহার কতকাংশ ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে, কতক পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের কাছে পঁহুছিয়াছে।

পরন্তু, ঐ পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালার সর্ব্বত্র একই রকম আকৃতি প্রকৃতি ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ও স্থলে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন ধরণ, গঠন ও উচ্চারণ ছিল। "যোজনান্তে ভাষা" আজও এ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। ফলতঃ ছিলও তাই। এখনও কোথাও কতকটা সেইরূপই আছে। কিন্তু এখনকার একটানা সভ্যতায়, শিক্ষায় ও পরীক্ষায়, কোথাও রেলে এবং ষ্টীমারে, কথার হেরফের অনেকটা কাটিয়া গিয়া সর্ব্বত্রই প্রায় একই ধরণ দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

তখন পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালা—কথোপকথনের Colloquial বাঙ্গালা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছিল। কিন্তু, সে বাঙ্গালায় কেহ কিছু লিখিয়া রাখিতে ও লিখিয়া জানাইতে সাহসী হইত না। কথা

কহার "ভাষা কথায়" লিখিতে লোকের তখন লজ্জা করিত, ভয় হইত। লিখিলে লোকে নেহাত মূর্খ বলিত, নিন্দা করিত, ছেলেমানুষী বলিয়া বিদ্রূপ করিত। কাযেই তখন কেহ কথা কহার স্বাভাবিক ভাষায় মনোভাব প্রায়ই ব্যক্ত করিত না। কিছু লিখিতে হইলে একটা অস্বাভাবিক উৎকট ভাষা ও উদ্ভট ভাব আবশ্যক হইত। তাহা যাহার না জুটিত, সে কখনও লিখিত না; যে পণ্ডিতি হেঁয়ালী রচিতে পারিত, সেই কেবল লিখিত। আর যে কিতাবতী গৎ জানিত, সেই কালি কলম একত্র করিতে পারিত। নহিলে আর কেহ কেবল "নকল" করা ছাড়া আপন ভাষায় "মুসবিদা" করিবারও ভরসা করিত না। তবে, আর এক শ্রেণীর লেখক বা রচক ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা তখনকার কথা কহার ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা পাইয়াছি।

যাহারা কথায় কথায় মিলন ও চরণে চরণে পূরণ করিতে পারিত, উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর লেখক ব্যতীত, কেবল তাহারাই তখন লিখিতে বা রচিতে সাহস করিত;—তাহারা কবিওয়ালা, কীর্ত্তনওয়ালা, কথাওয়ালা, পাঁচালী-ওয়ালা প্রভৃতি। ইহারা গান রচিত, কথা বাঁধিত, গানের পালা বাঁধিত, ছড়া গাঁথিত। ইহা যাহারা করিত, বা করিতে পারিত, তাহারা সকলেই আপনাদিগকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিত। স্বপ্নে কোনও দেবতার দেখা ও "আরতি" পাওয়া ভিন্ন কেহ কখনও এ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। বিশেষতঃ যাহাদিগকে বড় বড় পালা বাঁধিতে হইত, তাহারা প্রায় সকলেই দেবাদিষ্ট লোক, বা দেবতার বরপুত্র। জগতে জাহির হইতে উৎসুক কোনও দেবতা হঠাৎ এক আঁধার রাত্রে বা চাঁদনীর আলোকে তাঁহার বাঞ্ছাপুত্রের শিয়রে আসিয়া বসিতেন; তাহাকে জাগাইয়া বা স্বপ্ন দেখাইয়া নিজের জাহির হইবার বাসনা ব্যক্ত করিয়া তাহার যোগাড় করিতে কহিতেন। স্বপ্নাদিষ্ট জীব তাহার অজ্ঞতা অক্ষমতা বারবার জানাইত, কিন্তু দেবতা তাহা শুনিতেন না। জবরদস্তি দৈবশক্তি সহ পূজাপ্রচারের আরতি দিয়া যাইতেন। রাত্রিপ্রভাতে "পাঁচালী প্রবন্ধের" পুঁথি লেখা আরম্ভ হইত। এই সব পাঁচালী প্রবন্ধকে তখনকার লোকে বলিত "পালা", "জাগরণ", "মঙ্গল", "ভাসান", ইত্যাদি। আমরা এখন এ সকলকে বলি কাব্য। বলার অবশ্যই বিশিষ্ট কারণ আছে। তখনকার লোকে এই সব পাঁচালীর পালা আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গণে সংকল্প করিয়া গাওয়াইত, পাঁচালী-প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা দিত; রচক ও গায়ক প্রশংসিত

পুরস্কৃত হইত। সাধারণ লোকে সাগ্রহে সাদরে আসরে বসিয়া এই পাঁচালীর পালা শুনিত। শুনিবারই কথা। শ্রোতব্য বটে। বিশেষতঃ, এই সকলের মত সর্ব্বজনবোধগম্য ও মনোজ্ঞ রচনা আর কিছুই ছিল সকলেই ইহা উপভোগ করিতে পারিত, সুতরাং আদর করিত। কিন্তু চার্য্য-পণ্ডিত-সমাজে এই সব মঙ্গল-পাঁচালীর, এবং কবি, কীর্ত্তন ও বাঙ্গালার তদনুরূপ রচনা সকলের এক পয়সারও পশার ছিল না। সংস্কৃত চার্য্যেরা বলিতেন, "ও গুলা ভাষা।" নেহাত অনুগ্রহ হইলে, নাক য় তুলিয়া বড় জোর বলিতেন, "সুবুদ্ধি-রচনা", বা "ভাষা কথার সংঘটন ছে বেশ।" তখন এতটা প্রশংসাই প্রচুর ছিল। বিদ্যাবানদের মত ব ঠাকুরেরাও "মনসা মঙ্গলচণ্ডীর ইতর কথা" বলিয়া এই সব পাঁচালীর াকে অতিশয় বিদ্রূপ করিতেন। তবে সৌভাগ্য এই যে, তাঁরা নিজে শেষ ভাবে ভাষাসেবক ছিলেন, এবং তখনকার বাঙ্গালা ভাষার বহু র্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, গৌরাঙ্গসেবকদিগের প্রতিও পক্ষান্তরে ান ব্রাহ্মণদের বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হইত। এখনকার ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের ক্ষা অনেক বেশী গালিগালাজ গৌরাঙ্গভক্তেরা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, উল্লিখিত শাক্ত পাঁচালীওয়ালা ও বৈষ্ণব পদ-পয়ার-গান-ণতারাই তখনকার কথিত ও চলিত পারিবারিক ও সামাজিক বাঙ্গালার ঞ্চিৎ ভগ্নাংশ ভব-সংসারে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁদের কেহ কৃতী, কেহ অকৃতী ছিলেন; কেহ আসল, কেহ নকল; কেহ মেকি, কেহ খাঁটী লেন। তাঁদের কতক কাল-পর্ব্বে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন; কের সহিত অল্পাধিক বিকৃত বা অবিকৃত আকারে এ যুগের দেখা সাক্ষাৎ য়াছে। অবিকৃত আকারে তাঁদের অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে; অথবা ছুই পাওয়া যায় নাই। তবুও ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, পরিবর্ত্তিত, ক্ষিপ্ত, বিকৃত ও বিড়ম্বিত, যে আকারে ও যে অবস্থাতেই তখনকার ালার যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত ছিল, এবং এখনকার বাঙ্গালার সম্মুখে পঁহুয়াছে, তাহা পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা, ও পদওয়ালাদের প্রসাদাৎ; এবং নিন্দিত বটতলার বাণিজ্যপ্রবণতার প্রসাদাৎ। নতুবা নিশ্চয়ই এ কিঞ্চিৎও জুটিত না। বলিতে কি, বটতলাই এক হিসাবে আমাদের কাডমি অব্ লিটারেচর্।" কিন্তু যাহা পাইয়াছি, তাহা যৎকিঞ্চিৎমাত্র। নকার চলিত বাঙ্গালার চৌদ্দ ভাগের চারি ভাগও ভাসিয়া আসিতে পারে

নাই। যাহা আসিয়াছে, কেবল দৈবাৎ আসিয়াছে। কেন? তাহা পণ্ডিত-কারদেরই গণিয়া প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। প্রশ্নকার কেবল এইমাত্র মনে করেন যে, তখনকার রচকেরা প্রাণান্তেও পদ্য ভিন্ন গদ্য রচেন নাই। কিন্তু কেন? গদ্য রচার গুণ কি তাঁদের ছিল না? কেন থাকিবে না? বিলক্ষণ ছিল। পদ্য অপেক্ষা গদ্য রচা সহজ না হউক, কঠিন নয়। তাঁরা যে প্রকারের পদ্য রচিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ইহা নিশ্চিত বোধ হয় যে, তাঁরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে উত্তম গদ্য রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাঁদের গদ্য গাঁথার গুণ থাকিলেও, গদ্য রচার রেওয়াজ তখন একেবারেই ছিল না। একেই ভট্টাচার্য্য-"ভেঙ্গচানি-ভূষিতা 'ভাষা', তাহাতে আবার সুর-ছন্দ-যতি-হীন যদৃচ্ছাগ্রথিত গদ্য! তখনকার রচকেরা এখনকার লেখকদের মত সাদা মাঠা কথায় গাদা গাদা গদ্য রচিলে নিশ্চয়ই গালে চড় খাইতেন। তার পর, গদ্যে ত আর গান গাওয়া চলে না। তখনকার রচকদের গান গাওয়া বা গাওয়ানই আবশ্যক ছিল; গালে চড় খাইবার দরকার নিশ্চয়ই ছিল না। কাজেই তাঁরা গদ্য রচার বিষয় ভুলিয়াও ভাবেন নাই। ফলতঃ, এখন আমরা যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ পাঁচ সাত শত ক্রোশব্যাপী গদ্য লিখিয়া গ্রন্থ ছাপাই, প্রবন্ধ প্রকাশ করি, অতি তুচ্ছ তুচ্ছ সামান্য সামান্য ঘটনা বিবৃত করিয়া কথা কহার কথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র, পয়সা খরচ করিয়া প্রকাশ করি, তখনকার লোকেরা এখন জীবিত হইয়া আসিয়া উহা দেখিলে, নিশ্চয়ই আমাদিগকে বলিবেন, "তোমরা অকালকুষ্মাণ্ড ও অলস; সংসারে তোমাদের করণীয় আর কোন কর্ম্মই নাই, তাই তোমরা পণ্ডশ্রম করিয়া বৃথা বিষয়ে এত অধিক বাজে বাক্য লিখিয়া করিয়া রাশি রাশি কাগজ নষ্ট কর। আর তোমরা নিশ্চয় উন্মাদ হইয়াছ, তাই সেই সকল অযোগ্য ও হাস্যাস্পদ লিপি ইংরাজের কৃত ছাপাখানা নামক কলে ছাপাইয়া অতিদুর্লভ অর্থের দারুণ অপব্যয় কর। তোমরা মূর্খ ত বটেই, তাহার উপর মস্তিষ্কও তোমাদের মাটী হইয়াছে। নহিলে কেবল বালস্বভাবচাঞ্চল্যের বেগ ও ব্যভিচার এত বেশী হইতে পারে না!"

পিতামহগণ, তাঁহাদের সুদুর্লভ সাদা কাগজের অদ্যকার এই অসুমার অপব্যয় ও অপমৃত্যু দেখিয়া, মর্ম্মপীড়াবশতঃ সর্ব্বপ্রথম পত্রসম্পাদকগণকে সেকালের পলায়িত পাঠশালার পোড়োর মত আড়কোলা করিয়া যে পাগলা গারদে পঁহুছাইয়া দিতেন, ইহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

তখনকার রচকেরা এই গুরু কারণেই গদ্য রচিতেন না। পদ্য গাঁথিতেন। দ্য যে সে প্রবন্ধও রচিতেন না। পদ্যে পাণ্ডিত্যের ও পৌরাণিক নের পরিচয় পদে পদে দিতেন। প্রহেলিকা প্রস্তুত করিবার অবসর ইলে, তাহা পার্য্যমানে ছাড়িতেন না। তাঁরা পৌরাণিক বিষয় ভিন্ন প্রাকৃত য় প্রায়ই স্পর্শ করিতেন না। কচিৎ প্রাকৃত বিষয় কল্পনা করিলেও, হাতে পৌরাণিক ও শাস্ত্রিক বর্ণ রঞ্জিত করিয়া দিতেন। অতএব বলা হুল্য, সেরূপ রচনার বাঙ্গালা সাধারণতঃ কিরূপ আকার ধারণ করিত। সকল স্থলে পাঁচালী বা তাহার অংশবিশেষ দেবদেবীর বন্দনা, সাধনা, তি, বা মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, যে সকল স্থলে রচনা সর্ব্বাংশে শাস্ত্রীয়, পৌরাণিক, াণ্ডিত্যপ্রকাশিনী বা প্রহেলিকাময়ী, সে সকল স্থলের বাক্যবিন্যাসে সংস্কৃত সংস্কৃতমূলক শব্দেরই সবিশেষ আধিক্য হইবারই কথা।

তবে, পৌরাণিকে প্রাকৃতে মেশামিশি হওয়াতে, পৌরাণিকের উপর চকদের নিজের নিজের কল্পনার রঙ্ পড়াতে, এবং নিজের নিজের সময়ের ও সমাজের রঙ্ পড়াতে, কখনও কখনও অজ্ঞাতে, উলঙ্গ স্বভাব, শিল্পাতুরীর শিকল কাটিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনই—কেবল তখনই বি মহাশয়েরা কিয়ৎকালের জন্য সংস্কৃত শব্দের কায়দা ও পুঁথি লেখার চলিত Conventionality পরিত্যাগ করিয়া, লোকসাধারণ, সহজ ও স্বাভাবিক ভাষা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তখনই তাহা তৎকালের লোকব্যবহৃত বাঙ্গালার মত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দেখা যায়, স বাঙ্গালায় সংস্কৃত অপেক্ষা বরং অসংস্কৃতই অধিক। সাধুভাষা বা ভদ্র াষা অপেক্ষা তথাকথিত ইতর ভাষাই অধিক। দেশজ বাক্য, বিভক্তি ও ইডিয়ম' আদিতে তাহা প্রায়ই পরিপূর্ণ। সংস্কৃত শব্দও তাহার সঙ্গে মধ্যে ধ্যে আছে। কিন্তু হিন্দী ফারসীও আছে।

ফলতঃ, আজ কাল চলিত বাঙ্গালায় সংস্কৃতের ও সাধুভাষার যতটা বেশী রকম আমদানি হইয়াছে ও হইতেছে, সাবেক আমলে ততটা ত ছিলই না; তাহার তিন ভাগের এক ভাগও ছিল কি না সন্দেহ। এখনকার এবং সম্মুখের এবং বাড়ীর কাছের বাঙ্গালা দেখিয়াই, বোধ হয়, সিদ্ধান্ত হইয়া থাকিবে যে, সংস্কৃতই বাঙ্গালার জননী; তাহা না হইলে নিশ্চয়ই মাতামহী।

মাতা ও মাতামহী 'থিওরি' মন্দ নয়। কিন্তু, শ্বাশুড়ী 'থিওরি' কিরূপ শুনাইবে?

RIGHT RESERVED

যদি বলি, গর্ভজাতা দুহিতাও নহে,—দুহিতৃগর্ভজাতা দৌহিত্রীও নহে,—বাঙ্গালা, সংস্কৃত-ঠাকুরাণীর পুত্রবধূ, এবং সনাতনী সংস্কৃতভাষা, শ্রীমতী বাঙ্গালার শ্বাশুড়ী, তাহা হইলে, বোধ হয়, তীরখানা শিকার ছাড়িয়া বেশী তফাতে যাইয়া পড়ে না।

আর্য্য ঠাকুরেরা এ দেশে আসিয়া অনার্য্য বাঙ্গালিনী সহ বাঙ্গালা ভাষাকেও বিবাহ বা সংগ্রহ করিয়া, নববধূর সঙ্গে নববধূরই ন্যায় গৃহে তুলিয়াছিলেন। আর্য্যামাতা অনার্য্যা বধূদিগকে, এবং সংস্কৃত-মাতা বঙ্গভাষা বধূটিকে স্বগোত্রীয় মন্ত্রে শুভক্ষণে বরণ করিয়া লইয়া বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার ধন রত্ন যৌতুক দিয়াছিলেন। সংস্কৃত শ্বশ্রূ বঙ্গবধূর অনার্য্যঅঙ্গ শোধিত মার্জ্জিত করিয়া, তাহা আর্য্যসাজে সাজাইয়া, আর্য্যীকৃত করিয়া তুলিয়াছেন; ইহা অসম্ভব নয়। রমণী, জননীর বৈভব অপেক্ষা, ঠাকুরাণীর সম্পদেরই অধিকতর অধিকারিণী হইয়া থাকে। বাঙ্গালা এক রাত্রির মধ্যে সংস্কৃতের সাজ সজ্জা পরেন নাই। বহু শতাব্দে উত্তরোত্তর তাহার অধিকার করিতেছেন। বাদশাহী কাল অপেক্ষা ইংরেজী আমলেই এ অধিকার বেশী বাড়িয়াছে। শ্রীমতী শ্বশ্রূর সনাতন সম্পদে শক্তিমতী হইয়া, সোহাগ করিয়া, বিলাতী বিষয় বৈভব জুটা করিতেছেন। ইহা উন্নতি বটে।

অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পরীক্ষায় শ্রীমতীর প্রবেশাধিকার নাই বলিয়া, এ পক্ষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোনও কালে কখনও ইনি কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণাভাব। মোসলেম আমলে ইনি যেরূপ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, এখনি দেখা গিয়াছে। নিত্যপাঠার্থ পাঠশালাই ছিল তখন ইহাঁর প্রধান চতুষ্পাঠী। পরন্তু, নৈমিত্তিক 'কল্‌চারের' জন্যও বড় বড় দুইটি কলেজ ছিল; তাহার একটির নাম "আসর ইনিষ্টিটিউশন," এবং অপরটির নাম ছিল,—"বাসর একাডেমি"। এই দুই সিণ্ডিকেটের সহী স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত 'সার্টিফিকেট,' 'ডিগ্রি', 'ডিপ্লোমা' পাইয়া, নিদেন 'লাইসেন্স' কিনিয়া, যাঁরা 'য়ুনিভার্সিটী আউট' হইতে পারিতেন, তাঁরাই ছিলেন তখনকার "বাঙ্গালা-বিদ্যাবিদ্ বুধ", বা বৃহস্পতি, বা শুক্র। অর্থাৎ, এম্. এ., এম্. ডি., 'ডক্টর অব্ বেঙ্গলী লিটারেচর', ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীমতীকে সর্ব্বপ্রথম বালিকাবিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের সুকৃতী সন্তান। কিন্তু, বাঙ্গালাই বিদ্যা-

সাগরকে অমর করিয়াছে। শ্রীমতীর তখন বয়ঃক্রম অবশ্য বহু শতাব্দীই হইয়াছে,—যখন বিদ্যাসাগরের বিপুল যত্নে বালিকাবিদ্যালয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর শ্রীমতীর হাতে বই ছাপিয়া দিলেন, শেলেট পেন্সিল দিলেন, পাততাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, বেঞ্চের উপর বসাইলেন। সবকস্তা শাটীর নীচে একটি শাফ সাদা ধপ্‌ধপে সংস্কৃত শেমিজ্ পরাইয়া দিলেন। তাহার উপর আবার একটি 'বডিস্' পরাইলেন। সাবেক শাঁখা খাড়ু ভাঙ্গিলেন না, সীমন্তের সিন্দুরও মুছিলেন না। বরং সিঁথির উপর আর এক বিন্দু বেশী সিঁদুর টিপিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর বর্ষীয়সী বালিকাকে নূতন ধরণের "বর্ণ-পরিচয়" হইতে "সীতার বনবাস" "শকুন্তলা" পর্য্যন্ত সায় করাইলেন। বাঘমুখ বালা শাঁখার সঙ্গী হইল। শ্বাশুড়ী সংস্কৃত-ঠাকুরাণীর নিরেট লৌহসিন্ধুকে অজস্র জড়োয়া গহনা। গহনাগুলি বড় ডাগর ডাগর—সেকেলে রামচন্দ্রী মোহর গলাইয়া গড়া, সত্যযুগের সোনা। কলির মেয়ে বঙ্গবধূর গায়ে গলায় মানায় না। বিদ্যাসাগর বেতহাতে বিদ্যালয়ে অষ্টপ্রহরই উপস্থিত। হাতুড়ি ধরিলেন, হাপর বসাইলেন। সংস্কৃত-মাতার মান্ধাতার আমলের গহনা গলাইয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, পিটিয়া, মনের মত মানানসই 'ফ্যাশন'সই করিয়া, বাঙ্গালার গায়ে গলায় পরাইয়া দিলেন। বাউটিসুট, বাঁউড়ীসুট হইল। সোণার চন্দ্রহার ঝুলিল। ডায়মনকাটা চিকের কোলে হীরার ধুকধুকি জ্বলিল। কাণময় মাকড়ী। নাকে নাকফুল—সেকেলে নথখানার গড়ন কুৎসিত! পায়ে আটগাছা মল উঠিল। তখন আর পায় কে? বাঙ্গালা তখন চৌপাড়ীর চেটীত্বের কর্ম্মনাশা ও বাদশাহী বাঁদীদিগের বৈতরণী পার হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। এবং বিলাতি সাহিত্যের সমুন্নত শেলাই ফোঁড়াই শিখিয়া, বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন। সময় বুঝিয়া বাঙ্গালা কাটে, বিলাতি ছাঁটে, জোছনা-রঙের রেশমী গাউন শিলাইয়া, শ্রীমতীর বিদ্যাসাগরী বড়িসের উপর ঝুলাইয়া দিলেন। দিনে দিনে আরও রঙ, 'ওয়াশ', 'ব্রাশ্', 'এসেন্স্' প্রভৃতির আমদানি হইল। বধূর পায়ের গুজরিপঞ্চম গিয়া 'সিল্কের' 'ফুল্' 'ব্লু-ষ্টকিং' চড়িল। কীর্ত্তিমতী 'কিড কাফে'র দস্তানা আঁটিলেন। পিয়ানো আসিল, পিক্‌চার ঝুলিল, 'পাংখা' দুলিল, পরদা পড়িল; বিদ্যালয়-কক্ষ তখন হাফ ড্রয়িংরুম্, হাফ বল্‌রুম্। বিদ্যাসাগর তখন নাই, বেতও নাই। বল্-রুম্ কারপেটে মোড়া, কোচ কেদেরায় যোড়া। শ্রীমতী তখন আধ-বাঙ্গালিনী, আধ-বিবি। বিলাতি

বিস্‌কুটের পাকে বড়বাজারের বাদামতক্তী। গুড্ ইভ্‌নিং ম্যাম্! বেঙ্গলী ডি এঙ্গলী! ফেয়ার্ দি ওয়েল্! কিন্তু ঐ ফলা গুলা—" (ক-য়ে র-ফলা, ক-য়ে ম-ফলা, "আর্ক ফলা")—আই আই! ফাই ফাই!—ঐ ফলাগুলা আর এখন তোমার পরিধান করা ভাল দেখায় না। লেডি! তুমি থ্যাকারের বাড়ীতে 'ব্যাপ্‌তাইজ্' অর্থাৎ 'রোমানাইজ্' হও; নইলে বিলেত যেতে পাবে না। জান?—এটা ১৩০৫—20th সেঞ্চুরি?

শ্রীমতী যখন সাগরী শেমিজ্ পরিয়াছিলেন, তখন তাঁর সেকেলে মামশ্‌লা-বোঝাই "গহু"খানা বৈতরণীর বুকের উপর ডুবু ডুবু। কিন্তু তখন শনির দৃষ্টি ঘুচিয়া বৃহস্পতির দশা পড়িয়াছে; পরক্ষণেই কিস্তি কূলে লাগিল। চারি দিক থেকে দাঁড়ি মাঝী জন মজুর গিয়া জুটিল, জল ছেঁচিল, কাদা মুছিল, মাল বহিল, যত পারিল সাজাইল, শৃঙ্খলা করিল। বহুকালের পর মেরামতের জন্যে গহুখানা ডকে উঠিল। ইঞ্জিনিয়রেরা গিয়া গহুখানার ভিতর ক্যাবিন্ গঠিয়া শ্রীমতীর নবীন মূর্ত্তির বসবাসের কামরা সাজাইয়া দিল। শুলুফের ফ্যাশনে গহুখানার সংস্কার হইল। শ্রীমতী শুলুফে উঠিলেন। ডিঙ্গা আবার ভাসিল। ভাসিতে ভাসিতে ত্রয়োদশ পার হইয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পড়িল। এক—দুই—তিন—চারি—বিবিয়ানি আমলের বাঙ্গালা সাহিত্য সম্প্রতি তের শত পাঁচে পা দিয়াছেন।

এখন, পঞ্জিকাকার! কহ, শ্রীমতীর সূতিকা-গৃহের সংবাদ কি? শৈশবে তিনি কি ছিলেন? কৈশোরে কিরূপ ফুটিয়াছিলেন? বৃদ্ধা বিবি, বোধ হয়, তখন 'মিশি-বাবা' ছিলেন না? শ্রীমতীর অন্নাশন পুংসবনাদির সমাচার কি? এ আমলে কি তাঁর দ্বিরাগমন? বয়স বার শত বৎসর হইয়া গিয়াছে, বা তাহারও অধিক? সর্ব্বাগ্রে সাব্যস্ত কর তাঁর জন্মকাল, জন্মকোষ্ঠী এবং সর্ব্বোপরি তাঁর জনক জননী কে? বার শত বৎসরের বিবর্ত্তনে আধ-বিবিত্ব; এ ইনি কোন্ অবতার? তের-শ' পাঁচে তরীর কাণ্ডারী কে? ভৌগোলিক সংস্থান কি? এক শত হইতে বার শতের stock-takingতের শ'তে কিছু হওয়া উচিত কি না? তের শতের বাণিজ্য-বায়ু কোন মুখে, কোন দিকে? তের শ' পাঁচের রাজা কে, মন্ত্রী কে, বৈদ্য কে? রোগ কি? ঔষধ কি? মেঘ কেমন? জল কত? ফসল কেমন, ইত্যাদি নবপঞ্জী-ফলাফল বলুন,—যাহা শুনিয়া নর নারী দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

বলিবেন, রাজা নাই,—'রিপব্‌লিক্'। তের শ' পাঁচে 'পার্লামেণ্ট' বসেছে!

ঐ দেখ, পাঁচের পরম চরমোন্নতি "সাহিত্য-পরিষৎ"। অতি উত্তম উত্তর। 'রিপব্‌লিকে' রাজি আছি। কারণ, তাতে 'রাইট্' আছে। বিশেষতঃ, আরও সুবিধা এই যে, পঞ্জিকাকার খুঁজিতে এ পক্ষকে অলি গলিতে ঘুরিতে হইল না। নব-পঞ্জীর চিরপরিচালক নবদ্বীপের নূতন সংস্করণ অতি সহজেই ক্ষেত্রে সম্মুখে উপস্থিত। ইহা যেমন সৌভাগ্য, তেমনি শুভগ্রহ। নহিলে পঞ্জিকাকার কে, এবং কাহাদের হওয়া উচিত, 'নিম্ন-প্রাইমারি'র এই অতি নীচ প্রশ্নটাও অনেক ক্ষণ নিঙ্গড়াইতে হইত। অতঃপর কেবল আশঙ্কা এই যে, প্রশ্নগুলা কিছু 'অন্‌পার্লামেণ্টারী' রকমের হইয়া থাকিবে, এবং পার্লামেণ্টের বহু দূর বাহির হইতে হইয়াছে। কিন্তু, প্রথম অপরাধের সংশোধন আছে। দ্বিতীয়ের নজির আছে। পরিষৎ 'অন্‌পার্লামেণ্টারি'কে 'পার্লামেণ্টারী' করিয়া লইতে পারেন। সদস্যের মুখে না হয়, সেক্রেটারীর হাতে হইতে পারে। পরন্তু বাহিরের প্রশ্নও ভিতরে যাইতে পারে, তাহার নজির আছে। 'প্ল্যাট-ফরম' ও 'প্রেসে'র প্রশ্ন 'পার্লামেণ্টে' পঁহুছিবার কোনও না কোনও প্রবাহ পাইয়াই থাকে। সেখানে—স্বস্থানে ত পায়ই। ইদানীং এখানেও পাইতেছে। 'ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে', তথা 'লোকাল্ কৌন্সিলে' লোকজিজ্ঞাসা আজ কাল তাজা টাটকাই যাইয়া থাকে। পরিষদের পার্লামেণ্টে রাজনৈতিক সুরেন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিক সুরেন কি আধখানিও নাই?

উন্মাদিনী।

ভূমিকা।

প্রায় তিন বৎসর হইল, প্রিয়বর প্রেমগোবিন্দবাবু উকীলের খাতায় নাম লেখাইয়া হৃদয়পুরের বড় আদালতে যাতায়াত করিতেছেন। লাইসেনী লইবার পর পাঁচ মাস কি ছয় মাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি সপ্তাহেই প্রিয়বরের একখানা করিয়া পত্র পাইতাম। প্রেমগোবিন্দের পত্র যখন হাতে আসিয়া পঁহুছিত, মনে হইত, একখণ্ড বিদ্যুৎ কি অগ্নিশিখা যেন আমার ডান হাতের অঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া এই অসাড় দেহের সর্ব্বত্র একটা উদ্দাম স্ফূর্ত্তি ও অধ্যবসায়ের সাড়া দিয়া চলিয়া গেল! পত্রের ভিতরকার উৎসাহ দেখে

কে? সত্য ও সুবিচারের বলিদান হয় বলিয়া ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণের একটা বিষম বদনাম আছে। প্রেমগোবিন্দ দেখাইতে চান যে, তাহা প্রধানতঃ উকীলবাবুদের গুণে, আইনের দোষে নহে। তিনি এমন ভরসা রাখেন যে, উকীল-কলঙ্ক-ভঞ্জনের প্রথম দৃষ্টান্ত তিনিই দেখাইবেন। তাঁহার বিশ্বাস, ওই সাম্‌লাটাই যত নষ্টের গোড়া! ও জিনিসটা মাথায় দিলে দেবতাও দানব হইয়া যায়। নেহাৎ প্রয়োজন না হইলে প্রেমগোবিন্দ মালসা স্পর্শ করেন না!

কিন্তু কয় মাস পরে প্রেমগোবিন্দের চিঠির গতি ক্রমশঃ বড় মন্দা হইয়া আসিল। সপ্তাহান্তে ত দূরের কথা, মাসান্তেও আসে কি না সন্দেহ। তাহাও আবার এক পয়সার পোষ্টকার্ডমাত্র; আগেকার সেই রঞ্জিত কাগজে লিখিত, অপূর্ব্ব-অলঙ্কার-সমন্বিত, সুদীর্ঘ, বাক্যরূপী উৎসাহের প্রবাহ নহে। মনে করিলাম, ভায়ার পসার এইবার জমিয়া আসিতেছে। কাজের ভিড়ে বড় চিঠি দিবার আর সময় পান না। এতদিন কথায় যাহা বলিতেন, এইবার তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। ব্যাপারখানা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবার বড় সাধ হইল। শুধু সাধ নহে, একটু বিষাদেরও আভাস ছিল। প্রেমগোবিন্দ প্রায় তিন মাস আর কোনও খবর দেয় নাই। তাই ত; মক্কেলের ভিড়ে পথ হারাইয়া বিদেশে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হইল না কি! এই পূজার বাজারে চারি দিকেই দুষ্ট লোক ফিরিতেছে,—বিপৎপাত অসম্ভব নহে!

একদিন রবিবার সকল কাজ ফেলিয়া হৃদয়পুরে গিয়া হাজির হইলাম। প্রিয়বরের ক্ষুদ্র আশ্রমটি খুঁজিয়া বাহির করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তা হউক; ভায়াকে সুস্থশরীরে প্রত্যক্ষ করিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম,—

"ভায়া! আমি মক্কেল নহি। আলাপের সময় হইবে ত?"

প্রেমগোবিন্দ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—

"মার্জ্জনা করিও, ভাই! তিন বৎসরের পর হাতে খড়ি করিয়াছি। একটা মকদ্দমা লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলাম। তোমাদের কাহারও সংবাদ লইতে পারি নাই। এই একটা কাজেই আমি শ্রান্ত লইয়া পড়িয়াছি। সাম্‌নে পূজার ছুটি আসিতেছে। মনে করিতেছিলাম, কলিকাতায় গিয়া বন্ধুদের সাহচর্য্যে প্রাণটা আবার নবীন করিয়া তুলিব। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। এখন চল যাই। আদালতের বাতাসমাত্র আমার আর সহ্য হয় না। লাঙ্গল ধরিতে হয়, তাও স্বীকার। এ ঝক্‌মারী আর করিব না!"

আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"ব্যাপার কি বল দেখি? ওকালতীর পুণ্যাহ করিলে,—আগে ত মিষ্টান্নের খবর দাও।"

প্রে. গো.। আর লজ্জা দিও না ভাই! মিষ্টান্নের কথা কও কি? তিন মাস কাল আমি কোনওরূপ অন্ন মুখে দিয়াছি কি না সন্দেহ। মকদ্দমাটায় মস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলাম। বিফল, বিফল, সবই বিফল!

আমি। একটা মকদ্দমা হারিয়াছ? এই বই ত নয়? এর জন্য তুমি যে হাস লইবে, দেখ্‌ছি। এম্‌নি ক'রে পসার করিবে? জান না, উকীলের ব্যবসা নিষ্কামধর্ম্মের আদর্শ। সুখদুঃখ, সত্যমিথ্যা, জয়াজয়, ন্যায়ান্যায়, কিছুতেই বিকার নাই,—তবে ত বলি উকীল!

প্রেম। উকীলের মুণ্ডপাত কর!

আমি। আচ্ছা, তা করিব, তোমারটা বাদ দিয়া। এখন মকদ্দমার বৃত্তান্তটা আদ্যোপান্ত বল দেখি, শুনি।

প্রেম। শুধু মকদ্দমা নয়, আমার মক্কেলের বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত আগাগোড়া শুনিতে হইবে।

এই বলিয়া প্রেমগোবিন্দ ড্রয়ার খুলিয়া বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একখানি ফুলস্কেপ-মলাটের খাতা বাহির করিলেন। খাতাখানি খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ও কি?"

প্রেম। ভাই! বর্ত্তমান ব্যাপারটায় হাতে কিছু না আসুক, মাথায় কিছু আসিয়াছে। তাহারই পরিচয় এই ক্ষুদ্র গল্পে পাইবে। আমি পড়িয়া যাইতেছি। একটু সহিষ্ণুতাসহকারে শুনিবে কি?

আমি। বিলক্ষণ! শুভক্ষণে তোমার হৃদয়পুরের দিকে পা বাড়াইয়াছিলাম। তুমি এবার আমায় বাঁচাইলে! পূজার সময় একটা গল্প দিতে না পারিলে "সাহিত্য"-সম্পাদক "মারামারি কাটাকাটি" করিবেন, বলিয়াছেন। আমি আজকাল চাকরীর দায়ে কিরূপ বিব্রত, তা' ত জান। লেখাপড়ায় এক-প্রকার জলাঞ্জলি দিয়াছি। তাই বলি, এবার তুমিই আমায় বাঁচাইলে। এখন পড় দেখি, শুনি। উকীল আবার কবি হইতে পারে, এমন বিশ্বাস ত নাই। এত দিনের পর বুঝি বিশ্বাসটা ঘুচিয়া যায়!

প্রিয়বর তখন একটু হাসিয়া, চোখের উপর সোনার চশ্‌মাখানি সন্তর্পণে আঁটিয়া, অতি মিষ্টস্বরে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

১

মেয়ের নাম উন্মাদিনী রাখিবার সময় মেয়ের বাপ-মার মনে তাহার সুদূর পরিণামের কোনও কথা অলক্ষিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বড়মানুষের ঘরের বড় আদরের মেয়ে,—আদর করিয়া সকলেই উন্মাদিনী বলিয়া ডাকিত। কিন্তু উন্মাদিনীর বাল্যজীবনের সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার কোনও সম্পর্ক নাই। যথাকালে যেরূপ সকলের হয়, আমাদের নায়িকারও সেইরূপ বিবাহ হইয়া গেল। তবে, সে বাপের এক মেয়ে, তাহার বিবাহে একটু বিশেষত্ব ছিল। তাহার পিতা ও মাতা উভয়েরই ইচ্ছানুসারে গরিবের ছেলে দেখিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকে। জামাই শ্বশুরবাড়ীতে যাতায়াত করেন। মাঝে মাঝে কখনও এক মাস, কখনও বা দুই মাস কাটাইয়া যান। উন্মাদিনীর শ্বশুর ছিল না। কেবল শাশুড়ীঠাকুরাণী বাস্তবিগ্রহ বৈকুণ্ঠেশ্বরের সেবার নিমিত্ত ভদ্রাসন আগুলিয়া থাকিতেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধার মুখে কেবল বৈকুণ্ঠেশ্বর ব্যতীত আর কোনও কথা প্রায় শুনা যাইত না।

বৃদ্ধার মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠেশ্বরকে বোধ হয় নিজের পথ দেখিয়া লইতে হইত। তাঁহার পরম সৌভাগ্যক্রমে একটা সামান্য ঘটনায় সে বিপদ নিবারিত হইল। উন্মাদিনীর প্রথম যৌবনোন্মেষসময়ে একবার জামাইবাবু প্রায় পাঁচ মাস ধরিয়া তাহার সঙ্গসুখের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কর্ত্তা ও গিন্নীর মনে যাহাই থাক, দাসদাসীগুলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। এদিকে উন্মাদিনীর শাশুড়ী পুনঃপুনঃ পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং জামাইবাবু আর থাকিতে পারিলেন না,—নববসন্তের বাসরকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইল। প্রস্থানের পূর্ব্বদিন যত দাঁতে-মিশির দল তাঁহাকে ধরিয়া বসিল,—আমাদের কাপড় দিতে হইবে। জামাইবাবু মহাফাঁপরে পড়িলেন। উন্মাদিনী স্বয়ং তাহাদের সকলকে খুসী করিবেন, এই কথা বলিয়া মাঝখানে না পড়িলে, জামাইবাবুর সে যাত্রা কি হইত বলা যায় না। তথাপি নিস্তার নাই। একজন অনতীতযৌবনা অর্দ্ধবয়সী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল,—"যার এই ক্ষমতাটুকু নাই, তার আবার এত দেমাক কেন? তার শ্বশুরবাড়ী আসাই বা কেন? কথায় বলে, পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী!" জামাইবাবু ইতিপূর্ব্বে তাহাকে কোনও কারণে একটু মৃদু ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। এখন সে সময় পাইয়া পদ্মচক্ষু সমেত মুখখানা একবার ভাল করিয়া ঘুরাইয়া লইল।

কথাটা জামাইবাবুর কাণে গেল। তিনি অভিমানে দাসীকে কিছু না বলিয়া শ্বশুরমহাশয়ের সমীপে নালিশ করিলেন। শ্বশুরমহাশয় তখন নিলামে-কেনা নূতন জমীদারীখানার কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। অন্যমনস্কতাবশতঃই হউক, অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, জামাতার অভিযোগ শুনিয়া কেবল একটু হাসিলেন, কোনও কথা কহিলেন না। জামাইবাবু উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্যাপার এত দূর গড়াইয়াছে, তাহা হঠাৎ মনে করিতে পারিলেন না। অবশেষে উত্তর পাইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ধীরে ধীরে ফিরিলেন। ধীরে ধীরে গিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উন্মাদিনী তথায় নাই। তখন আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আপনার জামা ও উড়ানীখানি লইয়া, ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

জামাইবাবু নাম ত্যাগ করিয়া, প্রমোদকৃষ্ণ আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। অন্তরে বিষম অভিমান-বহ্নি জ্বলিতেছিল। মাতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া পর দিবস প্রভাতেই বধূকে আনিবার জন্য পাল্কী বেহারা পাঠাইয়া দিলেন। সেই সঙ্গে একখানা চিঠিও দেওয়া হইল। চিঠি এইরূপ,—

"আপনার বেহাইনের নমস্কার জানিবেন। আজ আমার পুত্রের অভিযোগের উত্তর করিতে আপনার মুখে কথা বাহির হয় না! কিন্তু আপনার কন্যার বিবাহসম্বন্ধের সময়, আমার স্বর্গীয় স্বামী যখন বড়মানুষের ঘরে কুটুম্বিতা করিতে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন, আমার মনে আছে, তখন আপনারই ওই মুখে কত মধুমাখা খই ফুটিয়াছিল। যাহা হউক, মুখে কথা থাকা না থাকা যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছাধীন, তখন বাক্‌রোধের নিমিত্ত আপনাকে তিরস্কার করিব না।

"এখন আমার কথা এই। পত্রপ্রাপ্তিমাত্র প্রেরিত লোকজনদিগের সঙ্গে আমার বধূমাতাকে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি, সে জন্য অন্যত্র আবেদন করিতে হইবে না।"

পত্র পড়িয়া জমীদার বাবুর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অনেক ঊর্দ্ধফণ ফণীর দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির এতদূর স্পর্দ্ধা কখনও দেখেন নাই। বাবু দরওয়ান্‌দের হুকুম দিলেন,—"পত্র লইয়া যে কয় জন লোক আসিয়াছে, প্রত্যেককে পাঁচ ঘা করিয়া পাগোরা জুতা পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দাও।"

হুকুম শুনিবামাত্র বেহারাদের কেহ বা পলাইল, কেহ বা দরওয়ানগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

প্রমোদকৃষ্ণের বধূ আনিবার সাধ এইরূপে মিটিল।

২

ক্রোধে ও লজ্জায় মাতাপুত্রের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া আসিল। এরূপ স্থলে যে একমাত্র উপায় বাঙ্গালাদেশে সচরাচর অবলম্বিত হইয়া থাকে, প্রমোদকৃষ্ণের জননী তাহার চিন্তা করিতেছিলেন কি না, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তবে প্রজাপতির দুই এক জন ভগ্নদূতের শুভাগমনবার্ত্তা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু প্রায় মাসখানেক পরে, একটা অভিনব উপায় আপনি আসিয়া দেখা দিল। উন্মাদিনীর স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র আসিয়া পঁহুছিল। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর হইলেও, আমরা পত্রখানি নিম্নে নকল করিয়া দিলাম।

"আপনার দাসী উন্মাদিনীর প্রণাম গ্রহণ করিবেন। বাবা আপনার লোকজনদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। সে অপমান আমার গায়ে লাগিয়াছে। সে জন্য আমি বাবার হইয়া আপনার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। দাসীর অপরাধ লইবেন না।

"পতিনিন্দা কানে শুনিয়া সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যেখানে আপনার অপমান, আমি সেখানে থাকিতে পারি না। এ বাড়ীর অন্ন আর গ্রহণ করিব না। তাহা আমার পক্ষে বিষ। যদি কখনও আমার সন্তান হয়, তাহাদিগকেও বারণ করিয়া যাইব, এখানে কখনও পদার্পণ না করে। যাহাতে আপনার অধিকার নাই, তাহা আমিও ভোগ করিতে পারি না। পিতার যত্নের ত্রুটি নাই। কিন্তু যখন মনে হয় যে, তিনিই আপনার প্রতি অপমান বর্ষণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আদরকে একান্ত অনাদর বই আর কিছু বলিয়া ভাবিতে পারি না। আপনি যেখানে স্বাধীন, যেখানে সামান্য বস্তুটির জন্য পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না,—দাসী চাকরের অপমান-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় না,—সে স্থান পর্ণকুটীর হইলেও আমার পক্ষে প্রাসাদতুল্য। আমি সেই দিনই এ গৃহ পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু একেলা বাহির হইতে পারি নাই। বিশ্বাস করিয়া মনের কথা এতদিন কাহাকেও বলিতেও পারি নাই। ভগবান আজ বিশ্বাসের যোগ্য একজনকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তাই আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। আমি আগামী কল্য

সন্ধ্যার পর লুকাইয়া এই বিশ্বস্ত দাসীর সহিত কামারপাড়ায় আমার আতরের বাড়ী চলিয়া যাইব। আপনি সেখান হইতে আমাকে কালই লইয়া যাইবেন। উন্মাদিনীকে যেন ভুলিবেন না।

"পুঃ। আমি চোরের মত লুকাইয়া যাইতাম না। কিন্তু বাবার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে এ কথা প্রকাশ করিলে কার্য্যহানির সম্ভাবনা। তাই একটু বাঁকা পথ অবলম্বন করিতে হইল। সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—"

বলা বাহুল্য, প্রমোদকৃষ্ণ তাহাই করিলেন। উন্মাদিনী স্বামিগৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিতা হইল। জমীদার মহাশয় আপ্‌শোষে কয়েক দিন কেবল অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কালে সকল ব্যথাই জুড়াইয়া যায়। তিনিও সান্ত্বনা লাভ করিলেন। উন্মাদিনী বা তাহার স্বামীর নাম আর মুখে আনিতেন না। এখন কি করিলে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হয়, তিনি আপনার বিপুল বিভবের একজন উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিতে পারেন, কর্ত্তা-গিন্নীর মনে সেই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল।

৩

এইখানে পাঠক মহাশয়কে একবার কুম্ভকর্ণের স্মরণ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য ঘুমাইতে হইবে। ইত্যবসরে প্রমোদকৃষ্ণ ইহ-সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গণে তাঁহারই ছবির ন্যায় একটি সুন্দর সুকুমার চারিবৎসরবয়স্ক শিশু খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। উন্মাদিনীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পূর্ণ মুখমণ্ডল দুঃখ ও দারিদ্র্যের পেষণে মলিন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ে সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা ও অভিমান-শিখা উজ্জ্বল জ্বলিতেছে। প্রমোদকৃষ্ণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না;—কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। শাশুড়ী ও বধূ কিশোর শিশুটির মুখ চাহিয়া কোনও রূপে দিনপাত করিতেছেন। উন্মাদিনীর পিতার আর কোনও সন্তান হয় নাই। সুতরাং প্রমোদকৃষ্ণের পুত্র, তাঁহার দৌহিত্র, এই শিশুটিই তাঁহার বিপুল বিত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী। যখন শিশুটি অন্নাভাবে কাঁদিত, তখন এই কথা স্মরণ করিয়া প্রমোদকৃষ্ণের মাতা নীরবে অশ্রুমোচন করিতেন। কিন্তু বধূর ভয়ে এবং তাহার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া, কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেন না। উন্মাদিনী প্রাণাধিক পুত্রের অনুপম কান্তি উপযুক্ত পোষণা-ভাবে দিন দিন ম্লান হইতে দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইত। তাহার

চোখ ফাটিয়া কখনও জল পড়িত কি না, ভগবান জানেন। মানুষে তাহা দেখিতে পাইত না। সে গ্রামস্থ এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পিতা বারংবার লোক পাঠাইয়াছেন, নিজেও দুই একবার আসিয়া আপনগৃহে লইয়া যাইবার জন্য কত অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় করিয়াছেন। পাষাণীর পাষাণ-হৃদয় কিছুতেই টলাইতে পারেন নাই।

এক দিন অপরাহ্নে উন্মাদিনী মুনিব-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শিশুটি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া, মাথায় মূল্যবান উষ্ণীষ পায়ে সমুজ্জ্বল জুতা পরিয়া, রাজপুত্রের মত প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছে। মাকে আসিতে দেখিয়া শিশু এক মুখ হাসিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল। উন্মাদিনী বুঝিতে পারিল যে, যিনি তাহার স্বামীকে এক দিন অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তিনিই তাহার পুত্রকে আজ এই অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়াছেন। কথাটা ভাবিতে তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। সে শিশুর মাথা হইতে টুপিটা টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। সেটা গড়াইতে গড়াইতে প্রাঙ্গণ-প্রান্তে একটা নর্দ্দমায় গিয়া পড়িল। তার পর মা ছেলেকে ধরিয়া সেই সুন্দর পোষাক খুলিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইল। শিশু কাঁদিয়া উঠিল, ঠাকুরমার নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল, আপনার সুকুমার দেহের সমগ্র ক্ষুদ্র শক্তিটুকু দুই হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া পোষাক সমেত স্বীয় বক্ষোদেশ চাপিয়া ধরিল। সে কিছুতেই তাহার মাতামহ-প্রদত্ত নবীন পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দিবে না। এ দিকে উন্মাদিনী টানাটানি করিতেছে। শিশু তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই প্রাঙ্গণে ধূলার উপর শুইয়া পড়িল, আর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরমার নাম ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঠাকুর-মা এত ক্ষণ কোথায় ছিলেন, বলিতে পারি না। শিশুর ক্রন্দনে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন ;—

"তোমার মতন পাষাণী মা ত কোথাও দেখি নি। হ'ক না ; আমাদের দেবার ক্ষমতা নাই ; ওর দাদামহাশয় দিয়াছেন। তা'তে তোমার এত আক্রোশ কেন ? যদি বেঁচে থাকে, ওরই ত সর্ব্বস্ব।"

উন্মাদিনী তখন শিশুকে ছাড়িয়া শাশুড়ীর উপর পড়িল। শিশু মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ঠাকুরমার এক পার্শ্বে আসিয়া লুকাইল।

বিচিত্র পোষাক ছিন্ন ভিন্ন ও ধূলায় ধূসরিত হইয়া তাহার অঙ্গে বৈরাগীর কন্থার ন্যায় ঝুলিতে লাগিল।

উন্মাদিনী কহিল, "আমার স্বামী দীন দুঃখী ছিলেন ; আমিও দীন দুঃখী। গরিবের ছেলের গায়ে অত পোষাক শোভা পায় না। পরের ধনে বড়মানুষী কেন ?"

শাশুড়ী। যদি কথা তুলিলে ত বলি, পরের ধনই বা কিসে ? ওর দাদা-মহাশয়ের ছেলেপিলে নেই, যা কিছু সব ওই ত পাবে।

বধূ। কা'র ধন পা'বে, সে কথাটা বোধ করি আপনার মনে নাই। আপনার ছেলের অপমান আপনি ভুলিতে পারেন, কিন্তু আমার স্বামীর অপমান আমি এ জন্মে ভুলিব না।

শাশুড়ী। যখন সময় ছিল, আমিও সে অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছি। এখন আর সে কথায় কাজ কি, মা ? যা'দের পেটে অন্ন নেই, তাদের আবার মান অপমান কি, মা ? এমন সোনার চাঁদ, দুধের ছেলে,—ওর মুখে ভাল খাবার, অঙ্গে ভাল কাপড় দিতে পারি না। এর বাড়া আর দুঃখ কি আছে ? আমাদের যা হ'বার হোক্। আমার প্রমোদের সোনার চাঁদ সুখে থাক্। মরণকালে তাই দেখিয়া যেন মরিতে পারি।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চোখের জল আর বারণ মানিল না। আপনার ঘরে গিয়া, মেঝায় পড়িয়া, উচ্ছ্বসিত স্বামিশোক ও পুত্রশোকে বৃদ্ধা কত দিনের কত কথা স্মরণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

৪

বৃদ্ধাকে অধিক দিন আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না। সকল যন্ত্রণাপহারী শমনের সুশীতল বাহুযুগল শীঘ্রই তাঁহার জন্য প্রসারিত হইল। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার কয়েক মাস পরেই প্রমোদকৃষ্ণের মাতা, উন্মাদিনী ও তাহার কিশোর শিশুটিকে সংসার সমরক্ষেত্রে ফেলিয়া, অমর-ধামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দুঃখে, শোকে ও দারিদ্র্যে উন্মাদিনীর দিন কাটিতে লাগিল। এখন হইতে সে বালকটিকে আর চোখের আড়াল করিত না। মুনিব-বাড়ী যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। সেখানেও শিশুটি সর্ব্বদা তাহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। অপর বালকগণ খেলার জন্য ডাকিলে বলিত, "আমি খেলিব না। আমার মা কাঁদিবে।" সে তাহার মাকে কোনও দিন কাঁদিতে দেখিয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তথাপি কি জন্য বলিতে পারি না, কেহ ডাকিলেই বলিত,—"না, আমার মা কাঁদিবে !" উন্মাদিনী তাহাকে

লইয়া কখনও কখনও গোপনে পরামর্শ করিত। পাঁচ বৎসরের শিশুর সঙ্গে পরামর্শটা কিরূপ, জানিবার নিমিত্ত পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। তাই আমরা নিম্নে তাহার একটা নমুনা দিতেছি। মা বলিতেন,—

"আমার পরাণ-ধন! তোমাকে যদি কেউ আমার কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে যায়?"

শিশু বলিত,—"তা' হ'লে আমি কাঁদিব।"

মা। আর আমি?

শিশু। তুইও কাঁদিবি!

মা। তোমার দাদামহাশয় যদি নিয়ে যান?

শিশু। আমি যা'ব না।

মা। কেন? তাঁরা ত তোমায় ভালবাসেন।

শিশু। কেন? তুই যে বলিস্ তা'রা আমার বাবাকে ভালবাসিত না।

মা। সেখানে যেও না বাবা! গরিবের ছেলের বড়মানুষের বাড়ী যেতে নেই। তা' হলে আমি কাঁদিব।

শিশু। না, মা! আমি কোথাও যা'ব না। বাবা যদি আসে কেবল তা'র কাছে যাব! তা' হলে ত তুই কাঁদিবি না?

মাতা-পুত্রের পরামর্শ ইহার পর আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সুতরাং আমরাও নিরস্ত হইলাম।

শিশু পাঁচ বৎসর ছাড়াইয়া ছয় বৎসরে পড়িল। উন্মাদিনী তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালে পাঠাইতে বাধ্য হইল। প্রমোদকৃষ্ণ বলিতেন,—"যে বিদ্যাধনের অধিকারী, সে জগতের অপর সকল ঐশ্বর্য্যকে অবহেলা করিতে পারে।" উন্মাদিনীর সে কথা স্মরণ ছিল। কিন্তু শিশুটিকে পাঠশালায় পাঠাইয়া তাহার মন কখনও সুস্থির থাকিত না। সে যতবার সুবিধা পাইত, স্বয়ং গিয়া শিশুটিকে দেখিয়া আসিত। সে যে বড়মানুষের মেয়ে—জমিদার-দুহিতা—তাহা বোধ হয় একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই রাস্তায় বাহির হইতে তাহার কিছুমাত্র লজ্জা হইত না। শুধু তাই নহে। এরূপ চাঞ্চল্যের আরও একটা কারণ ছিল। প্রমোদকৃষ্ণের মাতার মৃত্যুর পর উন্মাদিনীর পিতা কন্যা ও দৌহিত্রকে লইয়া যাইবার জন্য আর একবার আসিয়াছিলেন। এই শেষবারেও কন্যার কঠোর প্রতিজ্ঞার কোনওরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, সেইদিন হইতে তিনি কন্যার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ

করিলেন। কিন্তু তাঁহার দৌহিত্র, তাঁহার অতুল বৈভবের অধিকারী, তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। উন্মাদিনী ছাড়িয়া না দিলে তিনি আপন উত্তরাধিকারীকে বলপূর্ব্বক আপনার গৃহে লইয়া যাইবেন। তাঁহার সহিত বলে আঁটিয়া উঠেন, উন্মাদিনীর এমন সহায়, এমন সামর্থ্য ছিল না। তাই শিশুটিকে চক্ষের অন্তরাল করিয়া তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া থাকিত।

গুরুমহাশয় গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পাঠশালা গ্রামের প্রান্তে বারোয়ারীর আটচালায় স্থাপিত ছিল। গৌরচন্দ্র গ্রামের মধ্যে একজন বিজ্ঞলোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রায় দুই ক্রোশের ভিতর অন্য কোনও স্কুল বা পাঠশালা ছিল না। সুতরাং গৌরচন্দ্রের ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহার পাঠশালাটিও একটু উচ্চ ধরণের। গুরুমহাশয়ের নিজের জন্য একখানি চেয়ার, এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত ছাত্রবর্গের নিমিত্ত কয়েকখানি বেঞ্চ ছিল। উন্মাদিনীর শিশুটির স্বভাবগুণে গুরুমহাশয় তাহাকে আপন পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বেঞ্চগুলি বয়স্কছাত্রবৃন্দের জন্য কল্পিত হইলেও, গৌরচন্দ্র তাহারই একপ্রান্তে শিশুটিকে বসাইতেন। দিনের মধ্যে একবারমাত্র তাহার পাঠ লইতেন। পাঠান্তে শিশু আপন ইচ্ছামত খেলিত, বসিত, ঘুরিয়া বেড়াইত। গৌরচন্দ্র মানসিক শ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কখনও কখনও শিশুটির সহিত বাক্যালাপ করিয়া, বা তাহার খেলায় যোগ দিয়া, ক্লান্তি দূর করিতেন।

একদিন প্রভাতে পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ অনেকেই সমাগত হইয়াছে। উন্মাদিনীর বালকটিও আসিয়াছে। কিন্তু গৌরচন্দ্র স্বয়ং এখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। ছেলেদের মধ্যে কেহ ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ কলহ করিতেছে; কেহ বা ওরই মধ্যে একটু সুবোধ, গুরুমহাশয় সেদিনের যে পাঠ দিয়াছেন, তাহাই উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছে। এমন সময়ে আটচালার সম্মুখে বকুল বৃক্ষের তলায় একটা প্রকাণ্ডকায় হাতী আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে বড় বড় বাঁশের লাঠি কাঁধে করিয়া, মাথায় পাগড়ী, সুদীর্ঘকায় একদল হিন্দুস্থানী দরোয়ান আসিয়া পঁহুছিল। হস্তীর পৃষ্ঠে সুচিকণ ঝালরবেষ্টিত বিচিত্র হাওদা। হাওদার ভিতর স্বয়ং প্রমোদকৃষ্ণের শ্বশুর, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত জমীদার মহাশয়। অনেক ছেলে এ পর্য্যন্ত হাতী কখনও দেখে নাই। কেহ "হ'য়ে হাতী", কেহ "ঐ—ঐরাবত"

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অনেকে ভয়ে আটচালার ভিতর লুকাইল। ইত্যবসরে মাহুতের ইঙ্গিতক্রমে হাতী হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। তখন জমীদার মহাশয় হাওদার ভিতর হইতে নামিলেন। অদূরে তাঁহার বিষয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাঁহার দৌহিত্র, মলিনবসনে, অনাবৃত গাত্রে, আনাবৃত পদে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টে হাতীর পানে চাহিয়াছিল। জমীদার মহাশয় তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। বালক তাঁহাকে দেখিয়া চিনিল। বলিল, "দাদা মহাশয়!" দাদামহাশয় বলিলেন, "হাঁ দাদা! তবে আমাকে তোমার মনে আছে?" শিশু আবার বলিল, "দাদামহাশয়! তুমি ঐরাবত কোথা পেলে?"

দাদা। ঐরাবত তোমারই, ভাই! তোমাকে লইতে আসিয়াছে।

শিশু। আমি ত যা'ব না। আমার মা কাঁদিবে।

দাদা। না দাদা, তোমার মা কাঁদিবে না। তোমার মাকেও নিয়ে যা'ব।

শিশু। মা কই? মাকে ডাকো না।

দাদা। তোমার মা বিকাল বেলা যা'বে। তুমি আমার সঙ্গে চল। ইত্যবসরে একজন ভৃত্য বিচিত্র পোষাক আনিয়া দাদামহাশয়ের হাতে দিল। দাদামহাশয় আপন বসনপ্রান্তে বালকের অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে সেই সমুজ্জ্বল সাজে সজ্জিত করিলেন। তার পর তাহাকে একটি চুম্বন করিয়া আপন বক্ষে তুলিলেন। তুলিয়া হাওদার ভিতর গিয়া কোলে লইয়া বসিলেন। তখন মাহুতের ইঙ্গিতে হাতী আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তা'র পর গর্ব্বিত মন্থর পদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিল। লাঠী স্কন্ধে দ্বারবানের দল পশ্চাতে সারি দিয়া ধাবমান হইল।

পাঠশালার ছেলেরা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল। ঐরাবত চলিয়া যায় দেখিয়া, কেহ কেহ যত দূর পারিল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিন্তু পাকা বাঁশের লাঠীর ভয়ে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। আর কেহ কেহ বা ছাত্র-পল্টনের জেনেরাল গুরুমহাশয়কে সংবাদ দিতে দৌড়াইল।

৫

গ্রামের মধ্যে মহা গোলমাল পড়িয়া গেল। সেদিন আর পাঠশালা বসিল না। বালকগণ ছুটি পাইয়া হাতীর কথা আন্দোলন করিতে করিতে যে

যার বাড়ীতে প্রস্থান করিল। তাহার মধ্যে একদল ঐরাবতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৌতূহলসহকারে অগ্রসর হইল। গ্রামের মাতব্বর লোকেরা বিবিধ উপাখ্যানের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ বলিলেন,—হাতীটা বালককে শুঁড়ে ধরিয়া হাওদার ভিতর বসাইয়া দিয়াছিল। এ কথা তিনি তাঁহার নিজের ছেলের মুখে শুনিয়াছেন। তাঁহার ছেলে বালকটির সহপাঠী। সুতরাং তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কেহ বা বলিলেন,—ঐরাবত না কি বালককে দেখিবামাত্র দুই পা তুলিয়া নমস্কার করিয়াছিল! একজন রহস্যপ্রিয় বুড়া সহিষ্ণুতার সীমান্তে উপস্থিত হইয়া তাহারই টীকাস্বরূপ বলিলেন,—"হাতী নমস্কার করিয়াছিল বটে, কিন্তু দুই পা তুলিয়া নহে। আমি নিজের চক্ষে দেখিয়াছি, নমস্কারের সময় হাতী চারিটি পদই জমীর ঠিক চারি হাত উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছিল!"

ঐরাবতের বৃত্তান্ত যথাসময়ে উন্মাদিনীর কানে গিয়া পঁহুছিল। সে তখন কর্ম্মস্থলে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। উন্মাদিনী সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীজাতিসুলভ কোনও দুর্ব্বলতা দেখাইল না। কেবল তাহার চক্ষে উন্মাদিনীবৎ একটা উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অন্তরে যে অনল জ্বলিতেছিল, সে জ্যোতি তাহারই ছায়ামাত্র। উন্মাদিনী ধীরগমনে বাড়ীর কর্ত্রীর নিকট গিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, "এইবার আমার চাকরীর মেয়াদ ফুরাইয়াছে। আমি আর কাজ করিব না।" কর্ত্রী ঠাকুরাণীও সংবাদ শুনিয়াছিলেন। উন্মাদিনীর প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন,—"তা মা! এ ত তোমার চাকরী নয়। আমি তোমাকে আপন কন্যার মত দেখিয়া থাকি। তুমি কাজ কর, আর নাই কর, আমার গৃহে তোমাকে চিরদিনের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়াছি। আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।" উন্মাদিনী বলিল,—"মা! আপনার স্নেহ চিরদিন স্মরণ থাকিবে। আমি অনুগ্রহের প্রয়াসী নহি। ভগবান সেরূপ মতি দিলে পিতৃগৃহে রাণীর সম্পদ ত্যাগ করিয়া আসিতাম না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যিনি আমার হৃদয়ে এই অশ্রান্ত অভিমানের অনল জ্বালাইয়াছেন, তিনিই আমার উপায় করিয়া দিবেন। সেজন্য যেন মানুষের উপাসনা করিতে না হয়।" কর্ত্রীঠাকুরাণীর স্বভাবটি স্নেহরসে পরিপূর্ণ ছিল। উন্মাদিনীর এই উত্তর শুনিয়া আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। কথার পরিবর্ত্তে তাঁহার কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ের সমস্ত সৌরভ অপহরণ করিয়া সুবৃহৎ দুইটি মুক্তাফলের ন্যায় দুইটি

অশ্রুবিন্দু দুই গণ্ডে আসিয়া শোভিত হইল। উন্মাদিনী তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

উন্মাদিনী আপনার ঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার স্বর্গীয় স্বামী যে শয্যায় শুইতেন, বহুকাল হইল যে শয্যা সে আর স্পর্শ করে নাই, আজ কি মনে করিয়া তাহারই উপর শয্যারচনা করিয়া শয়ন করিল। তা'র পর আবার কি ভাবিয়া উঠিল। উঠিয়া, স্বামীর লিখিবার বাক্সটি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ বাহির করিল। ফটোগ্রাফ তাহার স্বামী ও শিশুর। শিশুটির বয়স যখন দুই বৎসর, প্রমোদকৃষ্ণ ফটোগ্রাফ-শিক্ষার্থী কোনও বন্ধুর অনুরোধে তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া এই ছবি তুলাইয়াছিলেন। উন্মাদিনী ছবিখানি বক্ষে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিল। যে উচ্চ সুরে তাহার প্রাণের বীণা এতদিন বাঁধা ছিল, তাহা এইবার ছিঁড়িয়া গেল। উন্মাদিনী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। বহুকাল অনুপভুক্ত স্বামীর সেই শয্যার উপর পড়িয়া দরবিগলিতধারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল;—

"ও আমার সাতরাজার ধন! আমার আঁধার ঘরের মাণিক! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তোরে কে চুরি করিল? আমার অঞ্চলের নিধি! কেন আমি তোমাকে অঞ্চলছাড়া করিলাম? তাহা না করিলে আমার প্রাণ থাকিতে ত কেহ তোমাকে কাড়িয়া লইতে পারিত না। সেখানে তোমাকে রাজার আদরে, রাজভোগে রাখিবে, তা' আমি জানি। কিন্তু সে আদর যে তোমার পক্ষে বিষ, তাহা কে তোমাকে শিখাইবে? আমি অতি দুঃখিনী—চির-কাঙালিনী। তোমার মনে আমি যাহাতে আর ঠাঁই না পাই, তা'রা তাই করিবে। আমাকে ঘৃণা করিতে শিখাইবে। আমাকে ভুলিয়া যাইতে শিখাইবে। যাঁহার অপমান আজ পর্য্যন্ত আমার মর্ম্মস্থলে অগ্নিশিখার মতন জ্বলিতেছে, তাঁহাকেও ভুলিয়া যাইতে শিখাইবে। যে প্রতিজ্ঞাপালনের আশায় এত দিন এ প্রাণ রাখিয়াছি, আজ তা' আমার ঘুচিয়া গেল। তবে প্রাণ আর কিসের জন্য রাখিব?"—

কিন্তু উন্মাদিনী ত মরিল না। শোকের প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে আবার উঠিল। চোখের জল মুছিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময় হইতে তাহার স্বভাবে উন্মাদের লক্ষণ কিছু কিছু দেখা দিল। সে এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারিত না, এক জনের সহিত অধিকক্ষণ কথা কহিতে

পারিত না। প্রায় সর্ব্বদাই পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। কখনও বা গুণ্ গুণ্ করিয়া গান করিত। সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইলে জিজ্ঞাসা করিত,—"হাঁ গা! রাজার হাতী এই পথে গেল কি? আমার ছেলেকে রাজা কর্‌বে। আমি রাজার মা হ'তে পার্‌ব না? আমি কাল শ্বশুর-বাড়ী যা'ব। আমার স্বামী নিতে এসেছে! আমি রাজার মা হ'তে পার্‌ব না!"—কথা কহিতে কহিতে উন্মাদিনী হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। কখনও বা, "ঐ আমার গোপাল মা মা ব'লে কাঁদ্‌ছে। সে রাজা হ'বে না। যাই, আমি তা'কে কেড়ে নিয়ে আসি।"—এইরূপ বকিতে বকিতে রাস্তা দিয়া ছুটিত। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া পাষাণেরও হৃদয় ফাটিয়া যাইত।

৬

রোগ সর্ব্বক্ষণ স্থায়ী নহে। কখন আসে, কখন যায়। যখন ভাল থাকিত, উন্মাদিনী ঘরের বাহির হইত না। কখনও বসিয়া বসিয়া ভাবিত, কখনও স্বামীর শয্যায় পড়িয়া কাঁদিত। কোনও দিন বা নিজের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিত। উন্মাদের অবস্থাতেও তাহাকে কখনও পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে, অথবা পরের অন্ন খাইতে দেখা যায় নাই। কেহ কিছু দিতে চাহিলে রুদ্ধ হইয়া বলিত, "আমি উন্মাদিনী, ভিখারিণী নহি।"

এইরূপে দুই এক মাস কাটিয়া গেল। তার পর উন্মাদিনী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। মকদ্দমা ভিন্ন তাহার শিশুটিকে পাইবার আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া, তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল। অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া, অবশেষে স্বামির ভদ্রাসনটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া গ্রামের অনেক লোক অর্থসাহায্য করিতে চাহিল। উন্মাদিনী তাহাদের গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল।

উন্মাদিনীর হাতে কয়েক শত টাকা সংগৃহীত হইল বটে; কিন্তু এই সময়ে আবার তাহার রোগ আসিয়া দেখা দিল। তথাপি সে মকদ্দমার কথা ভুলিল না। যাহার সঙ্গে দেখা হয়, কেবল জিজ্ঞাসা করে,—"হাঁ গা! জজসাহেব কোথা থাকে জানো? আমি তার কাছে নালিশ করিব। আমার গোপালকে চোরে নিয়ে গেছে। আমি চোরকে ফাঁসি দিব!" লোকে শুনিয়া হাসে, কেহ বা বিদ্রূপ করে, কেহ বা আপনাদের মধ্যে একজনকে জজসাহেব বলিয়া দেখাইয়া দেয়। অবশেষে একজন প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গিয়া, হৃদয়পুরের আদালতের কথা বুঝাইয়া বলিয়া দিল। আমাদের বিশ্বাস,

সে রমণী নিশ্চয়ই তাহারই ন্যায় শিশুহারা। নহিলে এমন কুকাজ কখনও করিত না।

হৃদয়পুরে আসিয়া উন্মাদিনী পূর্ব্ববৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেক উকীলের সাক্ষাৎ পাইল; কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া, লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, কেহই তাহার মকদ্দমা লইতে রাজি হইল না।

প্রেমগোবিন্দ নামে একজন শাপভ্রষ্ট ভদ্র লোক কয়েক বৎসর ধরিয়া আদালতের হাওয়া খাইতেছিলেন। এ পর্য্যন্ত হাতে-খড়ী করিতে পারেন নাই। একদিন কাছারী যাইবার সময় উন্মাদিনী তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি সন্ধান করিয়া লোকের মুখে তাহার অবস্থা অবগত হইলেন। প্রেমগোবিন্দের মাথাটা যতই সবল হউক, তিনি হৃদয়ের ভিতর একটু দুর্ব্বলতা পোষণ করিতেন। তাই শিশুহারা জননীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নূতন ধরণের মকদ্দমাটা লইয়া একটু নাম কিনিবার বাসনাও জাগিয়া উঠিল। তিনি সে দিন কাছারী যাওয়া বন্ধ করিয়া উন্মাদিনীকে আপন আলয়ে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তার পর তাহার সব কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া, আইনের বহি খুলিয়া, নজীর ঘাঁটিয়া একখান আরজী প্রস্তুত করিলেন। পর দিবস আদালত বসিবামাত্র তাহা পেশ্ করিয়া দিলেন। অনেকে উপহাস করিতে লাগিল,—"কি হে! ব্যবসায়ের গতিক বুঝিয়া অবশেষে উন্মাদ হইবার সাধ হইল না কি?" প্রেমগোবিন্দ তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মকদ্দমাটায় আপনার সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করিলেন।

নিজের সামর্থ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া প্রেমগোবিন্দ অনুনয়-বিনয় সহকারে দুই একজন নামজাদা উকীলেরও সহায়তা লাভ করিলেন। উন্মাদিনী বিষয়-বিক্রয়-লব্ধ টাকার পুঁটুলিটি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিল। প্রেমগোবিন্দ তাহা স্পর্শও করিলেন না। খরচ-পত্র সব নিজেই নির্ব্বাহ করিলেন! সুতরাং উন্মাদিনীর টাকা তাহার অঞ্চলেই বাঁধা রহিল।

জমিদার মহাশয়ের পক্ষে আয়োজনের ত্রুটি হইল না, পাঠক তাহা নিজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। যোগ্য উকীল যাঁহারা ছিলেন, কেহই নিযুক্ত হইতে বাকী রহিলেন না। ব্যাপার দেখিয়া যে দুই এক জন ইতিপূর্ব্বে প্রেমগোবিন্দের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কপালে করাঘাত করিয়া আঙ্গুল কামড়াইতে লাগিলেন।

আজ মকদ্দমার দিন। আদালতে লোক আর ধরে না। পাগলের মকদ্দমার বিচার শুনিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক। বাদিনীর পক্ষে বক্তৃতা শেষ হইলে, আসামীর উকীল ধর্ম্মাবতারকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আদালতের সম্মুখে যে বালককে আজ হাজির করা হইয়াছে, সে যে বাদিনীর গর্ভজাত, আমার মক্কেল তাহা স্বীকার করেন। বালককে যে বাদিনীর অজ্ঞাতসারে এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মক্কেল আপন প্রাসাদে লইয়া গিয়াছেন, তাহাও তিনি স্বীকার করেন। এ সব কথা স্বীকার করিয়াও তিনি বালককে তাহার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য নহেন। প্রথম কারণ, বাদিনী উন্মাদিনী; তাহার হাতে বালকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কারণ, বাদিনীর মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। পথে পথে, মাঠে মাঠে তাহার আশ্রয়। তাহাতেও বালকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। তৃতীয় কারণ,"—কিন্তু আমরা পাঠক মহাশয়কে এই কারণ-পরম্পরার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া আর হাবুডুবু খাওয়াইতে ইচ্ছা করি না।

এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আদালতগৃহে বাতী জ্বালা হইল। তখন হাকিম বাদিনীর পক্ষে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হুকুম লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হুকুম যাহা হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। লেখা শেষ হইলে ধর্ম্মাবতার তাহা পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রেমগোবিন্দ উন্মাদিনীর ইচ্ছানুসারে আদালতকে জানাইলেন,—"আমার মক্কেল নিজে এই মকদ্দমা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চান।" হাকিম মহা বিরক্ত হইলেন,—কিন্তু অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তখন উন্মাদিনী মঞ্চের এক প্রান্তে সর্ব্বলোকলোচনের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মহিমা-মন্থর পদক্ষেপ, তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব পরিণতি, তাহার বিশালায়ত লোচনযুগলের মহত্ত্বোজ্জ্বল বিদ্যুচ্চকিত দৃষ্টি দেখিয়া স্বয়ং বিচারকপ্রবরের হৃদয়দেশও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উন্মাদিনী বলিল,—"আমার সন্তানকে আমার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা হউক।"

আসামীর উকীল আপত্তি করিলেন,—"ইহাতে বালকের প্রাণহানির সম্ভাবনা।" বাদানুবাদের পর বালককে বিচারকের চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড় করাইবার ব্যবস্থা হইল।

উন্মাদিনীকে দেখিবামাত্র শিশু 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—তাহার ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইল। আসামীর উকীল অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"দোহাই হুজুরের! বালকের প্রাণহানি করিবেন না!" অনেক

কষ্টে বালককে থামাইয়া রাখা হইল। হাকিম স্বয়ং তাহার হাত ধরিয়া রহিলেন। উন্মাদিনী তখন বলিতে লাগিল,—

"দোহাই ধর্ম্মাবতার! ভগবানের বিচার হইতে মানুষের বিচারের প্রভেদ করিবেন না। ভগবান উহাকে আমারই গর্ভে স্থান দিয়াছিলেন। তখন আমারই হৃদয়ের শোণিত আমারই নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়া উহাকে পোষণ করিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হইলে আমারই বুকের সুধায় উহার অধর সিক্ত হইয়াছে। তার পর আজ ছয় বৎসর ধরিয়া আমি উহাকে দেহপাত করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমারই ললাটের অবিশ্রাম স্বেদবিন্দু অন্নজলে পরিণত হইয়া উহার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু গঠিত করিয়াছে। সেই আজন্মের—সেই জন্মপূর্ব্বের বন্ধন আপনি আজ ছিন্ন করিতে চান্? আজ উহার অধিকার-তত্ত্ব আপনার বিচারে আসিয়াছে। কিন্তু যখন দশ মাস দশ দিন আমার জঠরে বাস করিতেছিল, তখনকার বিচার ভার ত আপনার হস্তে ছিল না! দোহাই ধর্ম্মাবতার!"—উন্মাদিনীর দুই গণ্ডের উপর দুই অশ্রান্ত জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল,—"দোহাই ভগবানের! আমার জীবনের একমাত্র বন্ধন—আমার হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।"—বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে আর কথা কহিতে পারিল না। কেবল করযোড়ে অশ্রুবিপ্লাবিত বদনে বিচারকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ দিকে শিশু আবার 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—বিচারকের হাত ছাড়াইয়া মায়ের কাছে যাইতে উদ্যত হইল। একজন প্রহরী বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া রাখিল।

বিচারকের হৃদয় ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল। বুঝি ভাবিলেন,—"একি উন্মাদিনীর উক্তি!" মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম-সংবরণ করিয়া রায় পড়িয়া শুনাইলেন। উন্মাদিনীর শেষ আশার রশ্মিও নিবিয়া গেল। উন্মাদিনী তখন প্রকৃতই উন্মাদিনীবৎ এক লম্ফ দিয়া মঞ্চোপরি বিচারকের অভিমুখে এক পদাঘাত করিল। সে বুঝি ভাবিয়াছিল, সেই এক পদাঘাতে দেশের সমগ্র ধর্ম্মাধিকরণ চূর্ণ করিয়া ফেলিবে! তা'র পর আর এক লম্ফে বিচার-মঞ্চ পার হইয়া পলকের মধ্যে বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! আদালত-গৃহ মহান কলরবে পূর্ণ হইল। কে কাহাকে ধরিতেছে, কে কাহার পশ্চাতে ছুটিতেছে, তাহার ঠিকানা রহিল না।

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে জমীদার মহাশয়ের তোরণ-রক্ষক এক-

দিন নব-নির্ম্মল প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া তোরণ-পার্শ্বে একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। অনেক সন্দেহ-অনুমানের পর স্থির হইল, দেহটা উন্মাদিনীরই বটে!

উপসংহার।

প্রেমগোবিন্দ তাঁহার গল্প পড়িয়া শেষ করিলেন। শ্রোতার অবস্থা যাহাই হউক, লেখককে সান্ত্বনা করা আমার পক্ষে একটা বিষম দায় হইয়া উঠিল। প্রিয়বরের অশ্রুর স্রোত কিছুতেই বারণ মানিতে চাহে না। আমি বলিলাম,—"ভাল উকীল যা' হ'ক! কাঁদিয়া মকদ্দমা জিতিবে না কি?"

প্রেমগোবিন্দ। চল ভাই! আর এ রাজ্যে থাকিব না। আর এ ব্যবসা করিব না।

আমি। চল। আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আজ আমি অপূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত। ঔষধের শিশির মধ্য হইতে কবি কিট্‌সকে উদ্ধার করিবার গৌরব কেহ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই,—তিনি নিজেই প্রতিভাবলে সে কাজটা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আজ নজিরের ভস্মস্তূপ ও মকদ্দমার নথি-পত্র হইতে তোমার ন্যায় কবিকে আবিষ্কার করিয়া আমি বিচিত্র জয়মাল্যে সুশোভিত হইলাম।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণ।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও মৌর্য্যবংশীয় তৃতীয় সমাট্। ২৬৩-২২৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি মৌর্য্য সাম্রাজ্য শাসন করেন। মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে "রাষ্ট্রিক" জাতির উল্লেখ দেখা যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে "রট্ট" জাতি দক্ষিণাপথে আধিপত্য লাভ করে। তাঁহাদের নামানুসারে, তাঁহাদের অধ্যুষিত জনপদ মহারট্ট (মহারাষ্ট্র) নামে পরিচিত হয়। এই "রট্ট" জাতিই কালক্রমে "রাষ্ট্রিক" নামে পরিচিত হয়। রট্টবংশীয় বিভিন্ন পরিবার, পরস্পরের রক্ষণার্থ রট্টকূড়=(রাঠোড়=রাষ্ট্রকূট) নামে সম্মিলিত হয়। অন্ধ্রভৃত্য ও ক্ষত্রপ নরপতিগণের অধিকারকালে এই রাষ্ট্রকূট সামন্তেরা বিভিন্ন প্রদেশে অধীনতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন। অন্ধ্রভৃত্য

ও ক্ষত্রপ বংশের অধঃপতনের পর, সম্ভবতঃ এই রাষ্ট্রকূটগণ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কাহেরির পর্ব্বতগহ্বরে এক বৌদ্ধচৈত্যে একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের লিপি দৃষ্টে ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা রাষ্ট্রকূটবংশীয় কোন নরপতির ২৪৫-তম বর্ষে লিখিত হয় বলিয়া, উক্ত তাম্রশাসনে নির্দ্দিষ্ট আছে। চালুক্য-বংশের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাষ্ট্রকূটবংশ দক্ষিণাপথে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া, জয়সিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে চালুক্যবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিন শত বৎসর রাষ্ট্রকূটবংশ চালুক্য সম্রাটদিগের পদানত থাকিয়া, পুনরায় স্বাধীন হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত (৭৫৩—৯৭৩ খৃঃ) রাষ্ট্রকূটবংশ প্রবলপ্রতাপে দক্ষিণাপথ শাসন করিয়া, অবশেষে পুনরায় চালুক্যবংশের পদানত হয়। মাধ্য যুগে রট্ট সামন্তেরা বেলগাঁও জিলার সুগন্ধবর্ত্তী (সৌনদত্তি) প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। *

কোহ্লাপুরের সন্নিহিত সামনগড়ে দন্তিদুর্গের নামাঙ্কিত এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাহা ৬৭৫ শকাব্দে (৭৫৩ খৃঃ) দন্তিদুর্গের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। ইহাতে রাষ্ট্রকূটবংশীয় দন্তিদুর্গের পিতামহ গোবিন্দরাজ হইতে বংশাবলী আরব্ধ হইয়াছে। এলুরার গহ্বরস্থ দশাবতারের মন্দিরে গোবিন্দরাজের পূর্ব্বতন দন্তিবর্ম্মা ও ইন্দ্ররাজের নাম খোদিত রহিয়াছে। দন্তিবর্ম্মা হইতে রাষ্ট্রকূট নরপতিগণের ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাইতেছে। সামনগড়ের শাসনপত্র ৬৭৫ শকাব্দের মাঘমাসের রথসপ্তমীদিনে উৎকীর্ণ হয়। ইহার দ্বারা মহারাজ দন্তিদুর্গ শেপ্পর (সোপ্পর ?) জনপদের অন্তর্গত দেউলবট গ্রাম বশিষ্ঠগোত্রজ বেদবেদাঙ্গবিৎ নারায়ণ ভট্টকে প্রদান করেন। নারায়ণ ভট্ট করহাটক † গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণভট্ট ও পিতামহের নাম ত্রিবিক্রমভট্ট। এই শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, ৬৭৫ শকাব্দে ৮১১ সংবৎ ছিল। নিম্নে এই শাসনপত্রের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

* Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan" (1884), p. 9 and 35-36.

† কৃষ্ণা ও কোয়না নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত বর্ত্তমান কহ্লাড় নামক গ্রাম। সাহিত্য-সম্পাদক।

"আসীদ্দ্বিষত্তিমিরমুদ্যতমণ্ডলাগ্রো
ভূঃ শুচির্বিজয়তাপ্তদিগন্তকীর্ত্তিঃ।
তস্যাত্মজো জাগ্রতদীর্ঘকীর্ত্তিঃ
পুণ্যঃ কৃতিষ্বপকৃতানুকৃতিঃ কৃতজ্ঞঃ ॥ ১ ॥
তস্য প্রভিন্নকরটচ্যুতদানদন্তি-
ত্রাণঃ ক্ষিতৌ ক্ষপিতশত্রুরভূত্তনূজঃ।
যস্তীব্রয়ন্নভিমুখো রণশর্ব্বরীষু
গোবিন্দরাজ ইতি রাজসু রাজসিংহঃ ॥ ২ ॥
যার্ব্বার্ত্তহারিহরিবিশ্রুতনামধারী।
শ্রীকর্করাজ ইতি গোত্রমণির্বভূব ॥ ৫ ॥
দত্তপ্রহাররুচিরোল্লিখিতা সপীঠঃ
সম্রাট্কূট-কনকাদ্রিরিবেন্দ্ররাজঃ ॥ ৮ ॥
পূরিতাজাশুচির্ধ্বস্তাবৃত্তির্জ্যোৎস্নেব মাতৃতঃ।
রাজ্ঞী সোমান্বয়ী তস্য পিতৃতশ্চ শলুক্যজা ॥৯॥
যস্যতেজসি ধামোঘপ্রক্ষালিত-দিগন্তরঃ।
শ্রীদন্তিদুর্গরাজস্য স্বকুলাম্ভোজভাস্করঃ ॥ ১১ ॥
মহীমহানদীরেবারোধোভিত্তিবিদারণং।
লোকা বিলোকয়ন্ত্যুচ্চৈঃ কৃতং যজ্জয়কুঞ্জরৈঃ॥১৪॥
মাতৃভক্তিঃ প্রতিগ্রামং গ্রামলক্ষচতুষ্টয়ে।
দদত্যা ভূপ্রদানানি যস্য মাত্রা প্রকাশিতা ॥১৫॥
সদ্মবিভেদমগৃহীত-বিধৌতশস্ত্রং,
অজ্ঞাতমপ্রণিহিতান্ত্রমপেতযত্নাৎ।
যো বল্লভং সপদি দণ্ডলকেন জিত্বা,
রাজাধিরাজপরমেমশ্বরতামুপৈতি ॥ ১৬ ॥
সমরে ? বিনির্জিত্য তৈলপোঽভূন্মহীপতিঃ।
চালুক্যনৃপভ্রাজিষ্ণু যযাতিরাজকেশরী ॥ ৯ ॥
তস্যাত্মজঃ পরং জিষ্ণুঃ খ্যাতঃ সত্যাশ্রয়োঽভবৎ।
ক্ষিতীশ্বরঃ সত্যবৃত্তির্বিক্রমৈকরসোর্জ্জিতঃ ॥১০॥
কাঞ্চীশ-কেরলনরাধিপ-চোল-পাণ্ড্য-
শ্রীহর্ষ-বজ্রটবিভেদবিধানদক্ষং।
কর্ণাটকং বলমনন্তমজেয়রথ্যৈ,
ভূত্যৈঃ কিয়দ্ভিরপি যঃ সহসা জিগায় ॥ ১৭ ॥

"স চ পৃথ্বীবল্লভ-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-খড়্গাধার্ক-শ্রীদন্তিদুর্গরাজদেবঃ-সর্ব্বানেব ... ... আজ্ঞাপয়তি।" *

মহারাজ দন্তিদুর্গের প্রপিতামহ গোবিন্দ সম্ভবতঃ ঐহোলির শিলালিপিতে চালুক্যবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গোবিন্দ চালুক্যসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন, এবং পরে চালুক্যসম্রাটের সহিত বন্ধুত্বসংস্থাপনে বাধ্য হন। গোবিন্দের পুত্র কর্করাজ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রীতি সম্পাদন করেন। কর্করাজের পুত্র ইন্দ্ররাজ চালুক্যবংশীয় এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রাজকুমারী মাতৃপক্ষে চন্দ্রবংশীয় রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই গর্ভে ইন্দ্ররাজের পুত্র দন্তিদুর্গ জন্ম লাভ করেন। দন্তিদুর্গ চালুক্যরাজ বল্লভকে (দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মাকে) পরাজিত করিয়া, দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূটবংশের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কর্ণাটক, কাঞ্চী, কেরল, চোল ও পাণ্ড্যদেশীয় নরপতিগণকে পদানত করেন। শ্রীহর্ষ ও বজ্রট তাঁহার আনুগত্যস্বীকারে বাধ্য হন। কলিঙ্গ, কোশল, মালব, লাট, শ্রীশৈল ও টঙ্কের নরপতিগণ তাঁহার বশীভূত হন। মহারাজ দন্তিদুর্গ মালবের রাজধানী

* Journal of Bombay R. A. S. (II. 375-376.)

উজ্জয়িনী নগরে অবস্থিতিকালে প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যমাণিক্যাদি প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করেন।

দন্তিদুর্গের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য কৃষ্ণরাজ রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ইন্দ্ররাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কর্করাজের দ্বিতীয় পুত্র। সামনগড় ও খারেপাটনের † তাম্রশাসন হইতে রাষ্ট্রকূটবংশের যে নামাবলী জানা যাইতেছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। ইহারা রাষ্ট্রকূটবংশের পরবর্ত্তী ইতিহাস অবগত হইবার পাঠকবর্গের সুবিধা হইবে। নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আনুমানিক শাসনকা[illegible] নির্দ্দিষ্ট হইল।

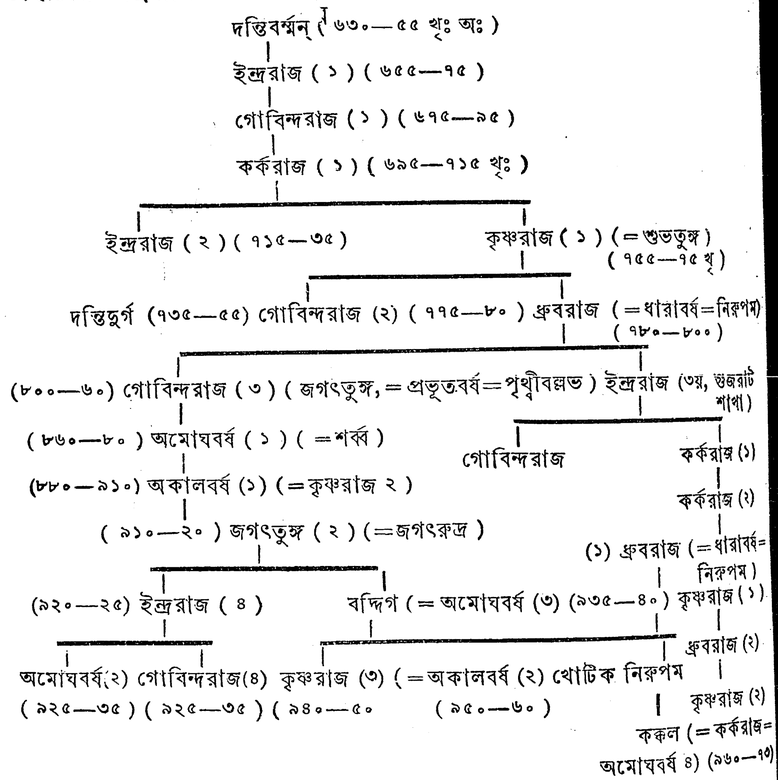

খারেপাটনের তাম্রশাসন ১৮৪২ খৃঃ নবেম্বর মাসে বোম্বের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বালগঙ্গাধর শাস্ত্রীর যত্নে ও পরিশ্রমে আবিষ্কৃত হয়। ইহা ৯৩০ শকাব্দে (১০০৮ খৃঃ) কঙ্কণের শিলাহারবংশীয় নরপতি রট্টরাজের আদেশে খোদিত হয়। ইহা

† Bombay branch of R. A. S. (1. 209-224.)

দ্বারা রট্টরাজা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শান্তম্মাণ্ডী, আম্মবীর ও বড়দ্গুন গ্রামে তিনখানি গ্রাম মত্তময়ূরবংশীয় কর্করোলীর বংশধর আত্রেয়-গোত্রজ ব্রাহ্মণ-গণকে প্রদান করেন। সান্ধিবিগ্রহিক দেবপালের পুত্র লোকপাল দ্বারা চারি খানি তাম্রপত্রে এই দানপত্র লিখিত হয়। রট্টরাজ চালুক্যপতি সত্যাশ্রয়ের অধীন মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। এই শিলাহারবংশীয় রট্টরাজের রাজধানী সম্ভবতঃ খারেপাটন বা বিজিয়াদুর্গে অবস্থিত ছিল। জীমূতকেতু এই শিলাহারবংশের আদিপুরুষ। চালুক্যসম্রাট তৈলপরাজের পুত্র সত্যাশ্রয়ের সমকালিক রট্টরাজ এই তাম্রশাসনে আপনার বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম কৃষ্ণরাজের সময়ে শণফুল্ল দ্বারা এই বংশের আধিপত্য দক্ষিণ কঙ্কণে প্রতিষ্ঠিত হয়। শণফুল্ল কৃষ্ণরাজের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। এই কৃষ্ণরাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। রট্টরাজ শণফুল্লের অধস্তন দশম বংশধর। রট্টরাজ ৯৩০ শকাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময় হইতে শণফুল্ল ও কৃষ্ণ-রাজের সময় অবধারিত হইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫।২৬ বৎসর ধরিলে, ৯ পুরুষে ২২৫।২৩৪ বৎসর রাজত্বকাল গ্রহণ করা যাইতে পারে। ৯৩০ শকাব্দ রট্ট-রাজের রাজ্যারম্ভকাল অনুমান করিয়া, (৯৩০—২৩৪) ৬৯৬ শকাব্দ (৭৭৪ খৃঃ) শণফুল্ল ও তাঁহার সমসাময়িক কৃষ্ণরাজের সময় অনুমিত হইতে পারে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, শণফুল্ল রাষ্ট্রকূট-নরপতি প্রথম কৃষ্ণরাজের সমসাময়িক ছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে রাষ্ট্রকূটেশ্বরদিগের পূর্ণ নামাবলী জানা যাইতেছে। রাষ্ট্রকূটবংশজ শেষ নরপতি কক্কলকে পরাজিত করিয়া, মহারাজ তৈলপ চালুক্যবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। রট্টরাজ মহারাজ তৈলপের পুত্র সত্যাশ্রয়ের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকূটবংশ যদুবংশ হইতে উদ্ভূত হয়। দন্তিদুর্গ হইতে কক্কল পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ জন নৃপতি রাষ্ট্রকূটবংশে রাজত্ব করেন। অনন্তর চালুক্যবংশের আধিপত্য মহারাজ তৈলপ দ্বারা পুনরায় স্থাপিত হয়।

"গোত্রং ভিত্বা ন ভূতো ন মধুপবসতির্নো সদা ধর্ম্মবক্রো
শক্রান্তো দণ্ডকোট্যা ন চ পর-পবনাকম্পিতো নান্তহীনঃ।
নাধস্তান্নীতমূলঃ প্রকৃতিরতিঘনা নো রণে দত্তপৃষ্ঠঃ
সাঽত্যর্থোঽস্তীহ বংশো যদুকুলতিলকো রাষ্ট্রকূটেশ্বরাণাং॥ ২॥
তত্রাসীদন্তিদুর্গঃ প্রভুরপি চ ততঃ কৃষ্ণরাজঃ পিতৃব্য-
স্তস্মাদ্ গোবিন্দরাজস্তমনু নিরুপমোঽস্মাজ্জগত্তুঙ্গদেবঃ।

তৎপুত্রোঽমোঘবর্ষো রিপুবনদহনোঽসাপ্যথাকালবর্ষো
নপ্তাস্য শ্রীন্দ্ররাজো রুচিরবরবপুস্তৎসুতোঽমোঘবর্ষঃ ॥ ৩ ॥

শৃঙ্গাররসনিবাসো বসন্তবদ্বরবধূসমূহবৃতঃ।
হরিরিব তস্য বলীয়ান্ ভ্রাতা
গোবিন্দরাজোঽভূৎ ॥ ৪
পিতৃব্যস্তস্যাসীৎ প্রণয়জননাকল্পবিটপী
কৃতান্তোঽরাতীনাং নয়গুণনিধি
র্বদ্দিগো নৃপঃ।
প্রতিচ্ছন্দঃ সাক্ষাৎকৃতযুগনৃপাণাং কলিযুগে
সদাচারঃ শান্তো মুনিরিব জগত্তুঙ্গতনয়ঃ ॥ ৫ ॥
শম্ভোঃ ষড়ানন ইবাত্রিমুনেরিবেন্দুঃ
রামো যথা দশরথস্য সুরেন্দ্রস্য জয়ন্তঃ।
তস্যাত্মজোঽপি চতুরম্বুধিমেখলায়া
ভর্ত্তা ভুবঃ সমভবৎ ভুবি কৃষ্ণরাজঃ ॥ ৬ ॥
সোঽয়ং ক্ষিত্যা মণ্ডলযোগদৃষ্ট্যা
যাতে তস্মিংশ্চৈব সদ্মাবকাশং।
তস্য ভ্রাতা খোটিকাখ্যস্ততোঽভূৎ
পৃথ্বীভর্ত্তা ত্যাগকামোর্জ্জিতশ্রীঃ ॥ ৭ ॥
কক্কলস্তস্য ভ্রাতৃব্যো ভুবো ভর্ত্তা জনপ্রিয়ঃ।
আসীৎ প্রচণ্ডধামেব প্রতাপজিতশাত্রবঃ ॥ ৮ ॥"

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে খোটিকের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কলের উল্লেখ আছে। কিন্তু কক্কলের পিতা নিরুপমের উল্লেখ দেখা যায় না। এই কক্কলকে সমরে পরাজিত করিয়া তৈলপ ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩ খৃঃ) দক্ষিণাপথে চালুক্য-বংশের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি দক্ষিণাপথ হইতে রাষ্ট্র-কূটবংশের অধিকার বিলুপ্ত হয়। সেই সময় হইতে রাষ্ট্রকূটবংশ চালুক্য-নরপতিগণের সামন্তমধ্যে পরিগণিত হয়।

সমরে তং বিনির্জিত্য তৈলপোঽভূন্মহীপতিঃ। তস্যাত্মজঃ পরং জিষ্ণুঃ খ্যাতঃ সত্যাশ্রয়োঽভবৎ।
চালুক্যনৃপভ্রাজিষ্ণু র্যযাতিরাজকেশরী ॥ ৯ ॥ ক্ষিতীশ্বরঃ সত্যবৃত্তির্বিক্রমৈকরসোর্জ্জিতঃ ॥১০॥

কড়াতে পূর্ব্বোল্লিখিত কক্কলের নামাঙ্কিত এক তাম্রশাসন * আবিষ্কৃত হয়। তাহা রাজা কক্কলের আদেশে ৮৯৪ শকাব্দে (৯৭২ খৃঃ) উৎকীর্ণ হয়। ইহার পরবৎসর তৈলপ কর্ত্তৃক কক্কল পরাজিত হইলে, রাষ্ট্রকূটবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথ হইতে উৎসন্ন হয়। ৭৪৮—৯৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ২২৫ বর্ষকাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় ত্রয়োদশ জন নরপতি দক্ষিণাপথে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করেন। কক্কলের পিতা নিরুপমের নাম এই তাম্রশাসনে প্রদত্ত হইয়াছে। এই শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, নিঃসন্তান অবস্থায় দন্তিদুর্গের মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতৃব্য কৃষ্ণরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃষ্ণরাজ রাষ্ট্রকূটবংশের অধিকার দৃঢ়ীভূত করেন, এবং দন্তিদুর্গের আরব্ধ কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন। তিনি শুভতুঙ্গ নামে রাজত্ব করেন। বরোদার তাম্রশাসন

* J. R. A. S. (III. 94) কর্ডে গ্রাম পুণা জিলার অন্তর্গত।—সাহিত্য-সম্পাদক।
† J. A. S. B. (VIII. 292) and J. A. (XII. 162)

অনুসারে কৃষ্ণরাজ এলাপুরে এক বৃহৎ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এলুরের (ইলোরার) পর্ব্বতগাত্রে এই মনোহর মন্দির 'কৈলাস' নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি রাহপ্প নামক রাজাকে জয় করিয়া, তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। বরোদার শাসনপত্রে দন্তিদুর্গের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কৃষ্ণ-রাজ হইতে রাষ্ট্রকূটবংশাবলীর আরম্ভ হইয়াছে। ইহা কৃষ্ণরাজের বংশধর ও প্রপৌত্র গুর্জরাটের রাষ্ট্রকূটনরপতি প্রথম কর্করাজের আদেশে, ৭৩৪ শকাব্দে (৮১২ খৃঃ) উৎকীর্ণ হয়। ইহাতে কৃষ্ণরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র দন্তিরাজের নাম উল্লিখিত না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় ত্র দৃঃ

কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ পৈতৃক সিংহা-সনে উপবিষ্ট হন। অল্পকাল পরেই কয়েক বৎসরের মধ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুবরাজ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। ধ্রুবরাজ নিরুপম, ধারাবর্ষ ও কলিবল্লভ নামে বিভিন্ন শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। ধ্রুবরাজ কাঞ্চীর পল্লবরাজকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার নিকট বিবিধ ও বহুমূল্য হস্তী করস্বরূপ গ্রহণ করেন। চেরদেশীয় গঙ্গাবংশীয় রাজা তাঁহার পদানত হইয়া কারারুদ্ধ হন। তিনি কৌশাম্বীর নরপতি বৎসরাজকে পরাজিত করেন। গৌড়দেশ-বিজয়ের পর বৎসরাজ গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৌড়বিজয়ের দ্বারা যে দুইটি রাজছত্র বৎসরাজের হস্তগত হয়, বিজয়ী ধ্রুবরাজ তাহা গ্রহণ করেন। বৎস-রাজ মাড়োয়ারের দুর্গম মরুভূমির অভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। কৌশাম্বী বর্ত্তমান কালে কোশম নামে পরিচিত ও আলাহাবাদের সন্নিধানে অবস্থিত। অনুমান ৭৭০—৭৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত এই বৎসরাজ কনোজে রাজত্ব করেন। কৌশাম্বী ও বারাণসী সেই সময়ে কনোজের পদানত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। খারেপাটনের তাম্রশাসনে ধ্রুবরাজ 'নিরুপম' নামে পরিচিত হইয়াছেন। নিরুপম ধ্রুবরাজের রাজত্বকালে পট্টদকলে এক প্রস্তর- লিপি * খোদিত হয়। তাহাতে তিনি ধারাবর্ষ ও কলিবল্লভ নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

ধ্রুবরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোবিন্দরাজ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্য সবিশেষ প্রসারিত হয়। তাঁহার আদেশে ৭২৯ শকাব্দে (৮০৭ খৃঃ) বর্ণীডিণ্ডোরীর ও ৭৩০ শকাব্দে (৮০৮ খৃঃ) রাধনপুরের শাসনলিপি উৎকীর্ণ হয়। † এই দুই শাসনপত্র

¶ I. A. (XI. 125)
† J. R. A. S. (V.) and Indian Antiquery (VI. 65)

ময়ূরখণ্ডী হইতে প্রচারিত হয়। ইহা হইতে বোধ হয় যে, ময়ূরখণ্ডী তাঁহার রাজধানী ছিল। মোরখণ্ডের পার্ব্বত্য দুর্গ এখন নাসিক জিলায় অবস্থিত। এই দুই শাসনপত্রে ধ্রুবরাজের পূর্ব্বোক্ত অবদানপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। ধ্রুবরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিতীয় গোবিন্দরাজের নাম ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই। ধ্রুবরাজ উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভারসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, যুবরাজ তাহাতে অসম্মত হন। তিনি জগত্তুঙ্গ, জগৎরুদ্র, প্রভূতবর্ষ, পৃথ্বীবল্লভ ও শ্রীবল্লভ নামে বিভিন্ন শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর চেরদেশীয় গাঙ্গেয় রাজাকে কারামুক্ত করেন। কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে উক্ত চেররাজ গোবিন্দরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া, পুনরায় পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন। রাজপদপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে, মহারাজ গোবিন্দের বিরুদ্ধে দ্বাদশ জন নরপতি সম্মিলিত হইয়া রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। গোবিন্দ একাকী তাহাদের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও তাহাদের একতা ভঙ্গ করেন। গুজরাটের নরপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে সাহসী না হইয়া পলায়ন করেন। মাহী ও তাপ্তি নদীর মধ্যবর্ত্তী লাটদেশের শাসনকার্য্যে গোবিন্দরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে নিযুক্ত করেন। এই ইন্দ্ররাজের দ্বারা রাষ্ট্রকূটবংশের এক শাখা গুজরাটে প্রতিষ্ঠিত হয়। লাটদেশের অধীশ্বর এই ইন্দ্ররাজের পুত্র কর্করাজ ও গোবিন্দরাজের প্রদত্ত দুইখানি তাম্রশাসন বরোদা ও কাবী নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরোদার শাসনপত্র ৭৩৪ শকাব্দে (৮১২ খৃঃ) কর্করাজের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। কাবীর শাসনলিপি কর্করাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দরাজের আদেশে ৭৪৯ শকাব্দে (৮২৭ খ্রীঃ) খোদিত হয়।*

গুজরাট অধিকারের পর, তৃতীয় গোবিন্দরাজ মালবের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। মালবরাজ বিনা যুদ্ধে তাঁহার পদানত হন। অনন্তর তিনি সসৈন্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজা মারাশর্ব্ব বিনাযুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। শ্রীভবনে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া, তিনি তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক কাঞ্চীর দন্তিগ নামক পল্লব-রাজকে পদানত করেন। চালুক্যবংশীয় বেঙ্গীরাজ কাঞ্চী নগরে আগমন পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করেন। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বেঙ্গীদেশে এইরূপে বিনা রক্তপাতে গোবিন্দরাদের আধিপত্য প্রসারিত হয়। এই

* J. A. S. Bengal VIII. 296; and I. A. V. 147.

দিগ্বিজয়ের পর উত্তরে মালব, দক্ষিণে কাঞ্চীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে গোবিন্দরাজের অধিকার বিস্তারিত হয়। নর্ম্মদা হইতে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে তুঙ্গভদ্রার তীরে অবস্থিতিকালে, গোবিন্দরাজ শিবধারীকে রামেশ্বর নামক পবিত্র স্থানে কিছু ভূমি প্রদান করেন। ৭২৬ শকাব্দে (৮০৪ খৃঃ) ইহার দানপত্র উৎকীর্ণ হয়। * তৃতীয় গোবিন্দরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি শর্ব্বদেব নামে পরিচিত ছিলেন। † মান্যখেট তাঁহার রাজধানী ছিল; কর্ডার শাসনপত্র দৃষ্টে এরূপ বোধ হয়। মান্যখেট এক্ষণে মালখেড় নামে পরিচিত ও নিজামরাজ্যে অবস্থিত। শর্ব্ব চালুক্যবংশীয় বেঙ্গীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। শিলাহারবংশীয় পুল্লশক্তি এই অমোঘবর্ষের অধীনে কঙ্কণের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ৭৭৫ শকাব্দের (৮৫৩ খৃঃ) খোদিত পুল্লশক্তির নামাঙ্কিত এক শিলালিপি কাহ্নেরির গিরিগহ্বরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তত্রত্য দুইখানি শিলালিপি পুল্লশক্তির পুত্র কপর্দ্দীর আদেশে ৭৯৯ শকাব্দে (৮৭৭ খৃঃ) অমোঘবর্ষের রাজত্বকালের ৬৩ তম বর্ষে উৎকীর্ণ হয়। ‡ জৈনাচার্য্য গুণভদ্র সূরি জিনসেন সূরির শিষ্য ছিলেন। গুণভদ্র 'মহাপুরাণ' নামক জৈন পুরাণের শেষভাগে অমোঘবর্ষকে § জিনসেনের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

* J. A. Xi. 126.

† J. A. Xii. 183.

‡ J. A. Xiii. 133 And J. Bombay R. A. S. (Vl. Xiii. 11.).

§ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন, "এই নৃপতির অপর নাম নৃপতুঙ্গ। বীরাচার্য্যকৃত "সারসংগ্রহ" নামক গণিতবিষয়ক জৈনগ্রন্থে নৃপতুঙ্গ অমোঘবর্ষকে জৈনদিগের "স্যাদ্‌বাদ" নামক পন্থের অনুযায়ী বলা হইয়াছে। এই নরপতি বৃদ্ধবয়সে রত্নমালিকা নামে এক গ্রন্থরচনা করেন, দিগম্বর জৈনদিগের গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।

বিবেকাত্যক্ত-রাজ্যেন রাজ্ঞেয়ং রত্নমালিকা।
রচিতামোঘবর্ষেণ সুধিয়াং সদলঙ্কৃতিঃ।

দ্বিতীয় ভাষাতে এই রত্নমালিকার অনুবাদ হইয়াছে।—"সাহিত্য"-সম্পাদক।

"যস্য প্রাংশুনখাংশু-জালবিসরদ্ধারান্তরাবির্ভবৎপাদাম্ভোজরজঃপিশঙ্গমুকুটপ্রত্যগ্ররত্নদ্যুতিঃ।
সংস্মর্ত্তা স্বমমোঘবর্ষনৃপতিঃ পূতোঽহমদ্যেত্যলং স শ্রীমান্ জিনসেনপুণ্যভগবৎপাদো জগন্মঙ্গলং॥

এই পুরাণের পূর্ব্বভাগ জিনসেনের দ্বারা ও অবশিষ্টাংশ গুণভদ্র দ্বারা রচিত হয়। ৮২০ শকাব্দে (৮৯৮ খৃঃ) এই গ্রন্থ অকালবর্ষের রাজত্বকালে সমাপ্ত হয়। মহাপুরাণ,—

অকালবর্ষভূপালে পালয়ত্যখিলাং মহীং।
তস্মিন্ বিধ্বস্তনিঃশেষদ্বিষি ধর্ম্মযশোজুষি॥
* * * * *
শকনৃপকালাভ্যন্তরবিংশত্যধিকাষ্টশতমিতাব্দান্তে।
মঙ্গলমহার্থকারিণি পিঙ্গলনামনি সমস্তজনসুখদে॥"

এই অকালবর্ষ অমোঘবর্ষের পর পৈতৃক পদে অধিষ্ঠিত হন।

খারেপাটনের শাসনপত্রে যিনি অকালবর্ষ নামে পরিচিত, তিনি কর্ডার তাম্রশাসনে কৃষ্ণরাজ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ ককলের তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে অকালবর্ষ কৃষ্ণরাজের জগত্তুঙ্গ বা জগৎরুদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। এই দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজের অধীন সামন্তরাজ পৃথ্বীরাম সোনদত্তি নামক স্থানে এক জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ৭৯৭ শকাব্দে (৮৭৫ খৃঃ) এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ধারবাড় জিলার অন্তর্গত মুলগুন্দ নামক স্থানে এই কৃষ্ণবল্লভের রাজত্বকালে ৮২৪ শকাব্দে (৯০২ খৃঃ) আর একটি জৈনমন্দির নির্ম্মিত হয়। চিকার্য্য নামে জৈন বণিক কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। * কৃষ্ণরাজের নামাঙ্কিত তিনখানি তাম্রশাসন গুজরাটের অন্তর্গত কাপড্‌বনজ নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ৮৩২ শকাব্দে (৯১০ খৃঃ) বৈশাখী পূর্ণিমায় কুলপুত্রক অম্মৈয়ক দ্বারা উৎকীর্ণ হয়। কৃষ্ণরাজের অধীন হর্ষপুরের মহাসামন্ত প্রচণ্ডের ভ্রাতা অক্কুব ও তাঁহার দণ্ডনায়ক চন্দ্রগুপ্তের নাম এই দানপত্রের শেষভাগে লিখিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ (অকালবর্ষ) ব্যাঘ্রাস নামে গ্রাম ব্রহ্মভট্ট নামক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। হর্ষপুর প্রদেশে ৭৫০খানি গ্রাম মহাসামন্ত প্রচণ্ডের শাসনাধীন ছিল। রাষ্ট্রকূট নরপতি কৃষ্ণরাজ বৈষ্ণব ছিলেন। এই শাসনপত্রে গরুড়ের মূর্ত্তি দৃষ্টে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষেরা শৈব ছিলেন। কৃষ্ণরাজ, ধ্রুবরাজ, গোবিন্দরাজ ও

* J. Bombay R. A. S. (X. 192, 200) and Epigrafia Indica (I. 52)

গুরাজ অকালবর্ষ কৃষ্ণরাজের উত্তরোত্তর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জগত্তুঙ্গ পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় মাতুল চেদিরাজ শঙ্করগণের কুমারী লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। কর্ডার শাসনপত্রের শঙ্করগণ সাঙ্গলীর দানপত্রে রণবিগ্রহ নামে পরিচিত হইয়াছেন। হৈহয়বংশীয়া এই রাজকুমারীর গর্ভে দ্বিতীয় জগত্তুঙ্গের পুত্র তৃতীয় ইন্দ্ররাজ জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্ররাজ হৈহয়বংশীয়া রাজকুমারী অম্বার পাণিগ্রহণ করেন। চেদিরাজ কোকলের জ্যেষ্ঠপুত্র অর্জ্জুনদেব। শঙ্করগণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই অর্জ্জুনদেবের পুত্র অঙ্কনদেব। ইন্দ্ররাজের পত্নী অম্বা এই অঙ্কনদেবের দুহিতা ছিলেন। রাজমহিষী অম্বার গর্ভে ইন্দ্ররাজের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম অমোঘবর্ষ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গোবিন্দ।

ইন্দ্ররাজের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অমোঘবর্ষ পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, চতুর্থ গোবিন্দরাজ এক বৎসর কাল পরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। গোবিন্দরাজ সাহসাঙ্ক ও সুবর্ণবর্ষ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অতি দানশীল ছিলেন। তিনি বহুতর শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মান্যখেটে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মান্যখেট হইতে ৮৫৫ শকাব্দে (৯৩৩ খ্রীঃ) সাঙ্গলীর দানপত্র প্রকাশিত হয়।* সাঙ্গলীর তাম্রশাসনে গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমোঘবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

চতুর্থ গোবিন্দরাজের পর তাঁহার পিতৃব্য বদ্দিগ তৃতীয় অমোঘবর্ষ নাম-ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বদ্দিগ জগত্তুঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র ও ইন্দ্ররাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তৃতীয় অমোঘবর্ষের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় কৃষ্ণরাজ রাজপদ লাভ করেন। এই কৃষ্ণরাজের নামাঙ্কিত এক শাসনপত্র সালোট্‌গি নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ৮৬৭ শকাব্দে (৯৪৫ খ্রীঃ) মান্যখেট হইতে কৃষ্ণরাজের আদেশে প্রচারিত হয়।† এই কৃষ্ণরাজের নামান্তর কহ্নরদেব। তক্কোল নামক স্থানে চোল নরপতি রাজাদিত্য এই কৃষ্ণরাজের সহিত সমরে পরাজিত ও নিহত হন। গাঙ্গ-বংশীয় পরমান্দীবুটুগ গঙ্গবাড়ী দেশের রাজা রাজমল্লকে সমরে নিহত করিয়া তৃতীয় কৃষ্ণরাজ কর্ত্তৃক বনবাসী প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। বনবাসী

* I. bombay R. A. S. IV. III.
† I. A. I. 205.

এক্ষণে উত্তর কানাড়া জিলায় অবস্থিত। এই পরমান্দীবুটুগ আটুকুর গ্রামে কিছু ভূমি চল্লেশ্বর শিবের পূজার্চ্চনানির্ব্বাহার্থ ৮৭২ শকাব্দে (৯৫০ খ্রীঃ) প্রদান করেন। আট্‌কুর মহীশূর প্রদেশে অবস্থিত, এবং আটগড় নামে এক্ষণে পরিচিত।* ইহাতে কৃষ্ণরাজ অমোঘবর্ষের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণরাজের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খোটিকদেব রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি অমোঘবর্ষের পত্নী কন্দকদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কন্দক-দেবী চেদিরাজ যুবরাজদেবের তনয়া। খোটিকদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কলদেব রাজাসনে আসীন হন। তাঁহার পিতার নাম নিরুপম। কক্কলদেব রাষ্ট্রকূটবংশের শেষ নরপতি। ৮৯৪ শকাব্দে (৯৭২ খ্রীঃ) কর্ডার শাসনপত্র এই কক্কলদেবের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩ খ্রীঃ) এই কক্কলদেবকে সমরে পরাজিত করিয়া, তৈলপরাজ চালুক্যবংশের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাষ্ট্রকূটনরপতিগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহারা যদুবংশীয় বলিয়া খারেপাটনের শাসনপত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। রাষ্ট্রকূট-নরপতিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন চালুক্যবংশীয় ভূপালদিগের ন্যায় আপনাদিগকে 'পৃথ্বীবল্লভ' ও 'বল্লভ-নরেন্দ্র' নামে পরিচিত করিয়াছেন। লক্ষ্মেশ্বরের শাসনপত্রে তৃতীয়† গোবিন্দরাজ 'শ্রীবল্লভ' ও রাধনপুরের শাসনপত্রে 'বল্লভনরেন্দ্র' নামে পরিচিত হইয়াছেন। সাঙ্গলীর শাসনপত্রে চতুর্থ গোবিন্দ ও কর্ডার শাসনপত্রে কক্কল-দেব 'বল্লভনরেন্দ্র' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বল্লভনরেন্দ্র ও বল্লভরাজ পদ একার্থ-প্রতিপাদক। 'বল্লভরাজ' পদ প্রাকৃতে 'বল্লভরায়', 'বল্লহরায়' ও 'বল্লরায়' শব্দে কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। মান্যখেট রাষ্ট্রকূট-নরপতিদিগের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আরব ভৌগোলিক-গণ মানকিরের 'বলহরা' নামে রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরাক্রান্ত নরপতিগণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হলায়ুধ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বরচিত "কবিরহস্য" নামক কাব্যে রাষ্ট্রকূট-বংশ তৃতীয় কৃষ্ণরাজের অবদানাবলী বর্ণনা করিয়াছেন।

* Epigrafiea Indica II. 167.

† এই গ্রাম ধারবাড় জিলায় মিরজ নগরের সন্নিহিত। "সাহিত্য"-সম্পাদক

অস্ত্যগস্ত্যমুনিজ্যোৎস্নাপবিত্রে দক্ষিণাপথে।
কৃষ্ণরাজ ইতি খ্যাতো রাজা সাম্রাজ্যদীক্ষিতঃ॥
সোমং সুনোতি যজ্ঞেষু সোমবংশবিভূষণঃ।
তোলয়ত্যতুলং শক্ত্যা যো ভারং ভুবনেশ্বরঃ।
কস্তং তুলয়তি স্থাম্না রাষ্ট্রকূটকুলোদ্ভবং॥—কবিরহস্য।

এই কৃষ্ণরাজকে বিজয়নগরের অধীশ্বর কৃষ্ণরায় বলিয়া ডাক্তার ওয়েষ্টারগার্ড ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূটনরপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে সমাপ্ত করা গেল। ভবিষ্যতে গুজরাটের রাষ্ট্রকূটবংশের বিষয় সংক্ষেপে সংগৃহীত করিয়া, পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

থ্যাকারে।

থ্যাকারের কন্যা শ্রীমতী রিচি পিতার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তদুপলক্ষে নানা পত্রে সেই চিরমধুময় ঔপন্যাসিক ও পরিহাসরসিকের সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। বোধ হয়, এ সময়ে সেই সকল প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া থ্যাকারের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

থ্যাকারের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে ডিকেন্সই তাঁহার প্রধান ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথমে পাঠকসমাজে ডিকেন্সেরই আদর অধিক ছিল। এখন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় থ্যাকারের আদর বাড়িতেছে। এখন ডিকেন্সের যশের ভরা গাঙ্গে ভাঁটা পড়িয়াছে; আর থ্যাকারের যশের মরা গাঙ্গে পুরা জোয়ার প্রবেশ করিয়াছে।

ডিকেন্স ও থ্যাকারে।

থ্যাকারের ইচ্ছাক্রমে আজিও তাঁহার কোনও পুরা জীবনচরিত রচিত হয় নাই। অপরের বিষয় লিখিবার সময় তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; কিন্তু কেহ তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবে ভাবিলে, তিনি ভীত হইতেন। মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতা!

জীবনচরিতের আতঙ্ক।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই কলিকাতা সহরে থ্যাকারের জন্ম হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে থ্যাকারে বংশ এ দেশে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। ঔপন্যাসিকের পিতামহ ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে আসেন। সার উইলিয়ম হণ্টার বলেন যে, তিনি পুরাতন কাগজপত্রে তাঁহার চারি পুত্রের ও অন্ততঃ চতুর্দ্দশ পৌত্রের ও দৌহিত্রের উল্লেখ দেখিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে,

বংশবৃত্তান্ত।

পিতামহ থ্যাকারের পাঁচ পুত্র; তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়া নেপালযুদ্ধে নিহত হয়েন। আর সকলেই সিভিল বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। পুরাতন দপ্তর-

খানা সন্ধান করিলে, দক্ষিণ-পশ্চিম মালাবার উপকূল হইতে উত্তর-পূর্ব্ব শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই থ্যাকারে-বংশীয়দিগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাঁচ বৎসর বয়সে থ্যাকারে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়েন। এত অল্প বয়সে জননীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, তাঁহার উপর তদীয় জননীর প্রভাবের হ্রাস হয় নাই; হণ্টার বলেন,—"Divided by half the world he clung to her memory." যদিও থ্যাকারে আর এ দেশে আসেন নাই, তথাপি তাঁহার বহু গ্রন্থ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্রে পূর্ণ। কিপলিং ব্যতীত আর কোন ইংরাজ লেখকের পুস্তকে এত অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র লক্ষিত হয় না। সেড্‌লী, কর্ণেল নিউকাম, মেকেঞ্জী প্রভৃতি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র, থ্যাকারের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের আদর্শে চিত্রিত। তখন ইংলণ্ডে একটা উপকথা প্রচলিত ছিল যে, ভারতবর্ষে প্যাগোডা নামক একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহা নাড়িলেই মোহর পড়ে; একবার ডাল নাড়িয়া তার পর কুড়াইয়া লইলেই হইল। ভারতপ্রত্যাগত "নবাব" নামে আখ্যাত ইংরাজদিগের ঐশ্বর্য্যাতিশয্য হইতেই এই উপকথার উৎপত্তি। কথাটা সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা সত্য; ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষ তখন "লুটের বিলেত" ছিল; সাধু অসাধু বিবিধ উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিয়া দেশে গিয়া "নবাব" সাজাই তখন ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময়ের অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চরিত্র থ্যাকারের বর্ণনায় যেমন ফুটিয়াছে, কোন ঐতিহাসিকের রচনায় তেমন ফুটে নাই। তাঁহার রচিত O'Dowd পত্নী, ব্র্যাণ্ডিপানিপাণ্ডী Sedley, রমণলাল প্রভৃতি চিত্র অমর। শুনিতে পাই, রমণলাল চরিত্রের আদর্শ জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, কর্ণেল নিউকাম চরিত্রের আদর্শ তাঁহার জননীর দ্বিতীয় স্বামী মেজর কারমাইকেল স্মিথ। Union Bank of Calcutta দেউলিয়া হওয়ায় থ্যাকারে পরিবারের অনেকেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন; থ্যাকারের পৈতৃক অর্থ যাহা কিছু ছিল, তাহাও যায়। থ্যাকারের পুরাতন এই ব্যাঙ্কই বুন্দেলখণ্ড ব্যাঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রভাব।

রচনার বিষয়।

কিছু দিন স্কুলে অধ্যয়নের পর থ্যাকারে কেম্ব্রিজে গিয়া ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহার ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধিলাভ ঘটে নাই। কলেজ ছাড়িয়া তিনি কিছু দিন আইন অধ্যয়ন করেন, এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বলা বাহুল্য, আইন-ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগে নাই। তিনি চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য প্যারিসে ও ওয়েমারে গমন করেন। এই সময় তাঁহার মনে সংবাদপত্রসেবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে "ফ্রেজারস্ ম্যাগাজিন্" পত্রে তাঁহার প্রথম পুস্তক Yellow Plush Correspnodence প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উহা পুস্তকাকারে প্রথমে আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে বার্ষিক পাঁচ শত পাউণ্ড আয় ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই ঘটনা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইলেও, সাহিত্যজগতের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যস্বরূপ পরিগণিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, থ্যাকারে যেরূপ অলসপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহাতে উদরান্নের জন্য সাহিত্যসেবা করিতে না হইলে, তিনি বোধ হয়, কখনও সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বাবধিই সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগ ছিল, এখন কষ্টে পড়িয়া তিনি সাহিত্যই অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিলেন।

জীবনবৃত্ত ও সাহিত্যসেবা।

"টাইম্‌স্" পত্রে থ্যাকারের হাতেখড়ি; কিন্তু "পঞ্চই" চিরদিন তাঁহার প্রিয় পত্র। পঞ্চেই তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ থ্যাকারের জীবনের প্রধান স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরই মাসিক খণ্ডের আকারে Vanity Fair আরম্ভ হয়। ভ্যানিটি ফেয়ার প্রকাশিত হইবার পরই থ্যাকারের যশ প্রায় ডিকেন্সের যশের সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পর ক্রমে দুই দুই বৎসর অন্তর Pendennis, Esmond, The Newcomes প্রকাশিত হয়। Esomond একেবারে সম্পূর্ণ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর দুইখানি মাসিকপত্রে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি কিছু দিন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বক্তৃতা করেন; অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ পরিহাসরসিকদিগের সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাও—The Four Georges কখনও অনাদৃত হইবে না। যে দেশে ভাল পুস্তকও অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিতে হয়, সে দেশের লোককে কেমন করিয়া বুঝাইব যে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়াও উপযুক্ত লোকের যথেষ্ট অর্থাগম হয়?

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যসেবা পরিহার করিয়া তিনি উদারনৈতিক দলের অক্সাইডের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করেন। অকৃতকার্য্য হইয়া পুনশ্চ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া The Virinians প্রকাশ করেন। প্রায় ২৩ বৎসর সম্পাদনের পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি Cornhill Magazine পত্রের ভার পরিত্যাগ করেন। থ্যাকারের প্রথম কবিতা পাওয়া গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম,—

রাজনীতি, সাহিত্য ও সংবাদপত্র।

মটন চপের মতন প্রণয়
ত্বরিতে শীতল হন;
সব আকর্ষণ হয় ব্যথাময়
না হতেই পুরাতন।
ফিক্ বেদনার মতন প্রণয়,
তারে সহা, হায়, সহজ ত নয়!
ব্র্যাণ্ডি-ব্যবহারে দু'ব্যথাই সারে—
এমন করি শ্রবণ।

যবে কোন কৃষী রমণীর তরে
প্রেমানলে মরে জ্বলে,
বাঁধিতে তখন চাহে সে তাহারে
পরিণয়-সুশৃঙ্খলে;
সুবিধা পেলেই গাঁটছাড়াটা করে
হায়, হতভাগ্য লম্বা, যাইয়া পড়ে
কটাহ ছাড়িয়া [illegible] নিতে যাইয়া
উনানে দীপ্ত অনলে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে থ্যাকারের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ থ্যাকারেকে হৃদয়হীন Cynic বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর বহু দিবস পরে ডিস্রেলী স্বীয় St. Barbe পুস্তকে বলিয়াছেন, থ্যাকারে Pushing, ভগ্নহৃদয় ও নীচমনা ছিলেন। এ বর্ণনা সেই নীচমনা ইহুদীরই উপযুক্ত; তিনি বোধ করি, সকলকেই আপনার মত ভাবিতেন। তাঁহার নীচতার বিবরণ প্রদানের স্থান আমাদের নাই; যাঁহারা সে বিবরণ দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ওকনরের ডিস্রেলী-চরিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। থ্যাকারে যত দিন করনহিল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন, ততদিন দুঃখী ও অক্ষম লেখকদিগের রচনা পত্রস্থ করিতে না পারিলেও আপনি তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতেন। ইহাই কি হৃদয়হীনের নীচতা?

চরিত্র-বিচার।

কেহ কেহ বলেন, থ্যাকারের গ্রন্থাবলী স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী নহে। যদি মানবচরিত্রের নিখুঁত খাঁটি বর্ণনা স্ত্রীলোকের পাঠ্য না হয়, তবেই থ্যাকারের গ্রন্থাবলী স্ত্রীলোকের পাঠের অনুপযোগী;—নহিলে নহে।

থ্যাকারের সর্ব্বপ্রধান উপন্যাস—Vanity Fair, আর সেই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান চরিত্র—বেকি সার্প। থ্যাকারের তুলিকায় সে চিত্র যেমন ফুটিয়াছে, কোনও ঔপন্যাসিকের তুলি-

ক্ষায় কোনও চরিত্র তেমন ফুটিয়াছে কি না সন্দেহ। সমালোচক ফ্রেডরিক হ্যারিসন বলেন যে, বেকি সার্প চরিত্র যদি ফল্‌ষ্টাফ ও সাইলক চরিত্রের মত না হয়, তথাপি স্কোয়ার ওয়েষ্টন্, টোবী ও স্যাম্ ওয়ানার চরিত্র অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। উপন্যাসজগতে কোনও চরিত্রেরই বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে চিত্রিত হয় নাই। বেকি সার্পের বুদ্ধির প্রাখর্য্য, রসিকতা, স্বার্থপরতা, অসীম সাহস, ধূর্ত্ততা, স্থির ও কর্ম্মশীল মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, যেখানে তাহার স্বার্থে আঘাত না লাগে, সেখানে তাহার সুবিচারপ্রিয়তা ও যেখানে কোনও ক্ষতি নাই, সেখানে তাহার সততা, অতুলনীয় ও অনুকরণের অতীত।

বেকি সার্প।

Esmond ও The Newcomesএর গ্রন্থকার কখনই Misanthrope হইতে পারেন না। ইংরাজ পরিহাসরসিকদিগের সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় তিনি সদাই সরল ও সদানন্দ। থ্যাকারের ন্যায় বন্ধুবৎসল লোক কখনই cynic ও misanthrope হইতে পারে না। আর থ্যাকারের কুৎসাকারীরা বিস্মৃতির কোন অতল তলে চিরান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর থ্যাকারের যশঃসূর্য্য সাহিত্যগগনে পূর্ণমহিমায় বিরাজ করিতেছে!

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

তিব্বত।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে Abbe Huc. চীন ও তিব্বতের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কাপ্তেন ওয়েল্‌বি ও তাঁহার সহযাত্রী লেফ্‌টেনাণ্ট মাল্‌কম্ "অজ্ঞাত" তিব্বতের মধ্য দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৮০ মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া [illegible]। তাঁহাদের এই সঙ্কটসঙ্কুল কষ্টসাধ্য ভ্রমণ ষ্যানসেনের মেরুভ্রমণের সহিত তুলিত হ [illegible] পারে। সচরাচর ভ্রমণকারীরা আপনাদের ঈপ্সিতসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; কি [illegible] এই দুই জন সর্ব্বতোভাবে সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সঙ্কল্প ছিল যে, মধ্য এসিয়া উপত্যকাভূমির পশ্চিম প্রান্ত হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া আধুনিক মানচিত্রে 'অজ্ঞাত'-চিহ্নিত দেশে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিয়া, সৈন্যের পার হইয়া, হোয়াংহো নদী বাহিয়া, চীনের বিখ্যাত প্রাচীর পার হইয়া, "স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের" রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন। শীত ও গ্রীষ্মের আতিশয্য, অনাহার ও পানীয়শূন্য মানববসতিবিরল পথের সহস্র বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, ইংরাজ সৈন্যের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা ও প্রফুল্লতা সহকারে ইঁহারা অভিলষিতলাভে সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহারা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে, লে নগর হইতে কাশ্মীরের মধ্য দিয়া যাত্রা করেন, এবং ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে পিকিনে উপস্থিত হয়েন।

তাঁহারা ভারবহনের জন্য বাইশটি কষ্টসহ অশ্বতর ও আরোহণের জন্য সতেরটি পোনি ঘোড়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। পরিচর্য্যা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য নয় জন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওয়েল্‌বি ও মাল্‌কাম্ ব্যতীত বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেণ্টের "ননকমিশণ্ড অফিসার" সাজাদমীর ভ্রমণকারীদিগের দলে ছিলেন। এই সুদীর্ঘ বিপদবহুল পথে তিনি ইঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিলেন। অশ্বতরচালকেরা প্রথম হইতেই অবিশ্বাসী ও অবাধ্য হইয়াছিল। অনুচরবর্গের মধ্যে লাগো ও ইসা জারেঙ্গ (যাহাকে সংক্ষেপতঃ ইসু বলিয়া ডাকা হইত) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ছিল। তাহারা যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি-

প্রণোদিত হইয়া এরূপ হইয়াছিল, তাহা নহে—যাত্রার প্রথম হইতেই দলের অন্যান্য পরিচারকদিগের সহিত তাহাদের মতান্তর হওয়াতেই তাহারা বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়।

লে হইতে যাত্রা করিয়া ভ্রমণকারীরা প্রথমে উত্তর তিব্বতের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে গমন করিয়াছিলেন; পরে চীনদেশের প্রান্তসীমায় পঁহুছিয়া উত্তরপূর্ব্ব দিকে চলিতে আরম্ভ করেন। ভ্রমণের প্রথম দুই মাস তাঁহারা শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্যবশতঃ কোন কষ্ট পান নাই। নাতিশীতোষ্ণ দেশে এই সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর তাঁহাদিগকে প্রচণ্ড শীত ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভ্রমণের এই অংশের বর্ণনা এইরূপ;—"পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে আমাদিগের পরিহিত বসন স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিত; সূর্য্যের উত্তাপ অসহনীয়। অবশেষে আমরা জামা খুলিয়া অনাবৃতগাত্রে চলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। একটু বাতাস পাইব, এই আশায় বহুক্ষণ ধরিয়া পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া থাকিতাম। চারি দিকে স্তূপাকার বরফ, কিন্তু তাহাতে আমাদিগের পিপাসাশান্তির বড় সুবিধা হইত না। আমাদিগের পথ বড় কষ্টকর। অনেক সময়ে ঠিক সরলভাবে পর্ব্বতগাত্রে উঠিতে হইত। এই স্থানের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৭০০০ ফিট। দলের সকলের জন্য অপেক্ষা করিয়া আমরা পর্ব্বতের অপর দিকে নামিতে আরম্ভ করিলাম। সহসা অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে উপস্থিত হইলাম। তুষারবৃষ্টি হইতে লাগিল। শীতল বাতাসে আমাদের বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে পর্ব্বতগাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সেখানে এত অধিক শীত বোধ হইতে লাগিল যে, তুষারবৃষ্টি সহ্য করিতে করিতে অগ্রসর হওয়াই ভাল বোধ করিলাম। *** তাম্বু ফেলিবার উপযোগী স্থান দেখিতে পাইয়া আর অগ্রসর হইলাম না। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। শীত আরও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু আমাদের অনুচরবর্গের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। তাহাদিগকে আমাদের অবস্থান-স্থান জানাইবার জন্য রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়িতে লাগিলাম। অবশেষে দূরে জনকলরব শুনিয়া বুঝিলাম, তাহারা আসিয়া পঁহুছিয়াছে। অশ্বতরগুলির মধ্যে কতকগুলি বেশ সুস্থ ও সবল ছিল, কিন্তু অন্যগুলি অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পথিমধ্যে ছয়টি অশ্বতর একেবারে চলিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন তাহাদিগকে ফেলিয়া অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।"

প্রথম প্রথম পর্ব্বতীয়েরা তাঁহাদের ভ্রমণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। সুশাল নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে সেই গ্রামের দলপতি বলিল, তাহারা পরবর্ত্তী গ্রাম "পাল"এ যাইবার রাস্তা জানে না; এমন কি, সে গ্রামের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। অনেক বাদানুবাদের পর বলিল, সে পথ একবারে অগম্য। পরে এক দল সশস্ত্র লোক আসিয়া পথপ্রদর্শক ইয়ুকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল ও ভ্রমণকারীদিগকে বলিয়া পাঠাইল যে, অগ্রসর হইলেই বিপদ ঘটিবে। এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহাদিগকে একটি বাঁক ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ত্রেব হ্রদের নিকট তাঁহাদিগের গমনে বাধা দিবার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক লোক জমা হইতে লাগিল। তাহাদের প্রধান অস্ত্র পুরাতন প্রথার নির্ম্মিত বন্দুক। কিন্তু সেগুলি একটি দণ্ডের উপর রাখিয়া তাহারা অব্যর্থসন্ধানে গুলি ছুড়িতে পারে। তাহারা শ্বেতকায়দিগের অগ্রগতিতে বাধা দিবার জন্য দেহপাত পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল। কাপ্তেন ওয়েলবির অশ্বতরচালকেরা এই সময়ে ভীরুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। যদিও তাহাদিগকে গুলি ও বারুদ দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সহজেই পরাভূত হইল। বাধাপ্রদানকারীরাও মরিয়া হইয়াছিল। তাহাদের

বীরত্বের ও সাহসের দৃষ্টান্তস্বরূপ কাপ্তেন ওয়েল্‌বি লিখিয়াছেন ;—"কয়েক হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া একটি লোকের বক্ষের উপর গুলি-ভরা রিভল্‌বার ধরিলে সে আপনার জামা ছিঁড়িয়া অনাবৃত বক্ষ দেখাইয়া গুলি ছুড়িতে বলে। ইহাতে আমার বোধ হইয়াছিল, এরূপ দৃঢ় বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা কোনও ক্রমে ঈপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব না। এই সকল তিব্বতীয়দিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা না করিয়া অগ্রসর হইবার আর কোনও উপায় ছিল না ; কিন্তু মানবহননের জন্য আমরা তথায় উপস্থিত হই নাই, সুতরাং নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

এই প্রতিবন্ধকের জন্য ভ্রমণকারীরা পুনরায় নাপুলী পার হইয়া ত্রেব হ্রদের পূর্ব্বতীর বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে যাত্রা করিবার পর তাঁহারা আর কোনও বাধা পান নাই। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাবে তাঁহাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের যে মেষের দল ছিল,পথশ্রমে তাহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন কি, অনেকগুলি মরিয়া গেল। কিন্তু ভারবাহী জীবগুলির মৃত্যু হওয়াতেই তাঁহাদিগকে অত্যধিক কষ্ট পাইতে হয় ; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি তুষারপাতে মারা যায়। অবশেষে যখন তাঁহারা "ভারহারী" হ্রদের তীর উপস্থিত হইলেন, তখন সর্ব্বশুদ্ধ আটাইশটিমাত্র জীবিত ছিল। এই হ্রদের তীরে তাঁহাদিগকে অনেক বোঝা ফেলিয়া যাইতে হইয়াছিল বলিয়া হ্রদের উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। এত কষ্টেও একটি ছাগ জীবিত ছিল। ছাগটি ভ্রমণকারীদের বড় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, সেটিকে সঙ্গে লইয়া চীনদেশে উপস্থিত হইতে পারিবেন। কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্যরূপ—একদিন তাঁহাদের দুই জন পরিচারক একটি গুলি-পোরা বন্দুক লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল; এমন সময় সহসা গুলি বাহির হইয়া যায়। ঐ গুলিতে সল্লুনামক পরিচারকের মুখের নিম্নাংশ উড়িয়া যায়। তখন উক্ত ছাগটিকে মারিয়া তাহার মাংসের সূপ করিয়া এই হতভাগ্যের মুখে ঢালিয়া দিতে হয়। শীঘ্র তাহার মৃত্যু না হওয়ায়, অবশেষে তাহাকে একটি পোনির পৃষ্ঠে কোন রূপে বহন করিয়া ভ্রমণকারীরা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে সুস্বাদুজলপূর্ণ একটি নালার নিকট উপস্থিত হইলে, সল্লু ও অপর একজন পরিচারক কোনমতেই আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। নিকটেই লোকালয় আছে ভাবিয়া, ভ্রমণকারীরা তাহাদের নিকট কয় দিনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, লোকালয়ে পঁহুছিয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য লোক পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু লোকালয়ের কোনও চিহ্ন না পাইয়া, তাঁহারা স্থানে স্থানে অনুচরদ্বয়ের জন্য খাদ্যসামগ্রী রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তখন ভারবাহী জন্তুগণের মধ্যে পনেরটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এইগুলির মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সবল ও সুস্থকায় ছিল, সেটি শীতল জলে সাঁতার দিয়া মৃতপ্রায় হয়। ভ্রমণকারীরা আপনাদিগের জামা খুলিয়া তদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন। এইরূপে অনেক কষ্টে সেটি বাঁচিয়া উঠে।

এই সময়ে ভ্রমণকারীরা শিকার করিয়া প্রধানতঃ খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান করিতেন। এই প্রদেশের বন্য পলাণ্ডু অনেক সময় তাঁহাদের খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ করিত। শিকারলব্ধ জন্তুগণের মধ্যে য়্যাক, এণ্টিলোপ-জাতীয় হরিণ, বানর ও খরগোষ, মধ্যে মধ্যে দুই একটা ভালুকও মিলিত। বন্য য়্যাকের মাংস খাইতে মন্দ নহে। এণ্টিলোপ ও বানরের মাংসও তাঁহাদের অতি সুস্বাদু বোধ হইয়াছিল! লোকে বলে, বন্য য়্যাক আহত হইলে শিকারীকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও সে বিপদে পড়িতে হয় নাই। তাঁহারা য়্যাকের চর্ব্বির পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। সময় সময় তাহাই আহার করা হইত। প্রাণী সকল মহম্মদীয় প্রথায় জবাই করা হইত না বলিয়া অনেকে মাংসাহারে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতাপ্রযুক্ত এ আপত্তি অধিক দিন টিকে নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনুচরগণের মধ্যে অনেকে প্রথম হইতেই অবাধ্য ছিল। মহম্মদ রহিম নামক একজন অশ্বতর-চালককে পথ খুঁজিতে পাঠান হইয়াছিল। দুই দিন পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বালকের মত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ন্যায় দীর্ঘকায় বলবান লোককে এরূপ কাঁদিতে দেখিয়া হাস্যসংবরণ করা দুষ্কর হইয়াছিল। অবশেষে সে অনেক ফোঁপাইয়া বলিল, "আমি পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" গোলাম হোসেনের অধীনস্থ লোকেরা একদিন দল ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহারা দিন কয়েক ভ্রমণকারীদের কাছে কাছে ছিল, ভাবিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু পাছে তাহারা অবশিষ্ট অশ্বতরগুলি চুরি করে, এই ভয়ে ভ্রমণকারীরা আর তাহাদিগকে দলভুক্ত করেন নাই। ইতিপূর্ব্বেই অশ্বতর ও পোনির সংখ্যা একুনে পনেরটি মাত্র হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে বিষাক্ত গুল্ম খাইয়া তিনটি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি মরিয়া যায়। এই সময়ে ভারবাহী জন্তুর অভাবে ভ্রমণকারীরা বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এই সুদীর্ঘ পথের মধ্যে অন্য কোনও জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। শীত ও গ্রীষ্মের দুর্ব্বিষহ আতিশয্যবশতঃ এই সকল স্থানের ভূমি অনুর্ব্বর ও জনবসতি বিরল। পরে চীনদেশের প্রান্তসীমায় তিব্বতদেশীয় বণিকদলের সহিত ভ্রমণকারীদের সাক্ষাৎ হয়। লেখক বলিতেছেন, তাহাদের দলপতি দেখিতে অতি সুন্দর ও সুদীর্ঘকায়—উচ্চে প্রায় ছয় ফিটেরও অধিক। ইহা অপেক্ষা দীর্ঘকায় লোক আমরা এ দেশে দেখি নাই। দলের মধ্যে সে কুসক নামে পরিচিত। তাহার যথার্থ নাম জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। পূর্ব্বে বুদ্ধগণ জীবিতাবস্থায় এই নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু এখন ইহা কেবলমাত্র স্নেহ ও সম্মানের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

কুসকের দলে পণ্যদ্রব্যবাহিগণের পনের শত য়্যাক ছিল। ভ্রমণকারীরা কিছু দিন এই দলে গমন করিয়াছিলেন। কুসক ইহাদের আগমন শুনিয়াই বলিয়াছিল, ইহারা হয় ইংরাজজাতীয়, অথবা রুশীয় ; অন্য কোনও জাতীয় লোক এইরূপ কষ্টসাধ্য ভ্রমণে বাহির হয় না। কুসকের সহিত প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা এইরূপ ;—"তাহারা আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। পরে একজন ভৃত্য উষ্ণ-চা-পূর্ণ এক একটি পাত্র আমাদের প্রত্যেকের হাতে দিল। তাহাতে সে মাখনের এক একটি ছোট পিণ্ড ফেলিয়াছিল ও চূর্ণ-বার্লি-পূর্ণ একটি থলিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিল। আমরা প্রত্যেকে কয়েক চামচ চূর্ণ লইয়া চায়ে মিশ্রিত করিলাম ও তাহাতে আবশ্যকমত লবণ দিলাম। পরে সেই ভৃত্য আমাদের কিছু 'চপ্‌ষ্টিক' আনিয়া দিল। তখন আমরা সাগ্রহে আহার আরম্ভ করিলাম। সে দিন আমরা যে পরিমাণে আহার করিয়াছিলাম, সাধারণে বোধ হয় তাহা বিশ্বাস করিতে সম্মত হইবেন না। তাহারা পরে আমাদিগকে পণ্যদ্রব্যের স্তূপের উপর শয়ন করিতে দেয়। কিন্তু আমাদের তাহা প্রীতিকর না হওয়ায় রাত্রে উঠিয়া তাহাদের তাম্বুতে শয়ন করি। ইহাতে যদিও তাহারা বিরক্ত হইয়াছিল, তথাপি কিছু বলে নাই।"

তিব্বতীয় বণিকদের ব্যবহার মোটের উপর মন্দ নহে। তাহারা ভ্রমণকারীদিগের কোনও অনিষ্টচেষ্টা করে নাই। তাহারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি; মনোভাব গোপন রাখিতে বিশেষ চেষ্টিত। কিন্তু দয়ামমতাশূন্য নহে।

মঙ্গোলীয় যাযাবরদিগের নিকট ভ্রমণকারীরা ইহা অপেক্ষা সাদর আতিথ্য প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। ইহাদের সহিত সাক্ষাতের বিবরণ এইরূপ ;—"কয়েক দিন অনাহারে ভ্রমণের পর একটি ঘন ঝোপের অন্তরালে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় নাই। কতকগুলি ছোট বালক ও বালিকা চারণক্ষেত্র হইতে এক দল সুন্দর মেষ তাড়াইয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। তাহারা পর্য্যাণশূন্য ছোট ঘোড়ার উপর চড়িয়া যাইতেছিল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তাহারা কিছুই জানে না। মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল। আমি গোপনে এই সুখময় শান্তিপূর্ণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। একটা অসঙ্গত চীৎকারে ফিরিয়া সহসা আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা প্রথমে বড় ভীত হইয়াছিল। কিন্তু সে ভীতি শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল। যাযাবরেরা অত্যন্ত যত্ন ও আদরের সহিত অতিথিসৎকার করিয়াছিল। ইহারা ন্যায়পর, অতিথিবৎসল ও দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদিগের আচার ব্যবহার বেশ সাদাসিদা রকমের। ভ্রমণকারীদিগের অসম্ভব ক্ষুধা দেখিয়া তাহারা নীরবে হাস্য করিয়াছিল। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম ;—রন্ধনপাত্র হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। * * * গৃহস্বামী অগ্নিকুণ্ডের নিকটে একখানি কম্বল বিছাইয়া আমাদিগকে বসিতে দিলেন, এবং একটি পাত্রের ঢাকা খুলিয়া আমাকে এক খণ্ড সিদ্ধ ছাগমাংস দিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন আমাকে আর এক খণ্ড দেওয়া হইল। তাহাও অচিরে "ধ্বংসপুরে" প্রেরিত হইল। গৃহস্বামী আমাকে আরও খাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অতিশয় লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।"

এই মোগল জাতির বিবাহ ও সমাধিপ্রথা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী স্বামী এক জন বন্ধুকে দিয়া কন্যার পিতার নিকট একখণ্ড মস্‌লিন কাপড় পাঠাইয়া দেন। ইহাকে কারটাগ্ বলে। যদি কন্যার পিতা তাহা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে জানা যায় যে, বিবাহ হইবে। তখন বর শ্বশুরকে অর্থ, মদ্য প্রভৃতি উপহার দেয় ও অবিলম্বে বধূকে গৃহে আনয়ন করে। কোন মঙ্গোলীয়ের মৃত্যু হইলে, তাহার শব মুক্ত প্রান্তরে নীত হয় ও তাহার মুখের ভিতর এক খণ্ড কাপড় গুঁজিয়া দেওয়া হয়। পরে পক্ষী ও কুকুরেরা শবদেহের মাংস খাইয়া ফেলে। তখন মৃতের বন্ধুরা প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া অবশিষ্ট অস্থিগুলি চূর্ণ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দেয়। তিব্বতে তিন প্রকার সমাধিপ্রথা প্রচলিত। সাধারণতঃ শবদেহকে কোনও পাহাড়ের উপর আসনপীড়ি করিয়া বসাইয়া রাখা হয়। পরে তৎপার্শ্বস্থ গভীর গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। শবদেহ তথায় বিহগের ভক্ষ্য হইয়া থাকে।

উমা।

স্তব্ধ রাত্রি ; চারি দিক শব্দহীন ; সুদূর নির্জ্জন,
যোগিবর যোগেশের যোগমগ্ন হৃদয় যেমন।
বিগতবিরাবরব বিহগেরা পশেছে কুলায় ;
মুদিত কমল মাঝে শ্রান্তদেহ ভ্রমর ঘুমায় ;
সুষুপ্তিমুদিত আঁখি প্রাণিকুল ঘুমে অচেতন,
নিশীথনিদ্রায় করে দিবসের শ্রমনিবারণ ;

স্বপনসঙ্গীত সম আসে শুধু পত্র-মরমর,
উপলব্যথিতগতি নির্ঝরের কল গীতস্বর ;
দু'একটি পাখী ভাবি চন্দ্রকরে অরুণ-কিরণ
ঘুমঘোরে গীতস্বরে ঢালিতেছে আনন্দবেদন ;
গিরিমল্লিকার বাসে গন্ধশ্বাসী নৈশসমীরণ
প্রত্যগ্র কুসুমকুলে দোলাইয়া করে বিচরণ।
জ্যোছনা-প্লাবিত ঊর্দ্ধে শোভিতেছে অনন্ত অম্বর,
দিগন্তবিহীন যেন সীমাহীন ক্ষীরোদ সাগর,
পথহারা একখানি শীর্ণদেহ শ্বেত জলধর
আলসে বিরাম লভে দূর অদ্রিশিখরের পর ;
ধবল তুষাররাশি শশধর-কর-পরশনে
দেখাইছে জ্যোতির্ম্ময় সীমাহীন নিশীথগগনে।

মধুর কুসুমরাশি প্রকৃতির স্নেহ আবরণ
পর্ব্বতে সানুদেশ করিয়াছে স্নেহে আচ্ছাদন।
বিষাদমলিনমুখ, নতদৃষ্টি, মৃদুমন্দগতি,
হরপ্রেম-আকাঙ্ক্ষিণী একাকিনী আইলা পার্ব্বতী।
সুকঠিন শিলাঘাতে ব্যথিত সে চরণপরশে
ফুটিল কুসুমকলি আত্মহারা আকুল হরষে,
রাতুল চরণে যেন সানুদেশ দিল উপহার
কুসুমসুষমারাশি আপনার ভক্তি-অর্ঘ্যভার।
চরণচুম্বিত কেশে কর্ণিকার শোভা নাহি পায়,
আঁধার কেশের রাতি অযতনে চরণে লুটায় ;
সে কমল-করে আর নাহি শোভে লীলার কমল ;
আভরণহীন কর্ণে আর নাহি শোভে কর্ণোৎপল ;
স্মিতহাস্য আর নাহি ফুটি রহে অধরযুগলে ;
থাকি থাকি আঁখি দুটি ভাসি উঠে নয়নের জলে ;
সতত চঞ্চল আর নহে এবে নীলাব্জনয়ন,
ধরাতলবদ্ধদৃষ্টি চাহে শুধু রাতুল চরণ ;
সুকোমল গণ্ডে আর নাহি শোভে রক্তিম বরণ ;
প্রবাল অধরযুগে রক্ত আভা মলিন এখন ;
তরুণ-অরুণরাগ বাস নাহি শোভে অঙ্গে আর,
শিরীষকোমল দেহ বেষ্টিয়াছে বল্কলের ভার।
তপস্যার তীব্র তাপে খিন্ন এবে নবীন যৌবন,
অকালজলদোদয়ে ম্লানমুখ পঙ্কজ যেমন।

শ্রান্তদেহ ধীরে ধীরে শিলাপরে করিয়া স্থাপন
তুলি নতদৃষ্টি দেবী—সানুপ্রান্তে করিলা দর্শন,—
নমেরুবেষ্টিত চারু তপোপন, যেথায় নিয়ত
যোগমগ্ন মহাদেব ব্যোমকেশ বাহ্যজ্ঞানহত ;

না বহে পবন বেগে ফুটাইতে কোরকনিচয়ে
সেই পুণ্য তপোবনে—ত্র্যম্বকের তপোভঙ্গভয়ে ;
ভুলি পাখী নাহি গাহে, ভুলি বেগে না বহে পবন
স্মরি স্মরনাশকালে শঙ্করের ভ্রূকুটী ভীষণ ;
যোগমগ্ন চন্দ্রচূড়, চারি দিক নিস্তব্ধ নিশ্চল—
আলেখ্যে লিখিত যেন তপোবন রয়েছে কেবল।
সলিলস্তম্ভিত আঁখি চাহি ক্ষণ সানুপ্রান্তদেশে
কহিতে লাগিল দেবী মৃত্যুঞ্জয় কপর্দ্দী উদ্দেশে,—
বেদনাকম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারিত স্বর
তুলিল প্লাবিত করি শব্দহীন অসীম অম্বর,
বীণাবিনিন্দিত স্বর শব্দহীন গভীর নিশায়
ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে উঠি মিলাইল তারায় তারায়—

"ছাড়ি গৃহ, পরিজন, একধ্যানে মগ্ন নিরন্তর
তোমায় পাব না আমি কখনো কি—জন্মজন্মান্তর ?
শুকায়েছে দেহে মোর যৌবনের সৌন্দর্য্যসম্পদ
তুমি না দেখিলে তাহা, হে বাঞ্ছিত, কেবলি আপদ।
তরঙ্গউত্থানহীন সিন্ধু সম ও তব হৃদয়,
কাহারো পরশে, দেব, হবে না কি বীচিমালাময় ?
নিবাত প্রদেশে স্থির শিখা সম ধ্যানমগ্ন মন
ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের তরে জানিবে না কভু কি কম্পন ?
বর্ষণবিহীন ঘন মেঘসম প্রণয় তোমার
ক্ষুদ্র একবিন্দু প্রেম বর্ষিবে না কভু একবার ?
ওই চন্দ্রকর ধৌত অভ্রভেদী গিরিচূড়া সম
তুমি কি বধির, দেব, হৃদয়ের প্রার্থনায় মম !
তুমি কি উহারি মত প্রাণহীন,—মমতাবিহীন,
আর কিছু নাহি চাহ, আপনাতে আপনি বিলীন !
তবু ত ও গিরিচূড়া আশ্রিতেরে দিতেছে আশ্রয়
হিমরাশি, ধারাধর লভে হোথা বিরামনিলয়।
তুমি কি অনধিগম্য, শিতিকণ্ঠ, রহিবে কেবল ;
ফিরিবে তোমারে ঘিরি জন্ম জন্ম বাসনা বিফল ?
হে অব্যয়, হে স্বয়ম্ভূ, তুমি কিগো কেবলি ভীষণ—
তব জটাজূটলীন বায়ুভক্ষ্য ভুজঙ্গ যেমন ?

"আর কিছু নাহি আশা, শুধু তব নয়নকিরণে
ফুটেছে যে প্রেম, লহ উপহার রাজীবচরণে।
মৌলিবাসী সুরধুনী শিরে তব শোভে, দয়াময়,
আমি শুধু চাহি, শূলী, মোক্ষদায়ী চরণে আশ্রয়।
ভক্ত যদি ভক্তিভরে বিল্বপত্র দেয় পদমূলে
প্রফুল্লরাজীবকরে, ভক্তিজেয়, লহ তাহা তুলে,

উপাসিকা দেয় যদি ভক্তি প্রেম চরণে তোমার
তুমি কি প্রসন্নমনে লবে না সে প্রেম-উপহার ?
হে অজ্ঞেয়, হে সুন্দর, হে কঠোর, হে চিরমধুর,
লহ পদে উপহার এ হৃদয় বেদনাবিধুর।

"ভ্রান্ত আমি। কখন কি মুগ্ধনেত্রে দেখে দিবাকর
তার করে কোথা ফুল ফুটিয়াছে কোন তৃণ'পর ?
তার আছে শত কাজ—জগতের আলোকবিধান,
সে কি দেখে তার পানে চাহে কার তৃষিত নয়ান ?
সে কি দেখে কোথা কোন আন্দোলিত কমল-হৃদয়
ফুটিয়া উঠেছে, হেরি প্রাচীমূলে তাহার উদয় !
তবু দিবাকর-করে আত্ম ভুলি ফুটে শতদল,
জীবনে মরণে তার তপনের প্রণয় সম্বল।
চাহ বা না চাহ তুমি যোগমগ্ন যোগেশ ঈশান,
তোমার চরণে, দেব, রবে মোর কাতর পরাণ।
যোগঅন্তে একবার মোর পানে চাহ যদি ভুলে—
আকুল উল্লাস জাগি উঠিবে এ হৃদয়ের কূলে ;
তখন সফল হবে পার্ব্বতীর জীবনসাধন,
ত্রিনয়ন ! ক্ষণতরে লভি তব নয়নকিরণ।"

ধীরে ধীরে গেল সরি নীল নভে জ্যোছনাপ্লাবন ;
পাণ্ডুর গগন—যেন রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর আনন।
তার পর পূর্ব্বদিকে ধীরে ধীরে ঊষালোক আসি
স্তরে স্তরে মেঘে মেঘে ফুটাইল দিবসের হাসি।
ভক্তিভরে যুক্তকরে দিবাকরে করি উপস্থান,
পিনাকী পূজিতে পুনঃ ধীরে দেবী করিলা প্রয়াণ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ারতী। ভাদ্র। "অধ্যাপক" গল্পটি সুখপাঠ্য। আখ্যানবস্তু সামান্য ; কিন্তু বর্ণনার চিত্র ভঙ্গী, অলঙ্কারের সমৃদ্ধ সুষমা ও ইন্দ্রজালময়ী 'কাব্যমায়া'র বিচিত্র বিকাশে ই সামান্য গল্পটিও মনোরম হইয়াছে। গল্পের মহীন্দ্র এক জন অন্তঃসারশূন্য 'লিটা-রী';—লেখক তাহার নিষ্ফল প্রয়াস, হাস্যরসাত্মক অহমিকা প্রভৃতির চিত্র আঁকিয়া ঠকের সহানুভূতি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু একটি গুণে আমরা ীন্দ্রনাথের অত্যন্ত পক্ষাপতী হইয়াছি। মহীন্দ্রের অধ্যাপক প্রতিমুহূর্ত্তে শিষ্যের শূন্য-র্ভ সাহিত্যগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেন ; এবং মহীন্দ্র তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া অধ্যাপককে 'ব্রহ্মদৈত্য' লত ;—সমালোচকের উক্তি তাহার মনঃপুত হইত না, এ জন্য সে নিজেকে 'বড়' এব' ালোচকদের 'ছোট' মনে করিয়া যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি সম্ভোগ করিত। কিন্তু মহীন্দ্র বোধ

করি, কলেজের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া কখনও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যসমাজে পায়ের ধুলা দিবার অবকাশ পায় নাই। তাই সে সমালোচকের বা তাহার চক্ষুস্থ অধ্যাপকের অন্য লাঞ্ছনা করিয়াই নিরস্ত ছিল;—বিদ্বেষবশে বা নীচতার আতিশয্যে কে যে তাহার বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় সমালোচনা করিতেছে, বা করিতে পারে, এমন সম্ভাবনা এই অল্পবুদ্ধি 'নকল' কবির অন্তঃসারশূন্য বুদ্বুদবহুল চিত্তে একবারও উদিত হয় নাই বিরুদ্ধ সমালোচনায় চটিয়া সে যে অসঙ্কোচে আপনার অসন্তোষ অপ্রীতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিয়াছে,—এবং সরলহৃদয়ে বিরুদ্ধবাদীকে গালি দিয়াছে, নিরীহ সমালোচকের শিরে কোনও মতলবের আরোপ করে নাই,—ইহাতে আমরা তাহার যথেষ্ট সরলতার পরিচয় পাই। এবং মনে হয়, কালক্রমে তাহার সাহিত্যব্যাধির উপশম হইলে, এই হৃদয়ের গুণে মহীন্দ্র এক প্রকার নির্বৃতিলাভ করিতে পারিবে। আমাদের দেশের 'আসল' 'সাহিত্যিক'গণ যদি এই কবিসৃষ্ট 'নকল' কবির সরলতার অনুকরণ করিতেন! "ভাষা ও ছন্দ" একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘ কবিতা,—তবু ভাষার কৃত্রিমতায় ও কষ্টকল্পিত ভাবের ভারে ইহার উৎকর্ষের অনেক হানি হইয়াছে। "মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে" একটি সাময়িক প্রসঙ্গ; সকলের অবশ্য পাঠ্য। মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিলে ভাল হয়। "প্রাচ্য প্রসাধনকলা" একটি সুপাঠ্য রচনা।

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "দক্ষিণের ভাষা" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। লেখক বলেন, "এই হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী উভয়ে মিলিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য ভাষা দিগ্‌গজের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার নাম মহারাষ্ট্রী বা মারাঠী।" মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উৎপত্তিবিষয়ক এই নূতন মতটি শাস্ত্রী মহাশয় কোথায় আবিষ্কার করিলেন? বররুচি, হেমচন্দ্র, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক বৈয়াকরণগণ বলেন,—সংস্কৃত হইতে মহারাষ্ট্রী নামক প্রাকৃতভাষা উৎপন্ন। মহারাষ্ট্রী হইতে শৌরসেনী, শৌরসেনী হইতে মাগধী গৌড়ী প্রভৃতির উৎপত্তি,—শৌরসেনী ব্রজভাষার জননী। হিন্দী ভাষা ব্রজভাষার কন্যা। বস্তুতঃ মহারাষ্ট্রী যে শৌরসেনী অপেক্ষা প্রাচীনা, তাহা নানা প্রমাণে সিদ্ধ হয়। ইংরাজ লেখকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতীয় সমস্ত ভাষা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ অধিক; এমন কি, দশ ভাগের নয় ভাগ সংস্কৃত। মুসলমান শাসনকালে অনেক উর্দ্দু শব্দ মারাঠী ভাষায় প্রবেশ করিলেও সংস্কৃত কমে নাই। এবং অনেক উর্দ্দু (শাস্ত্রীর কথিত হিন্দুস্থানী) শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়া উর্দ্দুকে মারাঠীর জননী বলা অসঙ্গত। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "মহারাষ্ট্র ভাষা শিখিতে কষ্ট না হইলেও ইহা অত্যন্ত কর্কশ ভাষা। ইহা শুনিতে কুশ্রাব্য এবং ইহার কবিতা বা গীত শুনিতেও ধৈর্য্য নষ্ট হয়!" শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অভিনব! "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও কবিগণ প্রাচীন মহারাষ্ট্রকে অতিশয় মিষ্ট ভাষা মনে করিতেন। সেই জন্য নাটকে রমণীদিগের "গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ" এই বিধি দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে যে ভাষায় দশভাগের নয় ভাগ সংস্কৃত শব্দ, সে ভাষা সুমিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক বোধ হয়। Encyclopedia Britanica গ্রন্থের ১৫ খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠায় মহারাষ্ট্র জাতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই ভাষাকে "Copious, Flexible and Sonorous বলা হইয়াছে। "হিকড়ী, তিঁকড়ী" (কচ্ছীভাষা) অপেক্ষা "হাদগা তোম্‌লা" শাস্ত্রীর কর্ণে কেন কর্কশ বোধ হইল, তাহা আমরা বুঝিলাম না! "দক্ষিণের সাহিত্য কখনই চরিত্রগঠনের সহায় হইতে পারে নাই।"—এই মন্তব্যপ্রকাশের পূর্ব্বে যথোচিত রূপে দাক্ষিণাত্যের সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি?

দাদার কাণ্ড।

সংসারের একমাত্র অবলম্বন, জীবনের একমাত্র সহায় যে স্নেহময়ী জননী, তাঁহার শোকে প্রথমতঃ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সময়ে তাহাও সহিল। আমরা দুই ভাই; দাদা বড়, আমি ছোট। মার স্বর্গারোহণের সময়, আমার বয়স বার, দাদার ঊনিশ। ছেলেবেলাতেই দাদার বিবাহ হয়। বধূ ঠাকুরাণী তাঁর চারি বৎসরের ছোট। এই পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকাই তখন আমাদের গৃহের গৃহিণী। কিন্তু সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূ ঠাকুরাণীর গুণের কথা আর কি বলিব? তাঁহার স্নেহে, তাঁহার যত্নে, আমার শৈশবের সকল অভাবেরই মোচন হইয়াছিল। আমি তখন বড় আদুরে ছিলাম, আমার সকল বায়না, সকল আব্‌দার রক্ষা করা বড় সহজ ছিল না। মাও সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। কিন্তু বৌমা আমার হাসিমুখে সকল দৌরাত্ম্যই সহিতেন। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, সম্ভবতঃ মার দেখাদেখি বধূ ঠাকুরাণীকে ছেলেবেলা হইতেই আমি "বৌমা" বলিতাম।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। দাদা সতের বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। কষ্টে কিছু দিন এল.এ.ও পড়িয়াছিলেন। মার হাতে সামান্য কিছু টাকা ছিল, তাহা হইতেই কোন রকমে সংসার চলিত। মার শ্রাদ্ধাদি 'যেন তেন প্রকারেণ' সম্পন্ন করিলেও, আমাদের পুঁজিপাটার অবশিষ্ট যা, সবই নিঃশেষ হইয়া গেল। কাজেই, দাদাকে পড়া শুনা ছাড়িয়া চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের গ্রামের নিকটেই এক মাইনর স্কুল ছিল, দাদা তার হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। বেতন নামে পঁচিশ, রসিদেও পঁচিশ টাকা লিখিয়া দিতে হইত, কিন্তু দাদা পাইতেন নগদ ঊনিশ টাকা মাত্র। আর ছয় টাকা না কি স্কুলের মাসিক চাঁদায় আমিও সেই স্কুলে পড়িতাম। মার কোলের ছেলে, বড় আদরের, পড়াশুনায় প্রথম প্রথম তেমন চাড় ছিল না। বলিতে লজ্জা করে, সেই বার বৎসরের ধেড়ে ছেলে আমি, তখনও মাইনর স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর উপর উঠিতে পারি নাই। পড়া শুনায় মন নাই, সারাদিন খেলা আর খেলা! এ দিকে সেই অল্প বয়সেই দাদাকে ঘোর সংসারী হইতে হইয়াছিল। দাদা চিরদিন ধীর, স্থির, বিনয়ী, অথচ বুদ্ধিমান।

লোকে বলে, বুদ্ধিটা না কি আমারও ছিল, সেটা কিন্তু বেশী খেলিত দুষ্টামিতে। পাড়ার সকল ছেলে, স্কুলের সকল সমপাঠী,—কথাটি নিতান্ত অবিশ্বাস করিও না,—স্বয়ং পণ্ডিতমহাশয়ও আমায় কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়কে না হউক, তাঁর বেত গাছটিকে ভয় না করে, এমন ছেলে দুনিয়ায় দুর্লভ। আমি ছিলাম কিন্তু সেই দুর্লভ রত্নের একটি। পণ্ডিত মহাশয়ের বেত অন্য ছেলের নিকট শিকারভ্রষ্ট সিংহের লাঙ্গুলের ন্যায় ভীষণ আস্ফালন করিত, আর আমার বেলায় তার দশা হইত যেন প্রহৃত কুক্কুরের লেজটি। পড়াশুনা করিতাম না, তবু আমার প্রতি পণ্ডিত মহাশয়ের যে এতটা অনুগ্রহ, বলিতে হইবে কি, সে কেবল আমার নষ্ট বুদ্ধির জোরে? সে বুদ্ধির পরিচয়টা আর এ বয়সে দিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষ গুরুনিন্দা, সেটা আর নাই করিলাম। কিন্তু কি বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, বার বৎসর বয়সেও আমার লেখাপড়া কিছুই হয় নাই! মার মৃত্যুর পরে দাদা আমায় একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "বিনু"—আমার নাম বিনয়, বাড়ীতে কিন্তু সকলে আদর করিয়া বলিত বিনু—"এখন ত একটু বড় হয়েছিস, নিতান্ত অবুঝও ন'স্—লেখাপড়া না শিখ্‌লে কি করে চল্‌বে বল? আমরা গরিবের ছেলে, মূর্খ হয়ে থাক্‌লে দু' মুঠা খাবার উপায় আমাদের নাই। এই দেখ্, যদি ভাল করে লেখাপড়া শিখিতে পারিতাম, তবে কি আর সামান্য টাকার জন্য রোজ দুই ক্রোশ মাটী হেঁটে এই গরু ঠেঙ্গান কাজ কর্ত্তে হতো? না সংসারেরও এই কষ্ট থাকতো? মা ত দুঃখ কষ্ট সয়ে চলে গেলেন, আমরা কিন্তু এমনই হতভাগা যে, তাঁকে এক দিনও সুখী কর্ত্তে পারিলাম না।" বলিতে বলিতে দাদার চক্ষু ছল ছল হইয়া আসিল। পণ্ডিতের বেতের ভয়ে যে হৃদয় একদিনও কাঁপে নাই, প্রতিবেশী আত্মীয়ের গুরুগম্ভীর উপদেশেও যে মন বিচলিত হয় নাই, আজ সহসা সে পাষাণ গলিল। পরদিন হইতে মাষ্টার, পণ্ডিত এবং সতীর্থবৃন্দ, সকলের বিষম বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, আমি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। সে দুষ্টামিও তিরোহিত হইতে লাগিল। ক্রমে প্রকৃতই এক জন ভাল ছেলে হইয়া দাঁড়াইলাম। ষোল বৎসর বয়সে প্রথম বিভাগে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু বৃত্তি পাইলাম না।

পাশের সংবাদে দাদা, বৌমা, সকলেই মহা খুসী! কিন্তু শীঘ্রই সকলের সে হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল। মাইনর ত পাশ করিলাম, কিন্তু তার পর? এখন ত এন্‌ট্রেন্স পড়িতে হইবে। দাদা বৃষ্ণনগরে যে আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছিলেন, সে আত্মীয়টি ত বহুদিন

দাদারও চিন্তা-গমন করিয়াছেন, তবে উপায়! দাদা মোট পান উনিশ টাকা, কর্ত্তী লওয়া কিছু ছিল না, চারি পাঁচটি পরিবার, সুতরাং তাহাতেই টানাটানি পড়ে, তবে আমার পড়াশুনার ব্যয় কোথা হইতে চলিবে?

দাদা বড় বিষণ্ণ, তাঁর মুখ দেখিলেই মনে হয়, কি যেন একটা দারুণ মনঃকষ্টে তিনি সদাই বিষম ব্যথিত। সহসা দাদার মুখে হাসি দেখা দিল। বৌমা এক দিন বলিলেন, "এত ভাবনা কিসের? আমার যে গহনা আছে, ইহাতেই অন্ততঃ পাঁচ সাত শত টাকা হইবে, সেই টাকায় কিছু দিন ত চলুক, তার পর ঈশ্বর একটা উপায় অবশ্যই ক'রে দিবেন।" আমি সেইখানেই ছিলাম, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "না না, তা কি হয়?" বৌমা আমার দিকে কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কেন বিনু?" সে কথার উত্তর আর আমার মুখে আসিল না। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতেই বৌমা মনে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন, বুঝিয়া ভারি অপ্রতিভ হইলাম, কষ্টও হইল। বৌমার প্রস্তাবে দাদার বুক হইতে যেন একখানা পাষাণ নামিয়া গেল।

এখন কথা উঠিল, কোন পথে যাই? এন্‌ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িতে এখনও চারি বৎসর, আবার এন্‌ট্রেন্স পাশ করিলেই যে চতুর্ভুজ হইব, এমনও কিছু নয়। তার পর এল্.এ., বি.এ., সে ঢের দিনের কথা! শেষ কলিকাতায় ক্যাম্বেল স্কুলে পড়াই স্থির হইল। দাদার আন্তরিক ইচ্ছা, আমি জেনারেল লাইনে যাই। বৌমারও বড় সাধ, আমি একটা প্রকাণ্ড বিদ্যাদিগ্‌গজ হই। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় এবং আত্মীয় বন্ধুর পরামর্শে সে সাধে বাদ পড়িল।

আমাদের গ্রামের নবীন ও ভূপেন কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটীতে তাঁহারা বাটী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মেসে "সিট"ও খালি ছিল; সুতরাং কলিকাতায় গিয়া প্রথম ও প্রধান যে উদ্বেগ, তাহা দূর হইল। নবীনদের সহিত কলিকাতা যাওয়াই স্থির, শেষ যাত্রার দিন আসিল। আমার যাওয়ার ক্ষুদ্র আয়োজন প্রস্তুত। বৌমাই সব গুছাইয়া দিয়াছেন, একটি টিনের প্যাটরায় প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও একটি পুটুলিতে খানকতক আমসত্ত্ব, পাকা আমের আমচুর, আর আমি সুপারি বড় ভালবাসি বলিয়া 'মিহিসুপারি' সেরখানেক বাঁধিয়া দিলেন, আর দিলেন একটা ভাঁড়ে সের তিনেক গাওয়া ঘি। সঙ্গে সঙ্গে বৌমা মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, "শুনেছি কলিকাতায় ভাল দুধ ঘি মেলে না; রোজ দু'বেলা ঘি অবশ্য অবশ্য খেও।" কলিকাতা গিয়াই ভাল

জুতা, জামা কিনিয়া লইবার জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিতে ভুলিলেন না। তার পর স্বহস্তে আমের শাখা ভাঙ্গিলেন, ঘট পুরিয়া আনিলেন। এখন আমায় যাত্রা করিতে হইবে। আমাদের বড় ঘরে একখানি আসন পাতা, বৌমা আমায় সেইখানে বসিতে বলিলেন; নিজেও আমার নিকট বসিয়া আদ্যাশক্তি ভগবতী, সিদ্ধিদাতা গণেশ প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতাকে আমার মঙ্গলের জন্য ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিয়া আমায় সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। শেষে আমার কপালে দধি ও সিন্দূরের ফোঁটা ও মাথায় "নির্ম্মাল্য" দিলেন। আবার পরক্ষণেই নির্ম্মাল্যটি আমায় ভাল করিয়া চাদরের খুটে বাঁধিয়া লইতে বলিলেন, শেষে দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা বলিতে বলিতে আমায় লইয়া যাত্রার ঘর হইতে বাহির হইলেন।

এ দিকে ট্রেনের সময় যায়; ভূপেন ও নবীন পথে দাঁড়াইয়া; দাদা শীঘ্র রওনা হইবার জন্য আমায় তাড়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু বৌমা, সে সকল গ্রাহ্য করিলেন না, কিছু না খেয়ে কি যাওয়া হয়? কাজেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। 'পাথেয়' লুচি সন্দেশও বৌমা সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। আমি বৌমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম, বৌমা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল! আমরা রওনা হইলাম। যতক্ষণ দেখা যায়, বৌমা খিড়কিতে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতে লাগিলেন।

ষ্টেশন আমাদের বাটী হইতে দেড় মাইল। দাদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিলেন। যাহা যাহা বলিবার, দাদা তা আমায় পথেই বলিতে বলিতে চলিলেন। দাদার সে কয়টি অমূল্য উপদেশ আমি চিরজীবন হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম। আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও আসিল। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। আমাকে নবীন ও ভূপেনের হাতে সঁপিয়া দাদা বিষণ্ণহৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। গাড়ীও ছাড়িল, আর আমার মনটি কেমন হইয়া গেল। সেই অবস্থায় কলিকাতায় পঁহুছিলাম। মনটি বড় উড়ু উড়ু। ক্রমে আলিপুরের বাগান, মিউজিয়ম, কেল্লা, ইডেন গার্ডেন দেখিতে দেখিতে মনটা কতক বসিল। তখন ক্যাম্বেলে ভর্ত্তি হইলাম। পড়ায় খুব মন। দেখিতে দেখিতে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। আমি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। পাশের সংবাদ

লইয়াই বাড়ী গেলাম। বৌমার মুখে আর হাসি ধরে না। দাদারও চিন্তা-ক্লিষ্ট বদনে প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা দিল। তখন প্রশ্ন উঠিল, চাকরী লওয়া কি ব্যবসা করা? আসাম অঞ্চলে একটা পঁচাত্তর টাকা বেতনের কাজ পাইবার আশা পাইয়াছিলাম। বৌমা ত তা শুনেই বল্লেন, "সর্ব্বনাশ, আসাম?—না, ভাই, সেখানে তোমার যাওয়া হবে না; ঘরের ছেলে, ঘরেই থাক।" সত্যই ঘরের ছেলে ঘরেই রহিলাম। দেশে তেমন ভাল ডাক্তার তখন কেহ ছিলেন না। সকলে দেশেই ডিস্পেন্সারী করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তা হ'লে ঔষধপত্র ও অন্যান্য আসবাব সংগ্রহ করিতে প্রথমেই যে অন্ততঃ দুই শত টাকার দরকার। বৌমা এবারেও বিপদে কাণ্ডারী হইলেন, বলিলেন, "আমার এখনও যে গহনা আছে, তাহাতে আড়াই শ তিন শ অনায়াসে হবে।" বৌমার কথার উপর কে কথা কহিবে? আমি ঔষধপত্র আনিবার জন্য অলঙ্কার সহ কলিকাতায় রওনা হইলাম। বৌমার হাতে এখন শুধু দু' গাছি শাঁখা রহিল। যাইবার সময় দাদা খান কয়েক আইনের পুস্তকের ফরমাইস দিলেন। বলিলেন, "একবার 'কমিটী' পরীক্ষা দিতে হবে।" দাদা কিন্তু মতলবটি মন্দ ঠাওরান নাই।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। দশ, পনর, বিশ, পঁচিশ, ক্রমে ছ'মাসের মধ্যে আমার মাসিক আয় চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত হইল। পশারও বেশ জমিল। তবে দেশে যত পশার, পয়সা তেমন নহে। যা হোক, ভবিষ্যৎ বড় মন্দ মনে হইল না। যা কিছু পাই, সবই বৌমাকে আনিয়া দিই। মধ্যে একটা বড় দাঁও উপস্থিত হইল। দেশস্থ কোন ধনাঢ্য ও বদান্য জমীদারের স্ত্রী ও পুত্রকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া এককালে তিন শত টাকা পুরস্কার পাইলাম। সে টাকাটা কিন্তু আর বৌমাকে দিলাম না। গোপনে সে টাকার একটা সদ্গতি করিলাম। তখন সোনার বাজার সস্তা, সেই তিন শত টাকাতেই বৌমার হাতের বালা, গলার হার ও কাণের মাকড়ী হইল। গহনা দেখে ত বৌ'র ভারি রাগ। আমাকে "এ গিন্নিমি কর্‌তে কে বল্লে?" বৌমা কোথায় আমার সম্বন্ধের জোগাড় করিতেছেন, বিবাহে অন্ততঃ ছয় সাত শত টাকার দরকার, আর আমি কি না, বলা নাই, কহা নাই, মাঝ-খান হ'তে এতগুলো টাকা নয় ছয় করে ব'সে আছি? বৌমা তখন ব্যবস্থা করিলেন, "আচ্ছা থাক, এ হার মাকড়ি সব কনের হবে।" এইবার আমার মুখ ফুটিল,—কোন দিন বৌমার সঙ্গে কথান্তর ঘটে নাই, আজ ঘটিল। সে

ভারি কোঁদল। পাঠিকাগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য এবং দুঃখিত হইবেন যে, সেই কলহে আমারই জয় হইল। শেষ বৌমাই সে অলঙ্কার ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলেন।

ক্রমে আমার আয় পঞ্চাশ, ষাইট টাকায় উঠিল। কোন মাসে বেশীও পাই। ষোল মাস ব্যবসায় করিতে না করিতে শুনিলাম, বৌমা আমার বিবাহের সমস্ত স্থির করে ফেলেছেন। বিবাহের আর দশ দিন মাত্র বাকি। অবাক কারখানা! বৌমাকে হাসিয়া বলিলাম,—"এটা কি সত্যি বৌমা?"

"কোনটি বিনু বাবু!" বলিয়া বৌমাও হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন।

আমি। এই বিবাহের কথাটা?

বৌমা। তোমার মনে কি হয়?

আমি। আমার ত সম্ভব মনে হয় না।

বৌমা। অসম্ভবটা কিসে ভাব্‌লে?

* * * * *

আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। কনের চারি শত টাকার গহনা চেলি সমস্তই সংগৃহীত। এর উপর বিবাহের খরচ বলিয়াও বৌমার হাতে আড়াই শত টাকা মজুত। আমার উপার্জ্জিত একটি পয়সাও বৌমা ব্যয় করেন নাই। কিন্তু আজ সে সমস্তই একেবারে অপব্যয় করিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক, বৌমার নিকট মনে মনে হারি মানিলাম, কিন্তু প্রকাশ্যে বৌমাকে একটু খোঁটা দিতে ছাড়িলাম না। বলিলাম, "বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যে এ সংবাদটি জানিতে পারিনি, এও ভাল।" বৌমা কথাটা বুঝিলেন, বলিলেন, "যা ভয় কচ্চ, তা নয়; কনে যেন গোলাপ ফুলটি, আমি যে নিজে দেখে ঠিক করেছি বিনু বাবু!"

"তা বেশ, ফুলদানিতে রাখ্‌বেন!" বলে আমি স্মিতমুখে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। আরে রাম, সেখানে কি আর দাঁড়াতে আছে?

যথাসময়ে বৌমার সেই অপব্যয়ের ফলটি আমার হাতে উঠিল। বৌমা আমায় মাঝে মাঝে আদর করিয়া "দেবর লক্ষ্মণ" বলিতেন। আমিও তাই, বৌমার প্রদত্ত ফলটি কিছু কাল লক্ষ্মণের 'ফল ধরা গোচ' ধরিয়া রহিলাম।

এবার আমার ব্যবসায়ের ভারি উন্নতি। ঘরে ঘরে জ্বর। লোকের সর্ব্বনাশ, আর আমরা ডাক্তার, কাজেই আমাদের পাথরে পাঁচ কিল। তিন মাসে আড়াই শত টাকা ভিজিট, এ ছাড়া ঔষধের দাম ত আছেই। সেও নিতান্ত

অল্প নহে। দুধে জল মিশাইয়া জলের দামে দুর্নামের বিনিময়ে অনেক গোয়ালা বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করে। ডাক্তারি ব্যবসাতেও জলে উপার্জ্জন বড় কম নহে। সুতরাং সে হিসাবে ডাক্তারি ব্যবসাটিকে Reformed গোয়ালার ব্যবসা বলা চলে। তবে এতে Municipal officerদের দন্তস্ফুট করিবার যো নাই, এই যা বল। তা সে কথা যাক, আমার আয়বৃদ্ধি দেখে বৌমা এক দিন আমায় বলিলেন,—"দেখেচ বিনু বাবু, কেমন পয়মন্ত বৌ এনেছি?"

"পয়মন্ত বটে, নইলে কি আর গ্রামে ঘরে ঘরে এত জ্বর জ্বালা হয়!" বলিয়া আমি কার্য্যান্তরে গেলাম।

বিবাহের ছ' মাস অতীত হইতে না হইতেই বৌমা নববধূকে বাড়ীতে আনিলেন। এরই জন্য তিনি বুঝি বিবাহের সময় "ধূলা পায়ে নবসত" করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নববধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৌমার কাজ বাড়িল। তার 'সাজগোজ' করা, চুল বাঁধা, খাওয়ান, ইত্যাদিতে বৌমা আমার সদাই ব্যস্ত। বালিকা প্রথম প্রথম দিনকতক বাপের বাড়ীর জন্য খুঁৎ খুঁৎ করিত। দুই এক দিন একটু আধটু কান্নাকাটি করিয়াছিল, তার পর সব চুপচাপ।

এক দিন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে, ভৃত্য শ্রীমান চৈতন্য আমার চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, একটি 'কল' আছে। কিন্তু এ ঘরের কলা বৌটিকে একা রাখিয়া যাওয়া চলে না, কাজেই বৌমাকে এ ঘরে থাকিবার জন্য ডাকিতে হইল। আমার প্রথম ডাকেই দাদা বলিলেন, "কে বিনু?" বলিয়া তিনি দোর খুলিয়া দিলেন। দাদা তখনও শয়ন করেন নাই, আইন-চর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। আমাদের কথাবার্ত্তায় বৌমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমাদের নিকট আসিলেন। আমি তখন দাদাকে বলিতেছিলাম, "প্রত্যহ এত রাত্রি জেগে পড়াশুনা কল্লে শরীর মাটী হয়ে যাবে যে।" "না" বলিয়া দাদা একটু হাসিলেন। বৌমা আমার কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "আমিও রোজ ঐ কথা বলি; তোমাকে বল্‌ব বল্‌ব করে বলা হয়নি, এখন কিছুদিন ছুটী নিলেও ত চলে।" বৌমা ঠিক বলেছেন, আমি উদ্যোগী হইয়া দাদাকে বিনা বেতনে তিন মাসের ছুটী লইতে বাধ্য করিলাম।

তিন মাস অন্তেই দাদা কমিটীর পরীক্ষা দিলেন; ঈশ্বরেচ্ছায় পাশও হইলেন। সব্‌ডিভিসন আমাদের গ্রাম হইতে চারি মাইলও নয়। সেইখানেই

প্রথমে প্র্যাক্‌টিস্ করা স্থির হইল। কিন্তু দাদা আপাততঃ কিছু দিন চাকরী করার অভিপ্রায় জানাইলেন। ভেক নহিলে ভিক মিলে না। ঘড়ি, চেন, পোষাক পরিচ্ছদ ত চাই। আবার কয়েকখানি আইনের পুস্তকও সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং কিছু টাকার দরকার। আমার কিন্তু এ যুক্তি ভাল বোধ হইল না। শুভস্য শীঘ্রম্! আমি প্রস্তাব করিলাম, ধার ধোর করে কোন প্রকারে টাকা সংগ্রহ করেও সত্বরেই ওকালতিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বৌমা অতিমাত্র দৃঢ়তার সহিত আমার প্রস্তাব 'সেকেণ্ড' করিলেন,—অধিকন্তু বলিলেন,—"ধারই বা কর্ত্তে যাবে কেন?"

আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তখনও প্রায় দেড় শত টাকা জমা! দাদা আর বাক্যব্যয় করিলেন না। মৌনং সম্মতিলক্ষণং, তখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইল। বাসাখরচের জন্য পঁয়ত্রিশটি টাকা হাতে লইয়া দাদা যাত্রা করিলেন! Practice আরম্ভ হইল—দাদা আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন। তাঁহার জমাখরচে দেখিলাম, প্রথম মাসে উপার্জ্জন তের টাকা আট আনা; খরচ সাতাইশ টাকা পাঁচ আনা আড়াই পয়সা! দ্বিতীয় মাসে বাসাখরচের জন্য "পুঁজি" হইতে আড়াই টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। তৃতীয় মাসে খরচ বাদে ছয় টাকা উদ্বৃত্ত হইল। পর মাসে আয় পঞ্চাশেরও বেশী। ক্রমে বৎসর অতীত হইতে না হইতে দাদার খুব নাম ছুটিল! ফৌজদারী কোর্ট যেন তাঁর একচেটিয়া হইয়া উঠিল! যে কোন মকদ্দমা হউক না, দাদা এক পক্ষে না এক পক্ষে আছেনই। ক্রমে মুনসেফি কোর্টেও দাদা "কেস্" পাইতে লাগিলেন! বোধ হয়, দাদার তখন বৃহস্পতিবার দশা। মুন্সেফিতেও তাঁহার বেশ পশার প্রতিপত্তি দাঁড়াইল। দুই বৎসরের মধ্যেই দাদা সব্‌ডিভিসনের একজন প্রধান উকিল হইয়া উঠিলেন। মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট হইল। জেলার কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজা, জমীদার বাঁধা মক্কেল হইলেন! আমাদের সংসারের শ্রীও ফিরিতে লাগিল। পাকা বাড়ী, জোত, জমা, পুষ্করিণী, বাগান, একে একে সবই হইল। তখন বৌমা দুর্গোৎসবের সাধ করিলেন! তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষিত হইবার নহে! পূজা করা গেল। কিছু সমারোহও হইল।

দাদা কিন্তু তখনও নিঃসন্তান! সে জন্য দাদা বা বৌমা যে কিছুমাত্র দুঃখিত, এমনটি বুঝা যাইত না। তবে বাটীতে একটি কচি ছেলের অভাব কিছু কিছু অনুভূত হইতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধু সকলে কার্ত্তিকপূজার

উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের কথায় কুমার কার্ত্তিকেরও শরণ লওয়া হইল। কুমারের অর্চ্চনাটা একেবারে বৃথায় গেল না। সংবৎসরের মধ্যেই বৌমার অপরিসীম একটা আনন্দের কারণ—তাঁহার সাধের সে কনে বউটির পঞ্চদশ বৎসর বয়সে, সন্তানসম্ভাবনা ঘটিল। মনের সাধে বৌমা "ভাজা সাধ" দিলেন। এবং, যথাসময়ে, বৌমার ভাষায় "সাত রাজার ধন মাণিক"—"আঁধার ঘরের আলো"—একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। বৌমার ফূর্ত্তি দেখে কে? বৌমা আর আমাদের দিকে ভাল করিয়া চাহেন না। মেজাজ বড় গম্ভীর। ছেলের 'জেঠী'র কি আর ছেলেমানুষী করিবার সময় আছে? মহাসমারোহে খোকার অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইয়া গেল—বৌমা নিজেই ছেলের নামকরণ করিলেন—"হৃদয়-রঞ্জন"! বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিতে লাগিল। ষষ্ঠী দেবীও বিশেষ কৃপাবিতরণ আরম্ভ করিলেন! দুই বৎসরের মধ্যে আবার এক "কন্যারত্ন" গৃহ উজ্জ্বল করিল।

সব্‌ডিভিসনে দাদার পশার প্রতিপত্তি যখন চরম সীমায় উপস্থিত হইল, তখন সকলে দাদাকে জেলা কোর্টে যাইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার সে বাঁধা মক্কেল কয়েক ঘরও বিশেষ উৎসাহ দিলেন। দাদা কিছু দিন ইতস্ততঃ করিয়া জেলা কোর্টেই গেলেন। গ্রহ অনুকূল,—জেলা কোর্টেও সত্বর দাদার সুনাম রটিল! আয়ও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল! সবই সুবিধা, অসুবিধা কেবল একটি, সব্‌ডিভিসনে থাকিতে দাদা প্রায়ই শনিবারে শনিবারে বাটী আসিতেন, এখন সেটি বন্ধ হইল! দুই মাস, তিন মাস, কখনও বা ছয় মাস অন্তর দাদার বাটী আসা ঘটে! জেলা হইতে বড় বড় মকদ্দমায় দাদাকে মাঝে মাঝে আমাদের সব্‌ডিভিসনে আসিতে হইত। দাদা সেই সময় বেগারের পুণ্যে গঙ্গাস্নান করিতেন, দুই তিন দিনের জন্য বাটী আসিতেন। এই এক অসুবিধা। বিশেষতঃ বৌমা গেলে সংসার অচল, কাজেই দাদার বাসায় সপরিবারে থাকা ঘটিত না। ঈশ্বরকৃপায় ক্রমে দাদার আয়বৃদ্ধি এবং আমার বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেশে এখন প্রায় ঘরে ঘরে ডাক্তার, সুতরাং আমার উপার্জ্জন দিন দিন কমিতে লাগিল। আমি ষষ্ঠীগাছ হইয়া "ছেলেপিলে" আগুলিয়া বাটীতে "গেঁয়োমোড়ল" হইয়া রহিলাম। খরচপত্র সব দাদা পাঠান; আমি ঘুমাইয়া তাস পিটিয়া ও ছেলে কোলে করিয়া দিন কাটাই! দুটা একটা 'কল্' কখনও পাই, কখনও বা নাও পাই। কিন্তু তাতে সংসারের কিছু ক্ষতি-

বুদ্ধি নাই। পরিবারের সকলেরই হৃদয়ে অনাবিল শান্তি, মুখে নির্ম্মল হাসি, আর গৃহে বিপুল আনন্দ। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। সহসা ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল! পূজার তিন দিন অনবরত পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণ করিয়া বিজয়া দশমীর প্রত্যূষে বৌমার কলেরা দেখা দিল। প্রথম হইতেই লক্ষণ বড় মন্দ, তার উপর বৌমা, গরমে অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া কাহাকেও না জানাইয়াই প্রাতে স্নান করিয়াছিলেন। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া আমি প্রাতেই সব্‌ডিভিসনের এসিস্‌টেণ্ট সার্জ্জনকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম। নিজেও প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু নিজের মাথার ঠিক ছিল না। মনে হইতে লাগিল, চিকিৎসাশাস্ত্র বুঝি বা সব ভুলিয়া গিয়াছি। মধ্যাহ্নে এসিস্‌টেণ্ট সার্জ্জন পঁহুছিয়া আমার ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। তখন নূতন উৎসাহে ডাক্তার বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ দিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই বাগ মানিল না। বৌমাকে বুঝি আর বাঁচাইতে পারিলাম না! বৌমা অন্তিমশয্যায় আমায় বলিলেন, "বিনু, আর কেন এত চেষ্টা ভাই? আমার যে সময় হয়েছে। আমার সব সাধই ত পূরেছে—আমি তোমাদের রেখে যাচ্চি—এর চেয়ে আর আমার কি সুখ আছে?—আমি ত চলিলাম, ছোট বৌ ছেলেমানুষ, দেখ ওর যেন কোন কষ্ট না হয়!" তার পর বৌমা কাতরদৃষ্টিতে দাদার দিকে চাহিলে আমি কি একটা উপলক্ষে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। দাদার ডাকে, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরিলাম—দেখিলাম, দাদা চক্ষু মুছিতেছেন—বৌমারও চোখে জল। কই বৌমা! সব সাধ ত মেটে নাই? কিন্তু দেবি, তোমায় বাঁচাইতে পারিলাম কই? দাদার পায়ে মাথা রাখিয়া আমার সম্মুখে বসাইয়া বৌমা আমার চোখ মুছিলেন। সে চক্ষু আর মেলিলেন না। আমাদের সোনার প্রদীপ নিভিয়া গেল, গৃহ অন্ধকার হইল। বিজয়ার প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৃহের সে দেবীপ্রতিমাও বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম।

ছেলেদের কান্নায় গৃহে আর তিষ্ঠান যায় না। "জেঠীমার কাছে যাব" বলিয়া তাহারা যে বায়না ধরে, তাহাদের গর্ভধারিণীও কিছুতে তাহা ভুলাইতে পারে না।

দাদার ব্যবহারে, বাহিরের লোকে শোকের চিহ্নমাত্র ধরিতে পারিল না। অন্যে না বুঝুক, কিন্তু আমি বুঝিলাম, দাদা আমার "জলন্ত শোকের আগুণ" বুকে ধরিয়া গর্ভাগ্নি অচলের মত অচল হইয়া দিবারাত্রি পুড়িতেছেন। আহার করিতে করিতে দেখিতাম, দাদার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। একত্র শয়ন করিয়া দেখিতাম, দাদা রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বলিতেন, "রাণী! তুমি যে এমন, তা ত আগে জানিতাম না", কোন দিন বা "এসেছ, চল যাই!" বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেন! আমি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "কি দাদা!" "না কিছু নয়, স্বপ্ন দেখিলাম" বলিয়া অপ্রতিভ হইয়া দাদা আবার শুইয়া পড়িতেন।

বৌমার শ্রাদ্ধাদি শেষ হইল। দাদা বৌমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খননের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বৌমার নামে তাহার নাম হইল "রাণীসায়র"।

দাদা এবার আদালত খুলিবার কয়েক দিন পূর্ব্বেই ব্যবসায়স্থানে যাইবার দিনস্থির করিলেন। আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। এ কয়টি দিন থাকিয়া গেলে হয় না? দাদা একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন, বলিলেন, সেখানে কাজকর্ম্মে তবু অনেকটা অন্যমনস্ক থাকিতে পারিব। আমি আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলাম না।

ক্রমে বৎসর অতীত হইতে চলিল। দাদা আর বাটী আসেন না; অবশ্য খরচপত্র বাটীতে রীতিমতই পাঠাইতেন। দাদা বাটী আসেন নাই বটে, কিন্তু দেশস্থ অনেক আত্মীয়বন্ধু দাদার বাসায় পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে আমি দাদার নিকট যাইতাম; শুনিতাম, সমাগত আত্মীয়গণ দাদাকে পরামর্শ দিতেছেন, "এত অল্পবয়সে কি বিপত্নীক অবস্থায় থাকিতে আছে?" ইত্যাদি! তাঁহারা কেবল এই অমূল্য উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, নিঃস্বার্থভাবে আপন আপন বয়ঃস্থা কন্যা দান করিতেও প্রস্তুত। দাদা কিন্তু তাঁহাদের এহেন ত্যাগস্বীকারেও উপকৃত হইতে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। কেহ কেহ দাদাকে অনুরোধ করিবার জন্য আমাকেও ধরিলেন; কেহ বা এমনও জানাইলেন যে, দাদার ত বিবাহ করিতে ষোল আনা মত, কেবল আমি কি মনে করিব, এই চক্ষুর্লজ্জাতেই দাদা বিবাহ করিতে পারিতেছেন না। পূজার সময় দাদা বাটী আসিলেন। বোধ হয়, বৌমার অনুরোধ স্মরণ করিয়াই দাদা পূজা বন্ধ করিলেন না। কিন্তু পূজা না পূজা। সে উৎসব ত শোকেই কাটিয়া গেল। আর বৎসর এমনই দিনে হায় আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। জগদম্বে! তোমার সহিত বৌমাকে যে একদিনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তুমি ফিরিলে, কিন্তু বৌমা কই?

পূজা ত কোনরূপে কাটিয়া গেল, কিন্তু নিত্য নূতন কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয়কুটুম্বগণের সমাগমে গৃহ আমাদের ভরপূর। দাদা সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। এক দিন দেখি, 'বৌমার এক মেসো—ঠিক ধান সম্বন্ধে নহে,—সপরিবারে আমাদের গৃহে উপস্থিত। মেসোটি নিতান্ত মাসীমা রকমের! কিন্তু মাসীমা বড় জমকাল লোক!, কথায় বার্ত্তায় মৌখিক আলাপ আপ্যায়িত প্রভৃতি রমণীসুলভ গুণে যেন মূর্ত্তিমতী! আবার বিষয়বুদ্ধিতে রমণীমণ্ডলে দুর্লভ। স্বয়ং বৃহস্পতি আর কি! মেসো-মহাশয়-রূপ নাবালকটির তিনিই না কি 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস্'।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই মাসীঠাকুরাণী, বৌমার নাম ধরিয়া "রাণী, মা আমার, তোর এ সোনার রাজ্য ফেলে কোথা গেলিরে মা" ইত্যাদি করুণ ক্রন্দনে গৃহ অনুরণিত করিয়া তুলিলেন। তার পর দাদার আগমনে, বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল; ক্রন্দনের সুর পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল। "আমাদের কি একবারেই ভুলে থাকতে হয় রে বাবা, রাণী যে আমার মাসীমা মাসীমা করেই পাগল ছিল রে বাবা!" ঠাকুরাণীর আর বাক্যনিঃসরণ হইল না। উপস্থিত রোদনাবেগ কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। তার পর ক্রন্দন সংবরণ করিয়া অঞ্চলে অশ্রু বিমোচন পূর্ব্বক, শোকবিজড়িত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "বলি বাবা ত আমাদের পর করেছেন, আমরাই একবার খোঁজ খবর নিয়ে আসি। আর সৈরিন্দিরও তোমাদের নামে লাল পড়ে, আহা রাণী আমার সৈরিন্দিকে কত ভালই না বাসত। ভাল জামাটি, ভাল কাপড়খানি, সৈরিন্দিকে না দিলে আর তার মন উঠত না। আহা, অমন মেয়ে কি আর হয়?" নির্ব্বাপিত বহ্নি বুঝি আবার প্রধূমিত হয়, কিন্তু না, এবার সংক্ষেপেই পালা শেষ হইল। কিঞ্চিৎ আর্দ্রকণ্ঠে ঠাকুরাণী বলিলেন, "সৈরিন্দি, কাঁদচিস্ বুঝি? কেঁদে আর কি করিবি মা! আয় এখন, তোর বোনাই বাবুকে প্রণাম করবি আয়!" আমি সম্মুখের ঘরেই ছিলাম, দেখিলাম, রূপে আলো করিয়া মন্থরগমনে আসিয়া ব্রীড়াবনতমুখে এক কিশোরী দাদাকে প্রণাম করিলেন, এবং দাদা স্বাগতবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, ডাইন হাতের দুই অঙ্গুলিতে বাঁ হাতের মাঝের আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছেন?" দাদা যেন একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যা, তুমি ভাল ছিলে!" সৈরিন্দ্রী স্মিতমুখে "যেমন রেখেছেন" বলিয়া দাদার প্রতি একবার সলজ্জ

আঁখি দুটির কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আবার মুহূর্ত্তেই, মাটীর পানে মুখ নামাইলেন। দাদাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সৈরিন্দ্রী বসুন না বলিয়া সপ বিছাইয়া দিলেন। দাদা বসিলেন।

* * * *

মাসীঠাকুরাণী তখন আমার নিকট আসিয়া গল্প ফাঁদিলেন। এ কথা, সে কথা, বৌমার নানা গুণের কথা তুলিয়া, শেষ দাদার বিবাহের কথা পাড়িলেন। আমাকে সে জন্য অনুরোধ করিতেও বলিলেন। আসল কথাটা কিন্তু তখনও ভাঙ্গিলেন না। ঠাকুরাণীর ব্যবহারটি আমার আগাগোড়াই কেমন কেমন মনে হইতেছিল, আমি কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারেই বলিলাম, আপনারাই চেষ্টা করে দেখুন, বলিয়া আমি বাহিরে গেলাম। কিন্তু ক্ষণপরে ফিরিয়া শয়ন-ঘরে যাইতে যাইতে শুনিলাম, কক্ষান্তরে, কুটুম্ববাড়ী হইতে আগত ঝি বলিতেছে—"ভাল দেখেছ ঠাকরুণ! তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই—তাই গিয়েছ কাজিকে শুধুতে দুগ্গোচ্ছবের পরবের কথা। আরে বিয়ে কল্লে ক্ষতিটা হবে কার? তখন কি আর এমন করে পায়ের উপর পা দিয়ে দাদার মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খাওয়া চল্‌বে? না, দাদাকে বোকা বুঝিয়ে সর্ব্বস্ব লুটে নিতে পার্‌বে?" মাসীঠাকুরাণী বলিলেন, "নে বাপু চুপ কর, ও সব কথায় তোর কাজ কি?" কথাটা ঝির পছন্দসই হইল না। সে সৈরিন্দ্রীকে মধ্যস্থ মানিয়া আবার আরম্ভ করিল, "তা আমি কি আর মিথ্যা বল্‌চি, কি বল গো সৈরিন দিদি?"

এখন আমাদের বাটীর যেটি গৃহিণী, সেটির ত সাত চড়েও মুখে রা নাই; বোঝা বহিতে বেচারা বড় মজবুত। কিন্তু হুকুম তামিলে যেমন তৎপর, হুকুম চালাইবার ক্ষমতা তেমন নাই। তা হোক, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদের সেবা করিবার শিক্ষা সে বৌমার নিকট লাভ করিয়াছিল। এখন মাসীঠাকুরাণীদের যত্ন সে বেচারা প্রাণপণেই করিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম দুই এক দিন, দাদা মাসীঠাকুরাণীর কথা তুলিয়া আমায় বলিলেন, "ভাই কি বিপদেই পড়েছি!" তার পর দাদার মুখে আর সেরূপ দুই দিন শুনিলাম না। দাদা যেন এখন সদাই কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক! যাহা হউক, নূতন কুটুম্বদের প্রতি দাদার আদর যত্ন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগে দাদাতে আমাতে নির্জ্জনে বসিলেই, বৌমার কথা উঠিত। সে প্রসঙ্গে দাদা যেন থাকিতেন ভাল! কিন্তু আজ কয় দিন হইতে দাদা আর

তেমন তন্ময় হইয়া এক স্থানে বসিতে পারেন না। আর বৌমার প্রসঙ্গও বড় উঠে না। দাদার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম—এখনকার মনের ভাবটিও যেন কতকটা না বুঝিলাম, তা নয়। কিন্তু দাদা আমায় এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না। দুই এক দিন কি যেন বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। অন্য প্রসঙ্গ তুলিতেন, লজ্জায় আর আসল কথাটি বলা হইত না।

তবে দাদা ত আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক,—তিনি যাহাতে সুখী হন, সেই ত ভাল—তখন দাদার লজ্জার বাঁধ আমিই ভাঙ্গিয়া দিলাম। এক দিনে বাটীর মধ্যে সকলের সমক্ষেই, দাদাকে বিবাহের কথা বলিলাম,—কথাটা তুলিতেই, সেই ঝি, মাসীঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া একটু আঁচা-আঁচি করিল। ঠোঁট ফুলাইয়া একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া চখ মট-কাইল! দৈবক্রমে সেটাও আমার চক্ষে পড়িল। ঝির মনের ভাবটা—"উনি না বল্লেই যেন সব আটকাচ্ছিল!" তা যাই হোক, আমার বিবাহের প্রস্তাব, আর অমনি দাদার সম্মতিপ্রকাশ আর কি? একবার যখন চক্ষুর্লজ্জা ঘুচিয়া গেল, তখন আর বাধা কিসের বল? দাদা আমার উদ্যোগী হইয়া অগ্র-হায়ণের প্রথমেই সৈরিন্ধ্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের দশ পনর দিন দাদা সস্ত্রীক বাটীতেই থাকিলেন। বড় বধূঠাকুরাণী, এই কয় দিনের মধ্যেই ঘর সংসার বেশ চিনিয়া লইলেন। এই জন্যই বলে,

"যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।"

দাদা আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যবসার স্থানে গেলেন। মাউই ঠাকুরাণীও—ভূতপূর্ব্ব মাসী মহাশয়া—স্বামী কন্যা সহ গৃহে গমন করিলেন। মাউইমা যাইবার সময়ে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপ্যায়িত করিয়া যাইতে ভুলিলেন না।

দাদা এখন মাঝে মাঝে শ্বশুরবাটী যান। বিবাহের ছয় মাস অতীত হইয়া গেলে শুনিলাম, বড় বধূঠাকুরাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। বড় সুখের কথা। যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। দাদার পুত্র হই-য়াছে, এর চেয়ে আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু এই সন্তান যদি বৌমার, যাক্—সুখের দিনে সে দুঃখের কথার আর কাজ কি?

বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর এইরূপ বিধিবিড়ম্বনায় বড় বধূকে

পিত্রালয়ে থাকিতে হইল। তবে দাদা অবশ্য ২।১ মাস অন্তর শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। এ দুইবারের পূজার কয় দিন বাটী থাকিয়া, অবশিষ্ট ছুটিটাও দাদা শ্বশুরালয়ে কাটাইলেন। নবকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বড় বধূঠাকুরাণীর আগমন হইল। দাদাও সে সময় বাটী আসিলেন, আর দুই চারি দিনের মধ্যেই মাউইমা (দাদার এ পক্ষের শ্বাশুড়ী) তাউই মহাশয় (দাদার হালি শ্বশুর) এবং তাঁহাদের অন্যান্য পরিবারবর্গের, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝিরও আবির্ভাব হইল। বাড়ীখানি যেন হইল কাকসমাকুল বটবৃক্ষ। ছোট বধূ একা, এতগুলি লোকের তত্ত্বাবধান করিতে হিম সিম খাইয়া গেল। বড় বধূ ত এখন কুটুম্ব মানুষ বলিলেও চলে,—তবে, এ চাই, ও চাই, ইত্যাদি ফরমাইসে তিনি ঘরের লোকের মতই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেই যা রক্ষা!

অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইয়া গেলে, কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মাউইমা যাইবার সময় আমার দু'খানি হাত ধরিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখ বাবা, তোমাদের বড় বৌ রইল, ছেলেমানুষ, ওর কোন দোষ টোষ ধরো না।" বাটীর মধ্যের ওদের কাছেও নাম ধরিয়া, "মা পিনু, (প্রিয়ম্বদার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, বৌমা-সম্পাদিত) তুমি বড়, সৈরিণ ছোট, ছোট বোনের কোন অপরাধ নিও না;" ইত্যাদি আপ্যায়িত সুধাবর্ষণ করিয়া-ছিলেন।

মাউইমা যাই বলুন, এবার বড় বধূঠাকুরাণী কিন্তু পাকা গৃহিণী হইয়া আসিয়াছেন। আমার সহিত স্পষ্ট কথা না বলিলেও 'জনান্তিকে' ফাই ফর-মাইসটা চলে, অর্থাৎ আমার সমক্ষে ছোট বধূকে উপলক্ষ করিয়া "দিদি, ঠাকুরপোকে বলো" ইত্যাদি।—কিন্তু যাহাকে বলিতে বলিতেন, তাহার কোন কথা বলার প্রয়োজন হইত না,—আর বলিবেই বা কে? বড় বধূর সম্মুখে আমার সহিত কথা কওয়া দূরে থাক, সে এক গলা ঘোমটা দিয়া জুজু বুড়ীর মত এক পায়ে দাঁড়াইত। বধূর ও সব বালাই ছিল না। তাঁহার একটি ছেলে হইয়াছে, অতএব ঘোমটা মাথায় আশ্রয় পাইয়াছিল; ছোট বধূ এখন একটি পুত্র ও তিনটি কন্যার জননী, কিন্তু কেমন অবুঝ, এ পর্য্যন্ত ঘোমটার পরিমাণ কিছুতেই সে কমাইল না। আমার উপদেশ, নজির, সব বৃথায় গেল—বেনা বনে মুক্তা ছড়ান আর কি?

তা সে কথা যাক্। বড় বধূ ক্রমে ক্রমে গিন্নিপনার গুরুভার হইতে ছোট

বধূকে মুক্তি দিতে লাগিলেন। সে বেচারাও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বাটীর যে ঝি ছিল, সে নীচজাতীয়া, সে বাসনাদি মাজিত, উঠান ঝাঁট দিত, ফাইফরমাইস খাটিত, সুতরাং ছোট বধূর এখন কেবল কাজ রহিল, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা, ছেলেদের খাওয়ান, জল আনা, বাটনা বাঁটা, রাখাল কৃষাণদের ভাত দেওয়া, গৃহদেবতার সেবানুষ্ঠান করা, আর দুটি বেলায় কেবল চাট্টি রান্না আর পরিবেশন, এইমাত্র। আর বড় বধূর হাতে ভাঁড়ার ঘর খোলা, দেওয়া, আবার তেলটুকু নুনটুকু বের করা পর্য্যন্ত সব কাজ। যে ঝি আসিয়াছিল, সে কুটুম্ববাড়ীর লোক,—কাজেই সে শুধু খোকাকে লইয়াই থাকিত, আর মধ্যে মিশেলে, বড় বধূর ভাণ্ডারগৃহের কার্য্যে সাহায্য করিত! বড় বধূ এখন রাঁধিবার চাল নিজে মাপিয়া দেন, পলা গুণিয়া ঘি দেন, আর এক পোয়ার স্থানে পাঁচ ছটাক তৈল লাগিলে, পাকশালের অধিকারিণী ছোট বধূর নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন। আমি শুনি, আর হাসি, আর ছোট বধূকে বলি, "এবার কেমন শক্ত গিন্নির পাল্লায় পড়েছে?" সে বেচারীও হাসে। কিন্তু হায়! আগে কে জানিত বল, হাসি হবে আঁখিজল,—বড় বধূর ব্যবহার ক্রমে কটু হইতে কটুতর হইতে লাগিল। ছোট বধূর আর না কাঁদিয়া দিন যায় না। সে তবু নীরবে সকলই সহিত। তা, রামের বাণ না হয় সহা গেল, কিন্তু ঐ যে রামের অনুচর, তার কিচমিচি, আর দন্তবিকাশন, সেটা নিতান্তই অসহ্য। ঝিও কি না মাঝে মাঝে ছোট বধূকে তিরস্কার করিতে সাহস পায়। আমি এক দিন স্বকর্ণে শুনিলাম, ঝি ছোট বধূকে উপলক্ষ করিয়া তীব্রকণ্ঠে হাত নাড়িয়া বলিতেছে—"রোজ রোজ বারণ করি, তা শোন না কেন? চাকরদের অত ভাল তরকারী দেবার কি দরকার? তোমাদের ত আর রোজগার কর্‌তে হয় না যে, দরদ লাগবে? সোয়ামীর কড়ি হতো ত বুঝতে পার্‌তে।" ছোট বধূ কিছু উত্তর দিল কি না শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার আর সহ্য হইল না। ঝিকে কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিলাম, "ঝি, তুমি ঝি, ঝির মতই থাক্‌বে, ছোট মুখে বড় কথা কেন? মুখ সামলে চলো।" আর কি রক্ষা আছে! ঝির উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও "তোমার সঙ্গে এসে আমার এত অপমান" ইত্যাদি বচনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বধূঠাকুরাণীর কণ্ঠও কাণে গেল—সে কণ্ঠ আজ সপ্তমে বাঁধা। বধূঠাকুরাণী বলিতেছেন, "ও মুখ সামলাতে যাবে কেন, ও কারু খায় না পরে? না কারু গলগ্রহ হয়ে আছে? যদি এতই মান,

একটা কথা গায়ে না সয়, তবে নিজে রোজগার করে, আলাদা সংসার কল্লেই ত চুকে যায়। একটা ঝি আছে,—তা আর হিংসেয় বাঁচেন না,—কেন রে বাপু! আমি সাতে নেই, পাঁচে নেই, সাত জনার হাততোলায় পড়ে আছি, আমার সঙ্গে এত কেন? সাধ্যি থাকে, নিজের পয়সায় ঝি রেখে, যত ইচ্ছে অপমান কল্লেই ত হয়। আমার ঝিকে, কিছু বল্লে ভাল হবে না কিন্তু।"

আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, রাগে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। সেই ক্রোধান্ধ অবস্থায় কি যেন বলিতে যাইতেছিলাম, পিছু হইতে কে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল, "ছি! তুমিও কি পাগল হলে?" তাই ত ছোট বধূ ঠিক বলিয়াছে, বড় বধূর যে মেজাজ, তাতে আমি যদি সামান্য একটা কিছু বলি, তবে আর রক্ষা থাকবে না। সুতরাং সে দিন আমি আর বাক্‌নিষ্পত্তি করিলাম না। ভাবিলাম, দাদা আগে আসুন, তার পর যা হয় করা যাবে। কিন্তু এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে লাগিল। দাদা ইহার ভিতর দুই বার বাড়ী এলেন; বলি বলি করিয়া, দাদাকে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কেমন বাধ বাধ ঠেকিল।

এক দিন দাদা আর আমি বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, সহসা বড় বধূর কণ্ঠ, কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়া মরমে পশিল। "বসে বসে কেবল শূয়রের পাল বিওবেন, আর জ্ঞাতিবাদ সাধবেন!" বেশ বুঝা গেল, সে বাক্যবাণ ছোট বধূর উদ্দেশেই বিক্ষিপ্ত। কিন্তু দাদাও যেন সে স্বরশরে কিঞ্চিৎ আহত হইলেন। আমি কথাটি শুনিয়াছি কি না, সন্দেহে দাদা আমার দিকে চাহিলেন; আমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া শেষ মুখ নত করিলেন। দাদা বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। "কি পাগলামি করে"—বলিয়া উঠিয়া বড় বধূর ঘরে প্রবেশ করিলেন। আবার বড় বধূর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"কি অন্যায় কথাটাই বলেছি,—অত ভয় করে থাকা আমার পোষাবে না। * * * তা আর চুপ চুপ কি? আমার কাছে এত ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই, আমার স্পষ্ট কথা। আমি অত অসইরন সইতে পারিনে। * * * কেন, আমি চুরী করেছি না ডাকাতি করেছি। ওঁরা বসে বসে গেরস্থালিটা পয়মালে দেবেন, আর তাই বুঝি চুপ করে দেখ্‌তে হবে? অত আহ্লাদ আমার কাছে খাটবে না।"

এবার দাদার কণ্ঠস্বর শুনা গেল। দাদা কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তোমার তাতে কি? তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?" আর যাবে কোথা? বড়

বধূর রোদনে ঘর ভরিয়া গেল · রোদনের সঙ্গে সঙ্গে শুনা গেল, "তা ত বটে, আমার মাথা ব্যথা হবে কেন? যত ব্যথা ওঁর ভাইয়ের আর ভাজের। তা থাক না কেন ভাই আর ভাজ নিয়ে; আমার বল্‌বার কি গরজ? আমাকে আজই বিদায় করে দাও। না দাও ত দিব্যি আছে।" দাদা ঊর্দ্ধফণ ফণীর মত গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন রণে ভঙ্গ দিয়া ফিরিলেন যেন কেঁচোটি! দাদা আপন মনে বলিতে বলিতে এলেন—"কি আপদই জুটিয়েছি।" দাদা যে ক'দিন বাড়ী ছিলেন, তাঁর দিন বড় অশান্তিতেই কাটিল। বড় বধূ কিছুতেই বর্গ মানেন না। হাত চেয়ে আম বড়, এ বড় প্রমাদ। দাদা বাটী হইতে রওনা হইবার দিন, আমায় কাতরভাবে বলিলেন, ভাই! "আমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু এখন আর উপায় কি? মৃত্যু পর্য্যন্ত আমায় এই ভোগ ভুগতে হবে। আমার মুখ চেয়ে, সব সহ্য কর ভাইটি আমার! গায়ের ক্ষত, এ যে ফেলবার নয় বিনু। আর, ও লোক নিতান্ত মন্দ নয়, তবে মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেলে, পাগলের মত হয়ে যায়, এই বড় বিপদ।" দাদার অবস্থা বুঝিতে বড় বাকী ছিল না, আজ আরও বুঝিলাম। তাঁর জন্য বড় ব্যথিত হইলাম।

দাদা এবার প্রায় তিন মাস বাটী আসিলেন না।

পূজার পূর্ব্বে আর বাটী আসিতে পারিবেন না, লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। খরচপত্র সব আমার নামেই পাঠাইতে লাগিলেন। বাটীর অশান্তি কাজেই দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

পূজার প্রায় পনর দিন পূর্ব্বে বড় বধূর সহসা যেন একটা পীড়া দেখা দিল। তিনি আর ভাল করিয়া আহার করেন না। মাথায় তেল দেন না। ফরসা কাপড় পরেন না।

পূজা আসিল, দাদাও বাটী আসিলেন। বড় বধূর পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, মূর্ত্তি মলিন, শরীর কৃশ, গায়ে খড়ি উঠিতেছে, মাথাটা যেন কাকের বাসা।

পূজায় কয় দিন কোনরূপে কাটিয়া গেল। একাদশীর দিন প্রাতে, দাদা বাটীস্থ সমস্ত পরিবারবর্গের সাক্ষাতে আমায় বলিলেন, "বিনয়! আর আমাদের একত্র থাকা পোষায় না। তোমার হাতে সংসারের ভার থাকিতে বাটীর বড় বধূর পরণে কিনা ছেঁড়া কাপড়, মাথা রুক্ষ, আর খাওয়া অভাবে মানুষটি যেন ছ'মাসের রোগী, আমি ত মাসে মাসে মুঠো মুঠো টাকা পাঠাই, তবে এমন হয় কেন? 'লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষা মাগা!' এ সব কি সহ্য হয়! "আমি ত অবাক; পরে

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আসল ব্যাপার বলিতে যাইতেছিলাম, দাদা বলিয়া উঠিলেন, "থাক্ থাক্, আর ঢাকিবার দরকার নাই। ঝির মুখে ও সব শুনেছি।"

আমার কথায় দাদার অবিশ্বাস, বড় মর্ম্মাহত হইলাম, চক্ষে জল আসিল, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে দাদাকে বলিলাম, "আপনি যাহা ভাল বুঝেন, করুন।" অভিমানে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

দাদা যে এমন করিবেন, তা যে স্বপ্নের অগোচর! বৌমা, আজ তুমি কোথায়? বেলা ১১টার সময় বাটী ফিরিলাম। দেখি, সব ঠিকঠাক। ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র, বিছানা, দাদা সব বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, চুল চিরে ভাগ কিন্তু বিষয়সম্পত্তি যা—সবই যে দাদার নামে, আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, তিনটি কন্যা গলায় বাঁধা।

ছোট বধূ বিষণ্ণবদনে রাঁধিতেছেন, আর ছেলে মেয়েগুলি তাহার কাছে বসিয়া আছে, সকলেই যেন স্ফূর্ত্তিহীন।

আমিও সেইখানে একটু দূরে বসিলাম।

বড় বধূর আজ বড় ধুমধাম, আজ তাঁহার রন্ধনের আয়োজনই বা কত সেই ঝি কাছে বসিয়া জোগাড় দিতেছে, আর মাউইমাকে আনিবার ব্যবস্থা-পত্রের খশড়া করিতেছে। আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা জানিতে পারিয়াই যেন তাঁহাদের কথোপকথন অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে আরম্ভ হইল ঝির কি একটি কথার উত্তরে বড় বধূ বলিলেন, "দেখুক এখন—কত জলে কত মুশুরি ভেজে।"

আমি বসিয়া বসিয়া সব শুনিতেছি, আর কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় দাদা বাড়ী আসিয়া আমার বড় মেয়ে সুশীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুশু, বৌমার কাছ থেকে একটু তেল আন্‌ত। স্নান করে আসি।" আমি প্রাতেই স্নান করিতাম। দাদা তেল মাখিয়া স্নান করিতে গেলেন, গামছা মাথাতেই ছিল। "বৌমার কাছ থেকে তেল নিয়ে আয়!" দাদার আবার একি ছল? কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা কি?

ভাত প্রস্তুত। ছোট বধূ আমায় আহার করিতে ডাকিলেন। সত্যই আমার কান্না আসিল। "দাদার সহিত পৃথক হইয়া খাইতে হইবে?" আমার ছেলের আর আমার দু'খানি আসন পাতা। আমি তখনও কি ভাবিতেছি; ইতিমধ্যে দাদা স্নান করিয়া আসিলেন; আমারই একখানি কাপড় লইয়া

ছাড়িলেন; তার পর, "বিনু, চল খেতে যাই" বলিয়া সেই আসনে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "বৌমা ভাত আন!" আমি ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। দাদার দ্বিতীয় ডাকে, মন্ত্রমুগ্ধবৎ আহারে বসিলাম। দাদা বেশ হাসিতে হাসিতে অন্য দিনের মত গল্প করিতে করিতে আহার শেষ করিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, দাদার একি কাণ্ড!

ঝি আমার সহিত দাদাকে আহার করিতে দেখিয়া গিয়া বড় বধূ ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিল। ভীমমূর্ত্তি বড়বধূ তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই ত গালে হাত দিলেন। তার পর, কি বলিতে যাইতেছিলেন, দাদা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "কি দেখ্‌চ? তোমার ভিন্ন হতে বড় সাধ, তাই তোমাকে ভিন্ন করে দিলাম। আমি আর বিনু কি ভিন্ন?"

আনন্দে আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল,—তবে দাদা আমার সেই দাদাই আছেন।

ভাঙ্গা ঘর আবার জোড়া লাগিল। বড়বধূর মেজাজ যেন কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইল। সে ঝি কিন্তু বিদায় পাইল।

সেক্সপীয়র।

তৃতীয় প্রস্তাব।

সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণের প্রণালী কিরূপ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহার চিত্র সুসম্পূর্ণ; বিকৃত, অপর্য্যাপ্ত, বা অঙ্গহীন নহে। তাঁহার চরিত্রচিত্রণ সত্যনিষ্ঠ, যথাযথ, এবং সর্ব্বত্র সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলী বিবিধ বিচিত্রতায় পূর্ণ, এবং তাহার চিত্রণে আমরা মানবচরিত্র বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম ভেদজ্ঞানের পরিচয় পাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদার অপক্ষপাতিতা এবং অপরিসীম উপেক্ষাভাবে বিস্মিত হইতে হয়। এবং ধারণা হয় যে, তিনি সর্ব্বত্র সমান সহানুভূতিশালী। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহ প্রাণময় জীবন্ত নরনারী, এক কথায় সজীব মনুষ্য। তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করেন।

চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলেন। সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে একটা বিচিত্রতা, একটা বিপুলতা, একটা হ্রাসবৃদ্ধির ভাব আছে। তাহারা বর্ত্তমানে সীমান্বিত নহে; তাহাদের জীবনের একটা ভূত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তি আছে।

এক কথায় বলিতে গেলে সেক্সপীয়র চরিত্রচিত্রণে সিদ্ধহস্ত। চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার দক্ষতা, নিপুণতা অদ্ভুত ও অপরিসীম। এই দক্ষতা নিপুণতা তিনি কোন্ প্রতিভাবলে লাভ করিয়াছিলেন? অমানুষী কল্পনাশক্তিতে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

আমি দেবদত্তকে ঘনিষ্ঠরূপে চিনি, তাঁহার চরিত্রের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে। আমি অনুমান করিয়া বলিলাম যে, দেবদত্ত অবস্থার বিপর্য্যয়ে দরিদ্র হইলে অভিমানে লোকালয় বর্জ্জন করিবেন। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা গেল যে, দেবদত্ত দারিদ্র্যভারে প্রপীড়িত হইয়াও জনসমাজে পূর্ব্বের মত বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা। আমি মনে করিতাম, দেবদত্তকে চিনি; এখন বুঝিলাম, তাঁহার প্রকৃতির সহিত আমার বাস্তবিক পরিচয় ঘটে নাই। প্রকৃত দেবদত্তকে আমি চিনি না। আমার আর এক পরিচিত ব্যক্তি রত্নদত্ত। তাঁহার প্রকৃতির সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। রত্নদত্ত ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, উন্নত চরিত্রের পুরুষ। রত্নদত্তের একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা হইল। আমি অনুমান করিলাম, ইহাতে রত্নদত্তের ঈশ্বরভক্তি দৃঢ়তর হইবে, ফলতঃ তাহাই হইল। রত্নদত্তের ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইল। আমি অনুমান করিলাম, ইহাতে রত্নদত্তের হৃদয়ে প্রগাঢ় বৈরাগ্যের উদয় হইবে; ফলতঃ তাহাই হইল। দেখিলাম, আমার অনুমান সত্য। বস্তুতঃই রত্নদত্তের চরিত্রের সহিত আমার প্রকৃত পরিচয় হইয়াছে।

আমি রত্নাবলীর সহিত পরিচিত নহি; তাঁহার নাম শুনিয়াছি মাত্র। সংবাদপত্রে এক দিন তাঁহার একটা কীর্ত্তির কথা পড়িলাম। আর এক দিন শুনিলাম, তিনি একটা প্রকাণ্ড লোভের মধ্যে পড়িয়া আত্মসংবরণ করিয়াছেন। পরে তাঁহার সম্বন্ধে একটা গণনা করিলাম। স্থির করিলাম যে, অমুক অবস্থায় পড়িলে রত্নাবলী এইরূপ করিবেন। আমার গণনা ফলিল না; আমার অনুমান মিথ্যা হইল। বুঝিলাম, রত্নাবলীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোন সঠিক জ্ঞান জন্মে নাই।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বিজ্ঞান উন্নতির চরম ফল গণনা-সাফল্য। যে বিজ্ঞান শাস্ত্র যতটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সাহায্যে ভবিষ্যৎগণনা ততটা সঠিকরূপে করা যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেই জন্য এক শতাব্দী পরে যে সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ হইবে, আজ তাহার সঠিক গণনা করা যায়। বৃষ্টি-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে নাই, সেই জন্য কত দিনে কি পরিমাণ ঝড় বৃষ্টি হইবে, তাহা ঠিক গণিয়া বলা যায় না।

বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলেন, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের বিষয়েই তাহা বলা যায়। জ্ঞানের স্বধর্ম্মই এই যে, জ্ঞানবানকে গণনা-শক্তি-সম্পন্ন করে। দেবদত্তের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ ঠিক গণিয়া উঠিতে পারি নাই ; তাহার কারণ এই যে, দেবদত্তের চরিত্র সম্বন্ধে আমার যথার্থ জ্ঞান ছিল না। রত্নাবলীর প্রকৃতি বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হয় নাই বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইল। আর রত্নদত্তের স্বভাব বিষয়ে আমার প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছিল বলিয়াই তাহার ভাবী কার্য্যাকার্য্য আমি ঠিক গণিয়া বলিতে পারিয়াছিলাম। অতএব গণনার সাফল্য-বৈফল্য জ্ঞানের প্রকর্ষ-নিকর্ষের সম্পূর্ণতা অপূর্ণতার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। রত্নাবলী, দেবদত্ত ও রত্নদত্তের অনুরূপ নরনারীকে নাটকের পাত্রপাত্রী করিয়া আমি এক মহা-নাটক লিখিয়া অমরতা সঞ্চয় করিবার সংকল্প করিলাম। একটা যে বড় দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা প্রথমটা বুঝিলাম না। আখ্যায়িকা হইলে, যাহা হয় একটা করিয়া তুলিতে পারিতাম। কারণ, পাত্রপাত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা আছে, চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া কাহাকে বা নিন্দাবাদ, কাহাকে বা সাধুবাদ উপহার দিয়া হয় ত একটা জাঁকাল রকমের চরিত্র বর্ণনা করিতে পারিতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা ঘটিল না। কারণ নাটককারের পক্ষে চরিত্রবর্ণনা যথেষ্ট নহে, চরিত্রচিত্রণ আবশ্যক। এখন বর্ণনা ও চিত্রণে অনেক প্রভেদ। কারণ চরিত্র চিত্রিত করিতে হইলে পাত্রপাত্রীর ঘটনাবিশেষের সংস্থানে যেরূপ কার্য্য করা সঙ্গত, ভাববিশেষের আবেশে যেরূপ কথা সম্ভব, নাটকের মধ্যে আমাকে সেইরূপ কার্য্য করাইতে হইবে, সেইরূপ কথা বলাইতে হইবে। মনে করুন, রত্নাবলীর হৃদয় প্রথম প্রণয়ের অরুণরাগস্পর্শে বিকশিত হইয়াছে ; সে এরূপ অবস্থায় কিরূপ কথা বলা সম্ভব, আমাকে তাহার সঠিক অনুমান করিতে হইবে। দেবদত্ত প্রণয়িনীকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়াছে। সে এরূপ ঘটনায় কিরূপ কার্য্য করিবে, কিরূপ কথা বলিবে, আমাকে তাহা ঠিক গণিয়া বলিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক পাত্রপাত্রী যে কয়টি কথা বলিবে, বা যে কয়টি কার্য্য করিবে, প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে আমাকে গণনা করিতে হইবে। যদি আমার অনুমান প্রকৃত হয়, যদি আমার গণনা ঠিক হয়, তবেই আমার চরিত্রাঙ্কন সত্যানুগত হইবে, তবেই আমার চরিত্রসৃষ্টি যথাযথ হইবে। তাহা হইলেই আমার অমরতালাভের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে, অন্যথা নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গণনার সাফল্য বৈফল্য জ্ঞানের প্রকর্ষ-নিকর্ষ সাপেক্ষ। অতএব নাটকের পাত্রপাত্রীর চরিত্র বিষয়ে যদি আমার যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকে, তবেই আমার অনুমান সত্য হইবে, আমার গণনা সফল হইবে, অন্যথা হইবে না।

উক্ত নাটকের দুই অঙ্ক শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেখিলাম যে, এক জন দেশভক্তের অবতারণা না করিলেই নয়। এবার বড় বিপদে পড়িলাম। কারণ রত্নদত্ত, দেবদত্ত ও রত্নাবলীর চরিত্র আমার পরিচিত নরনারীর চরিত্রের প্রতিকৃতি লইয়া আঁকিতেছিলাম ; কিন্তু দেশভক্তের প্রকৃতি আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কিন্তু উপায় কি ? অমরতার সাধে ত আর জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। সুতরাং কল্পনার সাহায্য লইতে হইল। দেশভক্তের যেরূপ ভাব ভঙ্গী ভাষা কার্য্য, সেই সমস্তের সমাবেশ করিয়া এক অভিনব চরিত্রের সৃষ্টি করিলাম। যদি আমার কল্পনা তেজস্বিনী হয়, যদি চরিত্রের উপাদান সকল মিশাইতে পারিয়া থাকি, তবেই একটি ঠিক মানুষ গড়িলাম। সে সজীব সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইল। আর যদি আমার কল্পনাশক্তি দুর্ব্বল হয়, যদি আমি চরিত্রের উপাদান সকল পুঞ্জীভূত করিয়া থাকি মাত্র, রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত করিতে না পারিয়া থাকি, তবে এক কিম্ভূতকিমাকার জীবের গঠন করিলাম মাত্র। আমার অমরত্বের সাধ হৃদয়েই বিলীন করিতে হইল। আমার নাটক পাঠোপযোগী হইল না।

উপরে আপনাকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়া চরিত্রচিত্রণের যে সকল প্রণালী সূত্রের সূচনা করিলাম, সেক্সপীয়র সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে তাহার উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইবে। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে সেক্সপীয়রসৃষ্ট চরিত্রাবলীর যাথাতথ্য সত্যানুগততার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। দেখিয়াছি যে, সেক্সপীয়র যেরূপ যথাযথ চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, অন্য কবির কার্য্যে

তাহা দুর্লভ। মানব-প্রকৃতি বাস্তবপক্ষে যেমন, সেক্সপীয়র তাহার ঠিক তেমনই ছাঁচ তুলিয়াছেন। কোথায়ও অতিরঞ্জন বা বিকৃত বর্ণন করেন নাই। কোথাও একটি রেখারও সংযোগ বা বিয়োগ করেন নাই। অতএব মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল, মানবচরিত্র যে তাঁহার বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সেক্সপীয়র-সৃষ্ট চরিত্রাবলীর একটি প্রধান বিশেষত্ব, তাহাদের বৈচিত্র্য। জগতের কোন কবিই এত বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এক বিধিসৃষ্টি ভিন্ন আর কোথাও এত বিবিধ বিচিত্রতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেক্সপীয়র শত শত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটি এক প্রকৃতির ব্যক্তি নহে। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টিতে পুনরুক্তি দোষ নাই। তাঁহার সৃষ্ট কোন দুইটি চরিত্র অস্বতন্ত্র নহে। প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে। কেলিবন ও টিটেনিয়া এবং মিরন্দা; বটম, থিসিয়ুস এবং প্রস্পেরো; পেরোলিস ও হটস্পার এবং পঞ্চম হেনেরি; ডোলটিয়ারসিট ও ইসাবেলা এবং ক্যাথিরিন; ক্লিয়োপেটরা ও রোজালিন্দ এবং ইমোজেন; জষ্টিস স্যালো ও জেক্স এবং হ্যামলেট—তাঁহার মহা নাটকের পাত্রপাত্রীগণ। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, অশেষ প্রকার মানবচরিত্রের সহিত সেক্সপীয়রের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। মানব-প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল।

মানবের প্রকৃতি বিষয়ে যাহা বলা হইল, চিত্তবৃত্তি বিষয়েও সেই কথা বক্তব্য। মানুষের যত প্রকার ভাব আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রেম—সেক্সপীয়রের নাটকে সকল ভাবেরই যথাযথ সমাবেশ দেখিতে পাই। অতএব মানবের বিবিধ বিচিত্র চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধেও তাঁহার প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল—প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল।

মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা, মানুষের চিত্তবৃত্তিবিষয়ে এই প্রভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, সেক্সপীয়র কোথা হইতে পাইলেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর কি?

এ সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া সমালোচকগণ কিছু ফাঁফরে পড়িয়াছেন। কেহ তাঁহার নাটকে ব্যবহারাজীবের প্রণালী পদ্ধতির সহিত ভূয়িষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে আইন-ব্যবসায়ী, অন্ততঃ উকিলের অতি নিকটস্থ ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ তাঁহার নৌ-বিদ্যা বিষয়ে

প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নাবিক স্থির করিয়াছেন। এইরূপ কেহ তাঁহাকে ডাক্তার, কেহ ধর্ম্মযাজক, কেহ যোদ্ধৃপুরুষ, কেহ কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাহারও চেষ্টার সফলতা হয় নাই। কারণ, একের সিদ্ধান্তের সমর্থন পক্ষে যে প্রমাণ, অপরের পক্ষেও ঠিক তাহাই। তাঁহাকে উকিল প্রতিপন্ন করা যত সহজ, ডাক্তার প্রতিপন্ন করা তদপেক্ষা এক রত্তিও কঠিন নহে। যে যুক্তিবলে তিনি ধর্ম্মযাজক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ঠিক সেই প্রণালীর যুক্তিপ্রয়োগে তাঁহাকে সেনানায়ক প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্ববিধ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সমান অভিজ্ঞতা। তিনি যখন ফরাসিদেশের প্রান্তরে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সৈনিকের ছবি অঙ্কিত করেন, তখন মনে হয়, তিনি বুঝি আজীবন কেবল সেনাসংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি যখন বীচিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে নেপলসরাজের মজ্জমান অর্ণবযানের চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন মনে হয়, বুঝি তাঁহার সারা জীবন নাবিক-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি যখন মিসররাণী ক্লিয়োপেটরার বিলাস-শয্যার উপান্তে সারল্য ও বর্ব্বরতার প্রতিমূর্ত্তি সাপুড়িয়াকে স্থাপন করেন, তখন মনে হয়, বুঝি জন্মাবধি এই শ্রেণীর জীবই তাঁহার আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। আবার যখন তিনি অ্যাণ্টনি অথবা কোরায়োলেন্স অথবা ম্যাকবেথ অথবা ইয়াগো অথবা ফলষ্ট্যাফ অথবা প্রস্পেরো অথবা সাইলক অথবা লিয়র অথবা হ্যামলেট অথবা টাইমনের বেশে বহুরূপী সাজিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি কি ছিলেন এবং কি না ছিলেন, কি জানিতেন অথবা কি না জানিতেন, কোন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, কোন্ বিষয়ে না ছিল, এ সকল নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা বিভোর মনে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকি, এবং অন্তরে অন্তরে অনুভব করি যে, তিনি সাধারণ মানুষের মত দেখিয়া শিখিয়া, বুঝিয়া শুনিয়া কিছু জানেন নাই বুঝেন নাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা ভূয়োদর্শনজনিত নহে। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী স্বতন্ত্র।

এইরূপে তাঁহার নাটকে বিচিত্র চিত্তবৃত্তির, বিবিধ ভাবের যথাযথ প্রতিকৃতি দেখিয়া অনেক সমালোচক অনুমান করিয়াছেন যে, তিনি যে সকল ভাবের স্বরূপচিত্র তাঁহার নাটকে ফুটাইয়াছেন, তাহা স্বয়ং অনুভব করিয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। এই জন্য কিংজন নাটকে পুত্র আরথরের বিয়োগবিধুরা জননী কনস্টন্সের মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বর শুনিয়া

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ নাটক রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি পুত্রবিয়োগের অরুন্তুদ যাতনায় পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবি-জীবনের শেষভাগে বিরচিত সিম্‌বেলিন বা উইন্‌টারস্‌ টেল নাটকে দীর্ঘবিচ্ছেদের পর পতি-পত্নীর পুনর্ম্মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ঐ সময়ে সেক্সপীয়র গার্হস্থ্য জীবনে পুনঃপ্রবেশ করিয়া নির্য্যাতিতা প্রণয়িনীকে পুনরায় হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। আবার কোন সমালোচক প্রেমবৈচিত্র্যে তরঙ্গায়িত প্রণয়-কাব্য-জগতের সারভূত সেক্সপীয়রের সনেট কবিতাবলীর রসাস্বাদ করিয়া—পূর্ব্বরাগ রসাভাষ মিলন বিরহ ঈর্ষ্যা অভিমান নৈরাশ্য নির্য্যাতন প্রভৃতি ভাবশবলতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সেক্সপীয়রকেই সনেটে চিত্রিত প্রেমনাটকের নায়ক, তাঁহার এক বা একাধিক প্রণয়িনীকে তাহার নায়িকা, এবং তাঁহার এক অবিশ্বাসী বন্ধুকে তাহার উপনায়ক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সকল সিদ্ধান্ত যে একবারে অসম্ভব বা অমূলক, তাহা বলিতেছি না। হয় ত ইহাদের ভিত্তিতে কতকটা সত্য নিহিত আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, যদি ঐ ঐ কারণে সেক্সপীয়রকে পুত্রশোকাতুর, পত্নী-মিলন-হর্ষোচ্ছ্বসিত, অথবা প্রেমবৈচিত্র্যে উদ্বেল-হৃদয় মনে করা সঙ্গত হয়, তবে প্রেমাতুর রোমিওর প্রথম প্রণয়োচ্ছ্বাস দেখিয়া, ঈর্ষ্যাজর্জ্জরিত ওথেলোর মর্ম্মবেদনা শুনিয়া, নির্য্যাতন-গ্রস্ত লিয়রের অভিশাপবহ্নিতে নির্দগ্ধ হইয়া, শোণিতকর্দ্দমাক্ত ম্যাকবেথের নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবসাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, কবি-দার্শনিক হ্যামলেটের জীবনসমস্যার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানে কর্ণপাত করিয়া, এবং নরদেবী টাইমনের বিকট আর্ত্তনাদে বধিরিত হইয়া আমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করিব? ইহা হইতে কি এই নিশ্চয় করিব যে, সেক্সপীয়র ঐ সকল অসাধারণ ভাব স্বয়ং অনুভব করিয়া তবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন? অর্থাৎ, তিনি একাধারে ম্যাকবেথ হ্যামলেট ওথেলো লিয়র টাইমন অ্যাণ্টনি সিজার পম্পুমস ব্রুটস্‌ রোমিও হটস্পার হেনরি কেলিবন প্রস্পেরো ফলস্‌ট্যাফ প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন মনুষ্য ছিলেন। সুধু তাহাই নহে। এ মতে তিনি পুরুষ হইয়াও নারীহৃদয়ের অসাধারণ ভাবনিচয় অনুভব করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ংই দেসদিমোনা ওফিলিয়া মিরন্দা পরদিতা ইসাবেল পোরসিয়া রোজালিন্দ এমিলিয়া কুইকলি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিরুদ্ধপ্রকৃতিশালিনী রমণীও ছিলেন। তাহা কোন রূপেই সম্ভবপর মনে

হয় না। পরন্তু ইহাই মনে হয় যে, কি মানব-প্রকৃতি, কি মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি, কোন বিষয়েরই অভিজ্ঞতা সেক্সপীয়র ভূয়োদর্শন দ্বারা লাভ করেন নাই। তাঁহার এ সম্বন্ধে প্রভূত ও পর্য্যাপ্ত জ্ঞান অনুভবসিদ্ধ নহে। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী সাধারণ মানুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রণালী কি? যদি সে প্রণালীর আমরা স্বরূপনির্ণয় করিতে পারি, তবে সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়রের কবিপ্রতিভার কি মূলতত্ত্ব বা বীজশক্তি, তাহাও নির্ণয় করিতে পারিব। অতএব একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ঐ প্রণালীর স্বরূপনির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, যে কিছু পদার্থ আমাদের জ্ঞান অথবা কল্পনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, বৃক্ষ নদী পর্ব্বত পশু পক্ষী নরনারী, প্রত্যেকেই কতকগুলি গুণ এবং ক্রিয়ার সমষ্টি। প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি অবয়বের সংহতি। একদা পথে যাইতে যাইতে একটি বৃক্ষ আমার নয়নগোচর হইল। দেখিলাম, পত্র-পুষ্পমণ্ডিত হইয়া বৃক্ষটি পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। কৌতূহলী হইয়া বৃক্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, বৃক্ষটি পত্র শাখা কাণ্ড ফুল ফল ইত্যাদি নানা অংশে বিভক্ত। দেখিলাম, বৃক্ষটির আকার আছে, গঠন আছে, হরিৎবর্ণ আছে, মধুর গন্ধ আছে, কঠিন স্পর্শ আছে; আরও কত কি গুণ আছে। আরও দেখিলাম যে, বৃক্ষটি বায়ুতে স্পন্দিত হইতেছে। শিকড় মুখে রস শোষণ করিতেছে। পত্রহস্তবিস্তার করিয়া সৌরকররাশি আদান করিতেছে। আরও কত কি ক্রিয়া চলিতেছে। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে, বৃক্ষ আর কিছুই নহে, কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র।

বৃক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। প্রত্যেকেই বহুতর অবয়বের সংযোগে রচিত। প্রত্যেকেই বহুবিধ গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি। কোন পদার্থের গঠন জটিল, কাহারও গঠন সরল; অর্থাৎ, কোন পদার্থের সংহত অবয়বসমূহ সংখ্যায় অত্যল্প, কাহারও অত্যধিক। আবার কোন পদার্থ ক্ষুদ্র, কেহ বা মহান্; অর্থাৎ কোন পদার্থের পরিচায়ক গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি অল্প, কাহারও বৃহৎ। এইরূপে পদার্থের মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়। বুঝিয়া দেখিলে মানবচরিত্রের মত দুর্গম জটিল পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। কারণ, ইহার সংহত অবয়বসমূহ সংখ্যায় অত্যধিক। আর মানবচরিত্রের পরিচায়ক গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি অতি বৃহৎ। সেই জন্য

মানবপ্রকৃতিকে অতি মহান্ পদার্থ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে পদার্থের গঠন সরল. যে পদার্থ ক্ষুদ্র, তাহার জ্ঞান অনায়াসগম্য, সাধারণ বুদ্ধির লভ্য। কিন্তু যে পদার্থের গঠন দুর্গম জটিল, যে পদার্থ মহান্, তাহার জ্ঞান সহজে লাভ করা যায় না, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহার ধারণা করা যায় না।

আমি একান্তে বসিয়া কল্পনার সাহায্যে কোন পদার্থ রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ চেষ্টার প্রণালী কিরূপ? সেই পদার্থ যে যে অবয়বসংযোগে গঠিত, প্রথমতঃ সেইগুলি কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। মনে করুন, আমি বৃক্ষ কল্পনা করিতেছি। বৃক্ষের শাখা কাণ্ড পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি কল্পনাবলে গঠিত করিতে হইবে। যদি আমার কল্পনাশক্তি দুর্ব্বল হয়, তবে বৃক্ষের সমস্ত অবয়বগুলি আমি এককালে চিত্তে ধারণা করিতে পারিব না। সুতরাং আমার দ্বারা বৃক্ষরচনা দুঃসাধ্য হইবে। যদি কল্পনার বিষয়ীভূত পদার্থের গঠন সরল হয়, সে পদার্থ যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে কল্পনাবলে তাহার সৃষ্টি করা সহজ হইবে। কিন্তু সে পদার্থ যদি মহান্ হয়, তাহার গঠন যদি দুর্গম জটিল হয়, তবে তাহার সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য হইবে।

এইরূপে বৃক্ষের সংহত অংশগুলি রচনা করিয়া ক্রমশঃ যে গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি লইয়া বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, সেই সমষ্টি কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সমষ্টি যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে তাহার কল্পনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। কিন্তু এই সমষ্টি যদি বৃহৎ হয়, তবে তাহার রচনা অতি কঠিন হইবে। আমার কল্পনাশক্তি যদি দুর্ব্বল হয়, তবে এ কার্য্য বোধ হয়, আমার অসাধ্য হইবে। কিন্তু আমার যদি প্রবল কল্পনাশক্তি থাকে, তবে হয় ত আমি সেই বৃহৎ সমষ্টিকে কোন মতে কল্পনাবলে পুনর্গঠিত করিতে পারিব। যদি কল্পনীয় পদার্থের সমস্ত অবয়ব ধারণায় আনিতে পারি, কল্পনার সাহায্যে তাহার নিখিল গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টির পুনর্গঠন করিতে পারি, তবেই আমার মনঃসৃষ্ট পদার্থ সুসম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ যথাযথ হইবে, অন্যথা হইবে না।

কল্পনীয় পদার্থ যদি সাকার না হইয়া নিরাকার হয়, স্থূল না হইয়া যদি সূক্ষ্ম হয়, কল্পনার বস্তু যদি বৃক্ষ না হইয়া মানবচরিত্র হয়, তবে এই কল্পনা-সৃষ্টিকার্য্য কিরূপ দুরূহ ব্যাপার হইবে! আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মানবচরিত্রের মত দুর্গম জটিল পদার্থ আর নাই। আর যে গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি লইয়া মানব চরিত্র, সে সমষ্টিও অতি বৃহৎ। অতএব কল্পনাবলে মানব-চরিত্রের পুনর্গঠন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। অতিতেজস্বিনী কল্পনার অধিকারী না

হইলে এ ব্যাপারে সফলতা লাভ করা যায় না। অতি পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র কল্পনার সাহায্যে কেহ যদি পুনর্গঠিত করিতে প্রয়াস করেন, তবে কল্পনাবলে সে চরিত্রের যথাযথ অনুকৃতি রচনা কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা পরীক্ষা দ্বারা অনুভব করিতে পারেন। আর সে চরিত্র যদি অর্দ্ধপরিচিত কিংবা অপরিচিত হয়, তবে মানস-সৃষ্টিকর্ত্তার রচনাপ্রয়াস যে সর্ব্বথা বিফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে আমি কল্পনাবলে বৃক্ষরচনা করিতে বসিয়াছি। যে সকল অবয়বসংযোগে বৃক্ষের গঠন, কল্পনার সাহায্যে তাহার পুনর্গঠন করিয়াছি। পরে যে গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি লইয়া বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, কল্পনা-বলে তাহারও সৃষ্টি করিয়াছি। অনেকে হয় ত ভাবিবেন যে, এত দূরে আমার বৃক্ষরচনা শেষ হইয়াছে। আমি কল্পনার সাহায্যে একটি সত্য-সঙ্গত যথাযথ বৃক্ষের প্রতিরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে তাহা নহে। রচনার জন্য যাহা প্রধান কার্য্য, যাহা অত্যাবশ্যক কার্য্য, তাহা আমি এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী, নর, নারী, সমস্তই জীবন্ত, কেহই প্রাণহীন মৃতবস্তু নহে। প্রত্যেক পদার্থের অভ্যন্তরে একটা জীবনী-শক্তি আছে, যে শক্তিবলে সেই পদার্থের নিখিল অবয়ব সুসংহত থাকে, যে শক্তি দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া সংসাধিত হয়, সমগ্র গুণ নিয়মিত হয়। সে শক্তি সেই পদার্থের জননী ও পালনী। ধান্যবীজে ধান্য হয় কেন, আম্র হয় না কেন? আম্রবীজে আম্র হয় কেন, ধান্য হয় না কেন? ইহার একমাত্র হেতু এই যে, প্রত্যেক পদার্থের এক একটি স্বতন্ত্র বীজশক্তি আছে। সেই শক্তির আধার বলিয়াই পদার্থের গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টি রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত; বৈজ্ঞানিক সংযোগে মিলিতমাত্র নহে। সেই জন্য বিভিন্ন বহু গুণের সমবায়ে এক পদার্থের সৃষ্টি হয়। বহুবিধ ক্রিয়া একই পদার্থে লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমি কল্পনাবলে বৃক্ষ সৃষ্টি করিতেছি। যদি কোন মতে বৃক্ষের যাহা বীজশক্তি, সেই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া আমার মনের মাটিতে বপন করিতে পারি, তাহা হইলে আম্রবীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে যেমন কাণ্ড-শাখা-পত্র-পুষ্প-সমন্বিত আম্রবৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ ঐ বীজশক্তি আমার মানসক্ষেত্রে বৃক্ষের একটি সত্যানুগত যথাযথ প্রতিরূপ সৃষ্টি করিবে। সেই প্রতিরূপে বৃক্ষের নিখিল গুণ ও সমগ্র ক্রিয়া রাসায়নিক সংযোগে সম্বদ্ধ হইয়া একীভূত হইবে। তখনই আমার প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষসৃষ্টি হইবে। অতএব

যদি মানুষ কোন পদার্থের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে ভূতস্রষ্ট্রী প্রকৃতির অনুকরণে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রথমতঃ কল্পনাধ্যানে সেই পদার্থের বীজশক্তিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। পরে সেই বীজ মানস-ক্ষেত্রে বপন করিয়া প্রকৃতির প্রণালীমতে ভিতর হইতে সেই পদার্থকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই পদার্থের যথার্থ পুনর্গঠন সিদ্ধ হইবে।

বৃক্ষ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, মানবচরিত্র সম্বন্ধেও ঐ কথাই বক্তব্য। প্রত্যেক চরিত্রেরই একটি বীজশক্তি আছে। ঐ শক্তিবলে তাহার সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত ভাব, সমস্ত ভাষা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চিন্তা নিয়মিত হয়। যদি কোন মতে ঐ বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া আমরা চিত্তভূমিতে বপন করিতে পারি, তবেই মানস-পটে সেই চরিত্রের যথাযথ প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিবে। তাহা হইলেই আমাদের সৃষ্ট চরিত্র সত্যনিষ্ঠ যথাযথ হইবে, অন্যথা হইবে না। কারণ, চরিত্রের গুণ দোষ কার্য্যাকার্য্য মিলিত করিলেই মনুষ্য সৃষ্টি হয় না, রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা তাহাদিগকে মিশ্রিত করিতে হইবে। এক যুগকাল তৈল ও জল মিলাইয়া রাখিলেও তাহা মিশ্রিত হয় না, কিন্তু অম্লজান ও জলজান রাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত একীভূত হইয়া নূতন বস্তুর সৃষ্টি করে। এইরূপে চরিত্রের বীজশক্তির সাহায্যে সমস্ত গুণ-দোষ কার্য্যাকার্য্য একীভূত হইয়া সজীব মনুষ্য-চরিত্র সৃষ্ট হয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করা যাইতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, ইংরাজ কবি ড্রাইডেন তীব্র বিদ্রূপের ভাষায় জিমরি নাম দিয়া বাকিংহামের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র বিরোধী বর্ণের সমাবেশে উজ্জ্বলীকৃত; বিদ্রূপ-কাব্যের শীর্ষস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঔপন্যাসিক স্কট তাঁহার উপন্যাসবিশেষে বাকিংহাম-চরিত্রের অবতারণা করিয়া ড্রাইডেনের বর্ণনার অনুকরণে সেই চরিত্র চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ, স্কট প্রতিভাবলে বাকিংহম-চরিত্রের যে বীজশক্তি, তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, সেই জন্য তিনি বাকিংহামে যে দোষগুণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। তাহারা পুঞ্জীভূত হইয়া এক বীভৎস জীবের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, মিশ্রিত ও একীভূত হইয়া মানবচরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সেক্সপীয়র যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহার সহিত তুলনা করিলে তাঁহার প্রণালীর ভেদ লক্ষিত

হইবে। তাঁহার ব্রূটস, অ্যাণ্টনি, কোরায়োলেন্স, হেনেরি, হটস্পার ঐতিহাসিক চরিত্র। ইতিহাসে তাহাদের দোষগুণ কার্য্যাকার্য্যের বিবরণ আছে। সেক্সপীয়র সে বিবরণের কোথাও অপলাপ করেন নাই। ঐতিহাসিক ব্রূটস, অ্যাণ্টনি, কোরাওলেন্স, হটস্পার, হেনরি যে যে দোষগুণের অধিকারী, যে যে কার্য্যাকার্য্যের অনুষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার ব্রূটস, অ্যাণ্টনি, কোরাওলেন্স, হটস্পার, হেনরীতে তিনি সেই সেই দোষগুণের, সেই সেই কার্য্যাকার্য্যের আরোপ করিয়াছেন। অথচ সেই সকল চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া সেই সকল দোষগুণ কার্য্যাকার্য্য এমন ভাবে মিশ্রিত করিয়াছেন যে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সজীব মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে। ব্রূটস, অ্যাণ্টনি, কোরাওলেন্স, হটস্পার, হেনরি জীবিত অবস্থায় যেরূপ ছিলেন, তাঁহার কাব্যে পুনর্জীবন লাভ করিয়া ঠিক সেইরূপই আছেন।

সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণপ্রণালীর যত দূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় প্রতীয়মান হইয়াছে যে, তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতেন। এই সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে বুঝা যায়, কেন তাঁহার চরিত্রচিত্রণ সজীব, সত্যনিষ্ঠ, সুসঙ্গত। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে সেক্সপীয়রের চরিত্রচিত্রণপ্রণালীর যে যে বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে, সে সমস্তই ঐরূপে চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিবার অবশ্যম্ভাবী ফল। এমতে আমরা ঐ সকল বিশেষত্বের প্রকৃত হেতু অনুধাবন করিতে পারি। সে জন্য আমাদের প্রাচীন সমালোচকগণের কষ্টকল্পনার ধাঁধায় পড়িয়া পথ হারাইতে হয় না।

চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করা কত কঠিন ব্যাপার, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। কি কৌশলে, কোন প্রতিভাবলে, সেক্সপীয়র এই কঠিন ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন? অতঃপর ইহাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক পদার্থ কয়েকটি অবয়বের সংহতি, এবং কতকগুলি গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক পদার্থেরই এক একটি বীজশক্তি আছে,—ঐ শক্তির প্রভাবেই সমস্ত অবয়ব সংহত থাকে, এবং সমগ্র গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টি নিয়ন্ত্রিত নিয়মিত হয়। সাধারণ মানব কল্পনাবলে ঐ অবয়বসংহতি, ঐ গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টি আপন চিত্তদর্পণে কথঞ্চিৎমাত্র প্রতিবিম্বিত করিতে পারে। কিন্তু ঐ প্রতিবিম্ব

সুসম্পূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ হয় না। কারণ, যে দর্পণে ঐ প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়, তাহা হয় ন্যুব্জ, না হয় কুব্জ; কদাচ সমতল নহে। সেই জন্য ঐ দর্পণ যথাযথ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ বিম্বিত পদার্থের প্রতিবিম্বের সহিত বিম্বগ্রাহক চিত্তের উপরাগ * মিশ্রিত হইয়া যে প্রতিকৃতির সৃষ্টি করে, তাহাতে পদার্থের স্বরূপ যথাযথ প্রতিফলিত হয় না। সেই জন্য সে প্রতিবিম্ব সত্যনিষ্ঠ হয় না।

সেক্সপীয়রের ব্যাপক সহানুভূতি, উদার অপক্ষপাতিতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দেখিয়াছি যে, তিনি সর্ব্বত্র সহানুভূতিশালী; কোন পদার্থেরই প্রতি দ্বেষযুক্ত নহেন। সেই জন্য তাঁহার চিত্তরূপ জাগতিক-দর্পণ পদার্থের যথাযথ প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ ছিল; কারণ বিম্বিত পদার্থের প্রতিকৃতির সহিত তাঁহার বিম্বগ্রাহক চিত্তের কোনরূপ উপরাগ মিশ্রিত হইত না। এই সহানুভূতিবলে তিনি সকল প্রকার চরিত্রে আত্মনিমজ্জন করিতে পারিতেন, নদী যেমন আপনা হারাইয়া সাগরে মিশ্রিত হয়, সেক্স-পীয়র সেইরূপ আপনার ব্যক্তিত্ব যখন যে চরিত্রের সৃষ্টি করিতেন, তাহাতে মিশাইয়া দিতেন। সৃষ্ট চরিত্রের সহিত একীভাব তাঁহার প্রতিভার এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। সেই জন্য তাঁহার এত গ্রন্থ মধ্যে কোথাও তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত মতামত জানা যায় না। তিনি এত বিভিন্ন ভাষায় কথা কহেন যে, তাঁহার মাতৃভাষা কি, তাহা জানা দুর্ঘট। যাহার মুখে যে কথা সাজে, যে মতামত যাহার প্রকৃতিসঙ্গত, তিনি তাহার মুখে সেইরূপ কথা, সেই মতামত বসাইয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার নাটকমধ্যে একই বিষয়ে বিভিন্ন ও বিরোধী মতামতের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

সাধারণ কল্পনাসৃষ্ট পদার্থের প্রতিরূপ সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ হয় না। কেন সত্যনিষ্ঠ হয় না, তাহা আমরা বুঝিয়া দেখিলাম। কেন সুসম্পূর্ণ হয় না, তাহার হেতু ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পদার্থের বীজশক্তি আয়ত্ত করিতে অপারগ বলিয়া সাধারণ কল্পনাশক্তি তাহার সুসম্পূর্ণ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু এই কল্পনাশক্তি যদি অসাধারণ হয়, অমানুষী হয়, তবে সেই কল্পনার অধিকারী অমানুষ কবি কল্পনীয় পদার্থের সুসম্পূর্ণ প্রতিরূপের সৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি প্রতিভাবলে কল্পনাধ্যান করিয়া সেই পদার্থের বীজ-শক্তি আয়ত্ত করেন। পরে সেই বীজ তাঁহার চিত্তভূমিতে উপ্ত হইয়া সমগ্র

* ইংরাজীতে এই উপরাগকে Personal element বলে।

পদার্থকে বিকশিত করিয়া তুলে। এইরূপে পদার্থের সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ প্রতিরূপ সৃষ্ট হয়। সেক্সপীয়রের কল্পনাশক্তি অমানুষী ছিল, তাহারই সাহায্যে তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া সত্যনিষ্ঠ ও সুসম্পূর্ণ চরিত্রাবলী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন। বিজ্ঞানবিৎ যেমন বৈজ্ঞানিক কল্পনার সাহায্যে কোনও বিলুপ্তজাতীয় পশুর ভূমধ্যপ্রোথিত অস্থির একাংশ দেখিয়া সমগ্র পশুশরীর পুনর্গঠিত করিতে পারেন, সেক্সপীয়রও সেইরূপ অমানুষী কবি-কল্পনার বলে চরিত্রের লেশমাত্র দেখিয়া সমগ্রচরিত্রের পুনর্গঠন করিতে পারি-তেন। শুনা যায়, কুভিয়ার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ অতীত কল্পের মাসটা-ডুন জন্তুর অস্থিপঞ্জরের একখান মাত্র হাড় দেখিয়া মাসটাডুন পশুর কিরূপ আকার গঠন দৈর্ঘ্য উচ্চতা ছিল, তাহা স্থির করিয়া তাহার একটা প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়রও সেইরূপ ওথেলো, হ্যামলেট, ক্লিওপেটরা, ইয়াগো, ব্রুটস, ম্যাকবেথ প্রভৃতির বিবরণ ইতিহাসে উপাখ্যানে বা নাটকা-ন্তরে পাঠ করিয়া ঐ চরিত্রের কোন একটা গুণ বা ক্রিয়ার লেশমাত্র অব-লম্বন করিয়া অমানুষী কল্পনাশক্তির সাহায্যে সেই সেই চরিত্র পুনর্গঠিত করিতে পারিতেন। যে সকল চরিত্র তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বকপোলকল্পিত, তাহাদিগের সম্বন্ধেও ঐ প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটিত না। সেই সেই চরিত্রের কোন একটা কল্পিত ঘটনা বা গুণ (যাহা নাটকের আখ্যানবস্তুর উপযোগী বা যাহার অব-তারণা উপাখ্যানের পরিণামসাধনের জন্য আবশ্যক) উপলক্ষ করিয়া সেই সেই চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিতেন; পরে তাহার উপর ভিত্তিরচনা করিয়া সমগ্র চরিত্র গড়িয়া তুলিতেন। শুনা যায়, ঐন্দ্রজালিক যাদুকর যাদু-বিদ্যার প্রয়োগস্থলীভূত ব্যক্তির সম্পর্কিত কোন একটা কিছু পাইলেই তাহার সমগ্র জীবনের উপর প্রভুত্বস্থাপন করিতে পারে। সেইরূপ সেক্সপীয়র কল্পনীয় চরিত্রের লেশমাত্রের সাক্ষাৎকার পাইলেই সমগ্র চরিত্র কল্পনাবলে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার কবিপ্রতিভার এমনই অদ্ভুত সামর্থ্য ছিল যে, তিনি চকিতমাত্রে যে কোন চরিত্রের সমগ্র প্রতিকৃতি চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত করিতে পারিতেন। সাধারণ মনুষ্য যেমন কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার মানসে একে একে তাহার অবয়বসমূহের সংস্থান করে, ক্রমে ক্রমে তাহার গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টির যোজনা করে, সেক্সপীয়র সেরূপ করিতেন না। তিনি অমানুষী কল্পনাবলে পদার্থের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া প্রতিভার বিদ্যুৎ আলোকে পদার্থের পূর্ণ প্রতিরূপ এক নিমেষে দেখিতে পাইতেন। চরিত্রের দেহ মন

আত্মা, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ভাবভঙ্গী, প্রকার, পদ্ধতি, সমস্তই দেখিতে পাইতেন। সেই জন্যই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র এমন সজীব সত্যনিষ্ঠ সম্পূর্ণ সুসঙ্গত হইত। সেক্সপীয়রের বিদ্যা বুদ্ধি অধিক ছিল না। তিনি লাটিন ও গ্রীক অত্যল্পই জানিতেন। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল। ইংরাজি ভাষায় তখন অনেক গ্রন্থ রচিত হয় নাই। সেই অনধিকসংখ্যক গ্রন্থই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। তিনি ইংলণ্ডের বাহিরে কখন পদার্পণ করেন নাই। অথচ মানবচরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত প্রর্য্যাপ্ত জ্ঞান, মানব ইতিহাস বিষয়ে প্রগাঢ় প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা তিনি কোথা হইতে পাইলেন? অমানুষী কল্পনাশক্তির নিকট হইতে। এই অমানুষী কল্পনাশক্তিই তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব, ইহার অধিকারী বলিয়াই তিনি মহাকবি সেক্সপীয়র।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফতেপুর শিক্‌রি।

আকবরের পরিত্যক্ত রাজধানী ফতেপুর শিক্‌রি আগ্রার দক্ষিণ-পশ্চিমে তেইশ মাইল দূরে অবস্থিত। সাধারণ অশ্বযানে আগ্রা হইতে যাইতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পথে দেখিবার জিনিসের অভাব নাই। পথের উভয় পার্শ্বে শস্যশ্যামল উর্ব্বরক্ষেত্র ও দুই একখানি বৃহৎ পল্লীগ্রামও দৃষ্ট হয়। নানা ক্ষুদ্র বিহঙ্গম নির্ভয়ে পথোপরি বিচরণ করে। শকুনি ও বায়সকুল পথিপার্শ্বে বৃক্ষকাণ্ডে বা প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া স্তিমিতলোচনে বিশ্রাম করে, লোক জনের গতায়াত গ্রাহ্যও করে না; কেহ নিতান্ত নিকটে আসিলে অলসভাবে এক আশ্রয় হইতে উঠিয়া অন্য আশ্রয়ে গিয়া উপবেশন করে। পথিপার্শ্বে পল্বলে সারসবলাকাদি নানাজাতীয় জলচর বিহঙ্গম কলরব করে। বিহগকূজিত প্রান্তরে সমুজ্জ্বলপক্ষধারী ময়ূরও বিরল নহে। ইহা ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, টিয়া পাখীর ঝাঁক উড়িতেছে, বসিতেছে; আর চিরচঞ্চল কাঠবিড়ালীরা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনাগমন করিতেছে।

ফারগুসনের মতে আকবরের স্থপতিশিল্পরুচিকৌশলের বিচার করিতে হইলে, ফতেপুর শিক্‌রি দেখিতে হয়। আকবরই এখানে গৃহাদিনির্ম্মাণের আরম্ভ করেন, তিনিই সে সকল সম্পূর্ণ করিয়া যান। অপর কোনও সম্রাট এখানে কোনও গৃহাদির প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

বহু শতাব্দীর পলিপড়া প্রান্তরের মধ্যে দেড় শত ফিট উচ্চ বালুকাময় প্রস্তরের গিরিমালার উপর ফতেপুর শিক্‌রি অবস্থিত। উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত ফতেপুর শিক্‌রি প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এখানে রাজধানীনির্ম্মাণের ও পরিত্যাগের কারণ জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। সে সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আকবর শাহের সকল সন্তান শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি সপরিবারে আজমীরের প্রসিদ্ধ পীর মইনুদ্দীনের দর্‌গায় গমন করেন। এই সুদীর্ঘ সাড়ে তিন শত মাইল পথ আকবর সপরিবারে পদব্রজে অতিক্রম করেন। প্রতিদিন তিন ক্রোশ পরিমাণ পথ অতিক্রান্ত হইত। বাদশাহের অসূর্য্যম্পশ্যা শুদ্ধান্তবাসিনীকে লোকচক্ষুর পাপদৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য পথের উভয়পার্শ্বে কাণাৎ (পর্দ্দা) সংস্থাপিত হইয়াছিল। আর কঠিন ধরণীতলস্পর্শে পাছে বাদশাহের, ততোধিক বেগমের কোমলপদপল্লবতল ব্যথিত হয়, সেই জন্য সমস্ত পথ কোমল কার্পেটে মণ্ডিত হইয়াছিল। দিবসের ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, নবাব ও বেগম যেখানে বিশ্রাম করিতেন, সেখানে একটি করিয়া ইষ্টকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত। দর্‌গায় উপস্থিত হইয়া "হত্যা" দিলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে, তাঁহাকে শিক্‌রির ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবাসী সেখ সেলিম চিস্তির নিকট যাইতে হইবে। সেই আদেশানুসারে আকবর শাহ সেই ছিয়ানব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সাধু সেলিম চিস্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, যোধাবাইয়ের গর্ভে আকবরের যে সন্তান জন্মিবে, সেই দীর্ঘজীবী হইবে। যোধাবাই তখন গর্ভবতী; কাজেই তাঁহার সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত আকবর সপরিবারে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অগষ্ট তারিখে যোধাবাই একটি পুত্র প্রসব করিলেন, রাজ্যে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইল। সেই সাধুপুরুষের নামানুসারে, আকবর সাহ পুত্রের মির্জ্জা সেলিম নামকরণ করিলেন। এই মির্জ্জা সেলিমই ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত।

তখন সর্ব্বদা সাধুর অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায়, আকবর নির্জ্জন শিক্‌রিতে রাজধানীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। সাধুর নির্জ্জন বাসস্থান জনকোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিল; সাধুর তপশ্চরণের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহার পর আকবর যখন শিক্‌রিতে রীতিমত দুর্গনির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন, তখন সাধু বলিলেন, "যদি আমার ক্ষমতায় তোমার আর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার ও আমার এক স্থানে বাস করা অসম্ভব। আমাকে এ স্থান হইতে শান্তিতে বিদায় লইতে দাও।" শুনিয়া আকবর বলিলেন, "তাহাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে দাসকে অনুমতি করিলে দাসই অন্যত্র গমন করে।" তখন বৃদ্ধ সাধু আগ্রা সম্রাটের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রাজাকে লইয়া রাজধানী; রাজার বাসস্থানপরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব রাজধানী শ্রীহীন। সম্রাটের আদেশে আগ্রার জনহীন প্রান্তর অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল, আর বন্যার জলের মত জনস্রোত ফতেপুর শিক্‌রি হইতে সরিয়া গেল। এখনও ফতেপুর শিক্‌রিতে সমুন্নত সৌধ ও প্রশস্ত পথ তেমনই রহিয়াছে; নাই কেবল নগরের জীবন, সৌধের সৌন্দর্য্য,—মানব। এখন সে পথে আর মানবপদধ্বনি ধ্বনিত হয় না, যেন আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত মৃতনগর; যেন কুশপরিত্যক্তা অযোধ্যা—

"যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়,
মুখর নূপুর চারু বাজিত চরণে;
আপনার পথ হেরি মুখের উল্কায়
সে পথে শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।"

"খোদিত্ত রমণীমূর্ত্তি স্তম্ভের উপর
ধূলায় বিবর্ণ হয়ে রয়েছে এখন;
তক্ত অহিচর্ম্ম পড়ি আছে বক্ষোপর
উরস আবরি যেন রয়েছে বসন।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও আরও অনেকের মতে পানীয় জলের অভাবই আকবরের ফতেপুর-ত্যাগের কারণ।

দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবেশ করিতে প্রথমেই "বুলন্দ দরওয়াজায়" মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ফারগুসনের মতে, ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ জগতে, আর কুত্রাপি কোন ধর্ম্মমন্দিরের এমন মনোরম দ্বার নাই।

বুলন্দ দ্বারের পার্শ্বে একটি প্রায় ত্রিশ ফিট গভীর স্বচ্ছসলিল সরোবর আছে। দর্শকদিগের নিকট হইতে কিছু "বক্‌শিস"-লাভের আশায় বালকগণ ও যুবকদল প্রায় সত্তর ফিট উচ্চ মসজিদ হইতে সেই সরোবরসলিলে লাফাইয়া পড়ে। বুলন্দ দ্বারের উপর আরোহণ করিলে, পরিত্যক্ত নগরী ও পার্শ্ব-

বর্ত্তী প্রান্তরের দৃশ্য নয়নসমক্ষে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। দ্বার অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রাঙ্গনের পশ্চিমাংশে বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন একটি মসজিদ অবস্থিত। প্রাঙ্গনের অপর তিন পার্শ্বেই তীর্থযাত্রীদিগের জন্য রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। মসজিদটি তিনটি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত গম্বুজের মুকুটে মণ্ডিত। মসজিদের দুই পার্শ্বের অংশ যাত্রিনিবাসের ন্যায় রক্তপ্রস্তরে গঠিত। মসজিদের মধ্যাংশ খিলান করা ও হর্ম্ম্যতল নানাপ্রকার জ্যামিতির চিত্রের মত চিত্রে সুন্দরীকৃত। মসজিদের প্রধান খিলানে লিখিত খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বুলন্দ দরওয়াজা ইহারও বহুদিন পরে (১৬০১ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের পশ্চাতে সেখ সেলিম চিস্তির শিশুপুত্রের সমাধি ও জাহাঙ্গীরের সূতিকাগৃহ। এখানে বসিয়া বৃদ্ধ সাধু আপনার ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। চত্বরের উত্তরাংশে দুইটি সমাধি অবস্থিত। একটি রক্ত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত, অপরটি অমলধবল মর্ম্মরের গঠন। ইহার বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত ধবলপ্রস্তরময় দেহ দূর হইতে সূক্ষ্মশিল্পকার্য্যবহুল চিক্কণবস্ত্রখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয়। এই সমাধিটি সেখ সেলিম চিস্তির। এই সমাধিমন্দিরাভ্যন্তরে শুক্তিখচিত মর্ম্মর আচ্ছাদনতলে তাঁহার দেহাবশেষ প্রোথিত। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই সমাধিনির্ম্মাণ শেষ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এই মন্দির নানা বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত ছিল। জাঠগণ সেই রত্নরাজি লুণ্ঠন করিয়া মন্দির শ্রীহীন করিয়া যায়। অপর সমাধিটি সেলিমের পৌত্র—জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী ইস্‌লাম খাঁর। অপর সমাধিটির সহিত তুলনায় ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

চত্বরের পূর্ব্বাংশে ষাট ফিট উচ্চ বাদশাহী দ্বারপথে বাহির হইয়া সোপানাবলী অতিক্রম করিলে, আবুল ফাজেলের ও তাঁহার ভ্রাতা ফয়জীর সুগঠিত নিবাসগৃহে উপনীত হওয়া যায়। এই গৃহ এক্ষণে বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার পরেই আকবরের প্রকৃত প্রাসাদাবলী। প্রথমেই অশ্বশালা; এখানে শতাধিক অশ্ব ও বহুসংখ্যক উষ্ট্র রাখিবার বন্দোবস্ত আছে; সাজসরঞ্জাম সকলই প্রস্তরের, তাই এতদিন পরে আজও কিছু নষ্ট হয় নাই। তৎপরে যোধাবাইয়ের মহল। একটি অত্যুচ্চ কারুকার্য্যবহুল দ্বার অতিক্রম করিয়া এই মহলে প্রবেশ করিতে হয়। উত্তরে ও দক্ষিণে প্রস্তরের ছাদবিশিষ্ট অনেকগুলি

প্রকোষ্ঠ; এগুলি গাঢ় নীলবর্ণে অতি সুন্দররূপে মিনা-করা। প্রাসাদ রক্ত-প্রস্তরের গঠন; কাজেই এই বর্ণবৈচিত্র্য যে অত্যন্ত নয়নারাম, সে কথা বলা বাহুল্য।

যোধাবাইয়ের প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে কতকগুলি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র গৃহ; সে সকলের মধ্যে মন্ত্রিবর বীরবলের গৃহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহ-নির্ম্মাণে লৌহ বা কাষ্ঠ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল রক্তবর্ণ বালু-প্রস্তরেই সমগ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের সর্ব্বাঙ্গ অতিসুন্দর কারুকার্য্য-খচিত;—দেখিলে প্রস্তরের গঠন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, যেন কোন জাপানী শিল্পী দন্তিদন্তের উপর নানা চিত্র খোদিত করিয়াছে। গৃহের উপরি-তল কয়টি গম্বুজে সুশোভিত। এই গৃহ এক্ষণে দর্শকদিগের বিশ্রামাগারে পরিণত হইয়াছে।

প্রাঙ্গনের অপরাংশে আকবরের খৃষ্টান বেগম মরিয়মের প্রাসাদ। এই প্রাসাদের দ্বারের উপরিভাগ বাইবেলে বর্ণিত নানা চিত্রে সুশোভিত। কিন্তু আকবরের পরবর্ত্তী গোঁড়া মুসলমানদিগের কৃপায় এখন তাহার অধিকাংশই বিনষ্টপ্রায়, শ্রীহীন। কেহ কেহ আকবরের খৃষ্টান মহিষীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কিন্তু যখন তাঁহার খৃষ্টান মহিষী থাকা না থাকা উভয় পক্ষেই উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, তখন এমন একটা মধুর জনশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিয়া লাভ কি? বীরবলের ও মরিয়ম বেগমের গৃহের মধ্যে উদ্যানে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র মসজিদ অবস্থিত; বোধ হয়, অন্তঃপুরচারিণীগণ এখানে উপাসনা করিতেন।

ইহারই নিকটে প্রসিদ্ধ "পঞ্চমহল"। ইহার প্রথম তলে ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ, তন্মধ্যে কোনও দুইটির গঠন একরূপ নহে। দ্বিতলে পঁয়ত্রিশটি ও ত্রিতলে পনেরটি ও চতুর্থতলে আটটি স্তম্ভ। সর্ব্বোপরি চারিটি স্তম্ভের উপর একটি গম্বুজ। এই পঞ্চমহলের কোন দুইটি স্তম্ভের মাতলার কারুকার্য্য একরূপ নহে। এই সুবৃহৎ গৃহ শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সমীরসেবনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহের দুইটি স্তম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একটি স্তম্ভ দুইটি করিকরে বিজড়িত; অপরটি, একজন মনুষ্য বৃক্ষ হইতে ফলচয়নে রত। কথিত আছে, শেষোক্তটি কোন বৌদ্ধমন্দির হইতে আনীত।

"খাসমহল" একটি প্রস্তরমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনমধ্যে একটি ক্ষুদ্র সরোবর,—পূর্ব্বে ইহাতে কয়টি ফোয়ারা ছিল। ইহার দক্ষিণে আকবর শাহের

শয়নমন্দির। প্রকোষ্ঠভিত্তি পারসীক রচনায় শোভিত। বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে অনেকগুলিই বাদশাহের প্রশংসাসূচক।

এই খাসমহলের এক কোণে আকবরের তুর্কি পত্নী স্তাম্বুলী বেগমের আবাসগৃহ। সমস্ত ফতেপুর শিক্‌রিতে এরূপ সুদৃশ্য প্রাসাদ অল্পই আছে। প্রাসাদাঙ্গে পশুপক্ষী প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক চিত্র ক্ষোদিত। একাংশে একটি অতি সুন্দর আরণ্য দৃশ্য চিত্রিত। স্তম্ভগুলিও নানাপ্রকার ক্ষোদিত পত্রপুষ্পে সুশোভিত।

আর একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গনপ্রান্তে "দেওয়ান-ই-খাস" অবস্থিত। হর্ম্ম্যতল দশ পঁচিশ খেলার ছক। এই অদ্ভুত অট্টালিকানির্ম্মাণের কোনও কারণই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, ইহা একটি costly architectural freek মাত্র। বহির্দ্দেশ হইতে অট্টালিকাটি দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সে ভ্রম অপনোদিত হইয়া যায়। হর্ম্ম্যতল হইতে ছাদপর্য্যন্ত কোনও ব্যবধানই নাই। গৃহের মধ্যস্থলে একটি সুবিশাল স্তম্ভ। স্তম্ভ গাত্রে নানা চিত্র ক্ষোদিত। স্তম্ভশির হইতে প্রকোষ্ঠের চারি কোণ পর্য্যন্ত এক একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতুবৎ পথ; প্রতি পথের শেষ হইতে হর্ম্ম্যতল পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণী নামিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর স্তম্ভশোভিত প্রাঙ্গনমধ্যে "দেওয়ান-ই-আম"। অনেকে অনু-মান করেন যে, ইহা বন্যপশুর ক্রীড়াদর্শন ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

ফতেপুর শিক্‌রিতে আর একমাত্র উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা,"আঁখমিছৌলি।" প্রদর্শকগণ বলেন, এখানে স্বয়ং আকবরসাহ পারিষদবর্গের সহিত "কাণা-মাছি" খেলা করিতেন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, উত্তরকালে সমগ্র ভারতভূমি যাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল, সেই জাহাঙ্গীরের বাল্যক্রীড়ার জন্য এ গৃহ নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা প্রাসাদের ধনাগার ছিল। দ্বারের গঠন দেখিলে এই শেষোক্ত মতই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। এই অট্টালিকার সম্মুখেই একটি জৈন ধরণে নির্ম্মিত সুন্দর ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য।

এই প্রাসাদসমূহের বহির্দ্দেশে "হাতিপোল।" দুইটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর শুণ্ডদ্বয় জড়িত হইয়া এই দ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এই নমা। কিন্তু আওরঙ্গজেব মুসলমানসুলভ প্রতিমাপূজাবিদ্বেষের আতিশয্যে

হস্তিদ্বয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করেন! যোধাবাইয়ের মহল হইতে হাতিপোলের উপরিস্থিত গৃহে আসিবার একটি আবৃতপথ আছে।

হাতিপোলের নিকটেই "হীরানমিনার"। ইহার নিকট দিয়া মৃগাদি তাড়িত হইলে বাদশাহ তাহাদের শিকার করিতেন। ইহা আদৌ সুরম্য নহে।

ফতেপুর শিক্‌রিতে এই সকল অট্টালিকা ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রাণ-তোষিণী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু অট্টালিকা বর্ত্তমান।

আকবর ফতেপুর শিক্‌রিতে দুর্গনির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে দুর্গ সম্পূর্ণ না হইবার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হাতিপোলের নিকটেই সেই অসম্পূর্ণ দুর্গের নমুনা—"সাঞ্জিয়া বুরুজ।" এই বুরুজের নিকটেই রাজ-দরবারে পণ্যবিক্রয়লোলুপ বণিকদিগের জন্য সরাই।

এখন এই সকল প্রাসাদ শ্মশানতুল্য নির্জ্জন। মোগলগৌরবের এই প্রাণ-হীন অবশেষে আছে কেবল পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি।

এখন এই বিজন প্রাসাদে সেখ সেলিম চিস্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত কতকগুলি প্রদর্শক বাস করে।

মৌর্য্যসম্রাট অশোক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অশোকের গিরিলিপিমালার মুখ্য উদ্দেশ্য,—তাঁহার ধর্ম্মানুশাসনের ঘোষণা। শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার মত কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এই সকল ধর্ম্মলিপি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে কলিঙ্গ বিজয় করিয়া আসিলে অশোকের অনুশোচনা হয়; এবং তজ্জন্য তিনি স্বরাজ্যে ও অপরান্তদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। (১) অভিষেকের দশম বৎসর পরে রাজাজ্ঞা হয় যে, পূর্ব্বে সুখলাভাভিলাষে যে বিহার-যাত্রার অনুষ্ঠান হইত, এখন হইতে তাহা ধর্ম্মযাত্রায় পরিণত হইবে। সে যাত্রায় শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা হইত, এবং তাঁহাদিগকে দান করা হইত; এতদ্ভিন্ন জনপদস্থ জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করা হইত, এবং ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসাও সম্পন্ন হইত। (২) অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর

(১) ত্রয়োদশ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (২) অষ্টম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

রে অশোক ধর্ম্মপ্রচারের রীতিমত বন্দোবস্ত করেন, এবং তাঁহার সাধারণ র্ম্মানুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করেন। রাজাজ্ঞায় চারি দিকে ধর্ম্মভেরী বাজিয়া ঠিল, এবং ধর্ম্মার্থ জনগণের সম্মুখে হস্তী, রথারূঢ় দেবগণ ও অন্যান্য দিব্য প প্রদর্শিত হইতে লাগিল। প্রাণিগণের অহিংসা, জীব ও কুটুম্বগণের প্রতি দ্ব্যবহার, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, পিতামাতার ও বৃদ্ধগণের শ্রূষা প্রভৃতি সৎধর্ম্মের অনুষ্ঠানার্থ আজ্ঞা প্রচারিত হইল। (৩) রাজক ও াদেশিকদিগের প্রতি এই আজ্ঞা প্রদত্ত হয় যে, নানা রাজকার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত ধর্ম্মার্থ প্রচারের জন্য, তাঁহাদিগকে প্রতি পঞ্চম বৎসরে স্ব স্ব লাকায় ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে—

পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের শুশ্রূষা সাধু,

জীবে দান সাধু,

অপভণ্ডদিগের প্রতি নিন্দাবিমুখতা সাধু। (৪)

রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজা আদেশ করেন যে, প্রজাগণের কথা কিম্বা মাত্য ও পঞ্চের বিবাদ বা প্রবঞ্চনার কথা জানাইবার জন্য প্রতিবেদকগণ র্ব্বদাই তাঁহার নিকটে যাইতে পারিবেন; তাঁহার ভোজনকালেই হউক, ার তিনি শুদ্ধান্তে, "খাসকামরা"য়, রথে, বা সুখোত্থানেই থাকুন, প্রতি-দকগণ যখন ইচ্ছা তাঁহার নিকটে যাইতে পারিবেন। (৫) সর্ব্বলোকহিতের ন্য কার্য্য করাই তাঁহার কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহার মূলে পরিশ্রম ও (ক্ষিপ্র) র্য্যকারিতা।

রাজা আজ্ঞা প্রচার করেন যে, আহারার্থ কোন জীব নাশ করা উচিত হে, যজ্ঞযূপে জীবনাশ করাও অনুচিত। অধিকাংশ সমাজ-(পর্ব্বমেলন)-ও দ্ধ, কেবল কতকাংশে ভাল। ভবিষ্যতে রাজরন্ধনশালায় আহারার্থ কোন ীব নাশ হইবে না। (৬) জীবের জীবনরক্ষার জন্য নিজ রাজ্যে ও অপরান্ত াজ্যে দুই প্রকার চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয়;—এক প্রকার মানবের জন্য, পর প্রকার পশুর জন্য। যেখানে ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেখানে রাজা-ায় নূতন বীজ রোপিত হইল। সাধারণের হিতার্থ স্থানে স্থানে কূপ খনন করা ইল। (৭) এই সকল ধর্ম্মানুশাসনের প্রচার ও তদনুযায়ী কার্য্য হইতেছে কি

(৩) চতুর্থ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (৪) তৃতীয় গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।
(৫) ষষ্ঠ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (৬) প্রথম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।
(৭) দ্বিতীয় গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

না, তাহা দেখিবার জন্য, অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ চতুর্দ্দশতম বৎসরে) অশোক ধর্ম্মমহামাত্য নামক এক অমাত্যশ্রেণী নিযুক্ত করেন। (৮)

অশোকের গিরিলিপিসমূহের প্রধান অনুশাসনগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

১। প্রাণীর অহিংসা,
২। পিতামাতার শুশ্রূষা,
৩। বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার,
৪। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দান ও তাঁহাদিগের শুশ্রূষা,
৫। দাস ও ভৃত্যদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার,
৬। বিধর্ম্মিগণের প্রতি নিন্দাবিমুখতা,
৭। শ্রম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা ও দৃঢ় ভক্তি। (৯)

এই সকল ধর্ম্মনীতি নীতিবিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয়;—ঊনবিংশ শতাব্দীতেও প্রশংসনীয়। দ্বিসহস্রার্দ্ধ বৎসর পূর্ব্বে, খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, এই মহান্ উপদেশের প্রচার করা যে অসাধারণ ধর্ম্মোন্নতির পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অবশ্য এই সকল ধর্ম্মানুশাসন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের নিকট হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল; সুতরাং ইহাতে অশোকের কোনও মানসিক বিশেষত্ব নাও থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে এই সকল উন্নত মত জন কতক ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের উপদেশে বা রচনাতেই বদ্ধ ছিল, সাধারণ জনগণের নিকট আদৃত হয় নাই। অশোকের গৌরব এই যে, তিনি প্রবল ধর্ম্মেচ্ছাপ্রণোদিতচিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বাভাবিক কার্য্যকুশলতাসহকারে শীঘ্রই এই সকল উন্নত মত স্বীয় বৃহৎ সাম্রাজ্যে ও অপরান্ত প্রদেশসমূহে বহুলভাবে প্রচারিত করেন, এবং আংশিকরূপে কার্য্যে পরিণত না করাইয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। যে কয় জন নৃপতি মানবজীবনকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে যুগাবতার বলিয়া ভ্রম হয়, সেই কয় জনমাত্র নরপতির মধ্যে অশোকের স্থান যে অতি উচ্চ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অনেকে মনে করেন যে, প্রথম হইতেই অশোক বৌদ্ধ ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এই গিরিলিপিমালা হইতে দেখাইতেছি যে, সে ধারণা ভ্রমমূলক। রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত অশোকের সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বনের যথোপযুক্ত প্রমাণাভাব সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। উপরি-উক্ত অনুশাসনসমূহ, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন, এই তিন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাধারণ

(৮) পঞ্চম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য। (৯) সপ্তম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

সম্পত্তি। প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র, উপনিষদ, স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এবম্বিধ অনুশাসনের যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। কাজেই আমেরিকার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষগণের আমেরিকায় গমনের পূর্ব্বে রচিত ইংরাজী সাহিত্য যেমন ইংরাজের ও আমেরিকানের সাধারণ সম্পত্তি, সেইরূপ এই সকল অনুশাসন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন, এই তিন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাধারণ সম্পত্তি। এতদ্ব্যতীত অশোক পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে মান্য করিবে। সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ হইলে তিনি কখনই প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা করিতে ও তাঁহাদিগকে দান করিতে বলিতেন না।

প্রথমাবস্থায় অশোক নির্দ্দয় ও অধর্ম্মী ছিলেন; দ্বিতীয়াবস্থায় তাঁহার এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি, ইহার কোনও সন্তোষজনক কারণ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই; তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ একাধিক কারণসমন্বয়ে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম কারণ, অবশ্য উদ্দামযৌবনান্তে প্রৌঢ়াবস্থায় পরিণতি ও তাহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তির পরিপাক। দ্বিতীয় কারণ, পঞ্চনদ প্রদেশত্যাগ ও মৃদুস্বভাব মাগধগণের উপর রাজত্ব। তৃতীয় কারণ, অশোক স্বয়ং ত্রয়োদশ লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন,—কলিঙ্গবিজয়কালে এত মানবজীবন বিনষ্ট হয়, এত লোক বন্দী হয় ও যুদ্ধের নিত্যসহচর নানা উপদ্রবে এত লোক কষ্ট পায় যে, তদ্দর্শনে অশোকের চিত্তে প্রবল অনুশোচনা জন্মে। চতুর্থ কারণ, বৌদ্ধজনশ্রুতি মতে, আচার্য্য উপগুপ্তের উপদেশ। (১০)

আচার্য্য উপগুপ্তের কোন ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক বৃত্তান্ত এখনও পাওয়া যায় নাই। কিম্বদন্তী অনুসারে তিনি মথুরাবাসী ও বৈশ্যবংশীয় ছিলেন। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়সে ভিক্ষু ও বিংশতি বৎসরে অর্হৎ হয়েন। হিওন্থসাঙ্গ মথুরার নিকটে কতকগুলি গহ্বর দেখেন ও শুনেন যে, সেগুলি উপগুপ্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। (১১) তাঁহার প্রিয়শিষ্য অশোক পাটলীপুত্র নগরে তাঁহার জন্য কয়েকটি প্রস্তরগৃহ (গুম্ফা) নির্ম্মাণ করিয়া দেন। (১২) হাওনথ্সাঙ্গ সিন্ধুদেশেও তাঁহার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন। (১৩) আমাদিগের অনুমান হয়, তিনি একজন জিতেন্দ্রিয়,

(১০) Beal's Si-Ya-Ki vol ll. pp. 88-90. (১১) Beal's Si-Ya-Ki vol l. pp. 181-2.
(১২) Si Ya-Ki vol ll. p. 93. (১৩) Si Ya-Ki vol ll. p. 273.

পরহিতব্রত, সাধুপুরুষ ছিলেন। বৌদ্ধ পুস্তক হইতে তাঁহার যৌবনকালীন একটি গল্প উদ্ধৃত করিলাম,—

মথুরা নগরে বাসবদত্তা নাম্নী এক বিখ্যাত বারস্ত্রী বাস করিত। এক দিন তাহার দাসী মথুরাবাসী বণিক যুবা উপগুপ্তের নিকট সৌগন্ধ ক্রয় করিতে যায়। দাসী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বাসবদত্তা পরিহাসচ্ছলে তাহাকে কহিল, "সখি, দেখিতেছি, এই যুবা তোমার প্রিয়; কারণ তুমি সর্ব্বদাই তাহার নিকট দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাক।" দাসী উত্তর করিল, "স্বামিকন্যে, বণিক-পুত্র উপগুপ্ত সুন্দরদর্শন, গুণবান ও মৃদুস্বভাব, তিনি কেবল ধর্ম্মচর্য্যায় সময় অতিবাহিত করেন।" ইহা শুনিয়া উপগুপ্তকে দেখিবার জন্য বাসবত্তার মনে প্রবল বাসনা জন্মে; সেই বাসনা হইতে ক্রমে উপগুপ্তের প্রতি তাহার প্রেমসঞ্চার হয়।

কিছু দিন পরে বাসবদত্তা সেই দাসীকে দিয়া উপগুপ্তের নিকট সংবাদ পাঠাইল, "আমার ইচ্ছা যে, আমি তোমার নিকট যাই, তোমায় দর্শন করি, তোমার নিকট থাকিয়া সুখভোগ করি।" এই সংবাদ পাইয়া বণিক যুবা সেই দাসীকে দিয়া এই উত্তর প্রেরণ করিলেন, "ভগিনী, তোমার এখনও আমাকে দেখিবার সময় হয় নাই।" বাসবদত্তার নিয়ম ছিল যে, তাহার সঙ্গসুখাভিলাষীকে প্রতিরাত্রে পাঁচ শত পুরাণ (ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রা) দিতে হইত। হয় ত অর্থাভাবেই উপগুপ্ত তাহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এই আশঙ্কা করিয়া বাসবদত্তা পুনরায় দাসীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইল, "স্বামিপুত্রের নিকট আমি এক কার্ষাপণও চাহি না, আমি কেবল তাঁহার সঙ্গসুখের প্রার্থিনী।" এই সংবাদ পাইয়া উপগুপ্ত পুনরায় পূর্ব্বের মত বলিয়া পাঠাইলেন, "ভগিনী, তোমার এখনও আমাকে দেখিবার সময় হয় নাই।"

সেই নগরের শিল্পিক চৌধুরীর সহিত বাসবদত্তার অবৈধ সম্বন্ধ ছিল। একবার এক ধনী সাধুপুত্র তথায় আইসে ও বাসবদত্তার যৌবনপুষ্পিতা রূপলাবণ্যসম্পন্না দেহলতা দেখিয়া তাহার জন্য পাগল হয়। তাহার প্রচুর ধন দেখিয়া সেই রূপাজীবার লোভ হয়; কিন্তু পাছে শিল্পিকের প্রতিহিংসা-বৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে আপনার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সঙ্কুচিত হয়। শেষে একদিন নির্জ্জনে পাইয়া সে চৌধুরীকে হত্যা করে ও তাহার শব গোময়স্তূপমধ্যে লুকাইয়া রাখে। চৌধুরীর বন্ধুবান্ধবগণ তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার সন্ধান করে ও পরে রাজদ্বারে বাসব-

দত্তার নামে অভিযোগ করে। মথুরারাজ বিচারে তাহাকে দোষী স্থির করিয়া আজ্ঞা করেন যে, তাহার হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে শ্মশানে ফেলিয়া আসিতে হইবে। রাজাজ্ঞা পালিত হয়; রক্ষিগণ তাহার শোণিতাক্ত দেহ শ্মশানে ফেলিয়া আইসে। পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাহার দাসী কেবল বাসবদত্তাকে ত্যাগ করিল না। সে অতিযত্নে তাহার শুশ্রূষাদি করিতে লাগিল।

বাসবদত্তার এইরূপ দুর্দ্দশার কথা উপগুপ্তের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক জন ছত্রধারী ভৃত্যমাত্র সঙ্গে লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। উপগুপ্তকে আসিতে দেখিয়া দাসী বাসবদত্তাকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইল। লজ্জা-বশতঃ বাসবদত্তা দাসীকে দিয়া আপনার ছিন্ন ভিন্ন দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করাইয়া রাখিল। উপগুপ্ত সম্মুখে আসিলে সে বলিল, "স্বামিপুত্র, এই দেহ যখন বিকশিত বিসপ্রসূনবৎ রমণীয় ছিল, যখন ইহা বহুমূল্য বসনে ও ভূষণে সুশোভিত থাকিত, যখন ইহা নিজগুণে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত, তখন আমি এমনই দুর্ভাগ্য ছিলাম যে, আপনার দর্শন পাই নাই। এখন এ দেহে আর কি আছে? এখন ইহার দুর্দ্দশা দেখিলে নয়ন ক্লিষ্ট হয়। এখন এ দেহ হইতে আনন্দ, ভোগ, সুখ, সৌন্দর্য্য, সকলই অপসৃত হইয়াছে। এখন এ কর্দ্দমাক্ত, রক্তাপ্লুত, ঘৃণার উদ্দীপক দেহ দেখিতে আসিলেন কেন?" শুনিয়া উপগুপ্ত কহিলেন, "ভগিনী, আমি ভোগাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসি নাই। আমি এখন দেখিতে আসিয়াছি, মানবের ভোগতৃপ্তিকারী বস্তু কতই না দুর্দ্দশাকর।"

ইহার পর তিনি সেই মরণাহতা পতিতাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। (১৪) তাঁহার উপদেশে বাসবদত্তার হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হইল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ, এই তিনে আশ্রয় লইয়া সে প্রাণত্যাগ করিল।

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

---

(১৪) সেই ধর্ম্মোপদেশের ভাবার্থ Paul Carus কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে—

"I have seen with mine eyes the Tathagata walking upon earth and teaching men his wonderful doctrine. But you would not have listened to the words of righteousness while surrounded with temptations while under the spell of passion and yearning for worldly pleasures. You would not have listened to the words of the Tathagata, for your heart was wayward and you set your trust on the charm of transient charms.

সতী।

গাথা।

১

"তুমি নাথ, তুমি নাথ!" হয় না প্রত্যয়!
ত্বরিতে ধরিল বুকে যদি স্বপ্ন হয়।
স্বপ্ন নয়, সত্য সেই আপনি দেবতা
বহিয়া এনেছে মৃত্যু-মঙ্গল-বারতা!
নয়নে সে চিরস্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ-ফল,
সেই সিন্ধু-বিধুনিত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থল।

"হে দেবতা!" রুদ্ধ কণ্ঠ স্ফুরে না বচন,
বিস্ময়ে আনন্দে ভয়ে প্রাণে মহারণ।
অবিরল অশ্রুজল—ধরা বাষ্পময়,
সবলে ধরিছে বুকে—অকূলে আশ্রয়!
সুদীর্ঘ জীবন যাপি সমুদ্র-উপরি
স্থলে যথা জলভ্রম কূলে অবতরি।

"কি দুর্দ্দিন সেই দিন—কেন নদীকূলে
গেছিনু আনিতে জল তব কথা ভুলে।
জীবনে করিনি পাপ—এক ভ্রম-পাপ
নারী-ধর্ম্মে বজ্রাঘাত—নরক-সন্তাপ।
ক্ষম দোষ দাসী আমি।" রক্তাক্ত কপাল।
"ইহকাল গেল, নাথ, রাখ পরকাল।"

হায় রূপ—ছার রূপ—পাপরূপে ধিক্,
নারকী নরক দেখি পাগল-অধিক।
তরীতে তুলিল বলে চকিতে আমায়—
অনুনয় অভিশাপ ক্রন্দন বৃথায়।
ডুবিতে দিল না জলে, করিল বন্ধন—
আকাশে অশনি নাই, জগতে মরণ।

দিন নাই রাত নাই, নিত্য এ কাননে
প্রবোধিতে আসে চেড়ী নানা আভরণে,
কহে কত পাপ কথা। ও পদ স্মরিয়া
এখনো এ দেহে প্রাণ রেখেছি ধরিয়া।
এত দিনে, হে দেবতা, হলে কি সদয়!
মিলিল মরণমুখে হৃদয়ে হৃদয়!

পবিত্র কৃতার্থ দাসী, গৃহে যাও, স্বামী,
আশার অধিক ফল লভিয়াছি আমি।
আজি সে নির্দ্দিষ্ট দিন, পাপিষ্ঠ দানবে
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আলিঙ্গিতে হবে।
যাও প্রভু হাসিমুখে, বল দাও মনে,
লুটে না পূজার ফুল দানব-চরণে।

সহসা খুলিল দ্বার, আলোক ঝকিল,
শুকাল বালার মুখ, নবাব দেখিল।
যুবক দাঁড়াল ফিরে স্থির নির্ব্বিকার,
বাম করে প্রিয়া-কটি, অন্যে তরবার।
নবাব হটিল পিছে, রোষে চক্ষু জ্বলে—
"নগ্ন করি দগ্ধ কর দোঁহে চিতানলে।"

২

রাজপথে জনতায় পথ চলা দায়,
জ্বলিছে জ্বলন্ত রবি মধ্যাহ্ন-রেখায়।
আকাশ নিষ্কম্প স্থির, জগত নীরব,
নীরব নিস্তব্ধ সব, নড়ে না পল্লব,
প্রোথিত হইল দণ্ড, জনতা উদ্‌গ্রীব,
বাজে ঘন জয়ঢাক, ফুকারে নকীব।

"The charms of a lovely form are treacherous and quickly lead into temptations, which have proved too strong for you. But there is a beauty which will not fade, and if you but listen to the doctrine of our Lord, Buddha, you will find that peace which you never would have found in the restless world of siuful pleasures"

নগ্ন করি দু'জনায়, দণ্ড-মধ্যস্থলে
ভিন্ন মুখে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বান্ধিল শৃঙ্খলে।
কি সুন্দর!—শালতরু-বিশাল শরীর,
প্রতি স্ফীত ধমনীতে শোণিত অধীর।
নয়ন নাসিকা-লগ্ন, প্রসন্ন বদন,
"ভগবন্, তব ইচ্ছা হউক পূরণ।"

কি সুন্দরী!—রোমে রোমে রবিরশ্মি পড়ি—
আলোকে আলোকময়ী ধবলা-শিখরী!
কি সৌন্দর্য্য অচঞ্চল! যৌবন-মত্ততা
কূলে কূলে দেছে ঢেলে নিজ অকুলতা!
নাহি পাপ-অন্ধকার, প্রত্যেক শোণিমা
বিকাশিছে আপনার পবিত্র মহিমা!

সজ্জিত হইল চিতা, উদ্‌ভ্রান্ত জনতা
সভয়ে হটিল পিছে, এলো দুষ্ট তথা।
"কি প্রার্থনা, হে রূপসি!" সহচরগণ
হাসিল, ভাষিল কত বিরূপ বচন।
নতমুখী স্বর্ণলতা, রুদ্ধ আঁখিতারা,
কপোলে স্তনাগ্রে টুটে স্থূল মুক্তাধারা।
"কি প্রার্থনা, হে রূপসি!" "তোমার নিকটে
এই এক ভিক্ষা মম—মরণের তটে
আমার মরিতে দাও পতিপদ চাহি।"
"আর কিছু?" ব্যঙ্গ হাসি। "কিছুমাত্র নাহি।"
"তাই হোক।" দিল বান্ধি করি মুখে মুখ।
জ্বলিয়া উঠিল চিতা—হোতা সর্ব্বভুক।

কি সুখ—পতির অঙ্গে দৃঢ় আলিঙ্গন!
জীবনের চিরসাধ প্রেম-উদ্‌যাপন!
সজল করুণ দৃষ্টি, সহাস অধর,
হৃদয়ে হৃদয়ে ভাষা অব্যক্ত সুন্দর!
কি চেতনা—কি সান্ত্বনা—যন্ত্রণা-মোহিত—
অস্থিতে পড়িছে অস্থি, শোণিতে শোণিত।

ধূধূধু জ্বলিছে চিতা, স্তম্ভিত জনতা,
অনলে দুলিছে কিবা কনকের লতা!
অন্ধ দৃষ্টি—তবু সেই কাতর নয়ন
অনলে খুঁজিছে যেন পতির চরণ!
দগ্ধ দেহ—তবু সেই স্থির ওষ্ঠাধর
প্রকাশিছে কত সুখ, কি প্রেম নির্ভর!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সমর্থ রামদাস স্বামী।

সাধন-চাবস্থা।

মহারাষ্ট্রদেশে, গোদাবরী নদীর উত্তর তীরে, বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত "বীড়" পরগণার সন্নিকটে, জম্বুগ্রাম বা জাম্বগাঁও নামে একটি গ্রাম আছে। তথায় বর্ত্তমান সময়ের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যাজী পন্ত নামক এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সেই গ্রামের কুলকরণী বা গ্রামলেখক ছিলেন। গ্রামাধ্যক্ষের নীচেই গ্রামলেখকের পদ। এই কারণে গ্রামে সূর্য্যাজী পন্তের প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। তাঁহাকে গ্রামের যাবতীয় পতিত ভূমি, কৃষিক্ষেত্র ও পথ ঘাট প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হইত। করসংগ্রহ-কার্য্যে গ্রামাধিকারীকে সাহায্য করা ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখাও তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল। মহারাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তলেখকগণ

তাঁহাকে "পরম তপস্বী, ভাগবতধর্ম্মপরায়ণ ও ষট্‌কর্ম্মনিরত" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কৌলিক রীতির অনুসারে রামোপাসনায় তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রগাঢ় নিষ্ঠাসহকারে কুলদেবতা রামচন্দ্র ও মারুতির "পট্টাভিরাম তাম্রময়ী মূর্ত্তির" অর্চ্চনা করিতেন। তিনি সমস্ত দিন জপ ধ্যান ও পূজার্চ্চনায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং রাত্রিকালে স্বীয় বৃত্তিকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

সূর্য্যাজী পন্তের সহধর্ম্মিণীও অতিশয় ধর্ম্মশীলা ছিলেন। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ দম্পতী প্রত্যহ হরিসংকীর্ত্তন, পুরাণশ্রবণ ও অতিথিসৎকার করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত অপত্যলাভে বঞ্চিত থাকায় সূর্য্যাজী পন্ত দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সৌরব্রতের আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই ব্রতাচরণের অল্পকাল পরেই (১৬০৬ খৃঃ) তিনি গঙ্গাধর নামক একটি পুত্র লাভ করেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে রামনবমীদিবসে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নারায়ণের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ গঙ্গাধর বাল্যাবধি অতিশয় শান্তচরিত, ভক্তিপরায়ণ ও জনকজননীর আজ্ঞাবহ ছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আজীবন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অকপট স্বধর্ম্মানুরাগ ও স্বাভাবিক বৈরাগ্য অনেক সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস অপেক্ষাও মহনীয় ছিল। গঙ্গাধর উত্তরকালে মাতৃভাষায় "ভক্তিরহস্য"-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বদেশীয় বিবুধসমাজে ভগবদ্ভক্ত সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (১)

কনিষ্ঠ নারায়ণ বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। শৈশবেও তাঁহার হৃদয়ে ভীতির লেশমাত্র ছিল না। কেহ "জুজুর ভয়" দেখাইলে আধ আধ কথায় তিনি বলিতেন, "জুজু কোথায় আমায় খেতে এসো, আমি জুজুকে মারিয়া ফেলিব।" অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে তিনি পিতা মাতার নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সমস্ত দিন গ্রামের বালকদিগের সহিত দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতেন। বৃক্ষারোহণ ও ধাবন উল্লঙ্ঘনাদি তাঁহার নিত্যক্রীড়া ছিল। (২) কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইলে, তিনি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সন্নিহিত ব্যক্তিদিগকে লোষ্ট্রনিক্ষেপে বিব্রত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কখনও বা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদিগকে উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং বৃক্ষতল হইতে

(১) রামদাস স্বামীর বখর।

(২) মহীপতিকৃত সন্তবিজয় ১ম অঃ ৭২ হইতে ৭৭ এবং ১২৩ হইতে ১২৭ শ্লোক। বখরকার এ বিষয়ে নীরব।

তাহাদিগের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেন। (৩) এক দিন তাঁহার চাপল্য ও উপদ্রবাদির জন্য তিরস্কার করিয়া তাঁহার জননী রাণু বাঈ তাঁহাকে বলেন, "চিত্ত স্থিরপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও ধনধান্য উপার্জ্জন করিতে না পারিলে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করা যায় না। বাছা! তোমার চিত্ত যেরূপ অব্যবস্থিত দেখিতেছি, তাহাতে তোমার গতি কি হইবে ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি।" এই কথা শুনিয়া নারায়ণ ধনধান্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি পরদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন, তথায় ধান্যপূর্ণ গোণীর অভাব নাই। অমিতবলশালী নারায়ণ প্রতিষ্ঠালাভের উপায় সম্মুখে দেখিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে একটি গোণী তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শস্যস্বামী পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। নিরুপায় বণিক পরিশেষে তাঁহার মাতার শরণাপন্ন হইল। বণিকের অভিযোগে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া, নারায়ণ সত্বর তাহার শস্যগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "আঃ! অকারণ গোলমাল করিতেছ কেন? শস্য লইয়া শীঘ্র প্রস্থান কর, নতুবা বাবা আসিয়া জানিতে পারিলে তোমায় তাড়না করিবেন!" (৪) নারায়ণ

(৩) রামদাস স্বামীর বখর (৺মহাদেব বিনায়ক চৌবল কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত) দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১২। এবং গোবর্দ্ধন দাস লক্ষ্মীদাস ঠাকুরের প্রকাশিত বখরের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩ পৃষ্ঠা।

(৪) মহীপতিকৃত সন্তবিজয় ১ম অঃ ১২৯ হইতে ১৫২ শ্লোক। রামদাস স্বামীর বখর নামক গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু ভক্তচরিতাখ্যায়ক মহীপতি বখরকার অপেক্ষা ৫০।৬০ বৎসরের প্রাচীনতর লেখক; সুতরাং তাঁহার লিখিত বিবরণ তথ্যমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী নারায়ণের বাল্যাবস্থায় দুরন্তপনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন, অবকাশ পাইলেই কোমলমস্তিষ্ক নারায়ণ কলনাদিনী গোদাবরীতটে বা ঘনচ্ছায় ন্যগ্রোধমূলে বসিয়া পরিণতবয়স্ক দার্শনিকগণ যে সকল চিন্তায় "ব্যামোহিত" হন, সেই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তনির্ণয়ের জন্য গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতেন। তিনি ব্রাহ্মণধর্ম্মের অবনতিদর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া উহার অবনতির কারণনির্ণয়ে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। অষ্টম বর্ষ বয়সের সময় ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্ব্বিষয়ে লীন করিয়া নারায়ণ এক স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক "ভারতচিন্তায় চিন্তিত" থাকিতেন। নারায়ণকে ইহার জন্য অসীম ভৎর্সনা ও সময় সময় প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইত; ইত্যাদি। (শিবাজীর জীবনচরিত ১০২।৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) কোনও মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে আমরা এ সকল কথার নামগন্ধও পাই নাই। কোনও দেশের ৭।৮ম বর্ষীয় বালকের চিত্তে এরূপ জটিল বিষয়ের গভীর চিন্তাসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে কি না, সে সম্বন্ধেও আমাদিগের গভীর সন্দেহ আছে।

বাল্যকালে কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও সপ্রতিভ ছিলেন, এই ঘটনায় তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষাবিষয়েও তাঁহার বুদ্ধি অপ্রতিহত ছিল। তিনি এমন মেধাবী ছিলেন যে, পঞ্চমবর্ষ বয়সে শিক্ষারম্ভ করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই তিনি গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে মৌঞ্জীবন্ধনের পর তিনি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বেদাভ্যাসে তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া তদীয় অধ্যাপক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। (৫)

নারায়ণ বাল্যকালে যেমন দৌরাত্ম্যে অকুতোভয় ও দুর্নিবার ছিলেন, "কুলদেবতার" প্রতি ভক্তি ও স্বর্ম্মানুরাগও তাঁহার তেমনই প্রগাঢ় ও প্রবল ছিল। ধর্ম্মশীলতায় তিনি যে কেবল পৈতৃক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার জনকজননী অপেক্ষাও তদীয় চরিত্রে অধিকতর বিকাশলাভ করিয়াছিল। একদা সূর্য্যাজী পন্ত তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রদিগকে লইয়া মহারাষ্ট্র দেশের তদানীন্তন মহাপুরুষ একনাথ স্বামীকে দেখিবার জন্য প্রতিষ্ঠান নগরে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, "শ্রীনাথজী" (একনাথ) মাসকতিপয়মাত্রবয়স্ক নারায়ণের লক্ষণাদি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সৌভাগ্যশালী শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মসংস্থাপনপূর্ব্বক জগতের (দেশের) উদ্ধারসাধন ও কোনও শকপ্রবর্ত্তক নরপতির দ্বারা ভূভারহরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিবে।" মহাপুরুষের ভবিষ্যৎবাণী বিফল হয় নাই। উত্তরকালে এই নারায়ণই "সমর্থ রামদাস স্বামী" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর ধর্ম্মোপদেষ্টার পদে আসীন হইয়া স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপনে তাঁহার সহায়তা করিয়া "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

গৃহে নিত্য হরিসংকীর্ত্তন, পুরাণ পাঠ, দেবার্চ্চনা এবং সদাচারপরায়ণ পিতামাতার ধর্ম্মশ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সুদৃষ্টান্তে অতি অল্প বয়সেই নারায়ণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতুল ভানুজী গোঁসাই একনাথ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তিনি পর্ব্বকালেও

(৫) সন্তবিজয় ১ম অঃ ৭৮।৭৯ এবং ৯৪ শ্লোক। সত্য বাবু বখরকারের মতানুসরণ করিয়া ৫ম বর্ষে নারায়ণকে উপনীত করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে প্রাচীন লেখক মহীপতির মতানুসরণ করা সঙ্গত বোধ করিলাম।

হরিসংকীর্ত্তনাদি উৎসবের সময় সূর্য্যাজী পন্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া কথকতার দ্বারা "অদ্বৈতনি রূপণ" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। রামনবমী প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে সূর্য্যাজী পন্তের গৃহে বহু সাধুর সমাগম হইত। গৃহস্বামী অবসর পাইলেই স্ত্রী পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশের প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষদিগের সন্দর্শনের জন্য তাঁহ াদিগের আশ্রমে গমন করিতেন। এই সাধুসহবাসের ফলে ও গার্হস্থ্য শিক্ষার গুণে নারায়ণের ভগবন্নিষ্ঠা ও কুলদেবতার প্রতি ভক্তি অল্প দিনের মধ্যে ঐ কান্তিক*ভাবে পরিণত হইয়াছিল। পৌরাণিক ভক্তকথা শুনিয়া তাঁহার শৈশব সুলভ সরলচিত্তে ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের দর্শনলাভবাসনা সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া উঠিত। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপুরশ্চরণ না করিলে ভগবদ্দর্শন ঘটে না। এই কারণে, কৈশোরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই ত্রয়োদশাক্ষরী রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য নারায়ণের অতীব আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর তদীয় সংকল্পে বাধা প্রদান করিলে অভিমানক্ষুব্ধ নারায়ণ মারুতির মন্দিরে গিয়া সরল শিশু-হৃদয়ের স্বত-উচ্ছ্বসিত ভাষায় "অভঙ্গ" (কবিতা) রচনা করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। স্তবপাঠ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া ভক্ত বালক এক দিন দেবমন্দিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (৬) অদ্যাপি মহারাষ্ট্রবাসীর বিশ্বাস, ভগবান্ রামচন্দ্রের "একনিষ্ঠ সেবক ব্রহ্মচারি-শ্রেষ্ঠ" মারুতির অনুগ্রহ ভিন্ন রামচন্দ্রের দর্শনলাভ অসম্ভব। এই কারণে বালক নারায়ণ মারুতির প্রসাদ-

(৬) বখরকার বলেন, সেই দিন মারুতি স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া নারায়ণকে ত্রয়োদশাক্ষরী রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া "রামদাস" আখ্যা প্রদান করেন। পরন্তু নারায়ণের সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনও ঘটে। কিন্তু মহীপতির সন্তবিজয় ও ভক্তবিজয়ের বর্ণনামতে ইহার বহু বর্ষ পরে নাশিকের নিকটস্থিত পঞ্চবটীতে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজীর প্রামাণিক জীবনীলেখক মহ্লার রামরাও চিটনীসের লিখিত বিবরণও মহীপতির উক্তির পরিপোষক। বলা বাহুল্য, মহ্লার রাওয়ের গ্রন্থ সমালোচ্য বখর অপেক্ষা প্রাচীন। স্বয়ং রামদাস স্বামী আপনার দীক্ষাবিষয়ে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেও মহীপতির উক্তিই সমর্থিত হয়। সত্যচরণ বাবু এখানেও অন্ধভাবে বখরকারের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে অষ্টম বর্ষীয় নারায়ণকে দীক্ষালাভের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট ভারত-উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত বক্তৃতা করিতে দেখিতে পাই। দুঃখের বিষয়, কোনও মহারাষ্ট্রীয় বখরে এ প্রসঙ্গে রামদাস স্বামীর মুখে স্বদেশের হিতসাধন বা তন্নিমিত্ত সন্ন্যাসগ্রহণের কোনও প্রস্তাবই আমরা দেখিতে পাইলাম না।

ভাজন ও তাঁহার ন্যায় রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। স্বভাবের যে দুর্দ্দমনীয়তায় তিনি পিতামাতার শাসন অতিক্রম করিয়া গ্রামের সকল বালককে "দুরন্তপনা"য় পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভাবের সহিত ক্রমে তাহা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মসাধন-বিষয়ে একাগ্র ও অবিচল করিয়াছিল।

উপনয়নের অল্পকাল পরেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় নারায়ণের স্বচ্ছন্দাচার অব্যাহত হইয়াছিল। (৭) ক্রমে নারায়ণ দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেন, তথাপি তাঁহার দৌরাত্ম্যের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। বিবাহবন্ধনে তাঁহাকে আবদ্ধ করিলে তাঁহার দুরন্তপনার কিছু লাঘব হইতে পারে বিবেচনা করিয়া রাণুবাঈ তাঁহাকে পরিণীত করিবার সংকল্প করিলেন। (৮) ইষ্টদেবতার উপাসনায় পুত্রের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ও মারুতির আরাধনায় তাঁহার বৈরাগ্যশীলতার আভাস পাইয়াও হয় ত তিনি পুত্রকে সংসারপাশে বদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গাধরের বিবাহ সূর্য্যাজী পন্তের জীবদ্দশাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং তিনি গৃহধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণের ইষ্টদেবতার দর্শনলাভবাসনা এরূপ দুর্দ্দম্য ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তিনি অভীষ্টদেবের সান্নিধ্যলাভ আশায় ভগবান্ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম ভক্ত মারুতির ন্যায় আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতের পালনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সুতরাং মাতার মনোভাব অবগত হইবামাত্র তিনি গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক কাননাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বহু অনুসন্ধান ও চেষ্টার পর তিনি পুনরায় গৃহে আনীত হইলেন বটে, কিন্তু কেহই সেই তেজস্বী বালককে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত করিতে পারিলেন না! বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেই তিনি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেন। বিবাহের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি একবার এক ঘনপল্লব বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়া লুকাইয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ দেখিতে পাইয়া অবতীর্ণ হইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে তিনি নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করণীতে ঝম্পপ্রদান করিয়া সকলকে ভীত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন। এইরূপ পতনে তাঁহার যে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণায় তাঁহাকে

(৭) মহীপতি ইহার পরও প্রায় ১৫।১৬ বৎসরের অধিক কাল সূর্য্যাজী পন্তকে জীবিত রাখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বোধ হয়।

(৮) মহীপতিকৃত সন্তবিজয় ১ম অঃ ১৫৫ শ্লোক।

কিছুদিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ললাটে ঐ আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

ফলতঃ নারায়ণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তদীয় অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর তাহা জননীকে বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু "মাতার অবোধ প্রাণ" সে কথা বুঝিয়াও বুঝিল না। (৯) তিনি আরও কালবিলম্ব না করিয়া স্বীয় সহোদর ভানুজী গোঁসাইর কন্যার সহিত নারায়ণের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। (১০) যথাকালে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। নারায়ণ বররূপে বিবাহমণ্ডপে উপনীত হইলেন। কন্যাদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে পুরোহিতগণ বরকন্যাকে "শুভকার্য্যে সাবধান" হইতে বলিলেন। নারায়ণ পূর্ব্বাবধি সতর্ক ছিলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে সংসারবন্ধনে জড়ীভূত হইবার পূর্ব্বে সাবধান হইতে বলিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া তিনি সহসা বিবাহ-মণ্ডপ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিলেন। (১১) তৎক্ষণাৎ কয়েক জন লোক তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবমান হইল। কিন্তু

(৯) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী বলেন, বালক নারায়ণ একবার মাতাকে জন্মভূমির সেবার নিমিত্ত আত্মোৎসর্গের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, জননী পুত্রকে "মাতৃদেবো ভব" এই বেদোক্তির অর্থ জিজ্ঞাসিলে নারায়ণ বলেন, "পণ্ডিতগণ জন্মভূমিকেও জননী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এ কারণে জননীর ন্যায় জন্মভূমির সেবার জন্য আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত, ইহাই বেদের আজ্ঞা!" শাস্ত্রী মহাশয় এ সকল মহনীয় কথা কোন্ গ্রন্থে পাইয়াছেন, জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কোনও প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই সকল কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

(১০) মহারাষ্ট্র দেশে ক্ষত্রিয়গণের প্রভুত্বকালে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা মারাঠা-ক্ষত্রিয়গণের নিকট হইতে "মাতুলীকন্যার" পাণিগ্রহণের রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। মারাঠাগণ আপনাদিগকে যাদববংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। যাদবগণের মধ্যে প্রাচীনকালে মাতুলকন্যার পাণিগ্রহণের প্রথা ছিল। প্রদ্যুম্ন স্বীয় মাতুলকন্যা শুভাঙ্গীকে এবং তৎপুত্র অনিরুদ্ধ রুক্মবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ে এইরূপ উল্লেখ আছে। ইদানীং মরাঠাগণের প্রভাব হ্রাস হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে।

(১১) শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "সকলে সাবধান হও! বলিয়া নারায়ণ পলায়ন করেন।" এখানে বখরে বর্ণিত উক্তির ভাবগ্রহণে তাঁহার ভ্রম ঘটিয়াছে।

তরস্বী নারায়ণ সকলকে অতিক্রম করিয়া জম্বুগ্রামের সন্নিহিত কাননে প্রবেশ করিলেন। এদিকে জননীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে ও অভ্যাগত জনসমাজের বিস্ময়-বিষাদে বিবাহ-মণ্ডপ ম্লানভাব ধারণ করিল। গঙ্গাধর শোকপরীতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। (১২)

জম্বুগ্রামের সন্নিহিত কাননে তিন দিন লুকাইয়া থাকিয়া নারায়ণ নাশিক অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি তত্রত্য পঞ্চবটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, রামদাস নাম ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্র ও মারুতির আরাধনা ও তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গুহানিবাস, মন্ত্র-পুরশ্চরণ, রামায়ণ-শ্রবণ, ভজন-সংকীর্ত্তন, সাধুসহবাস, শাস্ত্রচর্চ্চা, লোকোপকারসাধন, শীতোষ্ণপর্জ্জন্য-সহন, অষ্টাঙ্গযোগসাধন এবং কখনও ভিক্ষাটন, কখনও বা ফলপর্ণাহার করিয়া দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করিলেন। (১৩) কথিত আছে, রামদাসের কঠোর সাধনায় মারুতি প্রসন্ন হইলেন। মারুতির প্রসাদে রামদাসের চির-বঞ্চিত রামচন্দ্র ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত ও প্রত্যক্ষগোচর হইয়া, তাঁহাকে "স্বকীয়দিব্যগুহ্যজ্ঞান" প্রদান করিলেন। (১৪) বাল্যকালে তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাঁহার অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও অটল সাধনার বলে, তাহা সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে চরম পরিণতি লাভ করিল।

যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে সাধক ভববন্ধনমুক্ত হইয়া পরম মোক্ষপদবী লাভ করেন, যে পরম পুরুষের সাক্ষৎকার ঘটিলে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত ও সর্ব্বপ্রকার কামনার চরম পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, রামদাস সাধ-

(১২) ১৬২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (মাঘ মাসে) এই ঘটনা ঘটে। এই অব্দ মহারাষ্ট্র ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বৎসরেই মালিক আম্বেরের মারাঠা সেনানী শাহজী ভোসলে (শিবাজীর পিতা) ও লুখজী যাদবরাও (শিবাজীর মাতামহ) মহারাষ্ট্র-বীর্য্যপ্রভাবে মোগলদিগকে চমকিত করিয়াছিলেন। যে বীর্য্যপ্রভাবে মোগলরাজ্যের ধ্বংস হয়, তাহার প্রথম পরিচয় মোগলগণ এই অব্দে প্রাপ্ত হন। রামদাস স্বামীর সংসারত্যাগও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় ও মোগলদিগের অধঃপতনের পূর্ব্বচিহ্নস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। মোগলরাজ্যের ধূমকেতু অওরঙ্গজেব ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১৩) মহ্লার রাও চিটনীস প্রণীত শিবাজীর বখর ১ম সংস্করণ, রামদাস স্বামীর বখর, এবং সন্তবিজয় ২য় অধ্যায়।

(১৪) সন্তবিজয় তৃতীয় অধ্যায় ১০৭ শ্লোক।

নায় সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় যোগিগণ সাধারণতঃ নির্জ্জন গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পার্থিব জগতের শুভাশুভ হইতে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিয়া ধ্যানমগ্নচিত্তে অক্ষয় ব্রহ্মানন্দভোগে নিরত হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি ভগবদ্দর্শনজনিত সাত্ত্বিক আনন্দলাভের আশায় অকিঞ্চিৎকর সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কিশোরবয়সে গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কেবল আত্মসুখানুসন্ধায়ী হইয়া জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্যপালনে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন না। তিনি মোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ও ভূমানন্দের আস্বাদন করিয়াও দুঃখযাতনাসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাপত্রয়ক্লিষ্ট, দীনভাবাপন্ন ও পরস্পর-বিবদমান স্বদেশীয়গণের ক্লেশবিমোচন ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মোন্নতিবিধানে আত্মশক্তি নিয়োজিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দেশময় পর্য্যটন পূর্ব্বক, তাঁহার বহু দিনের সাধনালব্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া মহারাষ্ট্র জাতিকে সঞ্জীবিত, সম্মিলিত ও স্বধর্ম্মানুরক্ত করিবার বাসনা, তাঁহার প্রবলধর্ম্মানুরাগপরায়ণ উন্নত হৃদয়ে স্বতই উদিত হইয়াছিল। দ্বাদশ বৎসরের তপস্যায় তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণ ও শাস্ত্রজ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র জাতির শিক্ষাগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে নানাদেশ-পরিভ্রমণজনিত যে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার আবশ্যক, তখনও রামদাস স্বামীর তাহার সংস্থান ছিল না। এই কারণে এবং শাস্ত্রানুসারে, "পৃথিবী-প্রদক্ষিণ"-পূর্ব্বক তীর্থদর্শন না করিলে সম্পূর্ণ ধর্ম্মলাভ হয় না বলিয়া, ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "পৃথিবী-প্রদক্ষিণ" ও তীর্থাটনকার্য্য পরিসমাপ্ত করিবার মানস করিলেন।

এই সংকল্পানুসারে ২৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে রামদাস স্বামী পৃথিবী-প্রদক্ষিণে (ভারতভ্রমণে) যাত্রা করিলেন। তিনি জ্ঞানতত্ত্ব, ভক্তিমাহাত্ম্য ও রামোপাসনার প্রচারপূর্ব্বক শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে করিতে ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিলেন। প্রথমে বারাণসীক্ষেত্র ও তৎপরে যথাক্রমে অযোধ্যা, গয়া, প্রয়াগ, গোকুল, মথুরা, বৃন্দাবন ও পিণ্ডার্ক প্রভাসাদি ক্ষেত্র পর্য্যটন পূর্ব্বক তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীমূর্ত্তির (রামচন্দ্র মূর্ত্তির) প্রতিষ্ঠা ও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে জ্ঞানধর্ম্মে ও রামোপাসনায় দীক্ষিত করিয়া দেবভূমি হিমাচলের উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি শ্রীনগর, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, উত্তর মানস প্রভৃতি পুণ্যতীর্থসমূহের দর্শন ও

তথায় কিয়ৎ কাল অবস্থান করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রামদাস পূর্ব্বাঞ্চলের যাবতীয় তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় স্বমতপ্রচার ও মঠস্থাপন করিয়া, তিনি দক্ষিণসমুদ্রতীরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিলেন। কথিত আছে, বিভীষণের রাজধানী দর্শন করিবার মানসে সিংহল দ্বীপেও গমন করিয়াছিলেন। রামদাস তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া বহুদিনান্তে পুনর্ব্বার গোদাবরীতীরে নাশিকের সন্নিহিত পঞ্চবটীতে প্রত্যাগত হইলেন। পৃথিবীপ্রদক্ষিণ শেষ করিয়া তিনি "গঙ্গা-প্রদক্ষিণ" (১৫) করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি গোদাবরীর (গঙ্গার) উৎপত্তিস্থান সহ্যপর্ব্বতস্থিত "ত্র্যম্বকেশ্বর" হইতে পূর্ব্বসাগরের তীরবর্ত্তী "রাজমহেন্দ্রী" পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ পরিক্রমণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ভারতের যে সকল অংশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক প্রসিদ্ধ স্থানেই কিয়দ্দিবস অবস্থানপূর্ব্বক তত্রত্য ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহিত পরমার্থতত্ত্বের আলোচনা করিতেন। এইরূপ দেশপরিভ্রমণে দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়। (১৬)

এত দিনে রামদাস স্বামীর সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সহিত অশ্বারোহণ ও ধনুর্ব্বিদ্যার অভ্যাস করিয়াছিলেন। (১৭) যৌবনে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ও শাস্ত্রবিচারে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

(১৫) মহারাষ্ট্রীয়গণ গোদাবরী নদীকেই গঙ্গা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শিবপুরাণে লিখিত আছে যে, মহর্ষি গৌতমের আশ্রম পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে ছিল। তিনি একদা গোহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জন্য শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান ত্রিলোচন প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মহর্ষি ত্রিলোকপাবনী গঙ্গার সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করের বরে গঙ্গা গৌতমের আশ্রমের নিকট দিয়া প্রবাহিতা হইলেন। সেই গঙ্গাই কলিযুগে গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধা হন।

(১৬) রামদাস স্বামীর বখরের উভয় সংস্করণেই "পৃথিবী-প্রদক্ষিণের বিবরণ" সবিস্তার বর্ণিত আছে।

(১৭) রামদাস স্বামীর বখরে ও মহীপতিকৃত সন্তবিজয়ে রামদাস স্বামীর অশ্বারোহণ-দক্ষতা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অভ্রান্ত-লক্ষ্যতা সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে আমরা উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। সেকালের প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয় বালক অশ্বারোহণাদি পুরুষোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। রঙ্গনাথ স্বামী প্রভৃতি রামদাসের সহযোগিগণও অশ্বারোহণাদিতে নিপুণ ছিলেন। গ্রামলেখকের ন্যায় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পুত্র—বিশেষতঃ রামদাসের ন্যায় দুর্দ্দান্ত বালক যে বাল্যকালে সে শিক্ষায় বঞ্চিত ছিলেন, ইহা আমাদের কিছুতেই সম্ভবপর বোধ হয় না। সেকালের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও যে অশ্বারোহণাদি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, শিবাজীর বখরে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেশপর্য্যটনের ফলে লোকচরিত্র, ব্যবহারনীতি এবং ভারতবর্ষের রাজনীতি, ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিল। মলিনতা প্রাপ্ত সনাতন ধর্ম্মের পরিমার্জ্জন ও নিষ্কাম ধর্ম্মমূলক ভক্তিতত্ত্বের প্রচার করিয়া, স্বদেশবাসিগণকে জ্ঞান ধর্ম্মে গরীয়ান্ করিবার আকাঙ্ক্ষা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়াছিল। পৃথিবী পর্য্যটন পরিসমাপ্ত হইলে তিনি শোকাতুরা জননীর সান্ত্বনাবিধানের জন্য কিয়দ্দিবসমাত্র জম্বুগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজাতির হিতসাধন মানসে কৃষ্ণাতীরে—মহারাষ্ট্র দেশের কেন্দ্রস্থলে গমন করেন। কথিত আছে, তাঁহার ইষ্টদেবতার আদেশই তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ কৃষ্ণাতীরে গমনে উদ্বুদ্ধ ও তরমাণ করিয়াছিল।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রামদাস প্রথমতঃ কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি স্থান মহাবলেশ্বরে আশ্রম স্থাপন করিলেন। এবং হরিসংকীর্ত্তন, কথকতা, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নানা স্থানে "সগুণ-রামোপাসনার" প্রচার করিয়া "ভক্তিমার্গ বিস্তার" করিতে লাগিলেন। ক্রমে জয়রাম স্বামী, মোরয়াদেব, কেশব স্বামী, রঘুনাথ স্বামী ও তুকারাম প্রভৃতি তদানীন্তন মহারাষ্ট্রীয় সাধুবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভগবন্নিষ্ঠা ও সদাচার প্রভৃতি গুণে সাময়িক ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধুপুরুষগণের শীর্ষস্থানীয় হইলেন। রামদাস যাঁহাদিগকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারাই তদীয় অধ্যাত্মশক্তি দর্শনে প্রীত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে "সমর্থ" এই গৌরবাদস্পা উপাধি প্রদান করিলেন।

আমরা এইখানে রামদাস স্বামীর সাধনাবস্থার ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সাধনালব্ধ শক্তির বলে মহারাষ্ট্র সমাজে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, বারান্তরে তাহা আমাদিগের আলোচ্য।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

শ্রীমতী ইভেরার্ড কোট্‌স্‌।

শ্রীমতী কোট্‌স্‌ ইংরাজ, আমেরিকান ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পাঠকসম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে পরিচিতা ও সমাদৃতা। অল্প দিন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও তাঁহার শ্লেষপূর্ণ ও আনন্দপ্রদ রচনায় ইতিমধ্যেই তিনি পাঠকসমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার নূতন পুস্তক, A Voyage of Consolation প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে "বুক্‌ম্যান" পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিব।

বংশপরিচয়।

শ্রীমতী কোট্‌স্‌ ক্যানেডিয়ান। তিনি অণ্টেরিও প্রদেশের অন্তঃপাতী ব্র্যাণ্টফোর্ড নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মিষ্টার চার্লস ডন্‌কান যৌবনে জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। এখানে তিনি এক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সম্মানিত নাগরিক। তিনি নানা উচ্চ নাগরিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষা; বাল্যরচনা।

শ্রীমতী কোট্‌স্‌ ব্র্যাণ্টফোর্ড ও টরণ্টো এই দুই স্থানে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষার কোনও বিশেষত্ব ছিল না; সাধারণতঃ সকলের যেরূপ শিক্ষা হয়, তাঁহারও সেইরূপ হইয়াছিল। বাল্যে বিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশের জন্য সম্পাদকদিগের নিকটে প্রেরণ করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে সকল রচনা অধিকাংশ লেখকের বাল্যরচনার গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রকাশের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় সেগুলি প্রকাশিত হয় নাই। দুই একটি রচনাপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাঁহার রচনাস্পৃহাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীমতী কোট্‌স্‌ তাঁহার পিতার প্রথম সন্তান। তাঁহার পিতাকে বৃহৎ সংসার চালাইতে হইত, সেই জন্য তিনি প্রথম হইতেই কন্যার সাহিত্যসেবায় জীবিকা-অর্জ্জন-স্পৃহার অনুমোদন করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রসেবা।

তিনি প্রথমেই কয়খানি দৈনিকপত্রের সংবাদদাতা হইয়া নিউ-অর্লিন্স প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন। আমেরিকায় সাধারণতঃ বালিকাগণ একটু অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং তদীয় পিতা তাঁহার বিদেশগমনে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। যৌবনসুলভ অদম্য উৎসাহসহকারে, যে প্রকারেই হউক জীবনসংগ্রামে সাফল্যলাভ করিতে হইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি অখণ্ড মনোযোগসহকারে স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। প্রথমাবধিই তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনলালসা ও রচনায় দক্ষতালাভস্পৃহা বিশেষ বলবতী ছিল। এবার গৃহের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে মুক্ত জগতে জনতার সংঘর্ষে আসিয়া নানা ঘটনা ও নানা পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিবার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করিলেন। ধ্যানযোগীর পক্ষে আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া কেবল পুস্তকপাঠে যে জ্ঞান দুষ্প্রাপ্য, কর্ম্মযোগীর পক্ষে বিপুল জনতাসংঘর্ষে সে জ্ঞান সহজপ্রাপ্য। এবার ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করিলেন, সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবেই তাঁহার রচনা বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

নিউ-অর্লিন্স হইতে তিনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, সেগুলি সাদরে গৃহীত হওয়াতে, তিনি সংবাদপত্রসেবাতেই নিযুক্ত রহিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি "ওয়াশিংটন-পোষ্ট" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত হয়েন। তখন কুমারী ডন্‌কানের বয়স বিংশতিবৎসরমাত্র। এই অল্প বয়সে সম্পাদকের সহকারিরূপে তিনি পুস্তকের সমালোচনা করিতেন, এবং কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে প্রবন্ধরচনাও করিতেন। সময়সময় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরচনার ভারও তাঁহাকে লইতে হইত। ওয়াশিংটন হইতে টরণ্টোয় গমন করিয়া তিনি "টরণ্টো গ্লোবে"র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি প্রথিতকীর্ত্তি অধ্যাপক গল্ডুইন স্মিথের মুখপত্র "টরণ্টো উইক" নামক সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক তাঁহাকে রচনাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ভ্রমণ।

প্রথম হইতেই তাঁহার ভ্রমণস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল, এই জন্য কিছু দিন পরে তিনি "মন্ত্রিয়েল ষ্টার" পত্রের সহকারিসম্পাদকরূপে তথায় গমন করেন। তখন "ক্যানেডিয়ান প্যাসেফিক ষ্টীমার লাইন" খোলা হইয়াছে। ব্রিটিশ বাষ্পীয়পোতে ভূপ্রদক্ষিণাভিলাষে তিনি ও আর একজন মহিলা দেশভ্রমণে বাহির হন। শীতকালের মাঝামাঝি তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হন। এখানেই তাঁহার সহিত মিষ্টার ইভেরার্ড কোট্‌সের সাক্ষাৎ হয়। মিষ্টার কোট্‌স্‌ তখন ভারতগভর্মেণ্টের বিজ্ঞানবিভাগে কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া পরিণয়পাশে বদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

উপন্যাস ও গল্প।

ভূপ্রদক্ষিণকালে আমেরিকার সংবাদপত্রে যে সকল পত্র লিখিবার কথা ছিল, সে সকল লেখা হইলে, লেখিকা তাঁহার ভ্রমণাভিজ্ঞতা উপন্যাসে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করেন;—তাহার ফল তাঁহার A Social Departure গ্রন্থ। তিনি এই পুস্তক "লেডিস্‌ পিক্‌টোরিয়াল্‌" পত্রে প্রকাশের প্রস্তাব করিলে, তৎপত্রের সুচতুর সম্পাদক সাদরে সে পুস্তক গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। সম্পাদক বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই মনোরম ভ্রমণকাহিনীপূর্ণ উপন্যাস পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে। এই সম্পাদকের অনুরোধেই লেখিকা গ্রন্থমধ্যে তাঁহার আমেরিকান সহচরী মহিলাকে ইংরাজযাত্রিরূপে বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলেই, পাঠকগণের নিকট আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনও ইহা লেখিকার একখানি অতি সুখপাঠ্য উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেই সকল অবলম্বন করিয়া, An American Girl in London রচনা করেন। অনেকের মতে, তাঁহার এই দ্বিতীয় গ্রন্থ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কারণ, প্রথম গ্রন্থের রচনাকালে তাঁহার রচনা-চাতুর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; অধিকন্তু, বহু দিন সংবাদপত্রসেবার ফলে ও সেই গ্রন্থ সংবাদপত্রের জন্য লিখিত হওয়ায়, পুস্তকের রচনা সংবাদপত্রেরই উপযোগিনী হইয়াছিল।

দুই বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত হইবার জন্য কুমারী ডন্‌কান কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রথমে বঙ্গদেশে অবস্থানকালে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া, The Simple Adventures of a Memsahib রচনা করেন।

Idler পত্রে তাঁহার Vernou's Aunt নামক গল্প প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের হিসাবে ইহাই তাঁহার নিকৃষ্ট রচনা। ইহার পর সাময়িকপত্রে পুরস্কারলাভাশায় তিনি The Story of Sonny Sahib রচনা করেন। তিনি পুরস্কার পান নাই বটে,

কিন্তু তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটি অত্যন্ত মনোরম। তাঁহার এক বৃদ্ধা আয়ার নিকটে তিনি সিপাহীবিদ্রোহের বিবিধ গল্প শুনিয়াছিলেন। ইংরাজের সেই ভীষণ দুর্দ্দশার সময় ইংরাজ শিশুদিগের হত্যার বর্ণনা করিতে করিতে আয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না। সেই বৃত্তান্ত শুনিয়াই এই পুস্তকরচনার কল্পনা লেখিকার মনে উদিত হয়।

A Daughter of To-day নামক পুস্তকই তাঁহার প্রকৃত উপন্যাস রচনার প্রথম উদ্যম। পাশ্চাত্য সভ্যতায় উদ্ধতা আধুনিক মহিলাদিগের আত্মগরিমার ভাব দেখানই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

কিছু দিন য়ুরোপে বাসের পর ভারতবর্ষে আসিয়া লেখিকা তাঁহার His Honour and a Lady রচনা করেন; কলিকাতার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের জীবনকাহিনীর বর্ণনা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বার য়ুরোপের অভিজ্ঞতার ফলে লেখিকা তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকের ভাষা তীব্র বিদ্রূপপূর্ণ।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোট্‌স্ দম্পতী আর ভারতবর্ষে আসিবেন না স্থির করিয়া য়ুরোপ যাত্রা করেন। কিন্তু ঐ বৎসরই লণ্ডনে অবস্থানকালে মিষ্টর কোট্‌স্ কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র "ডেলি নিউসের" সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। পূর্ব্বে মিষ্টার কোট্‌স্ ভারত গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্ম লিপ্ত ছিলেন; কিন্তু সংবাদপত্রসেবাই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। এই অনুরোধ পাইয়া সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়া বিদুষী পত্নী সহ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। দুই বৎসর কাল "ডেলিনিউস্" সম্পাদন করিয়া, কলিকাতায় গ্রীষ্মকালযাপন কষ্টসাধ্য এবং সম্পাদকের কর্ম্মভারও গুরুতর বলিয়া, সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিয়া সংবাদদাতৃ-রূপে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রাজধানী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত রাজধানী চিরশৈত্যময়ী সিমলায় গমন করেন। এখানে গিয়া প্রথম বৎসরেই লেখিকা তাঁহার নবপ্রকাশিত উপন্যাসের অধিকাংশ রচনা করেন।

অন্যান্য কথা।

শ্রীমতী কোট্‌স্ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়া ও তন্বী। তাঁহার কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু উজ্জ্বল চক্ষু ধূসর। তাঁহার সরস মনোভাব যেন সর্ব্বদাই তাঁহার মুখদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। বেশভূষা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অবধান নাই। পুস্তকরচনাতেই তাঁহার আনন্দ। তিনি প্রত্যহই কিছু কিছু রচনা করেন—গড়ে প্রতি দিন ৩০০ হইতে ৪০০ কথা লিখিয়া থাকেন। তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া রচনা করেন বলিয়া তাঁহাকে আর বড় রচনার সংশোধন করিতে হয় না।

কলিকাতায় ও সিমলায় ইংরাজ-সমাজের প্রায় সকল উৎসবেই কোট্‌স্-দম্পতী যোগদান করিয়া থাকেন। শ্রীমতী কোট্‌স্ অশ্বারোহণ, দ্বিচক্র-রথচালন প্রভৃতি নানা ব্যায়ামে অভ্যস্তা।

ইতিহাস।

জিঞ্জী।

বিগত মাসের "মান্দ্রাজ রিবিউ" পত্রে মাননীয় জষ্টিস্ রাওবাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে মহোদয় মহারাষ্ট্র জাতির স্বরাজ্যলাভচেষ্টা সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। রাও বাহাদুরের লিপিকৌশল ও প্রগাঢ় ইতিহাসজ্ঞান এই প্রবন্ধে বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ এ স্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

শিবাজীর অকালমৃত্যুর পর, মহারাষ্ট্র রাজ্যে যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে অনেকে তাহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন না। শিবাজীর জীবদ্দশায় —যখন তিনি মহারাজ জয়সিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও পরে দিল্লী গিয়া সম্রাট অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন, তখনই এইরূপ একটি বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজী স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও সৌভাগ্যের বলে তাহা প্রতিহত করিয়াছিলেন ও অবশেষে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট তাঁহাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিবাজী বুঝিয়াছিলেন, অওরঙ্গজেবের এই সন্ধি কেবল বলসংগ্রহ ও আক্রমণের সুযোগানুসন্ধানের অবসরমাত্র। সুবিধা পাইলেই সম্রাট তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন। এই অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়নির্দ্ধারণে শিবাজীর জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয় গৃহবিবাদ হইতে নিরস্ত হইয়া পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ও মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সন্ধি দ্বারা উক্ত নরপতিদ্বয়ের অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল। কারণ মোগলসেনা যখন উক্ত রাজ্যদ্বয় আক্রমণ করিল, তখন তাঁহারা শিবাজীর সাহায্যবলে আত্মরক্ষা ও শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহারা শিবাজীকে কর দিতে প্রতিশ্রুত হন।

কিন্তু শিবাজী ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্বসংস্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের আশঙ্কায়, দাক্ষিণাত্যে কাবেরী উপত্যকায় অসময়ে আশ্রয়গ্রহণের জন্য "বিজয় ও বন্ধুতা" দ্বারা একটি নিরাপদ স্থান প্রস্তুত করিলেন। সহ্যাদ্রি, ঘাট ও অন্যান্য গিরিমালার শিখরস্থ পার্ব্বত্যদুর্গগুলির জীর্ণসংস্কার করিয়া, তাহাতে রীতিমত সৈন্যসন্নিবেশ ও খাদ্যদ্রব্যের সংস্থানাদি করিয়া রাখিলেন। দীর্ঘকাল অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি যে অজেয় সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছিলেন,—জয়লক্ষ্মী সকল সময়ে যাঁহাদের অঙ্কশায়িনী ছিলেন—স্বাধীনতাপ্রণোদিত সেই সৈন্যদল তাঁহার বিশেষ সহায় ছিল। কিন্তু হায়! তাঁহার অকালমৃত্যু এই বিপুল আয়োজন পণ্ড করিয়া দিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রাজ্যের শৃঙ্খলাস্থাপন, অথবা পরবর্ত্তী রাজার জন্য কোনও বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং বাধাবিমুক্ত প্রবল জলস্রোতের ন্যায় মোগল আক্রমণে তাঁহার আজীবন চেষ্টায় সংস্থাপিত মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্য ভাসিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী (শম্ভুজী) তাঁহার প্রত্যেক আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া মোগল সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করেন। পরে মোগল-সৈন্যদল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, শিবাজী তাঁহাকে পহালা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর, রায়গড়-স্থিত মন্ত্রিসভা সাম্ভাজীকে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার মন্ত্রণা করেন। কিন্তু তাঁহারা কোনও কোনও সেনানায়ককে এই ষড়যন্ত্রভুক্ত করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি হাম্বিররাও মোহিতে ইহার কিছুই জানিতেন না। সুতরাং ইহা বিফল হইয়াছিল। তাঁহার সহায়তায় সাম্ভাজী পহালা হইতে পলায়ন করেন, এবং মন্ত্রিদলকে পরাভূত করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি যে রাজ্যশাসনের বিশেষ অনুপযুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার উত্তরকালীন কার্য্যাবলীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বিমাতাকে অনশনে হত্যা করেন। তাঁহার হস্তে অনেক পুরাতন মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন।

তিনি যত দিন রাজা ছিলেন, তত দিন এইরূপ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। এই সকল কারণে তিনি পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

সাম্ভাজী স্বভাবতঃ বীরপুরুষ ছিলেন, এবং এক সময়ে বোধ হইয়াছিল যে, তিনি এই সকল নিষ্ঠুরতাসত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের সহিত যুদ্ধে মহারাষ্ট্র পরাক্রমের শৌর্য্যখ্যাতি অটুট রাখিতে পারিবেন। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। অতিরিক্ত মদ্যপানে ও নীচ আমোদ প্রমোদে দিন দিন তাঁহার মানসিক বল ও সাহসের ক্ষয় হইতে লাগিল ক্রমে তিনি প্রিয় পরিচর কলুশার পরামর্শে দৈত্যপূজা ও যাদুবিদ্যার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

রাজ্যের অষ্টপ্রধানেরা (সচিবেরা) স্বীয় পদ হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজপালনের গুরুতর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। সাম্ভাজী, শিবাজীর রাজকীয় অথবা সামরিক নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেন না। রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। সৈন্য সকল নিয়মিতরূপে বেতন পাইত না। পার্ব্বত্য দুর্গসমূহ অযত্নে জীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। রাজকর আদায়ের ভার প্রকাশ্য নিলামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। ঠিক এই সময়ে সম্রাট অওরঙ্গজেব কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ হইতে সংগৃহীত অগণ্য সৈন্যদল লইয়া "পার্ব্বত্যমূষিকের" অত্যাচারদমনে আগমন করিলেন।

এই সময়ে অওরঙ্গজেবের এক পুত্র পিতার সহিত বিরোধ করিয়া সাম্ভাজীর নিকট আশ্রয়লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাম্ভাজী তাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই। ইহাতে সম্রাটের সহিত সন্ধি করিবার একটি সুন্দর সুযোগ নষ্ট হইয়াছিল। পুরাতন মন্ত্রীরা তাঁহাকে উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। শত্রুদলের অনায়াসগতি রুদ্ধ করিবার কোনও আয়োজনই করা হইল না।

অওরঙ্গজেবের সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের তিন বৎসরের মধ্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করিল। পরে অসহায় অবস্থায় সাম্ভাজীকে অনায়াসে ধৃত করিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইহার পর মহারাষ্ট্র রাজ্যের সমতলাংশ মোগলসৈন্যে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। গিরি-দুর্গগুলিতে রীতিমত সৈন্যনিবেশ অথবা আত্মরক্ষার কোনও আয়োজন না থাকাতে, সেগুলি শীঘ্রই শত্রুগণের অধিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে রায়গড়ও অধিকৃত হইল। সাম্ভাজীর স্ত্রী পুত্র ধৃত হইয়া মোগল শিবিরে নীত হইলেন।

এইরূপে দাক্ষিণাত্যে আগমনের পাঁচ বৎসরের মধ্যে অওরঙ্গজেবের চিরজীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল। তিনি নর্ম্মদা হইতে তুঙ্গভদ্রা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। বোধ হইল, শিবাজী ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রাণপণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ষাট বৎসর ধরিয়া শিবাজী ও সাম্ভাজী যে প্লাবন প্রতিহত রাখিয়াছিলেন, তাহা এখন সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিল ও ভবিষ্যতে বাধা দিবার কোন চিহ্ন রহিল না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ তখন সুদূর শত্রুনগরে বন্দীকৃত। সাম্ভাজীর শিশু পুত্র শাহুও তদ্রূপ অবস্থায় মোগল-শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

তখন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য ভাগ্যনেমির নিম্নস্থানে অবস্থান করিতেছিল। তাহার পুনরুত্থানের কোনও আশা ছিল না। কিন্তু এই বিষম ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতেই মহারাষ্ট্র ভাগ্যরবি দীপ্তকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। শিবাজীর অধীনে শিক্ষিত এক দল স্বদেশপ্রেমিক সর্ব্বতোভাবে সাহায্যহীন ও অর্থশূন্য হইয়াও, স্বদেশকে শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া অওরঙ্গজেবের বিজয়িনী চমূকে হিন্দুস্থানে পুনঃপ্রেরণ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম বন্দিভাবে রায়গড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর তিনি

তথা হইতে পলায়ন করিয়া ইঁহাদের দলপতি হন। তখন তাঁহার বয়স বিংশতিবৎসরমাত্র। কিন্তু তিনি শিবাজীর শৌর্য্য ও সামরিক বুদ্ধি, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বভাবের মাধুর্য্য ও স্বাতন্ত্র্যানুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীদের বিশ্বাস ছিল, তিনি স্বকার্য্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন।

সাম্ভাজীর শিশু পুত্র শাহু তখন প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্রের রাজা। কিন্তু তিনি তখন মোগল-দিগের নিকট বন্দী। সুতরাং রাজারাম রাজপ্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরা এইখানে রাজারামের বিশিষ্ট অনুচর ও সহকারিগণের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব ঃ—

(১) প্রধান মন্ত্রী প্রহ্লাদ নীরাজী—ইনি শিবাজীর মন্ত্রী ন্যায়াধীশ (Chief Justice) নীরাজী রাওজীর পুত্র। সাম্ভাজীর রাজত্বকালে প্রহ্লাদ নীরাজী পদচ্যুত হইয়া সামরিক ঘটনার একজন নিঃস্বার্থ দর্শকমাত্র ছিলেন। তখন সমস্ত মহারাষ্ট্রপ্রদেশে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লোক ছিল না। মহারাষ্ট্র ইতিহাসলেখক মিঃ গ্রাণ্ট ডেফ্ সহজে ব্রাহ্মণ রাজপুরুষদিগের প্রশংসা করিতে চাহেন না; কিন্তু তিনি পর্য্যন্ত ইঁহাকে নিঃস্বার্থপর ও অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রহ্লাদ নীরাজী স্বীয় আরব্ধ কার্য্যের শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই দেশের অনেকাংশ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে সমূলে বিতাড়িত করা তখন কেবল সময়-সাপেক্ষ ছিল।

(২) হনুমন্ত রাও—ইঁহার পিতা সাহাজীর অধীনে একজন "কারকুন" ছিলেন। ইনি স্বাধীনচেতা ও নিঃস্বার্থপর বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। ইতিপূর্ব্বে রায়গড়ে অবস্থানকালে সাম্ভাজীকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহা বিফল হইয়াছিল। দেশের এই বিপদের সময় তিনি রাজারামের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এবং প্রহ্লাদ নীরাজীর সহিত একমত হইয়া তাঞ্জার "জিঞ্জি" নামক দুর্গ স্বীয় দলস্থ লোকদিগের আশ্রয়স্থানরূপে নিরূপিত করিলেন।

(৩) প্রথম পেশোয়া মোরোপন্ত পিঙ্গলের পুত্র নীলো মোরেশ্বর "জিঞ্জি" দুর্গের রক্ষক ও সামরিক আয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে দুর্গসংস্কার ও দুর্গ-প্রাকারের আবশ্যকমত নির্ম্মাণ অথবা সংস্কার আরম্ভ করিলেন।

(৪) সেনাপতি রামচন্দ্রপন্ত অমাত্য—ইনি কোহ্লাপুরে বাবদস্থিত বর্ত্তমান পন্ত অমাত্য-পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ। রামচন্দ্রের পিতা অবাজী সোনদেব শিবাজীর প্রধান অমাত্য ও সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে এত দূর বিশ্বাস করিতেন যে, স্বীয় অনুপ-স্থিতিকালে তাঁহাকে যথেচ্ছ কার্য্যনির্ব্বাহের ক্ষমতা দিতেন। এই যুদ্ধের সময় ইনি রাজারাম ও অন্যান্য দলপতিগণের স্ত্রীপুত্রের রক্ষাকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। ইনি লোকতঃ "বিদ্রোহি"-দলের অধিনেতা হইয়াছিলেন।

(৫) শঙ্করজী মল্হার—ইনি সাম্ভাজীর একজন সচিব ছিলেন। ইনি প্রথমে অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের সহিত জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বারাণসীধামে প্রস্থান করেন। সাহু রাজা হইবার পর দাক্ষিণাত্যের সৈয়দ রাজগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

(৬) পরশুরাম ত্র্যম্বক—ইনি কিল্লির "কুলকরণী" ছিলেন ও সেতারাবিভাগস্থিত ঔন্ধের পন্ত প্রতিনিধিপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ।

(৭) শঙ্করজী নারায়ণ—ইনি ভোর প্রদেশের পন্ত সচিবপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ। উপরি-

লিখিত দুই জন সেনাপতি রামচন্দ্র পন্তের প্রধান সহকারী ছিলেন। ইঁহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনাদের কার্য্যসম্পাদন করিতেন।

(৮ ও ৯) ধনাজী যাদব ও সান্তাজী ঘোরপাদ—দায়িত্বজনক কার্য্য সকল ইঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। প্রথমে ইঁহারা সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে ১৬৭৪ অব্দে গন্‌হলের নিকটে যে যুদ্ধ, প্রথমে সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও শেষে জয়লাভ করিয়া বিশেষ খ্যাত হইয়া উঠেন। ত্রয়োদশবৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সৈন্যের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরাক্রান্ত মোগলদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা রাজারাম প্রভৃতির সহিত জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু পরে মোগলদিগকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে তাঁহাদের ভাণ্ডার অর্থশূন্য। কিন্তু তাহাতে ভগ্নমনোরথ না হইয়া সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। লুণ্ঠন দ্বারা সৈন্যদিগের বেতন, আরোহণের অশ্ব, অস্ত্রাদি ও খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে দেশময় বড় অত্যাচার হইতে লাগিল। ইঁহাদের উপর্য্যুপরি আক্রমণে মোগলসেনা ব্যতিব্যস্ত ও ভীত হইয়া পড়িল। এইরূপে ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত না হইতেই মোগলসৈন্য দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রসেনা ক্রমে সাহস পাইয়া গুজরাট, মালব, খান্দেশ ও বেরার আক্রমণ ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এই সময়ে সান্তাজী গুপ্তশত্রুর চক্রান্তে নিহত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার তিনভ্রাতা অতি দক্ষতার সহিত সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহারা গুটি ও সন্দু নামক স্থানে ক্ষুদ্ররাজত্বস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাহুর রাজ্যারোহণ পর্য্যন্ত ধনাজী জীবিত ছিলেন।

অন্যান্য মহারাষ্ট্র দলপতিদিগের মধ্যে খান্দারাও দাবাদের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতা শিবাজীর সময়ে "তেলিগোঁয়া"র "পাটিল" ছিলেন। তিনিও প্রথমে জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে, বিশেষতঃ গুজরাট ও খান্দেশ-প্রদেশে, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন আরম্ভ করেন। "ধার" ও "দেওয়ান"এর পওয়ার-পরিবারের আদি-পুরুষ তাঁহার একজন সহযোগী ছিলেন। ইনি বহু দিন জীবিত ছিলেন। সাহুর রাজা হইবার পর পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ চৌথের সনন্দগ্রহণের জন্য যখন দিল্লী গিয়াছিলেন, ইনি তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র সেনাপতিরা স্ব স্ব অনুচরবর্গকে মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহে চৌথ ও শ্রীদসামুখী আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করেন। এইরূপে পরশোজী ভোঁশ্লে গণ্ডবন ও বেরারপ্রদেশে, নিম্বলকার "গঙ্গাথাদি" (?), দাবাদে গুজরাট ও ও খান্দেশ প্রদেশের চৌথ আদায়ের ভার পাইয়াছিলেন। অন্যান্য সেনানায়কেরা কর্ণাট অথবা মোগলাধিকারচ্যুত দেশে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"প্রভু" দলপতিদিগের মধ্যে খান্দেজ বল্লাল চৌৎনিস বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা শিবাজীর এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে সান্তাজী কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন। বল্লাল প্রথমে রাজারামের সহিত জিঞ্জীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে বেল্লারীর মুসলমান শাসনকর্ত্তা ছদ্মবেশী পলায়নকারীদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে, ইনি সকলকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিয়া, তথায় একাকী অবস্থান করেন। পরে মোগল কর্ত্তৃক ধৃত হন। শত্রুপক্ষ অত্যন্ত নির্য্যাতন করিলেও, অশেষ যন্ত্রণা সত্ত্বেও স্বীয় প্রভুর আশ্রয়স্থান প্রকাশ করেন নাই। পরে তাঁহারই সহায়তাবলে রাজারাম জিঞ্জি দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পর (কায়স্থ) দলপতিদিগের অপর এক জন, প্রয়াগজী, অওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সেতারা নগরী রক্ষা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

সহস্র বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই সকল দলপতিগণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে শীঘ্র তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তখন রাজারাম জিঞ্জি দুর্গে আপন

রবার স্থাপন পূর্ব্বক স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। সেনানায়-করা বিভিন্ন প্রদেশের চৌথ আদায়ের ক্ষমতা পাইতেছিল। তাঁহাদের লুণ্ঠনে ও উৎপীড়নে দেশবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। অওরঙ্গজেব দেখিলেন, বিদ্রোহীদিগের এই তন আশ্রয়স্থান বিনষ্ট করিতে না পারিলে, তিনি নিরাপদ হইতে পারিবেন না। এই াবিয়া তিনি অচিরে জিঞ্জিদুর্গধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেনাপতি জুলফিকির খাঁ ই কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। ১৬৯১ অব্দে জিঞ্জির অবরোধ আরব্ধ হইল। কিন্তু ১৬৯৮ ব্দের পূর্ব্বে তিনি তাহা হস্তগত করিতে পারেন নাই। দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি দেখিলেন, রাজারাম প্রভৃতি পলায়ন করিয়াছেন।

জিঞ্জি দুর্গ হস্তগত করিবার জন্য সমস্ত মোগলসেনা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং দেশের অন্যান্য অংশে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিগণ নির্ব্বিঘ্নে বলসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা মোগলসেনাদিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিলেন। জিঞ্জি দুর্গ শত্রুপক্ষের হস্তগত হওয়ায় যে দেশব্যাপী ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকার ন্যায় তাহা সত্বর অপসৃত হইল। ধনাজী যাদব ও সন্তাজী ঘোরপড়ে দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন-পূর্ব্বক জিঞ্জি পুনরধিকার করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শিবাজীর শিক্ষিত কতকগুলি সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। আর মোগলশিবির লুণ্ঠন করিয়াও যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল।

ইহা ব্যতীত মহারাষ্ট্রসেনা বিভিন্ন নায়কের অধীনে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছিল। ১৬৯২ অব্দে রামচন্দ্র পন্ত বিশালগড় হইতে সেতারায় উপস্থিত হইয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ শাসন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপ্রেরিত সেনাদল রায়গড়, পাহালা ও মিরাজ অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্র অধিকারের "সীমান্ত শিবিরে" পরিণত করিল। এই সকল বিভিন্ন দলের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ১৬৯৩ অব্দে অওরঙ্গজেব ভীমা নদীর তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে আসাদ খান ও আপনার এক পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৬৯৪ অব্দে সন্তাজী ঘোরপড়ে মোগল সম্রাটের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত দেশসমূহে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চিমে রামচন্দ্র পন্ত সসৈন্যে সোলাপুর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৬৯৫ অব্দে সন্তাজী, পরসোজী ভোঁশ্লে ও নিম্বলকারকে বেরার দেশ লুণ্ঠন করিবার ভার দিয়া স্বয়ং কর্ণাটে উপস্থিত হইয়া জিঞ্জি দুর্গের অবরোধকারী মোগলসেনা আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে ধনাজী পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করিয়া মোগলসেনাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। অবশেষে পরাজিত মোগলেরা সন্ধিপ্রার্থনা করাতে, একটি "সাময়িক সন্ধি" সংস্থাপিত হয়। ইহার সর্ত্তানুসারে মোগল সেনাপতি অবরোধ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। অওরঙ্গজেব এই সন্ধির বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও আসাদ খান ও স্বীয় পুত্রকে পদচ্যুত করিয়া জুলফিকির খাঁর অধীনে আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু জুলফিকির শীঘ্র দুর্গাবরোধ আরব্ধ করিতে পারিলেন না।

সন্তাজী উপস্থিতবিপন্মুক্ত হইয়া বিজাপুরস্থ সম্রাট-শিবিরের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে "দোদারি"র যুদ্ধে বিজাপুরের মোগল শাসনকর্ত্তা কাসিম খাঁকে পরাভূত করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। হিম্মত খাঁ নামক অপর এক জন সেনাপতিও পরাভূত হইয়া বন্দী হয়েন।

১৬৯৭ অব্দে পুনরায় জিঞ্জি দুর্গের অবরোধ আরব্ধ হইল। কিন্তু রাজারাম ইতঃপূর্ব্বেই

তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৬৯৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে জিঞ্জিদুর্গ মোগল সেনার হস্তগত হয়।

জিঞ্জি হইতে পলায়নের পর রাজারাম সেতারায় রামচন্দ্র পন্তের সহিত মিলিত হন। অন্যান্য দলপতিরা ক্রমে তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। এই সময়ে কর্ণাট ও দ্রাবিড় প্রদেশে রীতিমত যুদ্ধ চলিতেছিল। ধনাজী যাদব তথায় বিশেষ দক্ষতা সহকারে মহারাষ্ট্র অধিকারগুলি রক্ষা করিতেছিলেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য দুর্গগুলি তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিত। এ দিকে খানোজী আঙ্গ্রে বোম্বাই হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

১৭০০ অব্দে অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের পার্ব্বত্য দুর্গমালার অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজে সৈনাপত্য গ্রহণ করেন ও জুলফিকির খাঁকে রাজারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগল সম্রাট ক্রমে ক্রমে সমস্ত পার্ব্বত্যদুর্গগুলির অধিকার করিয়া অবশেষে সেতারা অবরোধ করিলেন। বহুদিন ধরিয়া আত্মরক্ষার পর সেতারা শত্রুকরতলগত হইল।

ঠিক এই সময়ে রাজারামের মৃত্যু হয়। শাহু তখনও মোগল শিবিরে বন্দী, সুতরাং রাজারামের দশমবর্ষীয় পুত্র রাজা হইলেন। রামচন্দ্র পন্ত পূর্ব্বের ন্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেনাপতিগণ আহূত হইয়া ধনাজীর অধীনে মোগলসেনার সহিত অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র চৌথ ও শ্রীদশমুখী সংগৃহীত হইতে লাগিল।

কিন্তু গিরিদুর্গই মহারাষ্ট্র সেনার প্রধান আশ্রয়স্থান। সেগুলি শত্রুকরতলগত হওয়ায় তাঁহাদিগকে সমতল রাজ্যাংশে ছড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদিগকে নূতন যুদ্ধপ্রণালীর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যুগপৎ খান্দেশ, বেরার ও গুজরাট আক্রমণ করিলেন। এক দল নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া মালবপ্রদেশে শিবির স্থাপন করিল।

অবশেষে ১৭০৬ অব্দে, সেনাপতিগণের পরামর্শানুসারে, অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সন্ধির প্রধান সর্ত্তগুলি এই ;—

১। মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রদেশ আক্রমণ করিবেন না।

২। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে ছয়টি সুবায় চৌথ ও সরদশমুখী আদায় করিতে পারিবেন।

ইহা ব্যতীত সম্রাটের মতানুসারে শাহুর সহিত সিন্ধিয়া ও যাদব নামক দুই সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলসেনাপতির দুই কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ অকলকোট, ইন্দাপুর, নেবাস ও বারামতী নামক চারিখানি জায়গীর প্রদত্ত হইবে, ইহাও স্থির হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সকল সর্ত্তে সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। সুতরাং আবার যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা পিমালা অধিকার করিয়া তথায় শিবাজী (রাজারামের পুত্র) ও তাঁহার মাতা তারাবাঈএর বাসস্থান স্থির করিল। পবনগড়, সিংহগড় ও রায়গড় শীঘ্রই পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ১৭০৭ অব্দে ধনাজী পুণা চামন অধিকার করেন। ইঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করা দুঃসাধ্য দেখিয়া অওরঙ্গজেব তাঁহাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করিবার উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহার প্ররোচনায় সাম্ভাজীর পুত্র শাহু মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে পরামর্শ দিয়া মহারাষ্ট্র সেনাপতিদিগকে একখানি পত্র লেখেন। কিন্তু ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সন্ধির প্রস্তাব ও শাহুর এই পত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শেষ দশায় অওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র যুদ্ধের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তখন তাঁহার বিপুল সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজকোষ অর্থশূন্য। বিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে মোগল সম্রাটের অজেয় শৌর্য্যখ্যাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিজে অত্যল্পমাত্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া পটপণ্ডপে কালক্ষেপ করিতেছেন। তখন তাঁহার মনে ভীষণ অনুতাপ ও হতাশার উদয় হইল। অবশেষে তিনি আমেদনগরে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, জুলফিকির খাঁর পরামর্শানুসারে আজিম শা শাহুকে মুক্ত করেন। শাহু মহারাষ্ট্রগণের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলে, আজিম শাহ তাঁহাকে স্বরাজ্য—যাহা তাঁহার পিতামহ কর্ত্তৃক বিজাপুর রাজ্য হইতে অধিকৃত হইয়াছিল—ভীমা ও নর্ম্মদা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী জায়গীরগুলি প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শাহু মুক্ত হইবার পর সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশে রাজরূপে স্বীকৃত হইয়া ১৭০৮ অব্দে সেতারা নগরে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ছয়টি সুবায় শাহুর চৌথ ও সরদশমুখী আদায়ের ক্ষমতা স্বীকার করেন, এবং পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে বালাজী বিশ্বনাথ পেশোয়া দিল্লী হইতে স্বরাজ্যপ্রদেশ চৌথ ও সরদশমুখী আদায়ের রীতিমত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে কুড়ি বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে, বোধ হয়, এই কয় বৎসরের ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষাবিখ্যাত। শিবাজীকে কখনও সমগ্র মোগলসেনার সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই। অবশ্য তিনি যখন মহারাজ জয়সিংহের নিকট সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন, তখন তাঁহাকে কতকটা আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রদলপতিগণের এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী যুদ্ধে অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে প্রথমে কোনও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই ; তাঁহাদের অর্থবল ছিল না ; তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রথমে এক এক জন ক্ষুদ্র সর্দ্দারমাত্র ছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত ও একমত হইয়া পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিয়া স্বদেশকে স্বাধীন করিয়াছিলেন। শিবাজী স্বীয় বীর্য্য ও প্রতিভার দ্বারা সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের উপর এক মোহজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর হইয়াছিল ; কিন্তু এই সকল সেনানায়কদিগের সে সমস্ত কিছুই ছিল না। তাঁহারা একমাত্র অধ্যবসায়বলে মোগল-বিক্রমে পরাজিত ও ভীত দেশবাসিগণকে স্বাধীনতার জন্য অকাতরে কষ্ট সহ্য করিতে ও প্রাণবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সাম্ভাজীর নিষ্ঠুরতা ও বিশৃঙ্খল রাজপ্রণালী দ্বারা দক্ষ পুরাতন কর্ম্মচারিগণ নিহত অথবা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান বল পার্ব্বত্যদুর্গাশ্রয়। সেগুলিও তখন অব্যবস্থায় জীর্ণ হইতেছিল ; ক্রমে তাঁহাদের রাজা নিহত হইলে, এক জন অপরিণতবয়স্ক যুবা তাঁহাদের দলপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি দক্ষ, স্বদেশপ্রেমিক ও প্রভুভক্ত ব্যক্তি এই দলভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরাক্রমেই মহারাষ্ট্র দেশে পুনরায় স্বাধীনতা-সূর্য্য সমুদিত হইয়াছিল।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। "রাজটীকা" গল্পটি সুন্দর। ইহার আদ্যোপান্ত উজ্জ্বল বিদ্রূপরাগে রঞ্জিত। "মদনভস্মের পূর্ব্বে" ও "মদনভস্মের পর" দুইটি খণ্ড কবিতা, কিন্তু পরস্পর যোগসূত্রে সম্বদ্ধ। এই কবিতাযুগলের ছন্দ ও ধ্বনি পরমরমণীয়। বিশেষতঃ "মদনভস্মের পর" ইতিশীর্ষক কবিতাটির রচনাকৌশল ও শব্দচয়নচাতুরী অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। শিল্পী কবিতা দেবীর মন্দিরগঠনে অত্যন্ত অবহিত হইয়া, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কিছু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বোধ করি অনতিক্রমণীয়। কেন না, শব্দসঙ্গীত-সৃষ্টির মোহে একান্ত মুগ্ধ হইলে অন্য দিকে কবির দৃষ্টি থাকে না। "প্রবাদপ্রসঙ্গ" একটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ।

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" একটি সুচিন্তিত ও সুরচিত প্রবন্ধ। বিদ্যাসাগরের এই চরিত্র-চিত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের মৌলিক চিন্তাপ্রবণতা ও বিশ্লেষণশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গ্রথিত "হীরার মূল্য" একটি সুন্দর ক্ষুদ্র গল্প। সুনিপুণ লেখক অতিসাবধানে অথচ অবলীলাক্রমে রহস্যরক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগরিত রাখিয়াছেন। তাঁহার লয়লা পাঠককে অনবরত বিস্ময়-চমকে চমকিত করিয়া উপসংহারে যখন পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গিনীর ন্যায় গল্প-রঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিত হয়, তখন লয়লার মিলনানন্দে পাঠকের চিত্তও আনন্দ-বেদনাবিধুর ও চঞ্চল হইয়া উঠে। অল্প পরিসরের মধ্যে এই গল্পে দক্ষিণ হয়দরাবাদের বিলাস-লীলাচঞ্চল ওমরাহ-সমাজের ছবিখানির যে ছায়া পড়িয়াছে, তাহা যেমন মনোরম, তেমনই অভিনব।

মুকুল। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। মুকুলের পূজার পরিচ্ছদ যেমন উজ্জ্বল, তেমনই সুন্দর। "রামতনু লাহিড়ী" প্রবন্ধটি যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নাই। "মুকুল" সকল সম্প্রদায়ের বালকবালিকার চিরসহচর হয়, এই আমাদের প্রার্থনা। নীতিধর্ম্মের সাধারণ মূলসূত্র সার্ব্বজনীন, তাহাতে সম্প্রদায়ভেদে মতভেদের সম্ভাবনা নাই। "মুকুল" সেই বিস্তৃত উদার ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেই ভাল হয়। সকল বালক থিয়োডোর পার্কার নহে; তাই মনে হয়, তাহাদের বিবেকবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক মতগঠনের ভার গুরুজনের হস্তে ন্যস্ত রাখিলে মন্দ হয় না। "করুণার জয়" গল্পটি সুন্দর। "গাছের আহার" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি অতি সুন্দর। লেখকের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তাঁহার বলিবার প্রণালী তেমনই সরল। "গোপাল ভাঁড়" যে কয়টি গল্প বলিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে। "বাহবা!" পূজার মুকুলের প্রধান অলঙ্কার। শিশুপাঠ্য সাহিত্যে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সকলের অগ্রণী। এই কবিতাটি তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে; আমরা অনেক শিশুর মুখে "বাহবা"র আধ-আধ আবৃত্তি শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা রচনার আর কি সাফল্য বা পুরস্কার হইতে পারে! "মজার মুল্লুক" একটি রহস্যপূর্ণ সচিত্র কবিতা। কবিতাটি বালকবালিকাদের উপযোগী ও সুন্দর হইয়াছে।

যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয়।

১

প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করা যে যারপরনাই কষ্টকর, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। যাহাকে আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করি, সেরূপ ভাবের কোনও প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কাজেই ভারতের তাৎকালিক কোনও তত্ত্বের নির্ণয় করিতে হইলে বহুল পরিমাণে অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। রাশি রাশি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার করা বড়ই দুষ্কর। তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ না করিলেও একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আবার ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে পরস্পরের মত এত বিভিন্ন যে, তাহাদের সাহায্য লইলেও প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অদম্য অধ্যবসায়ে প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা আমাদের পক্ষে অপরিসীম আনন্দের কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের মুদ্রা-আবিষ্কার ও তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার দ্বারা এ দেশে এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থসমূহের আলোচনা করিয়া, মুদ্রা, তাম্রফলক প্রভৃতির আবিষ্কার দ্বারা যে সকল নূতন নূতন প্রত্নতত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকেও বহুলপরিমাণে অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। কাজেই তাঁহাদের সকল সিদ্ধান্তগুলিই যে অকাট্য প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত, তাহা বলা যাইতে পারে না। এই সকল আনুমানিক প্রমাণের দ্বারা আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি লইয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসও লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐতিহাসিক তত্ত্বের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। যত দিন হইতে ইতিহাস-রচনার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্রিত; ইতিহাসেতর গ্রন্থের ত কথাই নাই। এমন কি, দুই শত বা এক শত বৎসর পূর্ব্বের ঐতি-

হাসিক তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেও অনেক স্থানে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের নির্ণয় করা যে অতীব দুরূহ ব্যাপার, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ণীত কোনও কোনও বিষয়ে আমাদের মত যদি কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে সাধারণে যে বিশেষ দোষগ্রহণ করিবেন না, অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস আমরা করিতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেইরূপ দুই একটি মতপার্থক্যেরই উল্লেখ করিব।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ণীত ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে, অব্দ বা সময়-নির্দ্ধারণ একটি প্রধান বিষয়। একটি কথা এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, এই সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্দ্ধারণে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও সকলে একমত নহেন। এই অব্দনির্দ্ধারণেও তাঁহাদের যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। তবে এই অব্দ-নির্ণয়ে তাঁহারা সকলেই একটিমাত্র মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া থাকেন। মূলসূত্র এক হইলেও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন হইয়া পড়ে। উক্ত মূলসূত্রটি আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়। গ্রীক্ ইতিহাসের নির্দ্দেশানুসারে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২১ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয় করেন। এই বৈদেশিক সাক্ষ্য যে একটি প্রধান প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে উক্ত বৈদেশিক সাক্ষ্য হইতে ইহা বুঝায় না যে, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েই গ্রীকবিজয় সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ অনুমানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আলেকজাণ্ডারের সময় যে চন্দ্র-গুপ্তের উল্লেখ আছে, তিনি মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত। এ বিষয়ে আমাদের মত স্বতন্ত্র। যাহা হউক, এই একমাত্র নির্ণীত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহারা গ্রীক-বিজয়ের পূর্ব্ব পশ্চাৎ সমস্ত বিষয়ের সময় স্থির করিতে চেষ্টা করেন; তাহাতে অনেক স্থলে তাঁহাদের যে সিদ্ধান্তবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে ভূদেব বাবু যাহা বলিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।—"ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিবৃত্তিক কালনির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যতই গবেষণা করুন, সমুদায় গবেষণার মূল একটিমাত্র কথা। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একজন গ্রীকজাতীয় রাজদূত রাজধানী পাটলীপুত্রে আসিয়াছিলেন। সেই রাজদূতের প্রণীত গ্রন্থ আছে, এবং উহা কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল তাহা জানা আছে, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময়ও তদ্দ্বারা জানা হইয়াছে। এই একমাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া অপর সমু-দায় ঐতিহাসিক বিবরণের সময়নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার যথেষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত মিলাইবার কোন উপায় না থাকায়, বিচারকদিগের মধ্যে অপরিসীম মতভেদ জন্মিয়া যায়, এবং প্রকৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না পারিলে, বিচার যেরূপ গলদ্-গোময় হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ১১২-১১৩ পৃঃ) কেবল এক গ্রীকবিজয়ের উপর নির্ভর করিলে যে সকল ঘটনার সময়নির্দ্ধা-রণ করা যায় না, ইহা প্রকৃত কথা। গ্রীকবিজয় কেহই অস্বীকার করেন না, আমরাও তাহা স্বীকার করিয়া থাকি। তবে তাহা যে চন্দ্রগুপ্তের সময় ঘটিয়াছিল, ইহার কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই, এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত যে মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং কাহার সময়ে প্রকৃত গ্রীকবিজয় ঘটিয়াছিল, ইহা প্রমাণিত করিতে না পারিলে, কেবল গ্রীক-বিজয়ের দ্বারা অন্যান্য সময়ের নিরূপণ কিরূপে হইতে পারে? এ সকল বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যুধিষ্ঠিরের সময়নির্দ্ধারণ আমাদিগের একটি প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত উদ্ধৃত না করিয়া আমরা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের মত এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; কারণ, রমেশ বাবু তাঁহাদের সকলের প্রতিধ্বনি; তাঁহার মত জানিতে পারিলে অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদেরই মত জানা হইবে। এই জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদের মত উদ্ধৃত না করিয়া এ স্থলে রমেশ বাবুর মতেরই উল্লেখ করি-তেছি। তিনি বলেন যে, খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়া-ছিল। মগধের প্রাচীন বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল হইতে বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত ৩৫ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রত্যে-কের ২০ বৎসর রাজত্ব ধরিলে খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উক্ত যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পুনশ্চ, মুদ্রাপরিদর্শনে স্থির হইয়াছে যে, কাশ্মীরের রাজা কনিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র অভিমন্যু উক্ত শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক, অর্থাৎ রাজতরঙ্গিণীকার বলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে অভিমন্যু পর্য্যন্ত ৫২ জন রাজা ১২৬৬ বৎসর পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দী স্থির হইতেছে। কিন্তু তিনি ইহার পর বলিতেছেন যে, আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর প্রকৃত

সময় নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তাঁহার মতে বুদ্ধদেবের যে সময়, তাহাও ঐ এক গ্রীকবিজয় অবলম্বন করিয়া স্থির করা হইয়াছে। কনিষ্কের সময় মুদ্রাপরিদর্শনে আবিষ্কৃত, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ আনুমানিক। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে অভিমন্যুর সময় ১২৬৬ বৎসর হইলে, কনিষ্ক বা তৎপুত্র অভিমন্যুর সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হয় না। রাজতরঙ্গিণীকার সুস্পষ্টরূপে কুরুক্ষেত্রের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা যদি তাঁহার একাংশের প্রমাণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে অপরাংশের প্রমাণই বা অকারণে পরিত্যাগ করিব কেন? আমরা স্বমতস্থাপনের সময় রাজতরঙ্গিণীর মত স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিব। রমেশ বাবুর কথা হইতে জানা যাইতেছে যে, সময়নির্দ্ধারণের মূল সূত্র—Keynote সেই গ্রীকবিজয়; এক্ষণে সেই গ্রীকবিজয়ের রহস্যোদ্ভেদ হইলে, বোধ হয়, আর কোনও গোল থাকে না। আমরা পরে সে বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিব। রমেশ বাবুর মতের সম্বন্ধে এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; আমাদের মতস্থাপনের সময়ে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইবে।

এক্ষণে আমরা আর একজন মহারথীর নিকট অগ্রসর হইতেছি। তিনি কেবল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রতিধ্বনি নহেন, তাঁহার নিজের মৌলিকতাও যথেষ্ট আছে। এই কুরুক্ষেত্রের সময়নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ন্যায় গ্রীকবিজয় প্রভৃতি ব্যতীত নিজেরও কয়েকটি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য তাঁহার সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। যদিও তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মতের প্রচার আমাদের পক্ষে অতিসাহসের কর্ম্ম, তথাপি আমাদের চিত্তে যেরূপ ধারণা হয়, সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে না। তিনি আমাদের বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, যে সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত খৃঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলেন, তাঁহাদের মত ভ্রান্ত, এবং দেশীয়গণ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে কলির প্রথমে হইয়াছিল বলেন, এবং সেই সময়ে মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাও ভ্রান্তিপূর্ণ। এই দুই মতের খণ্ডনের জন্য তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মতে, কলির প্রথমে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ঠিক নহে। রাজতরঙ্গিণীকারের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে গোনর্দ্দ কাশ্মীরের রাজা হন। গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। তাহা হইলে ২৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ

পাওয়া যায়। আমরা এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, এক্ষণে কল্যব্দ ৪৩৯৯। বঙ্কিম বাবু রাজতরঙ্গিণীর এই খৃঃপূঃ ২৪০০ বৎসরের সহিত বিষ্ণুপুরাণের মতপার্থক্যস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কলির প্রথমেই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, আমরা যদিও এ কথা স্বীকার করি না বটে, তথাপি রাজতরঙ্গিণীকারের মতই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি, এবং ইহার সহিত বিষ্ণুপুরাণের যে বিশেষ পার্থক্য নাই, ইহাও আমাদের ধারণা। যাহা হউক, আপাততঃ বঙ্কিম বাবু কি বলিতেছেন, দেখা যাউক। তিনি প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন,—

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥ ৩৩॥
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাষাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥ ৩৪॥
৪র্থ অংশ; ২৪ অ।

পরে ইহার এইরূপ অর্থ করিতেছেন,—"সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্ব্ব দিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মধ্যনক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন। সপ্তর্ষি পরিক্ষিতের সময় মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" সুতরাং পরিক্ষিতের সময় কলির দ্বাদশ শত বৎসর হইলে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯০০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। 'তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ' এই শ্লোকার্দ্ধের বঙ্কিম বাবুর কৃত 'তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল' এই অর্থ সমীচীন নহে। আমরা তাহা পরে দেখাইব। সুতরাং উক্তশ্লোকানুসারে খৃঃ পূঃ ১৯০০ বৎসর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় স্থির হয় না। এ সমস্ত বিষয় পরে আলোচিত হইতেছে। ইহার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, ৩৪ শ্লোক অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে খৃঃ পূঃ ১৯০০ অব্দে হয়, এই গণনা ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সহিত মিলে না। ৩৩ শ্লোক সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল বা Great Bear অথবা Ursa Major কতকগুলি স্থির তারা; মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থির তারা; স্থির তারার গতি নাই, তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে, ইংরাজীতে তাহাকে Precession of the Equinoxes বলে। হিন্দুমতে এই গতি ৫৪ বিকলা।

এক এক নক্ষত্রে ১৩⅓ অংশ। এ হিসাবে কোনও স্থির তারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে, শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া সপ্তর্ষি রাশিচক্রের বাহিরে,মঘা রাশিচক্রে ; ইংলণ্ড যেমন ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। বঙ্কিম বাবুর এই সমস্ত উক্তি সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

(১) সপ্তর্ষিমণ্ডল যে Great Bear বা Ursa Major, তাহার সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন; তাঁহারা Pliades বা কৃত্তিকা-নক্ষত্রকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলিতে চাহেন। শুনিয়াছি, পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রীরও এই মত। কৃত্তিকাকে সাধারণতঃ 'সাতভেয়ে' তারা বলে ; সম্ভবতঃ সেই কারণে সপ্তর্ষির সহিত ইহার একতাস্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু কৃত্তিকায় সাধারণতঃ ছয়টি নক্ষত্রের অধিক দেখা যায় না। আমরা কিন্তু Great Bear-কেই সপ্তর্ষি বিবেচনা করি। তবে Great Bearএর বিরুদ্ধে কেহ কেহ কৃত্তিকা খাড়া করেন বলিয়া আমরা তাহারও উল্লেখ করিলাম। অবশ্য, সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, সে সম্বন্ধে কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ আমরা আপাততঃ দিতে সক্ষম নহি বটে, কিন্তু একেবারে বিষয়টি কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারি না। কারণ, কোনও নিরপেক্ষ গণিত-বিশারদ জ্যোতিষী সপ্তর্ষির উক্ত শত বৎসর এক এক নক্ষত্রে পরিভ্রমণ সম্বন্ধে অদ্যাপি বিচার করেন নাই। একমাত্র বেণ্টলী সাহেব এ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আলোচনা পূর্ব্বাপর এত এক-দেশদর্শী যে,সে বিচারে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি মত দিতে পারেন না। একমাত্র বেণ্টলী সাহেবের মত লইয়া সপ্তর্ষির গতি কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঠিক নহে। পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে, গর্গ, পরাশর, আর্য্যভট্ট, বরাহ-মিহির প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষিগণ এই সপ্তর্ষির গতির বিষয় নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই একটা যে কিছু ইহার মধ্যে আছে, এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। উক্ত গতি সম্বন্ধে গণনার বিষয় এক্ষণে আমাদের নিকট অজ্ঞাত, এইরূপ বলিলেই যথেষ্ট হয়। বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থির তারা, মঘা নক্ষত্রও কতক-গুলি স্থির তারা ; সুতরাং যখন স্থির তারার গতি নাই, তখন সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্র কেমন করিয়া পরিভ্রমণ করিবে ? অতএব যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষি যে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। বঙ্কিম বাবু এতগুলি কথা স্পষ্ট করিয়া

না বলিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য যে এইরূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিম বাবুর ঐরূপ আপত্তি যথার্থ হইলে তাঁহার আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, সপ্তর্ষির অবস্থানই বা কোথায়, এবং মঘারই বা অবস্থান কোথায়, এবং সেই দুই অবস্থান চিরকাল একই থাকিবে, কখনও তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। বঙ্কিম বাবু না বলিলেও আমরা বলিয়া দিতেছি যে, যে হিসাবে দেশীয় গ্রন্থকারগণ সপ্তর্ষির মঘা নক্ষত্রে অবস্থানের কথা বলেন, উভয়ে স্থির তারা হইলে সে হিসাবে সপ্তর্ষির অবস্থান আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি আকাশমণ্ডলে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঘা বা সিংহ রাশির সমসূত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিতি করিতেছে। যখন সিংহ রাশির প্রকাশ, তখনই সপ্তর্ষির প্রকাশ, তাহার অস্তে সপ্তর্ষিরও অস্ত। অতএব যখন উভয়ে স্থির তারা হইলে চিরকাল সপ্তর্ষি মঘায় আছে, এরূপ বুঝা যাইতেছে। যে সকল হিন্দু জ্যোতিষী দৃগ্‌গণিতের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা কি এই সামান্য বিষয়টি লক্ষ্য করেন নাই যে, মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি চিরকালই আছেন ? তবে বুঝিতে হইবে যে, সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অন্য কোনওরূপ গণনা ছিল, যাহা এক্ষণে আমাদের নিকটঃ অপরিজ্ঞাত। রাশিচক্রের নক্ষত্র বলিয়া হিন্দুজ্যোতিষীরা যাহা বুঝেন, তাহা যে একেবারেই স্থির তারা বলিয়া বুঝেন, এমন নহে। সচল রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগকে তাঁহারা এক একটি নক্ষত্র বলেন, তাহার মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জ পড়িয়া যায়, তাহারাও সেই নামে অভিহিত হয়। সুতরাং মঘাকে স্থির তারা বলিয়া যে তাঁহারা স্বীকার করেন,এরূপ বলা যায় না। তবে সে হিসাবে গণনা করিতে হইলে বিষুবের গতির সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা ১০০ বৎসর সপ্তর্ষির গতি নির্ণয় করা যে কঠিন হয়, সে বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর অভিমত আমরা অস্বীকার করি না। তবে রাশিচক্রের সহিত সপ্তর্ষির সম্বন্ধ হওয়া যে অসম্ভব, তাহা আমরা স্বীকার করি না। কিরূপভাবে সপ্তর্ষির সহিত রাশিচক্রস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের সম্বন্ধ হয়, আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিতেছি। ফলতঃ, সপ্তর্ষির গতির সম্বন্ধে আমরাও স্পষ্ট করিয়া যখন কিছুই বলিতে পারি না, তখন সে বিষয় লইয়া অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। বঙ্কিম বাবু সপ্তর্ষির গতি লইয়া যেরূপ ভাবে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের গ্রন্থকারগণ

কেবল সপ্তর্ষির দ্বারাই বর্ষ গণনা করিতেন। বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা অন্যান্য অনেক উপায়ে বর্ষাদির গণনা করিতেন, সূক্ষ্মভাবে গণনা করিবার তাঁহাদের অন্যান্য অনেক উপায় ছিল। সপ্তর্ষির গণনা মোটামুটি গণনামাত্র। সুতরাং তাঁহারা যে কেবল সপ্তর্ষির গণনা দ্বারা শত বৎসর স্থির করিতেন, এরূপ নহে। বরঞ্চ অন্যান্য উপায়ে শত বৎসর স্থির করিয়া, তদ্দ্বারা সপ্তর্ষির এক নক্ষত্র হইতে আর এক নক্ষত্রে গমন, এই একটি নাম প্রদান করিতেন, এরূপও বলা যাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে,—

যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৩২ ॥

অর্থাৎ, পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর। তাহার পর লিখিতেছেন,—

তে তু পরিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম। ৩৪।

অর্থাৎ, পরিক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন।

ইহার পর লিখিতেছেন,—

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নন্দের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। এই কয়টি শ্লোকের দ্বারা কি বুঝায়? প্রথমতঃ, পুরাণকার যে পরিক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান ১০১৫ বৎসর বলিলেন, ইহা কি সপ্তর্ষির গতি অনুসারে গণনা করিয়া, না অন্য কোনও উপায়ে তাহা স্থির করিয়াছেন? অবশ্য ইহা অন্য কোনও উপায়েই স্থির করিয়াছেন। কারণ, সপ্তর্ষির গতির দ্বারা ১০১৫ এরূপ সূক্ষ্ম গণনা এখানে হইতে পারে না। কারণ, পরিক্ষিতের সময় মঘার কত অংশে সপ্তর্ষি ছিলেন, এবং নন্দের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ার কত অংশে তাঁহাদের অবস্থান ছিল, ইহা না জানিলে, ১০১৫ পর্য্যন্ত গণনা করা যায় না। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। আর যে সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরে এক এক নক্ষত্রমাত্র, তাহারা কোন নক্ষত্রের কত অংশে আছে, দৃক্‌গণিতের দ্বারা তাহা স্থির করিয়া পরে বর্ষগণনা নিতান্ত সহজ নহে। ফলতঃ, বিষ্ণুপুরাণের বচন দ্বারা সপ্তর্ষির গতিগণনায় ১০১৫ বৎসর স্থির হয় না। ১০০০, ১১০০ ইত্যাদি হইতে পারে, কিন্তু ১০১৫, ১০২০, এরূপ সূক্ষ্ম গণনা হয় না; কাজেই

সপ্তর্ষির গতি একটি মোটামুটি গণনা, এবং কেবল উহা দ্বারাই শত বৎসর নির্ণীত হইত না। সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরের একটি নামান্তরমাত্র। যদি শত বৎসরের ঐরূপ একটি সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহা কাল্পনিক হউক, বা প্রকৃত হউক, তাহাতে প্রকৃত সময়গণনার যে বিশেষ গোলযোগ হয়, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, পূর্ব্ব গ্রন্থকারগণ ঐ সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত করিতেন না, ইহা ঠিক। অতএব বঙ্কিম বাবু সপ্তর্ষির উপর আক্রমণ করিলেও প্রকৃত গণনার কিছুই ক্ষতি হয় না।

(২) তৎপরে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে হওয়ায় মঘানক্ষত্রে থাকা অসম্ভব; যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কিরূপে সপ্তর্ষি-মণ্ডল এক এক নক্ষত্রে থাকে, পুরাণকার নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিলে বঙ্কিম বাবুর কথার উত্তর হইবে। পুরাণকার লিখিতেছেন,—

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্ ॥

স্বামী ইহার এইরূপ টীকা লিখিতেছেন,—"তত্র যৌ পূর্ব্বৌ প্রথমোদিতৌ পুলহক্রতুসংজ্ঞৌ দৃশ্যেতে তয়োস্তৎপূর্ব্বয়োশ্চ মধ্যে সমং দক্ষিণোত্তর-রেখায়াং সমদেশাবস্থিতং যদশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষ্বন্যতমনক্ষত্রং দৃশ্যতে, তে তথৈব যুক্তা নৃণামব্দশতং তিষ্ঠন্তি।" অর্থাৎ, পুলহ ও ক্রতুর মধ্যে দক্ষিণোত্তর রেখার সমদেশস্থিত যে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র থাকে, তাহা দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডল যুক্ত হয় বুঝায়। পুলহ ও ক্রতু সপ্তর্ষির সর্ব্ব পশ্চিমে। পুলহ ও ক্রতুর মধ্য হইতে দক্ষিণোত্তরে রেখা টানিয়া তাহাতে অবস্থিত করা বুঝাইলে, রাশিচক্রের ভিতর বাহির লইয়া যে বড় একটা আসিয়া যায়, এমন বোধ হয় না। এই 'সমসূত্র' কথাটি বঙ্কিম বাবু নিজের অনুবাদেও দিয়াছেন, অথচ, 'ইংলণ্ডের ভারতবর্ষের অবস্থানের ন্যায় সপ্তর্ষির মঘাতে অবস্থান কথাটি' কেন লিখিলেন, বলিতে পারি না।

(৩) বিষ্ণুপুরাণের ৩৩ শ্লোকে লিখিত আছে,—

তে তু পরিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥

বঙ্কিম বাবু ইহার অর্থ করিতেছেন, "সপ্তর্ষি পরিক্ষিতের সময়ে মঘা

নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" এই অর্থ যে সমীচীন নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ' পদটি কলির বিশেষণ; ইহার অর্থ এইরূপ যে, যে কলির পরিমাণ দ্বাদশশত বৎসর, সেই কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কলির দ্বাদশ শত বৎসর নহে। কলির মোট পরিমাণ যত, সেইটিই এইখানে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কলির পরিমাণ দ্বাদশ শত দিব্য বৎসর, এখানে সেই পরিমাণেরই কথা বলা হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী টীকায় লিখিতেছেন,—"তদা সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ.....সন্ধ্যারূপমতিক্রমৎ স্বেন রূপেণ প্রবৃত্তঃ প্রকর্ষেণ বৃত্ত ইত্যর্থঃ।" ঐ শ্লোকের ভাগবতের টীকায় আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন,—"দ্বাদশাব্দশতাত্মক ইতি দিব্যেন মানেন সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ যো দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ স কলিঃ তদা সন্ধ্যামতিক্রম্য প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।" সুতরাং বঙ্কিম বাবুর কৃত অর্থ সমীচীন নহে। বঙ্কিম বাবু যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইলে, "কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ" এইরূপ পাঠ না হইয়া "কলের্দ্বাদশাব্দঃ শতাত্মকঃ" এইরূপ পাঠ হইত। এখানে 'দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ' পদটি কলির বিশেষণ হওয়ায়, যে কলির পরিমাণ দ্বাদশ শত দিব্য বৎসর, সেই কলিই প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এইরূপ বুঝিতে হইবে। কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এরূপ অর্থ নহে। তাহা হইলে, বঙ্কিম বাবু বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক দ্বারা যে খৃঃ পূঃ ১৯০০ বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে।

ইহার পর বঙ্কিম বাবু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরিক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান ১০১৫ বৎসর, এবং নন্দের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। পরিক্ষিতের সময় ইঁহারা মঘাতে ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর আবার বিষ্ণুপুরাণকে আশ্রয় করিয়া ১০০ বৎসর নন্দবংশের রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন, ইহার পরে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক। বঙ্কিম বাবুর মতে, আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে ভারত আক্রমণ করেন, এবং খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন। ৩১৫ এর সহিত নন্দবংশের ১০০, এবং নন্দ ও পরিক্ষিতের ব্যবধান ১০১৫, এই ১১১৫ যোগ করিলে ১৪৩০ খৃঃ পূঃ হয়, এবং ইহাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। এখানেও বঙ্কিম বাবুকেও সেই মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় যে গ্রীক-বিজয় ঘটিয়াছিল, সেই মূলসূত্র অবলম্বন করিতে হইয়াছে। উক্ত মূলসূত্র সম্বন্ধে

আমরা পরে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব বলিয়া এক্ষণে উক্ত প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম। যাহা হউক, বঙ্কিম বাবু খৃঃ পূঃ ১৪৩০কে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় বলেন।

উক্ত সময়নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তিনি "চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ" বলিয়া জ্যোতিষের প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, এবং তাহাকে অখণ্ডনীয় প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। আমরা তাঁহার উক্ত প্রমাণের মর্ম্ম প্রদান করিয়া আমাদের মন্তব্যপ্রদানেরও চেষ্টা করিতেছি।

বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, বৎসরের যে দুই দিনে দিবারাত্রি সমান হয়, তাহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার ৯০° অন্তর অয়নপরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর বলিতেছেন যে, মহাভারতে লিখিত আছে যে, ভীষ্ম উত্তরায়ণে মরিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পর মাঘমাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।

তাহা হইলে, তখন মাঘমাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ ও তৎপূর্ব্ব দিনকে মকর-সংক্রান্তি বলিলেও, এখন ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, যখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ হইত, এবং তখনই ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইত। এখনও ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এক্ষণে আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং ১লা মাঘেও পূর্ব্বের ন্যায় উত্তরায়ণ হয় না। এক্ষণে ৭ই বা ৮ই পৌষ (২১ এ ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ক্রান্তিপাতবিন্দুর গতির জন্য অয়নপরিবর্ত্তন বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। এই অয়ন-চলনই Precession of the Equinoxes; হিন্দুদিগের মতে তাহা বৎসরে ৫৪ বিকলা; ইউরোপীয়দিগের এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। বঙ্কিম বাবু ষ্টকওয়েলের ৫০·৪৩৮ বিকলা মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের কোন দিনে, তাহা লিখিত নাই। বঙ্কিম বাবু বলেন, মহাভারতের সময়েও সৌরমাস প্রচলিত ছিল। সৌর-মাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের মৃত্যু হয়, তাহা লিখিত নাই। মাঘের শেষে

হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটি বলা হয় না। ২৮এ মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির মোটামুটি গতি ৪৮ অংশ। কিন্তু রবির শীঘ্র ও মন্দগতি প্রযুক্ত ৭ই পৌষ হইতে ২৯এ মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট ৪৪°·৪ পাওয়া যায়। ঐ ৪৪°·৪ লইলে খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায় ; ৪৮° পুরা লইলে ১৫৩০ হয়। ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোনও মতেই হইতে পারে না। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া যায়, তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। দ্বাপরের শেষে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের যুদ্ধ হইলে, সৌরচৈত্রে উত্তরায়ণ হইত; চান্দ্রমাঘও কখনও সৌরচৈত্রে হইতে পারে না।

বঙ্কিম বাবুর মতের মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

(১) বঙ্কিম বাবু মহাভারতের শ্লোকার্দ্ধ লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বিচার করা তাঁহার উচিত ছিল। উক্ত শ্লোকার্দ্ধে সমস্ত বুঝা যায় না। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই,—

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লে ভবিতুমর্হতি ॥

নীলকণ্ঠ ইহার টীকায় লিখিতেছেন,—"মাঘোঽয়মিতি সৌম্যশ্চান্দ্রঃ মাসস্য চতুর্ভাগীকরণে সার্দ্ধসপ্ততিথের্ভাগত্বাৎ অষ্টম্যর্দ্ধস্যানতীতত্বেন প্রথমভাগস্য বিদ্যমানত্বাৎ ত্রিভাগশেষো ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ তেনাদ্যাষ্টমীতর্থ্যঃ॥" এই শুক্লাষ্টমীর কথা নীলকণ্ঠ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভকালেও উল্লেখ করিয়াছেন। এবং গ্রন্থান্তর হইতেই, "হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী। প্রবৃত্তং ভারতযুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে। অর্জ্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘমাসে সিতাষ্টমী। ত্রয়োদশ্যান্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ।" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও মহাভারতের অন্যান্য স্থানের বচন উদ্ধৃত করিয়া এক বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। সে সমস্ত কথা এ স্থলে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। যাহা হউক,তিনি 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' ইত্যাদি সম্পূর্ণ শ্লোকটির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, চান্দ্র মাঘের শুক্লাষ্টমী অদ্য উপস্থিত। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে লিখিত আছে যে,—"যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে।" উক্ত অনুবাদে ত্রিভাগশেষ কথাটি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, এবং চান্দ্রমাসেরও কথা নাই।

'পবিত্র' কথায় বোধ হয় যে, 'পবিত্র' সৌম্যেরই অনুবাদ। তাহা হইলে মাঘ চান্দ্র না হইয়া সৌরও হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে ত্রিভাগশেষ যোগ করিলে সৌর মাঘের কোন্ দিন ভীষ্ম বলিতেছেন, তাহা বুঝা যায়। বঙ্কিমবাবু উক্ত শ্লোকের মাঘ মাসকে সৌর কি চান্দ্র বলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। এ কথাটি তাঁহার স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত ছিল। উক্ত শ্লোকের 'সৌম্য' ও 'ত্রিভাগশেষ' কথাটি লইয়া নানারূপ অর্থ হইতে পারে। 'সৌম্য' কথাটিতে চান্দ্র ও পবিত্র এই দুই অর্থ হইতে পারে। আর 'ত্রিভাগশেষ' লইয়া শ্লোকটির ৪।৫ প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, 'ত্রিভাগশেষ' কথাটির অর্থ দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। ত্রিভাগশেষ, গত অর্থাৎ তিন ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, এক ভাগ মাত্র আছে, এইরূপ এক অর্থ হয়; এবং ত্রিভাগ শেষ, অবশেষ, অর্থাৎ এক ভাগ গিয়াছে, ও তিন ভাগ আছে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। তাহার পর সৌম্যকে চান্দ্র বলিলে, এবং ত্রিভাগশেষকে মাসের বিশেষণ ধরিলে তদ্দ্বারা দুই প্রকার অর্থ হয়; আবার সৌম্যকে পবিত্র বলিলে, সৌর ও চান্দ্র দুই মাসের ত্রিভাগশেষ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার ত্রিভাগশেষকে পক্ষের বিশেষণ ধরিলে তাহা হইতেও দুই অর্থ হয়। সুতরাং উক্ত শ্লোকটি হইতে যখন এত প্রকার অর্থ হয়, তখন বঙ্কিমবাবু কোন্ প্রকার অর্থের পক্ষপাতী, তাহা প্রকাশ না করিলে, উক্ত শ্লোক লইয়া কোন একটি সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। যদিও বঙ্কিম বাবুর ন্যায় সাধারণভাবে ধরিয়া লইলে একেবারেই যে অর্থ হয় না, এমন নহে, তথাপি সমস্ত শ্লোকটির অর্থ তিনি কি বুঝেন, এবং তদ্দ্বারাই সিদ্ধান্ত যে স্ফুটতর হয়, সে বিষয়ে, বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না।

(২) বঙ্কিম বাবু বলেন যে, এখন আর ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হয় না, কিন্তু ৭ই। ৮ই পৌষ হইয়া থাকে। এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু তিনি পরে বলিতেছেন যে, যে সময়ে ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত, সে সময়ে আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ হইত। কিন্তু এ আশ্বিন সৌর কি চান্দ্র, তাহা বঙ্কিম বাবু বলেন নাই। কিন্তু আশ্বিন সৌরই হউক কি চান্দ্রই হউক, ১লা আশ্বিন বৎসরারম্ভ হইলে কোনরূপে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইতে পারে না। চান্দ্র আশ্বিন হইলে ১লা পৌষ উত্তরায়ণ হইবে, ১লা মাঘ হইবে না। ১লা আশ্বিন হইতে ৯০° অন্তর ১লা পৌষ, ১লা মাঘ নহে। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, বিষুবের অর্থাৎ বৎসরারম্ভের ৯০° অন্তর অয়ন পরিবর্ত্তন হয়।

হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটি বলা হয় না। ২৮এ মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির মোটামুটি গতি ৪৮ অংশ। কিন্তু রবির শীঘ্র ও মন্দগতি প্রযুক্ত ৭ই পৌষ হইতে ২৯এ মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট ৪৪°·৪ পাওয়া যায়। ঐ ৪৪°·৪ লইলে খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায় ; ৪৮° পুরা লইলে ১৫৩০ হয়। ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোনও মতেই হইতে পারে না। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া যায়, তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। দ্বাপরের শেষে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের যুদ্ধ হইলে, সৌরচৈত্রে উত্তরায়ণ হইত ; চান্দ্রমাঘও কখনও সৌরচৈত্রে হইতে পারে না।

বঙ্কিম বাবুর মতের মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

(১) বঙ্কিম বাবু মহাভারতের শ্লোকার্দ্ধ লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বিচার করা তাঁহার উচিত ছিল। উক্ত শ্লোকার্দ্ধে সমস্ত বুঝা যায় না। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই,—

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লে ভবিতুমর্হতি ॥

নীলকণ্ঠ ইহার টীকায় লিখিতেছেন,—"মাঘোঽয়মিতি সৌম্যশ্চান্দ্রঃ মাসস্য চতুর্ভাগীকরণে সার্দ্ধসপ্ততিথের্ভাগত্বাৎ অষ্টম্যর্দ্ধস্যানতীতত্বেন প্রথমভাগস্য বিদ্যমানত্বাৎ ত্রিভাগশেষো ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ তেনাদ্যাষ্টমীতর্থ্যঃ॥" এই শুক্লাষ্টমীর কথা নীলকণ্ঠ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভকালেও উল্লেখ করিয়াছেন। এবং গ্রন্থান্তর হইতেই, "হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী। প্রবৃত্তং ভারতযুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে। অর্জ্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘমাসে সিতাষ্টমী। ত্রয়োদশ্যান্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ।" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও মহাভারতের অন্যান্য স্থানের বচন উদ্ধৃত করিয়া এক বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। সে সমস্ত কথা এ স্থলে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। যাহা হউক, তিনি 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' ইত্যাদি সম্পূর্ণ শ্লোকটির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, চান্দ্র মাঘের শুক্লাষ্টমী অদ্য উপস্থিত। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে লিখিত আছে যে,—"যাহা হউক, এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র মাঘমাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে।" উক্ত অনুবাদে ত্রিভাগশেষ কথাটি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, এবং চান্দ্রমাসেরও কথা নাই।

'পবিত্র' কথায় বোধ হয় যে, 'পবিত্র' সৌম্যেরই অনুবাদ। তাহা হইলে মাঘ চান্দ্র না হইয়া সৌরও হইতে পারে। সুতরাং তাহাতে ত্রিভাগশেষ যোগ করিলে সৌর মাঘের কোন্ দিন ভীষ্ম বলিতেছেন, তাহা বুঝা যায়। বঙ্কিমবাবু উক্ত শ্লোকের মাঘ মাসকে সৌর কি চান্দ্র বলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। এ কথাটি তাঁহার স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত ছিল। উক্ত শ্লোকের 'সৌম্য' ও 'ত্রিভাগশেষ' কথাটি লইয়া নানারূপ অর্থ হইতে পারে। 'সৌম্য' কথাটিতে চান্দ্র ও পবিত্র এই দুই অর্থ হইতে পারে। আর 'ত্রিভাগশেষ' লইয়া শ্লোকটির ৪।৫ প্রকার অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, 'ত্রিভাগশেষ' কথাটির অর্থ দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। ত্রিভাগশেষ, গত অর্থাৎ তিন ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, এক ভাগ মাত্র আছে, এইরূপ এক অর্থ হয় ; এবং ত্রিভাগ শেষ, অবশেষ, অর্থাৎ এক ভাগ গিয়াছে, ও তিন ভাগ আছে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। তাহার পর সৌম্যকে চান্দ্র বলিলে, এবং ত্রিভাগশেষকে মাসের বিশেষণ ধরিলে তদ্দ্বারা দুই প্রকার অর্থ হয় ; আবার সৌম্যকে পবিত্র বলিলে, সৌর ও চান্দ্র দুই মাসের ত্রিভাগশেষ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার ত্রিভাগশেষকে পক্ষের বিশেষণ ধরিলে তাহা হইতেও দুই অর্থ হয়। সুতরাং উক্ত শ্লোকটি হইতে যখন এত প্রকার অর্থ হয়, তখন বঙ্কিমবাবু কোন্ প্রকার অর্থের পক্ষপাতী, তাহা প্রকাশ না করিলে, উক্ত শ্লোক লইয়া কোন একটি সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। যদিও বঙ্কিম বাবুর ন্যায় সাধারণভাবে ধরিয়া লইলে একেবারেই যে অর্থ হয় না, এমন নহে, তথাপি সমস্ত শ্লোকটির অর্থ তিনি কি বুঝেন, এবং তদ্দ্বারাই সিদ্ধান্ত যে স্ফুটতর হয়, সে বিষয়ে, বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না।

(২) বঙ্কিম বাবু বলেন যে, এখন আর ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হয় না, কিন্তু ৭ই। ৮ই পৌষ হইয়া থাকে। এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু তিনি পরে বলিতেছেন যে, যে সময়ে ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত, সে সময়ে আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ হইত। কিন্তু এ আশ্বিন সৌর কি চান্দ্র, তাহা বঙ্কিম বাবু বলেন নাই। কিন্তু আশ্বিন সৌরই হউক কি চান্দ্রই হউক, ১লা আশ্বিন বৎসরারম্ভ হইলে কোনরূপে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইতে পারে না। চান্দ্র আশ্বিন হইলে ১লা পৌষ উত্তরায়ণ হইবে, ১লা মাঘ হইবে না। ১লা আশ্বিন হইতে ৯০° অন্তর ১লা পৌষ, ১লা মাঘ নহে। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, বিষুবের অর্থাৎ বৎসরারম্ভের ৯০° অন্তর অয়ন পরিবর্ত্তন হয়।

তাহা হইলে, ১লা আশ্বিন হইতে ৯০° অন্তর ১লা পৌষই হয়, ১লা মাঘ হয় না। তিনি আবার বলিতেছেন যে, ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরব্ধ হয়। কিন্তু এ কথাও ঠিক নহে। যেমন সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে সেই সময় হইতে সৌর বৎসরের গণনা হয়, সেইরূপ চান্দ্রবৎসর গণনা করিতে হইলে চন্দ্রকেও অশ্বিনী নক্ষত্রে আসিতে হইবে। ফসলীও চান্দ্র বৎসর। চান্দ্রমাস পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ হয়। চন্দ্র যেখানে থাকে, তাহার সমসপ্তমে সূর্য্য না থাকিলে পূর্ণিমা হয় না। সুতরাং যে সময়ে চন্দ্র মেষ রাশির আদিতে আশ্বিনী নক্ষত্রে থাকিবে, সে সময় সূর্য্যকে তাহার সপ্তমে তুলা রাশির আদিতে থাকিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ১লা কার্ত্তিক হইতেই বৎসর আরম্ভ হওয়া সম্ভব, কদাচ ১লা আশ্বিন নহে। প্রকৃত কথা এই যে, অশ্বিনী পৌর্ণমাসীর পর হইতে চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হইবে। তাহা চান্দ্র মাসের ১লা কার্ত্তিক। কিন্তু সৌর মাসের দিনের পার্থক্য হইয়া থাকে। সুতরাং সৌর ১লা আশ্বিন ঠিক করিয়া বলাই যাইতে পারে না। আর চান্দ্র ১লা কার্ত্তিক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আশ্বিনকে সৌর মাস ধরিলে আরও গোলযোগ হয়। কারণ, সৌর বৎসরারম্ভের ২৭০° পরে উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। বঙ্কিম বাবুর আশ্বিন যদি সৌর হয়, তাহা হইলে, উত্তরায়ণ ১লা আষাঢ়ে হইবে; কদাচ ১লা মাঘ নহে। সুতরাং ১লা আশ্বিনে বৎসর ধরিলে, তাহা সৌরই হউক বা চান্দ্রই হউক, ঠিক কোনরূপে ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হয় না। ১লা আশ্বিনে, যৎকালে সৌরই হউক বা চান্দ্রই হউক বৎসরারম্ভ হইত, (যদি কোন কালে হইয়া থাকে) অয়ন-চলন দ্বারা গণনা করিলে তাহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয়। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, এবং ১লা আশ্বিনে কোন সময়ে বৎসরারম্ভ হইত, বঙ্কিম বাবু তাহা না বলায়, আমরা উক্ত বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না।

(৩) বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন যে, সৌরমাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা লিখিত নাই। অবশ্য উক্ত শ্লোকের যেরূপ নানাবিধ অর্থ করা যায়, তাহাতে সৌরমাঘের কোন্ দিনে ভীষ্মের প্রাণত্যাগ হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন বটে। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, "মাঘোঽয়ং" শ্লোকের সৌম্য কথাটি পবিত্র অর্থে ধরিয়া লইলে, তাহা সৌর ও চান্দ্র দুই মাসই হইতে পারে, এবং ত্রিভাগশেষের দুই অর্থের যে কোন অর্থ লইয়া সৌরমাঘের কোন

দিন, তাহাও স্থির করা যাইতে পারে। সুতরাং একেবারে লিখিত নাই, তাহা বলা যায় না। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে, সে সময়ে মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে শেষ দিন নহে; কারণ, তাহা হইলে "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটি হইতে পারে না। সেই জন্য তিনি মাঘ মাসের ২৮এ উত্তরায়ণ হইয়াছিল ধরিয়া, এখনকার প্রকৃত উত্তরায়ণদিন, অর্থাৎ ৭ই। ৮ই পৌষ হইতে ২৮ মাঘের ব্যবধান ৪৮ দিনে রবিস্ফুট ৪৪ অংশ ৪ কলা ধরিয়া অয়ন-চলন দ্বারা খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর স্থির করিয়াছেন; এবং উক্ত ৪৮ দিনে পূর্ণ ৪৮ অংশ ধরিয়াও ১৫৩০ খ্রীঃ পূঃ স্থির করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত ১৪৩০ খ্রীঃ পূর্ব্ব কুরুক্ষেত্রের সময় নির্ণয় করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিতেছেন যে, সে সময়ে সৌরমাঘের কোন দিন উত্তরায়ণ হইয়াছিল, তাহা লিখিত নাই, অথচ তিনি ২৮এ মাঘ ধরিতেছেন। তাঁহার কথানুসারে ধরিতে গেলে, ১লা মাঘ হইতে ৩০ এ মাঘ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ হওয়া সম্ভব, এরূপ বলাই উচিত; তাহা হইলে অয়ন-চলন দ্বারা ১লা মাঘ হইতে ৩০ মাঘ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টজন্মের ৩য়, ৪র্থ শতাব্দী হইতে খ্রীঃ পূঃ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রের সময় নির্ণয় করিতে হয়। তাহাতে দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক ব্যবধান হইবার সম্ভব। সেরূপ গণনা নিতান্ত প্রবল বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমবাবু ১২৬৩ খ্রীঃ পূঃ স্থির করিবার জন্য ২৮এ মাঘ ধরিয়াছেন। কিন্তু নিজেই বলিতেছেন যে, একেবারে শেষ দিন ধরা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটা বলা হয় না। ২৯এ বা ৩০এ না ধরিয়া ২৮এ ধরিলে কি 'সমনুপ্রাপ্তঃ' প্রয়োগ রক্ষা হয়? 'সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, মাঘ মাসের কতক দিন গত হইয়াছে, একেবারে শেষ হইয়া আসে নাই; বঙ্কিমবাবুও তাহাই বলেন। কিন্তু তাঁহার ২৮এর সহিত ২৯এ, ৩০এর বড় অধিক পার্থক্য নাই। যদিও বঙ্কিমবাবু উক্ত ১২৬৩ খ্রীঃ পূঃ ও ১৫৩ খ্রীঃ পূঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একরূপ শেষ সময় বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বে আর হইতে পারে না, এরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সময় কি, তাহা তাঁহার জ্যোতিষ-প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হয় নাই। হইতে পারে, তাহা খ্রীঃ ষষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়াছিল; তাহা বেণ্টলী স্থির করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উক্ত জ্যোতিষের প্রমাণ বলবৎ নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। মাঘমাসের কতক দিন গত হইলে ভীষ্মের মৃত্যু হয়, এ কথা ঠিক, এবং 'সমনুপ্রাপ্তঃ' কথায় একেবারে শেষ দিকেও নহে, ইহাও বুঝা যায়। তাহা

হইলে সে সময়ে কোন দিনে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়া হস্তিনাপুরে যান। তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিবার পর, সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইয়াছে দেখিয়া, ভীষ্মের সৎকারোপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিয়া, হস্তিনাপুর হইতে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাহার পরই ভীষ্ম বলিতেছেন, 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' ইহাতে কি বুঝা যায় না—মকরসংক্রান্তিতেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল? পূর্ব্বকালের লোকেরা দৃগ্‌গণিতের দ্বারা অয়নাদির নির্ণয় করিতেন, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এখনকার ন্যায় পঞ্জিকার বাঁধাবাঁধি নিয়মে, অর্থাৎ দৃগ্‌গণিত পরিত্যাগ করিয়া কেবল বচন দ্বারা সময়াদি নির্ণীত হইত না। সুতরাং সে সময়ে যে দিন সূর্য্যের অয়নপরিবর্ত্তন হইত, সেই দিনকেই তাঁহারা উত্তরায়ণ বা মকরসংক্রান্তি বলিতেন। এই অয়ন হিন্দুগণনানুসারে প্রায় ৬৭ বৎসরে ১ দিন পিছাইয়া থাকিত। যে দিনে পিছাইত, সেই দিনই তাঁহাদের মতে মকরসংক্রান্তি হইত। ৬৭ বৎসর পরে উক্ত ১ দিন তাঁহারা ক্রমে পিছাইয়া লইয়া গণনা করিয়াছেন। সে হিসাবে বৎসরারম্ভেরও পরিবর্ত্তন হইত। ৬৭ বৎসর পরে একদিনের পিছানতে বিশেষ কোনও গোলযোগ হইত না। এইরূপে ৬৭ বৎসর অন্তর ১ দিন করিয়া পিছাইয়া বৎসর গণনা করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সময় হইতে অয়নচলন আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কাজেই এখনকার উত্তরায়ণের সময় ধরিয়া পূর্ব্বকালের সময় নির্ণয় করিতে গেলে কোনও মতেই তাহা স্থির করা যায় না। পূর্ব্বকালে দৃগ্‌গণিত প্রচলিত ছিল, এবং অয়ন-চলনও যে প্রচলিত ছিল, তাহাও ঠিক। মধ্যে নিরয়ন মতের প্রচলন হওয়ায়, এই সায়ন মত বরাবর চলিয়া আসিতে পারে নাই; তাহার পর আবার যখন ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন হইতে আবার সায়ন মতের প্রচলন আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে মকরসংক্রান্তিও বর্ত্তমান ৯। ১০ই পৌষ এই উভয়বিধ অয়ন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। নিরয়ন মত প্রচলিত হওয়ায়, মকরসংক্রান্তিই অয়নকাল বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু পূর্ব্বকালে যে সেই মকরসংক্রান্তি ৬৭ বৎসরে ১ দিন করিয়া পিছাইত, নিরয়ন মত তাহা গণনার মধ্যে আনিত না। সায়ন মত পুনর্ব্বার প্রচলিত হওয়ায় পৌষমাসের শেষে মকরসংক্রান্তি হইতে ক্রমে ৯। ১০ পর্য্যন্ত অয়নপরিবর্ত্তন কত বৎসরে হইয়াছে, এই সময় নির্ণয় করা যায় মাত্র। অর্থাৎ, এখন হইতে কত বৎসর পূর্ব্বে

আবার সায়নমত প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায় মাত্র। তাহার পূর্ব্বকার সময় কিছুতেই নির্দ্ধারিত হয় না। কারণ, মধ্যে নিরয়ণ মত প্রচলিত থাকায়, চিরদিনই মকরসংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ হইত। এক্ষণে যেমন পঞ্জিকায় মকরসংক্রান্তি বলিলে পৌষের শেষ বুঝিতে হয়, এবং তাহাকে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি বলে, অথচ প্রকৃত উত্তরায়ণ দেখিতে গেলে ৯। ১০ই পৌষের নিকট আসিতে হয়, তখন উত্তরায়ণ বলিলে পৌষের শেষই বুঝাইত। নিরয়ণের পূর্ব্বে যখন সায়ন মত প্রচলিত ছিল, তখন তাঁহারা উত্তরায়ণকে ৬৭ বৎসর অন্তর এক দিন পিছাইয়া আনিতেন, এবং কোন সময় হইতে এইরূপে পিছান আরম্ভ হয়, তাহার কোনও উল্লেখ না থাকায় অয়ন-চলনের দ্বারা কদাচ পূর্ব্বকালের সময় নির্ণীত হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলিলে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। সৌর চৈত্রের উত্তরায়ণ কাল ৫ হাজার বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে হয়। উক্ত বিষয়ে আমাদের বিশেষ বক্তব্য আর নাই। বঙ্কিমবাবু আমাদের গুরুস্থানীয়, তাঁহার যুক্তি-খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে যে কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে তিনি জ্যোতিষের যে প্রমাণ দ্বারা কুরুক্ষেত্রের সময়নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট তত বলবৎ মনে না হওয়ায়, আমরা তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথামাত্র বলিলাম। আপাততঃ আমরা যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত হইলাম। আগামী বারে যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয় সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

ভানুমতী।

৯

অমাবস্যার ঘোরা কৃষ্ণা মহানিশি প্রভাত হইতেছে। জননী প্রকৃত নৃমুণ্ডমালিনী সাজিয়া এ মহানিশিতে এ অঞ্চলে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রকৃত পূজা সৃষ্টিসংহারকারিণীর বুঝি আর কখনও হয় নাই। শ্মশানবাসিনীর পূজার রাত্রিতে এমন প্রকৃত মহাশ্মশান বুঝি আর কখনও সজ্জিত হয় নাই।

সমস্ত বঙ্গদেশ সারারাত্রি উৎসবক্ষেত্র—আর এ অঞ্চল মহাশ্মশান! আনন্দ-আলোকের পার্শ্বে এরূপে নিরানন্দের ছায়া ধরিয়া, হায় মা! তুই উভয়ের কি মহত্ত্বই প্রতিপাদন করিস্! আনন্দ না থাকিলে নিরানন্দ, নিরানন্দ না থাকিলে আনন্দ, আমরা বুঝিতে পারিতাম না;—মানব-জীবন বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া অসহনীয় হইয়া উঠিত। আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ,—এ গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলনে তোর সংসার প্রয়াগক্ষেত্র!

রাত্রি প্রভাত হইতেছে। বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রভাত-আরতি বাজিতেছে। অনাথনাথ সমস্ত রাত্রি শোকে এবং শারীরিক ও মানসিক অবসাদে অচৈতন্য ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে স্বপ্নে বহুদিনশ্রুত, বহুদিনবিস্মৃত, মধুর বংশীরবের মত "বাবা!" সম্বোধন প্রবেশ করিল। সম্বোধনে যেন তাঁহার মৃতবৎ দেহে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি চৈতন্যলাভ করিতে লাগিলেন। আবার শুনিলেন,—"বাবা!" এবং অনুভব করিলেন, তাঁহার চরণে যেন সুকোমল সুশীতল কুসুম বর্ষিত হইয়াছে। নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, দুই হাতে ভানুমতী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে জাগাইতেছে। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র মুখখানি! কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র আয়ত নয়ন! সেই মুখে, সেই নয়নের কি কোমলতা, কি স্নেহ, কি শোক! অনাথনাথ স্থিরনয়নে সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার আবার মনে হইল,—এ বালিকা কে? এ কি মানবী? বালিকা আবার "বাবা" বলিয়া ডাকিলে, অনাথনাথ বলিলেন—"কি মা!" বালিকা বলিল—"বাবা! আমি চলিলাম। আমি ২।১ দিন পরে আবার আসিব। যদি পাই, তোমার জন্যে একখানি নৌকা লইয়া আসিব। তুমি চম্বল গ্রামে কোথাও আশ্রয় লইয়া এই দুই দিন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।"

অ। সে কি মা! তুই কোথায় যাইবি?

ভা। আমি আদিনাথ যাইব।

অ। কেন?

ভা। অমিয়কে বাঁচাইতে।

অনাথনাথ উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন,—"'হায়! মা! অমিয় কি আর বাঁচিবে?"

ভা। বাঁচিবে।

অ। না মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিয়া উঠে?

ভা। উঠে। লক্ষীন্দর আবার বাঁচিয়াছিল। সত্যবান আবার বাঁচিয়াছিল। অমিয় আবার বাঁচিবে না কেন? পত্নী যদি পতিকে বাঁচাইতে পারে, ভগ্নী ভাইকে বাঁচাইতে পারিবে না কেন?

অ। হায় মা! সে সব উপাখ্যান। রমণীদিগকে সতীধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কবিগণ এ সকল উপাখ্যানের রচনা করিয়াছেন।

ভা। না বাবা! সে সকল গল্প নহে। সকলই সত্য কথা। বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া দেবপুরে গিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়াছিল, আমি এ সমুদ্র সাঁতারিয়া ঐ দেবলোক আদিনাথে গিয়া অমিয়কে বাঁচাইব।

বালিকা বিদ্যুৎবেগে অনাথনাথের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণ-ধূলি ললাটে মাখিয়া, অনাথনাথ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবার পূর্ব্বে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। তিনি তাহাকে বারণ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, বেদে রমণীরা যেরূপ কাপড়ের দোলা করিয়া শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া পথ চলে, ভানুমতী সেইরূপে মৃতশিশুকে তাহার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, একখানি কাষ্ঠমাত্র ভর করিয়া, দু'হাতে বিশাল তরঙ্গ কাটিয়া, অবলীলাক্রমে বেগে সন্তরণ করিয়া যাইতেছে। এ শক্তি ত মানবীর নহে! এ কি তবে সত্য সত্যই সেই "কমলে কামিনী" মহাশক্তি! তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুই ক্রোশব্যাপী সমুদ্রশাখা সন্তরণ করিয়া বালিকা অপরাহ্ণে আদিনাথ গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চশেখরসানুস্থিত দেবমন্দিরে উপস্থিত হইল। বালিকার বৈরাগী পিতা গৌরদাস ভারতপূজিত স্বনামখ্যাত ৺শঙ্করপুরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলে পুরী গোস্বামী বা পুরী বাবাজি বলিয়া পরিচিত ও পূজিত ছিলেন। গৌরদাস দেহত্যাগের সময়ে বালিকাকে বলিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসর পরে তাঁহার গুরুদেব আদিনাথ দর্শন করিতে আসিবেন। সে কথাটাতে কি এক শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বালিকার প্রাণে যেন জাগিয়া রহিয়াছিল। সে দিন গণিতেছিল। সেই ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এ সময়ে আদিনাথের মন্দিরে গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। সে বেদে বেদেনীকে এই সকল কথা বলিয়াছিল। বেদে নিজেও বড় সন্ন্যাসিভক্ত ছিল। আর বেদেনী—সেও ৺পুরী গোস্বামীর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার যেরূপ গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাহার মতরূপ-গুণ-বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন রমণীরত্নকে

দেখিলেই ঘড়া ঘড়া টাকা দিবেন। অতএব উভয়ে আনন্দের সহিত বালিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাজি করিতে করিতে 'সোণাদিয়া' হইয়া আদিনাথ যাইবার পথে ঝটিকাগ্রস্ত হইয়াছিল।

বালিকা সেইরূপ উত্তরীয়বৎ বসনে পৃষ্ঠে বদ্ধ মৃত শিশু সহ অবলীলা-ক্রমে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া আদিনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং একজন ভৃত্যের কাছে শুনিতে পাইল যে, সত্য সত্যই একজন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সে সময়ে মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। আনন্দে, আবেগে, অজ্ঞাত আশায় নিরাশায়, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কম্পিত হইল। সন্ন্যাসী একটি বিশাল পার্ব্বত্যপাদপচ্ছায়ায় স্থির নয়নে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ বসিয়াছিলেন। কি মূর্ত্তি!

বীরবপু, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত উরস,
তেজঃপুঞ্জ স্বর্ণকান্তি ভস্মে আচ্ছাদিত।
জটার মুকুট উচ্চ শোভিতেছে শিরে,
আদিনাথ-অদ্রিশিরে শোভিতেছে যেন
উচ্চ চূড়া মন্দিরের। বসি যোগাসনে,
মহাযোগী, দীর্ঘ দেহ স্থির সমুন্নত।
যোগস্থ আয়ত নেত্র আকর্ণবিস্তৃত,
চাহি অর্দ্ধ-নিমীলিত মহাসিন্ধু পানে।
স্থির, শান্ত, অপলক। রুদ্রাক্ষের মালা
অচল দক্ষিণ করে। শোভিছে বরদ
বাম কর বাম অঙ্কে, যেন মহাযোগী
করিছেন বরদান জীবে, চরাচরে।
শেখর নীরব স্থির, স্থির চরাচর।
কেবল সমুদ্রানিল বহিতেছে ধীরে
কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র, উত্তরীয়-বাস
বাম-অংস-বিলম্বিত, ধীরে ধীরে ধীরে।
অপরাহ্ণ-রবিকরে ভাসে চারি দিকে
কি দৃশ্য কল্পনাতীত সিন্ধু-বসুধার।
চারি দিকে জলরাশি, অনন্ত অতল;
পশ্চিমে দক্ষিণে মহালীলা নীলাম্বুর।

উত্তরে ধবল সিন্ধু শোভা সুবিস্তৃত
সুপবিত্র পাদমূলে চন্দ্রশেখরের
নীলাকাশে সুশোভিত মেঘমালা মত,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গিত যেন চিত্রাঙ্কিত।
পূর্ব্বে শাখা সিন্ধু শ্বেতভুজ সুবিশাল
প্রসারি পয়োধি যেন রয়েছে প্রণত
আলিঙ্গিয়া আদিনাথ পবিত্র শেখর।
শোভিতেছে পূর্ব্বতীরে সমুদ্রশাখায়
চট্টলের গিরিশ্রেণী অনন্ত শৃঙ্খলে
বসুধার বক্ষে শ্যাম মরকত মালা।
ভাসিতেছে আদিনাথ গর্ভে জলধির
কি সুন্দর, সিন্ধুগর্ভে যেন নারায়ণ।

বালিকার বোধ হইল, তাহার সম্মুখে সেই যোগস্থ নারায়ণ। চারি দিকের এই মহাদৃশ্য সেই ঝটিকার পরে অপরাহ্ণ-রবিকরে কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্ত-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে! স্থান, কাল, তাহার হৃদয়ের অবস্থা—সম্মুখস্থ মহাযোগী—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভক্তিতে পরিপূরিত হইল। সমাধিশেষে যোগিবর নয়ন উন্মীলন করিলে, বালিকা তাহার পৃষ্ঠস্থিত শিশুশব তাঁহার চরণতলে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী কোমল সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি কে?"

ভা। আমি গৌরদাসের শিষ্যা-কন্যা।

স। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

ভা। পুরী বাবাজি এ সময়ে এখানে আসিতে গুরুদেবের কাছে প্রতি-শ্রুত ছিলেন।

স। শঙ্কর পুরীর মৃত্যু হইয়াছে বহু বৎসর।

ভা। তাঁহার মত মহাযোগীর মৃত্যু নাই। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

স। তুমি মা! কি তাহা বিশ্বাস কর?

ভা। করি।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিলেন।

স। কেন কর?

ভা। গুরুবাক্য কর্ণে শুনিয়াছি—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ মৃত্যুর অধীন। আত্মা অমর। চক্ষে দেখিয়াছি, শত শত মৃত জীব পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেহ যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। অতএব দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু একটা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। সে যদি এ দেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, অন্য দেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন?

সন্ন্যাসী বালিকার তেজস্বিনী বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া আবার একটু সস্নেহ হাসি হাসিলেন। যেন তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোক একটু দেখা দিয়া আবার লুকাইল।

স। তুমি আমার কাছে কি চাও?

ভা। এই শিশুর প্রাণভিক্ষা।

স। মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিতে পারে?

ভা। আমি কিরূপে মরিয়া বাঁচিয়াছিলাম? পুরী বাবাজির বাঁচাইবার শক্তি আছে।

স। অবস্থাবিশেষে জলমগ্ন জীবকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে। তাহাতেই বোধ হয় পুরী গোস্বামী তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার সে অবস্থা নহে।

ভা। নহে কেন?

স। ইহার মৃত্যু জলে ডুবিয়া হয় নাই। বিশেষতঃ এই শিশু যোগভ্রষ্ট। ইহার কিঞ্চিৎ কর্ম্মফল ভোগ করিবার ছিল। সে তাহা ভোগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৎসে! ওই সমুদ্রের স্রোতে একখানি ভগ্ন যান ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতেছ? উহা যতক্ষণ স্রোতের আকর্ষণে থাকিবে, ততক্ষণ ভাসিবে। মানুষের আত্মাও যতক্ষণ এই পার্থিব কামনা-স্রোতের আকর্ষণে থাকে, ততক্ষণ এই পৃথিবীতে তাহার পুনর্জন্ম হয়। এই স্রোতের অতীত হইলে পৃথিবীতে সে আর আসিবে না। তোমার এ জগতে কর্ম্ম আছে। তোমার দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইবে বলিয়া তোমাকে পুরী গোস্বামী পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই শিশু পুনর্জ্জীবিত হইলে তাহার পক্ষে অধোগতি হইবে, এবং সেই কর্ম্মেরও বিঘ্ন হইবে।

ভা। আমি অনাথা ভিখারিণী, বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা বাবা! কি মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে?

স। সনাতন ধর্ম্মরক্ষা। যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ যুগে যুগে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,

শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহারই ক্ষুদ্রাংশ। মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি। এই আদিনাথ, আর ওই সুদূরে মেঘের গায়ে চন্দ্রনাথ, দর্শন কর। এত তীর্থ জগতের কোথায়ও একস্থানে নাই। ধর্ম্মকর্ম্মজ্ঞানহীন মোহন্তদিগের সংস্রবে ভারতের পবিত্র তীর্থ সকলের কি দুরবস্থাই হইয়াছে! ইহারা মোহন্ত নহে, মোহান্ধ। পূর্ব্ব মোহন্তগণ তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসীর সেবায় ব্যয়িত করিতেন। ঐ চন্দ্রনাথের পূজ্যপাদ মোহন্ত গোমতীবন ও রত্নবন স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির-সমীপবর্ত্তী আস্তানে কৌপীনমাত্রপরিহিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশ অতিবাহিত করিতেন। যাত্রিগণ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেবসেবার্থ যথা ইচ্ছা দর্শনী প্রদান করিয়া এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। কিন্তু এক্ষণে কি শোচনীয় পরিবর্ত্তনই সাধিত হইয়াছে! এখন তীর্থধাম রেলওয়ে পরিণত হইয়াছে। এই মোহান্তেরা এবারে "টিকিট" কাটিয়া, তীর্থধামের সমক্ষে ঘেরা দিয়া, প্রহরী রাখিয়া, বলপূর্ব্বক দর্শনীর স্থানে এত কাল "কর" আদায় করিতেছিলেন। এই অর্থরাশি এবং তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় এখন তাহাদের আত্মসেবায় নিঃশেষ হইতেছে। দেবতা, অতিথি ও সন্ন্যাসীর সেবা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দির ও সোপানাবলী পর্য্যন্ত সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে। কেবল এখানে বলিয়া নহে মা! ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই শোচনীয় অবস্থা।

ভা। বাবা! রাজা কেন এই ভণ্ড মোহন্তদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তীর্থগুলি রক্ষা করেন না?

স। ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য। আসমুদ্র হিমাচল, আগান্ধার চট্টগ্রাম এরূপ প্রগাঢ় ভারত যুধিষ্ঠিরের সেই ধর্ম্মরাজ্যের পর আর কখনও ভোগ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। এক দিকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, আমাদের দর্শনের সূক্ষ্ম জটিলতা তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন। বাক্য মনের অগোচর পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন 'প্রতিমা' যে পুতুল নহে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অতএব আমাদের সার্ব্বভৌম ধর্ম্মকে তাঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া তাহার প্রশ্রয়

দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করেন। অন্য দিকে প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাই তাঁহাদের রাজ্যের একটি মূল নীতি। বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবর্ষে ইহা যে উত্তম নীতি, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা না করিলে কে ধর্ম্মরক্ষা করিবে? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজশক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। এক এক জন অবতার আসিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপন করেন; যতদিন রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে থাকে, ততদিন তাহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। রাজশক্তি অপসারিত হইলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। এইরূপে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যচ্ছায়া, এবং বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে অশোকের রাজ্যচ্ছায়া ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। রাজশক্তির অবলম্বন অভাবে আর্য্যধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইংরাজ রাজা বলেন, তাঁহাদের নীতির রাজ্য। তীর্থ সম্বন্ধেও রাজনীতি আছে। প্রজাগণ সেই নীতির অনুসরণ করিয়া আপন আপন তীর্থ রক্ষা করুক।

ভা। বাবা! প্রজারা তাহা করে না কেন?

স। মা! কে করিবে? হিন্দু ধর্ম্ম জীবনহীন; হিন্দু সমাজ মৃত। তবে চট্টগ্রামবাসীদের সাহস আছে, উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে। মহাঝড়েও অর্ণবযানের পালদণ্ডের শীর্ষদেশে উঠিতে চট্টগ্রামবাসী ভয় করে না। পুরী গোস্বামী মনে করিয়াছিলেন, এখানে যদি হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজে জীবন সঞ্চার করিতে পারেন, একটি শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে নৈসর্গিক শোভাসম্পন্ন এই পুণ্যস্থানের তীর্থগুলি রক্ষা করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ এখানের তীর্থগুলির যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। এই কারণে তিনি মুক্তহস্তে শস্য ছড়াইয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র কিছুরই বিচার করেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, যে বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পড়িবে, তাহা হইতে সুফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু হায়! প্রায় সকল বীজই ঊষর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিসন্ধির মহত্ত্ব, তাঁহার দীক্ষার গভীরত্ব এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, উদারতা, সমপ্রাণতা, ইহারা কিছুই বুঝে নাই। শুনিলাম, কোনও একজন অবস্থাপন্ন শিষ্য অম্লানমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি তীর্থরক্ষাব্রতে যোগদান করিতে পারেন না; কারণ, কোন মোহন্ত ও তিনি উভয়েই পুরী গোস্বামীর শিষ্য। হা পুরী গোস্বামি! তুমি কি এই ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছিলে? তুমি কি শিক্ষা দিয়াছিলে যে, কোনও শিষ্য ঘোরতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলেও তোমার শিষ্যগণ তাহাকে সেই কার্য্য

হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার প্রশ্রয় দিবে? বারংবার এ অঞ্চলে আসিয়া তোমার বুঝি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের এই অধোগতি দেখিয়া বুঝি তুমি ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলে, তাহাতেই বুঝি তোমার অকালে দেহত্যাগ ঘটিল!

সন্ন্যাসীর নয়নে জল আসিল। বালিকার নয়নেও জলধারা বহিল। বালিকা গলদশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা! ইংরাজ রাজা দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছেন। চোর তস্করের দণ্ড দিতেছেন। যাহারা দেববিত্ত চুরি করিতেছে, তাহারাও কি চোর নহে? তাহাদেরও অন্য চোরের মত দণ্ড দেওয়া কি রাজার উচিত নহে?"

স। উচিত। কিন্তু এ পথেও দুটি অন্তরায়। ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যদি ইহাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভয় করেন যে,—"রাজা হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেন"—বলিয়া সমস্ত দেশ চীৎকার করিয়া উঠিবে। তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। সমস্ত দেশ বরং তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। চীৎকার করিবে কেবল মুষ্টিমেয় লোক। ইহাদের অধিকাংশই মোহন্তদের উচ্ছিষ্টভোজী। কেবল কয়েক জন মাত্র আশঙ্কা করেন যে, ইংরাজ রাজাকে তীর্থে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তীর্থবিত্ত যাহা এখন মোহন্তরা ভোগবিলাসে ও পাপকার্য্যে ব্যয়িত করিতেছে, তাহা রাজকোষে যাইবে। ইহারা ইংরাজ রাজপুরুষদের সাধু উদ্দেশ্যে প্রায় সকল বিষয়েই অল্পাধিক বিশ্বাসহীন। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তীর্থগুলির রক্ষা না করিলে দুরাচার মোহন্তদের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করিবে কে? এ দরিদ্র দেশে যাহারা ধনী, তাহারা সকলেই উপাধিব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের এখন ধর্ম্ম—উপাধি, অর্থ—উপাধি, কাম—উপাধি, মোক্ষ—উপাধি! অন্য দিকে দেবতার কৃপায় মোহন্তদের প্রভূত অর্থ-বল। ইহাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কে সর্ব্বস্বান্ত হইবে? মোহন্তরা বিলাত পর্য্যন্ত না করিয়া ছাড়িবে না। ২০ বৎসরেও এই বিবাদ বিচারালয়ে শেষ হইবে না। ইতিমধ্যে বিবাদী মোহন্ত সমস্ত দেববিত্তের ধ্বংস করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এই বিবাদে তীর্থের কোনও উপকার হইবে না। কেবল অভিযোগকারীর সর্ব্বনাশ। যদি এই হিমালয়স্বরূপ অন্তরায় না মানিয়া কেহ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অভিযোগ করিতে অগ্রসর হয়, তখন দ্বিতীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাজপুরুষেরা পূর্ব্বে সমাজের নেতাদের সঙ্গে

পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। এখন আর তাহা করেন না। সুতরাং ক্রমে নেতৃগণ এই কারণে নেতৃত্ব হারাইতেছেন, দেশ নেতৃহীন হইতেছে, সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নেতার স্থানে এখন চাটুকারের আবির্ভাব হইয়াছে; এই চাটুকারেরা সামান্য স্বার্থের জন্যে না কহিতে পারে, এমন মিথ্যা কথা নাই; না করিতে পারে এমন পাপ নাই; না জানে, এমন প্রবঞ্চনা নাই। এই নীচাশয়দের চক্রান্তে অভিযোগ নিষ্ফল হয়।

ভা। তবে কি হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু তীর্থের, কোনও মতে রক্ষা হইবে না?

স। হইবে। তবে হিন্দু পুরুষপুঙ্গবদের দ্বারা হইবে না। হইবে—হিন্দু রমণীর দ্বারা। সতী সাধ্বী ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু রমণী আছে বলিয়া দেশে এখনও ধর্ম্ম আছে, তীর্থ আছে। পুণ্যবতী.....সোপানশ্রেণীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এখনও যাত্রিগণ চন্দ্রশেখর আরোহণ করিয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে পারিতেছে। তোমার মত হিন্দু রমণীরাই এ সকল তীর্থ রক্ষা করিবে!

ভা। হায় বাবা! আমি ভিখারিণী বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা কেমন করিয়া এত বড় একটা মহৎকার্য্য হইবে?

স। মা! তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সময়ে পুরী গোস্বামী তোমার কর্ণে শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যথাসময়ে তিনি তোমার হৃদয়ে ইহার উপায় উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। বালিকা পাদপদ্মে প্রণত হইলে, তিনি তাহার শিরে সেই বরদ পদ্মপাণি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।"

১০

ঝড়ের ও সমুদ্রপ্লাবনের ভীষণ সংবাদ প্রথমতঃ জনরবের ক্ষীণকণ্ঠে, পরে এ অঞ্চলস্থ কর্ম্মচারীদের পত্রে ঘোরারাবে চট্টগ্রাম নগরে উপস্থিত হয়, এবং দেশ ব্যাপিয়া হাহাকারধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। উত্তরে কুমিরা হইতে দক্ষিণে কক্‌স্‌বাজার, অনুমান ৩৫ ক্রোশ, এবং পশ্চিমে সমুদ্রতট হইতে পূর্ব্বে দক্ষিণ লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত, অনুমান ৪০ ক্রোশ পরিসর স্থানে বৃক্ষ ও গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে। অনুমান ১০ লক্ষ লোক একপ্রকার গৃহহীন হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র লোক গৃহপিষ্ট হইয়া ও বৃক্ষচাপা পড়িয়া

প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শত্রু সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কামানের অজস্র বজ্রবর্ষণে নগর যেরূপ বিধ্বস্ত হয়, চট্টগ্রাম নগর প্রভাতে সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে। নগরে পর্ণগৃহমাত্র নাই; শৈলশেখরস্থ অট্টালিকা সকল ভগ্নাঙ্গ ও শ্রীহীন; বৃক্ষাদি পড়িয়া রাজপথ সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মহা মহীরুহ সকল পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। কর্ণফুলীস্থ অর্ণবযান সকল বিধ্বস্ত বা জলমগ্ন হইয়াছে। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ফিলিমোর নগর পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং বিপন্নদের সাহায্যের জন্যে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন, চট্টগ্রামবাসী তাহা শীঘ্র ভুলিবেন না।

অনাথনাথের বাটীতে এ ভীষণ সংবাদ পঁহুছিলে, তাঁহার লোকজন খাদ্য-দ্রব্যাদি ও শিবির লইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জলপথে ছুটিল। তাঁহার জমিদারী সুবর্ণদ্বীপ-রূপ মহাশ্মশানে শিবিরস্থাপন করিয়া তিনি কয়েক দিন যাবৎ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রজাদের প্রাণপণে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার পত্নীর ও বেদেদের বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন, কোনও সংবাদ পান নাই। পত্নীপুত্র-সর্ব্বস্ব অনাথনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় লইয়া, আত্মশোক ভুলিয়া, প্রজাদের ভগ্নহৃদয়ে শক্তির ও শান্তির সঞ্চার করিতেছেন। শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতেছেন, ক্ষুধার্ত্তের ও তৃষ্ণাতুরের অন্নজলের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ গবর্মেণ্টের পক্ষ ও তাঁহার পক্ষ হইতে খাদ্য ও জল আসিতেছে; কারণ, সমুদ্রপ্লাবনে সমস্ত সরোবর ও দীর্ঘিকা লবণাক্ত ও মৃত গলিত শবে দূষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য শবের সৎকার। শত শত সহস্র সহস্র নর-পশু-পক্ষি-শবে দ্বীপাবলি ও সমুদ্রতটস্থ গ্রামসমূহ সমাচ্ছন্ন। শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী, কিছুই জীবিত নাই। মৃতদেহ সকল এরূপ লবণাক্ত হইয়াছে যে, তাহা অতি ধীরে ধীরে পচিতেছে, এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া এই শবরাশি পুতিয়া ফেলিতে হইতেছে। তাঁহাকে ও চিরস্মরণীয় একজন ইংরাজ রাজপুরুষকে এই ভীষণ কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইতেছে। কারণ, যে সকল লোক ঝটিকাপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা এরূপ হতসাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা কোনও কার্য্যই হইতেছে না। এই পুণ্যব্রতে ভানুমতীই অনাথনাথের একমাত্র সহায় ও শান্তি। সমস্ত দিবস বালিকাকে লইয়া সর্ব্বস্বান্ত দুর্ব্বল

প্রজাদের সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং সবল প্রজাদের দ্বারা কূপখনন ও জমিদারি-রক্ষার্থ সমুদ্রতীরস্থ ভগ্ন বাঁধের ও প্রজাদের গৃহের সংস্কার করেন, এবং রাত্রিতে নির্জ্জন শিবিরে বালিকার মুখ দেখিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া, পত্নী পুত্রের শোক নিবারণ করেন। ডিক্‌সন সাহেব পর্য্যন্ত বালিকার শক্তি, বুদ্ধি ও সহৃদয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনিও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং বলেন, ভারতবর্ষে এমন রমণীরত্ন আছে, তিনি চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না।

অপরাহ্ণ। শিবিরচ্ছায়ায় সিন্ধুসম্মুখে অনাথনাথ একখানি চেয়ারে দিবসের পরিশ্রমে অবসন্নদেহে বসিয়া আছেন। পদতলে ভানুমতী, যেন দেবপদতলে চম্পকফুলরাশি। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র অপরাহ্ণ-রবি-করে তরঙ্গিত তরল সুবর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছে। অনতিদূরে বাষ্পযান ও অর্ণবযান সকল পাল প্রসারিত করিয়া নানাবিধ অর্ণবচর পক্ষীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অ। মা! এত দিনে আমি বৃটিশ রাজ্যের ও বৃটিশ রাজপুরুষদের একটি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বৃটিশ রাজ্যকে ও বৃটিশ রাজাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এ অঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গময় হইবার সংবাদ চট্টগ্রাম নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, আমাদের করুণহৃদয় কমিশনার কলিয়ার সাহেব একখানি "ষ্টিমলঞ্চ" লইয়া ছুটিয়া আসেন। এমন শান্ত, স্থির, শিবতুল্য ব্যক্তি, এমন নির্ব্বাক, আড়ম্বর-শূন্য, দৃঢ়, কর্ম্মজ্ঞ লোক, ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বিরল। তাঁহারই কৃপায় এই ধ্বংসাবশিষ্ট হতভাগ্যগণ অন্নজল পাইতেছে। তাহার পর ওই দেব-প্রতিম ডিক্‌সন সাহেব একটি কর্ম্মাবতারের মত উপস্থিত হইয়া কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন, তুমি তাহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তাঁহার নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে করুণা, শরীরে অসাধারণ শক্তি ও সহিষ্ণুতা। মৃতদের শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, জীবিতদের হাহাকার শুনিয়া, তাঁহাকে কতবার কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই বলিলেও হয়। তিনি অনবরত গ্রামে গ্রামে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া কিসে হতভাগ্যদের দুঃখের উপশম হইবে, এবং এ সকল স্থান আবার বাসোপযোগী হইবে, দিবারাত্রি তাহারই জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। ইঁহার ঘৃণা নাই, দুর্গন্ধজ্ঞান নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, মুখে চিরশান্তি, চির প্রসন্নতা। ঐ দেখ পাদুকাশূন্যপদে কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া, আস্তিন গুটাইয়া, তিনি কখন বা স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কখন বা

গলিত শবদেহ নিজে টানিয়া গর্ত্তে ফেলিতেছেন। তাঁহার এই অক্ষয়কীর্ত্তি এ দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত থাকিবে, এবং আবহমান কাল এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিবে।

ভা। বাবা! ইনি কি মানুষ?

অ। মানুষ। তবে আমাদের মত মানুষ নহেন। ইঁহার কার্য্য দেখিয়া আমি এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কেন রাজা, আমরা কেন তাঁহার প্রজা। এত দিনে বুঝিয়াছি ইংরাজ কি শক্তিবলে এরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হন না। ইহার এক অংশে সন্ধ্যা, অন্য অংশে প্রভাত; এক অংশে নিশীথসময়, অন্যাংশে মধ্যাহ্ণ। এমন কর্ম্মবীর আর এ জগতে নাই। ইঁহার পর এলেন সাহেব আসিয়াছিলেন। তিনি বন্দোবস্তির ভার প্রাপ্ত হইয়া ১০ বৎসর এ অঞ্চলে আছেন, এবং আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে পরিচিত; তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মপটু, তেমনি সহৃদয়। এ দেশের নওয়াবাদ বন্দোবস্তি কার্য্যের মত বিরক্তিকর ও অপ্রিয় কার্য্য বুঝি আর নাই। কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই, কখনও তাঁহার মুখে রুক্ষভাষ শুনে নাই। কেবল মাত্র প্রিয় ব্যবহারে তিনি সকলের কাছে প্রিয়। এ অঞ্চলের অনেক তালুকদার ও প্রজাকে তিনি চেনেন। এক এক জন তালুকদারের শূন্য ভিটা ও বহু পরিবার সহ ধ্বংসের কথা শুনিয়া অশ্রু-পাত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহারই প্রস্তাবে ও কলিয়ার সাহেবের পৃষ্ঠ-পোষকতায় গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষের দানভাণ্ডার হইতে ৫০,০০০ টাকা প্রজাদের সাহায্যার্থ দিয়াছেন। সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বাঁধিবার জন্য এবং কৃষকদের হাল গরু কিনিবার জন্য ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ দিতেছেন; এবং এ অঞ্চলের দুই বৎসরের খাসমহলের রাজস্ব—লক্ষাধিক টাকা রেহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে প্রণালীতে এ অঞ্চলের প্রজাদের সাহায্য করা হইতেছে, শুনিয়াছি, তাহার উদ্ভাবকও এলেন সাহেব। ইঁহার পর আমাদের প্রিয়-ভাষী কালেক্টর সাহেব আসিয়া প্রজাদিগকে স্বহস্তে ঋণ দিয়াছেন ও তাহাদের বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন।

এমন সময়ে আর এক জন সাহেব আসিলেন, এবং অনাথনাথের সঙ্গে অভিবাদনবিনিময়ের পর তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "একটি লোক কতকগুলি পুরাতন কাপড় ও পয়সা স্থানে স্থানে বন্যাবিধ্বস্ত লোকদিগকে বিলাইতেছে। সে বলিল, সে ব্রাহ্ম।"

অ। সম্ভব। ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশরক্ষা করিয়াছে। পূজ্যপাদ ৺রাম-মোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে এতদিন অর্দ্ধেক হিন্দু খ্রীষ্টান কি মুসলমান হইত। এখনও ব্রাহ্মসমাজে বহু পূজনীয় ব্যক্তি আছেন। (ক্রমশঃ।)

জাপানের পত্র।

অন্তর্যামীর ইচ্ছারূপ পবনে অনন্তের স্রোতে আমি ভাসিয়া চলিয়াছি। কোথায় যাইব, তাহার স্থির নাই—স্থির করিবার শক্তিও নাই। বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—নিয়তির স্রোতের প্রতিকূলে যাইব, আমি দীনবুদ্ধি, হীনশক্তি মানব, আমার এমন সাধ্য কি? সে স্রোত আমাকে যেখানে লইবে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, আমাকে সেইখানে যাইতেই হইবে। আজ এখানে আছি; কাল কোথায় যাইব, কে জানে? আজ আপনাকে ইয়োকোহামার কিছু বিবরণ প্রদান করিতেছি।

ইয়োকোহামা কানাগোয়া বিভাগের অন্তর্গত; দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি মাইল, প্রস্থে প্রায় তিন মাইল। ইয়োকোহামা কতকটা উপদ্বীপের মত; তিন দিকেই বিস্তৃত সমুদ্র। সহরের মধ্যেও পাঁচ ছয়টি খাল আছে। বাণিজ্যের পক্ষে জলপথই প্রশস্ত; মালপত্রের গতায়াত প্রায় সমস্তই নৌকাতে হয়। সহরের মধ্যে বসতির অংশের নিকটে একটা বাজার আছে। বাজারটি ক্ষুদ্র; এবং বিশেষ পরিষ্কারও নহে। শাকসবজী, ফল মূল, মৎস্য মাংস প্রভৃতি দ্রব্য দোকানে বিক্রীত হয়। বিদেশীয়দিগের থাকিবার জন্য সমুদ্রের নিকটেই উপনিবেশ আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুইটি উচ্চ সমুদ্রপ্রাচীর। পূর্ব্বাংশে প্রায় বিদেশীয় শ্বেতাঙ্গগণ এবং পশ্চিমাংশে জাপানীরা বাস করিয়া থাকে। পশ্চিমাংশকে Japanese Bluff বা নন্‌গিয়ামা (Nungiama) বলে। সমুদ্রতীরে একটি বিস্তৃত রাস্তা আছে। "জেটির" নিকট হইতে "গ্র্যাণ্ড্ হোটেল" পর্য্যন্ত রাস্তাটি কতকটা কলিকাতার "রেড-রোডের" মত—তবে ইহা প্রস্তরমণ্ডিত। প্রভাতে ও সন্ধ্যাসমাগমে বিদেশীয়গণ সমীরসেবনার্থ এ পথে আসিয়া থাকেন। এই রাস্তায় পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রতীরে দুইটি হোটেল অবস্থিত—"গ্র্যাণ্ড্ হোটেল" ও "ক্লাব হোটেল"। ইয়োকো-হামায় এই দুইটি হোটেলই বিশেষ প্রসিদ্ধ; প্রথমোক্তটি—দ্বিতীয়টির অপে-

ক্ষাও উত্তম। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী এই রাস্তার পরই সহরের প্রধান রাস্তা। বিদেশীয়দিগের প্রায় সমস্ত আফিস, ডাকঘর, প্রভৃতি এই রাস্তায় অবস্থিত।

বসতির অংশের নিকটেই একটি উদ্যান আছে। উদ্যানটির চতুর্দ্দিক কেবল চেরীবৃক্ষে পূর্ণ; মধ্যস্থলে একটু ঘেরা জায়গা ও পার্শ্বে একটি কাঠের ঘর। বিদেশীয়গণ এইখানে "টেনিস" "ক্রিকেট" "ফুটবল," প্রভৃতি খেলা খেলিয়া থাকেন। ইহার চারি দিক বেড়া দিয়া ঘেরা। যখন চেরীফুল ফুটে, তখন ইয়োকোহামার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলকেই প্রভাত হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানীরা বড় সৌন্দর্য্যপ্রিয়। অতি দরিদ্রের গৃহেও টবে দুই চারিটি ফুলের গাছ, কিম্বা লতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে কোনও পুষ্পেরই সৌরভ নাই।

কলিকাতায় কেল্লার নিকটে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের মত, এখানেও একটি ঘোড়-দৌড়ের ময়দান আছে। ইহার মধ্যস্থল আবাদী জমিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সেখানে নানাপ্রকার শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানেও ঘোড়দৌড়ের সময় বাজী রাখা হইয়া থাকে। ইহা সভ্য পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত জুয়াখেলা মাত্র। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সকল য়ুরোপীয় নীতিবাগীশ জুয়াখেলার বিশেষ নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার নিঃসঙ্কোচে এই জুয়াখেলায় যোগদান করেন। ঘোড়দৌড়ের এই জুয়াখেলা সভ্যজগতের ব্যাধিবিশেষ হইয়া পড়িতেছে।

জাপানে জাপানী হাঁসপাতাল, জর্ম্মণ হাঁসপাতাল, ইংলিশ হাঁসপাতাল প্রভৃতি আছে। সহরের যে অংশ জাপানীগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত, সে অংশে অনেকগুলি রঙ্গালয় আছে।

জাপানে আর একটি নূতন প্রথার কথা বলি। এখানে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি একটা কি দুইটা পর্য্যন্ত পায়খানা পরিস্কৃত হইয়া থাকে। সংগৃহীত পুরীষরাশি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়া সারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সহরের পার্শ্বে চতুর্দ্দিকবেষ্টিত একটি স্থান আছে; ইহার নাম "মাগানী চোক্"। পূর্ব্বপত্রে যে সকল অভাগিনীদিগের কথা বলিয়াছি, তাহারা এইখানে বাস করিয়া থাকে। * সহরের পশ্চিমে রেলওয়ে ষ্টেশন।

ইয়োকোহামার প্রায় প্রত্যেক পথেই চারি পাঁচটি করিয়া সাধারণ স্নানাগার অবস্থিত। বোধ করি জগতে আর কুত্রাপি স্নানাগারের এরূপ বাহুল্য লক্ষিত

* "সাহিত্য"—১৩০৪, আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

হয় না। প্রভাত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই সকল স্নানাগার উন্মুক্ত থাকে। অধিকাংশ জাপানী রাত্রি আটটার পর হইতে বারটার মধ্যে স্নান সম্পন্ন করে। প্রত্যেক স্নানাগারে পাশাপাশি দুইটি কাগজের প্রবেশদ্বার। অধিকাংশ গৃহে বামদ্বারে স্ত্রীলোক এবং দক্ষিণ দ্বারে পুরুষগণ গতায়াত করিয়া থাকে। প্রবেশ-পথে সম্মুখেই একটি উচ্চ বেদীর উপর স্নানাগারের কর্ত্তা অথবা কর্ত্রী বসিয়া থাকেন। স্নানের জন্য দুই সেণ্ট (প্রায় পাঁচ পয়সা) ও সাবানের জন্য এক-সেণ্ট এবং যদি কেহ গাত্রমর্দ্দনকারী অথবা গাত্রমর্দ্দনকারিণী চাহে, তজ্জন্য আর এক সেণ্ট দিতে হয়। সাধারণতঃ বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে কিছু অধিক আদায় করা হইয়া থাকে ;—তবে দশ সেণ্টের অধিক আদায় হয় না। যাহাতে গৃহমধ্যে যথেষ্ট আলোক প্রবেশ করিতে পায়, তজ্জন্য, কক্ষটির পশ্চাদ্ভাগ ব্যতীত, অপর তিন দিকের প্রাচীর, কাচের বা কাগজের। একটু চেষ্টা করিলেই রাস্তা হইতে স্নানার্থী বা স্নানার্থিনীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্নানাগারের হর্ম্ম্যতল কাষ্ঠবিনির্ম্মিত ;—জাহাজের পাটাতনের মত মসৃণ ও রঞ্জিত। কক্ষমধ্যে সম্মুখেই দেরাজের মত একটা বস্ত্রাদি রাখিবার স্থান আছে। স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিবস্ত্র হইয়া দেরাজের মধ্যে বসনাদি রক্ষা করে। হর্ম্ম্যতল দুই ভাগে বিভক্ত—সম্মুখের অংশে স্নানের পূর্ব্বে বস্ত্রাদি ত্যাগ ও স্নানান্তে বস্ত্রাদি পরিধান করা হয়। এই অংশ প্রায় অর্দ্ধহস্তপরিমাণ উচ্চ ; প্রস্থে প্রায় পাঁচ হাত হইবে। এই উচ্চ স্থানের নিম্নেই স্নান হইয়া থাকে। আজকাল সহরের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের স্নানের স্থানে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য হর্ম্ম্যতলের নিম্নাংশে একটি দুই তিন হাত উচ্চ কাগজের ব্যবধান প্রদান করা হইয়া থাকে। এই কাগজের দেওয়ালের মধ্যে আবার যাতায়াতের জন্য দুই তিনটি দ্বার থাকে। দ্বারগুলি উন্মুক্তই থাকে ; ব্যবধান নামমাত্র। সকলেই ছোট ছোট টবে গরম জল লইয়া গাত্রমার্জ্জনে রত থাকে ; সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা সংবাদের সমালোচনাও চলিতে থাকে। পুরুষেরা ইচ্ছামত যে কোনও প্রকারে, এবং স্ত্রীলোকেরা একটি জানু নত ও অপরটি উত্থিত করিয়া বীরাসনে উপবেশন করে। সম্মুখে কাষ্ঠদণ্ডের উপর এক একখানি দর্পণ রক্ষিত হয়। কেহ স্বহস্তে বুরুশ ও বাবুই পাখীর বাসার মত এক প্রকার পদার্থ লইয়া গাত্রমার্জ্জন করে ; কেহ বা কৌপীনমাত্রধারী বলিষ্ঠ যুবকদিগের দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করাইয়া লয়। মধ্যস্থিত দেওয়ালের

নিকট একখানি জলের কটাহ থাকে ; ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ব্যবহার্য্য। এই সকল স্নানাগারে স্ত্রীপুরুষের স্বতন্ত্র গরম জলের বৃহৎ টব থাকে। গাত্রমার্জ্জনাদির পর সকলে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় প্রায় দশ মিনিট কাল এই গরম জলের টবে উপবেশন করিয়া থাকে। পরে গাত্রের জল মুছিয়া উলঙ্গাবস্থায় কেশবিন্যাস সমাপ্ত করিয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া চলিয়া যায়। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামের স্নানাগারে স্ত্রীপুরুষের স্নানের স্থানের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই ; সকলেই একত্র এক টবে স্নান করে। মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই। সহরে গলিঘুঁজিতেও এই ব্যবস্থা। আমি পূর্ব্বে এই কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারি নাই। একদিন এক সম্ভ্রান্ত জাপানী বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া বহু দূরে চলিয়া যাই ; প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি বলিলেন, "আজ জাপানের একটি রহস্য দেখাইব।" আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দেখাইবেন ?" তিনি আমাকে লইয়া একটি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম, স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্র স্নান করিতেছে। আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই নানাকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল, "ইন্দনো কোলম্বো !" জাপানে ভারতবাসী বা সিংহলবাসীদিগের কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলে রাজপথে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও খেলা ভুলিয়া "ইন্দনো কোলম্বো, ইন্দনো কোলম্বো" বলিতে বলিতে পথিকের অনুগমন করে। আমার জাপানী বন্ধুটি আমাকে স্নানাগারের সমস্ত ব্যাপার দেখাইলেন। বিস্মিত হইয়া আমি রাত্রি আটটার সময় বাসায় ফিরিলাম।

আমি বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, আমার শয়নকক্ষে টেবিলের উপর এক-খানি পত্র রহিয়াছে। পাঠ করিয়া বুঝিলাম, আমাকে টোকিওতে লইয়া যাইবার জন্য ইহা ইনাওয়ের * নিমন্ত্রণপত্র। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অবধি ভাবিতে ছিলাম যে, এ দেশের ধর্ম্মের অবস্থা ভাল করিয়া না বুঝিয়া কোনও ধর্ম্মসভায় যোগদান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তদবধি এখানকার ধর্ম্মের তথ্য জানিবার জন্য আমি মন্দিরে মন্দিরে এবং সাধু ও সাধ্বী ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতাম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, যে ধর্ম্ম ও যে জ্ঞান এককালে ঋষি, মুনি, সাধু, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মযাজকদিগের জীব-

* ইনাওয়ে সমস্ত জাপানের মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

নের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল, এক্ষণে তাহা স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থদিগের আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধু, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মযাজকগণ এক্ষণে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িকতার বৃথা অভিমানে ও জ্ঞানের অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান নাই, গর্ব্ব আছে। বিষ নাই, বৃহৎ চক্র আছে। তাঁহারা আপনাদিগকেই শ্রেষ্ঠ এবং জগতের আর সকলকে হেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। এক্ষণে বরং গৃহস্থদিগকে ধর্ম্মালোচনা হেতু অনেকাংশে সরল ও সত্যপ্রিয় দেখা যায়। সাধুদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে গিয়া আমি হতাশ হইয়াছিলাম। ভগ্নমনোরথ হইয়া আমি যখন এ দেশে ধর্ম্মের বিষয় অবগত হওয়া একান্তই সুদূরপরাহত বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলাম, সেই সময়ে এই পত্র আমার মৃতপ্রায় আশা পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। সত্যসন্ধানে প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে ভগবান স্বয়ং সত্যানুসন্ধিৎসুর পথ সুগম করিয়া দেন। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে চা পান পূর্ব্বক আমি টোকিও যাত্রা করিলাম।

ডাক্তার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালগুলা আমার দুই চক্ষের বিষ, কিন্তু খোঁড়ার পা কি খালেই পড়িবে? যতই তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি, ততই তাহাদের সঙ্গে সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। বাল্যকালে এই বাঙ্গালের অত্যাচারে লেখাপড়া ছাড়িতে হইয়াছে; যৌবনে সংসারপথে পদার্পণ পূর্ব্বক একটু মান সম্ভ্রমের যোগাড় করিয়া লইয়াছি, দেখি, সম্মুখেই আমার পথরোধ করিয়া একটা বাঙ্গাল দণ্ডায়মান! ক্রোধে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া গেল, কিন্তু নিরুপায়; এই ব্রহ্মতেজোবর্জ্জিত কলিকালে ব্রাহ্মণের মুখের অগ্নি নিষ্ফল আস্ফালনে পরিণত হইয়াছে, নতুবা এক এক সময়ে আমাদের যে পরিমাণ ক্রোধের উদ্রেক হয়, তাহাতে সত্যযুগের মত কথায় কথায় মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিবার ক্ষমতা থাকিলে, প্রতিমাসেই দুই চারিটা খাণ্ডবদাহন করিতে পারিতাম; যাহা হউক, আক্ষেপ ছাড়িয়া এখন প্রকৃত কথা বলি।

বাবার কিছু জমীদারী ছিল; লেখাপড়া ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া বসিলাম; মনে করিলাম, বি. এ., এম. এ, পাশ না করি, লেখাপড়া ত শিখিয়াছি, কাহারও দাসত্ব করিবারও আবশ্যক নাই। আমাদের জগা পাগলা বলিত, "কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহের কারণং।" তাহাও হইয়া গিয়াছে, বাবা বাঁচিয়া থাকিতেই সৌদামিনী-রূপ মাধবীলতায় এই নবীন সহকার পরিবেষ্টিত করিয়া গিয়াছেন! আমি এখন সংসারের কর্ত্তা। স্থির করিলাম, সংসারে একটা কিছু কীর্ত্তি স্থাপন করিব।

গ্রামে একটা মাইনর ইস্কুল ছিল। অনেক কাল আগে বাবা তাহার সেক্রেটারী ছিলেন। আমি দেখিলাম, অগ্রে ওই পৈতৃক গৌরবটি হস্তগত করা আবশ্যক; ইস্কুলফণ্ডে কিছু টাকা সাহায্য করা গেল। টাকাটা আমার নিজের পকেট হইতে ব্যয় করিতে হয় নাই, আমার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রজারা কিছু কিছু মাথট দিয়াছিল, তাহারই কতক টাকা বাঁচিয়া ছিল, সেই টাকা ব্যয় করিয়া সুলভে 'দেশহিতৈষী' নাম ক্রয় করিলাম।

শিক্ষাবিস্তারে আমার উৎসাহ দেখিয়া ইস্কুলের বর্ত্তমান সেক্রেটারী বাবু বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি আমাদের মহকুমার একজন খ্যাতনামা সেকেলে উকীল; আদালতে তাঁহার অখণ্ড পসার; একদিন অপরাহ্ণে আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া তিনি বলিলেন, "ভায়াহে! তোমরা ইয়ং জমিদার, তাতে এডুকেটেড; দেশের উন্নতি করা তোমাদেরই কাজ, ইস্কুলের ভারটা তুমিই লও, এ বৃদ্ধবয়সে পাঁচ কাজে আমি ব্যতিব্যস্ত থাকি, সময়ও নাই, উৎসাহও নাই, তুমি হইলে কাজ চলিবে ভাল।" আমি প্রথমে একটু আধটু আপত্তি করিয়া সেক্রেটারী হইতে স্বীকার করিলাম।

আমি সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইলে, ষ্টেটস্‌ম্যানে কে একটা করস্পন্‌ডেন্স বাহির করিল যে, আমিই এখন আমাদের গোপীনাথপুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পেট্রিয়ট, নিঃস্বার্থপরতার অক্টরলোনী মনুমেণ্ট, এবং দয়ার আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র; এ অঞ্চলের মধ্যে আমিই একমাত্র শিক্ষিত জমীদার!—আমি তখন নূতন ষ্টেটস্‌ম্যানের গ্রাহক হইয়াছি, বড় লোকের দুই একটা অনাবশ্যক অতিরিক্ত জিনিষ রাখা দরকার—তন্মধ্যে খবরের কাগজ একটা। আমি নিজে কখনও ঐ কাগজ খুলিতামও না, পাড়ার ছেলেরা খুলিয়া এক আধবার দেখিত, তাহার পর পরাণে বেনে মশলা বাঁধিবার জন্য দোকানে লইয়া যাইত।

ষ্টেটস্‌ম্যানে এই করেস্পণ্ডেন্স বাহির হইলে আমার ইস্কুলের সেকেণ্ড

মাষ্টার তাহাতে একটা নীল পেন্সিলের দাগ দিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমার কাছে পাঠাইয়াছিল। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে ছাপার অক্ষরের নামের একটা মোহ আছে। আমি পেট্রিয়ট, ছাপার হরফে এ কথা মুদ্রিত দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল, মনে হইল, পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ সিংহ, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডী, পার্কার ও ওয়াশিংটন, ইঁহারা যে দলের, আমিও সেই দলের, কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করা গিয়াছে,এইমাত্র প্রভেদ; স্বদেশহিতৈষী হওয়া এতই সহজ! বুঝিলাম,আমাদের সেই সেকেণ্ড মাষ্টারই আমার এই জয়ধ্বনি ঘোষণা করিয়াছে। আমি অকৃতজ্ঞ নহি, আমার সেই জয়ঢাকটাকে আমার ভাগিনেয়ের প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করিলাম।

কিন্তু স্বদেশহিতৈষীর অম্লান যশঃশশধরও অনেক সময় দুর্বৃত্তের নিন্দা-রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকে; ষ্টেটস্‌ম্যানের করসপন্‌ডেন্স্‌ বাহির হইবার অল্প দিন পরে "আর্য্যপ্রদীপ" নামক সাপ্তাহিক কাগজে আমার স্বদেশহিতৈষিতার সমালোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ প্রেরিতপত্র প্রকাশিত হইল; তাহাতে লেখক লিখিয়াছে যে, প্রজার নিকট হইতে আমি যে 'মাথট' সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা জোর করিয়া ভিক্ষা আদায়ের নামান্তরমাত্র, এবং এই অর্থের সদ্ব্যবহার গোবধ করিয়া তাহার চর্ম্মে ব্রাহ্মণকে জুতাদানের ব্যবস্থার সহিত তুলনীয়। আমি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলাম। একবার মনে হইল, সম্পাদক-কুল-কলঙ্ক—যে এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কথা ছাপাইতে পারে, তাহাকে ধরিয়া চাবকাইয়া আসি। ক্রোধের প্রথম উচ্ছ্বাস কিছু প্রশমিত হইলে আমার প্রিয়বন্ধু নব্য উকীল মহেশ বাবুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তখন ওকালতির চার ফেলিয়া মক্কেল-মৎস্য ধরিবার জন্য নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আইন-পুস্তকরূপ 'হুইল' লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, "এডিটারের কাছে উকীলের চিঠি দিয়া আগে লেখকের নাম চাহিয়া পাঠাও, তাহার পর ডিফামেসন স্যুট, এ ত জলের মত সোজা মকদ্দমা!"—কথাটা সঙ্গত বোধ করিলাম, তখনই উকীলের চিঠি লইয়া ডাকে রওনা করিলাম, কিন্তু সম্পাদক লেখকের নাম প্রকাশ করিল না, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দিল না, অধিক 'পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি'—নামক কলমে শ্লেষের সহিত লিখিল, "গরু মারিয়া জুতাদানের রীতি, সভ্য এবং অসভ্য সকল দেশেই বর্ত্তমান আছে, বাবুজী অনর্থক মনঃকষ্ট পাইয়াছেন; যদি মস্তিষ্ক উষ্ণ বোধ

হয়, কিঞ্চিৎ মধ্যমনারায়ণ ব্যবহার করিলে সুফল লাভ হইতে পারে।"—পাঠাইলাম উকীলের চিঠি, উত্তরে কবিরাজের ব্যবস্থা আসিল। আমি ক্রুদ্ধ-চিত্তে মহকুমার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুদর্শী উকীল নীলাম্বর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, "ডিফামেশন স্যুট করা সহজ বটে, কিন্তু ফলাফলের কথা কিছুই বলা যায় না; তোমারও কিছু কিছু গলদ বাহির হইতে পারে; অতএব চাপিয়া যাওয়াই ভাল, জানই ত, 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।' সাধারণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনেকেরই গালাগালি সহ্য করিতে হয়, বিলাতের গ্ল্যাডষ্টোন হইতে ভারতের সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কাহারও অব্যাহতি নাই।"—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!" ঠিক কথা,—আমি আর উচ্চবাচ্য করিলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনঃস্থির করিলাম বটে, কিন্তু এই পত্রপ্রেরক লোকটা কে, গোপনে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অবশেষে বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম,কাজটা আর কাহারও নয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার ঘোষেদের আশ্রিত, আমার চিরশত্রু, সেই বাঙ্গাল ডাক্তার গগন বাবুরই এই কীর্ত্তি।

বাঙ্গালের উপর হাড়ে চটিয়া গেলাম। গগন বাবুর বাড়ী কোথায় খবর রাখি না; চট্টগ্রাম কি শ্রীহট্ট, বরিশাল কি বাখরগঞ্জ, এই রকম কোন একটা জেলায় হইবে। লোকটা কিছু ব্রাহ্মতন্ত্রের; বাছবিচার কিছু করে না, যে গোঁ ধরে,তাহা কিছুতে ছাড়ে না; পরশ্রীকাতরের অগ্রগণ্য। এমন লোককেও মানুষে কাজের ভার দেয়? কিন্তু সে ঘোষেদের বড়বাবু প্রাণকৃষ্ণের বন্ধু, বন্ধুকে সম্মানিত করিবার জন্য প্রাণকৃষ্ণ বাবু তাহাকে তাঁহার সংস্থাপিত মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারী করিয়া দিয়াছেন। আমিও স্কুলের সেক্রেটারী, আর এই নামহীন, অর্থহীন, পরান্নভোজী, সামান্য ডাক্তারও স্কুলের সেক্রেটারী! আমার বন্ধু জয়-লাল বলিত,হস্তীও চতুষ্পদ, ভেকও চতুষ্পদ; স্থির করিলাম, একবার তাহাকে আমার ক্ষমতাটা দেখাইব, হাতে না পারি, ভাতে মারিব।

আমার ভাগিনেয়ের প্রাইভেট টিউটার সেই সেকেণ্ড মাষ্টারকে দিয়া "ব্যবহার-দর্পণ" নামক মাসিকপত্রিকায় গোটাকত প্রবন্ধ লিখাইলাম। সম্পাদক প্রথমে সে প্রবন্ধ ছাপিতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু আমি দশ কাপী

কাগজের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইতেই সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল; সেই সকল প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, স্ত্রীশিক্ষাটা আমাদের দেশের উপযোগী নয়, ইহাতে রমণীর সতীধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, এই শোচনীয় শিক্ষায় রমণীর সুকোমল বৃত্তি বিনষ্ট হইতে পারে, ইহাতে বিধবাবিবাহের সংখ্যা বাড়িবে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের আস্থা থাকিবে না,এবং জীবনসংগ্রামে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে যে ফল হইবে, তাহাতে পুরুষেরই বিপদ অধিক, নলিননয়না ললনাকুলকে অবহেলা করিয়া পুরুষকে কেহই চাকরীতে নিযুক্ত করিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ড ও আমেরিকার স্ত্রীকর্ম্মচারিগণের প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমার যে বিশেষ বিরাগ ছিল, তা নয়; তবে ব্রাহ্ম ডাক্তারটাকে জব্দ করিবার জন্য আমাকে এই প্রকার কূট নীতির পক্ষ সমর্থন করিতে হইল, এবং এই কারণেই, উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ে আমি যে মাসিক চাঁদা দিতাম, তাহা রহিত করিলাম। আমার দলস্থ যে সকল লোক গার্লস্ স্কুল কমিটীর মেম্বর ছিলেন, তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণী হইতে উঠাইয়া আনিলাম। কিন্তু হায়! এত চেষ্টাতেও স্কুল উঠিল না। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার ঘোষেরা ডাক্তারের পরম সহায়, তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে স্কুল চালাইতে লাগিল। ডাক্তার অক্ষুণ্ণ রহিল, এবং কাহারও কোনও ক্ষতি হইল না; কেবল আমার স্বদেশহিতৈষী অন্তরাত্মা নিষ্ফল আক্রোশে অধিক করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

শেষে আমি অধিক পরিমাণে রাজক্ষমতালাভের জন্য সচেষ্ট হইলাম। বুঝিলাম, ইহাতেই শুধু প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য লাভ করা যাইতে পারে। গগন ডাক্তার তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। আমাদের মহকুমার নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী রসুল উদ্দীনকে হস্তগত করিতে পারিলে অনায়াসে এই প্রকার সখের চাকরী লাভ হইতে পারে শুনিয়া,আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আরম্ভ করিলাম, এবং তাঁহাকে মাছ, মুরগী, খাসি, ঘৃত ও বালাম চাউল প্রভৃতি আমিষ ও নিরামিষ ভোজ্যদ্রব্য উপহার পাঠাইতে লাগিলাম। মুসলমান শাস্ত্রে আমার পারদর্শিতা ছিল না, সুতরাং পীর ও পয়গম্বরদিগের লোভ-নামক রিপুটার প্রাখর্য্য সম্বন্ধে কোনও পরিচয় পাই নাই, কিন্তু মানবচরিত্রে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, অতএব উপহারপ্রভাবে ডেপুটী রসুল উদ্দীন সাহেবকে হস্তগত করা আমার পক্ষে কঠিন হইল না।

দুই মাস পরে কলিকাতা গেজেটে সংবাদ বাহির হইল, ছোটলাট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তৃতীয় শ্রেণীর অনাহারী হাকিম পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। জমীদারের ছেলে হাকিম হইলাম; আমার পার্শ্বচর প্রাইভেট টিউটার হাসিয়া বলিল, "ইহারই নাম সোনার উপর মিনের কাজ"—যাহারা পূর্ব্বে এক হাত তুলিয়া সেলাম করিত, তাহারা এখন দুই হাতে সেলামের বৃষ্টি করিতে লাগিল।

নির্ব্বিঘ্নে সরকারী কাজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই যে একটা বাঙ্গাল পথভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে অন্নবস্ত্রের চেষ্টায় কোথা হইতে আমাদের গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে কিছুতে আঁটিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে ডেপুটি সাহেব তাহাকে ও আমাকে এক বেঞ্চে কাজ করিতে দিলেন। আমরা দু'জনেই তৃতীয় শ্রেণীর হাকিম, কিন্তু ডাক্তার সিনিয়ার, কাজেই রায়-প্রকাশের ভার তাহার হাতে! আমার বড় রাগ হইত, কিন্তু যুক্তিতে তাহাকে হারাইতে পারিতাম না; হারিয়া জেদ বাড়িয়া গেল, স্থির করিলাম, শীঘ্রই ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

পর বৎসর শীতকালে কালেক্টর সাহেব সফরে বাহির হইলেন, এবং আমাদের মহকুমা-পরিদর্শনে আসিলেন; আমি এই সুযোগে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা দেখিলাম। ডেপুটী সাহেবের অনুগ্রহে কাজটা কঠিন হইল না। দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল হইতে খানা আনাইলাম,কেলনারের গ্রীনসিল হুইস্কি ও শ্যাম্পেন,ম্যানিলার সুগন্ধি চুরোট,সিজনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যাকালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানভবনে কালেক্টর সাহেব,পুলিশ সাহেব,ডেপুটী সাহেব এবং একদল কুঠিয়াল সাহেবকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলাম। আমাদের ডেপুটী সাহেব কালেক্টরের কাছে আমাকে introduce করিয়া দিলে সাহেব আমার অমায়িক ব্যবহার ও রাজভক্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সে বৎসর বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। বঙ্গে সর্ব্বত্র অজন্মা,গৃহে গৃহে লোক উপবাসী; কালেক্টরের অনুরোধে Central Famine Fundএর খাতায় আমি এক শত টাকা দান স্বাক্ষর করিলাম। আহারান্তে পরিপূর্ণ-উদর, লব্ধতৃপ্তি, সুধাপানপ্রফুল্লচিত্ত, অরুণাভনেত্র সাহেব সুগন্ধি চুরোটে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে আমার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন, "বাবু! তোমাদের মত লয়াল এন্‌লাইটেণ্ড ইয়ং জমীন্দারস্ বাঙ্গালা দেশের অর্ণামেণ্ট, Now good bye, your public spirit should be rewarded."

মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল, আমার সেকালের পিতা ও পিতামহগণ বৃথা পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, অন্নসত্র খুলিয়া, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের উদর পূর্ণ করিয়া রাশি রাশি টাকার অপব্যয় করিয়া গিয়াছেন! সেকেলে লোকের মূর্খতার সীমা ছিল না।

আমি প্রফুল্ল অন্তরে গৃহে ফিরিলাম। রাত্রে নায়েব আসিয়া সংবাদ দিল, বাজারের মুদী তেল লবণের উঠনার দেনা বাবদ আমার নামে ছোট আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইয়াছে। আমি তখন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় বিমুগ্ধ হইয়া 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভের সুখস্বপ্নে মগ্ন ছিলাম; তুচ্ছ চাল ভাল এবং মুন্সেফী আদালতের ক্ষুদ্র ডিক্রীর কথা গ্রাহ্যও করিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরবৎসর এড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে প্রকাশিত হইল, সমস্ত জেলার অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মধ্যে কেবল আমিই সুন্দররূপে অতি দক্ষতার সহিত বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। প্রকাশ্য গেজেটে এ জন্য আমি সরকারের ধন্যবাদভাজন হইলাম। আনন্দে আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। একদিন সান্ধ্যভোজনে আমার দলস্থ বন্ধু বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, গেজেটের রিমার্ক পড়িয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলাম। শুনিয়া সকলে একবাক্যে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঘোষেদের মূর্খতা লইয়া অনেক উপহাস চলিল।

কিন্তু নিন্দুকেরা আমার নিন্দাঘোষণা করিতে ত্রুটি করিত না। আমার সুনাম এবং রাজদ্বারে প্রতিপত্তি ঘোষেদের কিছুতে সহ্য হইত না; তাই আমাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য তাহারাই চাউল ডাইলের উঠনাদারকে দিয়া আমার নামে মকদ্দমা করাইয়াছিল, এবং গোপনে তাহারা বলাবলি করিত, আমি পাওনাদারদিগের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করি না, আমার কথার কোন ঠিক নাই, আমি দেনা করিয়া সাহেবদের ভোজ দিই, অথচ আমার আত্মীয়েরা অনাহারে থাকে, দেশের সাহেব-মহলে আমার যতই সুনাম বিস্তৃত হউক, আমার স্বদেশিগণ আমাকে প্রতারক ভিন্ন আর কিছু মনে করে না, ইত্যাদি।

কথাগুলা আমার কানে না পঁহুছিত, এমন নয়; কিন্তু সে সকল হিংসুকের গ্লানি আমি গ্রাহ্যও করিতাম না। দেশের লোকের নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন

হইবার আবশ্যক? ক্ষুদ্র মুদী ময়রা, কাপড়ওয়ালার সামান্য দেনা পরিশোধ না করিলে কি এমন অন্যায় হয়? "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"এ ত শাস্ত্রের কথা, বিশেষতঃ যাহারা প্রেষ্টিজের মর্ম্ম অবগত আছে, যাহাদের কাছে 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করিয়া না চলিলে প্রতিপত্তিহানির সম্ভাবনা, তাহাদের কাছেই সাবধান হইয়া চলিব; নিজের মা ঘরের কোন্ কোণে অনাহারে ছিন্নবস্ত্রে শীর্ণদেহে হাহাকার করিতেছে, তাহার সংবাদ না লইলে কি ক্ষতি!—ভারতমাতার জন্য আমি কতখানি বাক্য এবং ঘর্ম্ম ব্যয় করিতেছি, ছুটাছুটি ও কলরব করিয়া দেশের কানে তালা লাগাইতেছি, সংবাদপত্রে কি পরিমাণে জয়ধ্বনি ঘোষিত হইতেছে, তাহাই আলোচনার বিষয়; private characterএর দিকে কটাক্ষ করিয়া দোষগুণের বিচার করা সভ্যজাতির চক্ষে অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য। public career দেখিয়া যাহারা মানুষের গুণগ্রামের আলোচনা করিতে শেখে নাই, তাহারা সভ্যসমাজের নিম্নতম সোপানে অবস্থিত, ঘোষেদের সভ্য হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তাহাদের নিন্দায় আমার কোন ক্ষতি হইবে না।

দুই এক মাসের মধ্যেই আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করিলাম। আমার, প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ বলিয়া অভিমান করিত। আমার এই পদবৃদ্ধিতে সে বিষম ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিল। তাই মানসিক সন্তোষলাভের অভিলাষে বন্ধুমহলে প্রকাশ করিতে লাগিল, "তোষামোদ করিয়া সকলেই এমন পদ পশার করিতে পারে।"—এ কথার একটা জবাব দেওয়া আবশ্যক। প্রাণকৃষ্ণের মোসাহেব জহরলালকে একদিন পথে দেখিতে পাইয়া কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বলিলাম, "তোষামোদ করাও একটা ক্ষমতা, সকলে কি সকলের কাছে কল্‌কে পায়? তোমার বাবু তোমাকে যেমন ভাল বাসেন, আর কাহাকেও তেমন ভাল বাসেন কি?"—ভাবিয়াছিলাম,—সে তাহার প্রভুর কথার মত আমার কথারও প্রতিধ্বনি করিবে; কিন্তু আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, জহরলাল বলিল, "সকল লোকেরই খানিক করিয়া দুর্ব্বলতা আছে, সেই রন্ধ্রপথে শয়তান তাহাদের দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষমতাশালী লোককেও কিয়ৎপরিমাণে নিজের অধীন করিয়া লয়, ইহাতে সয়তানের কোন গৌরব নাই। তৈলমর্দ্দনের অনুরোধে আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা ভাল রকম চলিলে অধিক লোকে আমাদের হিংসা করে না, বরং কৃপাপাত্র বলিয়াই মনে করে; কিন্তু সে জন্য যদি প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তৈলদাতাকে উচ্চাসন

দেওয়া হয়,তাহা হইলেই লোকে নিন্দা করে ; এ নিন্দা কতক পরিমাণে সঙ্গত, তোষামোদ করিয়া বড় হওয়া সহজ হইলে লোকে প্রকৃত গুণবান ও বিদ্বান হইবার চেষ্টা করিবে কেন ? আবার যে নির্ব্বোধ রাজা বিদূষকের প্রশংসাবাদে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মন্ত্রিত্ব বা বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে রাজার কখন মঙ্গল হয় না।"—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের এই বিদূষকটাকে চাণক্য পণ্ডিতের মত বক্তৃতা করিতে দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কিন্তু এখনও বিপদ হইতে উদ্ধার নাই ; গগন ডাক্তারকে যেমন দুই চক্ষে দেখিতে পারিতাম না, তেমনি সে প্রত্যেক কাজে আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত। আমি তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। একদিন দেখি, ডেপুটি সাহেব একটা গরুচুরীর মকদ্দমা বেঞ্চে ট্রানস্‌ফার করিয়াছেন, এবং আমাকে ও গগন ডাক্তারকে একত্র সেই মামলার বিচার করিতে দিয়াছেন।

আমি এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হাকিম, অনেক নব্য ডেপুটি ও এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা আমার ক্ষমতা অধিক ; নিয়ম অনুসারে এই মকদ্দমায় আমিই রায় লিখিব ; কারণ, ডাক্তার এখনও সেই 'থার্ডক্লাস পাওয়ারে'ই পড়িয়া আছে। কিন্তু এই গরুচুরীর মকদ্দমার বিচার করিতে গিয়া আমাদের মধ্যে ভয়ানক মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল ; অভিযুক্ত মুচি বেটা নিশ্চয়ই গরুচুরী করিয়াছিল, নতুবা ফরিয়াদী কেন অনর্থক এ প্রকার মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিবে ?—বিশেষতঃ, 'No conviction no promotion" কথাটা অনেকদিন হইতে আমার জানা ছিল। আমাদের অনরারী হাকিমদের বেতন নাই বটে, কিন্তু পদবৃদ্ধি, সম্মান, এ সকলের অভাব কি ? কয় জন প্রথম শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্গের স্বাধীন বিচারাসন (Independent Bench) শোভিত করিয়াছে ?—আমারও সেই অত্যুচ্চ লক্ষ্য ছিল। আর বেতন না থাকিলেই বা কি ? অনাহারী গোক্ষুরের বিষের কি তীব্রতা নাই ? আহার যে একবারেই নাই, এ কথাও আমি জোর করিয়া বলিব না। ইংরাজী প্রবচনে লিখিত আছে, "ইচ্ছা থাকিলে সর্ব্বত্রই পথ করিয়া লওয়া যায়", আমাদের ন্যায় "ইন্‌টেলিজেণ্ট" লোকের ইহা অজ্ঞাত নহে, ফৌজদারীর হাকিমী করিয়া মোক্তার দলের ও আসামী ফরিয়াদী উভয় পক্ষের সেলামবৃষ্টি, সস্তা দরে গোপপল্লীর দধিদুগ্ধ, বিনা পয়সায় সাধারণ লোকের পুষ্করিণীর মাছ, ক্ষেতের তরি তরকারী, বাগানের মর্ত্তমান রম্ভা, গ্রাম্য চৌকী-

দারের স্কন্ধে ভর করিয়া ইঙ্গিতমাত্রে যে গৃহপ্রাঙ্গণে সমাগত হয়, ইহার কি কোন মূল্য নাই ? তথাপি মূর্খেরা বলে, এ চাকরী "ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান মাত্র।" ঢোঁড়া সাপের যে কিছুমাত্র বিষ নাই এ কথা গগন ডাক্তারের জ্ঞান ছিল না। ব্রহ্মজ্ঞানীদের দোষই ঐ। সে গরুচুরীর মকদ্দমায় আমার সঙ্গে কিছুতে একমত হইল না,চোরের পরমাত্মীয় হইয়া বসিল, বলিল, "অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ নাই, এরূপ অবস্থায় ইহার দণ্ডবিধান করিলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অবমাননা করা হইবে।" অগত্যা মকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে 'রেফার' হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট নূতন লোক, ঘৃণার সঙ্গে তখনও পড়তা জমে নাই, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে পুনর্ব্বিচারের ভার দিলেন, গরুচোর বেটা বেকসুর খালাস পাইল।

আমি একটু ব্যথিত হইলাম। আর কখন এমন আঘাত প্রস্তুত হই নাই। কিন্তু এখানেই অব্যাহতি নাই। আসামী পক্ষের অসভ্য মোক্তারটা একদিন এক নিমন্ত্রণসভায় উপস্থিত হইয়া দশনপংক্তি বিকশিত করিয়া সহাস্যে এবং সালঙ্কারে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের কাছে যখন আমার সেই বিচারকাহিনীর বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, "হে মা বসুমতি, যদি তুমি দ্বিধা—" কিন্তু সে কথা যাক্। গগন ডাক্তারের স্পর্দ্ধায় আমি আরও বিচলিত হইয়া উঠিলাম ; ডাক্তার সেই মোক্তারকে আহ্বান করিয়া বলিল,"ছিঃ নন্দলাল বাবু, এ সমস্ত তুচ্ছ কথা লইয়া নিমন্ত্রণসভায় এক জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে বিদ্রূপ করা উচিত কি ? ভ্রম ত সকলেরই হয়। রমাকান্ত বাবু বালকমাত্র, তিনি যদি একটা ভুল করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ না করাই ভদ্রতা, বিচারকার্য্যে বড় বড় বিচারকগণেরও ভ্রম ঘটিয়া থাকে।" ব্রাহ্মের উদারতা দেখিয়া রাগে ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণ্যমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অপমানিত হইয়া ক্রোধে, ক্ষোভে ও মনস্তাপে আমি নিমন্ত্রণসভা ত্যাগ করিলাম। সেই দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি, বিচারকদের সাধারণ লোকের সহিত মেশামিশি না করার প্রথা অতি প্রয়োজনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে এক এক দিনের এক একটা ঘটনায় ডাক্তারের উপর আমার ক্রোধ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার চাকরীর উপর যমদণ্ডক্ষেপের ন্যায়

একটা কঠোর এবং অব্যর্থ আঘাত করিবার জন্য আমি আমার সমস্ত বুদ্ধি পরিচালনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বাঙ্গালকে আঁটিয়া উঠা কঠিন। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, আমি যতবার তাহাকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ততবারই সে ধৈর্য্যের সহিত উদার সকরুণ ব্যবহারে, কখনও অটল নির্ভীকতায়, কখনও নিরুত্তর অবজ্ঞাভরে, আমার আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকবার সে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়া যে, আমি তাহার নিকট বুদ্ধিহীন বালক ভিন্ন আর কিছুই নহি! আমি আমার ক্রোধে আপনি দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

গগন ডাক্তার মিউনিসিপালিটীর ডাক্তার। অবশেষে যেবার আমি আমাদের গোপীনাথপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলাম, সেই বার তাহাকে হাতে পাইলাম; প্রত্যেক বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে আমার খুটি-নাটি চলিতে লাগিল। আমি ভাবিতাম, সে চেয়ারম্যানের ভৃত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; আমার সমস্ত আদেশ বিনা প্রতিবাদে এবং নতশিরে সে পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু গগন ডাক্তারের বিশ্বাস ছিল, তাহার কর্ত্তব্যে আমার হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার নাই।

যাহা হউক, কিছু দিন পরে একটা সুযোগ ঘটিল। প্রমাণ পাইলাম, গগন ডাক্তার কোনও রোগীর নিকট মিউনিসিপালিটীর ঔষধালয় হইতে একটা ঔষধ বিক্রয় করিয়াছে। আমার সুযোগ্য বন্ধু হরিচরণ ডাক্তার এ বিষয়ের একজন প্রধান সাক্ষী; অন্যান্য সাক্ষীরও অভাব হইল না। গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি তখন মিউনিসিপালিটীর সভাপতির কঠিন কর্ত্তব্যসম্পাদনে কৃতসংকল্প, কাহারও সুপারিসে কর্ণপাত করিলাম না।

কিন্তু বাঙ্গালদের কি অপূর্ব্ব একতা! সবডিবিজনাল কোর্টে মকদ্দমা, আদালত লোকে লোকারণ্য। কোর্টের প্রধান উকীলগণ কেহ কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে এজলাসের সম্মুখে উপবিষ্ট। গগন ডাক্তার, নির্ভীকভাবে ডকে দণ্ডায়মান; কেন জানি না, তাহার মুখের দিকে চাহিতে আমার একটু লজ্জা বোধ হইতেছিল, তাই একটু তফাতে বসিয়া মকদ্দমার গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। মকদ্দমা আরম্ভ হইবে, এমন সময় হ্যাটকোটধারী এক বাঙ্গালী সাহেব প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী লিভারি-শোভিত চাপরাশীর ঘাড়ে আইন-পুস্তকের গন্ধমাদন চাপাইয়া ধীরমন্থরগমনে এজলাসে প্রবেশ করিলেন। দর্শকগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আমিও সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, বাঙ্গাল ব্যারিষ্টার মিঃ বোস সাহেব! তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ললাটের ঘর্ম্মবিন্দুর অপসারণপূর্ব্বক ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিলেন, তাহার পর টেবিলের উপর হ্যাট রাখিয়া মৃদুহাস্যে হাকিমকে বলিলেন, "এই মকদ্দমায় আসামীর পক্ষসমর্থনের জন্য আমি কোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করি।"

শুনিলাম, বোস সাহেব স্বদেশী ডাক্তারকে রক্ষা করিবার জন্য 'বিনা ফিসে' কষ্টস্বীকার পূর্ব্বক মফঃস্বল কোর্টে আসিয়াছেন। আসামী পক্ষ মকদ্দমা চালাইবার জন্য এতখানি আয়োজন করিয়াছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও অগ্রে জানিতে পারি নাই। আমাদের ডেপুটি হাকিম মৌলবি সাহেব বোধ করি আর কখনও ব্যারিষ্টারের হাতে পড়েন নাই, মিঃ বোসের প্রভাবে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ক্রস্-একজামিনেশনে আমার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না; দেখি, আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া চাষাগুলা পর্য্যন্ত দ্বারপ্রান্ত হইতে হাসিতেছে। আমি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলাম। চারি ঘণ্টার পর আসামী বেকসুর খালাস পাইল। আমার প্রদত্তমাছ ও মুরগী, ঘৃত ও খাসীতে উদর পূর্ণ করিয়া ডেপুটী সাহেব রায়ের ভিতর আমার বিরুদ্ধে যে সকল কথা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহাতে আসামীর পক্ষে আমার নামে 'ড্যামেজ সুট' আনিবার বিশেষ সুবিধাই হইল; আমার একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, "Oh Treachery! thy name is Musulman.

যাহা হউক, কেন বলিতে পারি না, গগন ডাক্তার আমার নামে মকদ্দমা আনিতে সাহস করিল না। কেহ কেহ তাহাকে মকদ্দমা করিতে পরামর্শও দিল, এবং আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ তাহাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে লাগিল; কিন্তু আমি মনিব, চাকরীর ভয়েই বুঝি বাঙ্গাল আমার নামে নালিশ করিল না। আমার রহস্যপ্রিয় এয়ার গণেশ বাবু সকালে বিকালে সুর করিয়া গাহিতে লাগিল, "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়"—ইত্যাদি। বড় আমোদে দিন কাটিতে লাগিল; এই মকদ্দমা লইয়া গ্রামে দলাদলীর ধূম পড়িয়া গেল। গোপীনাথপুরের ঘাটে পথে হাটে বাজারে আমাদের দুই দল জমীদারের পৃষ্ঠপোষকগণ কুরুপাণ্ডবের মত দল বাঁধিয়া বাক্‌যুদ্ধে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে যে পরিমাণ বাক্যব্যয় হইল, তাহা লৌহশর হইলে তদ্দ্বারা পাঁচটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে পারিত।

এ দিকে মিথ্যা মামলা উপস্থিত করিয়া মিউনিসিপালিটীর অনেক টাকা

অপব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গলা কাগজে আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত করেসপণ্ডেন্স বাহির হইতে লাগিল। আমার ভাগিনেয়ের প্রাইভেট টিউটার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমার পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল; মাসেক খানেক ধরিয়া কাহারও মুখে অন্য কথা নাই, আলোচনার অন্য বিষয় নাই, দলাদলির প্রবল বাত্যায় গ্রাম উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, শেষে গোলমাল দেখিয়া আমি চেয়ারম্যানের পদে 'রিজাইন' দিলাম।

কিন্তু এ জন্য আমার কোন আক্ষেপ নাই। কারণ এই, ঘটনার অনতিবিলম্বেই আমি জেলাবোর্ডের সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইলাম। এই নবপদ লাভ করিবার জন্য আমাকে কিছু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু যে ট্রাভলিংটা যথারীতি ঘরে আসিবার কথা, তাহার তুলনায় এ ব্যয় খুব অতিরিক্ত নয়; বিশেষতঃ, যে সকল ক্ষমতাপন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাস্ত করিয়া আমার এই পদলাভ, তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক হইয়াছিল। আমার গ্রামসম্পর্কের বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা বলিলেন, "ভায়া, এই কচি বয়সে খুব বাহাদুরী করে নিলে যা হোক।"—আমি হর্ষভরে বলিলাম, "তবু ত ঠাকুরদা, লোকে নিন্দে কত্তে ছাড়ে না, বলে লেখা পড়া জানে না।" দাদা এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "আরে ভাই, ইঁদুর ধরতে পাল্লেই হোল, হোক না কেন কাঠের বিড়াল! এখন হাকিমীর সনদখানা একটু জাঁকালো, আর একটা রায়বাহাদুর খেতাব পেলেই এবারকার খেলায় তোমার জিৎ। তোমার মাতা রত্নগর্ভা ছিলেন—সন্দেহ কি?"

হায় রে পৈতৃক বিষয়! বড় দুঃখ যে সাহেব মহলে পঁচিশ হাজার বলিয়া প্রচার থাকিলেও পাঁচ হাজার টাকার বেশী বার্ষিক আয় নয়, নতুবা দেখিতাম, রায় বাহাদুর হওয়া কত কঠিন! আর ফাষ্টক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেটি 'পাওয়ার', সে ত দুই মাসের যোগাড়েই লাভ করা যায়, কমিশনর সাহেবের সঙ্গে দেখা হইতে যা কিছু বাকি!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বর্ষার অবসানে, ভাদ্রমাসের প্রথমে, আমাদের পুরাতন কালেক্টরের বদলী উপলক্ষে তাঁহাকে একটা ইভনিং পার্টিতে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বিদায়ভোজ

দিবার জন্য আমি সদরে নিমন্ত্রিত হইলাম। এবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমাকে যাইতে দিবেন না। কারণ, আমার পুত্র কয়েক দিনের জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে; জ্বরটার লক্ষণ কিছু খারাপ। কিন্তু পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হইলেও আজ আমাকে সদরে যাইতে হইবে। আমার হিতৈষী বন্ধুকে, আমার সংসারসুখের বিধাতাকে, তাঁহার বিদায় উপলক্ষে আমি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপ্রদর্শনের সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না।

তিন দিন পরে রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বাড়ী ফিরিলাম। যখন বাড়ীর কাছে আসিলাম, তখন রাত্রি তিনটা। সন্ধ্যার পর হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, রাত্রিশেষে প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড়ের শব্দে, অরণ্যের সুবিশাল বৃক্ষপত্রের আকুল শন্‌শনে, এবং মেঘমণ্ডিতা সেই বর্ষানিশীথিনীর দিগন্তব্যাপী সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঘনবিজলীচ্ছটায় ও মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্রে একটা খণ্ডপ্রলয়ের আশঙ্কা মনে পড়িতে লাগিল। পথে কেহ কোথাও নাই, শুধু একখানি রুদ্ধদ্বার শকটে আমি একাকী। বৃষ্টির শব্দের সহিত সম্মিলিত প্রভঞ্জধারানি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিরাশ্রয় দৈত্যশিশুর আর্ত্তনাদের ন্যায় তীব্র, সকরুণ বঙ্গ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মনে পড়িল, আমার গৃহে আমার স্ত্রী একাকিনী রহিয়াছে, এবং তাহার শয্যাপ্রান্তে আমার শিশু পুত্র রোগশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে; কে জানে, শিশুর দেহে এখনও প্রাণ আছে কি না?—আর আমি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটি ক্ষমতালাভের আশায়, রায় বাহাদুর খেতাবলাভের ছলনায় মুগ্ধ হইয়া, শুধু পরের পদে অর্থ ও তোষামোদ-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিয়া বেড়াইতেছি। সংসারে আমার কিসের অভাব? আমার সংসার, আমার স্ত্রীপুত্র, আমার প্রজাপুঞ্জ, আমার আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাসী এবং গ্রামবাসী, সকলের হৃদয়ের উপরে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মহিমাজ্যোতিঃসমলঙ্কৃত সম্মানাসন সংস্থাপন করিবার জন্য আজীবন শুধু আত্মসম্মান বলিদান করিয়াছি, মনুষ্যত্বলাভের নামে মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আসিতেছি, সাধারণের নিন্দা ও অখ্যাতিকে গণ্য করি নাই। আজ এই তৃতীয় প্রহর রাত্রে, এই বৃষ্টিপ্লাবিতা ঝঞ্ঝালুণ্ঠিতা ধরণীর প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে আমার সুপ্ত হৃদয় এতকাল পরে লুপ্তপ্রায় কঠোর মনুষ্যত্বের তীব্র কশাঘাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। আমি বৃথা পদগৌরবের নয়নরঞ্জন উজ্জ্বল আলোকবেষ্টনের মধ্যে

সুস্নিগ্ধ রমণীপ্রেম, পুত্রস্নেহ এবং গৃহস্থের অলঙ্ঘ্যনীয় মধুর কর্ত্তব্য স্ফুট-কুসুমের গন্ধময় সুকোমল দলের ন্যায় বিকশিত দেখিলাম।

গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আমার পুত্রের অবস্থা শোচনীয়। জীবনের আশা অতি অল্প। গৃহকোণে একটি মৃদু বাতি জ্বলিতেছে, দ্বার প্রান্তে আমাদের বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য বলরাম বসিয়া একটা ষ্টোভে জল গরম করিতেছে, এবং আমার প্রিয়তমার সুখদুঃখভাগিনী দাসী পদ্ম তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া ঢুলিতেছে; আমার স্ত্রী রোগক্লিষ্ট শিশুর মুখের দিকে পলকহীন নতনেত্রে চাহিয়া নিশ্চল ছবির ন্যায় বসিয়া ছিল। তাহার ম্লান মুখ ও নিত্যজাগরণপাণ্ডুর নিরাশা-কাতর চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় দুঃখে, অনুতাপে এবং বেদনায় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।—কিন্তু অদূরে টেবিলের ধারে বসিয়া বাতির আলোকে কে ঐ ভদ্রলোক এই গভীর রাত্রে একখানি বৃহৎ পুস্তকে সমাহিত-চিত্ত? আমার সমস্ত চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য সংযত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, এ ভদ্রলোক আর কেহ নহে, আমাদের সেই বাঙ্গাল ডাক্তার গগন বাবু!

ডাক্তার আমার শব্দে সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যার সময় আপনার পুত্রের অবস্থা বড় মন্দ সংবাদ পাইয়া আমি চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি; সমস্ত রাত্রি সাবধানে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, এখন অবস্থা অনেক ভাল। আপনার গৃহ-চিকিৎসক হরিচরণ বাবু আজ দুই দিন হইতে মফঃস্বলে আছেন। আপনার আগমনপ্রতীক্ষায় আর আমি বিলম্ব করিতে পারি নাই। যাহা হউক, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

আমি ডাক্তারের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না! নতমস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম; লজ্জায় আমার মস্তক মাটির সহিত মিশিয়া গেল। অবশেষে অতিসঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "ডাক্তার বাবু, আমি এতদিন আপনাকে চিনিতে পারি নাই, শতবার আপনাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, রাজদ্বারে আপনাকে বিড়ম্বিত করিবারও ত্রুটি করি নাই, আজ এই মহৎ ব্যবহারে আপনি আমাকে সমুচিত দণ্ড দিয়াছেন; যে চিরদিন আপনার অশুভ কামনা করিয়াছে, তাহার পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য আপনার নিজের সুখ ও সুবিধার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি করেন নাই।" আমি একেবারে ডাক্তারের নিকটে আসিয়া উচ্ছ্বাসভরে তাহার হাত দুখানি আমার উত্তপ্ত,

কম্পমান হস্তের মধ্যে টানিয়া লইলাম, আমার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় আমার পুত্র 'বাবা' 'বাবা'বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি তাহার শয্যাপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইলাম, আমার পুত্রের শুষ্ক বিশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; আমার অভিমানিনী সাধ্বী পত্নী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অঞ্চলে তাহার অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, এবং বাহিরে দুর্য্যোগ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।

তাহার পর আমি, আমার স্ত্রী এবং ডাক্তার, তিন জনে আমাদের ক্ষীণ কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় দ্বারসমাগত যমদূতগুলার সহিত প্রবল যুদ্ধ করিলাম; প্রত্যূষে জ্বরত্যাগে শ্রান্তরোগী শান্ত ভাবে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল!

প্রভাতে ডাক্তারের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, আকাশের কোথাও আর মেঘ নাই, প্রকৃতি স্থির, প্রভাতবায়ু সিক্ত ধরণীর শ্যামাঙ্গে আপনার অদৃশ্য কোমল অঞ্চল বুলাইয়া, বর্ষার ধারাপাতপরিতুষ্ট ললিত কিশলয় দুলাইয়া, বৃক্ষশাখা কম্পিত করিয়া, নদীতরঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া, চপলা বালিকার ন্যায় লঘুপদক্ষেপে দিক্‌দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; এবং তরুণ অরুণ শারদলক্ষ্মীর সীমন্তমূলে সমুজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দুর ন্যায় পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত করিয়া আলোকতরঙ্গের সহিত ধরাতলে কুসুমকাননে, বিহঙ্গমকণ্ঠে, সুপ্তোত্থিত নরনারী প্রাণে নবরাগ, প্রমোদগীত, নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত করিতেছে। এই ঊষালোকপ্রদীপ্ত, শোভন সুন্দর সুরঞ্জিত শারদপ্রভাতে হৃদয়ের কৃত্রিমতা এবং অহঙ্কারের জটিল মোহ আবরণ ছিন্ন করিয়া আমি নূতন করিয়া আমার উপেক্ষিত পারিবারিক কর্ত্তব্যের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইলাম; এতদিন যাহাদের শত্রুতা সাধন করিয়াছি, তাহাদিগকে অকৃত্রিম বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলাম। গ্রামের বৃহৎ দলাদলি মিটিয়া গেল, এবং তাহার পর যদিও আমি প্রথম শ্রেণীর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করিতে পারি নাই, তথাপি আমার শত্রুদলের সহিত নিবিড় আত্মীয়তাস্থাপনের পুলকালোকে আমার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতাপ্রিয়তা নিতান্ত অসার এবং তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অম্বা।

ধীরে ধীরে বনভূমে বহিছে যমুনা।
অতি ধীরে সায়াহ্নের কিশোর সমীর
কিশোরী কুমারী যত তরঙ্গিণী সাথে
একান্তে খেলিছে নব প্রণয়ের খেলা।
সুধীরে পশ্চিমনভে তমালের শিরে
সন্ধ্যার সুবর্ণ আভা যেতেছে মিশায়ে,—
পূরবেতে ঘনাইছে আঁধার গোধূলি।
বিদায়ের গান গেয়ে বনের বিহগ
নীড়ে ফিরিতেছে সবে মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বিজন অরণ্য-ছায়ে নিশাচর পশু
গুপ্ত গুহা তেয়াগিয়া হ'তেছে বাহির;
উঠিছে কানন-প্রান্তে ফেরু-কোলাহল।
জোনাকী আলোক-পাখা মেলিয়া আলসে
আঁধার-বধূর কেশে বসিছে উড়িয়া।
আকাশে জ্বালিছে দীপ দেবের বালিকা।

হেন কালে একদিন যমুনা-পুলিনে
অভাগিনী অম্বা আসি বসিলা নীরবে।
আলুলিত কেশরাশি মেঘরাশি প্রায়
ক্ষীণ কটিতটে তার পড়েছে ঝুলিয়া!
বন্ধুর বুকের পরে দুকূলের সাথে
দুরন্ত আরণ্য-বায়ু করে ছেলেখেলা,—
আধ আবরণ তাহে পড়িছে খসিয়া!
অম্বার নয়ন কিন্তু নাহি তার পানে।
কি গভীর শোকে তার কাঁপিছে হৃদয়,
থেকে থেকে উথলিছে গভীর নিশাস,
আঁখি দুটি অশ্রুজলে আসিছে পুরিয়া।
নীরবে আলখ্য-লেখা ছবির মতন
কতক্ষণ অম্বা হেন রহিল বসিয়া,
কতক্ষণ পরে পুন অঞ্চল গুটায়ে
ধীরে ধীরে একবার মুছিলা নয়ন;
দুঃখের কাহিনী তার আরম্ভিলা শেষে।

"লো যমুনে! বন্দে পদে অম্বা বিষাদিনী
কাশীরাজ-সুতা আমি, ত্যজি' লোকালয়
আসিয়াছি তোর পাশে সান্ত্বনার আশে।
শুনেছি যমুনে! তুই বড় স্নেহময়ী।
বিরহ-বিধুরা বালা রাধা বিনোদিনী
হেথা আসি অশ্রু-আঁখি বসিত বিজনে,
তোরে শুনাইত যত প্রাণের বিলাপ।
তুই তার আঁখিজল দিতিস্ মুছায়ে,
শুনাতিস্ কানে কানে আশ্বাসের বাণী।
তাই সে আশার ভরে এসেছি হেথায়,
জীবন-কাহিনী মাগো শুনাইব তোরে।
প্রাণের পাষাণ-রুদ্ধ বিষাদের ভার
বিন্দু বিন্দু করি তোর ফেলিব সলিলে।
গানসমাপনে যবে লইবি ডাকিয়া
তরল স্নেহের কোলে ঘুমাইব সুখে।

"লো যমুনে! দেখ্ ভাবি, পড়ে যদি মনে
সুদূর সে অতীতের স্বপন-কাহিনী।
সেই সে তোমারি তীরে মধুর শৈশবে
তিনটি ভগিনী মোরা কত শত বার
আসিতাম করিবারে শৈশবের খেলা।
তিনটি তটিনী সম তিনটি ভগিনী
বন হ'তে বনান্তরে উপত্যকা-ভূমে
নাচিয়া তরঙ্গ-রঙ্গে বেড়াতেম ভ্রমি!
স্মৃতির উজ্জ্বল পটে স্বর্ণরেখা সম
আজিও মা সেই কথা রয়েছে জাগিয়া।
আজিও জাগিছে মনে, ভ্রমি' বনে বনে
রাশি রাশি তুলি ফুল বসিতাম তীরে,

ফেলিতাম একে একে সুনীল সলিলে।
তরঙ্গের সঙ্গে তারা যাইত ভাসিয়া,
গাইতাম গান মোরা দিয়া করতালি!
কভু বা নগন-তনু নামিয়া সলিলে
ধাইতাম পিছে পিছে ধরিবার আশে!

"এইরূপে গেল কাল, কাটিল বরষ,
কৈশোরের লীলা ক্রমে এল ফুরাইয়া।
যমুনে! সে সব খেলা, সে সব কাহিনী,
আজি এ দুর্দ্দিনে অম্বা পারে কি ভুলিতে?
আজি হেন মনে হয় মুহূর্ত্তের খেলা
মুহূর্ত্তেই যদি, হায়, না যেত ফুরায়ে,—
এ যৌবন তেয়াগিয়া পুন এ অভাগী
যদ্যপি ফিরিত সেই শৈশবের দেশে।

"কৈশোর তেয়াগি যবে প্রথম যৌবনে
ধীরে ধীরে অভাগিনী করিল প্রবেশ,
কত যে অজ্ঞাত সুর, অজ্ঞাত সঙ্গীত
একেবারে এ পরাণে উঠিল বাজিয়া,
কাজ নাই সে সকলে করিয়া স্মরণ।
বাল্যের সারল্যময় তরুণ স্বপন
কি কুহক-আবরণে হ'ল আবরিত;
কি এক উদ্দেশ্যহীন অর্থহীন আশা
ছায়ার মতন প্রাণে উঠিল ভাসিয়া!
কে যেন বসিয়া দূরে বিজন পুলিনে
মধুর বচনে মোরে ডাকিত সতত,—
কানেতে বাজিত তারি বাঁশরীর ধ্বনি।
মন যেন তারি তরে বেদনা-ব্যাকুল
অন্বেষিতে দিশি দিশি হ'ত ধাবমান;
তারি পদতলে গিয়ে চাহিত লুটাতে!
যমুনে! কেন যে সদা অম্বা উদাসিনী
একাকিনী আসি তোর বসিত পুলিনে,
কভু বা চঞ্চল-আঁখি চপলা হরিণী
নিবিড় নিকুঞ্জ ছায়ে করিত ভ্রমণ,
তুই কি কখনও তাহা ভাবিতিস্ মনে?

"এইরূপে শূন্য প্রাণে পুষিয়া স্বপন
কেটে গেল যৌবনের কতক দিবস।
গোপন না রহে আর প্রাণের উদাস,
সখীরা বুঝিল মোর হৃদয়ের দশা।
দুখে দুখী অশ্রুমুখী ভগিনী দু'জন
জানিতে চাহিত সদা প্রাণের বাসনা;—
কি বলিবে কালামুখী, বুঝিত না কিছু,
আপনারে হ'ত লাজ আপনার লাগি!
উদাস হৃদয়ে মোর ভুলাইতে ছলে
দিবানিশি কত তারা করিত প্রয়াস,
প্রত্যহ নূতন গান করিয়া রচনা
কলকণ্ঠে অভাগীর চালিত শ্রবণে,
প্রত্যহ খেলিত নব প্রমোদের খেলা।
যমুনে! সকলি হ'ত শুধু ছেলেখেলা;
বাহিরে থাকিত পড়ি বাহিরের গান,
হৃদয়ে জ্বলিত সেই ছায়ার জ্বলন!

"একদিন অবশেষে সন্ধ্যা-সমাগমে
বসন্ত-বধূর দেহ পরশি সুধীরে
কাননে বহিছে যবে নব সমীরণ,
উদিছে পূর্ণিমা-শশী দূর তরুশিরে,
বন-বিহারেতে মোরা হইনু বাহির।
যমুনে লো! সে দিনের অপূর্ব্ব কাহিনী
মুহূর্ত্তেরও তরে অম্বা পারেনি ভুলিতে,—
জন্মজন্মান্তরে বুঝি ভুলিবে না কভু।
একাকী দাঁড়ায়ে তোর তীরতরুতলে
কে জানে ভাবিতেছিনু কোথাকার কথা!
সহসা পশ্চাতে মোর বন-অন্তরালে
কার মৃদু পদধ্বনি করিনু শ্রবণ।
চকিতে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে চাহিয়া
একেবারে হ'য়ে গেল নয়নে নয়ন!
দেখিনু পুরুষবর,—হিমশৈল-শিরে
প্রভাতের দীপ্তকান্তি প্রভাকর সম!
কে জানে মা পোড়া লাজ গিয়েছিল কোথা;
কালামুখী আঁখি মোর ফিরিল না আর,
বিবশ বিহ্বল হেন রহিল চাহিয়া।

মনে নাই কতক্ষণ ছিনু এই ভাবে ;
কতক্ষণ পরে পুন সম্বরি' আপনা
সমুখে সে ভাবে আর নারিনু থাকিতে ;
ধীরে ধীরে নত চক্ষে বনপথ দিয়া
ফিরিনু হৃদয়-মন বিকায়ে চরণে।

"অরণ্য তেয়াগি যবে প্রবেশিনু গৃহে
লজ্জা আসি কণ্ঠে মোর রুধিল দুয়ার।
তবু অতি সঙ্গোপনে করিয়া সন্ধান
হৃদয়-চোরের মোর পেনু পরিচয়।
পাঠাইনু প্রেম-দূতী, লিখিনু লিখন,—
'এস তুমি মদ্ররাজ! আপনি বরিয়া
তোমারে করিনু আজি যৌবনের রাজা।'
এইরূপে অকস্মাৎ জীবন-আকাশে
প্রেমের প্রভাত-রবি পাইল প্রকাশ
উজলি' যৌবন-বন সোনার কিরণে!
এইরূপে সেই দিন মানস-সরসে
প্রথম প্রেমের পদ্ম উঠিল ফুটিয়া,—
স্বপ্ন মোর সত্যরূপে দেখা দিল আসি।
শুভ কি অশুভ সেই প্রথম চাহনি
এইরূপে বক্ষে মোর করিল আঘাত,
হৃদয়ের দিশি দিশি উঘাটিল তাহে!

"যমুনে! বুঝিতে তুই পারিবি সহজে
পরদিন সন্ধ্যাগমে পুন সে কাননে
কি আশা হৃদয়ে ল'য়ে ছুটিল অভাগী।
ভেবে দেখ্ কি আগ্রহে কিসের লালসে
প্রাণ তোর ধায় সদা দূর সিন্ধু পানে!

"মাথার উপরে মোর দু' চারিটি তারা
নিবিড় পল্লবরন্ধ্রে যেতেছিল দেখা।
প্রদোষের অর্দ্ধস্ফুট চাঁদের কিরণ
সরল সোহাগভরে ভূতলে আসিয়া
শুয়েছিল পথপ্রান্তে অন্ধকার কোলে।
নীরব সে বনপথ, নীরব গোধূলি ;
শুধু মোর হৃদয়জ স্পন্দনের ধ্বনি
কানেতে বাজিতেছিল গানের মতন!

হেনকালে অকস্মাৎ কা'র বাহুপাশে
ধরা দিল তনু মোর? নিশীথ-শয়নে
স্বপন-সাথীর মৃদু পরশ সমান
অধরে সে কা'র স্পর্শ হ'ল অনুভব?
কে জানে যমুনে! এই গোড়া আঁখি মোর
বিন্দু দুই অশ্রু কেন নারিল ধারিতে ;—
কপোল-গোলাপে তা'রা আসিতে অমনি
চুম্বন-অনলে কার গেল শুকাইয়া!

"তা'র পরে কত সন্ধ্যা মিলিনু দু'জন।
কভু ধীরে আধ কথা ফুটিত অধরে,
কভু বা মিশিয়া যেত চুম্বনের সাথে।
অবশেষে অভাগীর অদৃষ্ট-আকাশে
বিষাদের ঘন মেঘ উদিল আসিয়া,—
কাল বিদায়ের কাল হ'ল উপনীত।
সেই সে বিদায়-ক্ষণে, অধরে অধর,
চিরপ্রেম-ডোরে মোরে করিয়া বন্ধন,
নিশান্তের স্বপ্নসম চলি গেলা বীর।
কে জানিত সেই হবে অন্তিম বিদায়?
কে জানিত সে দিনের সেই শশী সনে,
অম্বার সুখের শশী হ'ল অস্তমিত?
প্রথম মিলনমোহে, প্রথম উল্লাসে,
ভেবেছিনু এইরূপে যাবে চিরদিন ;
ভেবেছিনু সে সুখের সমুদ্র মাঝার
সমস্ত জীবন ভরি বাহিলে তরণী,
তবু তার সীমা বুঝি পাব না খুঁজিয়া।
কে জানিত সবি, হায়, হবে মরীচিকা?
কে জানিত, দু'দিনের হাসির মাঝার
সারা জীবনের অশ্রু ছিল লুকাইয়া?

"বিরহীর মরুময় মরমের মাঝে
দুরাশা বসিয়া নিজ অনল-আসনে,
কতকাল বরষিল বিষের নিশাস।
অবশেষে উপজিল দারুণ সংশয়,—
ভাবিলাম, বসন্তের বিলাসী মধুপ,
ক্ষণিকে মিটায়ে বুঝি ক্ষণিকের আশ

নবমুকুলিকা আশে গিয়েছে উড়িয়া!
হৃদয় হইল কালো অভিমান বিষে!
"ক্ষুদ্র এক আশা পরে উঠিল জাগিয়া।
মহাসমারোহে পিতা তিন কন্যা লাগি
সার্ব্বভৌম স্বয়ম্বর করিলা ঘোষণা।
আশার ছলনে ভুলি' ভাবিনু অভাগী
বিরহ-হিমানী-অন্তে বসন্ত আবার,
প্রেমের বকুল ফুল ফুটাইল বুঝি!
যমুনে লো! শুনিবি কি কেমনে সে আশা
দারুণ হুতাশরূপে দহিল আমায়?
হায় মা! জানিনে হেথা কেন আসি মোরা,
জানিনে জীবন ল'য়ে কা'র হেন খেলা,
জানিনে মৃত্যুর পরে কি হ'বে কোথায়,—
জানি শুধু, ভবিষ্যের অন্ধকার গৃহে
মানুষের আঁখি কভু পশিত যদ্যপি
নিমেষে জনম লভি' নিমেষের জীব
নিমেষে ভবের খেলা ফেলিত ঘুচায়ে!
"কি বর্ণিব স্বয়ম্বর? শিহরে হৃদয়
এখনও স্মরিলে সেই স্বয়ম্বর-কথা!
ইন্দ্রপুরী সম সভা, হায় মা! সহসা
ভীষণ প্রলয়-দৃশ্যে হ'ল পরিণত!—
চমকি' আতঙ্কে আমি হারানু চেতনা।
যখন ভাঙিল মোহ, মেলিয়া নয়ন
দেখিনু রয়েছি এক রথের উপরি ;
দুই পাশে বসি মোর ভগিনী দু'জন।
সমুখে হিমাদ্রিসম ধনুর্ব্বাণ হাতে
বীর সাজে যোদ্ধা এক আছে দাঁড়াইয়া।
অগণ্য রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রথে
পিপীলিকাশ্রেণীসম ঘেরিয়াছে তারে।
"জলদগম্ভীর বাণী শুনিনু শ্রবণে,—
'শুন কাশীরাজ, শুন নৃপতি-সমাজ!
ভাবিও না ভীষ্মদেব এতদিন পরে
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত তার গিয়েছে ভুলিয়া।
বিচিত্র বিচিত্রবীর্য্য, প্রিয় ভ্রাতা মোর,
তা'রই লাগি ক্ষত্রধর্ম্ম নীতি অনুসরি
এ তিন রমণী আমি করিনু গ্রহণ।
লহ শান্তি, লহ রণ, যথা অভিলাষ ;—
একা ভীষ্ম সবে আজি জিনিবে সমরে।'
"ইঙ্গিতে তুমুল রণ উঠিল বাজিয়া।
দেখিলাম মদ্ররাজে সম্মুখে সবার ;
অযুত নৃপতিবৃন্দ ধাইছে পশ্চাতে।
কে আঁটে ভীষ্মেরে রণে? ক্ষণেক বুঝিয়া
ভঙ্গ দিলা বীর সব, অম্বার হৃদয়ে
অন্তহীন অশ্রু-উৎস হ'ল উৎসারিত।
"তখন সম্বরি' লাজ শান্তনু-তনয়ে
জানানু বেদন, অন্যপূর্ব্বা হেরি মোরে
বর্জন করিলা বীর। নব আশাভরে
ভেটিলাম হৃদয়ের নাথে। কিন্তু, হায়,
যে অশনি সম বাণী শুনিনু সে মুখে,
যমুনে মা! কেমনে তা' শুনাইব তোরে?—
'অসতী,—অসতী অম্বা,—অন্যের গৃহীতা,
শল্যের হৃদয়ে আর নাহি তার ঠাঁই!'
ধরিলাম পদযুগ, কহিনু কাঁদিয়া,—
'হা নিষ্ঠুর! পুরুষের এই কি হে রীতি?
মনে কি পড়ে না, সখা, সেই সন্ধ্যালোকে
মধুর বেদনা-ভরা বিদায়ের ক্ষণে
চুম্বনে চাপিয়া কি যে কহেছিলে কথা!
সে কি শুধু মুহূর্ত্তের মিলন-চাতুরী?
পৈশাচিক আকাঙ্ক্ষার ধর্ম্ম-আচ্ছাদন?
অসতী, অসতী আমি! এ বক্ষ বিদারি'
মরমের মাঝে যদি পারিতে পশিতে,
গৃহ-দেবতার মত দেখিতে সেথায়
কার প্রেমমূর্ত্তিখানি রয়েছে জাগিয়া ;—
দেখিতে কে মোরে, হায়, করেছে অসতী!
ভালবাসা কি গো সখা, শুধু ছেলেখেলা?
ক্ষণস্থায়ী পিপাসার ক্ষণিক তর্পণ?
দাবানল জ্বলে নাকি মর্ম্ম মাঝে তা'র?
বুক তা'র ফাটে নাকি চিরতৃষ্ণা-ভরে?

নাহি চাও, ক্ষতি নাই ; শুধু বলে দাও,
সিন্ধু আশে যে তটিনী এসেছে ছুটিয়া,
কি হ'বে নির্দ্দয় যদি নাহি চায় তারে ?
বল, সখা, উজানে সে বহিবে কোথায় ?'—
যমুনে ! কিছুতে মন গলিল না তাঁর,
ডুবিয়া অতল জলে মরিল অভাগী।
"যমুনে মা ! মরি নাই ; মরিব না একা !
যতখানি ভালবাসা ছিল এ পরাণে
ততখানি হিংসানল উঠিল জ্বলিয়া।
যে জ্বালিল সে অনল চিতানল সম,
স্বহস্তে সাধিব আমি নিধন তাহার ;—
ভীষ্ম-বধ, ভীষ্ম-বধ প্রতিশোধ মোর !
"প্রচণ্ড পরশুরাম, পরশুর ধার,—
তারই পদতলে গিয়া পড়িল বাঘিনী ;
জানাইয়া মর্ম্মব্যথা, করি আরাধনা
গলাইল পরশুর পরশু-হৃদয়।
মরণ-সংগ্রামে ভীষ্মে করি আবাহন
দাঁড়া'ল পরশুরাম ; দাঁড়া'ল বাঘিনী
স্বচক্ষে দেখিতে ভীম ভীষ্মের নিধন।
কিন্তু, হায়, চিরদুষ্ট অদৃষ্ট আমার !
কোথা হ'তে কা'রা আসি দাঁড়াইল মাঝে,
সান্ত্বনা করিল রামে, ভীষ্মে বুঝাইল ;
প্রণয়-মিলনে দোঁহে ভঙ্গ দিলা রণে।
হাহা বিধি ! সেই সব শির লক্ষ্য করি'
কেন না হানিলে তব দীপ্ত বজ্রানল ?
কেন না হানিলে বজ্র অম্বার এ শিরে ?
"যমুনে মা ! মরি নাই, মরি নাই তবু !
যমুনে মা ! মরিব না, মরিব না একা !
শোন্ তবে এ বাঘিনী কি করিল শেষে।
সুদূর উত্তরে আছে ভীষণ গহন,—
আলোক পশিতে যথা কম্পমান ত্রাসে,
হিংস্রক প্রাণী যথা করে শুধু রব,
মরণের রাজধানী বিরাজে যথায় !
সেইখানে আসি শেষে পশিল রাক্ষসী।
সেইখানে বসিয়া সে অন্ধকার মাঝে
কঠোরে সেধেছে অতি নিষ্ঠুর সাধনা,—
ভীষ্মের নিধন-বর ফলেছে তাহায়।
তাই আজি অন্ধকার গুহা তেয়াগিয়া
আলোকের কূলে তোর হ'য়েছি বাহির,
অন্তিম আঁধারে পুন পশিতে হেথায় !
জানিনে কেমনে ভীষ্ম হইবে নিধন।
শুধু মাগো ভবিষ্যের অতি দূরদেশে
যেন ক্ষীণ দেখা যায় রণক্ষেত্র-রেখা ;—
পরিশ্রান্ত আঁখি সেথা পারে না পশিতে।
সেইখানে ধনুর্ব্বাণ ধরি দুই করে
কে যেন দাঁড়ায়ে ওই ছায়ার মতন ;—
ওকি ছায়া ? কিম্বা অম্বা নব কায়া ধরি?
নীলকান্তসমুজ্জ্বল আরও একজন
যেন লজ্জানতশিরে দাঁড়াইয়া পিছে।
তাহারি সম্মুখে ওই শরশয্যা'পরি
হেরি কেবা বীরবর নীরবে শয়ান,—
অসংখ্য সায়ক—বিদ্ধ সর্ব্ব অবয়বে !
"লো যমুনে ! সাঙ্গ হ'ল রোদনের গান।
এ জন্মের অনুরাগ, বিফল বাসনা,
জনমেরি সাথে আজি করিনু নির্ব্বাণ !
অন্তিম মিনতি তুমি রেখো মা আমার,—
চাহিয়া তোমার পানে দাঁড়ায়ে পুলিনে
জিজ্ঞাসিবে যবে কেহ অম্বা কোথা বলি,
অম্বার সংবাদ তুমি দিও না মা তারে।
শুধু ও প্রশান্ত বক্ষ মৃদু আন্দোলিয়া
মৃদুহাস্যে যেও চলি সাগর-সঙ্গমে !"

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

কার্লাইল।

ভিন্ন ভিন্ন রুচির সমালোচকগণ কার্লাইলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কেহ কার্লাইলের দোষবিশেষের অতিরঞ্জনে ব্যস্ত ; কেহ বা কার্লাইলকে সেক্‌স্‌পীয়র ও হোমরের সহিত তুলনা করিয়া প্রশংসাবাদের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গে স্থাপন করিয়াছেন; আবার গুণবিশেষের অভাব-নিবন্ধন তাঁহাকে নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের মতে কেবল দোষানুসন্ধিৎসা ও শেষোক্ত প্রকারের স্তুতিবাদ, উভয়ই ভয়াবহ। কার্লাইলের ওজস্বিনী ভাষা, আদর্শোপলব্ধি, গভীর চিন্তাশীলতা, ও হাস্যোদ্দীপক ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ বাস্তবিকই প্রতিভার পরিচায়ক। কার্লাইলের আদর্শ (Ideal) অতি উচ্চশ্রেণীর। কেবল চিন্তোপলভ্য, অবাস্তব আদর্শ লইয়া থাকিলে, সেই আদর্শের তুলনায়, যাহা কিছু বাস্তব, তৎসমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হয়। কার্লাইলের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার মনে আদর্শের যত বিকাশ হইতে লাগিল, ততই পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁহার বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয় সম্বন্ধেও, বর্ত্তমান প্রত্যেক পদার্থের উপরই তিনি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কখন ঘৃণা, কখনও বা উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহা হইলেও, তাঁহার আদর্শের বিষয় মনে রাখিলে, তাঁহার উদ্দেশ্য যে মহৎ ও আন্তরিক, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আমরা নিম্নে কোন সহযোগীর কার্লাইল সম্বন্ধীয় একটি সমালোচনার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

কার্লাইল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

লেখক বলেন যে, সপ্তদশবর্ষ মাত্র কার্লাইলের মৃত্যু হইলেও এখন আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই শুনা যায় না। সাহিত্যে কার্লাইলের স্থান, মানবজাতির শিক্ষয়িতৃগণের মধ্যে তাঁহার আসন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সকল তর্কবিতর্ক তাঁহার জীবদ্দশাতেই একরূপ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল। এক দিকে অতিরিক্ত নিন্দা, অপর দিকে অযথা স্তুতিবাদ উভয়ই কার্লাইলের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ ফ্রুডের Reminiscences প্রকাশিত হইবার পর হইতেই কার্লাইলের প্রতি লোকের অনুরাগ কমিয়া আসিয়াছে। কার্লাইলের পরিণত বয়সের রচনা যে তাঁহার যৌবনের রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল, Reminiscences তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল। এই সময়ে কার্লাইলের অবনতির হয় ত অবধি থাকিত না কারণ একবার ভাঁটার টান পড়িলে তাহা ফিরান সহজ নহে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে কার্লাইলের পত্নী ও জীবনবন্ধু জেন বেলি ওয়েলশের নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও অসাধারণ মহত্বের কথা শুনিয়া জনসাধারণ কার্লাইলের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। ফ্রুডের আলেখ্যে কার্লাইল যেরূপ অর্দ্ধ আলো

অর্দ্ধ অন্ধকারের মলিনতায় চিত্রিত হইয়াছেন, হয় ত বা তাহারই জন্য কার্লাইলের দোষদর্শনস্পৃহা আজকাল এত বলবতী। কিন্তু কার্লাইলের মৃত্যুর ১৫। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে ধর্ম্মবিদ্বেষী, বাকসর্ব্বস্ব, ইংলণ্ডের নীতির ভয়ানক শত্রু প্রভৃতি বলিয়া তাঁহার প্রতি যে সকল তীব্র দোষারোপ করা হইত,তাহা নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও অনেকে ঘৃণাবিমিশ্রিত সহানুভূতির সহিত, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কার্লাইলের ত্রুটীগুলি দেখাইতে ভুলেন না। এই সমস্ত অপবাদ যে কার্লাইল নিজেই আপন মস্তকে আনিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার কল্পনার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি কিরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রৌঢ়দিগের অবশ্য মনে থাকিতে পারে। মৃত্যুর ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যদি কার্লাইল লেখনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার প্রতিভাপ্রসূত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট রচনা হইতে জনসমাজ বঞ্চিত হইত, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার যশোরাশি তাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকিত। তাঁহার যৌবন-বসন্তের সদ্যোনিচিত সুষমাসম্পন্ন পুষ্পরাজি সাহিত্যোদ্যানে চিরপ্রফুল্লতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কার্লাইলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করাও শ্লাঘ্য মনে করিতেন; জনসাধারণও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশের জন্য ঋণী ছিল। এই সময়ে যদি তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইতেন, তাহা হইলে এই সকল প্রশংসাবাদের বিরুদ্ধে,ক্ষুদ্রশফরীবৎ সমালোচকগণ কার্লাইলকে তীব্র ঘৃণাত্মক ভাষায় তিরস্কার করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, কার্লাইলের কোন সমালোচনা, এমন কি, তাঁহার রাজনৈতিক মতের সম্পূর্ণ সমালোচনাও ১০। ১২ পৃষ্ঠার মধ্যে বিশদরূপে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। নগণ্য সমালোচকগণ যেরূপ ভাবে কার্লাইলের সমালোচনা করেন, তাহাতে বোধ হয়, যেন কার্লাইলের রচনা নিতান্তই ক্ষণস্থায়িনী, কিন্তু বাস্তবিকই যদি তাহাই হয়, তবে আর তাঁহাদের অত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন ছিল কি? যাহা জন সাধারণের মনে স্থান পায় নাই, এবং যাহা ভবিষ্যৎ বংশাবলীর মনে স্থান পাইবে এরূপ আশঙ্কাও নাই, তাহা লইয়া তাঁহারা আর বৃথা বকিয়া মরিয়াছেন কেন? বাস্তবিক কথা এই যে, ঐ সকল সমালোচকগণ কার্লাইলের রচনার যে ক্ষণস্থায়িত্বের কথা বলিয়া বেড়ান, তাহা তাঁহারা নিজেই বিশ্বাস করেন না।

লেখক কার্লাইলের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মতের সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথম, তাঁহার Gospel of labour কার্লাইলের হিসাবে, যাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লোকশিক্ষামূলক নূতন কিছু সন্নিবিষ্ট হয় নাই, তেমন কোন রচনাই রচনা-নামের যোগ্য নহে। কার্লাইলের Gospel of labour ইহার পরিস্ফুট দৃষ্টান্ত। "ইহজগতে কর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। কর্ম্ম করিবার জন্যই আমাদের জন্ম। প্রত্যেক দিন নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছে" ইত্যাদি। কার্লাইল এত পুনঃ পুনঃ এই উপদেশের উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কার্লাইল জানিতেন যে, কতকগুলি ধ্রুবসত্য এমন সাধারণ ভাবে বলা হইয়া থাকে যে, লোকে তাহার উপকারিতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য লোকের মনে বিশেষভাবে এইগুলির সঞ্চার করিতে হইলে খুব জ্বলন্ত ভাষায় পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়। কার্লাইল

যে উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে প্রত্যেক সহৃদয় পাঠক স্বীকার করিবেন যে, তাহা অতীব মহৎ। সমগ্র কর্ম্মক্ষম জনসমাজকে এক কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য কার্লাইলের যে ব্যগ্রতা ছিল, তাহা আন্তরিকতাপরিপূর্ণ। Latter day Pamphlet-এর অনিয়ত ভাষা তাঁহার জ্ঞানগর্ভ সত্যগুলির মূল্য কিছুতেই হ্রাস করিতে পারিবে না।

রাজনীতি সম্বন্ধে কার্লাইলের মত এক কথায় এই,—"প্রকৃত শাসনক্ষমদিগের হস্তে সাধারণের শাসনভার ন্যস্ত করা একান্ত আবশ্যক।" কার্লাইল বলেন যে, "আমাদের ইচ্ছা যে শাসনকর্ত্তার ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী করিতে হইবে,এবং যাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিলে আমাদের কল্যাণ সংসাধিত হইবে,পৃথিবীতে তিনি মহৎদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারক্ষম। যিনি আমাদের নিয়ামক, যিনি নানাপ্রকার শিক্ষা-বিস্তার করিয়া আমাদিগের কল্যাণসাধন করেন, তিনি সমস্ত আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক গৌরবের মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত; তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় 'রাজা,' 'নিয়ামক' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজী ভাষার নামটি অধিকতর অর্থদ্যোতক; King অর্থাৎ 'দক্ষলোক।'" শাসনকর্ত্তা। কার্লাইলের Hero Worship বা 'মহদর্চ্চনা' উল্লিখিত যুক্তি বা উপদেশের ভিত্তির উপর গঠিত। এ মতের পোষকতায় কার্লাইলের শিষ্যগণ অধিক দূর গুরুর অনুসরণ করিতে পারেন না, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি সমাজের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার মত কোন শক্তি ক্রিয়া না করিত,তবে সমাজ বন্ধনশূন্য নিয়মবিহীন জনসমষ্টিমাত্রে পরিণত হইত। এই শক্তিই এক বা তদধিক ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। কার্লাইলের মতে, এই শক্তির নিয়ন্তৃদিগের প্রতি, ভক্তি না হউক, সম্মানপ্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

যে সময় Hero and Hero Worship প্রকাশিত হয়, তখন কার্লাইলের মনে তদীয় রাজনৈতিক মত পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং ইহাতে তখন অনেক ভ্রম প্রমাদ ছিল। কিন্তু Latter Day Pamphlets ও Frederick the Great প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার এই ভ্রম আরও বাড়িতে লাগিল, এবং তাঁহার মতও যেন নানা প্রকারে বিকৃত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কার্লাইলের সমস্তই যে দোষাবহ ও পরিবর্জ্জনীয়, এমন হইতে পারে না। জ্ঞানিগণ দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন না। তাঁহার প্রচারিত মতে অনেক ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন দেশকালাবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার মতের বৈষম্য ও ত্রুটী সকল স্পষ্টই বুঝা যায়; কেবল দোষানুসন্ধান না করিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্যের এবং সেই সত্যের প্রকাশক কার্লাইলের, সম্মান করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক মত।

কার্লাইল সাধারণতন্ত্র রাজ্যের নিতান্তই দোষ গাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার প্রকৃত মত এবং আজকালকার উদারনৈতিকদিগের উদ্দেশ্য একই প্রকার। তবে যদি শেষোক্ত সম্প্রদায় বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের মতই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত, তাহা হইলেও কার্লাইলের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তাঁহারাও উপকার পাইতে পারেন। কার্লাইল বলেন যে "প্রকৃত বীরত্বই ইংলণ্ডের লর্ডশ্রেণীর সৃষ্টির অভিজাততন্ত্র।

উপাদান। কিন্তু প্রথম জেম্‌সের সময় হইতে এই গুণটির তিরোধান হইতে আরম্ভ হইয়াছে; উক্ত রাজত্বের শেষভাগ হইতেই, কোনও গুণ না থাকিলেও, অর্থভাগ্য ও কুটুম্বভাগ্য দেখিয়াই, 'লর্ড' উপাধি বিক্রীত হইত। তাহার ফলে, আমাদের "লর্ড" মহাশয়গণ বাজারের পিত্তলমূর্ত্তির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছ—বাহিরে যথেষ্ট চাকচিক্যশালী, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই। অবশ্য, কার্লাইল বহুপূর্ব্বতন লর্ডদিগের গুণগরিমা বাস্তবিক যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়াছেন, এবং আধুনিক সকল জিনিসের উপর বিরক্তি-বশতঃ বর্ত্তমান লর্ডদিগের কিছু অধিক নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কার্লাইলের উদ্দেশ্য দেখিতে গেলে, ইহাতে কেবল দোষ দেখিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কার্লাইল অভিজাততন্ত্র শাসন (Aristocracy) বলিতে সর্ব্বোৎকৃষ্টদিগের কর্ত্তৃক শাসন বুঝিতেন; যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান এবং পারদর্শী, তাঁহাদিগকে উন্নীত করিয়া দাও,—তাঁহারা আমাদিগকে শাসন করুন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তোমরা নিকৃষ্ট ও অনুপযুক্তদিগকে সমাজের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতেছ। অনেকে বলেন, লর্ড বিকন্‌স্‌ফিল্‌ড কার্লাইলের মতানুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক ইহাঁদের মধ্যে অতি সামান্য সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয় না। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই লর্ড বিকন্‌স্‌ফিলড্‌কেই কার্লাইল তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছিলেন।

কার্লাইল যেরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন, 'প্রকৃতিরঞ্জনাৎ রাজা'র আদর্শ দিয়াছেন, বাস্তবিক তেমন আদর্শ মিলিয়া উঠা দুর্ঘট। পরন্তু তাঁহার প্রকৃত আদর্শ রাজার পরিবর্ত্তে তদ্রূপ কোন রাজার আদর্শ।

কৃত্রিম আদর্শ সংস্থাপন করাও বিপজ্জনক। কিন্তু তাহা হইলেও ঐরূপ আদর্শ রক্ষা করা যে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহার অভীষ্ট আদর্শ শাসনকর্ত্তা না পাওয়া গেলেও ঐরূপ আদর্শ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে,আমরা অনায়াসে 'প্রকৃত' হইতে 'কৃত্রিম' পৃথক করিতে পারি। অবশ্য, আদর্শ শাসনকর্ত্তা সম্বন্ধে কার্লাইল যেমন নিরাশ হইয়া গিয়াছেন, আমাদের ভাগ্যও সেইরূপ; কিন্তু তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিলে, আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে। "Latter Day Pamphlets"এর এক স্থলে পার্লেমেণ্ট মহাসভার কথা বলিতে বলিতে কার্লাইল বলিয়াছেন যে, "পার্লেমেণ্ট যতদিন কেবল বাক্যযন্ত্রমাত্র থাকিবে, ততদিন ইহার সহস্র উৎকর্ষ হইলেও, তাহাতে কোন জাতীয় উপকার সাধিত হইবে না। ইংলণ্ডের সমস্ত পরিশ্রম, শক্তি, মান, গৌরব, কার্য্যকুশলতা ব্যয় করিয়া ও কায়মনে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আরাধনা করিয়া বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের পরিবর্ত্তে ১২ জন, ১০ জন,অভাবপক্ষে ৬ জন প্রকৃত শাসনক্ষম লোক কি মিলে না?" Latter Day Pamphlets কার্লাইলের মতের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া স্বীকার করা বোধ করি ঠিক নহে। তিনি যে বাক্যযন্ত্র বলিয়া পার্লেমেণ্টের নিন্দা করিয়াছেন, অনেক সময়ে প্রকৃত কর্ম্মযন্ত্রের সৃষ্টি করিতে হইলে, তাহার উপায়স্বরূপ বাক্যযন্ত্রের সাহায্য আগে চাই। কিন্তু "আমাদিগের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের পরিবর্ত্তে সমস্ত দিয়াও অন্ততঃ ৬ জন প্রকৃত শাসনকর্ত্তা আবশ্যক হইয়াছে", এ বিষয়ে কার্লাইলের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত।

কার্লাইলের সমস্ত মতই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা এবং তৎসমুদায়ের সমর্থন আমাদের

অভিপ্রেত নহে। তবে কার্লাইলের প্রতি এক সম্প্রদায়ের অসম্মানসূচক অভক্তি দেখিলে আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হই। কার্লাইলের প্রচারিত কতকগুলি

শেষ কথা।

সত্য আমরা ভুলিয়া গেলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহার অনেক বিষয় চিরকাল নিত্য সত্য ভাবে পৃথিবী মনে রাখিবে। যদি ইংরেজেরা কার্লাইলের পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষা করিত, এবং কার্লাইলের উপদেশানুমত স্বদেশহিতৈষী হইতে পারিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আজ তাহারা আপনাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি ও নেতৃগণের অসৎপ্রকৃতিজনিত অনেক অপমান ও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইত। তাঁহার উপদেশগুলি স্বতঃই কেমন সারগর্ভ! বর্ত্তমান সময়ের কেমন উপযোগী! উপসংহারে তাঁহার শেষ-সময়ের রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—"আমি শুনিয়াছি,ইংলণ্ডের গৌরব (Prestige) নাকি মহাদেশে এখন আর অক্ষুণ্ণ নাই; ইহাতে সম্পাদক মহাশয়েরা আক্ষেপ করিয়াছেন। আমি ত আক্ষেপের বিষয় কিছুই দেখি না। গৌরব ব্যাপারটি ছায়া-বাজির ন্যায়। দরিদ্র ইংলণ্ডের খুব ভাল সময়েও যে 'মহাদেশে তাহার এই গৌরব কোন দিন ছিল বা কখনও তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল, তাহা ত আমি জানি না।"

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ভোটান।

—*—

ভোটান আমাদিগের আবাসস্থান বঙ্গদেশ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। কিন্তু সেই অনধিগম্য দেশাংশ আমাদিগের নিকট "চীন,ব্রহ্মদেশ,অসভ্য জাপান" হইতেও অধিক অপরিচিত। কারণ, সেখানে প্রবেশলাভ সহজসাধ্য নহে, সেখানে ভ্রমণকারীর জীবন নিরাপদ নহে, সেখানকার অসভ্যতার উৎপীড়ন বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সম্প্রতি "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে ভোটান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,আমরা নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।—

কলিকাতা হইতে ন্যূনাধিক ৩২০ মাইল ভ্রমণের পর আমরা এক অদ্ভুত রাজ্যে উপনীত হই। তথায় সুশৃঙ্খলে রাজ্যপালন ঘৃণিত; নরহত্যা, উৎপীড়ন ও রাজদ্রোহ নিত্য ঘটনা; দাসত্বপ্রথা অবাধে প্রচলিত। বঙ্গদেশের অতি সন্নিকটেই এই

দেশের নাম কি?

সকল বিদ্যমান। এই অদ্ভুত দেশ ও তথাকার উচ্ছৃঙ্খল অধিবাসিগণের বিবরণ আমরা প্রায় কিছুই অবগত নহি। এমন কি, আমরা ইহার নাম যথাযথরূপে লিখিতে জানি না। লেখক বলেন, স্যর উইলিয়ম হণ্টারের প্রচলিত মতানুসারে ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত "ভুটান" নাম ভ্রমাত্মক। বোত শব্দ হইতে উক্ত নামের উৎপত্তি। "বোত" শব্দে তিব্বতীয়েরা স্বদেশকে নির্দ্দেশ করে। ইহা লাডক ব্যতীত সর্ব্বত্র ভোট অথবা ভোও উচ্চারিত হয়। ইহার যথার্থ নাম ভোটান। এই নাম ভোটের অর্থাৎ তিব্বতের সীমান্ত প্রদেশ বুঝাইবার জন্য প্রথমে গুর্খাগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। ভুটীয়ারা স্বদেশকে ড্রুকয়ুল অথবা ধর্ম্মযুল বলে। তিব্বতীয়েরা ইহাকে লোয়ুল ও সিকিমের লেপচারা প্রু বলে। "ভোটান"ই প্রকৃত উচ্চারণ—"ভুটান" নহে।

লেখক যে সকল মূল হইতে স্বীয় প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি নীরব। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ভোটানে রাজকার্য্যে দুইবার দূত প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যবিবরণী হইতে তদ্দেশীয় ভৌগোলিক তথ্য অথবা মানবপ্রকৃতির কোনও তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু যে সকল কষ্টসহিষ্ণু ভ্রমণকারী দুরারোহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক এই দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তথাকার অনেক কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতীয় জরিপ-বিভাগের যে সকল এদেশী কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে তিব্বত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের রোজনামচা ও পথবিবরণীতেও অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিবরণ সাধারণের গোচর হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক এই সকল বিবরণ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা।

পূর্ব্বপশ্চিমে ভোটানের দৈর্ঘ্য ১৮৫ মাইল ও প্রস্থ ৮৫ মাইল মাত্র। ইহার অধিকাংশ পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছন্ন। মধ্যে কতকগুলি সুজলা উপত্যকা আছে। সেই সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত জলস্রোতগুলি ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রধান নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দেশের ভূমি উর্ব্বরা, কিন্তু রাজ্যশাসনের বিশৃঙ্খলা ও অধিবাসিগণের অত্যধিক লুণ্ঠনপ্রবণতায় ইহা বৃক্ষসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে পরিণত। সিমলা শৈলের শষ্পহীন ভীষণ দৃশ্য হইতে ইহা অনেকাংশে বিভিন্ন। পর্ব্বতগাত্রে বিশাল মহীরুহশ্রেণী উন্নতমস্তকে আকাশের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। কর্ষণহীন সমভূমি অনায়াসজাত তৃণগুল্মে সদা শ্যামলা। প্রাকৃতিক দৃশ্যে হিমালয়ের এই অংশ বড় সুন্দর ও পথিকের নয়নানন্দদায়ক। সিমলায় জলকষ্টের অন্ত নাই; পর্ব্বতপার্শ্বস্থ গভীর অন্ধকার খদে সূক্ষ্ম জলরেখা কদাচিৎ সূর্য্যালোকে পথিকের নয়নগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে পর্ব্বতগাত্র হইতে সর্ব্বত্র অসংখ্য ঝরণা নামিয়াছে। তাহাদের অবিরাম পতনশব্দে সমস্ত দেশ সর্ব্বদা মুখরিত। ঝরঝর শব্দ শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেই নয়নসমক্ষে একখানি চারুচিত্র আবির্ভূত হয়,—রবিকরে জলরাশি হীরকের মত দীপ্তি পাইতেছে।

ক্ষেত্রজাত উৎপন্নের মধ্যে চাউল, গম ও বার্লি প্রধান। উন্নতপর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকায় এক প্রকার নিকৃষ্ট বার্লি জন্মে। বপনের দুই মাসের মধ্যেই তাহা সুপক্ক হইয়া উঠে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে বীজবপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে হলকর্ষণাদি আবশ্যক হয় না। কঠিন জমির উপর বীজ ছড়াইয়া একবারমাত্র হলকর্ষণ করিলেই যথেষ্ট। দেশের সর্ব্বত্র নানা-জাতীয় মূল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা রন্ধনান্তে বা বিনা রন্ধনে ভক্ষিত হইয়া থাকে। আলুর চাষও অনেক স্থানে আরব্ধ হইয়াছে। কোন কোন প্রশস্ত উপত্যকায় পশুপালন সাধারণের প্রধান জীবিকা। পশ্চিম ভোটানে আমুচু ও ওয়ংচু নামক স্থানদ্বয়ে ইহা অধিকপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পালিত পশুগণের মধ্যে ভারতীয় গো ও মিশ্রজাতীয় ইয়াক প্রধান। তাহারা আকারে বড় ও যথেষ্ট দুগ্ধ প্রদান করে। দুগ্ধ হইতে প্রচুরপরিমাণে নবনীত প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যরূপে ও মন্দিরে পূজার্থ ব্যবহৃত হয়। এখানে শিকারোপযোগী বিস্তর পশু দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ এতদ্দেশীয়েরা পশুহননে বিরত, কিন্তু বন্য

পশুবধে কাতর নহে। সুতরাং গণ্ডার, বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র, নানাজাতীয় চিতা, বৃহৎ বন্যছাগ, কস্তুরীমৃগ ও অন্যান্য পশুর শিকারে শিকারী প্রচুর আমোদলাভ করিতে পারেন; তাহাতে দেশবাসিগণেরও উপকার হয়।

শাসনপ্রণালী।

দেশের শাসনপ্রণালী অনেকাংশে তিব্বতের ন্যায়,—ইহাকে আংশিক "দেবতন্ত্রীয়" বলা যাইতে পারে। দেশীয় বিভিন্ন সর্দ্দারেরা একজন প্রধান ধর্ম্মরাজকের অধীনতা স্বীকার করে। এই সকল সর্দ্দারেরা এক প্রকার স্বাধীন। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ব্যারণদিগের সহিত ইহাদের শাসনকার্য্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দেশের প্রধান পুরোহিত ধর্ম্মরাজ নামে আখ্যাত। সাধারণের বিশ্বাস, তিনি অতি-ঐতিহাসিক যুগে জীবিত ছিলেন ও "সাবডাং নগাগওয়াং নামগ্যাম" নামক বীরের অবতার। ইনি চল্লিশ বৎসর মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু সহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ গোলাপের ন্যায় লোহিত ও পদ্মগন্ধী। তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ, তদ্রচিত গ্রন্থাবলী ও তন্নির্ম্মিত সেতু প্রভৃতি দেখিয়া বোধ হয়, তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল সর্দ্দারেরাই দেশের প্রকৃত রাজা। সমস্ত দেশ নয়টি বিভাগে বিভক্ত ও প্রত্যেক বিভাগে একজন সর্দ্দার আছে। তাহারা স্বেচ্ছামত স্বাধিকারের শাসন ও অবসরমত পার্শ্ববর্ত্তী বিভাগের লুণ্ঠনে সময়-ক্ষেপ করে। স্বাধিকারমধ্যগত পণ্যদ্রব্যে তাহারা অত্যধিক শুল্ক আদায় করে। একে ত প্রতিপদে জীবননাশের সম্ভাবনা, তদুপরি এই অত্যধিক শুল্কে বাণিজ্যব্যবসায় যে অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

দেশবাসিগণ।

প্রবন্ধলেখক ইহাদের দৈহিক বল ও গঠনের প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারা আকারে দীর্ঘ ও দৃঢ়গঠিত। তিব্বতীয়গণ অপেক্ষা ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। ইহারা বড় কলহপ্রিয় ও কিছুতেই পরের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। এ জন্য কোন কার্য্যে "নিযুক্ত" হইলেও বড় অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইহাদের অনেকে নানা কারণে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সিকিম অথবা দুয়ারে আসিয়া বাস করিতেছে। অনেকে দার্জ্জি-লিঙ্গের চা-বাগানে কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, অবাধ্য ও শীঘ্রই কাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অসাধারণ দৈহিক বল সত্ত্বেও তাহারা সহজে ভারবাহ-কের কর্ম্ম করিতে চাহে না। কিন্তু স্বদেশে তাহারা আলস্যে জীবনযাপন করে না।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা বেশ বলিষ্ঠ ও দৈহিক সামর্থ্যে প্রায় পুরুষের সমতুল্য। অনেক সময়ে স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্রে পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকে। এখানে "বহুপত্যাত্মক বিবাহ" প্রচ-লিত। এক পরিবারের তিন, চারি ভ্রাতায় মিলিয়া এক জন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া এক সংসারে বাস করে।

ভারতবর্ষের সকল দেশীয় রাজ্যে এক জন করিয়া ইংরাজ রেসিডেণ্ট আছেন, কিন্তু আশ্চ-র্য্যের বিষয়, ভোটানে তাহা নাই। গত ত্রিশ বৎসর ইহাদের সহিত ইংরাজ গবর্ম্মেণ্টের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু বহু দিন হইতে ইহাদের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং মধ্যে অনেকগুলি যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভোটীয়ারা কুচবিহার আক্রমণ করিলে, তদ্দেশীয়েরা বৃটিশ গবর্ম্মেণ্টের সাহায্য

প্রার্থনা করে। তদনুসারে কাপ্তেন জোন্স দুইটি কামান ও দুই দল সিহাহি সৈন্য সহ ইহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। ইনি সমভূমিতে পর্ব্বতীয়দিগকে যথেষ্ট ক্ষতি-সহকারে পরাভূত করিয়া তাহাদের পর্ব্বত্য আশ্রয়স্থান পর্য্যন্ত অনুসরণ পূর্ব্বক কুচবিহারের বালক রাজার উদ্ধারসাধন করেন। তিনি ডালিং ও অন্যান্য দুর্গ তোপে উড়াইয়া দেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দেশ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। অবশেষে তিব্বতের প্রধান লামার বিশেষ অনুরোধে ভোটান ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ১৭৭৪ অব্দে তিব্বতগমনকালে মিঃ জর্জ্জ বোগ্‌ল ভোটানের মধ্যে দিয়া তিব্বতগমনে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন। তাঁহার আদেশানুসারে তিনি গমনপথের স্থানে স্থানে আলুর বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আলু ভোটানের সর্ব্বত্র সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। উক্ত ঘটনার দশ বৎসর পরে কলিকাতা হইতে তিব্বতযাত্রী একদল রাজদূত দেশের সর্ব্বত্র সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন।

ধুস্কক্ষেত্র॥

পরে সাধারণের অজ্ঞাত কোনও কারণে ভোটীয়া ও ইংরাজের মধ্যে পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে বহুদিনব্যাপী "বিচ্ছিন্ন" যুদ্ধের পর পর্ব্বতীয়গণের উপদ্রবশান্তির আশায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট দুয়ার নামক স্থান ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু শীঘ্র তাহাতে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইংরাজেরা দুর্ব্বলতাবশতঃ ও আত্মরক্ষায় অক্ষমতাপ্রযুক্ত এই প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়াছে ভাবিয়া তাহারা পুনরায় সমতলভূমিতে লুটপাট আরম্ভ করিল। তখন এদেশে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ন্যায় ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়চেতা কোনও শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। সুতরাং প্রায় বিংশতি বৎসর তাহারা অবাধে সীমান্তবাসিগণের উপর উপদ্রব করিয়াছিল। অবশেষে ১৮৬৪ অব্দে, শান্তি ও সন্ধির স্থাপনের জন্য এস্‌লি ইডেন রাজকীয় দূতরূপে প্রেরিত হন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। রাজদূত দেশের সর্ব্বত্র অত্যন্ত অবমানিত হইয়াছিলেন। দেশমধ্যস্থ পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকায় সন্ধিসত্বনির্দ্ধারণার্থ সমবেত সর্দ্দারমণ্ডলীর উৎপীড়নে তিনি ইংরাজের হীনতাজ্ঞাপক এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই সন্ধিপত্র অস্বীকার করিয়া পর্ব্বতীয়গণের দমনের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। গত শতাব্দীতে মুষ্টিমেয় সৈন্য ও তৎকালীন আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে কাপ্তেন জোন্স কয়েক মাসে মধ্যেই সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার অসংখ্য সৈন্য অজস্র অর্থনাশ করিয়া দুই বৎসরে তাহা সংসাধিত হইল না। যুদ্ধশেষে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, অনেকের মতে তাহা বৃটিশ রাজশক্তির অবমাননাজ্ঞাপক। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এই সন্ধির দ্বারা ডালিংকোট ও কালিমপুর নামক সুন্দর ভূমিখণ্ডদ্বয় ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়। ভোটানের প্রধান সর্দ্দার এখন ইংরাজের নিকট হইতে বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখন সীমান্তবাসিগণ লুণ্ঠন ও অন্যান্য উপদ্রব হইতে নিরাপদ হইয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। "দেবতার গ্রাস" কবিতায় লিখিত একটি সুন্দর গল্প। ভাষার উচ্ছলিত প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে গল্পটি অবলীলাক্রমে উপসংহারের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ছন্দের কঠোর বন্ধনে কোথাও তাহার লীলাময়ী গতির রোধ হয় নাই। স্নেহ প্রেম সৌন্দর্য্যের সুকোমল অরুণাভায় গল্পটির প্রারম্ভভাগ সুরঞ্জিত,—কিন্তু এই স্নিগ্ধ আলোকের পর কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার!—সেখানে অন্ধ কুসংস্কার, তামসী স্বার্থপরতা, ও অরুন্তুদ নিষ্ঠুরতার কি ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা! তাহাতে সঙ্কুচিত শঙ্কিত মথিত হৃদয় শিহরিয়া চমকিয়া মুহ্যমান হইয়া আসে, এবং সর্ব্বশেষে এই বিচিত্র ছায়ালোকসম্পাতরচিত চিত্রখানির মধ্যে সহসা করুণরসোচ্ছ্বাসপূত ব্রাহ্মণের পরার্থে আত্মদান কি মহনীয় কি বরণীয় কি স্পৃহনীয় বলিয়া মনে হয়। কবির নিষ্ঠুর কল্পনায় হৃদয় পিষ্ট হউক, কিন্তু তাঁহার কাব্য-কৌশল প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "প্রবাসস্মৃতি" পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ করিয়া একজন দক্ষ লেখক কালী ও কাগজের এত অপব্যয় করিতে পারেন, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। বিলাতে অবস্থানকালে লেখক এক সুন্দরী ব্রিটিশ যুবতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"বাঃ দিব্য দেখিতে!" সুন্দরীর স্বামী 'জন্‌পুঙ্গব' লেখকের "সম্মুখে আসিয়া গুরুগর্জ্জনে বলিলেন, 'কি মহাশয়!' লেখক 'গম্ভীর স্থির স্বরে' কহিলেন, 'কেন মহাশয়!' "ইংরাজ কহিল, 'আপনি যে বলিলেন, 'দিব্য দেখিতে' তাহার মানে কি?" লেখক 'তাহার তপ্ত তাম্রবর্ণ মুখের প্রতি শান্ত কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া' কহিলেন, 'তাহার মানে আপনার কুকুরটি দিব্য দেখিতে!' লেখক 'অদূরে উৎস-উচ্ছ্বাসের মত সুমিষ্ট একটি হাস্যকাকলি শুনিতে' পাইলেন; "আর সেই অকস্মাৎ প্রতিহতরোষ ইংরাজের সুগভীর বক্ষঃকুহর হইতে একটা বিপুল হাস্যধ্বনি সজল গম্ভীর মেঘস্তনিতের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল।" ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী অক্ষরসমষ্টি গলাধঃকৃত করিয়া পরিশেষে এই অপূর্ব্ব ঘটনায় উপনীত হইলে সহজেই মনে দুটি প্রশ্নের উদয় হয়; ১ম,—এই সুন্দরীসন্দর্শন নাটকের শেষঅঙ্কে লেখকের ভাগ্যে 'উৎস উচ্ছ্বাসের মত সুমিষ্ট হাস্যকাকলি' জুটিয়াছিল; কিন্তু এতখানি পণ্ডশ্রম করিয়া পাঠকের কি লাভ? ২য়,—জন-পুঙ্গব প্রত্যুৎপন্নমতি সাহসী লেখকের উত্তর শুনিয়া, নিজের কুকুরকে, না বিদেশী নিগারকে,—কাহাকে হাস্যরসের সমধিক উদ্দীপক ও 'পিটি'র পাত্র মনে করিয়াছিল? পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন, "দ্বিতীয়বার আর এরূপ ঘটনা ঘটে নাই।" বঙ্গীয় পাঠকের পরম ভাগ্য! দুঃখের বিষয় এই, যাঁহারা এমন বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তাঁহারাও বিষয়নির্ব্বাচনে এতটা অসাবধান ও বিচারবিমুখ। বয়স্যজনসমাগমে যাহা অতি সুন্দর 'টেব্‌ল্-টক্' বলিয়া সাদরে গৃহীত হইত, তাহা যে সাহিত্যের সভা নিরর্থ ও ব্যর্থ হইতে পারে, আত্মপ্রত্যয়ে অচলা ভক্তি না থাকিলে, লেখক তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। "বানুরে বুদ্ধি" প্রবন্ধে লেখক বানরজাতির বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক কতিপয় দেশীয় গল্পের সংগ্রহ করিয়াছেন। "সাইবীরিয়া" নামক সুখপাঠ্য প্রবন্ধে, লেখক, Meigrian সাহেব প্রণীত From Paris to Pekin over the Siberian

Snows নামক ভ্রমণকাহিনীর পরিচয় দিয়াছেন। "দেশান্তরিত ফরাসী" প্রবন্ধে, লেখক, মিঃ লুই ডি রোজমণ্ট নামক 'একটি অসাধারণ' ব্যক্তির পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইয়া, ভূমিকায় 'সাধারণ' বাঙ্গালীর ভ্রমণে অনিচ্ছার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছেন। কিন্তু হায়! যে 'অসাধারণ' ভ্রমণকারীর অদ্ভুত অবদানে লেখক এত মুগ্ধ হইয়াছেন, কোনও বিলাতী দৈনিকের কল্যাণে জানা গিয়াছে, সেই রোজমণ্টের কাহিনী আদৌ সত্য নহে, লোকটি জাল, ইত্যাদি। সুতরাং লেখক যে তাসের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, অগত্যা তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে।

নব্যভারত। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার ঘোষের 'সুন্দরবনে মগ' প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কাসাভা বা সিমুল আলুর চাষ" একটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "পূজা দেখা" কবিতাটির রসগ্রহণ করিতে পারিলাম না। গোবিন্দ বাবুর ন্যায় সুকবির হস্তে কবিতার এইরূপ অপব্যবহার ও লাঞ্ছনা দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। "কুকির কবিতা" কৌতূহলজনক। লেখক বলেন,—"বর্ব্বর ও নিরক্ষর কুকিদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।" ত্রিপুরাপতির যত্নে কুকি জাতিকে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। আশার কথা,—এই যত্ন ও চেষ্টা বিফল হয় নাই; "আজ কাল ত্রিপুর রাজ্যের অনেক কুকি প্রজাই বাঙ্গালা লেখাপড়া কথঞ্চিৎরূপে শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।" কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ত্রিপুররাজের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে কুকি রাজা বান থাম্পুই স্বরচিত 'দুঃখগান' শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন। * * * ইহার পূর্ব্বে কুকি জাতির মধ্যে কেহ কখনও কবিতা লিখিয়াছে, পুথি, পুস্তক, অথবা লোকমুখে এমন কথা শুনা যায় নাই।"—কালীপ্রসন্ন বাবু কুকিরাজের রচিত সেই বাঙ্গালা কবিতাটি প্রকাশিত করিয়াছেন। এবার "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা"য় নব্যভারত-সম্পাদকের শীলতা ও সৌজন্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি! "মাসিকপত্রিকাসমূহের সম্পাদকগণের অনেকেই" নব্যভারত-সম্পাদককে মাসিকপত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জগতের কি দুর্ভাগ্য! নব্যভারতের সম্পাদক বলিয়া দিতেছেন, তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম। নব্যভারত-সম্পাদকের মতে, "মাসিকসাহিত্য সমালোচনায় ঘৃণা, বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত কুৎসাই প্রশ্রয় পাইতেছে।" তাঁহার উক্তি প্রতিবাদেরও অযোগ্য। নব্যভারত-সম্পাদকের মতে, যে সমালোচনা করে, সে লেখকের "বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করে।" পুনশ্চ, নব্যভারতের এই নব্য সাধু বলিতেছেন,—"আমরা আপন আপন বন্ধুর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে পারিব না।" সাধু সাধু! সেই জন্যই কি ছুরিকাখানি শানাইয়া "সাহিত্য ভারতী পূর্ণিমা প্রভৃতি"র সম্পাদকগণের বক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? আমাদের কল্যাণে নব্যভারত-সম্পাদকের যে সকল বন্ধুর 'বক্ষ' বাঁচিয়া গিয়াছে, তাঁহারা কি অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার অনুরোধেও, তাঁহাদের এই বন্ধু-সম্পাদকের জন্য মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করিবেন না?

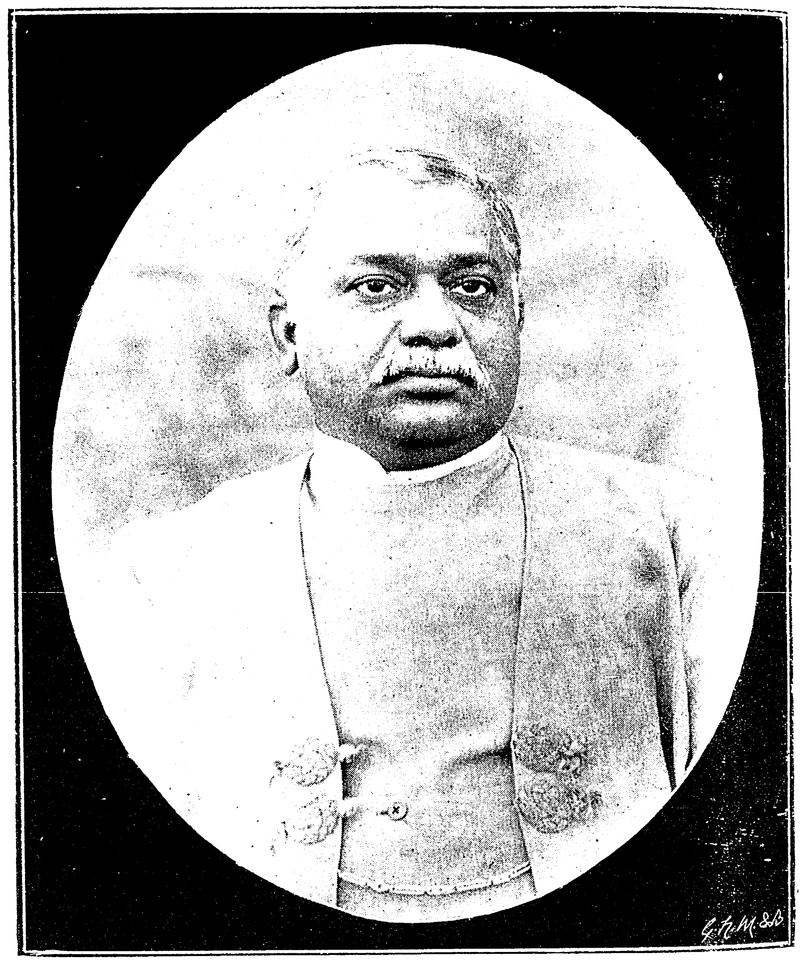

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

আমার যখন পঠদ্দশা, তখন প্রেমচাঁদরায়চাঁদ-বৃত্তিধারী উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম ছাত্রসমাজে অপরিচিত ছিল না; কিন্তু তিনি তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে বোধ হয় অপরিচিত ছিলেন। "সাহিত্য" পত্রে বৈদিক কালে গোহত্যাবিষয়ক যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়, বোধ হয়, তাহাই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় প্রাচীন-ইতিহাস-ঘটিত গবেষণাপূর্ণ যে সকল প্রবন্ধ সচরাচর বাহির হয়, সাধারণ পাঠকের অন্তঃকরণে তাহা কি রকম একটা অনির্ব্বচনীয় ভীতির সঞ্চার করে; বোধ করি, সেই ভীতির বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তখন সেই বৈদিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে সাহস পাই নাই। "সাধনা" পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা তাঁহার লেখনী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে আমি তাঁহার রচনায় আকৃষ্ট হই, এবং তখনই বুঝিতে পারি, বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে অভিনব মহারথের আবির্ভাব হইয়াছে। তদবধি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে তাঁহার যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, প্রায় সকলই আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি, এবং যখনই পড়িয়াছি, তখনই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। অথচ, এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ঐতিহাসিক গবেষণায় পরিপূর্ণ।

ইহাও স্বীকার করিতে দোষ দেখি না যে, "সাহিত্য" পত্রের মলাটের উপর উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম মুদ্রিত দেখিলেই মনে একটা উৎকট হর্ষ উপস্থিত হইত। আশা হইত যে, এমন একটা কিছু তাঁহার রচনামধ্যে দেখিতে পাইব, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। কখনই সে আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

কিন্তু তখন জানিতাম না যে, এত অচিরে এই আনন্দের জনয়িতা বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইবেন, এবং যে আগ্রহ, যে আকাঙ্ক্ষার সহিত মাসের পর মাস উমেশচন্দ্রের নাম "সাহিত্যের" মলাটে অঙ্কিত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহা এত শীঘ্র চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেক। তাঁহার স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও কখন মনে করি নাই।

বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয়ের

সৌভাগ্য ঘটে নাই ; এবং তিনি সাহিত্যের যে অংশের প্রধানতঃ আলোচনা করিতেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে আমার অধিকারবহির্ভূত। এই অবস্থায় তাঁহার জীবন বা কর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনায় আমি কোন ক্রমেই যোগ্য নহি। তথাপি যখন "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতিই এই ভার অর্পণ করিলেন, এবং তজ্জন্য আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে আমি দ্বিধাবোধ করি নাই। দূর হইতে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকাশের অবসর লাভ করিয়া সেই লোভের সংবরণ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্রের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। উমেশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার ভূমিকামাত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সেই অসম্পূর্ণ ভূমিকা হইতে ও তাঁহার পুত্রগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনের স্থূলঘটনা কয়টির উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রাম উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্ম স্থান। ১২৫৯ সালে ভাদ্র মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩০৫ সালে ১লা শ্রাবণ তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। ছচল্লিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই এই কৃতী বঙ্গসন্তানের অকালমরণ কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পাল ও অন্যান্য বঙ্গসন্তানের স্মৃতি জাগাইয়া দিবে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামও অন্যান্য কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের সহিত সম্পর্কসূত্রে সাহিত্যসমাজে অপরিচিত নহে। এই গ্রামের অন্তর্গত অন্যতর পল্লী রাধানগর রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। রামমোহন রায়ের ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থানীয় সমাজের উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, ও এই সম্পর্কে রামমোহন রায়ের সময়েও উভয় দলে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাহার স্মৃতি সেদিনও বঙ্গীয় সাহিত্যে ক্ষুদ্র একটি বিতণ্ডার আন্দোলন উৎপন্ন করিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী রামকানাই বটব্যাল উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধপিতামহ। রামকানাইএর পিতৃপিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন; রামকানাই আপন পরিবারমধ্যে স্বকল্পিতযন্ত্রসহকারে অভিনব শক্তি-উপাসনার প্রচলন

করিয়া যান ; তাহা এখনও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং উমেশচন্দ্র সেই শক্তি-উপাসনার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন।

উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল, মাতার নাম প্রসন্নকুমারী দেবী। উমেশচন্দ্রে বঞ্চিত হইয়া উভয়েই এখনও জীবিত, বা জীবন্মৃত।

৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর প্রতিষ্ঠিত রাধানগর ইংরাজী স্কুলে ১৮৬৮ সালে উমেশচন্দ্র প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আইসেন। এবং ১৮৭২ সালে সংস্কৃত কালেজ হইতে বি. এ. উপাধি লাভ করেন। ৭৪ সালে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম্. এ., ৭৫ সালে বি. এল্. উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ সালে প্রেমচাঁদরায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়াট পদক পুরস্কার পান। পঠদ্দশার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

১৮৭৭ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে গবর্মেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক স্থানে ঐ কার্য্যের পর, দশ বৎসর পরে ষ্টাচুটারি সার্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ানী লাভ করেন। পরে বিভিন্ন জেলায় প্রশংসার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বগুড়ায় অবস্থানকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। চিকিৎসায় বা স্থানপরিবর্ত্তনে কোন উপকার হইল না। ১লা শ্রাবণ তারিখে কলিকাতার বাটীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজকীয় কার্য্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। "নম্রতা, রসজ্ঞতা, গর্ব্বাভাব" ইত্যাদি গুণে সকলের প্রিয় ছিলেন, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক যথোচিত বর্ণিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

গার্হস্থ্যজীবনে বা রাজকীয় কর্ম্ম সম্পর্কে তিনি বৃহৎ সমাজের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন ; সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বৃহত্তর সংসারের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই সংসারেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে তিনি এই বৃহত্তর সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া যাইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচনা বড় অপূর্ব্ব সামগ্রী ছিল! এই দুর্ভাগ্য দেশের সাহিত্যক্ষেত্রের প্রায় সমগ্র প্রদেশটা যে সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত, সেই সেনাভুক্ত বীরপুরুষগণের বেশভূষার পারিপাট্য ও

সৌভাগ্য ঘটে নাই ; এবং তিনি সাহিত্যের যে অংশের প্রধানতঃ আলোচনা করিতেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে আমার অধিকারবহির্ভূত। এই অবস্থায় তাঁহার জীবন বা কর্ম্ম সম্বন্ধে সমালোচনায় আমি কোন ক্রমেই যোগ্য নহি। তথাপি যখন "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতিই এই ভার অর্পণ করিলেন, এবং তজ্জন্য আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে আমি দ্বিধাবোধ করি নাই। দূর হইতে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকাশের অবসর লাভ করিয়া সেই লোভের সংবরণ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্রের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। উমেশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার ভূমিকামাত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সেই অসম্পূর্ণ ভূমিকা হইতে ও তাঁহার পুত্রগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনের স্থূলঘটনা কয়টির উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রাম উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্ম স্থান। ১২৫৯ সালে ভাদ্র মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩০৫ সালে ১লা শ্রাবণ তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। ছচল্লিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই এই কৃতী বঙ্গসন্তানের অকালমরণ কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পাল ও অন্যান্য বঙ্গসন্তানের স্মৃতি জাগাইয়া দিবে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামও অন্যান্য কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের সহিত সম্পর্কসূত্রে সাহিত্যসমাজে অপরিচিত নহে। এই গ্রামের অন্তর্গত অন্যতর পল্লী রাধানগর রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। রামমোহন রায়ের ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থানীয় সমাজের উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, ও এই সম্পর্কে রামমোহন রায়ের সময়েও উভয় দলে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাহার স্মৃতি সেদিনও বঙ্গীয় সাহিত্যে ক্ষুদ্র একটি বিতণ্ডার আন্দোলন উৎপন্ন করিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী রামকানাই বটব্যাল উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধপিতামহ। রামকানাইএর পিতৃপিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন; রামকানাই আপন পরিবারমধ্যে স্বকল্পিতযন্ত্রসহকারে অভিনব শক্তি-উপাসনার প্রচলন

করিয়া যান ; তাহা এখনও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং উমেশচন্দ্র সেই শক্তি-উপাসনার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে যথেষ্ট গৌরব অনুভব করিতেন।

উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল, মাতার নাম প্রসন্নকুমারী দেবী। উমেশচন্দ্রে বঞ্চিত হইয়া উভয়েই এখনও জীবিত, বা জীবন্মৃত।

৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর প্রতিষ্ঠিত রাধানগর ইংরাজী স্কুলে ১৮৬৮ সালে উমেশচন্দ্র প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আইসেন। এবং ১৮৭২ সালে সংস্কৃত কালেজ হইতে বি. এ. উপাধি লাভ করেন। ৭৪ সালে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম্. এ., ৭৫ সালে বি. এল্. উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ সালে প্রেমচাঁদরায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়াট পদক পুরস্কার পান। পঠদ্দশার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

১৮৭৭ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে গবর্মেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক স্থানে ঐ কার্য্যের পর, দশ বৎসর পরে ষ্টাচুটারি সার্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ানী লাভ করেন। পরে বিভিন্ন জেলায় প্রশংসার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বগুড়ায় অবস্থানকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। চিকিৎসায় বা স্থানপরিবর্ত্তনে কোন উপকার হইল না। ১লা শ্রাবণ তারিখে কলিকাতার বাটীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজকীয় কার্য্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। "নম্রতা, রসজ্ঞতা, গর্ব্বাভাব" ইত্যাদি গুণে সকলের প্রিয় ছিলেন, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক যথোচিত বর্ণিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

গার্হস্থ্যজীবনে বা রাজকীয় কর্ম্ম সম্পর্কে তিনি বৃহৎ সমাজের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন ; সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বৃহত্তর সংসারের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই সংসারেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে তিনি এই বৃহত্তর সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া যাইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচনা বড় অপূর্ব্ব সামগ্রী ছিল! এই দুর্ভাগ্য দেশের সাহিত্যক্ষেত্রের প্রায় সমগ্র প্রদেশটা যে সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত, সেই সেনাভুক্ত বীরপুরুষগণের বেশভূষার পারিপাট্য ও

অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহাদের জড়শরীরে মেরুদণ্ডের ও অস্থি-কঙ্কালের অস্তিত্বসম্বন্ধে ঘোর প্রমাণাভাব। রামায়ণের আমলে ও হোমারের আমলে বীরপুরুষেরা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাগ্‌যুদ্ধটাকে একবারে অনাবশ্যক বলিয়া ভাবিতেন না; কিন্তু বাহুযুদ্ধটা একবার আরম্ভ হইলে তাহার ফল শত্রুর পক্ষে বড় বিষম হইত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রের বীরেরা যে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন, তাহার তীক্ষ্ণতা কখনও অনুভবের বিষয় হয় না; এবং তাঁহারা যে অস্ত্রের আস্ফালন করেন, তাহা কাহারও পৃষ্ঠে কখনও কাটিয়া বসে না। এক শ্রেণীর লেখকের অত্যাচারে মনে হয়, কি অশুভক্ষণেই এদেশে কমলাকান্তের দপ্তর ও উদ্ভ্রান্ত প্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল। আর এক শ্রেণীর লেখক অতিশয় পুরাতন জীর্ণ সত্যকে জীর্ণতর বেশভূষায় কথঞ্চিৎ সজ্জিত ও আবৃত করিয়া সাধারণসমক্ষে উপস্থিত করেন, তাহার প্রতিও কোনরূপ আকর্ষণের বা অনুরাগপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহিশস্যের বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা শুনিতে পাই, একান্ত নাইট্রোজেন-বর্জ্জিত; বঙ্গের জলাভূমি যে ম্যালেরিয়া উৎপাদন করেন, তাহা বাষ্পীয় পদার্থ; বঙ্গের অন্তঃপুরচারিণীগণ যে সকল বৎসের জন্মদান করেন, তাহারা কঙ্কালবিহীন; আর বঙ্গের বাগ্‌দেবতা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহা "ধূম-জ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ"; বঙ্গদেশে কাঠিন্যধর্ম্মবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য।

উমেশচন্দ্র বটব্যালে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। উচ্ছ্বাসের হাওয়া ও বাক্যের কুয়াসা কাটাইয়া উন্মুক্ত আলোকে কঠিন মৃত্তিকায় দুই দণ্ড দাঁড়াইবার অবসর দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তাঁহার উদ্যত অস্ত্রে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ও রশ্মিপ্রতিফলনক্ষমতা ছিল না; তাহাতে ধার ছিল ও তীক্ষ্ণতা ছিল; যে বাহুতে তিনি সেই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশী বর্ত্তমান ছিল। কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি জন্মাইতেন না। তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন, ও পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আস্বাদনে আমাদের রসনা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইত, নূতন নূতন তথ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বহির্মুখে আসিত ও তন্দ্রাত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিত। বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসা নহে; এবং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে।

উমেশচন্দ্র প্রধানতঃ স্বদেশের পুরাতন ইতিহাস-উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টা যেন একটু জাগিয়া উঠিয়াছে বোধ হইতেছে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে যে বিদ্যা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে, দেশে ইতিহাস জানিবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, এইরূপ একটা বিলাপধ্বনি সচরাচর শোনা যায়; কিন্তু আমাদের নব্যসম্প্রদায়ের কৃতবিদ্যেরাও ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছেন, তাহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। পরন্তু নব্যসম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আচরণ অনেক সময় স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনাজনক। পাশ্চাত্য হিসাবে স্বদেশানুরাগ যাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় প্রাচীনকালেও আমাদের ছিল না, এবং একালের পাশ্চাত্য শিক্ষাও তাহা জন্মাইতে পারে নাই। মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র হয়; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্ব্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্পশিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতিস্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্য হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চিনে না, সে যেন ভণ্ড ও কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন করিয়া ধিক্কৃত না হয়।

আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যে দুই চারি জন সহৃদয় পুরুষ আপনার জাতিকে চিনিতে ও আপনাকে চিনিতে চেষ্টার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহাদের অন্যতম। আমাদের শিক্ষিতসমাজে তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। সত্য কথা, উমেশচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ও ক্ষমতানুরূপ কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারেন নাই, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। এক একবার মনে হয়, তিনি যদি রাজকার্য্য জীবিকার উপায়স্বরূপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আরও অধিক কাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু সেও বুঝি মনের ভ্রম। কৃতবিদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদিগকে পরাধীনবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই; যাঁহাদের শক্তির বা অর্থসামর্থ্যের বা অবকাশেরও অভাব নাই, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয় জন উমেশচন্দ্রের মত দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের জন্য অনুরাগ দেখাইয়াছেন?

আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবেন, এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষায় বা আলোচনায় কোনও লাভ নাই, তাঁহারা অধম; আর যাঁহারা প্রাচীন কালের জন্য কেবল হা হুতাশ করেন ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তাঁহাদের পরিতাপও স্বদেশানুরাগের দৃঢ়তার অভাবই প্রকাশ করে মাত্র। এই অবস্থায় যিনি অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও দেশের অতীতস্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র উদ্যম দেখাইয়াছেন, তিনি ধন্য ও সার্থকজন্মা।

উমেশচন্দ্র এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। তিনি কালস্রোতে নীয়মান যে দুই একটি চিহ্নমাত্র অবলম্বন করিয়া অতিদূরস্থ লোকনয়নাতীত বিস্মৃতপ্রায় অতীত দেশের চিত্র অঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার নির্ণয়ে আমি সমর্থ নহি। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলী জনসমাজে তেমন সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যে সকলেই আস্থা স্থাপন করিবেন, এমন কোন কথা নাই। সামান্য প্রমাণ আশ্রয়ে, অধিকাংশ স্থলে কল্পনার সাহায্যে যে ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়, তাহার যাথার্থ্যে সন্দেহ চিরকালই থাকিবে। কিন্তু এইরূপ দার্শনিকোচিত সংশয়পরতাই কেবল তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমষ্টির প্রতি সাধারণের অনাস্থার কারণ নহে। এই অনাস্থার মূলে আমাদের স্বদেশের ইতিবৃত্তের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়াই সংশয় হয়।

অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধসমূহ আমার নিকট অয়স্কান্তের কাজ করিত। একটা অনিবার্য্য মোহের আবেগে আমি সেই রচনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইতাম। তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করিতেন, কিন্তু নিশ্চেষ্ট কাপুরুষের মত কেবল বৈদেশিক পন্থার অনুসরণ করিয়া যাইতেন না। স্বাধীনভাবে আপনার উদ্ভাবিত নূতন পথে চলিতে চাহিতেন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহাকে যে পথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। তাঁহার এক একটি প্রবন্ধ বৈদিককালের আর্য্যসমাজের এক একটি পট মানস-চক্ষুর নিকট উজ্জ্বল আলোকে ধরিয়া দিত। সেই পট যে সর্ব্বত্র প্রকৃত তথ্যের অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমিও বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু সেই পটের অভিনবত্ব, তাহার স্পষ্টতা, তাহার ঔজ্জ্বল্য, তাহার পরিস্ফুটতা দেখিয়া, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতাম। কল্পনার তুলিকা যে তাহার স্থানে অস্থানে বিবিধ বর্ণের বিন্যাস করিয়া তাহাকে মূর্ত্তি

প্রদান করিত, তাহা বুঝিতাম। অতিরঞ্জনই হয় ত তেমন ঔজ্জ্বল্যের কারণ ইহাও সম্ভব হইতে পারে। তথাপি সেই পট এক এক খানা যখন দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইত, তখন সুখস্বপ্নদৃষ্ট স্মৃতির মত মনের মধ্যে স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া যাইত। ভারতবর্ষের অতীত সমাজের সেই চিত্র ইউরোপীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্র হইতে কত বিভিন্ন! হয় ত তাহা কল্পনাকৃত অতিরঞ্জনে বিকৃত ও অসত্য। হয় ত আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ও আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তার উৎপাদক বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার অনধিকারী। কিন্তু তাহার মূল্যনির্দ্ধারণ অন্যরূপে করিতে হইবে। যে অস্পষ্ট স্মৃতি তাহা জাগাইয়া দিত, যে আকাঙ্ক্ষার, যে অতৃপ্তির, যে আশার, উদ্দীপনা করিত, তদ্দ্বারা তাহার মূল্যের পরিমাণ করিতে হইবে।

এবং এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির ও আশার উদ্বোধনই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের অলস জড় অনাসক্ত সুপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহকে প্রবোধিত করিতে এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির ও আশারই এখন প্রয়োজন। কর্ম্মসম্পাদনে আমাদের এখন শক্তি নাই, সত্যাবিষ্কারে আমাদের ক্ষমতা নাই। এখন কর্ম্মের প্রতি ও সত্যের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্যম জন্মিবে, এই উদ্যম কালে ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ভাব ও অতৃপ্তির ভাব উমেশচন্দ্রের রচনার প্রত্যেক ছত্রে প্রকাশ পাইত। তিনি একটা পিপাসার উত্তেজনায় পানীয় আহরণে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে পারিতাম। শুষ্ক সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রাণের চেষ্টায় যেন জলের অন্বেষণ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে মরীচিকাদর্শনেও যেন তৎপ্রতি ধাবিত হইতেন। অন্ধতমসে আচ্ছন্ন জীব নূতন জ্যোতির দেখা পাইয়া যেন তাহার অভিমুখে বাধাবিঘ্ন না মানিয়া ধাবিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইত। এই জন্য উমেশচন্দ্রের বৈদিক রচনা আমার নিকট এত ভাল লাগিত। বাঙ্গালায় আরও কতিপয় ব্যক্তি ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, অনেকেই কেবল বৈদেশিকের পদাঙ্কানুসরণ ও বৈদেশিকেরই অনুবৃত্তিতে ও অনুকারেই নিরস্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বৈদেশিক প্রণালীক্রমে নূতন সত্যাবিষ্কারেও সমর্থ হইয়াছেন। উমেশচন্দ্রের সম্পাদিত কর্ম্মের অপেক্ষা তাঁহাদের সম্পাদিত কর্ম্ম এক হিসাবে অধিক মূল্যবান্। কিন্তু উমেশচন্দ্রের যে স্বাধীন চিত্তপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছি, যে

আকাঙ্ক্ষার ও পিপাসার উত্তেজনা দেখিয়াছি, তাহা অন্যত্র দেখিয়াছি, বোধ হয় না। কোথাও দেখি নাই বলিলে হয় ত ভুল হয়। অক্ষয়চন্দ্র দত্তে এই আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বিধাতার নিগ্রহ তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। বিধাতার নিগ্রহে উমেশচন্দ্রেরও সেই পিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তির অবসর ঘটিল না। মাতর্বঙ্গভূমি! এই নিগ্রহ হইতে মুক্তিলাভ কি তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে না?

যে লোকান্তরিত মহাত্মার "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্র এককালে বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস রচনার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ উপাদান তখনও সংগৃহীত হয় নাই; এখনও সংগৃহীত হইতে অনেক বিলম্ব। তিনি বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগকে পথপ্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা তাঁহার আন্তরিক স্বদেশানুরাগ হইতে প্রসূত। উমেশচন্দ্রেরও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা ছিল। কোন বন্ধুকে তিনি পত্র দ্বারা ইহা জানাইয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি উপাদানেরও সংগ্রহ করিতেছিলেন। উপাদানসংগ্রহ অনেকেরই সাধ্য; এদেশে সেই সাধ্যসাধনেও সকলে পরাঙ্মুখ। উপাদান একত্র করিয়া তাহাকে যথাবিধানে সজ্জিত করিয়া তাহার যথাস্থানে বিন্যাস সকলের সাধ্য নহে। সংগৃহীত উপাদানের মূল্যনির্দ্ধারণ, তাহার অর্থ-আবিষ্কার, পুরাতন জিনিষকে নূতন চোখে দেখা সকলের সাধ্য নহে। উমেশচন্দ্রে এ শক্তি যথেষ্ট মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ শক্তির কার্য্যে বিনিয়োগ ঘটিল না। দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে থাকিয়াই লয় পায়। আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য কি চিরদিনই এইরূপ ফলোৎপাদনের প্রতিহর্ত্তা থাকিবে?

উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যত্রও তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে তাঁহার দার্শনিক মতের বিশদ উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্যমতানুবর্ত্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে এই দুই বিভিন্ন অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ইংরাজী দর্শনে যাহাকে noumenon বলে, ও যাহাকে substance বলে, প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যমতে সেইরূপ noumenon, বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে অবস্থিত substance কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে প্রকৃতি ও

পুরুষের সম্মিলনে বা সম্বন্ধস্থাপনে এই প্রতীয়মান বিশ্বজগতের অর্থাৎ phenomenon সমষ্টির উৎপত্তি। এই সম্বন্ধস্থাপনেই বিশ্বজগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই সৃষ্টিব্যাপারকে তিনি "দার্শনিক সৃষ্টি" আখ্যা দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যদর্শনকে এবল্যুশনিষ্ঠ বা অভিব্যক্তিবাদী বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই অভিব্যক্তির তাৎপর্য্য ঠিক্ বুঝিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। ইংরাজী দর্শনে যে এবল্যুশন শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে জড়-জগতের অভিব্যক্তি বুঝায়, তাহাতে ব্যাবহারিক প্রতীয়মান জগতের বা ফেনমেনাল জগতের ব্যাবহারিক অভিব্যক্তি বুঝায়। স্পেন্সারের মত যাঁহারা মানবমনের ও জীবজন্তুর মানসিক বৃত্তির অভিব্যক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও সেই ব্যাবহারিক অভিব্যক্তি। সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তি বা দার্শনিক পারমার্থিক অভিব্যক্তি সেই অভিব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রপ্রকৃতিক। এই কথাটা বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় যেমন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমন অন্য কোথাও হইয়াছে কি না, জানি না। অন্ততঃ, আমার জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কোথাও দেখি নাই। ভবিষ্যতের দর্শন-ব্যাখ্যাতৃগণ যদি এই পার্থক্যটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে, হিন্দুজাতির দর্শনশাস্ত্র অনেক নিগ্রহ ও নির্য্যাতন হইতে নিষ্কৃতি পায়।

উমেশচন্দ্রের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাপাঠে যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই। পুরুষের বাহিরে বহির্জগতের অন্তস্তলে প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব একটা অনুমান বা হাইপথীসীস্ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও জাগতিক রহস্য ও দার্শনিক সৃষ্টি বুঝা যাইতে পারে। সে বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। পুরুষ অর্থে স্থূলতঃ যদি মনুষ্যের আত্মা ধরা যায়, তাহা হইলে, আমার ন্যায় অন্যান্য মানবেরও আত্মা আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে উমেশচন্দ্র গণ্য করিতেন। এ কথাটাও ঠিক্ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমার আত্মা আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অপরের আত্মা আমার নিকট অনুমানগম্য ও কল্পিত পদার্থ। জড় জগৎ যেরূপ আমার অনুমানলব্ধ কল্পিত পদার্থ, জড় জগতে বিচরণশীল জড়শরীরধারী জীবগণের অজড় আত্মাও আমার নিকট সেইরূপ অনুমানলব্ধ কল্পিত পদার্থ, ইহার অধিক

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে আসে না। বৈদান্তিক সমগ্র বিশ্বকে একমাত্র 'অহম্'-পদার্থে পরিণত করিয়াছিলেন; এবং সেই 'অহম্'কেই 'ব্রহ্ম' উপাধি দিয়া বিশ্বের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতার স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে যেমন অনির্দ্দেশ্য কারণে প্রকৃতি ও পুরুষের, জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলনে জ্ঞানের উৎপত্তি, অর্থাৎ বিশ্বের দার্শনিক দৃষ্টি; বেদান্ত মতে সেইরূপ 'অহম্' বা 'ব্রহ্ম' নামধেয় পদার্থ হইতে কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে বা 'অবিদ্যা'-যোগে বিশ্বের উৎপত্তি। উভয়ত্রই একটা অনির্দ্দেশ্য কারণ বর্ত্তমান আছে। জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলন কিরূপে ঘটিল, অথবা 'অহম্'এর কিরূপে বিকার ঘটিয়া বিশ্বজগতে পরিণতি ঘটিল, তাহার প্রণালীনির্দ্দেশ করিতে গেলেই এই অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় হেতুর অবতারণা আসিয়া পড়ে। প্রচলিত ঈশ্বরবাদ সগুণ অথচ বচনাতীত, অনুভবগম্য অথচ অনির্দ্দেশ্য—'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—এইরূপ ঈশ্বরনামক পদার্থের কল্পনা করিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় হেতুর স্থান পূরণ করে। উমেশচন্দ্র অন্ততঃ শেষ বয়সে সাংখ্যমত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এই শেষোক্ত ঈশ্বর-বাদের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বৈদান্তিক 'সোঽহম্'-বাদই কিন্তু বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

পঠদ্দশায় ইংরাজী শিক্ষার হাওয়ায় উমেশচন্দ্র 'পৌত্তলিকতা'র প্রতি ও হিন্দুর প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতির প্রতি আস্থা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অনাস্থা কখনও তাঁহাকে শাস্ত্রবিরোধী আচারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, বোধ হয় না। তাঁহার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি এককালে তিনি ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসও ত্যাগ করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উপরেই বলিয়াছি, সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনের অনির্দ্দেশ্য কারণের স্থলে তিনি ঈশ্বর স্থাপন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর অর্থে তাঁহার নিজ ভাষায় "An intelligent being to whose intelligent action the present form and arrangement of the world of matter and the connection between human souls and that world, are owing." এই ঈশ্বর কিন্তু অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, তিনি অমঙ্গল হইতে মনুষ্যকে উদ্ধার করেন। এই অমঙ্গল আবার জগৎপ্রকৃতির অংশমাত্র। তাঁহার স্বভাষায় "Evil is a part of Nature, and the energy of God is directed to the purging of our nature from evil and to the raising of us to a higher state." এই মতের সহিত তাঁহার সাংখ্যমতের সামঞ্জস্য ঠিক্ বোঝা গেল না। অন্যান্য পণ্ডিতের

ন্যায় তিনি বেদের বহুদেববাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের আবিষ্কারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালের উপাস্য দেবতার তত্ত্বনির্ণয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত আছে। কোন্ মত সমীচীন, তাহা জানি না। অন্ততঃ, জৈমিনি-প্রমুখ যে মীমাংসক-সম্প্রদায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়া বেদের প্রভুত্ব হিন্দুজাতির সমাজতন্ত্রের মূলে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের ব্যবস্থা-পনে যাঁহাদের নির্দ্দেশ সমগ্র হিন্দুসমাজ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না, এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়।

দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুর কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে হিন্দুসমাজভুক্ত কোন ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত আপত্তি চলিতে পারে, বোধ হয় না। প্রথম বয়সে 'পৌত্তলি-কতা' সম্বন্ধে তাঁহার মত যাহাই থাক, জীবনের শেষভাগে তিনি যন্ত্রযোগে উপাসনার সমর্থন করিতেন, এবং যন্ত্রযোগে উপাসনা ও স্তুতিমাত্র বা ধ্যানমাত্র অবলম্বনে উপাসনার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিলাম। সমাজধর্ম্মপালনে তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক ব্রাহ্মণনিয়ন্ত্রিত সামাজিক ব্যবহারে অনুরাগী ছিলেন। কালভেদের সহকারে ব্যবস্থাভেদের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করিতেন না; এবং শতবৎসর পূর্ব্বে আচারবিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহার সকলগুলির উপ-যোগিতা না থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেও সম্ভবতঃ কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথই যে হিন্দুর অবলম্বনীয় প্রকৃত পথ, এই স্থূল সিদ্ধান্তের সহিত ঐরূপ পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার বস্তুতঃ কোন অসামঞ্জস্য নাই। বেদপন্থী হিন্দুসমাজের বিপ্লবের জন্য ভগবান্ শাক্যমুনির সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল নূতন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করিতে, বোধ করি, এই জন্যই উমেশচন্দ্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সম্প্রতি আমাদের শিক্ষিতসমাজে যে নব্যহিন্দু-নামধারী নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বত্র সরল পথে চলিতেছেন কি না, বিচার্য্য স্থলে দাঁড়াইয়াছে। ভূদেব বাবু এক স্থানে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ইংরাজী

শিক্ষার বিষ সহজে শরীর হইতে নামে না। আমাদের নব্যহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রচারিত উপদেশ শুনিয়া অনেক সময়ে ভয় হয়, তাঁহারাও এই বিষ সম্পূর্ণ হজম করিতে পারেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের নামে প্রচলিত অনেক মত অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টানি মত বলিয়া সংশয় জন্মে। আজকাল শিক্ষিতসমাজের মধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত ভাবপ্রবণ কর্ম্মবিরোধী ধর্ম্মের প্রতি যে আত্যন্তিক অনুরাগটা সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে পঠদ্দশায় বিনা বিচারে উপার্জ্জিত খ্রীষ্টানিভাব কতটা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বোধ হয় সময় আসিয়াছে; এবং এই উচ্ছ্বসিত ভাবপ্রবণতার কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অধঃপতিত পরপীড়িত রাজনৈতিক অবস্থায় আবশ্যক কি না, তাহাও বিচারযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরিতসমালোচনকালে তিনি যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার আমি অনুমোদন করিতে পারিব না। কিন্তু যে ভাবপ্রবণ অস্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণতা গীতোপনিষদুক্ত ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত জ্ঞানমূলক বৈরাগ্য হইতে এবং সেই বৈরাগ্য হইতে অভিন্ন নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবণতা হইতে হিন্দুসমাজকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন। স্বদেশগতপ্রাণ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি এই বিষয়ে স্বাধীনমত স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন কি না, জানি না। সার্ব্বভৌমিক প্রেম শব্দটা বড়ই চিত্তোন্মাদক, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এই সার্ব্বভৌমিক প্রীতিবিস্তারের যে ভয়ঙ্কর কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা রোমহর্ষের উৎপাদন করে। অন্ততঃ পরপদানত হিন্দুসমাজের পক্ষে এখন কিছু দিন কূর্ম্মবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আত্মসম্প্রসারণ অপেক্ষা আত্মসঙ্কোচের চেষ্টা করিলেই বোধ করি ভাল হয়। যাঁহারা ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় হইতে সামাজিক ব্যক্তিবৃন্দের চিত্তপ্রবৃত্তি অপসারিত করিয়া অভিনব পঞ্চমপুরুষার্থের প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন, এবং গৃহস্থাশ্রমের প্রতি ও কর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া হিন্দুসমাজকে ধীরে ধীরে মনুপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণরক্ষিত পরিচিত মার্গ হইতে বিচলিত করিতেছেন, তাঁহাদের দূরদর্শিতা কত দূর প্রশংসনীয়, তাহা চিন্তার বিষয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ভানুমতী।

১১

দেখিতে দেখিতে শীত কাটিয়া গেল। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এবং অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া অনাথনাথ হতাবশিষ্ট প্রজাদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছেন; পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ আনাইয়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন; প্লাবনবিধ্বস্ত বাঁধ—এ অঞ্চলে তাহাকে "কাঠি" বলে—বাঁধিয়াছেন; ভবিষ্যৎ প্লাবনে পানীয় জল রক্ষা করিবার জন্যে স্থানে স্থানে প্লাবনতরঙ্গ হইতে উচ্চতর-পাড়বিশিষ্ট দীর্ঘিকা খনন করিয়াছেন; এবং তাহাদের আশ্রয়ের জন্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল কাছারী-বাড়ীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনাথনাথ প্রজাদের মা বাপ। চিরদিন তাঁহার এরূপ সুনাম। তাহাতে ঝটিকার পর প্রজাদের যে এরূপ সাহায্য করিয়াছেন, জনরব তাহা বিদ্যুদ্বেগে সংখ্যাতীত কণ্ঠে প্রচারিত করিয়াছে। এ সুখ্যাতিতে স্থানান্তর হইতে এত প্রজা সমাগত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে জমি দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারি আবার প্রজাপূর্ণ হইয়াছে, এবং সকলে জমিদারের কৃতিত্বে ও দেবত্বে উৎসাহিত হইয়া আবার কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর জমিদারীতে তাঁহার বিশেষ কোনও কার্য্য নাই। ভানুমতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ভানুমতী যাইতে অস্বীকার করিল। সে বলিল, তাহার অমিয় এখানে, তাহার গোপাল এখানে, তাহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা মাতা—অনাথনাথের পত্নী—এখানে, সে এখানে থাকিবে। সে বেদের মেয়ে, এ সকল গরীব দুঃখীর পুত্রকন্যাকে বুকে লইয়া, তাহাদের মাতাকে মাতা বলিয়া, সে সেই শোক হৃদয়ে বহন করিবে। দরদর ধারায় তাহার অশ্রু বহিতে লাগিল। অনাথনাথেরও পুত্রপত্নীর শোক আবার এত দিন পরে উথলিয়া উঠিল। তিনি সংযত স্থির প্রকৃতির লোক। প্রজার দুঃখনিবারণব্রতে সেই শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পত্নীপুত্রকে এখানে রাখিয়া গৃহে ফিরিবেন, এই স্মৃতিতে বহুদিন পরে তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। তিনি আত্মসংযমবলে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"মা! তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুই আমার এ জীবনের একমাত্র শান্তি! তোকে ফেলিয়া আমি সেই শ্মশানে শূন্য

হৃদয়ে কি আকর্ষণে ফিরিব? আমিও তবে আর বাড়ী ফিরিব না।" ভানুমতী কিছুক্ষণ নীরবে শান্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। শেষে তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

অদ্য প্রাতে অনাথনাথ গৃহে যাত্রা করিবেন। ঘাটে সজ্জিত বজরা নানা বর্ণের পতাকা উড়াইয়া সমুদ্রের শান্ত লহরীতে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। সমুদ্রসৈকতে লোকারণ্য। প্রজাগণ—নরনারী, বালক বালিকা, তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। কেহ কেহ চরণতলে গড়াগড়ি দিতেছে। বৃদ্ধা রমণীরা সাশ্রুনয়নে পুত্রবৎ তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সকলেরই কণ্ঠে ভানুমতীর প্রতি 'মা' বা 'দিদি' সম্বোধন। তাহাকে রমণীরা বুকে লইয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছে। সকলে বলিতেছে—"তুই মা! কোনও দেবকন্যা। শাপক্রমে বেদের মেয়ে হইয়াছিস্!" অনাথনাথ ও ভানুমতী গলদশ্রুনয়নে তাহাদের নানা রূপে সান্ত্বনা দিয়া বজরায় উঠিলেন। প্রজাগণ সমুদ্রকল্লোল প্লাবিত করিয়া তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। চৈত্রমাস; পূর্ণ বসন্ত। বজরার শ্বেত পাল দক্ষিণানিলে প্রসারিত হইল; তরণী পক্ষপ্রসারিতা রাজহংসীর ন্যায় সমুদ্রের নীল গর্ভ বিদারিত করিয়া ছুটিল।

পুণ্যতোয়া শৈলজায়া কর্ণফুলী নদীর তীরে পাহাড়তলী গ্রামের পার্শ্বস্থিত একটি শৈলশেখরে অনাথনাথের অট্টালিকা-খচিত ভদ্রাসন। নদীতীর হইতে গিরিশ্রেণীর স্তরে স্তরে বৃক্ষরাজিসজ্জিত শ্যামবপু উত্থিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বোচ্চ শেখরে বৃক্ষপল্লবান্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত, অর্দ্ধপ্রকাশিত, মনোহর অট্টালিকা। বিস্তীর্ণা কর্ণফুলীর

—"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঞ্জন ও।"

এক দিকে নদী। অন্য দিকে গিরিপাদমূলে নাগেশ্বর-উপবনে সমাচ্ছন্ন একটি সমুন্নত প্রান্তরে বৌদ্ধদিগের মহামুনির মহাক্ষেত্র। নাগেশ্বরের উপবন হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের মন্দিরের চূড়া গগনে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিতেছে। অনাথনাথের অট্টালিকা হইতে এই শোভা অতুলনীয়। চৈত্র-সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্ব হইতে এখানে প্রস্ফুটিত নাগেশ্বরবনে পর্ব্বত্য ও সমতলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি মেলা বসিয়া থাকে। আনাথনাথ বাটী ফিরিবার কিছু দিন পরে এই মেলার আরম্ভ হইয়াছে। এই মহামেলার কথা আমি

চট্টগ্রামবাসী কিছু না বলিয়া "বঙ্গবাসীর" একজন বিদেশীয় প্রবন্ধলেখকের ভাষায় বলিব;—

"মহামুনি চট্টলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ মেলা। প্রতি বৎসর বিষুবসংক্রান্তিতে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে এই মেলা মিলিয়া থাকে। এদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিবেষ্টিত; ঐ পাহাড়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগদের বসতি, এবং সমতল উপত্যকায় নানা স্থানে বৌদ্ধভদ্রলোকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে। ঐ সকল বৌদ্ধদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ধর্ম্মপিপাসায় মেলা-স্থান এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক যিনি সংসারে স্বর্গ দেখিতে চাহেন, যিনি ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া শীতল হইতে চাহেন, যিনি দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া কাতর প্রাণে সুখের অন্বেষণ করেন, তিনি একবার এই মহামুনির মহাভাব প্রত্যক্ষ করুন। সকল জ্বালা, সকল অশান্তি, মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক কুহকে কোথায় লুকাইয়া পড়িবে! * *

"মরি! মরি! কি প্রাণারাম স্থান! কি মনোহর দর্শন! এমন ত জীবনেও দেখি নাই! এ দৃশ্য যে কল্পনারও অতীত। অতি ক্ষুদ্র শৈল,—উপরিভাগ সমতল। সেই সমতল স্থান নবীন পল্লবে নবীন মুকুলে সুশোভিত নানা জাতি তরুলতায় আচ্ছন্ন। মধুর মলয় সততই মৃদুপ্রবাহে প্রবাহিত। নাগেশ্বর পুষ্প শোভা ও সুবাস দানে সততই তৎপর। বসন্ত পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজিত। অতি সম্পূর্ণ, অতি সম্পন্ন! বিলাসিনী বাসন্তীর এই পূর্ণবিকশিত পরিণত মূর্ত্তি; এ মূর্ত্তি ধারণায় আইসে না। সে দৃশ্যে প্রাণ মন ডুবিয়া যায়, উত্তেজনা ফুরায়, দেহগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে! আজ সেই বসন্তের নির্জ্জন ক্রীড়া-কানন অগণিত মানব ও শত শত দোকান পসারিতে পরিপূর্ণ। সকল দোকানেই মহা ভিড়; এমন কি, পথ চলিতে কষ্ট বোধ হয়। এই জনস্রোতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যেখানে মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দির, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। চতুষ্পার্শ্বেই সমান আয়তনের বারেণ্ডা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের বিরাট মূর্ত্তি। ইঁহারই অর্চ্চনা-উপলক্ষে এই মহামেলায় অসংখ্য মগের সমাগম হইয়া থাকে। মূর্ত্তিটি লম্বে ১০।১২ হাত, এবং তদনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা। বিরাটরূপে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট। কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি গভীর ভাব! দেখিলাম, ৭।৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মহামুনির পদতলে বসিয়া একাগ্রপ্রাণে আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহাদের মস্তক মুড়ান—দাড়ি গোঁপ কামান,—পরিধানে গেরুয়া বসন।"

অনাথনাথ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্য ধর্ম্মের প্রতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। তিনি এই মেলার সাহায্যার্থ, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদের সেবার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি ভানুমতীকে লইয়া অপরাহ্ণে মেলাস্থলে আসিলেন। উভয়ে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে মহামুনি বুদ্ধদেবের মহামূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মেলা দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রশস্ত উপবন ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছে। যত দূর দেখা যাইতেছে, নানা পর্ব্বত্যজাতীয় নরনারীতে মেলা-স্থান পরিপূরিত; তাহাদের গীতে, কণ্ঠে, হাস্যে ও বংশীধ্বনিতে মুখরিত। মস্তকের উপর বসন্তের কোকিল, 'বউ কথা কও' নাগেশ্বরের ডালে বসিয়া, গগনে উড়িয়া, অমৃতকণ্ঠে সেই বংশীনিনাদের সঙ্গে যোগ দিতেছে। পর্ব্বত্য জাতিদের স্বর্ণগৌর কান্তি। পুরুষের মস্তকে সম্মুখে কৃষ্ণের চূড়ার মত ঘোর ঘন কৃষ্ণ কেশের চূড়া। সেই বিদেশীয় প্রবন্ধ লেখকের ভাষায়,—

"সকলেরই এক বেশ। মগ পুরুষের মাথায় রেশমী রুমাল, গায়ে কুর্ত্তা, পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি, হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার আঙটি। তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও গয়না পরিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। মগ মহিলাদের খোপা প্রকৃত ফুলের ন্যায় কৃত্রিম ফুলের তোড়ায় সুশোভিত; বক্ষঃস্থল একটি রেশমী রুমালে বাঁধা, পরিধানে রেশমী শাড়ী, গলায় টাকার মালা; হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার গয়না। ইহাদের কাণের ছিদ্র এত বড় যে, এক বুরুল পুরু রৌপ্যখণ্ড ইহারা কাণে অনায়াসে ঢুকাইয়া দেয়। মগ মহিলারা প্রকৃতির প্রসাদে স্বভাবতই লাবণ্যময়ী। সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহাদের দেহমন সততই প্রফুল্ল। মগ পুরুষেরা সকলেই বলশালী ও কর্ম্মঠ; কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই নাসিকাটি চাপা। মগেরা বড় আমোদপ্রিয়। নৃত্যগীত তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। শত সহস্র লোকের সম্মুখে যুবকেরা অসঙ্কোচে যুবতীদের নৃত্যে বংশীবাদন করে ও উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগের বাহুলতার আশ্রয়ে নৃত্য করিতে থাকে। অথচ মুখে নির্ম্মল হাসি, প্রাণে অপার আনন্দ।"

তাহারা দলে দলে অন্ন ও পুষ্প লইয়া বুদ্ধদেবকে পূজিতে যাইতেছে। অনাথনাথকে দেখিয়া দলে দলে ভূতলে জানু রাখিয়া ললাটে ভূমিতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রণাম করিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। আলুলায়িতকুন্তলা, গৈরিকবসনপরিহিতা, প্রায়নিরাভরণা, স্বর্ণপ্রতিমাস্বরূপা ভানুমতীকে তাঁহার পশ্চাতে দেখিয়া সকলে বিস্মিতনয়নে তাহার দিকে

চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ তাহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী মনে করিয়া প্রণাম করিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, নানাবিধ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানে একটি আনন্দউচ্ছ্বাস উঠিতেছে। তিনি পূর্ণচন্দ্রের মত যেন আনন্দজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। ক্রমে উৎসবক্ষেত্রের এক নির্জ্জন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি নাগেশ্বরবৃক্ষতলা কোমল মকমলসন্নিভ শ্যাম দূর্ব্বাসনে বসিলেন। ভানুমতী তাঁহার চরণতলে বসিল।

ভা। বাবা! আপনি ত মহামুনিকে প্রণাম করিলেন; হিন্দুর কি মগের দেবতাকে প্রণাম করা উচিত?

অ। উচিত। মা! ওই নাগেশ্বর পুষ্পকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মগ, সকলেই আদর করিতেছে না? যিনি দেবতা, তিনি নরজাতির নাগেশ্বর। দেবতা মগের হউন, মুসলমানের হউন, খৃষ্টানের হউন, তাঁহাকে প্রণাম করা, পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ হিন্দুর কাছে তিনি পূজ্য। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, 'যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তিনি দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদের পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্যে, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।' ঠিক এই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে, খৃষ্টদেব 'নেজারতে', এবং মহম্মদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্য মানিতে গেলে, হিন্দুর সকলকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়। তিনি যে কেবল এ ক্ষুদ্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন কথা বলেন নাই। এই জন্যে হিন্দুরা সকল ধর্ম্মে বিদ্বেষহীন।

ভা। বাবা! এই মহামুনি বুদ্ধদেব কে?

তখন অনাথনাথ বুদ্ধদেবের সেই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকা তাহাকে সংক্ষেপে শুনাইলেন। সিদ্ধার্থের জন্ম, কৈশোর, জীবের জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখ-নির্ব্বাণের উপায়-উদ্ভাবনের জন্যে রাজপুত্রের সন্ন্যাস, ঘোরতর তপস্যা, অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-প্রচার, তিরোধান, ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে শুনাইলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে বুদ্ধলীলা শ্রবণ করিল। অনাথনাথ বসন্তের সান্ধ্য নীলাকাশের দিকে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে সেই তিরোধান কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে যেন সেই মহাদৃশ্য বহুক্ষণ নীরবে বসন্তের সান্ধ্য আকাশপটে অঙ্কিত দেখিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"বাবা!

আমার পূজনীয় বৈরাগী পিতা আমাকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের ব্রজলীলা, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চরিতামৃত পড়াইয়াছিলেন। আমি ইহার বেশী কিছুই জানি না।"

অ। ইহার বেশী রমণীদিগের শিখিবার আর কিছু নাই। কিন্তু হায়! এখনকার শিক্ষাপ্রণালী কেবল আমাদের বালকদের মুণ্ডপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, বালিকাদেরও বলিদান দিতেছে। এখন বালকদের মত বালিকারাও পড়ে ছাইভস্ম; শিখে,-না ধর্ম্ম, না কর্ম্ম। যে দেশে ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ছিল, এখন সেই দেশে ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও কুন্দনন্দিনী। রমণীরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সূক্ষ্ম উচ্চ শিক্ষা বুঝিতে পারে না, শিখিতে পারে না। শিখে ঘোরতর আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা ও পতিপ্রতিযোগিতা। যাক্ সে কথা।

ভা। আমি দেখিতেছি, চৈতন্যদেবের ও বুদ্ধদেবের লীলা প্রায় একরূপ।

অ। খৃষ্টদেবের লীলাও তাই। তাঁহার জীবনের প্রথম ৩০ বৎসর কি করিয়াছিলেন, কেহই জানে না। তার পর ২৷৷০ আড়াই বৎসর তিনি একজন হিন্দুবৈরাগী। তুমি আমার গৃহে তাঁহার চিত্রে দেখিয়াছ, তিনিও একজন কৌপীন-উত্তরীয়পরিহিত বৈরাগী মাত্র। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহম্মদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যেরূপ স্থানে, যেরূপ সময়ে, যেরূপ সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, দুষ্কৃতের দমন, সাধুদের পরিত্রাণ, ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইত না। উভয়ের কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। দুষ্কৃতের দমনের জন্যে স্বয়ং অসি ধরিতে হইয়াছিল। খৃষ্ট ধরেন নাই বলিয়া দুষ্কৃতেরা তাঁহাকে "ক্রশে" নৃশংসরূপে হত্যা করিল। সেই হত্যাতেই তিনি অবতারত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হন, তখন ভারত জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নত। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির অসি ভিন্ন অন্য অসির প্রয়োজন ছিল না।

ভা। ইহারা কি পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন?

অ। না। শ্রীভগবান এক,—তাঁহার সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য লাভ করিবার সাধনার পথ স্বতন্ত্র। এই মহামুনির মেলা ত এক, কিন্তু ওই দেখ, কত পথে ইহাতে লোক আসিতেছে। যে পথ যাহার পক্ষে সহজ, সে সেই

পথে আসিতেছে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, শিক্ষা বিভিন্ন। অতএব প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে ধর্ম্মের পথও স্বতন্ত্র হইবে। তুমি মা! তোমার বৈরাগী পিতার কাছে ষড়্‌রসের কথা কি শুনিয়াছ?

ভা। শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, কান্ত, মধুর।

অ। তান্ত্রিক হিন্দু ও খৃষ্টান শান্তরসাশ্রিত। তাহারা ঈশ্বরকে পিতামাতার মত প্রেম করে। হিন্দুর দেব দেবীরা পিতা মাতা। খৃষ্টের ঈশ্বরও পিতা। এই রসের সঙ্গে দাস্যরসও সংমিশ্রিত। কারণ, পিতা মাতার দাস কোন্ পুত্র নহে? মুসলমান ধর্ম্মে সখ্যরস। মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। কিন্তু সখ্য এবং অপর তিনটি রস বৈষ্ণবধর্ম্মের নিজস্ব। নন্দযশোদা শ্রীরাধাকে যেরূপ প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রেম করা, বাৎসল্যরস। শ্রীদাম সুদাম যেরূপ করিত, সেরূপ করা, সখ্যরস। ব্রজগোপীরা যেরূপভাবে তাঁহাকে পতিভাবে দেখিত, জগৎপতিকে সেইভাবে প্রেম করা—পতিপত্নীর মত প্রেম করা—কান্ত রস। আর শ্রীমতী যেরূপ পতির অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তর ভাবে প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেরূপ প্রেম করা মধুর রস। ইহা পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর। ইহাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে আত্মহারা হয় ও তাঁহাকে অভিন্ন দেখে। তাই রাসের শেষে গোপীরা মনে করিয়াছিল, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাঁহার লীলার অভিনয় করিয়াছিল। এই অবস্থা হিন্দুযোগীর 'সোঽহং' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ'। এইরূপ, যাহার যেরূপ প্রকৃতি, মানুষ তদনুসারে রস বা ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এক এক ধর্ম্ম একটি সাধনার পথমাত্র—গন্তব্য স্থান শ্রীভগবান। মূল পথ তিন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। তিন পথেরই প্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণ। যোগীর জ্ঞানপথ, বুদ্ধের কর্ম্মপথ, অপর ধর্ম্ম ভক্তিপথের বিভিন্ন শাখা।

তখন মহামুনির মন্দিরে সান্ধ্য আরতি বাজিয়া উঠিল। বাসন্তী জ্যোৎস্নায় নাগেশ্বরের উপবন ও সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত ও প্রান্তর হাসিতে লাগিল। মেলাস্থল আনন্দকোলাহলে পূরিত হইল। বিদেশীয় দর্শক সেই দৃশ্য এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন;—

"দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চারিদিকের শ্যামল গিরিরাজি দূর সুনীল প্রাচীরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। মাথার উপর গাছে গাছে পাখীগুলি একবার কিচিমিচি করিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নীরব হইল। কিন্তু নিম্নে সেই আনন্দকোলাহলের একবিন্দুও হ্রাস হইল না। বরং সন্ধ্যা সমাগত

দেখিয়া বৌদ্ধ মগদের আনন্দলহরী আরও উছলিয়া উঠিল। শত শত দোকান পসারিতে অগণিত দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র শৈলশেখর যেন ৺শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাবনের মত শোভা পাইতে লাগিল। মগ মহিলাগণ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে চারি দিকে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। একি! একি! আমি স্বর্গে! এরা কি দেববালা! না গন্ধর্ব্বকুমারী অথবা অপ্সরী! এদের চতুষ্পার্শ্বে যেন কি এক মোহের মদিরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। লাবণ্য ঢলিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে ভাবিতাম, পাহাড়ীদের আবার রূপ কি? বেশ-ভূষাই বা কোথায়? আজ আমার সেই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,—যদি রূপ থাকে, তবে এদের মধ্যেই আছে, যদি বেশভূষার বাহার থাকে, তবে এই মগ মহিলাদের বেশভূষাতেই আছে!"

"যুবতীগণ যুবকের দলে, কিশোরীগণ কিশোরের দলে, এবং বালিকাগুলি বালকের দলে এক হইয়া সেই মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রশস্ত বারাণ্ডায় নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল, আর একবার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কেমন এক রকম অস্বাভাবিক চীৎকারে মন্দির-প্রাঙ্গন বারংবার কাঁপাইতে লাগিল।

"যখন এবংবিধ নৃত্যগীতে, মন্দিরে, প্রাঙ্গনে, রাস্তা ঘাটে আনন্দের ঢেউ ছুটিতে লাগিল, কার সাধ্য সে তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারে? তুমি আতুর হও, উঠিয়া নাচিবে,—বোবা হও, আনন্দে আনন্দধ্বনি করিবে,—বধির হও, যেন সব শুনিতে থাকিবে,—অন্ধ হও, প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকিবে। এ মেলার এমনই মহান্ ভাব!

"রাত্রি কিছু অধিক হইল, মগ স্ত্রীপুরুষ দলে দলে যে যেখানে পাইল, গাছের তলে বিনা শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা মাটিতে শুইলে কেন? হাসিমুখে উত্তর হইল,—'প্রভুর বাড়ী,—এ যে আমাদের ফুলশয্যা; এমন শয্যা আর কোথায় পাব?'

মৌর্য্যসম্রাট অশোক।

তৃতীয় প্রস্তাব।

অশোকরাজত্বের তৃতীয়াংশ তাঁহার অভিষেকের পঞ্চদশ বৎসর হইতে ষড়বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত। ইহাই বৌদ্ধ ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয়াংশে যে বীজ কেবলমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এই যুগে তাহা হইতে ঘনচ্ছায় বিশাল বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। তাহার ছায়ায় সমগ্র ভারতবর্ষ ও প্রান্তরাজ্যসমূহ শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ধর্ম্মেতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বস্তুতঃ বড়ই বিরল। কেবল সম্রাট কন্‌ষ্টান্‌টাইন কর্ত্তৃক ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্মকে রাজধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা ব্যাপারই ইহার সহিত তুলনীয়। কিন্তু কন্‌ষ্টান্‌টাইনের সময়ে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি এরূপ সমদর্শিতাও ছিল না, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের এরূপ সুব্যবস্থাও ছিল না।

অশোকরাজত্বের এই তৃতীয়াংশের বিবরণ নিম্নলিখিত লিপিমালা হইতে প্রাপ্তব্য।—

(ক) গুহালিপি—

খলতিকস্থ (আধুনিক বারাবরস্থ) সুপিয়া (আধুনিক করণচৌপাড়) গুহা, গয়ার ১৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। (১)

(খ) গিরিলিপি—

(১) সাসেরাম, সাহাবাদ জিলায়;

(২) রূপনাথ, মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের ৩৫ মাইল উত্তরে;

(৩) বৈরাট, জয়পুর হইতে ৩১ মাইল উত্তরে;

(৪) ভাব্রা, ঐ;

(৫—৭) সিদ্ধাপুর, মহীশূরস্থ চিতলদুর্গের ইলাকায়।

(গ) স্তম্ভলিপি—

(১) বারাবরে অশোকের সময়ের আর দুইখানি গুহালিপি আছে। সে দুইখানি নিগোহ (আধুধিক সুদাম) ও (আধুনিক) বিশ্বঝোপ গুহায় খোদিত। উভয় লিপিই অশোকের অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) উৎকীর্ণ। এই লিপিদ্বয়ে অজীবিক-নামক যতিগণকে দানের উল্লেখ আছে।—Indian Antiquary. vol. xx. (1891) pp. 361-5, 16 p—70.

(১) নিগ্লীব, নেপাল তরাই, গোরক্ষপুর জিলার উত্তরে; উহ্ন রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে;

(২) পড়েরিঅ, নেপাল তরাই, নিগ্লীব হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে;

(৩) এলাহাবাদস্থ কৌশাম্বী;

(৪) কাকনাভ, (আধুনিক সাঞ্চী), ভূপালরাজ্যে।

উল্লিখিত লিপিমালা আয়তনে ক্ষুদ্র ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খোদিত। সিদ্ধাপুরস্থ তিনটি লিপি মহীশূর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিষ্টার লুইস্ রাইস্ কর্ত্তৃক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত। নিগ্লীবস্থ স্তম্ভলিপি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নেপালের কোন রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়; ডাক্তার ফুরার স্থানাদি নির্ণয় করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী পড়েরিঅর লিপি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। কৌশাম্বীলিপির সহিত সাঞ্চীলিপির বহুলপরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই দুই লিপিই অসম্পূর্ণ ও তারিখ-বিরহিত।

বারাবরস্থ সুপিয়া গুহালিপি হইতে প্রকাশ যে, অশোক অভিষেকের একোনবিংশতি বৎসর পরে (অর্থাৎ বিংশতিতম বৎসরে) সেই গুহা দান করেন; সে গুহা তিনি কাহাকে দান করেন, তাহা পাঠ করা যায় নাই; তবে তৎপর্ব্বতস্থ তাঁহার দুইটি ও তাঁহার পৌত্র দশরথের দুইটি লিপি হইতে দেখা যায় যে, গুহাগুলি অজীবিক যতিগণের সম্পত্তি। এই অজীবিকগণ কে, তৎসম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে। তবে তাহারা যে বৌদ্ধ নহে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় যে, তাহারা এক নগ্ন-সাধুসম্প্রদায়-ভুক্ত; সে সম্প্রদায় শাক্যমুনি ও তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। বরাহমিহির বৃহজ্জাতকে ইহাদিগের নামের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং তাহার টীকায় উৎপল তাহাদিগকে "নারায়ণাশ্রিতানাম্" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২) অতএব গুহালিপি হইতে দেখা যায় যে, রাজত্বের বিংশতিতম বৎসরেও অশোক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি বিমুখ ছিলেন না।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে উৎপীড়িত না করিলেও, ক্রমে তাহাদের প্রতি অশোকের সহানুভূতির হ্রাস হয়, এবং ক্রমশঃ তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়েন। সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট ও সিদ্ধাপুর, এই কয় স্থানের লিপিমালা হইতে

(২) Kern, l. c. Prof. Buhler. Ind. Ant. xx. p. 362.

তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সিদ্ধাপুরস্থ প্রথম লিপিতে অশোক লিখাইয়াছেন,—

"দেবগণের প্রিয় (প্রিয়দর্শিন্) ইহা বলিয়াছেন—সার্দ্ধদ্বিবৎসরের অধিক কাল আমি উপাসক হইলাম, কিন্তু (তৎকালমধ্যে) কোন চেষ্টা করি নাই। ছয় বৎসর কেন, ততোধিককাল আমি সংঘতে উপগত হইয়াছি; তৎকালমধ্যে (ধর্ম্ম)-বৃদ্ধিসাধনকল্পে চেষ্টা করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে যে সকল মনুষ্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি) জম্বুদ্বীপে সত্য বলিয়া অনুমিত হইতে ছিল, তাহারা দেবগণ সহ অসত্য স্বরূপ, প্রকাশ হইল।" (৩)

সাসেরাম প্রভৃতির লিপিমর্ম্মও এইরূপ। (৪) অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে কাজেই আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এক্ষণে এই প্রয়োজনীয় লিপির সময়নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে প্রকাশ যে, অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে (অর্থাৎ নবম বৎসরে) অশোক কলিঙ্গ বিজয় করেন। তথায় নানা প্রাণীর বিনাশ ও জীবক্লেশ দেখিয়া তাঁহার মনে অনুশোচনার উদয় হয়। সম্ভবতঃ সেই অনুশোচনায় অশোকের মন প্রথম ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব দশম বৎসরে তাঁহার "উপাসক" হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আবার দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ লিপিদ্বয়ে প্রকাশ যে, ধর্ম্মলিপিমালা ও অন্যান্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রধানতঃ তাঁহার অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) আজ্ঞাপিত হয়। এই বিষয় ষষ্ঠ স্তম্ভলিপিতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। দশমবর্ষ হইতে "সার্দ্ধদ্বিবৎসরের অধিক" কাল হিসাব করিলে আমরা ত্রয়োদশ বৎসরে উপনীত হই। সেই সময় হইতে যে অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বহুলপ্রচারাদিকল্পে বহুবিধ চেষ্টা করেন, তাহাও দেখা যাইতেছে, এবং পরেও দেখা যাইবে। অতএব অন্যান্য লিপিমালা উপরি-উক্ত সিদ্ধাপুরাদির লিপিগুলির সমর্থন করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অশোকের কার্য্যাবলী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, তিনি নানা বৌদ্ধ তীর্থে গমন করেন ও সেই সকল তীর্থে নূতন স্তূপাবলীর নির্ম্মাণের ও পুরাতন স্তূপগুলির সংস্কারের

(৩) Epigraphia Indica vol. iii, pp 138—9.

(৪) Ind. Ant. xx. p. 165; xx ii pp. 299 ff.

বন্দোবস্ত করেন। ইহার আভাষ নিগ্লীব ও পড়েরিঅ স্তম্ভলিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫) নিগ্লীবে লিখিত আছে যে, অভিষেকের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে গত বুদ্ধ কোণাকমনের পূর্ব্বস্থিত স্তূপ তিনি বর্দ্ধিত করেন। পড়েরিঅতে উল্লেখ দেখা যায়, অভিষেকের বিংশতি বৎসর পরে বুদ্ধশাক্যমুনির জন্মস্থান লম্বিনিগ্রামে প্রিয়দর্শিন্ আসিয়া পূজা করেন ও সেই গ্রামখানি নিষ্কর করিয়া দেন। প্রবাদ এই যে, তিনি স্বরাজ্যের মধ্যে চতুরশীতি সহস্র স্তূপাবলী স্থাপিত করিয়াছিলেন। (৬)

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে বৌদ্ধস্তম্ভ মণ্ডপ ও গৃহের নির্ম্মাণ করেন। পড়েরিঅতে শিলাস্তম্ভের কথা লিখাইয়াছেন। অশোক লাট স্তম্ভ এখনও অনেক স্থানে দেখা যায়; যেমন গয়া জিলায়,—নিজ গয়া সহরে ও ইসলামপুর থানার দক্ষিণে, দুইটি এখনও বর্ত্তমান। বৌদ্ধ অবদানের মতে, বোধগয়ায় মহাবোধিদ্রুম ও বজ্রাসনের জন্য রেলিংযুক্ত, থামওয়ালা, খোলা মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দেন ও তদ্রক্ষার্থ তাহার চারি পার্শ্ব প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। রেলিং প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। (৭) আচার্য্য ও ভিক্ষুগণের জন্য স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রকক্ষসমন্বিত গৃহসমূহের নির্ম্মাণ করেন। (৮)

দ্বিতীয়তঃ, অশোক বৌদ্ধশাস্ত্র সংগঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বিখ্যাত ভাব্রা গিরিলিপি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা প্রাচীন বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বা আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং সেই গিরিলিপি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"রাজা প্রিয়দর্শিন্ মাগধসংঘকে অভিবাদন করিয়া (তাঁহাদের) আয়ু ও সুখের বৃদ্ধি কামনা করেন। পূজনীয়গণ, আপনারা জানেন, আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের কত মান্য ও শুভকামনা করি। পূজনীয়গণ, ভগবান বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক যাহা ভাষিত, সে সব সুভাষিত; এবং যত দূর আমি আদেশ করিতে পারি, তাহার ঘোষণা করা আমি উত্তম মনে করি, যে তাহা হইলে সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী

(৫) নিগ্লীব—Ep. Ind. v. pp. 5-6.
পড়েরিঅ—Ep. Ind. vol. I. p. 4.
(৬) Beal's Si-Yu-Ki vol. II. pp. 88-90; Fahien Ch. xx-iii and xxvii.
(৭) Dr R. L. Mittra's Bodh-Gaya pp. 71, 72, 146; General Cunningham's Mahabodhi pp. 4-16; Si-Yu-Ki vol. II. 117-8.
(৮) Si-Yu-Ki II. p. 93; cf. Fa-hien ch. xxvii.

হইবে। পূজনীয়গণ, ধর্ম্মপরিযাত্রাগুলি এই;—বিনয়সমুৎকর্ষ, আর্য্যবসানি, অনাগতভয়ানি, মুনিগাথা, মোনেয়সূত্র, উপতিষ্যপ্রশ্ন, এবং লাঘুলোবাদ, যাহা মৃষাবাদ হইতে আরব্ধ হইয়া ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক ভাষিত। পূজনীয়গণ, আমি ইচ্ছা করি, বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ অবিরত এই ধর্ম্মপরিযাত্রাগুলির শ্রবণ ও উপাধ্যান করেন; উপাসক এবং উপাসিকারাও এইরূপ করে। এতদুদ্দেশে, পূজনীয়গণ, ইহা লিখাইলাম যে, লোকে আমার ইচ্ছা জানুক।" (৯)

এই ধর্ম্মপরিযাত্রাগুলি কি, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। বোধ হয়, বিনয়সমুৎকর্ষ,—বিনয়পিটকের সারাংশ "পতিমোকখ"; অনাগত ভয়,—সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তরনিকায়শাখার "আরণ্যকানাগতভয়" সূত্র; উপতিষ্য-প্রশ্ন,—বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গস্থ "শারিপুত্র" আখ্যান; মুনিগাথা,—সূত্রপিটকের সুত্তনিপাতশাখার "মুনিগাথা" নামক দ্বাদশ সূত্র; এবং লাঘুলোবাদ—সূত্রপিটকের মজ্‌ঝিমনিকায়শাখার ৬১ সূত্র, "অম্বলট্ঠিক-রাহুলোবাদ"। আর্য্যবাস এবং মান্যেয়সূত্র এখনও চিহ্নিত হয় নাই।

উল্লিখিত তালিকায় তদনীন্তন সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রেরই উল্লেখ আছে, এমন বোধ হয় না। আমি অনুমান করি, ভগবান বুদ্ধদেবের ভাষিত যে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্রবণ ও অনুচিন্তা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য, অশোক সেই সকল গ্রন্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহ ব্যতীত ভগবান বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ভাষিত, বা তাঁহার শিষ্যপরম্পরা কর্ত্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য অনেক সূত্রও তখন বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ, স্বদেশে ও বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অশোক বহুবিধ ব্যবস্থা করেন। ইহার আভাস আমরা গিরিলিপিতে (দ্বিতীয় প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) পাইয়াছি ও বড় স্তম্ভলিপিমালায় প্রাপ্ত হইব। দ্বিতীয়, সপ্তম ও ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে লিখিত আছে যে, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। স্বরাজ্যেও রাজকর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। স্বরাজ্যের ধর্ম্মশিক্ষার উন্নতি হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য, "প্রতিবেদিক" ও "ধর্ম্মমহামাত্য" নামক কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন। সাসেরাম প্রভৃতি উল্লিখিত চারিখানি গিরিলিপিতে প্রকাশ,—"বিবুথ দ্বারা ইহা

(৯) M. Senart, Ind. Ant. xx. pp. 165-8.

(ধর্ম্মপ্রচার) বিস্তৃত করা হইয়াছে। দুই শত ছাপ্পান্ন ইতি ২৫৬।" (১০) বুলার সাহেব "বিবুথের" বুদ্ধ অথবা ব্যুষ্ট (অতিবাহিত) এই অর্থ করিয়া, লিপির সময় বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল হইতে ২৫৬ সাল ঠিক করেন। (১১) কিন্তু উত্তমরূপে পাঠটির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, সেনার্ট সাহেবের কৃত 'প্রচারক' অর্থ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রচারকপ্রেরণের কথা অশোক নানা লিপিতে বলিয়াছেন।

অশোকের কার্য্যাবলী তাঁহার নিজের রচনা হইতে প্রদর্শিত হইল। বৌদ্ধ-কিম্বদন্তীতেও অশোকের কার্য্যকলাপের কতকটা বিবরণ পাওয়া যায়; তবে তথায় এই সকল কার্য্যসমূহের অধিকাংশ তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির নামে উল্লিখিত। তাহা কত দূর সত্য, বলা যায় না। উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে এই সমিতির উল্লেখ বিরল ও অস্পষ্ট। কেবল দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধেরাই তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির কার্য্যাবলীর সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। সিংহলদেশীয় দীপবংশে ও মহাবংশে এতদ্বিষয়ক মূলাধার বিবরণ দৃষ্ট হয়।

উভয় পালিপুস্তকে প্রকাশ যে, কালক্রমে বৌদ্ধ আচার-ব্যবহারে নানা ভ্রম ও বিবিধ মতানৈক্যের সঞ্চার হয়, ও তাহার ফলে সংঘের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ভ্রমসংশোধন ও বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিবার জন্য, অশোক, সাম্রাজ্যের নানা বিভাগ হইতে বিদ্বান্ ও পূজনীয় ভিক্ষুগণকে পাটলিপুত্রে আহ্বান করেন। এক সহস্র স্থবির সভায় সমবেত হন, ও মোগ্গলিপুত্র তিষ্যকে সভাপতিত্বে বরণ করেন। ইহারই নাম তৃতীয় বৌদ্ধসংহতি। অশোকাভিষেকের অষ্টাদশ বৎসর পরে এই তৃতীয় সংহতির অধিষ্ঠান হয়। সংহতি নয় মাস কাল শাস্ত্রাদি ও বিভিন্ন মতাদির সমালোচনা করেন। এই বহুকালব্যাপিনী আলোচনার ফল দুইটি বৃহৎ বিষয়ের ব্যবস্থা। প্রথম, বৌদ্ধ-ত্রিপিটকের সংগঠন; দ্বিতীয়,—বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারিত প্রচার।

ত্রিপিটক বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ও প্রাচীনতম শাস্ত্র। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—

১। বিনয়পিটক,—সংঘস্থ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের নিত্যাচারপদ্ধতি।

২। সূত্রপিটক,—উপাসকগণের জন্য শাস্ত্রীয় পাঠ।

৩। অভিধর্ম্ম,—বৌদ্ধদর্শন।

(১০) Senart, Ind. Ant. xx. 160-1.

(১১) Ep. Ind. vol. iii, p. 142.

বর্ত্তমানকালে ত্রিপিটক অতি বৃহৎশাস্ত্র। পালি বিনয়পিটক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত;—পারাজিক (প্রব্রজিক), পাসিত্তি (প্রায়শ্চিত্ত), মহাবগ্গ, কুলবগ্গ, পরিবারপাঠ। সূত্রপিটক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, পঞ্চদশখণ্ডে বিভক্ত। অভিধর্ম্ম ও আকারে বড় ক্ষুদ্র নয়, সাত খণ্ডে বিভক্ত। (১২)

ত্রিপিটক-সংগঠন ব্যতীত, সংহতি হইতে দেশ বিদেশে রীতিমত ধর্ম্ম-প্রচারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। দীপবংশের অষ্টম অধ্যায়ে ও মহাবংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রকাশ যে, নিম্নলিখিত দেশে নিম্নলিখিত প্রচারকগণ প্রেরিত হন;—

দেশ	প্রচারকগণের নাম
কাশ্মীর ও গান্ধার (কাবুল নদীর দক্ষিণ উপত্যকা),	মজ্ঝন্তিকা
মহীশ (মহীশূর)	মহাদেব
বনবাসি (উত্তর কানাড়ায় বৈজয়ন্তি)	রক্ষিত
অপরন্তক (? সিন্ধু বা উত্তর আফগানিস্থান)	বাষ্ট্রিয়দেশীয় ধর্ম্মরক্ষিত
মহারষ্ঠ (মহারাষ্ট্র)	মহাধর্ম্মরক্ষিত
যোনলোক (সিরিয়া ও অন্যান্য গ্রীকরাজ্য)	মহারক্ষিত
হিমবন্ত (হিমালয়ের পাদপ্রদেশ)	মজ্ঝম
সুবর্ণভূমি (ব্রহ্ম বা মালয়)	সেন এবং উত্তর
সিংহল	মহিন্দ ইত্যাদি (১৩)

ক্রমশঃ।

যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয়।

২

গতবারে আমরা যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতসমালোচনায় যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সাধারণে তাহার বিচার করিবেন। যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া প্রত্নতত্ত্বাদির যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সহসা কোনও কথা বলিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। তবে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাহা বুঝি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দুই চারি কথা বলিয়াছি মাত্র। সুতরাং সে জন্য

(১২) Rhys David's Buddhism, pp. 18-21.

(১৩) Do. p. 227.

কেহ বোধ হয় আমাদিগকে দোষভাগী করিবেন না। এবার আমরা যুধিষ্ঠিরাব্দ ও গ্রীকবিজয় সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিতে চাহি; সেগুলি যে একেবারে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বা অকাট্য প্রমাণ, আমরা তাহা বলিতেছি না; প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত বা প্রমাণ আমরা অভ্রান্ত বা অকাট্য বলিয়া মনে করি না, কাজেই কি বলিয়া আমাদের উপস্থাপিত বিষয়গুলি সাধারণকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে অনুরোধ করিব? তবে সেগুলি আপাততঃ আমাদের নিকট কতকটা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় আমরা সেই সিদ্ধান্ত ও প্রমাণগুলিকে গ্রহণ করিয়া একবার সাধারণকে তদ্বিষয়ে বিচার করিতে বলিতেছি। যদি কেহ গুরুতর প্রমাণবলে তাহার খণ্ডন করিয়া অন্য সিদ্ধান্ত স্থাপিত করেন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই; আমরা প্রকৃত সত্য-সংস্থাপনেরই ইচ্ছা করিয়া থাকি। কতকগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া, দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত প্রমাণের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে চেষ্টা করাকে আমরা প্রকৃত সিদ্ধান্ত মনে করি না। অনুসন্ধান ও ভূয়সী গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত যে অনেকটা মূল্যবান্ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপাততঃ আমরা যে দুই একটি সিদ্ধান্ত কতিপয় প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছি, সাধারণে তাহার একটু বিচার করিলে আমরা যারপরনাই সুখী হইব।

যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে আমরা মনে করিয়া থাকি যে, খৃঃ পূ ২৪৪৮ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সেই সময় হইতে উক্ত অব্দ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রমাণ রাজতরঙ্গিণী হইতে দিতেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোন প্রাচীন ইতিহাস থাকে ত তাহা রাজতরঙ্গিণী, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অস্বীকার করেন না। সেই রাজতরঙ্গিণীর কথাটা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। একমাত্র সেই গ্রীকবিজয়ের দোহাই দিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। গ্রীকবিজয়ও আমরা অস্বীকার করি না, পরে সে কথা বলিব। রাজতরঙ্গিণী বলিতেছে,—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥ ১ম ত রঙ্গ; ৫১।"

অর্থাৎ, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, দ্বাপরের শেষে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল, রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লণ পণ্ডিত তাঁহাদের মতকে অশ্রদ্ধেয় মনে করেন; তিনি বলেন,—

"ভারতং দ্বাপরান্তেঽভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।
কেচিদেতাং মৃষা তেষাং কালসংখ্যাং প্রচক্রিরে॥"

এই কথা তিনি কেবল কল্পনাবলে বলিতে চাহেন না; তিনি বলেন যে, কাশ্মীরের রাজগণের রাজত্বকাল কলির অতীতাব্দে যোগ করিলে সম্পূর্ণ কল্যব্দ পাওয়া যায়,—

"লব্ধাধিপত্যসংখ্যাং বর্ষাণ্ সংখ্যায় ভূভুজাং।
ভুক্তান্ কালাৎ কলেঃ শেষো নাস্ত্যেবং তদ্বিবর্জ্জিতাৎ॥"

রাজতরঙ্গিণীকারের কথা এখানে একটু খুলিয়া বলা ভাল। তিনি গোনর্দ্দ নরপতি হইতে কাশ্মীরের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন। গোনর্দ্দ হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজগণের রাজত্বকালের তালিকা তাঁহার জানা আছে, এবং তিনিও তাহা প্রদান করিয়াছেন। সেই গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। সুতরাং গোনর্দ্দের সময়নির্দ্ধারণের অনুসারে, কলির কয়েক শত বৎসর গত না হইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে না। তাই তিনি বলিতেছেন যে, কলির যে অতীতাব্দ হইতে কাশ্মীরের রাজগণের বিবরণারম্ভ, তাহাতে তাঁহাদের রাজত্বকাল যোগ করিলে তবে সম্পূর্ণ কল্যব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, গোনর্দ্দ পর্য্যন্ত রাজত্বকালের সংখ্যা কলির প্রথম হইতে হয় না, তাহার কয়েক শত বৎসর পর হইতে হয়, ইহাই তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য। সেই জন্য তিনি বলিতেছেন যে, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। কহ্লন পণ্ডিত রাজত্বের তালিকা দ্বারা যে সময়ের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার গ্রন্থকে আমরা ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, তাঁহার প্রমাণটা কি একেবারে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিব, অথবা তাহার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিব? কোন্‌টি কর্ত্তব্য, তাহা সাধারণে বিচার করিবেন।

রাজতরঙ্গিণীকার কেবল কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলের মঘানক্ষত্রে অবস্থানের কথাটাও বলিয়াছেন,—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য॥ ৫৬॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বসময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন। ২৫২৬ বৎসর তাঁহার রাজ্যের শককাল। ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দের পর হইতে যুধিষ্ঠির-

শক অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, ইহাই তাৎপর্য্য। রাজতরঙ্গিণীকার পুরাণাদিতে উল্লিখিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথাটাও গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজের উপস্থাপিত কাশ্মীররাজগণের শাসনতালিকা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণের চেষ্টাও করিয়াছেন। গ্রীকবিজয়ের দোহাই দিয়া কহ্লন পণ্ডিতের মতটিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ঐতিহাসিক কহ্লন পণ্ডিতের মত আমরা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরাচার্য্যের উক্তির দ্বারা সমর্থন করিতেছি। সম্ভবতঃ, কহ্লন, বরাহমিহিরের গ্রন্থ হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও যুধিষ্ঠিরের শককালের কথাটা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতায় সপ্তর্ষিচারনামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥ ৩ ॥"

রাজতরঙ্গিণীর শ্লোকের শেষে 'রাজ্যস্য' কথাটি আছে, এখানে তাহার স্থলে 'রাজ্ঞশ্চ' কথাটি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; অর্থাৎ, যুধিষ্ঠির রাজার শককাল ২৫২৬ বৎসর প্রচলিত ছিল। রাজতরঙ্গিণী অপেক্ষা বৃহৎসংহিতার পাঠই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সাহেব বৃহৎসংহিতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই গ্রন্থ হইতে আমরা উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম। তিনি পরিশিষ্টে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের পর I. O. Libraryর হস্তলিখিত একখানি বৃহৎসংহিতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটি এই,—

"বর্ষসহস্রত্রিতয়ং শতমেকং সপ্ততির্বিনাগ্রা চ।
শককালযাতমিশ্রং কলের্গতং ধর্ম্মপুত্রাত্ ॥"

ইহার অর্থ এই যে, কলি ও ধর্ম্মপুত্রের শককালের মিশ্রণ ৩১৭৯ বৎসর। আমরা বৃহৎসংহিতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে পাইয়াছি যে, যুধিষ্ঠিরের শককাল ২৫২৬ বৎসর। তাহা হইলে, ৩১৭৯ হইতে ২৫২৬ বাদ দিলে, ৬৫৩ অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং, ৬৫৩ কল্যব্দ হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়। বরাহমিহির ও রাজতরঙ্গিণীকারের মতে, কলির ৬৫৩ বৎসর হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরব্ধ হয়। আর্য্যভট্ট ও পরাশরের মতও প্রায় তাহাই। তবে সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে আর্য্যভট্টের মতে কলির ৬৬৩ বৎসরে ও পরাশরের মতে ৬৬৬ বৎসরে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘার প্রথমে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। কল্প, মন্বন্তর ইত্যাদির পরিমাণ হইতে সপ্তর্ষির গতিগণনা করিয়া সূক্ষ্মরূপে ঐরূপ বিচারে উপনীত

হইতে হয়; কাজেই এই সামান্য পার্থক্যে বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না। ফলতঃ, রাজতরঙ্গিণীকার, বরাহমিহির, আর্য্যভট্ট, পরাশর প্রভৃতির একই মত, বলা যাইতে পারে। রাজতরঙ্গিণী ও বৃহৎসংহিতার মত গ্রহণ করিলে খৃঃ পূর্ব্বে ২৪৪৮ বৎসরে যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্ধারিত হয়।

আমরা এতক্ষণ ইতিহাস ও জ্যোতিষের কথা বলিয়া আসিলাম। এক্ষণে ইহাদের সহিত পুরাণের বচনের কত দূর সামঞ্জস্য হয়, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥ ৩৪ ॥
যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ ॥ ৩৫ ॥
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ ॥ ৩৬ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। সেই সময়ে দিব্য দ্বাদশশতপরিমাণ কলি প্রকৃষ্টরূপে উপস্থিত হইয়াছে। যে সময়ে ভগবান বাসুদেব স্বর্গারোহণ করেন, সে সময়ে কলি উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলির আবির্ভাব হইয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পাদপদ্ম দ্বারা বসুন্ধরা স্পৃষ্ট ছিল, তত দিন কলি প্রবল হইতে পারে নাই। শ্রীধর স্বামী ৩৪ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—"দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ সন্ধ্যারূপ মতিক্রম্য স্বেন রূপেন প্রবৃত্তঃ প্রকর্ষেণ বৃত্ত ইত্যর্থঃ।" এখানে সন্ধ্যাশব্দে যুগের সন্ধ্যা নহে; কারণ, কলির সন্ধ্যা দিব্য ১০০ বৎসর, যাহা আমাদের ৬৫০০০ বৎসর হয়। এখানে সন্ধ্যাশব্দে আদ্যবস্থা। উক্ত আদ্যবস্থা অতিক্রম করিয়া কলি প্রকৃষ্টরূপে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং কলির যে নিতান্ত ২।৪ বৎসরমাত্র গত হইয়াছে, তাহা নহে। কলির কিছু অধিক সময়ই গত হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যায়। স্বামী ৩৬ শ্লোকের টীকায় আবার লিখিতেছেন যে, "পৃথ্বীপরিষঙ্গে ভূমেঃ পরিভবে সমর্থ ইত্যুক্তেঃ পূর্ব্বমপি কলিঃ প্রবিষ্ট ইতি গম্যতে।" সুতরাং যুধিষ্ঠিরের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই যে কলির আরম্ভ হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে তাহা কত পূর্ব্ব, ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে পারে কি না, এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে। ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্ব স্থির করা যায় কি না, তদ্বিষয়েও আমরা কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণের উক্ত অধ্যায়েই লিখিত আছে,—

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

অর্থাৎ, সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন, সেই সময়, অর্থাৎ নন্দের সময় হইতে, কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে নন্দের সময়ের কত ব্যবধান, তাহাও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

"যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৩২॥"

পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেককাল ১০১৫ বৎসর ব্যবধান। ভগবান বাসুদেবের স্বর্গারোহণের পর হইতে কলি প্রবল হইল, কিন্তু তাহার বাড় বাড়িল কবে? না, তাহার ১০১৫ বৎসর পরে। সুতরাং তাহার আদি হইতে যে সময়ে সে প্রকৃষ্টরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়ের ব্যবধান কি ৫।৬ শত বৎসর হইতে পারে না? এই সমস্ত শ্লোকগুলির বিচার করিয়া দেখিলে, রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের সহিত বিষ্ণুপুরাণের কোনও অনৈক্য হয় না। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের মত একই, সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, বরাহমিহির, রাজতরঙ্গিণী, এবং আর্য্যভট্ট ও পরাশর, সকলের মতেই খৃঃ পূ ২৪৪৮, অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে বা পরে, যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রমাণগুলি আমরা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। বোধ হয়, গ্রীকবিজয়ের সহিত সংঘর্ষ না ঘটিলে, বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এতগুলি প্রমাণ একেবারে অগ্রাহ্য করিতেন না। গ্রীক্‌বিজয়ের যদি কোন সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমাদের উপস্থাপিত প্রমাণগুলি সকলে গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

আমরা যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে খৃঃ পূর্ব্ব ২৪৪৮ অব্দে যুধিষ্ঠিরের সময় বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ, কলির ৬৫৩ বৎসর হইতে তাঁহার অব্দারম্ভ। বোম্বাই প্রদেশের পঞ্জিকায় কল্যব্দই যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত প্রদেশের পঞ্জিকারগণের মতে, যুধিষ্ঠিরের শক ৩০৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহার পর বিক্রমাদিত্যের শক আরব্ধ হয়। বিক্রমাদিত্যের শকের পর শালিবাহনের শকারম্ভ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কল্যব্দই যুধিষ্ঠিরের শক, এবং সম্বৎ বিক্রমাদিত্যের ও শকাব্দ শালিবাহনের। কল্যব্দকে যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়া অভিহিত করা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতেও ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বরাহমিহির, রাজতরঙ্গিণীকার প্রভৃতি তাহার খণ্ডন করিয়া কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দকে পৃথক করিয়াছেন।

রাজতরঙ্গিণীকার যে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দকে এক বলিয়া অভিহিত করা ভ্রমের কার্য্য বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সাধারণতঃ সময়গণনায় বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে না; তবে যুধিষ্ঠিরের সময়নির্ণয় করিতে হইলে ও তৎসময় হইতে কোনও গণনার প্রয়োজন হইলে, গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা বটে। ফলতঃ কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দের পৃথক্ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ, কলির ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়, ইহা জানা আবশ্যক।

বরাহমিহির ও রাজতরঙ্গিণীকারের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ বৎসর প্রচলিত, এবং তাঁহাদের মতে কল্যব্দের ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হয়। তাহা হইলে কলির ৩১৭৯ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত ছিল। এখানে কলির ৪৯৯৯ বৎসর। ৩১৭৯ হইতে ৪৯৯৯ পর্য্যন্ত ১৮২০ বৎসর ব্যবধান। এই ১৮২০ বৎসর শকাব্দের পরিমাণ। তাহা হইলে রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পরই শকাব্দের আরম্ভ হয়। বোম্বাই প্রদেশের পঞ্জিকাকারগণের ও অন্যান্য অনেকের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পর বিক্রমাদিত্যের অব্দ আরম্ভ হয়, কিন্তু তাঁহারা কল্যব্দকে যুধিষ্ঠিরাব্দ ও সম্বৎকে বিক্রমাদিত্যের অব্দ বলিয়া থাকেন। বরাহমিহিরের টীকাকার উৎপল ভট্টের মতে শকাব্দই বিক্রমাদিত্যের অব্দ। যুধিষ্ঠিরের অব্দের পর বিক্রমাদিত্যের অব্দ প্রচলিত হইলে, তাঁহার মতে, শকাব্দই সেই অব্দ হয়। কারণ, কলির ৬৫৩ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ হইলে, এবং তাহা ২৫২৬ পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলে, তাহার পরই শকাব্দের আরম্ভ হয়। কাজেই শকাব্দই বিক্রমাদিত্যের অব্দ হইয়া উঠে। বিক্রমাদিত্যের অব্দ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশের মতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী বিক্রমাদিত্যের সময়। এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। সময়ান্তরে তাহার সমালোচনার ইচ্ছা রহিল। আমাদের মতে খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ বৎসরে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরব্ধ হয়। এক্ষণে গ্রীক্‌বিজয়সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়। এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত। গ্রীকদূত মিগাস্থিনিস পালীবোথ্রা নগরীস্থ সান্দ্রাকোটাস রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উক্ত পালীবোথ্রা গঙ্গা ও ইরেনেবসের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। এই প্রসা-

ণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বলেন যে, গঙ্গা ও হিরণ্যবাহু বা শোণের সঙ্গমস্থল পাটলীপুত্রনগর চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, এবং উক্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয়, এবং তাঁহার সময়েই আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সার উইলিয়ম জোন্স প্রথমতঃ এই তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তিনি সম্ভবতঃ পুরাণ ও মুদ্রারাক্ষসাদি পাঠ করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্রের কথা অবগত হন। এবং আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের কথাও তাঁহার জানা ছিল। সেই জন্য তিনি মিগাস্থিনিসের উল্লিখিত সান্দ্রাকোটাস, পালীবোথ্রার সহিত চন্দ্রগুপ্ত ও পাটলীপুত্র প্রভৃতি মিলাইবার চেষ্টা করেন।* মিগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে সান্দ্রাকোটাস, পালীবোথ্রা, ইরেনেবস্ প্রভৃতি কয়েকটি কথা ব্যতীত চন্দ্রগুপ্তের বিবরণের আর কিছুই জানা যায় না, এবং তিনিই যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, তাহাও বুঝা যায় না। সান্দ্রাকোটাস যদি চন্দ্রগুপ্তই হন, তাহা হইলে তিনি যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, ইহার প্রমাণ কি? সার উইলিয়ম জোন্স কেবল মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। উক্ত চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত আরও চন্দ্রগুপ্ত যে ভারতের সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সার উইলিয়ম জোন্সের সময় তাহার আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অসাধারণ

* নিম্নে সার উইলিয়ম জোন্সের উক্তির কিয়দংশ প্রদান করা যাইতেছে,—

"I can not help mentioning a discovery, which accident threw in my way.....To fix the situation of that *Palibothra* which was visited and described by Magesthenes, had always appeared a very difficult problem,...We could not confidently decide that it was *Pataliputra*, though names and most circumstances nearly correspond, because that renowned capital extended from the confluence of the *Sone* and the *Ganges* to the city of *Patna*, while *Palibothra* stood at the junction of the *Ganges* and *Erannobous*.....But this only difficulty was removed, when I found in a classical sanskrit near 2000 years old, that *Hiranyabahu* which the Greeks changed into *Erannobous*, was in fact another name for the *Sone* itself.....This discovery led to another of greater moment, for *Chandra Gupta*, who from a military adventurer, became like *sandracottus*, the sovereign of upper Hindustan, actually fixed the site of his empire at *Pataliputra*, where he received ambassadors from foreign princes, and was no other than that very *Sandracottus* who concluded a treaty with *Seleucus Nicator*.'—Sir William Jones in Assiatic Researches, IV. 10-11. সার উইলিয়ম জোন্সের লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহাকে এই আবিষ্কার করিতে কত দূর কষ্ট-কল্পনা করিতে হইয়াছে।

অধ্যবসায় ও মুদ্রাদির আবিষ্কারে আরও দুই এক জন চন্দ্রগুপ্তের বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। এবং তাঁহারাও যে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং যদি সান্দ্রাকোটাসকে চন্দ্রগুপ্ত ধরিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে, যখন মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন কথাই মিগাস্থিনিস হইতে পাওয়া যায় না, তখন তিনি অন্য চন্দ্রগুপ্তই বা না হইবেন কেন? বরঞ্চ তাঁহার বিবরণ হইতে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহই উপস্থিত হয়। মিগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, উক্ত দরবার সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু সেই দরবারে চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী যে এক জন ছিলেন. যাঁহার প্রসাদবলে চন্দ্রগুপ্ত মগধেশ্বর বা ভারতেশ্বর হইয়াছিলেন, সে চাণক্যের কোন প্রসঙ্গই দেখিতে পাই না কেন? মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা লিখিত হইলে যেখানে চাণক্যের কোন কথারই উল্লেখ দেখা যায় না, সেখানে সে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশীয় কি না, ইহাতে সন্দেহ হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সুতরাং মিগাস্থিনিস মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের দরবারে যান নাই, তিনি অন্য কোনও চন্দ্রগুপ্তের দরবারে গিয়া থাকিবেন। আমরা যদি গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দরবারে তাঁহার উপস্থিতির কথা বলি, তাহা হইলে আপত্তি কি? অবশ্য সে বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক।

মিগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থল পাটলীপুত্র নগরের রাজা চন্দ্রগুপ্তের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন। এবং তাঁহার সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২০ বৎসরের কিছু অল্প বা অধিক। তাহা হইলে আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে,—

(১) গুপ্ত বংশের রাজধানী পাটলীপুত্র ছিল।

(২) গুপ্ত বংশের চন্দ্রগুপ্তও সম্রাট ছিলেন।

(৩) গুপ্ত বংশের রাজত্ব খৃঃ পূঃ ৩২০ বৎসরের কিছু কম বা বেশী।

আমরা উক্ত বিষয়গুলি যথাসাধ্য সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

(১) গুপ্তবংশের রাজধানী কোথায় ছিল, ইহা লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে; পরে তাঁহারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, পাটলীপুত্র বা পাটনায় গুপ্তবংশীয়দেরও রাজধানী ছিল। স্মিথ সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসা-

ইটীর পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—"If a choice must be made, I should be inclined to fix upon Pataliputra (Patna) as the head quarters of the eastern dominions of the Gupta Kings."

এই সম্বন্ধে তিনি টিপ্‌পনীতেও অন্যান্য পণ্ডিতের যে সকল মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও প্রদত্ত হইল। "Wilford long ago fixed on Patna as the Gupta Capital, but in doing so was guided by a mistaken notion that Padmabati was an equivalent of Pataliputra. (Wilson's Vishnu Purana, 4th, edn, P. 486, note 70). I find that the late Mr. Wilton Old have also speaks of the Gupta dynesty, the Capital of which was in Magadha or Bihar, the city of Pataliputra or the modern Patna" (Hist. and state. Memoir of the Ghazipur District, Part I. P. 38). Ayodhya was probably one of the Chief cities of the Guptas." ইহার পর ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে তিনি স্পষ্ট করিয়াই পাটলীপুত্রকে গুপ্তবংশের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "But, I am still of opinion that Pataliputra has the best claim to be considered the Gupta capital." স্মিথ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা দেখাইলাম যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পাটলীপুত্রই গুপ্ত বংশের রাজধানী হইতেছে। এক্ষণে আমাদের পুরাণ হইতেও তৎসম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, মগধদেশীয় গুপ্তেরা অনুগঙ্গ প্রয়াগে রাজত্ব করিবেন। "অনুগঙ্গপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।" (৪ অংশ; ২৪ অ; ১৮ শ্লোক) বায়ুপুরাণেও লিখিত আছে,—

"অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতং মগধাংস্তথা।
এতান্ জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥ ৩৭ অ; ৩৭৭।

দেখা যাইতেছে যে, গুপ্তবংশীয়দের রাজধানীও মিগাস্থিনিসের পালীবোথ্রা বা পাটলীপুত্র।

(২) এক্ষণে দেখা যাউক, মৌর্য্যবংশের চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তও ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন কি না? গুপ্তবংশের দুই জন চন্দ্রগুপ্তের বিষয় অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই মিগাস্থিনিসের সান্দ্রাকোটাস বলিয়াই আমরা অভিহিত করিতে চাহি। মুদ্রাবিচারে গুপ্তবংশের রাজগণের যে তালিকা স্থির হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ

জানা যায় (১) মহারাজা শ্রীগুপ্ত (২) মহারাজা শ্রীঘটোৎকচ, (৩) মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত। ইহার পর হইতে সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম ৩ জন গুপ্তকে মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করিতে দেখিয়া অবশ্যই ইহা বোধ হয় যে, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুপ্তরাজগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ও বংশের প্রধান ছিলেন। এবং বহু দূর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, কান্যকুব্জ প্রদেশও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের সহিত যে চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষণ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সহিতও তাহা ঘটিতে পারিত। অতএব মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তও যে ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহাও সপ্রমাণ হইতেছে।

(৩) এক্ষণে গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় খৃঃ পূঃ ৩২০ বা তাহার কিছু কম বেশী হয় কি না, ইহাই আমাদিগকে প্রমাণিত করিতে হইবে। গুপ্তবংশের রাজত্বের সময় লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্মিথ সাহেবের মতে ১৬০। ১৭০ খৃঃ অব্দ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বের আরম্ভ হয়। ওল্ডেনবর্গ প্রভৃতি ৩১৮। ১৯ খ্রীঃ অব্দ উক্ত বংশের রাজত্বকালের আরম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৪০০ খৃঃ অব্দ গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভের কাল। মিষ্টার টমাস শকাব্দকে গুপ্তবংশের কাল বলিয়া অভিহিত করেন। লাসেন সাহেব বলেন, সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মুদ্রার আবিষ্কার দ্বারা গুপ্তবংশের যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ পুরুষ। সুতরাং খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতে যে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ হইতে পারে, লাসেন সাহেবের মতে, ইহাও স্থির করা যায়। অতএব প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্তবংশের সময় নির্ণীত হয়। আনুমানিক সময়নির্দ্ধারণে কিরূপ পার্থক্য হয়, সাধারণে ইহার বিচার করিবেন। এক্ষণে আমরা যদি ঐরূপ আনুমানিক সময়নির্দ্দেশের চেষ্টা করি, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমাদের সিদ্ধান্ত একবারে অগ্রাহ্য হইবে না। আমাদের মতে গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়, অর্থাৎ, তাঁহার সময় খৃঃ পূঃ ৩২১ বৎসর। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া লইলে আমাদের প্রমাণ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক

হয় বটে, কিন্তু আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ই গ্রীকবিজয় হইয়াছিল, বলিতে চাহি। কারণ, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করায় গুপ্ত-বংশের মধ্যে তিনিই যে পরাক্রমে [illegible]জ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। তাঁহার পর হইতে সক[illegible]ক্ত উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। মিগাস্থিনিসের সান্দ্রাকো[illegible]রাক্রমশালী ছিলেন, এই জন্য আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই মিগাস্থিনি[illegible]দ্রাকোটাস বলিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে তাহা বলিলে আমাদে[illegible]াণ আরও দৃঢ় হইয়া উঠে। যদি প্রথম চন্দ্র-গুপ্তের সময় ৩২৩ খৃঃ পূঃ ধরা যায়, তাহা হইলে, তালিকানুসারে তিনি তৃতীয় পুরুষ হওয়ায়, তাহার ৬০।৭০ পূর্ব্ব হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ-কাল ধরা যাইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ধ্রবংশের পর গুপ্ত সম্রাটগণকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা প্রথমতঃ কোন্ সময়ে অন্ধ্রবংশের রাজত্বের শেষ হয়, তাহাই দেখাবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা পৌরাণিক মতেই তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক মতের রাজত্ব-পরিমাণ ধরিয়া লইয়াছেন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তে পৌরাণিক মতেরই অনুসরণ করিতেছি। বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ুপুরাণ, যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে অন্ধ্রবংশের রাজত্বশেষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমরা সেই জন্য তিন পুরাণের মতই প্রদান করিয়াছি।

বংশের নাম	বিষ্ণুপুরাণ	বায়ুপুরাণ	মৎস্যপুরাণ
পরিক্ষিতের সময়	৬৫৩ কল্যব্দ	৬৫৩	৬৫৩
পরিক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান	১০১৫	১০৫০	১০৫০
নন্দবংশ	১০০	১০০	১০০
মৌর্য্যবংশ	১৩৭	১৩৭	১৩৭
শুঙ্গবংশ	১১২	১১২	১১২
কণ্বংশ	৪৫	৪৫	৪৫
অন্ধ্রবংশ	৪৫৬	৪৫৬	৪৬০
	২৫১৮	২৫৫৩	২৫৫৭

উপরে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মতে কত কল্যব্দে অন্ধ্রবংশের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইল। ৩১০০ কল্যব্দ খৃষ্টের জন্মকাল। তাহার

৩২১ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকবিজয় হইলে, ২৭৭৯ কল্যব্দ গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সময় বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে, বিষ্ণুপুরাণের মতে অন্ধ্রবংশের ২৬১ বৎসর পরে, বায়ুপুরাণের মতে ২২৬ বৎসর পরে ও মৎস্যপুরাণের মতে ২২২ বৎসর পরে, চন্দ্রগুপ্তের সময় স্থির হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের তৃতীয়, এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উক্ত বংশের পঞ্চম। তাহা হইলে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অন্ততঃ ৬০।৭০ পূর্ব্ব ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে, গুপ্তবংশের সময় ধরা যাইতে পারে। এক্ষণে যদি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়েই গ্রীকবিজয় ধরা যায়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মতে, অন্ধ্রবংশের পর হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভকাল ২০০ বৎসরের কম হইতে আর ১৫০ বৎসর ব্যবধান হইয়া উঠে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ধরিলে ব্যবধান অত্যন্ত কম হইয়া পড়ে। যদি আমরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীকবিজয় হয়, বলি,—তাহা হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষ আপত্তি করিতে পারেন না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে সান্দ্রাকোটাস ধরিলে, অন্ধ্রবংশের ও গুপ্তবংশের মধ্যে যে একটু ব্যবধান থাকে, তাহা ২।৪ দিন পরে পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। কারণ, বর্ত্তমান গুপ্তবংশের তালিকা অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আবিষ্কার হইলে সে ব্যবধানটুকু অনায়াসেই পূর্ণ হইতে পারিবে। কিন্তু আমরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় যখন গ্রীকবিজয়ের কথা বলিতেছি, তখন ব্যবধানটুকু একটু অধিক হইতেছে, এবং তাহাও পূর্ণ করিতে ২।৩ জনেরও অধিক অনাবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাটের আবশ্যক হইয়া উঠে। আমরা কিন্তু অন্ধ্রবংশের শেষ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভের একটু ব্যবধান রাখিতে চাহি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যেমন অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরেই গুপ্তবংশকে আনিয়া ফেলেন, আমরা তাহা ইচ্ছা করি না। পুরাণাদিতে অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরেই গুপ্তবংশের উল্লেখ নাই। অন্ধ্রবংশের পর নানা স্থানে নানা বংশের কথা লিখিত আছে। যদি অন্ধ্রবংশের পর পর সেই সমস্ত বংশের রাজত্বকাল নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে গুপ্তবংশীয়েরা প্রায় আমাদের সমসাময়িক হইয়া উঠেন। সুতরাং কেহ যেন পুরাণাদিতে উল্লি-খিত অন্ধ্রবংশের পর যে যে বংশের উল্লেখ আছে, তাহাদের রাজত্বকাল পর পর ধরিয়া গুপ্তবংশের সময় নির্দ্দেশ না করেন। পুরাণাদির উক্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, অন্ধ্রবংশের পরে ভারতে এমন কোন সম্রাট ছিলেন না, যাঁহাদের রাজ্য বহুদূরবিস্তৃত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতক বৎসর

ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন বংশ রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে গুপ্তবংশ অন্যতম। উক্ত গুপ্তবংশ ক্রমে রাজ্যবিস্তার করিয়া ভারতের সম্রাট হন। তাঁহারা কদাচ অন্ধ্রবংশের অব্যবহিত পরে নহেন। পুরাণাদিতে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সেই জন্য আমরা অন্ধ্রবংশের শেষ হইতে গুপ্তবংশের রাজত্বারম্ভ পর্য্যন্ত কিছু ব্যবধান রাখিতে চাহি। এবং গুপ্তরাজগণের মধ্যে প্রথমেই প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট দেখিতে পাই বলিয়া, তাঁহাকে পরাক্রমশালী মনে করিয়া, তাঁহারই সময় গ্রীকবিজয় নির্দ্দেশ করিতে চাহি। সাধারণে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রীক-বিজয় হওয়া সম্ভব।

যে যে প্রমাণের ভার আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছিল, আমরা যথাসাধ্য তাহা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা বিচার করিয়া যথা-কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মূলমন্ত্র গ্রীকবিজয় যদি বজায় থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় অব্দনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কি বিশেষ আপত্তি থাকিতে পারে? এক্ষণে দিন দিন অশোকাদির যে সকল শিলালিপির আবিষ্কার হইতেছে, তাহার দ্বারা যে সময় নির্ণয় হইতেছে, তাহাও গ্রীকবিজয়ের সাহায্যে। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে অথবা অন্যান্য রাজার তাম্রশাসনাদিতে যে সমস্ত লেখা আবিষ্কৃত হইতেছে, সেগুলি সেই সেই রাজার রাজত্বাব্দের অমুক অমুক বৎসরে খো। ত বলিয়া দেখা যাইতেছে। তাহার সহিত খৃষ্টাব্দ মিলাইতে গেলে, সেই গ্রীকবিজয় চাই। এক্ষণে আমরা যুক্তি ও প্রমাণের বলে সেই গ্রীকবিজয়কে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে অপসারিত করিয়া গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্তের সময়ে আনিয়া উপস্থিত করিলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণতঃ যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রাচীন ভারতের ঐতিবৃত্তিক বিষয়ের নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহাদের সেই প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সাধারণকে বিচার করিতে বলিতেছি। অন্ততঃ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রমাণের উপর একতরফা ডিক্রী না দিয়া যদি দোতরফা শুনিয়া তাঁহারা অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

জাতিতত্ত্ব।

আসামের অতি-ঐতিহাসিক জাতি।

আসাম যদিও আমাদিগের সন্নিহিত প্রদেশ, তথাপি প্রতীচ্য সভ্যতার আলোকে এখনও তাহার রহস্যান্ধকার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। এখনও আসাম সম্বন্ধে আমাদিগের যথেষ্ট জ্ঞান নাই। প্রতীচ্য বণিকদিগের অদম্য উৎসাহে—'চা'র কৃষির কল্যাণে, আসামের বনভূমি এখন রম্যকাননে পরিণত হইয়াছে। আসামে এখনও অতিপ্রাচীন দেবমন্দির ও বিস্তৃত সরোবরসমূহ পরাক্রমশালী প্রাচীন নৃপতিদিগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। মগদিগের উৎপাতই আসামের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এ. এস্. গুহ মহাশয় কোনও ইংরেজীপত্রে আসামের প্রাচীনজাতি সকলের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। ব্রহ্মপুত্র নদের

উপক্রমণিকা।

পূতবারিবিধৌত আসাম প্রদেশ প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরিচূড়া হইতে সুবিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর পর্য্যন্ত সকলই সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। কোথাও পর্ব্বতগাত্রপ্রবাহিত জলপ্রপাতের মৃদু কলনাদ; আবার তাহারই পার্শ্বে বহুমূল্য-বৃক্ষরাশি-সমাকুল অরণ্যানীর স্নিগ্ধ ছায়ায় ঋক্ষ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর গম্ভীর গর্জ্জন। এই প্রাকৃতিকবৈষম্যময় প্রদেশ অতি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে নানা জাতির আবাসভূমি। এই জাতিসমূহের ভাষা ও শাসনপ্রণালী বিভিন্নপ্রকার। আসামের গ্রীষ্মপ্রধান জনাকীর্ণ প্রান্তরে সাধারণতঃ কৃষিজীবীর বাস। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু, এবং অপেক্ষাকৃত সুসভ্য। অহিফেনসেবনে যদিও ইহাদের জাতীয় জীবন উত্তরোত্তর নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, তথাপি বাণিজ্যব্যবসায়ী ইংরেজের কৃপায় এখন আর তাহাদিগের আলস্যে দিন কাটাইবার তথায় উপায় থাকিতেছে না। অন্য দিকে দক্ষিণাংশের যাযাবর পর্ব্বত্য জাতিগুলি যুদ্ধপ্রিয়; ইহারা স্ব স্ব দলপতির আজ্ঞাধীন। উত্তরে ও পূর্ব্বে কতকগুলি নিতান্ত অসভ্য পর্ব্বত্য শিকারী জাতির বাস। ইহারা সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ, কলহ ও রক্তপাত লইয়া ব্যস্ত।

লেখকের মতে, "আসাম" আধুনিক নাম। আর্য্যদিগের এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্বে এ প্রদেশকে কি নামে অভিহিত করা হইত, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। তথাপি তৎ-

অনার্য্য জাতি।

সাময়িক অধিবাসী জাতিগণের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। এতদ্দেশীয় উচ্চবর্ণের অধিবাসিগণই বাস্তবিক আর্য্যপ্রভাবে প্রভাবিত; নিম্ন বর্ণের অধিবাসিগণ হিন্দু বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করে বটে, কিন্তু পানাহার ও বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রাচীন বর্ব্বর নিয়ম হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে

নাই। লেখক বলেন, শূকরমাংস ও আসব-ব্যবহার, এবং স্বামী অথবা স্ত্রীর পরিবর্ত্তন ইহাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হয়। আধুনিক ধর্ম্মাধিকরণে "পত্নী-অপহরণের" মকদ্দমার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, এবং আইন ও উকীলগণের কৃপায়, ইহার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ও মফস্বলে হিন্দুধর্ম্মের আলোকরশ্মি আজও প্রবেশ করে নাই। সে সকল স্থলে প্রাচীন রীতি নীতি বহুকাল হইতে অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বিদ্যমান। এই মৃত্যুশয্যাশায়ী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিনে দাসত্বপ্রথার নামান্তরিত কুলী-ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহু লোককে প্রলোভিত করিয়া আসামে লইয়া আইসে; এবং কালে তাহারা এতদ্দেশেই আপনাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়।

এই অনার্য্য জাতিগণ অতি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবাসিগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় আপনাদের অধিকার-বিস্তার করে। সময়ে সময়ে পর্ব্বত্য জাতিগণও ইহাদিগের নিধন করিয়া রক্তপিপাসার শান্তি করিয়াছে। লেখকের মতে, এই অনার্য্য জাতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অধিবাসিগণের ইতিহাস প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে ভাষাবিৎ এবং মানবজাতির ইতিহাসবেত্তৃগণ একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আসাম অধিকার।

লেখক বলেন, সর্ব্বপ্রথমে নেগ্রিটো জাতির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ; আকৃতি খর্ব্ব ও কৃশ; ঘন কেশ কুঞ্চিত; নাসিকার অগ্রভাগ অত্যধিকমাংসল চক্ষু বিস্ফারিত; এবং মুখ শ্মশ্রুহীন। ইহারা যাযাবর জাতি। ইহাদের সাময়িক বাসস্থান মধুমক্ষিকার চক্রের ন্যায় বহুপ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। ইহারা বহু ভ্রাতা মিলিয়া এক স্ত্রীর, এবং বহু ভগ্নী মিলিয়া এক স্বামীর পাণিগ্রহণ করিত। সন্তানগণ মাতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। লেখক বলেন, এ প্রথা অদ্যাবধি ভুটিয়া জাতির মধ্যে বিদ্যমান, এবং কিছু দিন পূর্ব্বে গারো ও খাসিয়া জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল। দকলা এবং মিরি জাতির মধ্যে যাহারা পৃথক স্ত্রী ক্রয় করিতে অক্ষম, তাহারা বহু ভ্রাতা মিলিত হইয়া এক স্ত্রীর মূল্য সংগ্রহ করে। এই নেগ্রিটো জাতির ভাষা বহুবর্ণবিশিষ্ট ও শ্রুতিমধুর।

নেগ্রিটো জাতি।

এই নেগ্রিটো জাতি দক্ষিণ চীন হইতে আগত অন্য এক জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। ভাষাবিদেরা ইহাদের "মন-আনাম" নামকরণ করিয়াছেন। আকৃতি খর্ব্ব হইলেও নেগ্রিটো জাতির ন্যায় ইহারা কৃশ নহে। ইহাদের চুল অত্যন্ত পাতলা; চক্ষু ক্ষুদ্র ও অর্দ্ধনিমীলিত; নাসিকা উন্নত নহে; মুখ চ্যাপটা রকমের। ইহারা অত্যন্ত বৃহৎ গৃহের নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিত। এই গৃহ কখন কখন ১০০ ফুট বিস্তৃত ও ৩০ ফুট উচ্চ হইত, এবং বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকিত। অবিবাহিতদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইত। লেখক বলেন, এরূপ গৃহ নাগা, আবর ও খামটি জাতির মধ্যে আজিও বিদ্যমান। লালং ও গারো জাতির মধ্যেও এরূপ গৃহনির্ম্মাণপদ্ধতি অপ্রচলিত নহে। এই সকল গৃহের সংলগ্ন বৃহৎ বারান্দায় বসিয়া কেহ বা গল্প করে, কেহ বা অন্যান্য কার্য্য করে। আবর জাতির সমুদয় অবিবাহিত যুবক কতকগুলি

"মন-আনাম" জাতি।

বিবাহিত পুরুষের সহিত এক গৃহে শয়ন করিত। ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, অথবা গৃহে অগ্নি লাগিলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সকলকে রক্ষা করিত। এই "মন-আনাম" জাতি কৃষিব্যবসায়ী ছিল। ইহারা পর্ব্বতগাত্রের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৃহৎ বৃক্ষাদির ছেদন করিয়া, ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিত। তার পর সেই জমিতে চাষ করিত। এইরূপ প্রথাকে "ঝুনিং" বলিত। লেখক বলেন, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পর্ব্বতের তৃণবৃক্ষাদিহীন দেহ বহু-শতাব্দীব্যাপী "ঝুনিং" প্রথার ফল। গারো, বোদা ও খাসিয়া জাতির মধ্যে ইহাদের প্রভাব আজও দৃষ্ট হয়।

এই "মনআনাম" জাতি তিব্বত হইতে আগত আর এক জাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। ইহারা হিমালয়ের উত্তর দিয়া প্রথমে পূর্ব্ব দিকে গমন করে, এবং ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া আসামে আসিয়া উপস্থিত হয়। খাসিয়া পর্ব্বত ভিন্ন "মনআনাম" জাতির অধিকৃত সমুদয় প্রদেশই ইহাদের করতলস্থ হয়। ১৮৭৪ সালে সমগা-উটিং নামক স্থানের নাগা অধিবাসিগণ কর্নেল জন্‌ষ্টোনকে বলিয়াছিল যে, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা উত্তরপূর্ব্ব হইতে আগত, এবং তাহারা সাত পুরুষ তথায় বাস করিতেছে। তাহারা গ্রামের স্থাননির্ব্বাচনের সময় সেই স্থানে অনেক হস্তিদন্ত ও হস্তির কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তিব্বতীয় জাতির আকৃতি অতিশয় বৃহৎ, এবং কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর। ইহাদিগের ভাষা অনুচ্চার্য্য-ব্যঞ্জনবর্ণ-বহুল। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে ভাষার অনটন হইলে ইহারা আকার ইঙ্গিতে কার্য্য সমাধা করিত।

তিব্বতীয় অনার্য্যগণ।

অতঃপর ঐতিহাসিকযুগে আর্য্যদিগের আসাম-অধিকার সম্বন্ধে লেখক ভবিষ্যতে কিছু লিখিবার আশা দিয়াছেন। লেখক বলেন, আধুনিক আসাম-নিবাসিগণ এই পরম্পরাগত নানাবিধ জাতির মিলনসম্ভূত। নাগা, লুসাই, বোদো প্রভৃতি জাতির ভাষায় ভারতীয় প্রভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু নাগা ও বোদো জাতির মধ্যে সর্ব্বনাম শব্দগুলি তিব্বতীয়, এবং "মনআনাম"-প্রভাবাপন্ন। লুসাইগণ আপনাদের পূর্ব্বার্জ্জিত ভাষা ত্যাগ করে নাই। এই সকল জাতির ভাষা ক্রমে মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভাষার মূলে চাইনিস্ ও তিব্বতীয় শব্দ দেখা যায়।

আসামী ভাষা।

প্রাচীন অধিবাসীদিগের আমোদ প্রমোদও তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপের ন্যায় বর্ব্বরতা-মিশ্রিত ছিল। অনেক জাতির মধ্যে "মস্তক শিকারের" প্রথা প্রচলিত ছিল। নাগা ও কুকীদের মধ্যে ইহা আজও দৃষ্ট হয়। যত দিন মানুষের মস্তক ছেদন করিতে না পারিত, ততদিন কেহ সম্মানের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইত না, এবং এই স্ত্রীজনোচিত কাপুরুষতার নিমিত্ত সে সুন্দরীগণের কৃপার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই নরঘাতকগণ গৌরবচিহ্নস্বরূপ একপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। নরহত্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন নাগাকে কৌড়ি-খচিত তরবারি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না। এই নরহত্যাজনিত সম্মানলাভের আশায় ইহারা গুপ্তভাবে পথিপার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া পথিকের প্রাণবধ করিত, এবং কখনও কখনও পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বালক বৃদ্ধ ও রমণীগণকেও বধ করিত। হত্যা করিয়া বংশখণ্ড-

আমোদ প্রমোদ।

গ্রথিত নরমুণ্ড হস্তে যখন ইহারা গ্রামে প্রবেশ করিত, তখন সুন্দরীগণ তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ইহাদের অভ্যর্থনা করিত। কঙ্কালগুলি দলপতি অথবা হন্তার গৃহে রক্ষিত হইত। ইংরেজ-রাজ এই নৃশংস প্রথার বিনাশসাধনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

উল্কি পরিয়া দেহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে ইহারা বিশেষ যত্নবান। সিংকো-জাতীয় পুরুষগণ সামান্য রকম চিত্র করে। রমণীগণ পদদ্বয় ও বক্ষঃস্থল চিত্রিত করে। "আও নাগা" জাতির পুরুষগণ বক্ষঃস্থলে মনুষ্যমূর্ত্তি আঁকিয়া নরহত্যার সংখ্যা নির্ণয় করে।

স্বজাতিপ্রেম ইহাদের এক বিশেষত্ব। আবর জাতির বিবাহিত যুবকগণ বিবাহান্তে পৃথক বাসগৃহের নির্ম্মাণ করে। এই গৃহনির্ম্মাণে তাহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ তাহাকে বিলক্ষণ সাহায্য করে। অনেক সময় ইহারা পীড়িতদিগের জন্য শস্যের উৎপাদন করিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা এই স্বজাতিপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের সাহায্য করে বটে, কিন্তু কাহারও আজ্ঞাপালনে সম্পূর্ণ অসম্মত। ইহারা কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। লেখক বলেন যে, এই সাধারণতান্ত্রিক ভাবের অভ্যুদয় কৌতূহলাবহ।

অতি প্রাচীনকালে যখন অসভ্যজাতিগণ সম্প্রদায়বদ্ধ হইতে আরম্ভ করে, তখন গৃহস্বামীই তাহার সন্তানসন্ততির একমাত্র প্রভু বলিয়া গণ্য হয়। ক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলিয়া যখন স্থানে স্থানে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়, তখন প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া দলপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরগণ এই দলপতিকে বিশেষ গ্রাহ্য করে না। শাসনপ্রণালীও বিশৃঙ্খল হয়। পর্ব্বতীয় মিরি জাতি তাহাদের সাধারণতন্ত্রের রক্ষণের জন্য দলপতির উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত; এ বিষয়ে কেহ দলপতিকে কোনও প্রকার সাহায্য করিত না। স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিত। দলপতির বিশেষ কোনও ক্ষমতা ছিল না।

নাগা জাতির মধ্যে তাহার স্বোপার্জ্জিত ধন ও উহার রক্ষণার্থ বাহুবলই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। দলপতিগণ কোন "রাজস্ব" আদায় করিত না; তাহার আদেশ সকলের মনোমত না হইলে পালিত হইত না। এই শ্রেষ্ঠপদে বংশানুক্রমে পিতার পরে পুত্র নির্ব্বাচিত হইত না। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই এ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইত। ইহারা অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ। সার জেম্‌স্ জন্‌ষ্টন বলেন যে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত দুই পক্ষে সমসংখ্যক নরহত্যা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধির আশা একেবারেই নাই। মজুমা ও সেফেমা বিবাদ করিতেছে। মজুমা সেফেমার পক্ষীয় পাঁচ জনকে হত্যা করিয়াছে; সেফেমা মজুমার পক্ষের চার জনকে হত্যা করিয়াছে। সেফেমা বলিবে, "আর এক জনকে হত্যা করিয়া তার পর সন্ধি করিব।" হয় ত একদিন সেফেমা সুবিধা পাইয়া এক জনের পরিবর্ত্তে মজুমার পক্ষীয় দুই জনকে হত্যা করিয়া বসিল। অমনি মজুমা যে পর্য্যন্ত না সেফেমার আর এক জনকে হত্যা করিবে, সে পর্য্যন্ত সন্ধি হইবে না। কাজেই যুদ্ধ পরিসমাপ্তি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

নাগা জাতির সাধারণতন্ত্র।

কালক্রমে এই সাধারণতন্ত্র উন্নতি লাভ করিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ

নিকটবর্ত্তী জাতিসমূহ পরস্পরের মধ্যে সখ্যস্থাপন করিল। শাসনপ্রণালী স্থিরীকৃত নিয়মের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। আবর জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহাদের শাসনপ্রণালী হইতেই উল্লিখিত সত্যের প্রতিপাদন হয়। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব স্ব নিয়মপালনে যত্নবান ছিল, এবং বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সকল সম্প্রদায় একত্র মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিত। এই সমস্ত সভায় প্রাচীনগণ সভাপতি হইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর অধ্যক্ষবাসিগণ বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করিয়া আত্মাভিমানের পরিতৃপ্তি করিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি করিয়া "মোরাং" অর্থাৎ সহর থাকিত।

আবর জাতির সাধারণতন্ত্র।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মোড়লেরা রাজনৈতিক আন্দোলনের নিমিত্ত প্রত্যহ একবার করিয়া সমবেত হয়, এবং সাধারণের ব্যয়ে প্রচুরপরিমাণে মদ্যপান করে। সকলে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয়, তদ্রূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রচারিত হয়। মোড়লেরা কোন উপহার লইতে পারে না। প্রকাশ্য স্থানে যে সমস্ত উপহার প্রদত্ত হয়, তাহা তাহাদের সাধারণতন্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত। লেখক বলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই "মোড়লসভা"র প্রাণদণ্ড অথবা কোনরূপ শারীরিক শাস্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ইহা হইতে ক্রমে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে শাসনপ্রণালীতে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের কোনও সম্পর্ক থাকে না। কোন কোন স্থলে এক জন অথবা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি মিলিয়া নিজহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করে।

খাসিয়াদিগের মধ্যে গ্রামের ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণই শাসনভার গ্রহণ করিত। কোন কোন খাসিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশগত দলপতি নির্দ্দিষ্ট ছিল; ইহারা গ্রামের মোড়লদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিত। ইহাদের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও সাধারণের মত অগ্রাহ্য হইত না। ইচ্ছা করিলে ইহারা দলপতিকে পদচ্যুত করিতে ও মোড়লদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিত। সাধারণের ব্যয়ে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইত। দলপতিগণের কারারুদ্ধ করিবার এবং শারীরিক শাস্তি দিবার ক্ষমতা ছিল। আবর জাতির বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত ইহারাও পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইত। ইংরেজগণ খাসিয়া আক্রমণ করিলে ইহারা তিরুৎ সিংহের অধিনায়কত্বে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

খাসিয়া রাজতন্ত্র।

জীবনচরিত।

অধ্যাপক বুলার।

প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগিগণের নিকট হোক্রাথ জোহন জিওর্গ বুলারের নাম সুপরিচিত। কিছু দিন পূর্ব্বে সুইজারলাণ্ডে কনষ্টাণ্ট্ হ্রদে নৌকা-ডুবিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, অনেকে বোধ হয় তাহা বিদিত আছেন। বিগত এপ্রেল মাসের "এথিনিয়ম" পত্রে মিঃ সিসিল বেণ্ডাল তাঁহার সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হানোভার প্রদেশে বারষ্টেল নামক স্থানে বুলার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লুথার-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, এবং স্বীয় গ্রামে ধর্ম্মযাজকতা করিতেন। প্রথমে হানোভারে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বুলার বিখ্যাত গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তথায় প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক বেনফির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। বুলারের তীক্ষ্ণধী-শক্তি, অবিচলিত অধ্যবসায়, তদীয় অধ্যাপকের আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয় ছিল। তথায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি তিন বৎসর পারিস, লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথি সকল পাঠ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বুলার উইণ্ডসর কাসলের রাজকীয় পাঠাগারে কোনও কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার-প্রণীত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য" নামক পুস্তকের নির্ঘণ্ট (index) নির্ণয়ে গ্রন্থকারকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে উক্ত পণ্ডিতের চেষ্টায় ১৮৬২ অব্দে বোম্বাই শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হন। এ দেশে আসিয়া তিনি প্রথমে বোম্বায়ের এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদলাভ করেন। পরে গুজরাট প্রদেশের স্কুলসমূহের ইনস্‌পেক্‌টর নিযুক্ত হন। তিনি যখন এই শেষোক্ত কার্য্যগ্রহণ করেন, তখন গুজরাট প্রদেশে সাত শত বিদ্যালয় ও সেই সকল বিদ্যালয়ে ৪৭০০০ ছাত্র ছিল। এ দেশের কার্য্য হইতে তাঁহার অবসরগ্রহণের সময় গুজরাট প্রদেশের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭৬৩ ও ছাত্রসংখ্যা ১০১৯৭০ হইয়াছিল।

শিক্ষালাভ ও ভারতে আগমন।

অধ্যাপক বুলার ও কেলহরণ প্রভৃতি কৃতবিদ্যগণের চেষ্টায় ও গবেষণায় বোম্বাই-বিভাগস্থ লোকেরা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা সংস্কৃত বিদ্যায় অধিক অগ্রসর হইয়াছে। তথাপি ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদের মতে, সংস্কৃতশিক্ষার জন্য এরূপ ইয়ুরোপীয় অধ্যাপকগণের কোনও আবশ্যকতা নাই;—দেশীয়েরা নিজ চেষ্টায় এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতেছে।

সংস্কৃতানুরাগ।

শিক্ষাবিভাগীয় কার্য্যব্যপদেশে বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণকালে বুলার অনেক প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ করেন, এবং দেশীয় পাঠাগারগুলির পুস্তকাবলির একটি সূচী প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ অব্দে কাশ্মীরভ্রমণসময়ে তাঁহার দ্বারা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যসংক্রান্ত অনেক অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হয়। অবশেষে ১৮৮০ অব্দে এ দেশ হইতে অবসর লইয়া ইয়ুরোপে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ভায়েনা নগরীতে সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপক বুলারের রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে হিন্দু আইনবিধির সংক্ষিপ্তসার, সুন্দর ভূমিকা সহ মনুর অনুবাদ, আপস্তম্ব ও অন্যান্য বিধিকারগণের সমূল অনুবাদ, বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত পুস্তকের সংকলনে বোম্বাই আসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যর রিচার্ড ওয়েষ্ট্ তাঁহার অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সংস্কৃত আভিধানিক গ্রন্থের মূল ও ঐতিহাসিক উপন্যাস ও অন্যান্য অনেক পুস্তক প্রকাশ করেন। অনেক সাময়িক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইত। তন্মধ্যে "ভায়েনা ওরিয়েণ্টাল জর্ন্যাল" ও "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরি" পত্রের প্রবন্ধাবলী বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার "ইণ্ডিয়ান

ষ্টডিজ্" নামক পুস্তক ইংরাজিতে লিখিত। এতৎসম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধলেখককে বলিয়াছিলেন, ভারতবাসিগণের সহজবোধ্য হইবে বলিয়া ইহা ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে।" "এন্সাই-ক্লোপিডিয়া অব্ ইণ্ডো-এরিয়ান রিসার্চ্চ" নামক পুস্তকে তাঁহার আজীবন অনুসন্ধানের ফল পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রধানতঃ তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছিল। ইহাতে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ও সহযোগী প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের সাহায্য বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিকতত্ত্বনিরূপণে নিযুক্ত ছিলেন। সেই পুস্তক প্রকাশিত হইলে অনেক অজ্ঞাত ঐতিহাসিক বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইত। কিন্তু হায়! যে মহতী ধীশক্তি এই অনন্যসাধারণ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল, নিয়তিবলে তাহা অনন্তকালের জন্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে!

হারাধনের বট।

যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামে খরস্রোতা মধুমতীর তীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ তাহার চিক্কণশ্যামপত্রবহুল বহু শাখা বিস্তার করিয়া আপনার মহিমাগর্ব্বে গর্ব্বোদ্ধতশিরে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে যেখানে কুলকামিনীগণের স্নানের ঘাট ছিল, তাহার উপরেই এই বটবৃক্ষ অবস্থিত;—এই বৃক্ষতল দিয়াই ঘাটের পথ ছিল। এখন সে ঘাট পরিত্যক্ত;—এখন আর কুলকামিনীকুল সে ঘাটে জলে কলস ভাসাইয়া মধুমতীর নির্ম্মল নীরে আগ্রীব-নিমজ্জিতা হইয়া নানা কথায়, কৌতুকহাস্যে সে ঘাট শব্দমুখর করিয়া তুলেন না; এখন আর বর্ষীয়সীগণ সেই ঘাটের কূলে সৈকতোপরি উপবেশন করিয়া তদ্গতচিত্তে পূজাহ্নিকে রত থাকেন না। এখন সে পরিত্যক্ত ঘাটের পথে তৃণ জন্মিয়াছে;—এখন আর কেহ কক্ষে কলস লইয়া সে পথে গমন করে না; এখন সে পথে কোনও স্নানার্থিনীর অলক্তকরাগরঞ্জিত কোমল চরণের মধুর নূপুরনিক্কণ শ্রুত হয় না; এখন আর সে পথে কাহারও কঙ্কণ কলসে মৃদুমৃদুস্পর্শজনিত মৃদুমধুর ধ্বনি উত্থিত করে না; এখন আর নিদাঘকালে স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কেহ সে বটবৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া যায় না। সে ঘাট এখন শূন্য;—সে পথ এখন পরিত্যক্ত;—সে বটবৃক্ষ এখন একাকী দণ্ডায়মান।

১

পূর্ব্বে গ্রামে হারাধন নামক এক জন গোপযুবক বাস করিত। অল্প বয়সেই হারাধনের মাতাপিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। হারাধন কতকটা পাগল, কতকটা আজন্ম নির্ব্বুদ্ধি, অর্থাৎ "ইডিয়ট"। আত্মীয় স্বজনগণ কেহই এই অসহায় অদ্ভুত জীবটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে নাই; তবে গ্রামের লোকের দয়ায় হারাধন দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন পাইত। গ্রামের লোক হারাধনকে দয়া করিত,—ভালও বাসিত। হারাধন তাহাদের অনেক কাজে লাগিত। হারাধনের এই একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, কেহ তাহাকে কিছু করিতে বলিলে, সে প্রাণপণে সে কাজ করিতে চেষ্টা করিত। কাহারও পীড়া হইলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গ্রামান্তর হইতে ডাক্তার বা কবিরাজ ডাকিতে হইলে, দূরগ্রামে কাহারও কোনও পীড়িত আত্মীয়ের বা কুটুম্বের সংবাদ আনিতে হইলে, হারাধনকে একবার বলিলেই হইল; হারাধন তখনই সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিত।

হারাধন এই বটবৃক্ষতলে থাকিতে বড়ই ভালবাসিত; গ্রীষ্মকালে সে এই তরুমূলেই নিশাযাপন করিত। মধুমতীর কলকলধ্বনি, বটবৃক্ষের ঘন-পত্ররাজির মৃদুমর্ম্মর, আর চারি দিকে অশ্রান্ত ঝিল্লীরব—এই সকল পাগলের মনে কি সুখ দান করিত, তাহা সেই বলিতে পারে।

সে এই বটবৃক্ষতলে থাকিতে ভালবাসিত বলিয়া, গ্রামের লোক—কেহ খড়, কেহ বাঁশ, কেহ রজ্জু, কেহ বা শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিক সাহায্য করিয়া এই বটবৃক্ষের নিকটেই হারাধনের জন্য একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিল। সেই কুটীরাভ্যন্তরে থাকিয়া হারাধন মধুমতীর বীচিভঙ্গ দেখিতে পাইত, বটপত্রের মৃদুমর্ম্মর শুনিতে পাইত। তাহার কুটীরখানি যেমন ক্ষুদ্র, কুটীরের দ্রব্যাদিও তেমনই সামান্য। কুটীরাভ্যন্তরে গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত কয়খানি বস্ত্রমাত্র থাকিত। হারাধন কুটীরের এক কোণে একটি উনান প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল। যে দিন আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইত না, সে দিন সে আপনি রন্ধন করিত। চাউল প্রভৃতির জন্য তাহার কোন ভাবনা ছিল না—চাহিলেই মিলিত।

২

বর্ষার অপরাহ্ণ। আজ শেষরাত্রি হইতে আর বৃষ্টির বিরাম নাই; এখনও টিপ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ ঘন ধূসর মেঘমালায় মণ্ডিত—

সে নিরবচ্ছিন্ন মেঘাবরণে কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই,—কোথাও এতটুকু নীল দৃষ্ট হয় না। আজ প্রভাত হইতে রৌদ্র দেখা যায় নাই,—এখন সন্ধ্যা না হইতেই চারি দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। নদীর পর পারে তীরতরুরাজি স্বচ্ছান্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে।

আজ গ্রামের রমণীরা সকাল সকাল ঘাট সারিয়া গিয়াছেন। ঘাটে আর লোক নাই, কেবল এইমাত্র এক কিশোরী কলস কক্ষে জল লইতে আসিয়াছেন। কিশোরীর দীপ্ত গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহে যৌবন তাহার শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; সে দেহে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে—যেন বর্ষাবারিরাশিপ্লাবিতা তরঙ্গিণী কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কুঞ্চিতকেশভারে কবরী শিথিল হইয়া গ্রীবাদেশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। কিশোরীর সীমন্তে সিন্দূরচিহ্ন নাই,—তিনি এখনও অবিবাহিতা। তাঁহার পিতা বড় কুলীন; সে প্রদেশে তাঁহার সমান ঘর দুর্ল্লভ; তাই আজও যুবতীর বিবাহ হয় নাই। যুবতীর এক ষষ্টিবর্ষীয়া পিতৃষসাও এখনও অবিবাহিতা। কৌলীন্যের কল্যাণে সে অঞ্চলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

হারাধন আজ আর আপনার কুটীর ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। পূর্ব্ব দিন সে কোথা হইতে কয় মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল; আজ দ্বিপ্রহরে আপনি রন্ধন করিয়াছে। এখন একটু অন্ধকার হইতেই সে কুটীরমধ্যে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়া আপনার ছিন্ন মাদুরখানি বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া সে একদৃষ্টে দেখিতেছিল,—চালের নিম্নভাগে একটা টিক্‌টিকি একটা ক্ষুদ্র পোকা ধরিতে চেষ্টা করিতেছে।

সহসা বাহিরে ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। হারাধন চমকিয়া উঠিল। এরূপ শব্দ তাহার নিকট পরিচিত; সে বুঝিল,—বর্ষাবারিপাতপ্রমত্তা মধুমতী কোথাও আপনার তটভূমি ভাঙ্গিয়া লইল।

কোথায় তট ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেখিবার জন্য, হারাধন কুটীরের বাহিরে আসিল; দেখিল, ঘাটের বামপার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র মৃত্তিকার চাপ খসিয়া পড়িয়াছে, যেখানে পড়িয়াছে, সেখানে জলরাশি আবিল হইয়াছে;—জলের আন্দোলন এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। সহসা সে দেখিতে পাইল, ঘাটের পার্শ্বেই জলে একটা পিত্তল-কলস ভাসিতেছে; ঘাটে জনপ্রাণী নাই! কলস তুলিবার জন্য জলে নামিয়া হারাধন পদে নরদেহের স্পর্শ অনুভব করিল। হারাধন জলতল

হইতে একটি রমণীদেহ তুলিল। ঘাটের পার্শ্বে তটভূমি হইতে যে মৃত্তিকার চাপ খসিয়াছিল, তাহারই একাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যুবতীর পৃষ্ঠদেশে পতিত হইয়াছিল;—সেই আঘাতে তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন। বর্ষার বারিপাতে নদী-গর্ভে অল্প জলে প্রভূত ধোয়াট মাটি জমিয়াছিল—সে মৃত্তিকা আটালো। তখন রমণীর দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; তিনি সেই আটালো মৃত্তিকা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইয়া আসিতেছিল।

যুবতীর মৃতপ্রায় দেহ লইয়া হারাধন কুটীরে ফিরিল; তাঁহার কলস নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে খেলা করিতে লাগিল।

যুবতীর মৃতপ্রায় দেহ কুটীরে আনিয়া হারাধন তাহা সযত্নে আপনার ছিন্ন মাদুরের উপর সংস্থাপিত করিল। সে রন্ধনান্তে উনানের অগ্নি নির্ব্বাপিত করে নাই;—কুটীর মধ্যে মৃদুতাপ অনুভূত হইতেছিল। সেই মৃদুতপ্তপবন-স্পর্শে শীঘ্রই রমণীর চৈতন্যোদয় হইল। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি দেখিলেন,—তিনি হারাধনের কুটীরে শয়ানা, হারাধন তাঁহার নিকটে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে। স্বভাবসুলভ লজ্জাবশতঃ তিনি কিছু সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া হারাধন বলিল, "ঠাকুরুণ, তুমি ঘরে থাক, আমি বাহিরে বসিতেছি।" রমণী কুটীরমধ্যে রহিলেন। হারাধন বাহিরে বসিয়া ভিজিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ পরে রমণী একটু সুস্থ হইলেন। তাঁহার শরীরে তখনও বেদনা প্রকাশ পায় নাই। তিনি হারাধনকে ডাকিলেন; সে দ্বারের নিকটে আসিল। রমণী বলিলেন, "হারাধন! আমি বাড়ী যাইব, আমার সঙ্গে চল।"

রমণী গৃহাভিমুখে চলিলেন; হারাধন তাঁহার সঙ্গে চলিল। তখন চারিদিক এমন ঘনান্ধকারে ব্যাপ্ত যে, পল্লীপথ উভয়ের পরিচিত না হইলে যুবতীর পক্ষে সে রাত্রে গৃহে যাওয়া সম্ভব হইত না। যাইতে যাইতে রমণী বলিলেন, "কি অন্ধকার! সাপের ঘাড়ে পা দিলেও দেখিতে পাইব না।"

যুবতী গৃহে উপনীত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননী বলিলেন, "এই যে সারদা, এতক্ষণে আসিলি! এই দুর্য্যোগে কি ঘাটে এত বিলম্ব করিতে আছে? আমি ভাবিয়া সারা হইতেছিলাম।"

সারদা সিক্তবস্ত্রেই সেইখানে বসিয়া জননীকে আদ্যোপান্ত সকল কথা

বলিল। তখন গৃহিণী বাটীর সকলকে শুনাইবার মত উচ্চস্বরে বলিলেন, "আমার কত দিনের পুণ্য, তাই, মা, আজ তো'কে পাইয়াছি।" শেষ কথা কয়টা বলিবার সময় গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে একটু ক্রন্দনের ঝঙ্কার আসিল।

সহসা এই কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা কি, তাহা জানিবার জন্য, বাটীর সকলে ছুটিয়া আসিল। তখন গৃহিণী সারদার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা (এবং দুই চারিটা অতিরিক্ত কথাও) বলিলেন, এবং সর্ব্বশেষে, গল্পসমাপনে "আমার কথাটি ফুরাল" ইত্যাদির মত, "আমার কত দিনের পুণ্য, তাই সারদাকে পাইলাম" বলিতে ভুলিলেন না। গৃহিণীর একটি দ্বাদশবর্ষীয়া পৌত্রী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল; তাঁহার কথা শুনিয়া সে বলিল, "তবে যে, ঠাকুমা, তুমি বল—মেয়ের নাম ফেলি, যমকে দিলেও গেলি! মানুষকে দিলেও গেলি?"

"তুই বড় জ্যাঠা হইয়াছিস" বলিয়া গৃহিণী তাহাকে এক তাড়া দিলেন, এবং কর্ত্তাকে বলিলেন, "হারাধনকে কাল এখানে খাইতে বল।"

সারদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারাধনের সন্ধানে বহির্বাটীর দিকে গমন করিলেন। কিন্তু হারাধনকে আর সেখানে পাওয়া গেল না; সে ততক্ষণ কুটীরাভিমুখে ফিরিয়া গিয়াছে।

৩

পর দিবস প্রত্যূষে পাড়ার আর আর গৃহিণীদিগের সহিত এই দুর্ঘটনার কথা বলিতে বলিতে ঘাটে যাইবার সময় সারদাসুন্দরীর মাতা ঘাটের পথ হইতে হারাধনকে ডাকিয়া বলিলেন, "হারাধন, আজ আমাদের বাড়ী যাইয়া খাইয়া আসিস্।" কুটীরের বাহিরে আসিয়া হারাধন উত্তর করিল, "যে আজ্ঞা, মাঠাকুরুণ।"

সারদার মাতার কথা শুনিয়া বামার মাতা বলিলেন, "ভরা সন্ধ্যায় কি মেয়েকে একলা ঘাটে যাইতে দিতে আছে! ও নিশ্চয় 'উপর-দৃষ্টি'। ভালয় ভালয় রক্ষা হইয়াছে, এখন একটা স্বস্ত্যয়ন করাইও।"

নদীতীরে একখণ্ড মৃত্তিকা ধসার মত একটা তুচ্ছ নৈসর্গিক ব্যাপার লইয়া গ্রামের গৃহিণীগণ যতপ্রকার মতামত প্রকাশ করিলেন, সে সকল বর্ণিবার স্থান আমাদিগের নাই; তবে এ কথাটা স্থির রহিল যে, "উপর-দৃষ্টি" নহিলে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই।

সেই দিন মধ্যাহ্নে হারাধন সারদার পিতৃগৃহে আহার করিতে গেল।

গৃহিণী আপনি দাঁড়াইয়া তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। সেই দিন হইতে হারাধন প্রায়ই সারদাসুন্দরীর পিতৃগৃহে যাইত। দুই তিন দিন টারপিন মালিস করিয়া সারদার দেহের ব্যথা দূর হইল। হারাধন তথায় গেলে, হয় সারদা স্বয়ং, নয় ত তাহার জননী, তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন।

এমনই ভাবে দুই তিন মাস কাটিয়া গেল।

পাগল হারাধন কিছু ভাবিত কি না,—সে কিছু ভাবিতে পারিত কি না, তাহা সেই বলিতে পারে। হয় ত বা তাহার হৃদয়ের কোনও নিভৃত প্রান্তে কোথাও মরুমধ্যে ওয়েসিসের মত এমন একটু অংশ ছিল, যাহা অপর সকলের হৃদয়ের মত সুখ, দুঃখ, ঘৃণা, ভালবাসা, আনন্দ, বিষাদ, অনুভব করিতে পারিত। অনুশীলনের অভাবে আলোকবিহীন স্থানে উদ্ভিদের মত তাহার হৃদয়ের সে অংশ বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই। ঘনান্ধকারমধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশে যেমন চারি দিক সচকিত হইয়া উঠে, তেমনই কোন তীব্র সুখ বা দুঃখ, ঘৃণা বা ভালবাসা, আনন্দ বা বিষাদ অনুভব করিলে, তাহার রুদ্ধ মানসীশক্তি সচকিত হইয়া উঠিতে পারিত। একখানি প্রস্তরের অন্তরায় অপসারিত করিলে যেমন নির্ঝরের বারিরাশি বিনির্গত হয়, তেমনই হয় ত একটা কারণে তাহার হৃদয়ের সেই অংশ সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিতে পারিত। সে কথা কে বলিতে পারে!

হারাধন কি ভাবিয়াছিল, তাহা সেই বলিতে পারে। তবে একদিন সকালে সে সারদার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল। তখন সারদার দুই ভ্রাতা ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ নিবিষ্টচিত্তে একটা ডাবা হুঁকায় ধূমপানে রত ছিলেন; কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের এক পুত্রের জন্য একখানা ঘুড়ী প্রস্তুত করিতেছিলেন। হারাধনকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "কি রে, হারাধন!" হারাধন বলিল, "একটা কথা বলিব!" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোর আবার কথা কি?" হারাধন বলিল, "ঠাকুরুণের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন না কেন?"

তাহার কথা শুনিয়া সারদার জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "দূর পাগল! ও কথা বলিতে নাই।" শুনিয়া হারাধন ফিরিয়া চলিল। তখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "দাদা, ওটা ত পাগল। উহার কাণ্ডজ্ঞান নাই;—উহাকে আর বাটীতে আসিতে দিয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া তিনি হারাধনকে ডাকিলেন।

হারাধন ফিরিয়া আসিল;—তিনি তাহাকে বলিলেন; "তুই আর আমাদের বাড়ী আসিস্ না।" হারাধন পূর্ণোন্মুক্ত নয়ন তুলিয়া একবার বক্তার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর "যে আজ্ঞা" বলিয়া আপনার কুটীরাভিমুখে ফিরিয়া গেল।

তখন পথিপার্শ্বে পাড়ার কলহনিরতা দুই জন রমণীর উচ্চকণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল। ইঁহারা দুই জন গ্রামের প্রসিদ্ধ ঝগড়াটে; এরূপ কলহ ইঁহাদিগের দৈনিক কার্য্যের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের লোকে রটিত যে, ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কোন দিন কলহ করিবার লোক না পাইলে বেণীবনে বিমুক্ত কেশ বাধাইয়া "কালামুখি আমার চুল ধরিলি কেন?" বলিয়া ঝোপের সহিত বেশ কলহ করেন; তাহার পর জলগ্রহণ করেন। কলহকালে আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণের পুংস্কোকিলকলবিড়ম্বিনী বাণী কিরূপে আতায়িচীৎকারে পরিণত হয়, তাহা যাঁহারা না শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার উপায় নাই। হারাধন যখন পথ দিয়া যাইতেছিল, তখন শুনিতে পাইল, কলহকারিণীদ্বয়ের মধ্যে এক জন অপরকে সম্বোধিয়া বলিতেছেন, "লোকসমাজে ও পোড়ামুখ দেখাইতে তোর লজ্জা করে না? কেন? এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরিতে পারিস্!"

শুনিয়া হারাধন আপনা-আপনি বলিল, "কেন, এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরি!" সে আপনার কুটীরে গেল; সে দিন আর বাহির হইল না।

সেই দিন হইতে হারাধন মধ্যে মধ্যে আপনা-আপনি গম্ভীরভাবে বলিত, "কেন, এক পয়সার দড়ীও কি জুটে না যে গলায় দিয়া মরি।"

৪

কিছু দিন পরে বহু চেষ্টায় সারদার বিবাহের পাত্র মিলিল। অনেক কথা-কাটাকাটি, অনেক দরদাম, অনেক চড়াদর হাঁকা ও সস্তাদর ডাকা প্রভৃতির পর পাওনা স্থির হইলে, পঞ্চাশৎবর্ষীয় পাত্র আর একবার টোপর মাথায় দিতে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইল, সারদা, তাহার এক ষষ্ঠবর্ষীয়া পিতৃব্যপুত্রী ও তাহার ষষ্টিবর্ষীয়া পিতৃষসা একত্র সেই একই "বরে" প্রদত্তা হইবেন। বরের পক্ষে ইহা বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র; কারণ, ইতিপূর্ব্বেই তিনি দ্বাদশবার ছাঁদনাতলায় দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং সেই দ্বাদশবারে তাঁহার ভাগ্যে ঊনবিংশটি রমণীরত্ন লাভ হইয়াছিল।

চুক্তিদরের কিছু অগ্রিম পাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘটক, নাপিত ও পাঁচ ছয় জন

লোক লইয়া বর বাটী হইতে বাহির হইলেন। কন্যার গ্রামের প্রান্তে সরোবরকূলে আসিয়া বরযাত্রীরা মেটে পথের এক হাঁটু ধূলি বিধৌত করিয়া ফেলিল, বোঁচকা হইতে জুতা বাহির করিয়া পায়ে দিল, উত্তরীয় লইয়া তৈলমর্দ্দনপিচ্ছল গ্রীবাদেশে বিলম্বিত করিল,—সাজগোজ শেষ করিয়া সকলে বরের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করিল।

হারাধন তখন কোথায় যাইতেছিল। গ্রামে একখানা পাল্কী ও এতগুলি অপরিচিত লোক দেখিয়া সে এক জন বাহককে জিজ্ঞাসা করিল, "পাল্কীতে কে?" বাহক তখন বিবাহবাড়ীর বক্‌সিসের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল,—হারাধনের কথা কানে তুলিল না। পথে এক দল বালক খেলা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, "হারাধন, ব্রাহ্মণবাড়ী বিবাহ। সেই, তুমি যাহাকে জল হইতে তুলিয়াছিলে, আজ তাহারই বিবাহ।"

হারাধন চলিয়া গেল।

এক দল ছেলে চেঁচাইতে চেঁচাইতে, ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে পল্লীপথে ধূলি উড়াইয়া বরের পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবাহবাড়ী পর্য্যন্ত চলিল। ভল্লূক যেমন মশকের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া উঠে, অথচ তাহাদের আক্রমণ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারে না, বরযাত্রিগণও সেইরূপ বিষম বিরক্ত হইয়াও বালকদলকে তাড়াইবার কোন উপায় করিতে পারিল না।

৫

সন্ধ্যার পর "লগ্ন" উপস্থিত হইলে, বর যাইয়া আলিপানা-দেওয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইলেন। কনে তিনটি পূর্ব্বেই সম্প্রদান-স্থলে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সম্প্রদানের কিছু পূর্ব্বে মর্য্যাদার একটা কথা উঠিয়া তর্ক উপস্থিত হইল। মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘশিখাধারী পুরোহিত হইতে টোপরপরা বরটি পর্য্যন্ত সকলেই সে তর্কে যোগদান করিলেন। তর্ক উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। জরাজীর্ণা পিসিমার আরও বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইতেছিল; তিনি বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আর বসিয়া থাকিতে পারি না। বাপু, একটা ফুল ফেলিয়া দাও।" চারি দিক হইতে সকলে "কি কর! কি কর!" করিয়া উঠিল। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ সম্ভাষণের জন্য পিসিমার আর সে বরের সহিত বিবাহ হইল না—বোধ হয়,জীবনের অবশিষ্ট কয় দিনের মধ্যে তাঁহার কৌমারদশা শেষ হইবার সম্ভাবনাও শেষ হইয়া গেল। কোন রূপে অশ্রুসংবরণ করিয়া তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তর্ক মিটিলে বিবাহ শেষ হইল। সমবয়স্কা ও অসমবয়স্কাদিগের নিকট সারদা যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে সে দৃঢ় বুঝিয়াছিল যে, ভূমিসম্পত্তির মত স্বামিসম্পত্তিতেও দখলীস্বত্বই প্রধানস্বত্ব,—কাজেই দখল ছাড়া কিছু নহে। তদ্ভিন্ন নিজের রূপের গর্ব্বও যে তাহার ছিল না এমন নহে; (কাহারই বা না থাকে?) সে ভাবিয়াছিল যে, নূতনের আকর্ষণে স্বামীটিকে দিন কয়েক কাছে রাখিতে পারিলেই, সে আপনার রূপ-বহ্নিতে তাঁহার পক্ষ দুইখানি ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারিবে। তাই ফুলশয্যার রাত্রেই সে স্বামীর সহিত তাঁহার গৃহে যাইতে চাহিল। স্বামী প্রথমে স্থানাভাব প্রভৃতি আপত্তি করিতে লাগিলেন। সারদা বলিল, "তোমার চরণসেবা করিতে পাইলে, সকল কষ্টই আমার নিকট সুখ বলিয়া বোধ হইবে।" এই বলিয়া সারদা দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলিল। তাহার সেই প্রভাত-শিশির-সিক্ত ফুল্লারবিন্দবৎ অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিয়া স্বামীর সঙ্কল্প টলিল। সারদা মনে মনে হাসিল; ভাবিল,—"তুমি পুরুষ, তোমার সাধ্য কি যে চাতুরীতে রমণীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিবে! চিরকালই নামে তোমরা প্রভু, আমরা দাসী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রভু, তোমরা দাস! চিরদিনই শ্যামার চরণতলে শিব, মহেশের মস্তকে মন্দাকিনী।"

তাহার পর সারদাসুন্দরী একবিংশতি সরিকের একজন হইয়া বিংশতিটি সপত্নী-সঙ্কুল স্বামিসম্পদে আপনার অংশ বুঝিয়া লইতে ও দখল রাখিতে স্বামিগৃহে গেল;—মনে আশা ছিল, ক্রমে একাই সবটা দখল করিয়া লইতে পারিবে।

সারদার সপত্নীরা সকলে স্বামিগৃহে থাকিতেন না। যাঁহাদিগের পিত্রালয়ের অবস্থা ভাল ছিল, তাঁহারা আর স্বামিসদনে আসিতেন না। যাঁহাদিগের পিত্রালয়ের অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল, কেবল তাঁহারাই স্বামিগৃহে বুকড়ী চাউলের অন্ন আহার করিয়া ও পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এখন একজন সাধারণ শত্রু উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী সন্ধিসংস্থাপন করিয়া, ঝগড়া আপোষে মিল করিয়া ফেলিলেন ও সমবেতশক্তিতে সারদাকে আক্রমণ করিলেন।

সারদা চালাক মেয়ে, সে প্রথমেই সপত্নীদিগকে চটাইল না। সে প্রথমে তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিল, তাহার পর স্বামীর উপর আপনার ষোল আনা প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া লইয়া সপত্নীদিগকে দুই পায় ছেঁচিতে লাগিল। ক্রমে সেই বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিল, স্বামী তাহার হস্তে খেলিবার পুতুল হইয়া দাঁড়াইলেন।

এমনই ভাবে কয় বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর সারদার স্বামী এক জন ধনীকে কন্যাদায়মুক্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। এবার আর সারদা স্বামীকে বাগে রাখিতে পারিল না; অর্থলোভে তাহার স্বামীটি অসমসাহসে বিষম জোরে টান দিয়া দড়ী ছিঁড়িলেন। সারদা বুদ্ধিমতী;—সে বুঝিল যে, আর বাড়াবাড়ি করাটা ভাল নহে, অধিক কচ্‌লাইলে লেবু, তিক্ত হইয়া উঠিবে; বিশেষ এ বিবাহে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ ধনীর দুহিতা আর দরিদ্র স্বামীর ঘর করিতে আসিবে না, মধ্য হইতে কিছু অর্থলাভ হইবে।

সারদার অনুমানই সত্য হইল। পাঁচ ছয় দিন পরেই স্বামী ফিরিয়া আসিলেন;—সঙ্গে কিছু অর্থও আনিলেন। তাঁহার নবপরিণীতা বধূ পিত্রালয়েই রহিলেন। গৃহে সারদাসুন্দরীর প্রভাব যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

৬

কিন্তু সারদার অদৃষ্টে এ সুখ অধিকদিন সহিল না। শেষ পক্ষের শ্বশুরালয়ে পানাপুকুরের পচা জল পান করিয়া স্বামী জ্বর লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর মধ্যে মধ্যে জ্বর হইত, মধ্যে মধ্যে যাইত,—জ্বর না থাকিলে, স্নানাহার সাধারণ মতই চলিত। ক্রমে নিত্যই একটু জ্বর দেখা দিতে লাগিল। গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় নাড়া টিপিয়া "পুটপাকের বিষমজ্বরারি লৌহ" ব্যবস্থা করিলেন। জ্বর বন্ধ হইল না; শীতের প্রারম্ভেই রোগীর পা ফুলা ফুলা বোধ হইতে লাগিল। সারদার অবিশ্রান্ত শুশ্রূষা সত্ত্বেও শীত যাইতে না যাইতেই তাহার কপাল ভাঙ্গিল।

স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বামিগৃহে সারদার সকল প্রভুত্ব শেষ হইয়া গেল। এখন সপত্নীদিগের জ্বালায় তাহার পক্ষে সে গৃহে বাস করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিধবার পুণ্য শুক্লাম্বর ধারণ করিয়া অলঙ্কারহীন প্রকোষ্ঠে, বিধবা সারদা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। কন্যাকে দেখিয়া মাতা ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; মাও কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়েও কাঁদিতে লাগিল।

কয় দিন পরে একদিন জননীর সঙ্গে স্নানার্থ ঘাটে যাইবার সময় সেই বটবৃক্ষের নিকটে হারাধনের কুটীর দেখিয়া সারদা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, হারাধন কি আজও বাঁচিয়া আছে?" মা বলিলেন "আছে বৈ কি!" সারদার অনুরোধে তাহার জননী হারাধনকে সে দিন তাঁহাদিগের গৃহে যাইয়া আহার করিতে বলিলেন। শুনিয়া হারাধন কিছুক্ষণ নদীর দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সম্মতি প্রকাশ করিল।

হারাধন আসিলে সারদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হারাধন, আমায় চিনিতে পার?" হারাধন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না।" সারদাসুন্দরীর বিষাদবিমলিন আনন, কোটরগত নয়ন, পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে তাহাকে চিনিতে পারিল না। সারদা বলিল, "আমি সারদা। সেই যে আমি নদীতে ডুবিয়া গেলে তুমি আমাকে তুলিয়াছিলে!" হারাধন কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মাথা নাড়িয়া অতিকরুণ, অতিকাতর, অতিক্লিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "চালাকি করিও না। তুমি সে নও ঠাকরুণ, তুমি সে নও।" নির্ব্বোধ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের যে মূর্ত্তির কথা ভাবিয়াছে, সে মূর্ত্তি আর এ মূর্ত্তি এক কি?

হারাধন রাস্তার দিকে চলিল। সারদা ডাকিল, "হারাধন, ভাত খাইয়া যাও।" হারাধন ফিরিল না;—সে যাইতে যাইতে শুনিল, সারদার পিতা বলিলেন, "ও পাগল। উহার কি বুদ্ধি আছে যে, কিছু মনে রাখিতে পারিবে?" শুনিয়া সারদা বলিল, "আহা, উহার কি দুঃখের জীবন!" আপনি দুঃখে দগ্ধ হইয়া সারদা অপরের দুঃখে দুঃখবোধ করিতে শিখিয়াছিল।

হারাধন আপন মনে বলিতে বলিতে গেল, "আমার জীবন কি এতই দুঃখের! তবে এ জীবন রাখি কেন?" সে যাইয়া আপন কুটীরে প্রবেশ করিল। সারদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাকিতে আসিলেও হারাধন আর কুটীর হইতে বাহির হইল না।

* * * * *

পরদিবস প্রত্যূষে প্রাতঃস্নানার্থিনীরা ঘাটের পথে বটবৃক্ষের নিকটে যাইয়াই, কক্ষের কলস ফেলিয়া ভয়চকিতদ্রুতপদে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া গ্রামের লোক সেখানে গেল। জীবনের ক্ষুদ্র সুখে দুঃখে হারাধন যে বটবৃক্ষকে এত ভালবাসিত, সেই বটবৃক্ষই তাহার মরণের অবলম্বন হইয়াছে;—বটশাখায় রজ্জু ঝুলাইয়া সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সেই অবধি গ্রামের লোকে সেই বটবৃক্ষটিকে 'হারাধনের বট' বলিয়া থাকে। হারাধনের 'অপমৃত্যুর' পর হইতে একটা অজ্ঞাত ভীতির আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা সন্ধ্যার পর প্রাণান্তেও সে বটবৃক্ষের নিকটে যাইতে স্বীকৃত হয় না। কেহ সে বিষয় লইয়া তাহাদিগকে কোনরূপ উপহাস করিলে তাহারা বলিয়া থাকে, "যদি ওখানে আশঙ্কার কোন কারণ না থাকে, তবে ও বটবৃক্ষে পাখীরাও বাসা বাঁধে না কেন?" বাস্তবিক 'হারাধনের বটে,' কেন জানি না, কোন পাখীই বাসা বাঁধে না!

ভারতবর্ষে।

১

মার্কটোয়েন ছদ্মনামধারী, সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান পরিহাসরসিক, মিষ্টার স্যামুয়েল ক্লিমেন্স,বৃদ্ধবয়সে প্রকাশকের ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণপরিশোধকল্পে দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে পৃথিবীপরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রকাশকের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া সাহিত্যসেবকের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম নহে। সার ওয়াল্টার স্কটও বৃদ্ধবয়সে প্রকাশকের ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, কঠোর কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নেও বিশ্রামলাভ করিতে পারেন নাই, পরন্তু তাঁহাকে ঋণশোধচেষ্টায় বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

মার্কটোয়েন More Tramps Abroad নামক গ্রন্থে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের আভাষ প্রদান করিব।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষাংশে মার্কটোয়েন বোম্বাই সহরে আসিয়া উপনীত হয়েন। বোম্বাইয়ে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিল—বর্ণ বৈচিত্র্য ও দেশীয়গণের প্রতি য়ুরোপীয়গণের কুব্যবহার। বোম্বাই দেখিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

বোম্বাই সহর সুমোহন—মনোহর—বিস্ময়োৎপাদক, দেখিলে স্বতঃই আরব্য উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। প্রকাণ্ড সহর;—সহরের জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ—দেশীয়দিগের তুলনায় য়ুরোপীয়দিগের সংখ্যা অতি সামান্য। এখন শীতকাল, কিন্তু আকাশে আমাদিগের দেশের জুন মাসের আকাশের মত শোভা; বৃক্ষরাজিও সেই সময়োপযোগী পত্রপল্লবশোভাসমন্বিত। সম্মুখে ঘনচ্ছায় তরুতলে সমুজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্যময়বেশধারী দেশীয় নরনারীগণ উপবিষ্ট। যানাদিতেও সেই শোভা। এই সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিয়া কিছুতেই ক্লান্তি বোধ হয় না। বাজারে দেশীয়গণের জনতা; পরিধেয়বস্ত্রের ও সৌধমালার বর্ণবৈচিত্র্য অনির্ব্বচনীয়। সে শোভা প্রাচীন ভারতের প্রণালীতে গঠিত বাজারেরই উপযোগী। আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন বায়ুসেবনের সময় উপস্থিত হয়,তখন আর এক প্রকার দৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। * * * এই সময় স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমজীবিগণ দলে দলে গৃহাভিমুখে গমন করিতে থাকে। পুরুষের পরিধানে সামান্য একখণ্ড বস্ত্র—কেবল তাহাই কোমরে বেষ্টিত।—তাহাদের গঠন অতি সুন্দর, বর্ণ পাটল, চর্ম্ম সাটিনের ন্যায় চিক্কণ ও উজ্জ্বল। রমণীরা তন্বী, তাহাদের দেহযষ্টি সুগঠিত—সরল, একখানি সমুজ্জ্বলবর্ণ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত। তাহাদের হস্তে, পদে ও নাসিকায় সামান্য কিছু অলঙ্কার। তাহাদিগের গঠন সরল, চলন গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক;—সেই এক দৃশ্য!

দেশীয়গণের প্রতি য়ুরোপীয়গণের কুব্যবহার দেখিয়া আমেরিকার ক্রীতদাসগণের প্রতি কুব্যবহারের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।—

ভারতবর্ষীয়গণ স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি ও কোমলভাবাপন্ন। তাহাদিগের ব্যবহারেই তাহাদিগের প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়। আমাদিগের ঘরের বারান্দায় একটি সুবৃহৎ কাচের দ্বার ছিল। সেই দ্বারে একটা কি করা আবশ্যক হইয়াছিল। সেই জন্য একজন শ্রমজীবী আহূত হইল। দেখিয়া বোধ হইল, সে ভাল করিয়াই কাজ করিতেছিল; কিন্তু হয় ত সে ভাল করিতেছিল না, কারণ (হোটেলের) সেই বিশালকায় জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীটি কোন দোষ না দেখাইয়া, তাহার গণ্ডদেশে একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল,—পরে তাহার দোষ দেখাইয়া দিল। আমাদের সকলের সম্মুখে এরূপ আচরণ বিশেষ লজ্জাকর বলিয়া মনে হইল। সেই দেশীয় লোকটি এই ব্যবহার ধীরভাবে সহ্য করিল। আমি পঞ্চাশ বৎসর এরূপ দৃশ্য দেখি নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া নিজের বাল্যজীবনের কথা আমার মনে পড়িল; আর মনে পড়িল যে—তখন এইরূপ করিয়াই ক্রীতদাসদিগের নিকট মনোভাব বিজ্ঞাপিত হইত। জন্মাবধি সেই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া তখন তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া আমার মনে হইত, এবং সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি যে অন্য কোনরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতাম না; কিন্তু তথাপি তখন এইরূপ ব্যবহারে সেই হতভাগ্যগণের প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হইত, আর সেই শাস্তিদাতার জন্য আমি লজ্জা বোধ করিতাম।

ভারতবর্ষের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মার্কটোয়েন বলিয়াছেন,—

এই দেশ * * * মানবজাতির শৈশবাবস্থার ক্রীড়াভূমি, ভাষার উৎপত্তিস্থল, ইতিহাসের জন্মভূমি, whose yesterdays bear date with the mouldering antiquities of the rest of the nations. কেবল এই দেশই ভিন্নদেশীয় নৃপতি বা কৃষক, পণ্ডিত বা মূর্খ, ধনী বা নির্ধন, সকলের পক্ষেই সমান আকর্ষক। একবার সামান্যরূপে এই দেশ দেখার সহিত পৃথিবীর অন্য সকল স্থান দেখাও সমান নহে।

ভারতে ভৃত্যের মাসিক বেতন সাধারণতঃ সাত টাকা, কৃষাণের মাসিক বেতন সাধারণতঃ চারি টাকা মাত্র। এই কথার উল্লেখ করিতে গিয়া মার্কটোয়েন বলিয়াছেন যে, কয়েক জন দেশীয় ভদ্রলোক মধ্যভারতের চিফ-কমিশনারের নিকট ভারতের দারিদ্র্যের কথা বলায়,তিনি তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে কৃষাণের বেতন মাসে আট আনা মাত্র ছিল। লেখক এই উপলক্ষে তৎকালীন ও বর্ত্তমান সময়ের খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য ও করভারের তুলনা করিয়া দেখাইলে বিদেশীয় পাঠকগণ ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের বিষয় বুঝিতে পারিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষ নগরপ্রধান দেশ নহে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে নগর নাই বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের এই বিশাল জনসমবায় প্রধানতঃ কৃষিজীবী। সমস্ত ভারতবর্ষ একটি প্রকাণ্ড

কৃষিক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন—ভারতের দারিদ্র্য কি বিশাল।

অন্যত্র গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

ভারত অদ্বিতীয়—ইহার তুলনা সম্ভবে না। বিশাল ব্যাপার কেবল ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। যখন অন্য কোন দেশে কোন বিষয়ে বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়, তখন অপর কোনও দেশে যে সেই বিষয়ে সেইরূপ বিশেষত্ব দৃষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহের আর কোন কারণ থাকে না। কিন্তু ভারতসম্বন্ধে ব্যাপার স্বতন্ত্র। * * *

মহামারী ভারতেই উৎপন্ন। ভারতবর্ষই ইহার রাজ্য,—লীলাভূমি।

সতীদাহও ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পত্তি। বৎসরে আট শত বিধবা স্বেচ্ছায়—সানন্দে স্বামীর মৃতদেহের সহিত চিতানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এ দৃশ্য দেখিয়াছে, এমন লোক আজও জীবিত আছে। ইংরাজ-রাজ বাধা না দিলে এখনও বৎসরে আট শত বিধবা স্বামীর চিতায় দেহদাহ করে।

দুর্ভিক্ষই ভারতবর্ষের প্রধান বিশেষত্ব। অন্যত্র দুর্ভিক্ষ সামান্য ব্যাপার,—ভারতে তাহা বিষম ব্যাপার। অন্যত্র দুর্ভিক্ষে শত শত লোকের মৃত্যু হয়; ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের ধ্বংস-লোলুপ শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করে।

ভারতবর্ষে বিংশতি লক্ষ দেবতা—সকলেই উপাসিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্য সকল দেশ দেউলিয়া, কেবল ভারতবর্ষই ক্রোরপতি।

ভারতে সকলই বিশাল। দারিদ্র্যবিষয়েও অন্য কোনও দেশ ভারতের সহিত তুলনীয় নহে। এক সময়ে তাহার ধনও তেমনই অসাধারণ অধিক ছিল। তাহার বহু-অর্থ-জ্ঞাপক শব্দগুলি এক এক কথায় সমাপ্ত। আমরা বলি—এক শত হাজার, ভারতে বলে—লক্ষ; আমরা বলি—দশ মিলিয়ন, ভারতে বলে—ক্রোর।

কি অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারেই ভারতবর্ষীয়গণ সুকঠিন শৈলাভ্যন্তরে মহামন্দিরমালা ক্ষোদিত করিয়াছে; আবার তাহাতে কত মূর্ত্তি, কত স্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়াছে, আর সেই সকল চিরস্থায়ী প্রাচীর কত চিত্তাকর্ষক চিত্রে সুশোভিত করিয়াছে! তাহারা যে সকল দুর্গের নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে সকলের তুলনায় অন্যান্য জাতির প্রধান প্রধান দুর্গও অতি ক্ষুদ্র। মূল্যবান গঠনোপকরণে, শিল্পচাতুরীতে ও সৌন্দর্য্যে, তাহাদের প্রাসাদমালার তুলনা নাই। তাহাদের নির্ম্মিত একটি সমাধিস্তম্ভ দেখিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে লোক আইসে। ভারতবর্ষে আশীটি বিভিন্ন জাতি—আশীটি বিভিন্ন ভাষা।

জাতিভেদও ভারতবর্ষের বিশেষত্ব,—আর ভারতবর্ষের বিশেষত্ব—ঠগী-সম্প্রদায়।

আদিতে ভারতবর্ষই সর্ব্ব দেশের অপেক্ষা অধিক উন্নতিশীল ছিল। এখানে সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়, এখানেই পার্থিব ধনের প্রথম সঞ্চয়, এখানেই গভীর দার্শনিকগণের ও কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিতগণের প্রথম আবির্ভাব। এই দেশের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকাই উচিত ছিল। ধীরভাবে বিদেশীয়ের অধীন না থাকিয়া,আজ ভারতেরই সর্ব্বদেশের অধিকারী ও নিয়ন্তা হইবার কথা। কিন্তু এই জাতিভেদের দেশে—এই ভাষাভেদের দেশে, তাহা সম্ভবপর নহে। দেশের এরূপ অবস্থায় দেশহিতৈষণা প্রবৃত্তি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না।

বরদায় য়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত নূতন প্রাসাদ দেখিয়া গ্রন্থকার বড় দুঃখে বলিয়াছেন,—বহুমূল্যত্ব ব্যতীত ইহার আর কোনও গুণ নাই। ইহার পর পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—ঠগীনিবারণের এই এক বিষময় ফল; ঠগী থাকিলে, বোধ হয়, এই প্রাসাদনির্ম্মাতা নিস্তার পাইত না!

গ্রন্থকার যখন এলাহাবাদে উপনীত হয়েন, তখন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে মাঘ-মেলা। সেই বিশাল জনসমুদ্র দেখিয়া গ্রন্থকার বিস্মিত হইয়াছিলেন।—

স্ত্রী ও পুরুষ তীর্থযাত্রীতে পথ পূর্ণ। কারণ,এখন এখানে একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমেলা হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশ হইতে যাত্রিদল সমাগত হইতেছে। কত জন কত মাস ধরিয়া ক্ষুধা,তৃষ্ণা, ধূলি, রৌদ্র, সকল সহ্য করিয়া, ক্লান্তিক্লিষ্ট হইয়া কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসের উত্তেজনায় এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। তাহারা এখন সুখী ও সন্তুষ্ট, পথকষ্টের কথা আর তাহাদের মনে নাই;—কারণ, পুরস্কার সন্নিহিত; কারণ, তাহাদের ধ্রুববিশ্বাস যে, এখানে—এই পূতসলিলে স্নান করিলে তাহাদের সকল কল্মষকালিমা বিধৌত হইয়া যাইবে, তাহারা পবিত্র হইবে। যে ধর্ম্মবিশ্বাসে বৃদ্ধ ও যুবা, সুস্থকায় ও রোগী—লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দচিত্তে এই অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে, সে বিশ্বাস কি প্রবল! ভয়েই হউক আর ভক্তিতেই হউক, ভারতবাসীরা এই কার্য্য করে। আমরা শ্বেতকায়গণ এ কষ্টের কথা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু এই দেশীয়গণের সহিত আমাদের অবশিষ্টাংশের তুলনা করা যায় না। তথাপি আমরা স্বার্থত্যাগের কথা বলি। আশা করি, আমরা এইটুকু বড় যে, আমরা হিন্দুদিগের এই স্বার্থত্যাগের সম্মান করিতে পারি।

বর্ষে বর্ষে এখানে বিংশতি লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। আর কত লোক যে যাত্রা করিয়া জরাভারে, পথকষ্টে, পীড়ায়, উপযুক্ত আহারাভাবে পথে প্রাণত্যাগ করে, কেহ তাহার তালিকা রাখে না। আবার কত জন যে গৃহে ফিরিয়া এই সকল কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাও কেহ জানে না। এই এক বিশাল কাণ্ড!

এলাহাবাদ হইয়া গ্রন্থকার বারাণসীতে গমন করেন। সেখানে হিন্দু-ধর্ম্মের জ্বলন্ত প্রভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন।—

বারাণসী দেখিয়া কাহাকেও হতাশ হইতে হয় না। বারাণসী দেখিবার উপযোগী বটে। গঙ্গার একটা বড় বাঁকে, উচ্চভূমিতে কাশী সংস্থাপিত। সেই উচ্চভূমি গৃহে পরিপূর্ণ। সেই গৃহপূর্ণ সহরে সঙ্কীর্ণ পথগুলি যেন নিরবচ্ছিন্ন অট্টালিকা-মালার মধ্যে ফাটল বলিয়া মনে হয়। মধ্যে মধ্যে মন্দিরচূড়াগুলি দৃশ্য আরও সুন্দর করিয়া তুলে। সেই সঙ্কীর্ণ রাজপথে অবিরাম জনস্রোত দেখিলে পিপীলিকাশ্রেণীর কথা মনে পড়ে। সেই সঙ্কীর্ণ পথে এক বিষম উৎপাত—গাভী। এই পবিত্র জীবকে কেহই তাড়না করে না, কাজেই তাহার জন্য পথে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বারাণসী ঐতিহাসিক যুগ অপেক্ষাও সুপ্রাচীন—উপকথা ও কিম্বদন্তী অপেক্ষাও পুরাতন।

হিন্দুর মতে, এখানেই জগৎসৃষ্টির আরম্ভ ;—অনন্ত-সমুদ্রে এখানেই বিষ্ণু 'একলিঙ্গম্' প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহারই চতুর্দ্দিকে দশ মাইল বিস্তার। ইহাই পঞ্চক্রোশী কাশী। তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, চারি দিকে এই জগতের সৃষ্টি। কাজেই বারাণসী জগতের কেন্দ্র।

বারাণসীর ইতিহাস ও ধর্ম্মেতিহাস বড়ই গোলযোগময়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে প্রথম হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়। তাহার পর ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়,—সে প্রভাব বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর আবার হিন্দুধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। হিন্দুর চক্ষে বারাণসী অতি পবিত্র। বারাণসী যেমন পবিত্র, তেমনই অস্বাস্থ্যকর। বারাণসী ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রধান স্থান, ইহার জনসংখ্যার অষ্টমাংশ পুরোহিত। কিন্তু পরিমাণে ইহা অধিক নহে ;—কারণ, সমস্ত ভারতবর্ষের উপর ইহাদিগের আধিপত্য। * * * বোম্বাই নগরে অবস্থানকালে আমি শুনিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে ৬৪০ জন 'প্রোটেষ্টাণ্ট' ধর্ম্মযাজক আছেন। এই সংখ্যা প্রথমে অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু বিবেচনা করিলে মনে হয়, এ কথা ভ্রমমাত্র। হিসাবে ৫০০০০০ জন ভারতবাসীর জন্য একজন ধর্ম্মযাজক। যেন ৩০০০০০০০০০ জন সৈন্যে পূর্ণ দৃঢ় দুর্গের বিরুদ্ধে ৬৪০ জন মাত্র সৈনিক! এক বারাণসীতে ৮০০০ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের বিরুদ্ধে কার্য্য করাই এই ৬৪০ জন ধর্ম্মযাজকের পক্ষে সুকঠিন! ধর্ম্মযাজকদিগের আশা ও বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের এই গুণ দেখা যায়। বারাণসীতে মিষ্টার পার্কারেরও এ গুণ আছে। তাই যেখানে অপরে আশার কোন কারণ দেখিতে পায় না, সেখানেই তিনি আশার আলোকরেখা দেখিয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতেই নমুনা দেখুন ;—তিনি প্রথমে বলিতেছেন,—অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে বিগত কয় বৎসর ধরিয়া বারাণসীতে যাত্রিসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহার পর তিনি বলিতেছেন,—এই পুনরুত্থান মরণের পূর্ব্বাভাষমাত্র ; ইহা পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বলক্ষণ শরীরিক 'আক্ষেপ'-মাত্র।

আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ভাবেই 'রোমান ক্যাথলিক' ধর্ম্মের আসন্নমৃত্যুসংবাদ পাইতেছি। বহুবার আমরা তাহার সৎকারার্থ প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই সে সৎকার স্থগিত করা হইয়াছে—হয় ত আকাশ পরিষ্কার ছিল না, নয় ত সেইরূপ আর কোনও কারণ উপস্থিত হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত শববাহীরা সৎকারভূমির দিকে অগ্রসর না হয়, ততক্ষণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। জগতে কোনও ধর্ম্মের মৃত্যু বড়ই অনিশ্চিত। * * *

মিষ্টার পার্কার বলেন যে, কাশীর প্রতি ধার্ম্মিক হিন্দুর ভক্তির ও ভালবাসার উপযুক্ত আভাষ দেওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি হিন্দুর এই ভক্তির সমুজ্জ্বল, প্রাণস্পর্শী, জ্বলন্ত চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখনই কোন হিন্দু সিপাহী দল বারাণসীর নিকট দিয়া যায়, তখন এই পবিত্র ক্ষেত্রের সীমায় পদার্পণ করিবামাত্র তাহারা 'কাশীজিকি জয়! জয়!—জয়!' রবে গগনমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলে। বার্দ্ধক্যে ও দৌর্ব্বল্যে প্রায় চলৎশক্তিরহিত, উত্তাপে ও ধূলিবাহুল্যে প্রায় অন্ধ, পথশ্রমে মৃতপ্রায় যাত্রী, অতিকষ্টে কোনরূপে উত্তপ্ত রেলওয়ে-শকট হইতে অবতরণ করিয়া, বারাণসীর পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র স্বীয়

শীর্ণ বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া 'কাশীজি কি জয়!' রব করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যখনই কোন য়ুরোপীয় কথাপ্রসঙ্গে ভারতবাসীদিগের নিকট বলেন যে, তিনি বারাণসীতে ছিলেন, তখনই লোকে তাঁহার জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে ; কারণ, বারাণসীবাসীরা ঈশ্বরানুগৃহীত।

ধর্ম্মবিশ্বাস যখন যুক্তি বা তর্কের বিষয় নহে, পরন্তু কেবল ভক্তির বিষয়, তখন মিষ্টার পার্কারের প্রদত্ত এই চিত্রে মনে হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের মৃত্যু এখন অনিশ্চিত কালের জন্য স্থগিত রহিল।

গ্রন্থকার বারাণসীতে ড্রেণের ময়লায় ও শবদেহে জাহ্নবীসলিল অপরিষ্কৃত হইতে দেখিয়াছিলেন। সেই বিষয় লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

যখন আমরা আগ্রায় যাই, তখন এক অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। এই অপরিষ্কার গঙ্গাজল যে সর্ব্বোত্তম পরিষ্কারক,তাহাই তখন আবিষ্কৃত হয়। বহুদিন হইতে দেখা যায় যে, যদিও মধ্যে মধ্যে বারাণসীতে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হয়, তথাপি সে পীড়া কখনই অন্যত্র হইতে নীত হয় নাই। পূর্ব্বে কখনও ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গভর্মেণ্টের অধীন বিজ্ঞানবিদ্ মিষ্টার হ্যান্‌কিন গঙ্গাজল-পরীক্ষার জন্য বারাণসীতে গিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। স্নানের ঘাটের নিকটে ড্রেনের মুখ হইতে জল লইয়া তিনি দেখিলেন,—জল লক্ষ লক্ষ বিসূচিকামূল জীবাণুপূর্ণ। কিন্তু ছয় ঘণ্টা পরে দৃষ্ট হইল যে,সেই সকল জীবাণু মরিয়া গিয়াছে! তাহার পর তিনি একটি ভাসমান শব কূলের নিকটে আনিয়া তৎপার্শ্ব হইতে জল সংগ্রহ করিলেন,—সে জল বিসূচিকামূল জীবাণুপূর্ণ ; কিন্তু ছয় ঘণ্টা পরে দৃষ্ট হইল—সে গুলিও মৃত! তিনি এই জলে বহু বিসূচিকামূল জীবাণু যোগ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ফল একই। ছয় ঘণ্টা পরে তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার পর মিষ্টার হ্যানকিন কোন-প্রকার-জীবাণুশূন্য কূপোদক গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিসূচিকাবীজ দিতে লাগিলেন ; এবার ছয় ঘণ্টার মধ্যে জল জীবাণুতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।*

কত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ এই গঙ্গোদক পবিত্রজ্ঞানে ইহাতে অগাধভক্তি সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, ইহা কোনও প্রকারেই অপবিত্র হইতে পারে না, পরন্তু ইহা সর্ব্বশুচিকর। এই বিশ্বাসেই তাহারা ভাসমান শব ও দৃশ্যতঃ ময়লাপূর্ণ জলও দ্বিধাশূন্য হইয়া স্নানার্থ ও পানার্থ ব্যবহার করে। এই জন্য হিন্দুগণ এতদিন উপহসিত হইয়াছে ; কিন্তু এখন পরিহাসের পাত্রপরিবর্ত্তন আবশ্যক। সেই পুরাকালে তাহারা কেমন করিয়া এই জলের পাবনী শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিল? তখন কি এ দেশে জীবাণুবিদ্ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল? তাহা জানি না ; তবে এইমাত্র জানি যে, আমাদের অসভ্যাবস্থা দূর হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহারা সুসভ্য ছিল। ক্রমশঃ।

* এ বিষয়ে আমরা মিষ্টার হ্যানকিন্‌কে পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার Cholera in Indian Cantonments ও The Prevention and Cause of Cholera পুস্তিকাদ্বয়ে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। অগ্রহায়ণ। "মণি-হারা" একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তু বৈচিত্র্যবিহীন, কিন্তু রচনাগুণে গল্পটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। যে মাষ্টারের মুখে লেখক গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন, সে চরিত্রটির সঙ্গে মূল গল্পসূত্রের সম্বন্ধমাত্র নাই; সে ব্যক্তি গল্পের কথকমাত্র—বরং তাহাকে দুনিয়ার স্বয়ংসিদ্ধ বিরূপ সমালোচক বলা যায়। সংসার-রঙ্গভূমির ভাবের দিকটা মাষ্টারের সম্পূর্ণ অগোচর, তাহার মতে সে ভাগটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, এবং নিতান্ত খেয়ালি লোকের ও মেয়েদের একচেটিয়া। নিতান্ত সোজাসুজি ব্যাপার ও তাহার সহজ মীমাংসা ভিন্ন আর কিছু এই বিরাগতিক্ত নীরস লোকটির বিচারে সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। চরিত্রটি যদিও সচরাচর বিরল নহে, তথাপি তাহার এই চিত্রখানি নূতন বলিয়া মনে হয়। তাহার টীকা টিপ্পনী, মন্তব্য, অযাচিত উপদেশ, বিবিধ সমস্যার উদ্ভট মীমাংসা অদ্ভুত বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হয় না। গল্পের এই অবান্তর চরিত্রটির রেখাচিত্রে লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও যথাযথ অঙ্কননিপুণতার প্রভূত পরিচয় আছে। ভাবপ্রবণ ফণিভূষণ ও তাহার পাষাণপ্রতিমা পত্নী, দুই জনের চরিত্র পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। এই দুই বিরুদ্ধ চরিত্রের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে গল্পটি যেমন জমিতে পারিত, এ ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। কিন্তু মাষ্টারের তীব্র শ্লেষে, অদ্ভুত বিচারে সে অভাব বুঝিতে পারা যায় না। গল্পের ভাষা অনেক স্থলে লেখক টানিয়া বুনিয়াছেন,— শিরোবেষ্টনপুরঃসর নাসিকা-প্রদর্শন আজকাল গদ্যভাষার একটা 'আর্ট' বলিয়া অনেকের সংস্কার, কিন্তু তাহাতে গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব কি না, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক, সে বিচারের এ স্থল নহে।—কিন্তু লেখকের উপমা-কৌশল অতি সুন্দর, উপভোগের উপযুক্ত।—শুধু সৌন্দর্য্যের বিকাশ নহে, তদ্দ্বারা লেখক স্বীয় বক্তব্য সহজে ও অনায়াসে সুপ্রকাশিত ও সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। "প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও আলোচ্য। লেখক মুখবন্ধ করিতেছেন,—"কিছুদিন হইল বোম্বে নগরীর নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয় হইতে নাট্যশাস্ত্র নামে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শোনা যায় নাট্যশাস্ত্র ইয়োরোপীয় কাব্যানুরাগী কোবিদগণের যথেষ্ট প্রীতি ও সমধিক সমাদর আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে; এই শুভযোগে আমরাও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন নাট্যবিদ্যার অতীত গুণগরিমা স্মরণ করিয়া কতকটা সান্ত্বনা এবং গৌরব অনুভব করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।" তথাস্তু। এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত হইলে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাসের এক অংশ উপকৃত হইবে। "বিদ্যাসাগর" প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুরচিত। লেখকের মতে, বিদ্যাসাগর "গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন।" লেখক দুঃখ করিয়াছেন,—"বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল কেহ ছিল না!"

ভানুমতী।

সুন্দর বৈশাখ মাস, সুন্দর সুনীলাকাশ,
কি সুন্দর বহিছে মলয়,—
শান্ত সুশীতল!
কি সুন্দর শৈলশোভা তরঙ্গিত মনোলোভা,
উপত্যকা তরুশোভাময়,—
সুন্দর শ্যামল!
সুন্দর বৈশাখ মাসে, সুন্দর জ্যোৎস্না হাসে
নীলাকাশে শ্যামল ধরায়,—
কি হাসি সুন্দর!
যুবতী পার্ব্বতী সতী হাসিতেছে পুণ্যবতী,
সরলার হাসি নিরমল,—
প্রাণ স্নিগ্ধকর।
সে যূথিকা হাসি মাখি শোভিতেছে কর্ণফুলী
পার্ব্বতীর পদপ্রান্তে,
মালা মালতীর।
পার্ব্বতীর প্রেমধারা পুণ্যবতী স্রোতস্বতী
কি তরল সুধা নিরমল,—
কি শান্ত গভীর!

অনাথনাথ ও ভানুমতী অট্টালিকার ছাদে বসিয়া প্রকৃতির এই বৈশাখী ফুল্লচন্দ্রিকামণ্ডিতা শোভা দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির এই লীলাভূমির শীর্ষ-স্থানে বসিয়া যে এই শোভা দেখে নাই, কবির সাধ্য নাই, চিত্রকরের সাধ্য নাই, তাহাকে উহা বুঝাইবে। গিরিপাদমূলে, নদীর উভয় কূলে, গ্রামগুলি এক একটি বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবনের মত শোভা পাইতেছে। বৃক্ষঅন্তরালে গ্রামের প্রদীপাবলী জ্যোৎস্নায় ক্ষীণালোক হইয়া প্রস্ফুটিত মালতীপুষ্পের মত শোভা পাইতেছে। পল্লবে, গুল্মে ও তৃণে সমাবৃতা পার্ব্বত্য ও সমতল ভূমি জ্যোৎস্নালোকে কি মনোহর শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে! এই শ্যাম-

ক্ষেত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কর্ণফুলীর কি নয়নানন্দকর বাঙ্কমগতি! শ্যামার ও শ্বেতভুজার এই আলিঙ্গনে পরস্পরের সৌন্দর্য্য কত বর্দ্ধিত হইয়াছে! গিরি-শেখরে অনাথনাথের মনোহর পুরীর অট্টালিকা ও উদ্যান চন্দ্রকরে খণ্ড-ত্রিদিবের মত বোধ হইতেছিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, গুল্মে গুল্মে, পূর্ণ বসন্তের প্রস্ফুটিত ফুলরাশির সেই কৌমুদীপ্রোদ্ভাসিত শোভা কল্পনাতুর্ল্লভ। অট্টালিকার ছাদ ও টবের নানাজাতীয় ক্রোটন, ফুল ও লতার মনোহর উদ্যান ও নিকুঞ্জ স্থানে স্থানে নানা অবয়বের ছায়া নিক্ষেপ করিয়া জ্যোৎস্নায় একটি স্বপ্নদৃষ্ট শোভার বিকাশ করিতেছে। নিম্নে নাগেশ্বরের উপবন হইতে মহামুনির মন্দিরের চূড়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মানবকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইতেছে; যেন বলিয়া দিতেছে যে, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা মানব-হৃদয় তাহার মত জ্যোৎস্না-বিধৌত শ্বেতকান্তি ধারণ করিলে তবে নির্ব্বাণের দিকে উত্থিত হইতে পারে।

অনাথনাথ একখানি 'লাউঞ্জ চেয়ারে' এবং ভানুমতী তাঁহার পদতলে আরক্তমকমলমণ্ডিত 'ফুটষ্টুলে' বসিয়া স্থিরচিত্তে এই শৈলকিরীটিনী, সরিৎ-মালিনী, জ্যোৎস্নাহাসিনী প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন। যদিও বিগত ঝটিকায় এই শোভা অনেক বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি উহা অতুলনীয়। উভয়ের মুখ প্রশান্ত; অধরে প্রীতির হাসি। প্রকৃতির প্রশান্ত প্রীতিময়ী জ্যোৎস্না যেন তাঁহাদের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া সেই ঝটিকার বিষাদচ্ছায়া কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়াছে।

কিছু ক্ষণ স্থিরনয়নে এই শোভা দেখিয়া এবং উভয়ে উহার আলোচনা করিয়া অনাথনাথ বলিলেন,—"মা! আমি স্থির করিয়াছি, তোকে আমার কন্যারূপে গ্রহণ করিব।"

ভা। বাবা! তুমি ত সেই ঝড়ের দিন হইতেই আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছ।

অ। শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিব।

ভা। সে কি বাবা! বেদের মেয়েকে কি ব্রাহ্মণে শাস্ত্রমত গ্রহণ করিতে পারে?

অ। পারে। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিব। তুমি বেদের মেয়ে নও, বৈরাগীর মেয়ে। সকলে বলিতেছে, তুমি কোনও শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। এত রূপ, এত গুণ, এরূপ

চরিত্র, বেদের মেয়ের হইতে পারে না। আমাদের পুণ্যশ্লোক শাস্ত্রকারেরা শ্রীভগবানের একটি মধুর নাম রাখিয়াছেন—পতিতপাবন। তিনি ঘোরতর পাপীকেও পবিত্র করিয়া মুক্ত করেন। তখন, অবস্থাক্রমে যাহারা সামাজিক ভাষায় জাতিভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পতিত করিয়া রাখা আমাদের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই নির্ম্মম বিদ্বেষমূলক অধর্ম্মে আজ ভারতের কত হিন্দু মুসলমান হইয়া হিন্দুসমাজকে কেবল যে দুর্ব্বল করিয়াছে, এমন নহে; উহারা মহাশত্রু হইয়া সোনার ভারতকে জাতীয় বিদ্বেষে উচ্ছিন্ন করিতেছে। হিন্দু সমাজের এই জড়ত্বহেতু অনেক পূজনীয় ব্যক্তিকে শিক্ষার্থ বিলাত গিয়া-ছিলেন বলিয়া আমরা হারাইতেছি। বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশে এইরূপ সমাজচ্যুতকে শুদ্ধ করিয়া সমাজে লইবার জন্য "শুদ্ধিসভা" স্থাপিত হইয়াছে। মাড়ওয়ারীরাও এইরূপ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও দুই এক জন শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি এইরূপে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

ভা। সে কি বাবা! হিন্দু খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, দেশদেশান্তরে যাউক, সে আবার হিন্দু হইতে পারিবে?

অ। কেন পারিবে না? হিন্দু শব্দ আমাদের কোনও শাস্ত্রে কি অভি-ধানে নাই। শুনিয়াছি, যবনদের সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভারত-জয় হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না। ইংরাজেরাও পারেন না। তাহারা সিন্ধু নদকে হিন্দু নদ বলিত। তৎপ্রদেশবাসীদিগকে হিন্দু বলিত। সেই হইতে এ দেশের নাম হিন্দুস্থান ও আমাদের ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম। যাহা হউক, এই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি কি? এই ভারতের আসমুদ্রগিরি, আচটুল গান্ধার যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস এক নহে, আচার এক নহে, আহার এক নহে, পরিচ্ছদ এক নহে, আকৃতি এক নহে, ভাষা এক নহে। অথচ সকলেই হিন্দু। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। নিরীশ্বর সাংখ্য ও চার্ব্বাকও হিন্দু। দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। আমাদের যোগী সন্ন্যাসীরা কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না, অথচ তাঁহারা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। বঙ্গদেশে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির পূজা আছে, ভারতের অন্যত্র তাহা প্রায় নাই বলিলেও চলে। বেদান্তের ঈশ্বর নির্গুণ, নিরাকার;—বৈদান্তিকেরাও হিন্দু। পুরাণ ও তন্ত্রের ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। পৌরাণিকেরা ও তান্ত্রিকেরাও হিন্দু। আচার হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে,—ভারতের নানা দেশে নানা আচার।

পরিচ্ছদও তদ্রূপ। আহার হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। ঘোরতর মদ্যমাংসাশীও হিন্দু, এবং মদ্যমাংসবিদ্বেষী নিরামিষাহারীও হিন্দু। তবে হিন্দুধর্ম্মের মূল কি? এই বিস্তীর্ণ ভারতব্যাপী হিন্দুদের মধ্যে কি সাধারণ কিছু নাই? যদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয় উহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের তিনটি সাধারণ সম্পত্তি আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, এবং ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াপদ্ধতি সহ দশকর্ম্মপদ্ধতি ও বর্ণ-ভেদ। কি বঙ্গে, কি তৈলঙ্গে, কি মহারাষ্ট্রে, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া পূজিত। সর্ব্বত্র কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলের দ্বারা শ্রীগীতা অধীত ও পূজিত; সর্ব্বত্র উক্ত পদ্ধতি অনুসারে অল্পাধিকপরিমাণে সমাজ পরিচালিত। তবেই বোধ হইতেছে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীগীতা, এবং সামাজিক তত্ত্বের মূল উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণানুসারে কর্ম্ম করিয়া সমাজসংরক্ষণ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মানুসারে তিনি চারি বর্ণ বিভক্ত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ণ জন্মগত করিলে গুণ ও কর্ম্মের পুরুষানুক্রমে আরও উন্নতি সাধিত হইবে। ফলে তাহাই হয়। একটি দ্বাদশবর্ষীয় তাঁতীর ছেলে যেরূপ বুনিবে, এক জন মহা-পণ্ডিত দশ বৎসর শিক্ষা করিয়াও তাহা পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বুঝেন নাই যে, তাহার পরিণাম এই হইবে যে, ব্রাহ্মণের পুত্র মহামূর্খ ও ঘোরতর পাপী হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে। বর্ণ এইরূপে জন্মগত হইয়া গুণ ও কর্ম্মের ভিত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই একবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাম্যবাদে হিন্দুসমাজ এরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, আবার সেই বর্ণাশ্রমমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। তাহা হইলেও উহার যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে, সমাজ বন্ধনহীন হইয়া আরও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে। সমাজের কিছু একটা বন্ধন চাই। উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমের তুল্য এমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বন্ধন আর কি হইতে পারে? অতএব হিন্দু কেহ খৃষ্টান হইয়া, মুসলমান হইয়া, কি দেশান্তরে গিয়া যদি (প্রচলিত কথায়) জাতি-ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, হিন্দুধর্ম্মের এই তিনটি মূলনীতি অবলম্বন করিলে সে হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইবে।

ভা। তাহার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক নহে?

অ। আমি এ কথা এক দিন নরনারায়ণ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা-

শয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই প্রকার পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক পাপ ও সামাজিক পাপ। বিদ্যাশিক্ষার্থ কি কোন সৎকর্ম্মার্থ বিলাত কি দেশান্তরে যাওয়া আধ্যাত্মিক পাপ নহে। তবে সামাজিক রীতিনীতির লঙ্ঘনের জন্যে সামাজিক পাপ হইতে পারে। কিন্তু এক জন বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যখন তাহাকে পদে পদে সেই রীতিনীতির লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করা ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করা বই নহে। আর দেশে থাকিয়াই কোন্ হিন্দু ইংরাজ মুসলমানকে স্পর্শ করিতেছে না? যাহা ১০ বৎসর পূর্ব্বে অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ তাহা খাইতেছে না কে? যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে খাইতেছে, কই তাহারা ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে না? আর যাহারা বিলাত কি অন্য দেশে যাইতেছে, তাহারা অবস্থার বাধ্য হইয়া খাইতেছে, তবে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন?

ভা। কিন্তু বাবা! আমাকে সেরূপে গ্রহণ করিয়া কি করিবে?

অ। তোমাকে আমার উত্তরাধিকারিণী করিব, এবং বিবাহ দিয়া আমার শ্মশানসদৃশ এই পুরীতে অধিষ্ঠিত করিব।

ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। সে মাথা হেঁট করিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জাবনতমুখে বলিল,—"তাহা হইলেই বা কি হইবে?"

অ। তুমি সুখী হইবে; আমি সুখী হইব।

ভা। সুখ কি বাবা? একটি কবিতায় পড়িয়াছি,—

সুখ যাহা বল কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ পেয়েছে কখন?
আকাশকুসুম, মুকুতার লতা,
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম!
ওই আকাশের নীলিমার মত
দুঃখই জীবনের স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বল বিদ্যুৎ মতন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার!

আহা! অভাগিনী অনাথিনী বালিকা এককালে সুখ কি তাহা জানে না,—প্রশ্ন শুনিয়া অনাথনাথের এ কথা মনে পড়িল। তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি একবার তাহার মুখের দিকে দেখিলেন—কিন্তু কই, তাহাতে

ত সেরূপ কোনও ভাব নাই। সে স্থির গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে জ্যোৎস্না-প্রোদ্ভাসিত নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারও মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিতের ভাব ধারণ করিল। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—বড় কঠিন প্রশ্ন। তবে ইহা বুঝিয়াছি, সুখ পদে নহে, সম্পদে নহে; গৌরবে নহে, বিভবে নহে; ধনে নহে, জনে নহে। পদে পদের আকাঙ্ক্ষা, সম্পদে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে মাত্র। ক্ষণিক তৃপ্তির পর অতৃপ্তি বাড়ে মাত্র। সেকেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন! আজ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অবস্থাও তাই। ইহারা রাজ্য রাজ্য করিয়া আকুল! কই, রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে, বিভবে তৃপ্ত হইয়াছে,—সুখী হইয়াছে, এ কথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই।

ভা। আমার বৈরাগী পিতা বলিতেন, কেবল ধর্ম্মেই সুখ।

অ। তোমার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বড় বিচক্ষণ লোক ও এক জন পরম সাধু ছিলেন। ধর্ম্মই সুখের একমাত্র পথ। ইহার দ্বিতীয় পথ নাই। থাকিবার কথাও নহে। আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর পক্ষীর পক্ষিত্ব, পশুর পশুত্ব নির্ভর করিতেছে। এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ। যে নীতিবলে তাহাদের এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, সে সকল নীতি তাহাদের পক্ষিত্ব ও পশুত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের পক্ষিধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম। তদ্রূপ যে সকল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর মানবের মানবত্ব নির্ভর করে, তাহাদের চরিতার্থতাই মানব-সুখ। এবং যে নীতিমালায় ইহাদের চরিতার্থতা ধারণ করে, অর্থাৎ যাহাদের উপর ইহাদের চরিতার্থতা নির্ভর করে, সেই নীতিমালাই মানব-ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মই একমাত্র সুখের পথ।

ভা। গুরুদেব বলিতেন, ব্রজলীলার মত ধর্ম্মশিক্ষার এমন সহজ ও মধুর উপায় আর নাই। তিনি অনেক ব্রাহ্ম ও ইংরাজীওয়ালা বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিতেন। আমি কাছে বসিয়া শুনিতাম। বাবুরা কৃষ্ণের বড়ই নিন্দা করিতেন।

অ। আমিও করিতাম। একদিন একটি ঘটনায় ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার আবরণ আমার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়ে। রথের দিন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের দর্শন-মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের পার্শ্বস্থ একটি সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া আছি। জনস্রোতের মত ভারতের নানাদেশীয় যাত্রীর স্রোত

জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইয়া সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছে। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছে, চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিয়াছে। এমন সময়ে তোমারই মত একটি ষোড়শী কিশোরী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি বড় হতভাগিনী। আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। আমার ভাগ্যে জগন্নাথদর্শন ঘটিল না। তুমি আমাকে জগন্নাথদর্শন করাও।" তাহার বসন বিশৃঙ্খল হইয়াছে। তাহার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিতেছে। তাহার ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম,—"তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দেখাইতেছি।" কিন্তু তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। তাহার কেবল একমাত্র প্রলাপের মত কথা,—"আমি বড় অভাগিনী। আমার ভাগ্যে জগন্নাথ-দর্শন ঘটিল না।" এক জন কনেষ্টবল আমার আজ্ঞামতে আমার গ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার মুষ্টি খুলিয়া দিলে, আমি তাহাকে শববৎ জড়াইয়া লইয়া যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলাম। সে অতৃপ্ত স্থির নির্নিমেষনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। দর দর ধারায় অশ্রু তাহার কপোল বহিয়া পড়িতেছে। সে বেদী প্রদক্ষিণ করিল। আবার অতৃপ্ত-নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইল। সে অবগুণ্ঠন টানিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বহু আত্মীয় সহ সে মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলে স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমি তাহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া আমার কাছে বসাইয়া রাখিলাম। তখন সে লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী। পরে অন্বেষণ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া আমি শ্রীমন্দিরের সেই দক্ষিণ দ্বারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি ঘটনা! শ্রীভগবানের মূর্ত্তিদর্শনের জন্যে ভক্তিতে অধীরা হইয়া যদি একটি কিশোরী এরূপভাবে এক জন অজ্ঞাত পুরুষের গলায় পড়িতে পারে, তবে ব্রজকিশোরীরা অদ্ভুতকর্ম্মা ও দৈবশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া—যে শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সে শারীরিক বলে এত অসুরের বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানবলে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন,—সেই 'সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্তি' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া রাসের শেষে, ভক্তিতে, ভক্তির চরম প্রেমে, অধীরা হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার শ্রীমুখ চুম্বন করিবে,

তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? বুদ্ধদেব কি পত্নীপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? চৈতন্যদেব কি শ্রীকৃষ্ণের জন্যে মাতা পত্নী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? তবে সরলা ব্রজগোপীরা স্বয়ং যে শ্রীভগবানকে পতি-পুত্র হইতে অধিক প্রেম করিত, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যে পতি-পুত্র ত্যাগ করিয়া যাইত, তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? এখনও কি গ্রামে এক জন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছে শুনিলে গ্রামবাসীরা পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া তাহাকে দেখিতে ছুটে না? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ তখন কিশোরমাত্র; কিশোরত্বের সীমা পঞ্চদশ বর্ষ।

আর একদিন আমি কার্য্যস্থান হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, একটি কিশোর সন্ন্যাসী শিশুকে লইয়া পরিবারস্থ মহিলারা এত আত্মহারা হইয়াছে যে, আমার জলখাবার প্রস্তুত করিতে হইবে—আমার পতিপ্রাণা পত্নী পর্য্যন্ত ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারা শিশুটিকে লইয়া একরূপ পাগল হইয়াছে। তখন আমার মনে হইল যে, একটি মূর্খ কিশোরসন্ন্যাসীকে লইয়া যখন ইহারা এরূপ করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান নবীনকিশোর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে ইহারা কি করিবে? কালে যমুনাতীরাভিনীত এই সরল ও সহজ—যমুনার সলিলের মত নির্ম্মল, শীতল ও মধুর ধর্ম্মও আবিল ও পঙ্কিল হইল। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ও গৌরীয় ধর্ম্মের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। হইবারই কথা। শ্রীভগবানের প্রতিভা মানুষ কোথায় পাইবে? এইরূপ আবিল ও পঙ্কিল হইয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অবতার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জাহ্নবীতীরে ও সিন্ধুতীরে সেই ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া বঙ্গদেশ ও ভারতের নানা স্থান কৃষ্ণনামে ও কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুতে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। আহা! কি করুণ মধুর লীলা! জগতে এমন প্রাণশীতলকারী আর কি আছে? তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণের দাসভাবে বিভোর হইয়া ব্রজলীলার শান্তিরস, কখন নন্দযশোদার ভাবে বিভোর হইয়া বাৎসল্যরস, কখন শ্রীদাম সুদামের ভাবে বিভোর হইয়া সখ্যরস, কখন বা গোপ-কিশোরীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিপ্রেমে বিভোর হইয়া কান্তরস, শ্রীরাধার প্রেমে বিভোর হইয়া মধুররস—সর্ব্বশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ষড়রসভোগের অভিনয় দেখাইয়া, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম, এবং ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের প্রেমই যে ব্রজলীলা, তাহা জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ বড়

কঠিন। যদি সরল ও সহজ পথ চাও, তবে "সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও"—তাহা বুঝিতে পারি না। ব্রজের গোপ গোপীরাই সর্ব্বধর্ম্ম, এমন কি, পতিপুত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণ লইয়াছিল। এইরূপে যে রাসলীলা নিন্দনীয় মনে করিতাম, তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ক্রমে আমার শিলাসম কঠিন বক্ষ দ্রব করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, ধর্ম্মপথই একমাত্র সুখের পথ। বুঝিলাম, শ্রীভগবানকে প্রেম না করিলে মানুষ ধর্ম্মপথের প্রকৃতপথিক হইতে পারে না। বুঝিলাম, সে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যে ব্রজলীলার মত সহজ, সরল ও মধুর আদর্শ আর হইতে পারে না। শ্রীভগবানকে পিতার মত, পুত্রের মত, সখার মত, পতির মত, পত্নীর মত, ভালবাসিতে সকল নরনারীই পারে। এ সকল প্রেমের মধ্যে পতিপত্নীর প্রেম সর্ব্বপেক্ষা গাঢ়তম। কিন্তু পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর যে প্রেম, তাহাই চরম প্রেম—তাহাই রাস। মা! তুমি একবার সেই গানটি গাও না।

ভানুমতী তখন বংশীবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে হর্ম্ম্যশীর্ষ মুখরিত করিয়া মধুর কীর্ত্তন গাহিতে লাগিল,—

১

ওরে ব্রজবাসী আয় রে আয়!
রাসে তোরা কে নাচিবি আয়!
ওরে চন্দ্র নাচে, তারা নাচে,
ধরা নেচে নেচে যায়।

২

কার্ত্তিক পূর্ণিমা নিশি,
গ্রহেতে গ্রহেতে ভাসি,
বাজিছে কৃষ্ণের বাঁশী, প্রাণ-উদাসী,
বুদ্ধ হেসে, গৌর নেচে, গৃহ ছেড়ে ছুটে যায়।

৩

সদ্যঃপ্রসূত কুমার
ছাড়ি, বুদ্ধ অবতার,
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী, শচী মা, নিমাই,
(ওরে) পত্নীপুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধূ আয় রে আয়।
(ওরে) পত্নীপুত্র না ছাড়িলে কৃষ্ণধনে নাহি পায়।

৪

প্রেমে কিশোর বিহ্বল,
দুই নেত্র ছল ছল,
মাঝে কৃষ্ণ,—কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত গোপীদল ;
নাচে করে কর, দেখে কৃষ্ণ সবারি গলায়,
নীল শশী বেড়ি যেন তারা নাচিছে ধরায়।

৫

প্রেমে হাসে জ্যোছনা,
প্রেমে হাসে যমুনা,
প্রেমে হাসে বৃন্দাবন,—নাহি উপমা।
(ওরে) নীলমণিধারাপ্রেমে যমুনা উছলি যায়।

৬

আহা আছেন ঈশ্বর,
বিরাজিত নিরন্তর,
সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে, কৃষ্ণ রাসেশ্বর,
রাসচক্রে সর্ব্বভূত, প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়,
ঘুরিছে প্রকৃতি নেচে ধরি পুরুষ-গলায়।

৭

প্রেমের ব্রজ এ ধরা,
প্রেমের গোপী আমরা,
কাল-কালিন্দীর তীরে প্রেমেতে ভরা ;
(আহা!) জন্মে জন্মে কর্ম্মফলে ভ্রমি ভব রাসলীলায়—
(নাথ!) নবীনের নাহি দুঃখ যদি হৃদে তোমায় পায়।

অনাথনাথ দেখিলেন, ভানুমতী সেই বৈশাখী জ্যোৎস্নায় পুলকিত আকাশের দিকে চাহিয়া গাহিতেছে, এবং তাহার কপোলযুগল বাহিয়া গঙ্গাধারার মত ভক্তিবিগলিত অশ্রুধারা ঝরিতেছে। অনাথনাথ ভাবিলেন,—"আমি কি তবে ভ্রান্ত ?"

ক্রমশঃ।

কর্ম্ম।

একখানি কাচের চক্র ; তাহাতে বিবিধ বর্ণের কাচ। মানুষের মনটি এমনি। একই পৃথিবী, একই লোক, বিভিন্ন সময়ে এই মনশ্চক্রে বিভিন্নরূপ বোধ হয়। এক মুহূর্ত্তে যাহাকে দেবতা ভাবি, পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে দানবী বোধ হয়। যাহার মুখখানি এক সময় চখের সাম্‌নে ভাসিয়া প্রাণ শীতল করে, সময়ান্তরে তাহার মুখচ্ছবি হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। বাসনা বা রাগ, বর্ণের ও বর্ণ-বিভিন্নতার কারণ। ইহারই নাম মোহ। এই জন্য শ্রীগৌতম বাসনার নির্ব্বাণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ কাল বাসনাবর্জ্জিত, সুতরাং সাধু পুরুষ দেখা যায় না। বাসনাবিমুক্ত স্বচ্ছ কাচে ভিন্ন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিভাত হয় না। বালক পথের ধারে পুতুল লইয়া খেলিতেছে, রাগে কখন হাসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে, কখন আপনাকে রাজরাজেশ্বর ভাবিতেছে, কখনও পথের কাঙ্গাল মনে করিয়া বুক ফাটাইতেছে। সকলই মোহ, সকলই কল্পনা। মোহবশতঃ মানুষ প্রকৃতিকে চিনিতে পারে না, মানুষের মত দুর্ব্বল কৃপাপাত্র কুয়াসার ক্রীড়নক জগতে সবাই। শিশু এই গলাগলি ভাব করিতেছে, আবার ক্ষণেক পরে লড়াই করিয়া কাঁদিতেছে। মানুষমাত্রই শিশু, মোহের হাতের পুতুল। সুখ কোথায় ? এক বাসনা পবিত্র নির্ব্বাতহৃদয়ে শ্রীপদের সমীপে। মানুষ কত দিনে শিশুত্ব ছাড়িবে, বীরত্ব পাইবে, মানুষ হইবে ? হায় মোহ ! দুর্ব্বলকে বলবান, বৃদ্ধকে যুবা, দেবীকে দানবী, বানরকে দেবতা, এ অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল তোমারই। তোমাকেই শয়তান বলিয়া ঋষিগণ উচ্চারণ করিয়াছেন।

মানুষ দিব্য চক্ষু লাভ করে একবার, চিতায় চড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে। শুনিয়াছি, একবার মানুষের দিব্য জ্ঞান হয়। তখন স্নায়ুপেশী গতিশূন্য ; সংসার দূরে, অতি দূরে, সৈকতপুলিনে বালুর মত সর্‌সর্ করিয়া সরিয়া যাইতেছে। দূরে থাকিয়া ডাকিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে, সে শব্দ কর্ণে স্পৃষ্ট হইতেছে না। জগতের উজ্জ্বল মোহন কমলমুখ আঁধারের ছায়ায় ঢাকিয়াছে, চন্দ্র, তারা, জ্যোৎস্না তখন অস্তমিত, তাই মানুষের দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। হায় ! তখন দিব্যজ্ঞান অসময়ে। পণ্ডিত ও মূর্খ, সংসারী ও শ্রমণক, যত-

দিন প্রাণ, ততদিন স্বপ্নের ক্রীড়া-পুত্তলি; কাচ ঘুরাইয়া অকারণে হাসে, অকারণে কাঁদে, অকারণে বৃথা লোকের সঙ্গে কোন্দল করে, কখনও তাহাকে বুকে পূরিয়া লয়, কখনও তাহাকে গলিত দুর্গন্ধ শবের মত ধিক্কার করিয়া ধূলায় নিক্ষেপ করে; আবার হয় ত ক্ষণবিলম্বে তাহারই চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দেহি পদপল্লব" বলিয়া কৃপাভিক্ষা করিবে। ধিক্ মানুষ!

মহত্ত্বের বিচিত্রতা এই কালচক্রে। নীচতা ও মহত্ত্ব মানুষের সকলই সমান। উভয়ই মোহবশাৎ। আমায় দেখিয়া তুমি হাসিতেছ, তোমায় দেখিয়া আমি হাসিতেছি। পাগল আমরা সকলে, এ হাসিও পাগলামি, কান্নাও পাগলামি। নীচতাও পাগলের পাগলামির উচ্ছ্বাসে, মহত্ত্বও পাগলামির উচ্ছ্বাস। বায়ুতাড়নায় মাছি উড়িয়া কখনও পয়োনালীমধ্যে, কখনও পর্ব্বতশিখরে। পর্ব্বতশিখরে বসিয়া তাহার গৌরবে অধিকার যেমন, সামান্য গুহাগহ্বরে তাহার দীনতার কারণও তেমনই অকিঞ্চিৎকর।

প্রাণ থাকিতে আশা, বাসনা, মোহ। জন্মই বাসনার মূল। মোহ না হইলে প্রাণের প্রাণতা থাকে না, মদ না খাইলে স্ফূর্ত্তি হয় না, মদ খাইলে দুর্ব্বল সবল হয়, মরা মানুষ নাচিতে থাকে। কি বীভৎস দৃশ্য! প্রাণ আছে, মোহ নাই, এমনটি কোথাও পাইবে না। মোহ যত টানিবে, প্রাণে তত উচ্ছ্বাস আসিবে। এ জন্য মোহ মানবের অবশ্যম্ভাবী। ধিক্ মানবজীবন! এই মানুষ কবি, বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য, মাতৃসেবী, বীর, কত কি নামে গৌরব করে। যে পদাঘাতেরও ঘৃণার পাত্র, সে মাথায় বসিয়া বীরপূজা দেবপূজা লাভ করিতে লালায়িত।

যে পর্ব্বতে চড়িয়া গৌরব মনে করিতেছে, সেই কৃপাপাত্র, ঘৃণিত। যে গহ্বরে পড়িয়া, সে ঘৃণিত নহে, দীন নহে। আকাশে ঘুড়ি উড়ে বাতাস, সূতা ও আকর্ষণের জোরে। ঘুড়ি যখন খুব উপরে উঠে, ছেলেরা করতালি দিয়া বলে—চমৎকার ঘুড়ি। সহসা ঘুড়ির মাথা ছিঁড়িল, কি কাণ ভারি হইল, ঘুরিতে ঘুরিতে মাটীতে পড়িয়া ছিঁড়িয়া গেল। বালক রাগে তাহাকে পদাঘাত করিল। রাগ এমনই অকারণ! যে মুখখানি দেখিয়া কাল প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারি নাই,—যত দেখি, বোধ হয় আরও দেখি, বুকে করিতে বুক জুড়াইতে গা কাঁপিয়াছে, আজ সেই মুখখানি দেখিয়া ঘৃণায় জ্বলিতেছি, তাহাকে দেখিতে ঘৃণা হয়, নিজের প্রতি ঘৃণা হয়, সমস্ত নারী-চরিত্রে ঘৃণা হয়। কাল যাহাকে লজ্জাশীলা ভাবিয়াছি, আজ তাহাকে লজ্জা-

হীনা ভাবিতেছি। কাল যাহাকে প্রেমময়ী কবিতারাণী মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহাকে বেনেনীর কাণা কড়া গণিতে দেখিতেছি। কালিকার সে চক্ষু কি আজ নাই? আছে, কালিকার সেই কাচখানি নাই। মনের নূতন কাচ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন রাগে আঁখি রঞ্জিত করিয়াছি। রাগে কাল সে দেবী ছিল, রাগে আজ সে দানবী হইয়াছে। বস্তুতঃ সে দেবীও নহে, দানবীও নহে।

ভালবাসার সাধ পূরিল না। যে হৃদয়খানি লইয়া বসন্তে কোকিলের ন্যায় প্রফুল্লতার এ জগতে আসিয়াছিলাম, আজ তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গুঁড়া-গুলি হাতে কুড়াইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। বাজারে আসিয়া ঘুরিয়া মরিলাম! কেনা কিছু হইল না। হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সাথের সাথী চলিয়া গিয়াছে; শ্মশানে তালগাছের মত একাকী দাঁড়াইয়া হাহা করিয়া জীবনটা কাটাইতে হইবে। সুখী হইব ভাবিয়াছিলাম; দুঃখের কটোরা পূর্ণ হইল; আনন্দে জীবন দীর্ঘতর হইবে আশা করিয়াছিলাম; এ ধাক্কায় বুঝি বা কখন চূর্ণ হইবে। ভাবিয়াছিলাম মালতী,—তুলিয়া দেখি ঘেঁটুফুল।

সখি! কি মোর করম লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি।

প্রেমিকের এই হাহুতাশ চিরদিন। ফুলের বনে একটি প্রজাপতি বসিয়াছিল; ধরিতে গেলাম, কাঁটা-গাছে উড়িয়া বসিল। এই ধরি, এই ধরি, করিয়া ধরিতে আর পারিলাম না, সে ধরা দিল না, কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। দু' হাতে বুক চাপিয়া—নহিলে বুক ভাঙ্গিয়া যায়—দু' হাতে বুক চাপিয়া পথের ধারে বসিয়া পড়িলাম। কেহ হাসিল, কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ ঘৃণা করিল, মুখ ফিরাইল, কেহ বা আহাহা করিয়া একটু ভুলাইতে আসিল, অবাক্ হইয়া নির্নিমেষনয়নে, শূন্যপ্রাণে, শূন্যদেহে, সে যে পথে গিয়াছে, সেই পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। সহসা কোথা হইতে আসিয়া সে ধরা দিল, ধরিতেই সাধ মিটিল, ধরিয়া তাহার ডানা দু'খানি ছিঁড়িয়া তাহাকে কাদায় ফেলিয়া পা দিয়া মাড়াইয়া হাসিলাম। এই আমার প্রেম! এই আমার ভালবাসা। কান্না ভাল, না হাসি ভাল? যে হাসে সে দেবতা, না যে কাঁদে?

আমি কাঁদিতেই জন্মিয়াছি, হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলি; ভাব করিতে গিয়া ঝগড়া করি, বুঝিতে গিয়া বুঝাইয়া আসি; আমার হৃদয়ের এমনি

বিচিত্র গঠন। দোষ কি আমার? প্রেমে সুখ নাই, জগতে প্রেমই নাই, অথচ সেই সাহারার মরীচিকা, আকাশের রামধনু ধরিতে নরনারী বালবৃদ্ধ সবাই দৌড়িতেছে, ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত দৌড়িতেছে! আজ তুমি আমাকে বাতুল, বাউল, বাউড়, বলিয়া উপহাস করিতেছ, শুষ্কতরু মুঞ্জরিল বলিয়া গান বাঁধিতেছ, মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে বলিয়া হাসিতেছ, কাল তোমাকেই আরক্তনয়নে ঊর্দ্ধশ্বাসে সফেনবদনে দৌড়িতে দেখিয়া আমি হাসিব। এক-খানি ঘুড়ি উড়িতে দেখিয়া তুমি দৌড়িতেছ, একটি চাঁদ উঠিতেছে দেখিয়া হাত দু'খানি বাড়াইতেছ, পাপিয়ার গানে মুগ্ধ হইয়া ধরিবার ফাঁদ পাতিতেছ, সে মুখখানি দেখিলে—আবেশে ঢল ঢল মুখখানি দেখিলে কে না পাগল হয়? ভাই! দোষ তোমারও নহে, দোষ আমারও নহে; সকলই আমাদের কর্ম্মফল। বাসনা-সুরা পান করিলে সকলেই মাতাল হয়; মাতালের প্রাণটি যেমন সরল, রসেভরা, তেমনি ঢল ঢল; সে কুরূপকে সুরূপ দেখে, মানবীকে দেবতা বলিয়া বুঝিয়া লয়।

এ কর্ম্মফল, কপালের লেখা নহে। ঘুড়ির রজ্জু, বায়ু ও আকর্ষণ। সেই আরক্ত আবেশপূর্ণ নয়ন দুটি, সেই ননীছাঁকা গোলাপমাখা মুখখানি, সেই মাল-তীর লজ্জাশীলতা, সেই শিশিরস্নিগ্ধ মধুরতা, সেই প্রভাতের কমলকোরক, সেই চাঁদের জোছনা, সকলই এই কল্পনায়! এ কল্পনা তোমার সৃষ্ট নহে, তোমার আয়ত্ত নহে, এ তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রাক্তন কর্ম্মফল।

বহরমপুরের পাগলাগারদে দেখিয়াছিলাম, সব পাগল ঠিক করিয়াছে যে, তাহাদের অধ্যক্ষ মহেন্দ্র বাবুই পাগল, আর তাহারা সকলে শেয়ানা। মানুষ এমনি পাগল, সে আপনার পাগলামি না বুঝিয়া ভগবানকেই পাগল সাজাই-য়াছে। তার ভগবান বাসনামদে যদি মাতাল; সে মাতালের পূজা করে।

হরি হে আপনি নাচ আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে তালে।

তার ভগবান নাচে, গায় ও বাজায়, সে কেবল ছায়াবাজির পুতুল। নিজে নাচে, ভগবান নাচান; বস্তুতঃ ভগবান বাসনাবিকারের অতীত; নাচেনও না, নাচানও না। নাচায় জীবের কর্ম্মফল—প্রাক্তন ও ঘটনারাশি—জন্মার্জ্জিত উত্তরাধিকৃত প্রবণতা ও ঘটনাচক্র—এই প্রবণতা ও এই ঘটনা, ইহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্মে মানুষ কর্ম্মী; এই ধর্ম্মে মানুষ ধর্ম্মী। এ ছাড়া মানুষের কর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, মান অপমান নাই, ঘৃণা ভালবাসা নাই। এই

কর্ম্মের নাম মোহ। এই মোহ চক্ষে অঞ্জন মাখাইয়া একবার তোমাকে আমার হৃদয়ের পুতুল করিতে শিখাইল, আবার এই মোহই তোমাকে ঘৃণা করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পথে প্রক্ষেপ করাইল। আমায় তুমি অসৎচরিত্র, মাতাল, চপল, বল। হয় ত কর্ম্মফলের ধাক্কায় আমি এমনি করি; তুমিও হয় ত এমনি করিয়াছ, করিতেছ, কি করিবে। দম্ভ করিও না, বৃদ্ধাকে দেখিয়া পাগল বলিয়াছিল, মা! তুমি ছিলে; যুবতীকে বলিয়াছিল, মা! তুমি আছ; কুমারীকে বলিয়াছিল, মা! তুমি হইবে। না, কৃপাভিখারী হইও না। স্রোতের তৃণকণা! তোমার সার্থকতা কি! আজ পর্ব্বতশিখরে, কাল গিরি-গহ্বরে, আজ আনন্দের স্বর্গে, কাল নিরাশার নরকে, আজ যে প্রেমদাস, কাল সে বৈরাগী।

নমস্যামো দেবান্ নন্থ হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী।

ওষধিপতি।

চন্দ্রের এক নাম ওষধিপতি। বিষ্ণুপুরাণে (২।১২) দেখা যায়, চন্দ্র অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদসমূহকে পরিবর্দ্ধিত করেন। অমাবস্যা তিথিতে তিনি প্রথমে জলে, পরে লতাসমূহে বাস করিয়া, পশ্চাৎ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন লতাতে গমন করেন, তখন যদি কেহ লতা ছেদন করে, কিংবা লতার পত্রচ্ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যাপাপের ভাগী হয়।

চন্দ্রের সহিত লতার কোন সম্বন্ধ আছে কি? চন্দ্র ওষধীশ,—এ বিশ্বা-সের কোন মূল আছে কি?

বৈদিক পণ্ডিতগণ বলিবেন, ঋগ্বেদে সোমের প্রশংসা স্তুতি থাকিলেও, সেখানে চন্দ্রের নাম সোম হয় নাই। অথর্ব্ব ও শতপথব্রাহ্মণে সোমের অর্থ চন্দ্র

হইয়াছে। সোমলতা লতার শ্রেষ্ঠ; চন্দ্রের সহিত সোমলতার সম্বন্ধ হইতে চন্দ্র ওষধীশ হইয়াছেন।

এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারা যায় না। সোমলতা বৈদিক ঋষিগণের সবিশেষ আদরের লতা ছিল; তাঁহারা সোমলতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কিন্তু সোমলতার সহিত চন্দ্রের কেন সম্বন্ধ হইল? চন্দ্র কুমুদবান্ধব,—ইহার অর্থ পাওয়া যায়। চন্দ্রের নাম ওষধীশ হইবারও কোনও কারণ থাকিতে পারে।

সূর্য্য দিবাকর, তেমনই চন্দ্র নিশাপতি। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র দৃশ্য হন না, তথাপি তিনি নিশাপতি, তারানাথ। রাত্রি নহিলে তাঁহাকে যে পাওয়া যায় না। অহর্পতি আছেন, নিশাপতিও থাকা আবশ্যক। এইরূপে রাত্রি বা অন্ধকারের সহিত লতার কিছু সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, অন্ধকার সোঁতা ঘরে আলুর যে অঙ্কুর হয়, তাহা আলোতে জাত অঙ্কুরের মত নহে। দেখা যায়, উহাদের বর্ণ এক হয় না। আঁধারে জাত অঙ্কুরের ডাঁটা শাদা, পাতা হল্‌দে; আলোতে জাত অঙ্কুরের ডাঁটা পাতা উভয়ই সবুজবর্ণ হয়। আঁধারে জাত লতার ডাঁটা বা অন্তর্পর্ব্ব লম্বা ও সরু হয়, অলোতে জাত তেমন হয় না। প্রথম লতার পাতা ও কাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কোণ ছোট হয়, পাতা ছোট হয়; দ্বিতীয় লতার সেরূপ হয় না।

এইরূপে দেখা যায়, অবিরাম আঁধারে থাকিলে উদ্ভিদের কাণ্ড ও পত্রের বিপরীত ফল হয়। আঁধারে পাতা বাড়ে না, কাণ্ড বাড়িয়া উঠে। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে, যে সময়ে আলোতে আলুর গাছ এক ইঞ্চি লম্বা হয়, সে সময়ের মধ্যে আঁধারে ১৫। ১৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। এমন কি, অতিশয় প্রখর আলোতে লতার বৃদ্ধি একেবারেই বন্ধ হয়। কিন্তু পাতার বেলায় উল্টা। অন্ধকারে পাতা ছোট হয়, মৃদু আলোতে বড় হয়, প্রখর আলোতে তত বড় হয় না। সকল গাছেরই এই রকম হয় না। থাম আলু অবিরাম অন্ধকারে বাড়ে না। যাহা হউক, দেখা যায়, আঁধার লতাবৃদ্ধির অনুকূল, আলো বৃদ্ধির প্রতিকূল।

ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেওয়ালের গায়ে কোন গাছ জন্মিলে গাছটা দেওয়ালের বাহির দিকে বাঁকিয়া উঠে। দেওয়ালের দিকে আলো বেশী লাগে না, অন্য দিকে বেশী লাগে। গাছের যে পাশে আলো বেশী লাগে, সে পাশটি বেশী বাড়ে না; যে পাশে কম লাগে, সে পাশটি বেশী বাড়ে। ফলে গাছটা বাঁকিয়া উঠে। যেন আলো পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে।

আলো লাগিবামাত্রই লতাবৃদ্ধি কম হয় না, তেমনই আঁধার হইবামাত্রই

বেশী হয় না। কোন কোন ওষধি লইয়া দেখা গিয়াছে, বেলা ১১টা ১২টার সময় বৃদ্ধির শেষ হইয়াছে। মধ্যাহ্নের পরে বেশী তাপ পাইলেও বৃদ্ধি ক্রমশঃ কম হইয়াছে। এই পরীক্ষাগুলি শীতকালে করা গিয়াছিল।

কিন্তু কোন গাছ স্বভাবতঃ অবিরাম আঁধারে কিম্বা অবিরাম আলোতে থাকে না। দিনের বেলা আলোতে থাকে, রাত্রেই কেবল আঁধারে থাকে। এ স্থলে দেখা যায়, দিবারাত্রিভেদে লতাবৃদ্ধির কম বেশী হয়।

রাত্রে বৃদ্ধির মান অধিক, দিবসে অল্প। দিবা কিংবা রাত্রি আরম্ভ হইবা-মাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। অল্পে অল্পে বৃদ্ধির মান কমে, অল্পে অল্পে বাড়ে। এইরূপে দেখা যায়, মধ্যরাত্রে বৃদ্ধি পরম না হইয়া তাহার পরে হয়।

আলোতে বৃদ্ধি কম হইবার কারণ বুঝা সহজ নহে। সে কথা এখন থাক। সূর্য্য হইতে আমরা কেবল আলো পাই না, আলোর সঙ্গে তাপও পাই। রাত্রে আলোর হ্রাস হয়, তাপেরও হয়। দিবাভাগে আলোর বৃদ্ধি, তাপেরও বৃদ্ধি। উপরে কেবল আলো ও আঁধারের গুণে লতাবৃদ্ধির বিচার করা গিয়াছে। তাপ সম্বন্ধে দেখা যায়, লতাবৃদ্ধির পক্ষে যেমন প্রখর আলোও ভাল নয়, মৃদু আলোও নয়; তেমনই প্রখর গ্রীষ্মও ভাল নয়, শীতও ভাল নয়। প্রত্যেক উদ্ভিদ এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় বেশী বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং আলোর ক্রিয়া কতটুকু, তাপের বা কতটুকু, তাহা জানা আবশ্যক। দেখা যায়, আমাদের দেশে অত্যন্ত শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে দিবসে যত গ্রীষ্ম হয়, তাহা অধিকাংশ গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ঠিক নহে; রাত্রে, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বরং ঠিক হয়। আর এক কথা আছে। আমাদের মত উদ্ভিদের দেহ হইতেও ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে। প্রখর গ্রীষ্মের সময় ঘর্ম্ম অধিক নির্গত হয়। অধিক ঘর্ম্মনিঃসরণ বৃদ্ধির অনুকূল নহে।

তবেই মোটের উপর সূর্য্যতেজঃ লতাবৃদ্ধির অন্তরায়, রাত্রি লতাবৃদ্ধির সহায়। মহীরুহের বৃদ্ধি সহজে পরিমাণ করিতে পারা যায় না। ওষধির সহজে লক্ষ্য হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ সোমলতার ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা ঐ লতার বৃদ্ধির অনুকূল কারণও নিশ্চিত জানিতেন। বিজ্ঞানের সাহায্যেই এই বিষয়টা জানিতে হইবে, এমন নয়। আমাদের ও অন্যান্য দেশের কৃষি-জীবীরা উদ্ভিদবৃদ্ধির অনুকূল কারণ জ্ঞাত আছে। বিজ্ঞানে অনেক জ্ঞাত বিষয়ের সূক্ষ্মতাসম্পাদন করে মাত্র।

তবে নিশাপতি চন্দ্র প্রকৃত পক্ষেই ওষধীশ। রাত্রিকালে ওষধি বর্দ্ধিত

হয়, দিবাভাগে হয় না। চন্দ্রই অমৃতময় শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা উদ্ভিদ-গণকে পরিবর্দ্ধিত করেন। চন্দ্রের কিরণ অমৃতময়; কেন না, তাঁহার আধি-পত্যসময়ে লতা বর্দ্ধিত হয়, মরে না। তিনিই যেন শিশিরসঞ্চারের কারণ, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণবৃদ্ধি করিবার কারণ। রাত্রেই চন্দ্র লতাতে গমন করেন; অমাবস্যার রাত্রে আকাশে দেখা দেন না, নিশ্চয়ই লতাতে বাস করেন। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার অন্য তিথিতে সম্ভবে না। তখন লতা কিংবা লতার পত্র ছেদন করিলে পাপ হয়। কবিচক্ষে লতা পাতার উপরে সঞ্চিত শিশির অশ্রুকণায় পরিণত হইয়াছে। লতা বা পাতা ছেদন করিলে অশ্রুধারা স্পষ্টই দেখা যায়। হেমন্তে অনেক লতারই পত্ররূপ চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ক্ষরিত হইতে থাকে। ইহা শিশির নহে, বস্তুতঃ লতার রস। অশ্রুও আমাদের দেহের রস। ছেদন করিলে অনেক গাছই অবিরল-ধারায় কাঁদিতে থাকে। তাই ত দুর্দ্দান্তেরা খেজুর গাছকে কাঁদাইয়া রস-সংগ্রহ করে। প্রাচীনেরা হয় ত দয়াপরতন্ত্র হইয়া রাত্রে বৃক্ষচ্ছেদন নিষেধ করিয়াছেন; হয় ত বা বৃদ্ধিসময়ে ক্ষয় বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া, দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সমর্থ রামদাস স্বামী।

২। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার অভিনব প্রণালী।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির সৌভাগ্যসঞ্চার-কালে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মামৃত সিঞ্চন করিয়া সেই মৃতপ্রায় জাতিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, একনাথ স্বামী ও রামদাস স্বামী তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় ধর্ম্মশিক্ষকগণের ন্যায় তাঁহারা জনসাধারণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধন ও অদ্বৈতভক্তিমূলক ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রীয়গণের লৌকিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির উৎকর্ষসাধন ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিবিধানের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে বৎসর একনাথ স্বামী সমাধিগ্রহণ করেন, সেই বৎসরেই

রামদাসের জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রদেশের ভক্ত-চরিতাখ্যায়কগণ বলেন, "এক-নাথ স্বামীর আরব্ধ ব্রতের উদ্‌যাপন করিবার জন্য"—"গ্লানিপ্রাপ্ত মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসমাহিত করিবার নিমিত্ত" রামদাস স্বামীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই অসাধারণ মহাপুরুষ ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে অভিনব প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। প্রস্তাবান্তরে তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষার বিষয় আলোচিত হইবে।

রাজ্যসংস্থাপনের ন্যায় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা-কার্য্যেও 'গঠন' ও 'রক্ষণ' নীতির প্রয়োজন হয়। রাজ্যের স্থায়িত্ববিধান করিতে হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার উপায়বিধান করা যেমন আবশ্যক, ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের পক্ষেও তাহা তেমনই অপরিহার্য্য। এই জন্য মহাপুরুষ রামদাস এক দিকে জ্ঞান, ভক্তি ও সদাচার প্রবর্ত্তিত করিয়া অপথচারী মহারাষ্ট্রসমাজে ধর্ম্মভাবের গঠন ও বর্দ্ধন করিতেছিলেন, অন্য দিকে ধর্ম্মদ্বেষী বিজাতীয় রাজশক্তির সংঘর্ষ হইতে তাহার 'রক্ষণের' উপায়বিধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে সকল বাহ্য বিঘ্ন বা বহিঃশত্রুর অত্যাচার জাতীয় ধর্ম্মভাব-বিকাশের অন্তরায়-স্বরূপ, তাহাদের উচ্ছেদের উপায়বিধান না করিলে এই নবোদিত ধর্ম্মভাবের স্থায়িত্ব সম্ভবপর নহে। প্রতীচ্যদেশের 'ক্রুসেড' ও মোসলেমদিগের 'জেহাদ' বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে স্বধর্ম্মরক্ষণ-প্রয়াসের নামান্তর-মাত্র। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম্মভাবের পুনরুজ্জীবনের যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাতন্ত্র্যলাভ করিবার জন্য এইরূপ ক্রুসেডের আবশ্যক হইয়াছিল। তুকারাম প্রভৃতি যে সকল সাধু পুরুষ "মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের" অন্তরঙ্গ দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, একমাত্র রামদাস স্বামী ব্যতীত তাঁহাদিগের মধ্যে আর কাহারও মনে বিজাতীয় রাজার প্রভাব হইতে ধর্ম্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের কল্পনা উদিত হয় নাই। অবহিতচিত্তে সমগ্র ভারতের ধর্ম্মসংক্রান্ত অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ-ফলে অথবা অনন্যসাধারণ প্রতিভার আলোকে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহপ্রিয় মোসলমানদিগের অত্যা-চার হইতে স্বধর্ম্মরক্ষার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করিতে না পারিলে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের" শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। হয় ত কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ও ভক্তিমার্গ-বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার এই সংস্কার

অধিকতর বদ্ধমূল হইয়াছিল। বস্তুতঃ সেকালের মোসলমানদিগের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে হিন্দুধর্ম্মের যে অবমাননা ঘটিত, তাহা নিবারণের জন্য রামদাস স্বামীর ন্যায় স্বধর্ম্মের অভ্যুদয়কামী মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

সেকালের প্রত্যেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মোসলমান নরপতি ও দেশাধিকারী হিন্দু-ধর্ম্মের নিগ্রহ তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য ও কোরাণসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—এই পরমোদার ভাগবতনীতি মোসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগের শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসকগণ প্রজাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান-স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া যে প্রকৃষ্ট নীতিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, মোসলমান ভূপতিগণের মধ্যে প্রায় তাহার অস্তিত্ব ছিল না। শাসননীতির সহিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মনীতির সংমিশ্রণ যে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব-কালে সকল নরপতির পক্ষেই অমঙ্গলের কারণ, এ কথা তাঁহারা বুঝিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে কোনও নরপতি হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহে ঔদাস্য প্রকাশ করিলে স্বসমাজে তাঁহার প্রতিপত্তির হানি হইত, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই কারণে মোসলমান শাসনকালে হিন্দুধর্ম্মের উপর সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরি-মাণে উৎপীড়ন হইয়াছিল। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বথরলেখক মল্লার রাম রাও চিটনীস বলেন,—"(যবন শাসনকালে) দাক্ষিণাত্যে (হিন্দু) ধর্ম্মের উচ্ছেদ হইয়াছিল। বহুপ্রকারে ব্রাহ্মণগণের নিগ্রহ ও অপরিমিত গো-বধ হইত। দেবমন্দির ও তীর্থস্থানাদির ধ্বংস এবং যজ্ঞযাগাদির উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। উত্তর-ভারতে হিন্দু নরপতিগণের সহিত সখ্য-নিবন্ধন দিল্লীর সম্রাট স্বরাজ্যমধ্যে হিন্দুধর্ম্মের অধিক বিড়ম্বনা করেন নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অত্যাচার সীমার অতিক্রম করিয়াছিল।" কদাচিৎ দুই এক জন সুলতান উদারপ্রকৃতি বা ধর্ম্মসম্বন্ধে সমদর্শী হইলেও, তাঁহাদিগের "দেবানুগৃহীত" স্বজাতীয়গণের হস্তে দুর্ব্বল প্রজাকুলের ধর্ম্ম সর্ব্বদাই ন্যূনাধিকপরিমাণে উপহত হইত। মহীপতিকৃত ভক্তবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে, সদাশয় নরপতির শাসনকালেও রামনবমী প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইয়া হরিনামাঙ্কিত পতাকা ও বীণামৃদঙ্গাদি-নিনাদ সহকারে 'নগর-সঙ্কীর্ত্তন' করিতে করিতে কোনও মসজেদের নিকটবর্ত্তী হইলে "ন্যায়-নীতি-শূন্য" "ধর্ম্মোন্মত্ত যবনগণ" তাঁহা-

দিগকে আক্রমণপূর্ব্বক প্রহার ও তাঁহাদিগের যন্ত্রপতাকাদি নষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগের অশেষ লাঞ্ছনা ও উৎসবভঙ্গ করিতেন। মোসলমান জমিদারগণ মহারাষ্ট্রদেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণকে সময়ে সময়ে ধর্ম্মান্তর-পরিগ্রহের জন্যও উৎ-পীড়িত করিতেন। তেজস্বী মারাঠাগণ যে সকল অত্যাচারই নিঃশব্দে অবনত-মস্তকে সহ্য করিতেন, তাহা নহে। নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে হিন্দুপক্ষ হইতেও সময়ে সময়ে মসজেদ প্রভৃতি ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইত।

সেই দুর্দ্দিনে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য বহুদিন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-ধর্ম্মীদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান ছিল। গোলকোণ্ডার অধিপতি কর্ত্তৃক পণ্ঢর-পুরের বিঠোবা দেবের মন্দির ভগ্ন হইয়া তথায় মসজেদ্ নির্ম্মাণের উপক্রম হইলে হিন্দুগণ দেবমূর্ত্তি লইয়া বিজয়নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন। একনাথ স্বামীর পিতামহ ভানুদাস কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তি পুনরায় পণ্ঢরপুরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়নগর রাজ্য মোসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-ধর্ম্ম এক প্রকার আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র "হিন্দুস্থানকে" "যবনস্থানে" পরিণত করিতে না পারিলে ভারতে মোসলমান শাসনের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হইবে না, কোনও কোনও যবনভূপতির এরূপ সংস্কারও জন্মিয়া-ছিল। সুতরাং শাসকসম্প্রদায়ের অত্যাচারের ভয়ে অনেক হিন্দুই স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। এতদ্ভিন্ন রাজপ্রসাদলাভের বাসনায় ও জেতৃ-জাতির অনুকরণ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেও অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। রামদাস স্বামী দেখিলেন, স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এই সকল সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভের অন্য কোনও উপায় নাই।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। সাহসী কষ্টসহিষ্ণু আরবেরা যেরূপ প্রাচীন রোমকীয় ও রুষীয় সম্রাটের আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মারাঠাগণও আদিলশাহী ও নিজামশাহী সুলতানগণের অধীনতায় কার্য্য করিয়া সমরবিদ্যায় নিপুণতা ও শাসনকার্য্যে জ্ঞানলাভ করিতেছিলেন। স্বাভাবিক কার্য্যদক্ষতা, নীতি-জ্ঞতা ও শৌর্য্যসাহসাদিগুণে তাঁহারা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের মন্ত্রণাসচিব ও সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসন-ব্যবস্থা ও বিগ্রহ-ব্যাপারে অগ্রণীত্ব লাভ করিতেছিলেন। মোসলমানদিগের বিলাসিতা ও কার্য্যবিমুখতার জন্যও কার্য্যকুশল দেশীয় কর্ম্মচারিগণের প্রতি ক্রমশঃ রাজ-কীয় কার্য্যের ভার অধিকপরিমাণে অর্পিত হইতেছিল। মোসলমান দরবারে

দেশীয়গণের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতেছিল বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিগ্রহ কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সাধুপুরুষদিগের অধ্যাত্ম-শক্তি, ক্ষমা, শান্তি ও তিতিক্ষাদিগুণ দর্শনে বিস্মিত হইয়াও অনেক মোসলমান শাসক তাঁহাদিগের নির্য্যাতনের লাঘব করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে এ সময়ে আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজাদেশে হিন্দুগণের সার্ব্বজনিক নিগ্রহ সাধিত হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানকালের ন্যায় সেকালে হিন্দুপল্লীতে গো-হত্যা নিষিদ্ধ ছিল না, প্রজাগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের সম্মানরক্ষার জন্য কোনও প্রকার বিশেষ রাজবিধানও প্রবর্ত্তিত ছিল না। সুতরাং সুলতানদিগের সদিচ্ছা ও দুই একজন সাধুপ্রকৃতি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সদ্ব্যবহারসত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খল মোসলমান জমিদারবর্গের ও তাঁহাদিগের ধর্ম্মান্ধ স্বজাতীয়গণের বিসদৃশ ব্যবহারে এবং মোসলমান সেনাপতিদিগের হিন্দুধর্ম্মোৎসাদন প্রথায় (১) দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণ বিধর্ম্মী শাসকসম্প্রদায়ের প্রতি বীতরাগ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে রামদাস, তুকারাম, রঙ্গনাথ স্বামী, বামন পণ্ডিত, মুক্তেশ্বর, বিঠ্ঠল-কবি, জয়রাম স্বামী, কেশব স্বামী ও আনন্দ মূর্ত্তি প্রভৃতি স্বদেশীয় ধর্ম্মশিক্ষকগণের যত্নে মহারাষ্ট্রবাসীর মনে স্বধর্ম্মের প্রতি যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্রমশঃ আত্মসম্মান-বোধের উদ্রেক হইতেছিল। স্বধর্ম্মের ও সমধর্ম্মী দেশবান্ধবগণের সামান্য নিগ্রহ বা অবমাননা তাঁহাদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। কোথাও ধর্ম্মের উপর অত্যাচার ঘটিলে লক্ষ লক্ষ হিন্দুহৃদয়ের সহানুভূতির প্রবাহ নিঃশব্দে উৎপীড়িতের উদ্দেশে প্রবাহিত হইত। এইরূপ সহানুভূতিসঞ্চারের ফলে স্বধর্ম্মের অবমাননাকারীদিগের সংস্রব ও আনুগত্যস্বীকার ক্রমে সাধারণের চক্ষে ঘৃণাজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। তুকারামের ন্যায় পার্থিব-বিষয়-বিমুখ সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুপুরুষের মুখেও তখন,—

হিন্দু তুমি তুরকীর দাস!
তবে কেন অকারণ করিতেছ অনুক্ষণ
আপনার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রকাশ!

৬২৩২ সংখ্যক অভঙ্গ।

(১) ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে কুতবশাহের সেনাপতি আমীর জুল্লা দক্ষিণ মহারাষ্ট্র বা কর্ণাট দেশ বিজয়কালে অতীব ক্রূরতার সহিত হিন্দুধর্ম্মীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। ধর্ম্মান্ধ দিল্লীশ্বরের দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাও এই শতাব্দীতেই বহুবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়াছিল।

ইত্যাদি অভঙ্গ শ্রুতিগোচর হইত। ফলতঃ মোসলমানগণ ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া হিন্দুদিগের অতিশয় বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়িণী অসমদর্শিতা এবং শাসননীতির সহিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মনীতির সংমিশ্রণের দোষেই মহারাষ্ট্ররাজ্য তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। অওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ও শাসনদক্ষ সম্রাটও এই ভ্রান্তনীতির অনুসরণ করিতে গিয়াই অজ্ঞাতসারে বিশাল মোগলরাজ্যের ভিত্তিমূল উৎখাত করিয়াছিলেন।

এক দিকে মোসলমানদিগের অসমদর্শিনী নীতির দোষে মহারাষ্ট্রীয় জনসাধারণ যেমন তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হইতেছিলেন, অপর দিকে তেমনই উচ্চপদ ও রাজসম্মানলাভের সহিত দেশের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছিল। দুর্ব্বল প্রজাবৃন্দ স্বধর্ম্মের বিড়ম্বনা দর্শনে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট প্রতিকার-কামনা ও স্বধর্ম্ম-রক্ষার্থ শক্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন। হিন্দু সর্দ্দার ও জাইগীরদারগণ স্বস্ব প্রাধান্য-বিস্তারের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতেছিলেন। রামদাস স্বামী দেখিলেন, মহারাষ্ট্র-সমাজের এই দুই বিভিন্নমুখী শক্তিস্রোত সম্মিলিত করিতে পারিলে মোসলমানদিগের দমন ও মহারাষ্ট্রধর্ম্মের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই দুষ্কর কার্য্যসাধন করিতে যে সর্ব্বাভিভাবিনী প্রতিভা, প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ, অসীম অধ্যবসায়, অসাধারণ কার্য্যকুশলতা ও অলৌকিক স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, তদানীন্তন মহারাষ্ট্র-সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও চরিত্রে তাহার সদ্ভাব ছিল না। মহাত্মা শিবাজীর পিতা রাজা শাহাজী সামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার সমরকৌশল তৎকালে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র প্রবাদের ন্যায় প্রথিত ছিল। তিনি নীতিকৌশলে স্বসমকালীন সমস্ত সর্দ্দারগণকে অতিক্রম করিয়া একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নবোদ্ভাবিত প্রণালীক্রমে তাহার শাসন ও শৃঙ্খলাবিধানের চেষ্টা করিতেছিলেন। (২) কিন্তু সমগ্র মহারাষ্ট্রজাতির হৃদয়ে একপ্রাণতার বীজবপনপূর্ব্বক ইতস্ততো-বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহকে এক সূত্রে গ্রথিত ও একতান করিয়া "স্বরাজ্যের" অটল ভিত্তিস্থাপন দ্বারা ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি লইয়া একজন অসাধারণ মহাপ্রাণ ব্যক্তির কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা ছিল। মহারাষ্ট্রজাতির দুঃখাবসানের নিমিত্ত বিধাতা রাজা শাহাজীর পুত্রকে

(২) Wilks' Sketches of the South. pp. 72/73.

সেই সকল অসাধারণ ক্ষমতায় সমলঙ্কৃত করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রামদাস যখন ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণার জন্য মহারাষ্ট্র-সমাজের বিভিন্ন-পথাবলম্বী শক্তিসমূহের সমন্বয়-সাধন-ক্ষম একজন যোগ্যতম নেতার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন তরুণ শিবাজী গো-ব্রাহ্মণের প্রতি-পালন, স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও উচ্ছৃঙ্খল মোসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনের জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র ও পরিমিত শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হইয়াছিলেন। যে সকল মহারাষ্ট্রীয় মোসলমানদিগের অধীন থাকিয়া সমরশিক্ষা করিয়াছিলেন, শিবাজী প্রথমে তাঁহাদিগের সহায়তা পান নাই। আলেক্‌জাণ্ডার বা সীজার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যেরূপ স্বল্পায়াসে আপনাদিগের প্রতিভার অনুরূপ উপকরণাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শিবাজীর ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়সহকারে নানা প্রতিকূল অবস্থার অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে কার্য্যসাধনোপযোগী সমস্ত উপকরণই স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই গিরিকাননচারী অসভ্য মাওলী জাতিকে সমর-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া একটি বিশ্বস্ত ও অসমসাহসিক সৈন্যদল গঠন ও গিরিদুর্গাদির নির্ম্মাণপূর্ব্বক যেরূপ বিদ্যুদ্বেগে ও বিনা রক্তপাতে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। তিনি নবাধিকৃত প্রদেশের শাসন ও শৃঙ্খলাবিধানের জন্য সেই অল্প বয়সেই যে সকল বিধি ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবল স্বধর্ম্মানুরাগ, সদাচার, পরাজিত শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার, রমণীকুলের সম্মানরক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন, সাধু-সহবাসে আকাঙ্ক্ষা এবং দর্পহীন মধুর সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণও তাঁহার অসাধারণত্বের আভাস প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিভাশালী রামদাস ভিন্ন সামসময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে আর কেহই তাহার সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শিবাজীর অধ্যবসায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া সাধারণে তাঁহাকে তদানীন্তন অন্যান্য স্বধর্ম্মপরায়ণ ও স্বপ্রাধান্য-বিস্তার-প্রয়াসী মারাঠা ভূম্যধিকারীদিগের অন্যতম বা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক উদ্যমশীল ও ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রামদাস যে সেই শিষ্যের চরিত্র-নিহিত অলৌ-কিক শক্তির অবিকশিত ছায়াময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—তাঁহার

কার্য্যকলাপে মহাপ্রাণতার অস্ফুট লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা গুরুর প্রতিভারই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

স্বদেশের দুর্দ্দশামোচন ও মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বধর্ম্মের উদ্ধার-সাধনে শিবাজীকে অধ্যবসায়সম্পন্ন দেখিয়া রামদাস কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সহায় হইবেন, সংকল্প করিলেন। শিবাজীও বহুদিন হইতে রামদাস স্বামীর জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অধ্যাত্ম শক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার "দর্শন-প্রসাদ-" লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বখর-লেখক চিটনীস বলেন,—

"সিদ্ধপুরুষগণের অনুগ্রহাশীর্ব্বাদে ধর্ম্মসংস্থাপনের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়া যাহাতে ভগবৎকৃপা-লাভ করিতে পারেন, তাহাই এই সময়ে শিবাজীর 'নিদিধ্যাস' হইয়াছিল। এই কারণে তিনি সাধুপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহাদিগের মুখে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যান ও পবিত্র পুরাণ-কথার শ্রবণে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সাধুপুরুষগণের ধর্ম্মোৎসব ও অন্ন-দানাদির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শিবাজী তাঁহাদিগকে ভূমিদান ও অর্থসাহায্যও করিতেন। সমর্থ রামদাস স্বামীর সৎকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভ ও অনুগ্রহপ্রাপ্তির জন্য তিনি অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। (৩) কিন্তু রামদাস তাঁহার পরীক্ষার জন্য আশ্রম পরি-ত্যাগপূর্ব্বক দুর্গম কাননে গুপ্তভাবে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবাজী কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার দর্শন পান নাই। পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হওয়ায় তিনি রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎলাভের জন্য অহর্নিশি উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।"

শিবাজীর মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ, তখন তিনি সহসা একদিন রাম-দাস স্বামীর লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন,—

"হে মহারাজ! আপনি মেরু পর্ব্বতের তুল্য অটলসংকল্প, ধীরতার আধার, বহু লোকের আশ্রয়স্থল ও শ্রীসম্পন্ন যোগী। যাঁহার দ্বারা অহরহঃ অসংখ্য ব্যক্তির উপকার সাধিত হইতেছে, তাঁহার মহত্ত্বের (মহানুভাবকতার) তুলনা কোথায়? হে নরপতি! আপনি হয়-পতি, গজপতি, দুর্গপতি ও ধরণীর অধীশ্বর; পুরন্দর ও শক্তি আপনার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে-ছেন। রাজন! আপনি যশোবান্, কীর্ত্তিমান্; পুণ্যবান্ ও ক্ষমতাবান্; এবং জ্ঞানবান্ ও নীতিসম্পন্ন। আপনার সদাচারপরায়ণতা ও সুবিবেচকতা, দানশীলতা ও ধর্ম্মশীলতা, বিজ্ঞতা ও সর্ব্বত্র সুশীলতা সুপ্রসিদ্ধ। আপনি ধীর, গম্ভীর ও শূরকার্য্যে তৎপর। হে নৃপবর! সাবধানতায় আপনি সকলকে পরাজিত করিয়াছেন।

---

(৩) মহীপতি বলেন, শিবাজী একদিন মৃগয়ার্থ কোনও গভীর বনে প্রবেশ করিলে তথায় সহসা তিনি যোগমগ্ন রামদাস স্বামীকে দেখিতে পান। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া শিবাজী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু রামদাসকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ শ্বাপদ ক্রীড়া করিতেছিল দেখিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইহাতে রামদাস স্বামীর সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর প্রবলা হইল।

"আমাদিগের তীর্থক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত হইয়াছে; ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমিসমূহ অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবী বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছে, ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে আমাদিগের ধর্ম্মের, দেবমূর্ত্তিসমূহের ও গো ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য নারায়ণ আপনার হৃদয়স্থ হইয়া প্রেরণা (আপনাকে উদ্বুদ্ধ) করিয়াছেন। আপনার নিকট বহুসংখ্যক পণ্ডিত, পুরাণবেত্তা, কবিশ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তার্কিক ও চতুর সভানায়ক আছেন। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারেন, সম্প্রতি ভূমণ্ডলে এরূপ কোন ব্যক্তি দৃষ্ট হইতেছেন না। কেবল আপনারই যত্নে 'মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম' এখনও কিয়ৎপরিমাণে সজীব রহিয়াছে। আপনার সহায়তায় এখনও নানা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে; আপনার আশ্রয়ে কত লোক সুখে কালযাপন করিতেছে; মহারাজ! আপনিই ধন্য, যে হেতু জগতে সর্ব্বত্র আপনার কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে। হে কল্যাণীয় রাজা শিব! আপনি কত দুষ্টের বিনাশসাধন করিয়াছেন, কত লোকের ভয় দূর করিয়াছেন, কত লোককে আশ্রয়দান করিয়াছেন। আপনার দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু আপনি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের কোন তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই! কি জানি, আমাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত প্রারব্ধফলেই বা আপনার এরূপ স্মৃতিবিভ্রম ঘটিল! যাহা হউক, আপনারা সকলে বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক, আপনাদিগকে অধিক আর কি বলিব? ধর্ম্ম-সংস্থাপনের কীর্ত্তি আপনাকেই অর্জ্জন করিতে হইবে। বিবিধ রাজকার্য্যের বাহুল্যবশতঃ আপনার চিত্ত হয় ত এখন ইতস্ততো-বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায় অপ্রাসঙ্গিকরূপে আপনাকে এই পত্র লিখিলাম—দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

এই পত্র পাঠ করিয়া শিবাজীর "নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত ও শরীর রোমাঞ্চিত" হইল। তাঁহার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বর্দ্ধনের জন্য পত্রের আরম্ভভাগে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি যেরূপ হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্রধর্ম্মের দুর্গতির বর্ণনাপাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার প্রয়াস যে কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে, এবং রামদাস স্বামীর ন্যায় মহাপুরুষের দ্বারা তাঁহার উদ্যম প্রশংসিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনের অনুরোধ" রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। রামদাস স্বামী তাঁহার কার্য্যাবলীর নিগূঢ়ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন ও তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া শিবাজী তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার চরণদর্শনের জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহা জানাইয়া তাঁহাকে একখানি বিনয়পূর্ণ পত্র লিখিলেন।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে শিবাজী কোনও কথকের মুখে ধ্রুবোপাখ্যান-শ্রবণপ্রসঙ্গে অবগত হইয়াছিলেন যে, গুরূপদেশ ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না।

তদবধি কোনও মহাপুরুষের নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়া নরজন্ম সার্থক করিবার বাসনা তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল। তিনি সামসময়িক প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষগণের মধ্যে অনেকেরই সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মব্যাখ্যানাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তিনি তখনও তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। সমর্থ রামদাস স্বামীর অধ্যাত্মশক্তির প্রশংসা ও দেশের সমস্ত সাধুমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া শিবাজীর হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দর্শনলাভের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এইরূপ সময়ে স্বামীর প্রেরিত উৎসাহপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি শিবাজীর শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। রাজপুত্র মহারাষ্ট্র-সাধু-সমাজের নেতা "মহাসমর্থ" রামদাস স্বামীকে তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন, সংকল্প করিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া জননী জীজীবাঈয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কতিপয় অনুচর সহ স্বামীজীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে সহসা এক পর্ব্বতে স্বামীর সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ হইল। তিনি সমর্থের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রোপদেশগ্রহণের ও তাঁহার সেবার অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামী বলিলেন, "তুমি প্রাসাদবিহারী রাজ-পুত্র, আমরা অরণ্যচর সন্ন্যাসী; ধর্ম্মসাধনও সহজসাধ্য নহে। অতএব তুমি এই বিসদৃশ অভিলাষ পরিত্যাগ কর। অকারণ 'ভেক ধারণ' করিয়া জগৎকে প্রতারিত করায় ফল কি?" (৪) এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বাষ্পাকুল-লোচনে বলিলেন,—"রাজ্যধন সমস্তই আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। এই দাসকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহপ্রকাশে সনাথ করিবার আদেশ হইক।" (৫) শিবাজীর সংকল্প অটল দেখিয়া রামদাস তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শিবাজী স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূত হৃদয়ে যথারীতি স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে স্বামী তাঁহাকে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত "দাসবোধ" নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ দশকের (অধ্যায়ের) ষষ্ঠ সমাসে (পরিচ্ছেদে) অবিকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

(৪) মহীপতি-কৃত সন্তবিজয়, চিটনীস-রচিত শিবাজীর বখর ও শিবদিগ্বিজয়।

(৫) মহীপতি-কৃত সন্তবিজয় ও চিটনীস-কৃত বখর।

এই ঘটনা ১৫৭১ শকাব্দের (১৬৪৯ খৃঃ) বৈশাখ শুক্লা নবমী বৃহস্পতিবার দিবসে শিবাজীর দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সংঘটিত হয়। (৬)

(৬) মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় বলেন,—১৬৫৫ খৃঃ জাওলীর রাজা চন্দ্ররাও মোরে ও ১৬৬১ খৃঃ শৃঙ্গারপুরের স্বাধীন জমিদার 'দলবই'কে পুরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যহরণ করায় শিবাজী স্বদেশবাসীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; এই কারণে, সাধারণের সহানুভূতিলাভের আশায় তিনি ১৬৬১ খৃঃ প্রতাপগড়ে ভবানীদেবীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও দেশের প্রসিদ্ধ সাধু রামদাস স্বামীর মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, সাহেব মহোদয়ের মতে শিবাজী "বোকা ভুলাইবার জন্য" ধার্ম্মিকতার ভান করিয়াছিলেন! গ্রাণ্ট ডফের এই উক্তি নিতান্তই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। আমরা কোনও গ্রন্থেই এই উক্তির পোষক কোনও প্রমাণের উল্লেখ পাই নাই। শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম ১৬১৭ শকের (১৬৯৫ খৃঃ) মাঘ শুক্লা সপ্তমী শুক্রবারে প্রতাপগড়ের মন্দিরের পূজারীকে যে রাজমুদ্রাঙ্কিত অভয়পত্র (সনন্দ) দান করিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি বিগত ১৮৯৬ সালের ১৯শে মে তারিখের কেশরী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আফজলখাঁর হত্যার অব্যবহিত পরে প্রতাপগড়ের ভবানীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে শিবাজী শৃঙ্গারপুর অধিকার করেন। জাওলীর রাজ্য ইহার বহু পূর্ব্বে ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থে ভবানীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার সহিত উক্ত রাজ্যদ্বয়গ্রহণের যে কার্য্য-কারণসম্বন্ধপ্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভবানীভক্ত শিবাজী যে স্বদেশবাসীর সহানুভূতি-লাভের জন্যই ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া প্রতাপগড়ে ভবানীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?

রামদাস স্বামীর উপদেশ সম্বন্ধেও আমরা সাহেব মহোদয়ের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা শিবাজীর দীক্ষা-গ্রহণের যে অব্দ নির্ণয় করিয়াছি, সমস্ত বখর-লেখকই একবাক্যে তাহার সমর্থন করেন। ডফ মহোদয় ১৬৬১ অব্দ কোথায় পাইলেন, বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তিনিও পাদটীকায় এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ করেন নাই। শিবাজীর জাওলী রাজ্য ও শৃঙ্গারপুর গ্রহণে মহারাষ্ট্রীয় জনসাধারণ যে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোনও আভাষ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই নাই। শৃঙ্গারপুর একটি ক্ষুদ্র নগর, শিবাজী ন্যায়যুদ্ধে তাহা অধিকার করিয়াছিলেন; তজ্জন্য মহারাষ্ট্রবাসীর অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ আমরা অনুভব করিতে পারিলাম না। জাওলী রাজ্য শৃঙ্গারপুর অপেক্ষা বহুগুণে বৃহৎ ও দেশমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। উহার অধিকার করিতে শিবাজীকে কূটকৌশলের অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ডফ মহোদয় বলেন, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক জাওলীপতির নিধনসাধন করায় শিবাজীর প্রতি অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, শিবাজীর দীক্ষাগ্রহণের সহিত এই ঘটনার সম্বন্ধকল্পনা সুসঙ্গত নহে। ১৬৫৫ খৃঃ জাওলী-বিজয়ে যে কলঙ্ক অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা প্রক্ষালন করিবার জন্য ১৬৬১ অব্দে শিবাজীর রামদাস স্বামীর নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় কি?

স্বামীর উপদেশে "আত্মজ্ঞান" লাভ করিয়া সংকল্পবিকল্পাত্মক সংসারের প্রতি শিবাজীর বিরাগ জন্মিল। রামদাস তাঁহাকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে তিনি বলিলেন,—"রাজ্য-বৈভব ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি। আর এই 'দুর্নিবার মায়াবিভ্রমে' মুগ্ধ না হইয়া গুরুদেবের চরণসেবায় জীবন-পাতপূর্ব্বক পরমার্থসাধন করিব।" ইহা শুনিয়া রামদাস শিবাজীর সংশয়ভঞ্জনের জন্য তাঁহাকে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন। সমস্ত কর্ম্ম-ফল ঈশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে ধর্ম্মপালন করিয়া জনক, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষিগণ যেরূপে মোক্ষপদবীর লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি শিবাজীর নিকট বিবৃত করিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশের দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া শিবাজীকে তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা "শিবদিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থ হইতে এ স্থলে অবিকল অনূদিত হইল,—

"যবনগণ বহুদিবস হইতে যথেচ্ছাচার করিতেছে; তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এরূপ চণ্ড পুরুষ কেহ নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে; সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে; নামসংকীর্ত্তন বিলুপ্ত হইয়াছে! পাপিগণের বলবৃদ্ধি হওয়ায় ধার্ম্মিকগণ দুর্ব্বল হইয়াছেন; এই সঙ্কটকালে সকলের সুখসম্মান লোপ পাইয়াছে। বিপদাগম হেতু এই পাপকালের আবির্ভাব হইয়াছে; দেবতাগণ (দেবমূর্ত্তিসমূহ) অত্যাচারভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবন-দিগের অনুকারী হইয়াছে। যবনগণ (দুর্ব্বল প্রজাকুলের প্রতি?) বিবিধ কটুভাষা ব্যবহার করে; নানা প্রকারে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয়; রঘুপতি এই সকল সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া (যবনদিগের বিরুদ্ধে) তোমার যোজনা করিয়াছেন। তুমি ঈশ্বরাংশ-সম্ভূত পুরুষ; তুমি প্রজাদিগের কিছু হিতসাধন কর। এক্ষণে সময়ের অনুরূপ ধর্ম্মস্থাপন করা তোমার কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন কর; নিজের প্রাণ দান করিয়াও তাহাদিগের সকলকে বিনাশ কর। তাহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে আপনার রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর। ধর্ম্মনীতির উপর রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ধর্ম্মনীতি পালন না করিলে সকলই মিথ্যা; সত্যপথে বিচরণ করিলে ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রম লাভ হয়। আপনার মান-রক্ষার জন্য অসি গ্রহণ করিয়া যিনি বৈরিকুল সংহার করেন, জগতে তাঁহার আনন্দবহুল-কীর্ত্তি প্রচারিত হয়। সকলের প্রতি আনন্দময় ভাব ধারণ করিবে; শৌর্য্যসহকারে উপার্জ্জন করিবে; উপার্জ্জনকারী জগতে সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। (শিবদিগ্বিজয়; ৩৮৯ পৃষ্ঠা)।

"তুমি ক্ষত্রিয়, অতএব ক্ষাত্রধর্ম্মী পুরুষদিগের ন্যায় রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন করিয়া দেবব্রাহ্মণের সেবা, ধর্ম্মসংস্থাপন ও দেশের ম্লেচ্ছভাব দূরীভূত কর। এ বিষয়ে রঘুপতির ইচ্ছা এই যে,—ম্লেচ্ছদিগের এই বহু দিবসের অত্যাচার ও উদ্দাম ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে 'দ্বিখণ্ড' করিয়া তুমি রাজ্যপালনের ভার গ্রহণ কর।"—রামদাস স্বামীর বথর। (৭)

এইরূপ উপদেশে শিবাজীর বৈরাগ্য তিরোহিত হইল। তিনি গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন তিনি বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সহ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক রাজকীয় সমারোহের সহিত সমর্থের পূজা করিলেন। নিঃস্পৃহ রামদাস বস্ত্র-ভূষণ-মাল্য-রত্নাদি পূজোপচারসমূহ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া কাননান্তরে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর শিষ্যগণ শিবাজীকে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া বিদায় করিলেন।

স্বামীর উপদেশে শিবাজী এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যহ স্বামীর দর্শনার্থ কাননে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামদাস কখন কোথায় বাস করিতেন, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না বলিয়া তিনি শিবাজীকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বরচিত "দাসবোধ" (৮) নামক "পরমার্থ গ্রন্থ" প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই গ্রন্থ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পাঠ ও ইষ্টদেবতার উপাসনা করিলে আমার দর্শনের ফললাভ হইবে।" শিবাজীকে অগত্যা এই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল।

স্বধর্ম্মের দুর্দ্দশা দেখিয়া রামদাস কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, শিবাজীর প্রতি তাঁহার উপদেশে পাঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য তিনি যে অভিনব পন্থার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারও আভাস উল্লিখিত উপদেশে পাওয়া যায়। স্বদেশবাসীর হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মোন্মাদের উদ্রেক করিতে না পারিলে বিজাতীয় শাসনের প্রভাব হইতে স্বধর্ম্মকে রক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না দেখিয়া রামদাস সকলকে ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র মরাঠাজাতিকে লক্ষ্য করিয়া

(৭) ম্লেচ্ছ ও যবন শব্দ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তুল্যার্থবোধক; অন্ততঃ রামদাস মোসলমানদিগের সম্বন্ধে উভয় শব্দেরই নির্ব্বিশেষে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা অনুবাদে মূলের শব্দগুলি যথাযথ ও অবিকৃত রাখিয়াছি।

(৮) দাসবোধ তখনও সমস্ত রচিত হয় নাই। যে অংশটুকু রচিত হইয়াছিল, তাহাই রামদাস শিবাজীকে পাঠ করিবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। দাসবোধ একটি উৎকৃষ্ট সর্ব্বসংগ্রহ পুস্তক।

শিবাজী ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে ক্ষাত্রধর্ম্মসম্বন্ধে যে দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এই ভাব সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কারণে, আমরা এ স্থলে তাহার একাংশের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

"এইবার পরম দুর্লভ ক্ষাত্রধর্ম্ম শ্রবণ কর। যিনি মৃত্যুকে ভয় করেন, তাঁহার ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত নহে—অন্য কোনও উপায়ে উদরপূর্ত্তি করা কর্ত্তব্য। যাহারা সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহাদিগকে ইহলোকে লজ্জা ও অপমান এবং মরণান্তে নরক ভোগ করিতে হয়। সুতরাং তাহাদিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। সমরে শত্রুনাশ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে সদ্গতি লাভ হয়; এবং শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারিলে মহান্ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারা যায়! কামানের গোলা যেরূপ নির্ভয়ে সৈন্যদলের মধ্যে গিয়া পতিত হয়, প্রকৃত ক্ষত্রিয় সেইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। সকলে একোদ্যমে উত্থিত হইলে শত্রুদিগের জন্য আর ভয় কি? ব্যাঘ্র যেরূপ সর্ব্বসমক্ষে মৃগযূথকে ধরাশায়ী করে, (ঐরূপে উত্থিত হইলে) শত্রুদিগকেও সেইরূপে বিনষ্ট করিতে পারা যায়। পুরুষের সাহস পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য; কিন্তু দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সাহস প্রকাশ করিলেই জয় লাভ হয়।

"দেশের সমস্ত দেবমূর্ত্তি উৎসাদিত হইয়াছে; আমাদিগের ধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হইয়াছে! এরূপ অবস্থায় আমাদিগের জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। যাবতীয় মহারাষ্ট্রীয়কে একত্র কর; আপনাদিগের 'মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের' বিস্তার কর। এই কার্য্যের সহায়কারী না হইলে পূর্ব্বপুরুষগণ উপহাস করিবেন। মরণের আহ্বান কেহ অতিক্রম করিতে পারে না; শত যত্ন করিলেও শরীর রক্ষা হয় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্য, তাহা বিবেকের সাহায্যে অবধারণ কর। যাঁহারা উচ্চবংশসম্ভূত বলিয়া সাহঙ্কারে আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা এ সময়ে যথাসত্বর 'হাজির' (কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ) হউন। এ সময়ে আলস্য ও অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে ইহ পরলোকে কষ্ট পাইতে হইবে। বিশুদ্ধজন্মা পুরুষগণ যদি সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া ভাল বলিব? এই কথায় যদি আপনাদিগের ক্রোধোদয় হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে হইবে। দেবদ্রোহীদিগকে কুক্কুর জ্ঞানে মারিয়া তাড়াইয়া দাও। নিশ্চয় জানিও যে, দেবভক্তগণই জয়লাভ করিয়া থাকেন। দেবতাগণকে মস্তকে ধারণ কর; একোদ্যমে সকলে উত্থিত হইয়া তুমুল বিপ্লব উপস্থিত কর; ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য দেশ বিজয় কর; স্বাধিকৃত প্রদেশসমূহ হস্তচ্যুত হইতে দিও না। আপনাদের দেশ রক্ষা কর, এবং তাহার মধ্যে যাহারা পরকীয় (স্বদেশদ্রোহী?), তাহাদিগকে আনিয়া অগ্রে তাহাদিগের সংহার কর। বিবেক, বিচার, সাবধানতা ও দীর্ঘ প্রযত্ন সহকারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া তুলজাদেবীর (ভবানীর) বরপ্রসাদে রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

হিন্দুধর্ম্মের সেই নির্য্যাতনের যুগে এরূপ উপদেশ প্রকৃতই 'পরম দুর্লভ' ছিল! যখন,—

অবনাবতীত-পবনাশ্বশোভিনো
ভব-নাগশায়ি-ভবনাভিমর্দ্দিনঃ।
সবনাদিকর্ম্ম-লবনায়-দীক্ষিতা
যবনাশ্চরন্তি ভুবনা বিভীষণাঃ॥—বিশ্বগুণাদর্শ; ২১৮

হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ করিবার জন্য যবনদিগের দুর্দ্ধর্ষ তুরগসেনা ভৈরববেশে দেশে দেশে দেবমন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া বেড়াইত, (৯) তখন ধর্ম্মরক্ষার জন্য এইরূপ উপদেশের যে অতীব আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? রামদাস স্বামীর এই উপদেশামৃত পান করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ অমর শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে, তাঁহারা কখনই এত অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে সমর্থ হইতেন না। যাঁহারা তাঁহাদিগকে লুণ্ঠনপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল দস্যুদল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যদি রামদাস স্বামীর এই উপদেশাবলীর মর্ম্মানুধাবন করেন, তাহা হইলে Sydney Owen মহোদয়ের সহিত একবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে,—

Shivaji and his people even in their warfare were by no means mere bandits. A halo of heroism, patriotism and religious zeal invested their proceedings and induced them to regard the Son of Shahji as a predestined, devinely favoured, indeed as an inspired deliverer. *** Both Shivaji and his original followers might well hold and did hold that in waging war after their own fashion with the Mosalmans, they were doing both God and man good service."—India on the Eve of British Conquest pp. 129/30.

সামসময়িক কবি ব্যঙ্কটাধ্বরি যথার্থই বলিয়াছেন,—

মায়াচঞ্চুতয়া ভয়াবহগতিঃ প্রত্যর্থি-পৃথ্বিভূজাম্
মহারাষ্ট্র-ভটচ্ছটা রণপটুর্নো পর্য্যটত্যেব চেৎ।

(৯) উল্লিখিত শ্লোকের রচয়িতা ব্যঙ্কটাধ্বরি কাঞ্চীপুরের (বর্ত্তমান কাঞ্জীভেরমের) অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে রচিত হয়। সামসময়িক কবির এই বর্ণনা অত্যুক্তিমূলক নহে। মোসলমানদিগের সহৃদয়তা ও রাজদরবারে দেশীয়দিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ যদিও কিয়ৎপরিমাণে কমিয়াছিল, তথাপি মোসলমান সেনাপতিদিগের দেশবিজয়কালে ধর্ম্মোৎসাদনের প্রথার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। আমীর জুম্লার কর্ণাটবিজয় ও অওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে অভিযান এই কথার প্রমাণস্থলে উল্লিখিত হইতে পারে।

দেবব্রাহ্মণবর্গ-নিগ্রহকৃতো দেশাংস্তরুক্ষা ইমে
নিষ্প্রত্যূহ-মনোরথা বিতনুয়ুর্নির্দ্দেবভূমিসুরান্॥ ১৯২
দেব-ক্ষোণীসুর-হিতকৃতে দারিতম্লেচ্ছপংক্তে—
র্মহ্যাং সহ্যা কথমপি মহারাষ্ট্রযূথস্য চেষ্টা।
ব্যাধিব্যূহপ্রতিহতিকৃতাং ব্যক্তমুগ্রৌষধানাং
কায়ারোগ-প্রণয়ি-হৃদয়ৈঃ কাটবং মর্ষণীয়ং॥ ১৯৩

হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অনেক ইংরাজ ইতিহাস-লেখক মহরাষ্ট্রীয়গণের রাষ্ট্রোন্নতির সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুরাগের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। তদনীন্তন মহারাষ্ট্র সাহিত্যে সেকালের মহাষ্ট্রীয়গণের ধর্ম্মোন্মত্ত হৃদয়ের যে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ-লেখকই তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ বা সুযোগ পাইয়াছেন। সুতরাং ইংরাজ-রচিত দুই একখানি ইতিহাস-গ্রন্থই যাঁহাদের একমাত্র সম্বল, তাঁহাদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয়দিগের কার্য্যকলাপ যে দস্যুজনোচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ইংরাজদিগের মধ্যে সিডনী ওয়েন মহোদয় ভিন্ন আর কোনও লেখক যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাষ্ট্রীয় উন্নতির এই নিগূঢ় কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না।

রামদাস স্বামীর উপদেশাবলীর মধ্যে "মহারাষ্ট্রধর্ম্ম" শব্দের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ অভিনব শব্দটি এই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির স্বরচিত—সামসময়িক অন্য কোনও কবির বা সাধুপুরুষের গ্রন্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় না। আমাদিগের বোধ হয়, স্বধর্ম্মের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুরাগবর্দ্ধনের জন্যই তিনি ঐ শব্দটির গঠন করিয়াছিলেন। "হিন্দুধর্ম্ম" ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের সাধারণ সম্পত্তি, অতএব সকলেরই রক্ষণীয়। যাহা সাধারণের সম্পত্তি, তাহার অবস্থা অনেকে স্থলেই "ভাগের মাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির" ন্যায় ঘটিয়া থাকে। এই কারণে, মহারাষ্ট্র দেশে নব ধর্ম্মভাবের (ভাগবত ধর্ম্মের) প্রবর্ত্তনাকালে নীতিজ্ঞ রামদাস উহাকে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" নামে পরিচিত করিলেন। সুতরাং উহার রক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্কন্ধেই পতিত হইল। "মহারাষ্ট্র ধর্ম্মকে" আপনাদিগের বিশিষ্ট সম্পত্তি বলিয়া মনে হওয়ায় তাঁহাদিগের অনুরাগ-স্রোত স্বতঃই তাহার দিকে ধাবিত হইয়া রামদাস স্বামীর উদ্দেশের সফলতাসাধন করিল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ভারতবর্ষে।

২।

গ্রন্থকার বারাণসীতে ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। স্বামীর শিষ্য মিনা বাহাদুর রাণা নেপালের এক জন ভূতপূর্ব্ব উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার বিষয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

ইনি সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ। ইঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল। কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ইনি সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে কুটীরবাসে, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ ধর্ম্ম আমাদিগের (খৃষ্ট) ধর্ম্মের মত। খৃষ্ট ধনবানদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া দীনভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমেরিকান ও ইংরাজ ধনিগণ এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া ধর্ম্মের বিশাল বলের ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন; তথাপি কত লোক সেই কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া থাকে! তাহারা মিনা বাহাদুর রাণাকেও উপহাস করিবে, এবং তাঁহাকে বুদ্ধিস্থৈর্য্যহীন বলিবে। তিনি শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকরণ জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কত খৃষ্টানও এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ইঁহাকে বুদ্ধিস্থৈর্য্যহীন বলিবে! লোকে যাহা বলে বলুক, আমি কিন্তু ইঁহাকে শ্রদ্ধা করি। এ শ্রদ্ধা মৌখিক শ্রদ্ধামাত্র নহে,—আন্তরিক। তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে: কেহ তোমাকে সেরূপ শ্রদ্ধা করিতে বলেও না। কিন্তু চেষ্টা করিলে তুমি এই সকলের প্রতি তাঁহার প্রবল বিশ্বাসকে ভক্তি করিতে পার। আরও একটু চেষ্টা করিলে তুমি তাঁহাকেও ভক্তি করিতে পার। তবে সে কার্য্য বড়ই কঠিন, তাই আমরা প্রায়ই সে বিষয়ে চেষ্টা করি না। কোন লোকের বিশ্বাসের সহিত আমাদিগের বিশ্বাস একরূপ না হইলেই আমরা তাহাকে বুদ্ধিস্থৈর্য্যহীন বলি। পূর্ব্বে ভিন্নবিশ্বাসীদিগকে আমরা অনলে দগ্ধ করিতাম, এখন আর তাহা করিতে পারি না, তাই তাহাদিগকে বুদ্ধিস্থৈর্য্যহীন বলিয়াই নিরস্ত হই।

সিড্‌নিতে গ্রন্থকারের সহিত এক জন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তিনি গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন,—

ভারবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার না হওয়ায় ইংলণ্ডের লোকে বিস্মিত হয়। তাহারা শুনে যে, ভারতবাসীরা সহজবিশ্বাসশীল ও অলৌকিক ঘটনায় দৃঢ়বিশ্বাসবান। কাজেই তাহারা বলে যে, এই সহজবিশ্বাসশীল ভারতবাসীরা অতি সহজেই খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিবে,

আর সেই সঙ্গে বাইবেলোক্ত অলৌকিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিলে তাহাদের অবিশ্বাসের আর কোনও কারণই থাকিবে না। এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ তাহারা মনে করে যে, কেবল ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দোষেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার অন্যরূপ। আমাদিগের বাইবেলোক্ত অলৌকিক ঘটনা সকল হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ঘটনা সকলের মত কার্য্যকর হয় না। হিন্দুধর্ম্মের সকল খুঁটিনাটি অলৌকিক ঘটনার উপর সংস্থাপিত ও অলৌকিক ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত। আমাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা না হইলে তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম্মে বিশ্বাস করান সহজ হইবে না। আমি যখন প্রথম ভারতবর্ষে গমন করি, তখন আমার (তদ্দেশীয়দিগকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করা) কার্য্য অতি সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে ভ্রম অতি অল্পদিনেই অপনোদিত হইয়াছিল। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এই বালকতুল্য অলৌকিকঘটনাপ্রিয় জাতিকে অলৌকিক ঘটনার সহিত ধর্ম্মের কথা বলিলেই তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এই বিশ্বাসে আমি সোৎসাহে তাহাদিগের নিকট Samsonএর কাহিনী বলিতে লাগিলাম। প্রথমে তাহারা বিশেষ মনোযোগসহকারে আমার কথা শুনিতে লাগিল; কিন্তু দেখিলাম, ক্রমেই তাহাদিগের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। শেষে বুঝিলাম, আমার এত কথায় তাহাদিগের কোন মনোভাব স্থায়ী হয় নাই।

এক জন বৃদ্ধ হিন্দু আমাকে বলিয়াছিলেন,—'আমরা হিন্দুরা কেবল তাঁহার কার্য্য দ্বারাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি; অন্য কোনও প্রমাণে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাও বোধ করি এইরূপ মনে করেন। যখন কোন মানব কোন মানবক্ষমতাতীত কার্য্য করে, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, সে দেববলে বলী, তাহার শক্তি ঈশ্বরপ্রেরিত। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাও এইরূপ কার্য্য দেখিয়া বুঝেন যে, সেই কর্ম্মকারী ঈশ্বরের ক্ষমতায় পূর্ণ। স্যামসনের কেশে ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল; কারণ দেখা গেল, কেশের সহিত তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। হিন্দুদিগেরও এই মত।

* * * *

'স্যামসনের এই দৈববল ছিল বলিয়াই তিনি এক গর্দ্দভের গণ্ড-অস্থি দিয়া সহস্র সহস্র নরকে নিহত করিতে পারিয়াছিলেন;—সেই দৈববলেই নগরতোরণ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আপনারা ইহাতে ভীত ও ভক্তিবিহ্বল হইয়া পড়েন, কারণ আপনারা দেখেন যে, সে অসাধারণ শক্তির মূলে দৈববল। কিন্তু হিন্দুদিগের নিকট এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া কোনও ফল নাই; কারণ, আমাদিগের দেবতারা যখন হনুমানকে অসীমশক্তি দিয়াছিলেন, তখন দৈববলে বলী হনুমানের কীর্ত্তির তুলনায় স্যামসনের কীর্ত্তি মলিন, নিষ্প্রভ। এই কারণেই হিন্দু শ্রোতৃগণ আপনার কথায় অবহিত হয় না।

'যখন পুরাকালে ঈশ্বরাবতার রামচন্দ্রের লঙ্কায় গমনের জন্য সিন্ধুসলিলে সেতুনির্ম্মাণের আবশ্যক হইয়াছিল, তখন স্যামসনেরই মত দৈববলে বলী হনুমান দুই দিনে সার্দ্ধ সপ্ত শতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া হিমাচল-পর্ব্বতখণ্ড আনয়ন করে ও তদ্দ্বারা সেতুবন্ধন করে। নিশাকালে গোবর্দ্ধনবাসীরা তাহার বজ্রনাদোপমেয় পদধ্বনি শুনিতে পাইল; সে পদক্ষেপে ধরণী কম্পিত

হইয়া উঠিতে লাগিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া তাহারা দেখিল, চিরতুষারমুকুটমণ্ডিত গগনস্পর্শী মহীধরসমূহ অগ্রসর হইতেছে, পর্ব্বতাঙ্গে শত সুপ্ত পল্লীর আলোক সেই নৈশগগনে জ্যোতিষ্কবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এই পর্ব্বত হইতে দেশক্রোশব্যাপী একাংশ স্খলিত হইয়া সেখানে পতিত হইল। তাহার অর্দ্ধাংশ কালে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; এখনও অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ বর্ত্তমান। স্যামসনের মত ঐশ্বরিক শক্তির সঞ্চার ব্যতীত হনুমান এ কার্য্য করিতে পারিত না। স্যামসনের শক্তির বিষয়ে কিম্বদন্তী ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই;—সে তোরণ আজ আর দৃষ্ট হয় না; কিন্তু গিরিগোবর্দ্ধন এখনও বর্ত্তমান।'

গ্রন্থকার বারাণসী হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় ক্লাইভ্ ও হেষ্টিংস উভয়ের কাহারও কোনও স্মৃতিচিহ্ন নাই, অথচ কোন এক অক্টারলোনীর নামে এক সমুচ্চ 'মনুমেট' আছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং গমনকালে পথে একটা ব্যাপার দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন,—

এই দুই ঘণ্টাকাল আমি এক জনও স্ত্রীলোক কি বালককে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দেখি নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের একটি মধুর গীত আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, গ্রীণল্যাণ্ড-ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা,—নানা দেশ হইতে লোকে তাহাদিগের দেশ ভ্রান্তিমুক্ত করিবার জন্য আমাদিগকে (খৃষ্টানদিগকে) আহ্বান করিতেছে। *

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাদিগের আহ্বানে আমরা যখন এ দেশ ভ্রান্তিমুক্ত করিতে আসিব, আশা করি, তখন আমরা আমাদিগের সমুচ্চ প্রতীচ্য সভ্যতার কতক অংশ গুপ্ত রাখিয়া তাহাদিগের (এই বিধর্ম্মীদিগের) সভ্যতার কতক অংশ লইয়া আমাদিগের সভ্যতা সমুজ্জ্বল করিয়া লইব। আমরা যদি ইহাদিগকে উন্নত করিতে চাহি, তবে ইহাদিগের খরচে আমাদেরও একটু উন্নত হওয়া আবশ্যক। বহুদিন পূর্ব্বে আমি একবার ব্যাভেরিয়ায় কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়াছিলাম;—'রোম্যান-ক্যাথলিক' ধর্ম্মাবলম্বীরা সেখানকার অধিবাসী। বোধ করি, বারাণসীবাসীরাও তত প্রগাঢ়ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে। আমার তৎকালের ডায়ারীতে দেখিতে পাই,—

---

* "From Greenland's icy mountains,
From India's coral strand,
Where Afric's sunny fountains
Roll down their golden sand,
From many an ancient river,
From many a palmy plain,
They call us to deliver
Their land from error's chain"

গত কল্য সুন্দর সুদৃশ্য গ্রাম্যপথ দিয়া বহু দূর ভ্রমণ করিয়াছিলাম। সে পথের আমোদ দুই কারণে নষ্ট হইয়াছিল;—প্রথমতঃ, পথিপার্শ্বে ধর্ম্মালয়; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রে অতিবৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের কঠোর শ্রম। পথিপার্শ্বে প্রচুর ধর্ম্মালয়ে ক্রুশোপরি খৃষ্টের পেরেকের ও কণ্টকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত—রক্তাক্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই স্থান হইতে যাইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ কি বিদেশে দেবমূর্ত্তির নিন্দা করিয়া থাকেন? আর দেখিলাম, পথিপার্শ্বে ক্ষেত্রে সত্তর কি অশীতিবর্ষদেশীয় বৃদ্ধারাও ক্ষেতের ফসল আঁটি করিয়া বাঁধিয়া গাড়ীতে বোঝাই দিতেছে।

ইহার পর আমি অষ্ট্রিয়ায় যাই। পরে আমি মিউনিচে গমন করি। মিউনিচে দেখিয়াছি, বৃদ্ধারা গুরুভার মদ্যের পিপায় বোঝাই ঠেলাগাড়ী চড়াই ও উৎরাই সঙ্কুল পর্ব্বতপথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমার অষ্ট্রিয়ায় লিখিত ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম,—ক্ষেত্রে কর্ষণকার্য্যের জন্য লাঙ্গলে একটি স্ত্রীলোক ও একটি গোজাতীয় জীব একত্র বদ্ধ দেখিতে পাই,—চালক এক জন পুরুষ! মারিয়েনবাদ সহরে প্রকাশ্য রাজপথে দেখিলাম, এক বৃদ্ধা ও একটি কুক্কুর একত্র বদ্ধ,—তাহারা একখানি 'শ্লেজ' গাড়ী টানিতেছে; পুরুষ চালক নিশ্চিন্তচিত্তে ধূমপান করিতে করিতে যাইতেছে;—তাহার বয়স বোধ করি ত্রিশ বৎসরও হইবে না!

পাঁচ কি ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার রোন নদীতে দ্বাদশদিনব্যাপী নৌভ্রমণে বাহির হই। তখনকার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম, * * * * অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকার সময় আমরা একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইলাম। সে দিন সেখানে অবস্থান করাই স্থির করিলাম। অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতে লাগিল; শীত প্রবল; "ওভারকোর্ট" পরিয়া শীত ভাঙ্গে না—তাহার উপর আবার "র‍্যগ্" জড়ান আবশ্যক। বৃষ্টির ফোঁটা এতই বড় যে, জলে প্রস্তরখণ্ডপতনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুই এক জন কৃষক ব্যতীত কোনও পুরুষ গৃহের বাহির হইতেছে না। এ সকল প্রদেশে স্ত্রীলোকের পক্ষে সকল সময়ই সমান।—স্ত্রীলোকের আর পশুদিগের দাসত্বের বিরাম নাই।

আমি যখন সেখানে উপনীত হইলাম, তখন তিন জন স্ত্রীলোক নদীতীরে কাপড় কাচিতেছিল। যতক্ষণ দিবসের আলোকে কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া না উঠিল, ততক্ষণ তাহারা সেই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। তাহাদিগের মধ্যে এক জনের বয়স বোধ করি ত্রিশ বৎসর,—আর এক জনের বোধ করি পঞ্চাশ,—তৃতীয়ার বোধ করি আশী বৎসর। তাহাদিগের 'ওয়াটার-প্রুফ' কি অন্য কোনও প্রকার বারিনিবারক আচ্ছাদন নাই, আছে কেবল মস্তকে এক এক খণ্ড চটের ছালা। বৃষ্টিবারির কতকাংশ সেই ছালা বাহিয়া ভূমিতে পড়িতেছে—আর অবশিষ্টাংশ তাহাদিগের গাত্র সিক্ত করিতেছে!

কিছু ক্ষণ পরে এক জন বলিষ্ঠ যুবক ছাতা মাথায় দিয়া—চুরুট টানিতে টানিতে একখানি গর্দ্দভ-শকটে অরোহণ করিয়া সেইখানে উপনীত হইল। সে বোধ করি বৃদ্ধার পৌত্র, প্রৌঢ়ার পুত্র, যুবতীর পতি। সে গাড়ীতে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকদিগকে হুকুম করিতে লাগিল, আর হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব হইলে ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক কয় জন তাহার হুকুম

নীরবে তামিল করিতে লাগিল;—তাহারা গাড়ীতে ছয় ঝুড়ী আর্দ্র বস্ত্র তুলিয়া দিল। সেই ঝুড়ীগুলি এতই ভারি যে, বোধ করি এক জন সাধারণবলশালী ব্যক্তি সেগুলি সহজে তুলিতে পারে না। গাড়ী বোঝাই হইলে যুবক অবতরণ করিয়া ছাতা মাথায় সরাইয়ে প্রবেশ করিল; আর স্ত্রীলোক কয়টি ভিজিতে ভিজিতে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে ফিরিল। আমি আসিয়া দেখিলাম, যুবক সরাইয়ে মদ্য ও খাদ্য লইয়া বসিয়াছে—তাহার হস্তে একখানি ধর্ম্মপত্র রহিয়াছে। দেশে এই দুর্দ্দশা—আর গত দুই শত বৎসর ধরিয়া ফ্রান্স অন্যান্য অসভ্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতেছে! এই রমণীদিগের মত অভাবপীড়িতা-দিগের দুর্দ্দশামোচন কি মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে?

একটি কবিতায় আছে যে, ভারতবর্ষে সকলই সুন্দর, কেবল মানবই নীচ। তাহার কারণ এই যে, ব্যাভেরিয়ার, অষ্ট্রিয়ার ও ফ্রান্সের 'সভ্যতা' আজও ভারতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবে আর অধিক বিলম্ব নাই। সে 'সভ্যতা' আসিতেছে। সে 'সভ্যতা' ভারতবর্ষকে 'উদ্ধার' করিবে—তাহার 'নীচতা' বিদূরিত করিবে।

ইহার পর লেখক সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতিচিহ্নদর্শনাভিলাষে কানপুরে ও লক্ষ্ণৌ সহরে গমন করেন। পরে নয়নাভিরাম তাজমহল দেখিবার জন্য তিনি আগ্রায় উপনীত হন। তাজমহলে ইংরাজগণ সময়ে সময়ে ভোজ ও নাচ দিয়া থাকেন শুনিয়া, লেখক বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

সত্য কথা বলিতে কি—আমরা যে সকল বস্তুকে পবিত্র বলিয়া মনে করি, তদ্ভিন্ন আর সকল বস্তুকেই আমরা অশ্রদ্ধা করিয়া থাকি; সেই সকল বস্তুই যে অপরে পবিত্র বলিয়া মনে করে, তাহা আমরা একবার মনেও করি না। কিন্তু একটা রহস্য দেখুন—আমরা যাহাকে শ্রদ্ধা করি, কেহ তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইলে আমরা বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হই। যদি এক দিন সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, এক জন অভিজাতবংশীয় ইংরাজ (আমেরিকায়) 'মাউণ্ট ভারননে' যাইয়া ওয়াশিংটনের সমাধিমন্দিরে ভোজন ও নৃত্যগীতাদি সম্পন্ন করিয়াছে, তবে আমরা (আমেরিকানরা) কতই ক্রুদ্ধ হই—সেই ইংরাজদিগকে কত শক্ত কথা শুনাই। আবার যদি ইংরাজগণ এক দিন শুনে যে, এক দল আমেরিকান 'ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবে'তে যাইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়াছে, তবে তাহারা কতই ক্রুদ্ধ হয়—সেই আমেরিকানদিগকে কতই কুকথা কহে!

'মাউণ্ট ভারননে' আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের দেহাবশেষ রক্ষিত, 'ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টর অ্যাবে' ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণের সমাধিমন্দির। তাজমহলের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বহুমূল্য উপাদানে রচিত সমাধিমন্দির আর কোথাও নাই। এখানে যে রাজরাজেশ্বরীর দেহাবশেষ সংরক্ষিত—তিনি এক জন নরপতির জীবনসর্ব্বস্ব ছিলেন, তাঁহার পবিত্র প্রেমে পতির হৃদয় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, তিনি নিষ্কলঙ্কচরিত্রা,—আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননী। আমে-রিকানের পক্ষে 'মাউণ্ট ভারনন' যাহা, ইংরাজের পক্ষে 'ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবে' যাহা, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পক্ষে এই তাজমহল তাহাই; তাহাদিগের নিকট তাজ-মহল অতি পবিত্র স্থান।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মেজর স্লীম্যান লিখিয়াছেন,—এই সম্রাটপত্নীর সমাধিমন্দিরে স্থানীয় ইংরাজগণ মধ্যে মধ্যে যে নাচ ও ভোজ দিয়া থাকেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিতেছি। নাচ ও ভোজ ব্যাপার মন্দ নহে; কিন্তু সমাধিমন্দিরের পক্ষে শোভনও নহে।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ওয়াশিংটনের সমাধিমন্দিরে বা 'ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবে'তে নাচ বা ভোজ দিলে যাহারা সেই বর্ব্বরোচিত আচরণে ক্রুদ্ধ হয়, তাহারাই আবার সুবিধা পাইলে তাজমহলে সেই সকল বর্ব্বরোচিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে!

দিল্লী, লাহোর, জয়পুর প্রভৃতি স্থান দেখিয়া গ্রন্থকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। সে সকল স্থান সম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই; প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আমরা এইখানেই বিদায় লইলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থকার ভারতবাসীদিগের গুণের প্রতি অন্ধ নহেন, বরং তাহাদের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বন্যা।

সাহেব! আজ রাত্রে নদী পার হওয়া দুষ্কর। একখানা বয়েল-গাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে। আপনার আসিবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যে এক্কা ছাড়িয়াছে, তাহা এখনও ওপারে যাইতে পারে নাই। সাহেবের কি বড় তাড়াতাড়ি? আচ্ছা, আমি পারের হাতীটা সম্মুখে লইয়া যাইতেছি! মাহুত! রামপ্রসাদকে এ দিকে নিয়ে আয়! স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে পারে ত ভালই। সাহেব! হাতী কখনও মিথ্যা কথা বলে না। রামপ্রসাদ বন্ধু কালানাগকে দেখিতে পাইতেছে না। তাই ওপারে যাইবার জন্য বড় উৎসুক। সাবাস্! সাবাস্ আমার রাজা! মাহুতজী! অর্দ্ধেক দূর গিয়া দেখ, নদী কি বলিতেছে। সাবাস্ রামপ্রসাদ! মাণিক আমার! একবার জলে নাম। বোকা! মাথায় মার। শালা, অঙ্কুশ কি শুধু তোর মোটা পিঠ চুল্‌কাইবার জন্য? মার, মার! পাথরে রামপ্রসাদের কি করে? আমার রুস্তম্! আমার জোরের পাহাড়! হুৎ! হুৎ!

না সাহেব। সব বৃথা! আপনি ডাক শুনিতে পাইতেছেন। সে কালা-নাগকে বলিতেছে—তাহার যাইবার ক্ষমতা নাই। দেখুন সে ফিরিয়া মাথা নাড়িতেছে। ও নির্ব্বোধ নয়, বার্হির রাগের কথা বেশ বুঝে। সেলাম রাম-প্রসাদ বাহাদুর! মাহুত! রামপ্রসাদকে গাছের নীচে নিয়ে গিয়ে মশলা দাও। বহুৎ আচ্ছা রামপ্রসাদজী! সরকারকে সেলাম দিয়ে ঘুমাওগে।

কি হবে? জল না কমা পর্য্যন্ত সাহেবকে অপেক্ষা করিতে হইবে। খোদার মর্জ্জিতে কাল সকালে বা পরশু জল কমিয়া যাইবে। সাহেবের এত রাগ কেন? আমি সাহেবের নফর। খোদা থাকিতে আমি কিছু এই নদীর সৃষ্টি করি নাই! আমি কি করিব? আমার কুঁড়ে ঘর ও তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই সাহেবের। আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। খোদাবন্দ! এই দিকে আসুন। নদীকে গালি দিলে কি জল কমিবে? সেকালে সাহেবলোকেরা এমন ছিল না। আগুন-গাড়ীতে সমস্ত মাটী করিয়াছে। সেকালে সাহেবরা যখন দিনরাত ঘোড়ার পিছনে পিছনে যাইত, নদীতে পথ আটকাইলে বা একখানা গাড়ীর চাকা কাদায় বসিয়া গেলে তাহারা কিন্তু এ রকম করিত না। খোদার মর্জ্জি! এ রকম আগুন-গাড়ীর মতন নয় যে, চল্‌বেই—চল্‌বেই—দেশের সমস্ত ভূতগুলো ল্যাজে বাঁধিয়া দিলেও তবুও চলে! আগুন-গাড়ীতে সত্যসত্যই সাহেবলোককে নষ্ট করিয়াছে। এক দিন না হয় দু' দিন গেলেই বা কি হয়? সাহেব কি সাদী কর্ত্তে যাচ্ছেন? তাই এত খাপা? হো হো হো! আমি বুড়া হইয়াছি, এখন বড় একটা সাহেব দেখিতে পাই না। খোদাবন্দ! গোস্তাকী মাফ করিবেন যদি আপনার মর্য্যাদা বুঝিছে না পারিয়া থাকি। সাহেবের গোসা হয় নাই ত?

সাদী! নিজের সাদী! হো হো হো! বুড়াদের মন নুমা গাছের মতন; ফল কুঁড়ি ফুল আর পুরাণ বছরের মরা পাতা, সব এক সঙ্গে আছে। পুরাণ, নূতন, আর যাহা ভুলিয়াছি, সমস্তই এক স্থানে। সাহেব চারপাইতে বসে না হয় একটু দুধ খান। সাহেব! একবার আমার তামাকটা খেয়ে দেখুন! তামাকাটা বড় সরীফ। এ নুক্লাওয়ের তামাক। আমার ছেলে সেখানে চাকরী করে—সে আমায় পাঠাইয়াছে। সাহেব, যদি নল ধরিতে জানেন তবে টানুন না কেন? সাহেব যে মুসলমানের মত তামাক খাইতে পারেন! বাহবা! কোথায় শিখ্‌লেন?

নিজের সাদী! হো হো হো! সাহেব বলছেন বিয়ের কথা কিছুই নয়। কালা আদমীকে কি সাহেবরা কখনও খাঁটি কথা বলেন? তবে তাড়াতাড়ির আর আশ্চর্য্য কি? প্রায় ত্রিশ বৎসর এই পারঘাটায় আমি ঘড়ী বাজাইতেছি, কিন্তু কোনও সাহেবকে এত তাড়াতাড়ি যাইতে দেখি নাই। ত্রিশ বৎসর! ওঃ! অনেকদিনকার কথা। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘাটে অনেক বেনিয়া পার হইত। একরাত্রে দুই হাজার বোঝাই বলদ পার হইতে দেখিয়াছি। এখন রেল্ হয়েছে—আগুন-গাড়ীতে বজ্ বজ্ শব্দ কচ্ছে—লাখো লাখো মন মাল এখন ঐ সাঁকোর উপর দিয়া যায়। খুব আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু পারঘাটা এক প্রকার ফাঁক হইয়া গিয়াছে। বেনিয়ারা আর গাছতলায় তাঁবু ফেলিয়া থাকে না।

আকাশ দেখিয়া আর লাভ কি? সকাল অবধি বৃষ্টি হবে। শুনুন; জলের ভিতর পাথরে কথা কহিতেছে। সাহেব আজ যদি পার হইবার চেষ্টা করিতেন, তা হ'লে, পাথরে আপনার হাড়গুলি তুষঝাড়া করিত! আমি দুয়ার বন্ধ করিতেছি। বোধ হয়, আর বৃষ্টি হইবে না। আঃ! ত্রিশ বৎসর এই নদীর ধারে! বুড়া হইয়াছি···চেরাগের তেল কোথায়?

খোদাবন্দ মাফ করিবেন! কুকুরের মত আমারও ভাল ঘুম হয় না। সাহেব দুয়ারের কাছে গিয়াছেন, একবার তাকাইয়া দেখুন আর শুনুন—এ পার হইতে ও পার এখন পুরা আধ কোশ। আপনি ঐ দূরে তারার কাছে দেখিতে পাইতেছেন—জলও সাত আট হাত গভীর। আপনার চখে রাগ দেখিয়া জল কমিবে না; গালাগালিতেও নদী শান্ত হইবে না। কোন-টার বেশী জোর সাহেব? আপনার গলার, না নদীর? শুইয়া ফের ঘুমাইবার চেষ্টা করুন। পাহাড়ের নীচে যখন বৃষ্টি হয়, তখন বার্হির রাগ আমি বেশ বুঝিতে পারি। আমি একবার রাত্রে এর চেয়ে দশগুণ ভয়ঙ্কর নদী পার হইয়াছি। সে দিন শুধু খোদার মেহেরবানীতে জাহান্নমের দরজা হইতে ফিরিয়াছিলাম!

আমি সেদিনকার কথা বলিব কি? বেশ সুন্দর গল্প! আর একবার তামাক সাজিয়া দিতেছি।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে,—আমার তখন বয়স কম—এইখানে আসিয়াছি। দেহে অসীম শক্তি। আমি যখন বলিতাম—এখন পার হওয়া যাইবে, তখন বেনিয়ারা আমার কথা অবিশ্বাস করিত না। আমি সমস্ত রাত্রি কাঁধ পর্য্যন্ত

স্রোতের জলে ডুবাইয়া এক শত ভয়ব্যাকুল বলদ পার করিয়াছি—একখানি খুরও খোওয়া যায় নাই। ইহার পর লোকগুলাকেও পার করিতাম। যাইবার সময় সেরা বলদটা আমাকে বক্‌শিস্ করিয়া যাইত। আমার এতই খাতির ছিল। আজ বৃষ্টি পড়িতেছে—নদী বাড়িতেছে—আর আমি কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করিয়া ঘরে ঢুকিতেছি। সে তাকত নাই—আমি বুঁড়া হইয়াছি—আর আগুন-গাড়ীর জন্য ঘাট খালি হইয়া গিয়াছে। সকলে আমাকে বলিত 'বার্হির জোয়ান।'

সাহেব, আমার মুখ দেখুন! বাঁদরের মতন। হাত বুড়ীর হাতের মতন। খোদার কিরা, এক দিন এক সুন্দরীর এই মুখ ভাল লাগিত। এই বাহুমূলে এক জন মাথা রাখিত। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সাহেব। বিশ্বাস করুন। কিছুই মিথ্যা বলিতেছি না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে!

দুয়ারের কাছে আসিয়া নদীর ও পারে দেখুন দেখি। অনেক দূরে নদীর ভাঁটীতে একটা আলো দেখিতে পাইতেছেন কি? পাতিরা গ্রামের হনুমান-মন্দিরের আলো। ঐ বড় তারাটার নীচে উত্তর দিকে পাতিরা গ্রাম। নদীর বাঁকে গ্রামখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অনেক দূর সাঁতার দিয়া যাইতে হয় সাহেব। কাপড় চোপড় খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? আমি সাঁতার দিয়া পাতিরাতে গিয়াছি একবার নয়—অনেক বার। নদীতে মগরের অভাব নাই।

ভালবাসার কাছে জাতির বিচার নাই। না হ'লে আমি এক জন মুসলমান, এক জন মুসলমানের ছেলে, এক হিন্দু রমণীর জন্য—পাতিরার লম্বরদারের বিধবা ভগিনীর জন্য, এত আকুল হইব কেন? কিন্তু ঘটিয়াছিল তাই। লম্বরদারের পরিবারেরা তীর্থদর্শন উপলক্ষে মথুরাতে আসিয়াছিল। সে তখন নববিবাহিতা বধূমাত্র। গরুর গাড়ীর চাকায় রূপার হাল। রেশমী পর্দ্দা দিয়া গাড়ীখানা ঢাকা। সাহেব, আমি তাহাদিগকে শীঘ্র পঁহুছিয়া দিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হই নাই। কারণ, বাতাসে পর্দ্দা উড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম। যখন তাহারা তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার বালক স্বামী মরিয়া গিয়াছে। তাহাকে পুনর্ব্বার গাড়ীর ভিতর দেখিলাম। খোদার দোহাই! হিঁদুরা অতি নির্ব্বোধ! সে হিন্দু হৌক, আর জৈন হৌক,—সে কুষ্ঠাগ্রস্ত হউক বা সুস্থ হউক, তাহাতে আমার কি? আমি নিশ্চয় তাহাকে বিবাহ করিয়া এই নদীতটে মনোরম কুটীর বাঁধিতাম। নবম দণ্ডের সপ্তম দণ্ডে লেখা আছে—মুস্‌রিকিন্‌কে বিবাহ করিতে নাই। তাহা কি সত্য?

শিয়া ও সুন্নি উভয়রাই কি বলে মুস্‌রিকিন্‌কে বিবাহ করিতে নাই? সাহেব কি তবে মোল্লা? নতুবা এ সমস্ত কথা কেমন করিয়া জানিলেন? কিন্তু আমি দুই একটা কথা বলিব,—যাহা সাহেব জানেন না। প্রেমের কাছে শিয়া সুন্নি, মুমিন ও মুস্‌রিকিন্ নাই। নয় 'দণ্ড' শুধু প্রেমের অগ্নি জ্বালিবার জন্য দণ্ডমাত্র। সত্য সত্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু আমি কি করিব? লম্বরদারের লোকেরা হয় ত লাঠাইয়া আমার মাথা গুঁড়া করিত। আমি দু' পাঁচ জনের ভয় রাখি না। কিন্তু অর্দ্ধেক গ্রাম আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে কি করিতে পারি?

প্রত্যহ রাত্রে আমি পাতিরার এক শস্যক্ষেত্রে তাহার সহিত দেখা করিতাম। এ কথা কেহ জানিত না। আমি এইখানে নদী পার হইতাম। তাহার পর জঙ্গলের ভিতর দিয়া নদীর বাঁকে যেখানে রেলের সাঁকো, সেইখানে যাইতাম। তাহার পর একখানা মাঠ পার হইয়া পাতিরাতে পঁহুছিতাম। রাত্রি ঘনান্ধকার হইলে মন্দিরের আলো দেখিয়া গন্তব্য স্থান চিনিয়া লইতাম। নদীর নিকটে জঙ্গল সর্পে পরিপূর্ণ। বালির উপর ছোট ছোট কেউটা ঘুমাইত। আর তাহার ভাইরা আমাকে সেখানে দেখিলে হয় ত মারিয়াই ফেলিত। কিন্তু আমরা দু'জন ছাড়া এ কথা কেহই জানিত না। বালি উড়িয়া আমার পায়ের দাগ ঢাকিয়া যাইত। গ্রীষ্মকালে পারঘাটা হইতে পাতিরাতে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার। বর্ষার প্রথমেও তাই। শরীরের বল দিয়া নদীর বলের সহিত যুঝিতাম। এবং প্রত্যহ রাত্রে কুটীরে আহার করিয়া পাতিরাতে গিয়া পান করিতাম! সে এক দিন বলিল, হিরনাম সিং নামে এক জন বদমাইস্ তাহার পিছনে লাগিয়াছে। তাহার বাটী পাতিরার পারে। কিন্তু কিছু দূর উজানে। শিখরা কুকুর; তাহা না হইলে খোদার শ্রেষ্ঠ প্রসাদ তামাক তাহারা ত্যাগ করিবে কেন? হিরনাম সিংকে শমন-ভবনে পাঠাইবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। বিশেষতঃ হিরনাম শাসাইয়াছিল, তাহার কথায় রাজি না হইলে এক দিন লুকাইয়া দেখিয়া লম্বরদারকে ভগিনীর গুপ্ত প্রণয়ের কথা বলিয়া দিবে।

এই খবর শুনিয়া অবধি একখানা ধারালো ছুরী কোমরে বাঁধিয়া সাঁতার দিতাম। আমাকে কেহ বাধা দিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয় তাহার দিন ফুরাইত। আমি হিরনাম সিংকে চিনিতাম না। কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে কেহ ব্যবধান করিলে কখনই তাহার মঙ্গল হইত না।

বর্ষার প্রথমে এক দিন রাত্রে পাতিরাতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। কিন্তু নদী ক্রোধকম্পিতা। সাহেব! বাহির স্বভাব এই—কুড়িবার নিশ্বাসের মধ্যে পাহাড় হইতে বাহির হইয়া দেড় হাত উঁচু দেওয়ালের মত ছুটিয়া আসে। আগুন ধরানো ও চাপাটী বানানোর মধ্যে এক ক্ষুদ্র নালা হইতে বাহি যমুনার বহিন হইয়া দাঁড়ায়। এক পোওয়া ভাঁটীতে একটা চর আছে। প্রথমে সেখানে থামিয়া দম লইতাম। নদী খরস্রোতা। কিন্তু ভালবাসার জন্যে ছোঁড়ারা কি না করিতে পারে? তারার আলো অতি সামান্য, চরের মাঝামাঝি সাঁতার দিবার সময় মুখ ঘসিয়া একটা দেবদারুর ডাল ভাসিয়া গেল। দেবদারু খুব শক্ত গাছ—সহজে পর্ব্বতগাত্র হইতে উৎপাটিত হয় না। দেবদারু-শাখা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, পর্ব্বতের পাদদেশে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি সাঁতার দিতেছিলাম। স্রোতে আমার বিশেষ সাহায্য হইতেছিল। কিন্তু চরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই চারি দিকে যেন নদীর ধমনীর শব্দ অনুভব করিতেছিলাম। কোনখানে আর চর নাই—শুধু এ পার ও পার জুড়িয়া একটা বড় ঢেউয়ের মাথার উপর ভাসিতেছিলাম। সাহেব কি কখনও এমন জলের পাল্লায় পড়িয়াছেন?

জলের উপর মাথা রাখিয়া বোধ হইতেছিল, পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত যেন জল ভিন্ন আর কিছুই নাই। স্রোতের মুখে গাছপালার সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিলাম। বন্যার গর্ভে মানুষ যেন কিছুই নয়। সেই বারের বন্যার কথা লোকে এখনও গল্প করিয়া থাকে। ভয়ে আমার পিত্ত গলিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর অপেক্ষায় কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অসাড় হইয়া ভাসিয়া ছিলাম। জলে জীয়ন্ত জীবেরও অভাব ছিল না।—তাহাদের আর্ত্তনাদ মাঝে মাঝে শুনিতে পাইতেছিলাম। একবার শুনিলাম, এক জন লোক যেন সাহায্যের জন্য চেঁচাইতেছে। বৃষ্টির জল চাবুকের মতন পড়িয়া নদীকে শুভ্র ফেনিল করিয়া তুলিয়াছিল। আমি নীচে পাথরের ও উপরে বৃষ্টির শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইতেছিলাম না। এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে ভাঁটীতে চলিয়াছিলাম,—নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। অল্প বয়সে মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। সাহেব কি এখানে দাঁড়াইয়া রেলের সাঁকো দেখিতে পাইতেছেন? পেশোয়ার-যাত্রী ডাকগাড়ীর ঐ আলো দেখা যাইতেছে। নদী হইতে সাঁকো এখন প্রায় বার তের হাত উঁচুতে। কিন্তু সে রাত্রে জাফ্রির উপর আসিয়া জল গর্জ্জন করিয়া পড়িতেছিল। আমার পা জাফ্রিতে আসিয়া ঠেকিল। সেইখানে ও

থামের উপর অনেক গাছপালা আসিয়া জমিয়াছিল। সেই জন্য আমায় বড় একটা বেশী আঘাত লাগিল না। শক্তিশালী লোক যেমন দুর্ব্বলকে চাপিয়া ধরে, বাহি সেই প্রকার আমাকে চাপিতেছিল। কোনও ক্রমে জাফ্রি ধরিয়া উপরে উঠিলাম। সাহেব! রেলের উপরও প্রায় আধ হাত জল। ভাবুন দেখি কি প্রকার বন্যা! আমি দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছিলাম না। শুধু শুইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

কিছু ক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। আকাশে দুই একটা বৃষ্টিধৌত তারা দেখা গেল। সেই অস্পষ্ট তারার আলোকে দেখিলাম, যত দূর দৃষ্টি যায়, তত দূর শুধু কালো জল। থামের উপর স্রোতোবিক্ষিপ্ত গাছপালার উপর মৃত জন্তু। কয়েকটার গলা জাফরির মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। যাহারা তখনও ডুবিয়া যায় নাই, তাহারা জাফরি ধরিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল—মহিষ ও গরু, বন্য শূকর, দুই একটা হরিণ। আর সর্প ও শৃগালের গণনা হয় না। সেতুর বামভাগ মৃত জন্তুর দেহে পরিপূর্ণ। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী জাফ্‌রির ভিতর দিয়া গলিয়া স্রোতের মুখে ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিতেছিল।

তাহার পর তারা ডুবিয়া গেল—পুনর্ব্বার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নদী ক্রমশই বাড়িতেছিল। নিদ্রা হইতে জাগিবার পূর্ব্বে মানুষ যেমন গা মোড়া দেয়, সেই প্রকার সাঁকোটা আমার পায়ের নীচে কাঁপিতেছিল। কিন্তু ভয় ছিল না সাহেব! শরীরে বল না থাকিলেও দিব্য করিয়া বলিতে পারি আমার বিন্দুমাত্রও ভয় হয় নাই। আমি জানিতাম, তাহাকে আর একবার না দেখিয়া মরিব না। আমার খুব শীত করিতেছিল, এবং বোধ হইতেছিল—সাঁকোও বুঝি শীঘ্রই ভাসিয়া যাইবে।

জল কাঁপিতেছিল—বড় একটা তরঙ্গ আসিবার পূর্ব্বে যেরূপে কাঁপে। জলের বেগে সেতুর বামভাগ উত্থিত হইল—দক্ষিণ দিকের জাফ্রি জলের ভিতর ডুবিয়া গেল। আমি দাড়ি ছুঁইয়া বলিতে পারি—এ সমস্তই সত্য। মিরজাপুরের পাথরবোঝাই নৌকা বাতাসে যেরূপ ঘুরিতে থাকে, বার্হির সাঁকো সেই প্রকার ঘুরিয়া গেল। ঠিক এই রকমে গিয়াছিল সাহেব! অন্য রকমে নহে।

আমি সাঁকোর উপর হইতে গভীর জলে পড়িয়া গেলাম। আমার পশ্চাতে ক্রোধকম্পিতা বার্হির বিশাল তরঙ্গ। বার্হির গর্জ্জন শুনিতে পাইতেছিলাম। এবং সেই সঙ্গে শুনিতে পাইলাম, সাঁকোর মধ্যদেশের স্তম্ভ স্খলিত হইয়া

জলে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ঙ্কর শব্দ! তাহার পর অনন্ত জলরাশির উপর ভাসিয়া উঠিবার পূর্ব্বে আর কিছুই জানি না। সাঁতার দিবার জন্য হাত বাড়াইতে গিয়া জটাবদ্ধ কেশ হাতে ঠেকিল। লোকটা মরিয়া গিয়াছে। সেই ভীষণ সংগ্রামে 'বার্হির জোয়ান' ভিন্ন আর কেহই বাঁচে নাই। বোধ হইল, মড়াটা দুই দিনের। আমার হাসি আসিল। তবে নিশ্চয় তাহাকে দেখিতে পাইব। আঙ্গুল দিয়া তাহার চুল জড়াইয়া ধরিলাম—আমার মোটেই জোর ছিল না। দুই জনে ভাঁটিতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছিলাম—আমি জীবিত, সে মৃত। এই অবলম্বন না পাইলে আমি ডুবিয়া যাইতাম। আমার মজ্জায় মজ্জায় হিম প্রবেশ করিয়াছিল—হাড়ের উপর মাংস যেন সিদ্ধ হইয়া দাঁড়া-দাঁড়া হইয়াছিল। বার্হির প্রবল প্রতাপ যাহার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহার আর ভয় কি? তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা ভাসিয়া যাইতে দিলাম। অবশেষে দক্ষিণতীরাভিমুখ একটা প্রবাহ ধরিয়া তটের দিকে যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মড়াটা একটা ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া ক্রমাগত পাক দিতে লাগিল। ভাবিলাম, গাছের ডালে লাগিয়া বুঝি এমন ঘটিতেছে, এবং হয় ত এটাও শীঘ্র ডুবিয়া যাইবে। হঠাৎ ঝাউ গাছের মাথায় আমার হাঁটুতে ঘেঁস্ লাগিল। বুঝিলাম, বন্যাজলমগ্ন শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। পা বাড়াইতেই মাটী পাইলাম। বোধ হইল, একটা মাঠের আইল। অশথ গাছের নীচে একটা ঢিপির উপর মড়াটা বাধিয়া রহিল। আমি আনন্দে জল ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম।

বন্যার জলে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম—জানেন? পাতিরা গ্রামের পূর্ব্ব সীমানায় একটা ঢিপির কাছে। উপকার পাইয়াছি ভাবিয়া, বা পুনর্ব্বার দরকার হইতে পারে ভাবিয়াই হউক, ঘাসের উপর মৃতদেহটা টানিয়া আনিলাম। লম্বরদারের বাটীর নিকট নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া শৃগালের ন্যায় তিনবার চীৎকার করিলাম। কিন্তু প্রিয়তমা পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়াছিল। বার্হির প্রবল বন্যায় আমার কুটীর ভাসিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে আকুল-হৃদয়ে কাঁদিতেছিল। আমি হাঁটু-জল ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে সেখানে উপস্থিত হইলে, ভূত ভাবিয়া সে পলাইবার উপক্রম করিতেছিল—কিন্তু আমি তাহাকে বাহু দিয়া বেষ্টন করিলাম।.....সেকালে আমি ভূতের মতন ছিলাম না,—এখন যদিও বুড়া হইয়াছি বটে।

আমি তাহাকে বার্হির সাঁকো ভাঙ্গার কথা বলিলাম। সে বলিল,—

আমি দেবতা! ভরা বন্যার সময় বার্হি পার হওয়া মানুষের অসাধ্য। তাহার হাত ধরিয়া ঢিপির কাছে গিয়া যাহার সাহায্যে নদী পার হইয়াছিলাম, সেই মৃতদেহ তাহাকে দেখাইলাম। রাত্রের শেষভাগে আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছিল;—অস্পষ্ট তারার আলোতে সেই শবদেহ দেখিয়া সে মুখ ঢাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'এ যে হিরনাম সিং!' আমি বলিলাম, 'জীয়ন্ত অপেক্ষা মরা শূকরই বেশী কাজের।' 'নিশ্চয়ই! কারণ পৃথিবীর মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমকে সে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু যাই হোক, মড়াটা সরাইয়া ফেলাই উচিত। নতুবা লোকে আমাকে নিন্দা করিবে।' দেহটা বলিতে গেলে প্রায় তাহার ঘরের দুয়ারের নিকটই পড়িয়াছিল।

দেহটা গড়াইয়া দিয়া বলিলাম, 'খোদার মর্জ্জি,—তোমার রক্তে আমার হস্ত কলঙ্কিত হইবে না। এখন তোমাকে দাহঘাট হইতে ফিরাইয়া অন্যায় করিয়াছি কি না, সে বিষয়ের মীমাংসা তোমার ও বায়সদিগের মধ্যেই হউক।' বন্যার জলে তাহাকে ভাসাইয়া দিলাম। মিম্বার-বোর্ডে মোল্লার দাড়ীর মত তাহার দাড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছিল।

হিরনাম সিংকে আর দেখি নাই। ভোর হইবার পূর্ব্বে পরস্পরের নিকট বিদায় লইলাম। জঙ্গলের ভিতর যেখানে জল দাঁড়ায় নাই, সেইখান দিয়া চলিলাম। অন্ধকারে যাহা করিয়াছি, প্রভাতের আলোতে তাহা দেখিয়া অস্থি শিথিল হইয়া আসিল। পাতিরা গ্রাম ও সুদূর অপর পারের বৃক্ষ-সমূহের মধ্যে দুই-ক্রোশ-ব্যাপী ফেনোচ্ছ্বসিত জলরাশির ব্যবধান হইয়াছিল। মধ্যে বৃদ্ধের মাড়ির উপর ভগ্ন দন্তের ন্যায় বার্হি-পুলের স্তম্ভ জাগিতেছিল। জলের উপর জীবন্ত প্রাণীর—পাখীর—কি নৌকার চিহ্নমাত্র ছিল না। শুধু দলে দলে মরা জানোয়ার—মরা ঘোড়া, গরু—মানুষ ভাসিয়া যাইতেছিল। পর্ব্বতের নিম্নদেশের রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় সমস্ত জল লাল হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তেমন বন্যা আর দেখিলাম না। সে রাত্রে আমি যাহা করিয়াছিলাম, অন্য মানুষে তাহা করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি সে দিন ফিরিতে পারিলাম না। লম্বরদারের সমস্ত জোত জমা পাইলেও আমি অন্ধকারে ভিন্ন এমন অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না। অন্ধকারে বিপদ প্রচ্ছন্ন থাকে। নদীর এক ক্রোশ উজানে এক জন চামারের ঘরে আশ্রয় লইলাম। বলিলাম, বন্যার জলে আমাকে কুটীর হইতে ভাসাইয়া আনিয়াছে। এক সপ্তাহ পরে নৌকাযোগে ঘরে পঁহুছিলাম।

কুটীরের দেওয়াল, চাল কি মেঝের চিহ্নমাত্র ছিল না। ছিল শুধু—কাদা। সাহেব! বুঝিতে পারিবেন, জল কত বাড়িয়াছিল।

অদৃষ্টে ছিল—গৃহে, বাহির-গর্ভে, বা বাহির-পুলের নীচে মরণ হইবে না। সেই জন্য দুই দিনের বাসী মড়া হিরনাম সিংকে খোদা মিলাইয়া দিয়াছিলেন। আজ কুড়ি বৎসর হিরনাম সিং নরকে পচিতেছে, নিশ্চয় সেই রাত্রের স্মৃতিই তাহার নরকযন্ত্রণার চরম যন্ত্রণা।

শুনুন সাহেব! নদীর স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রভাতের পূর্ব্বে সে ঘুমাইয়া পড়িবে। ভোর হইতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী। আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার তেজ বাড়িবে। এ কথা কেমন করিয়া জানিলাম? আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছি—বাপ যেমন ছেলের আওয়াজ চিনিতে পারে, আমি কি বাহির স্বর তেমনই চিনিতে পারি না? প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার রাগ পড়িয়া যাইতেছে। খোদা মালুম, এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা কোনও বিপদ ঘটিবে না। কিন্তু সকালের কথা আমি বলিতে পারি না। সাহেব! জল্‌দি করুন—আমি রামপ্রসাদকে আনিতেছি—এবার সে আর ফিরিয়া আসিবে না। মোটঘাটের উপর ভাল করিয়া ত্রিপল বাঁধা হইয়াছে ত? মাহুত! বেটা গাধা! সাহেবের জন্যে শীঘ্র হাতী লইয়া আয়! ও পারে বলিস্—সকালে আর পার হওয়া যাইবে না।

টাকা? না সাহেব, অমি সেরকম নই। না না, ছেলেপুলেকে মিঠাই কিনিয়া দিবার জন্যও চাহি না। আমার গৃহ শূন্য—আমি বৃদ্ধ।

হুৎ রামপ্রসাদ! হুৎ! হুৎ! হুৎ! সাহেব তোমার ভালো হোক—বিদায়! *

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

* কিপ্‌লিং হইতে ভাষান্তরিত।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ব্রেটহার্ট।

প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রেট হার্টের The Luck of Roaring Camp প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে এই নবপ্রকাশিত পুস্তকখানি সাহিত্যজগতে এক জন নূতন প্রতিভাশালী গ্রন্থলেখকের আবির্ভাব সূচিত করিয়াছিল। সম্প্রতি ব্রেটহার্টের সমগ্র গ্রন্থাবলী চতুর্দ্দশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর আয়তন প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ গল্প আছে। গল্পগুলির প্রধান ঘটনাস্থল, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরদেশ; কিন্তু নিউ ইংলণ্ড, ওল্ড ইংলণ্ড ও জর্ম্মণিও কয়েকটি গল্পের ঘটনাস্থলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মিঃ চার্লস ওয়ারেণ ষ্টডার্ড, "আটলাণ্টিক মন্থলি" নামক প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে এই সমস্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদিও গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যশিল্পচাতুরী, মনোহারিতা ও লোকরঞ্জনতার হিসাবে তারতম্য আছে, তথাপি নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে, তাঁহার কোনও রচনাই অসার, অলীক ও অপদার্থ মনে করা যায় না।

১৮৫৪ সালে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্রেটহার্ট কালিফর্ণিয়ায় প্রথম আগমন করেন। সেই সময়ের কয়েকটি ঘটনা আমরা মিঃ ষ্টডার্ডের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।—যখন ব্রেটহার্টের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর, এবং দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, তখন তিনি যৌবনসুলভ উৎসাহে কষ্টসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হন, এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় শীঘ্রই তাঁহার প্রতিভার অনুকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। তিনি কিছু দিন পল্লীগ্রামে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং শিক্ষকের ব্যবসায়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, কতিপয় অতি সুন্দর গল্পে তাহার নিদর্শন দিয়াছেন। তাহার পর কিছু দিন তিনি মুদ্রাকরের ব্যবসায়শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন; পরে পাড়াগেঁয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি কিছু দিন দ্রুত সংবাদবাহকের কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে বন্দুকধারী দস্যুসঙ্কুল গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। ইহাতে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি বরং আনন্দ উপভোগ করিতেন; সৌভাগ্যক্রমে কোন বিপদই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ যৌবনসুলভ স্বাস্থ্যের কল্যাণে তিনি সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতেন। এই সময়ে যদিও তিনি প্রায়ই বিপদে পড়িতেন, তথাপি তাঁহার জীবনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের অভাব ছিল না। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি অজ্ঞাতসারে গ্রন্থকারের অনুকূল কয়েকটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সঙ্কটসঙ্কুল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তিনি মানবজীবনের যে ছায়ালোকসম্পাত, যে বৈচিত্র্য, যে ভাববাহুল্য দেখিয়াছিলেন, অতি অল্প লেখকই সে সকল লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

প্রথম জীবন।

ইহার পরে ব্রেটহার্ট কিছু দিন সান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরীতে "গোল্ডেন ইরা" নামক সংবাদপত্রের যন্ত্রালয়ে কম্পোজিটারের কার্য্য করেন। এই সময়ে তাঁহার "ম্লিস" নামক প্রথম রচনা "গোল্ডেন্ ইরা"য় প্রকাশিত হয়। পরে তিনি ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত "দি কালিফর্ণিয়ান" নামক সংবাদপত্রের লেখক হইয়াছিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে তাঁহার প্রকৃত ব্রতের আরম্ভ; ইহা হইতেই তাঁহার অক্ষয় যশের সূত্রপাত।

১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে "দি ওভারল্যাণ্ড মন্থলি" প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ব্রেটহার্ট এই মাসিকের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এণ্টন রোমান নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক একখানি মাসিকপত্রপ্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া, সে বিষয়ে নানা লেখকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের পরামর্শেই তিনি পত্রপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হন। ব্রেটহার্ট এই সময়ে "গোল্ডেন ইরা" নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন। মিঃ ষ্টডার্ড, ব্রেটহার্টকে "ওভারল্যাণ্ড মন্থলির" সম্পাদক-পদের যোগ্য স্থির করিয়া, মিঃ রোমানকে তাঁহার নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেন। এই মাসিকের অগষ্ট-সংখ্যায় তাঁহার "দি ল্যাক্ অফ্ রোরিং ক্যাম্প" প্রকাশিত হয়।

সাফল্যের সূত্রপাত।

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যে সংশয় ছিল, এই রচনা প্রকাশিত হইবার পরে তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। এই রচনা প্রকাশিত হইবার পরে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সফলতালাভ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রহিল না। এই রচনায় অসাধারণ মৌলিকতা, পুরুষোচিত তেজ ও মানসিক বলের সমন্বয় দর্শন করিয়া, এক জন স্ত্রী-কম্পোজিটার এই রচনার বিরুদ্ধবাদিনী হইয়া উঠে। পত্র-সম্পাদক হইতে কম্পোজিটর, কার্য্যাধ্যক্ষের কর্ম্মচারী হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, যাঁহারা এই রচনা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ব্রেটহার্টকে অনেক ভুগিতে হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার উদ্দেশ্য, সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা ও সুরুচি সম্বন্ধেও নানা জনে বিবিধ জল্পনা করিয়াছিল। ব্রেটহার্ট বলিলেন, যদি পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার গল্প প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে তিনি সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভয়প্রদর্শনের ফলে, পরিশেষে, তাঁহারই জয় হয়। "দি ওভারল্যাণ্ডের" স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। ব্রেটহার্টের কীর্ত্তি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বায়রণ লিখিয়াছেন, 'এক দিন প্রভাতে জাগিয়া দেখিলাম,—আমি যশস্বী হইয়াছি।' ব্রেটহার্টের ভাগ্যেও প্রায় সেইরূপ ঘটিয়াছিল। এই রচনায় তাঁহার যশ সহসা অপসৃতমেঘাবরণ দীপ্ত প্রভাকরের মত চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

রচনা যাহাতে নিখুঁত হয়, ব্রেটহার্টের সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি। এমন কি, একটি সামান্য শব্দের জন্যও তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করেন। যথাস্থানে উপযুক্ত শব্দটির ব্যবহার করিতে পারিলে পদের লালিত্য বর্দ্ধিত হয়, রচনা শক্তিশালিনী হয়!

ভাষা।

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি"—ইহাই তাঁহার আদর্শ,—রচনার মূলমন্ত্র। ব্রেটহার্টের রচনা তাঁহার অন্তরের কথা। একবার এক জন ব্রেটহার্টের রচনার এক অংশ পাঠ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; ব্রেটহার্টের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যখন উহা লিখিয়াছিলাম, তখন আমিও কাঁদিয়াছিলাম।'

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

যবদ্বীপ।

পৃথিবীর জ্ঞানবিস্তারের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নাম সুবর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। মানবের সুখসমৃদ্ধিবিস্তারে, জ্ঞানের সার্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষবিধানে, আমাদিগের যুগ দৃষ্টান্তস্থল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভূত উন্নতির প্রধান কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরসম্মিলন। অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ স্বয়ং আমাদিগের বাহন,—এই গমনাগমনের সুবিধার দিনে, সুদূর সিন্ধুসলিলবিধৌত শষ্পপল্লবশ্যামল মধুর-

জলকল্লোলমুখরিত দ্বীপভাগে ভ্রমণ করিয়া, অনিন্দ্যসুন্দরী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে কাহার মন না ব্যাকুল হয়? শত বৎসর পূর্ব্বে দেশভ্রমণ বিলাসের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এখন ইহা অন্নবস্ত্রের ন্যায় আবশ্যক বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। আমাদের দেশে পূজা ও বড়দিনের অবকাশে "পশ্চিমে" যাইবার পদ্ধতি, ইহারই উদাহরণ। যাঁহাদিগের জ্ঞান গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাঁহারাও এখন পৃথিবীর সুদূরপ্রান্তস্থিত অষ্ট্রেলিয়াণ্ডের নবাবিষ্কৃত স্থান সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিতে পারেন। সুতরাং কোনও ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা এখন একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ ঘটনাকে গ্রন্থকারের কল্পনার রঞ্জিন কাচফলকের মধ্য দিয়া দেখাইতে পারিলে, তাহা গুণগ্রাহী পাঠকের নিকট প্রশংসালাভ করিতে পারে; কিন্তু দেশবিশেষ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিয়া পাঠকের প্রসাদলাভ আজকাল সহজ নহে। অল্প দিন হইল, কুমারী অগষ্টা ডি উইট Facts and Fancies about Java নামে এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। পুরাতন যবদ্বীপ আমাদিগের পরিচিত এবং ঐতিহাসিক স্থান। ইহার সৌরকরমণ্ডিত পর্ব্বতমালাচুম্বিত সুনীল আকাশ ও স্বর্গীয়-সুষমাময়ী বনদেবী ভ্রমণকারীর হৃদয় ভাবরসে আপ্লুত করিয়া তুলে। অনুবাদে কুমারী ডি উইটের রচনার ভাষামাধুর্য্যের রক্ষা করা কতকটা অসম্ভব হইলেও, তাঁহার পুস্তকের দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিব:

জাহাজ লাগিবার পর আধ ঘণ্টা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক ভাবে কাটিয়া যায়। কিন্তু এই নূতন দেশে এই প্রথম ব্যাপারেও কিছু নূতনত্ব আছে। জাহাজে বিশাল জনতা, কিন্তু গোলমালমাত্র নাই। অনেক লোকের পদশব্দ, হুড়াহুড়ি, চীৎকার, কলহ, কোলাহল নাই; মুটিয়াগণ বৃহৎ বৃহৎ বাক্সগুলা 'কাঁধের উপর ফেলিয়া প্রায় নিঃশব্দে যাইতেছে। প্রত্যেক কুলি তাহার পালার প্রতীক্ষায় আফিসে অথবা প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতেছে। যখন কোনও য়ুরোপীয় ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহাদিগের মধ্য দিয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের সরল শান্ত মুখমণ্ডলে যুগপৎ ঘৃণা ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, দিনের ভিতর আরও ত কত সময় রহিয়াছে, আরও ত কত দিন পড়িয়া রহিয়াছে, তবে ইহারা এত ব্যস্ত কেন? অমঙ্গল হইতেই ব্যস্ততার জন্ম, ইহারা কি তাহা জানে না?

অবতরণ।

ভারতীয় ইংরাজগণ রেলওয়ে ষ্টেশনে কোলাহলকুতূহলী কুলিদিগের অশিষ্ট ব্যবহারে যেরূপ অভ্যস্ত, তাহাতে কুমারী অগষ্টার অবতরণকাহিনী, তাঁহাদের নিকট বিশেষ আমোদজনক বলিয়া বোধ হইবে। ভারতের সহিত যবদ্বীপের অনেক বৈষম্য আছে; তন্মধ্যে ইহার হোটেল একটি। যবদ্বীপের হোটেলগুলি এমনই অসুবিধাজনক যে, গ্রন্থকর্ত্রীর অভিজ্ঞতা এখানে কাহারও অসূয়ার বিষয় হইবে না।

গ্রন্থকর্ত্রী লিখিতেছেন,—ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছি। সহরের প্রখর রৌদ্র, বিচিত্রবেশসজ্জিত জনতা, নূতন নূতন দৃশ্য ও নানা প্রকার অদ্ভুত শব্দ, এই সকলের মদিরতা যেন আমাকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল;—কেবল মদই যে মত্ততার কারণ নহে, এ সম্বন্ধে হোমারের সহিত আমিও সম্পূর্ণ একমত। গৃহের পশ্চাৎভাগ দিয়া অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সহিত প্রবেশ করিলাম। আহারস্থলের দিকে চাহিয়া দেখি,—অন্ন, মৎস্য, মাংস ও ফলের পাত্রে টেবিল পূর্ণ। আমার সম্মুখে যাহা পড়িল, তৎসমস্তই নিজের পাত্রখানিতে রাশীকৃত করিলাম। আমি আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার পর যে কি হইল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সহজ নহে। এইটুকু লিখিতে যত

হোটেল।

সময় লাগিয়াছে, তদপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে আমি অতীব যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। গরম চামচের সংযোগে আমার ওষ্ঠাধর জ্বলিতে লাগিল, এবং সেই জ্বালানিবারণ করিবার জন্য যে জল পান করিলাম, তাহাতে আমার গলা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। আমার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া আসিল, কষ্টে অশ্রুধারার গতিরোধ করিলেও,—যন্ত্রণা নিতান্তই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমার পার্শ্বে একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন; তিনি আমাকে জিহ্বায় কিঞ্চিৎ লবণ দিতে বলিলেন। দুই এক মিনিট দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাভোগের পর একটু আরাম বোধ করিলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখনও ভুলিয়াও এরূপ আহারের দিকে চাহিব না। বলা বাহুল্য, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি নাই।

যবদ্বীপবাসী ডাচগণ গ্রীষ্মের ন্যূনাধিক্য ও আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মহিলাগণ গ্রীষ্মকালে শীতপ্রধান দেশের ক্লেশদায়ক বেশের পরিবর্ত্তে দেশীয় পোষাকই পছন্দ করেন। এখানে বাধ্য হইয়া শ্রীমতীদিগকে বেশের বিলাস ত্যাগ করিতে হয়। ইংরাজগণ উষ্ণপ্রধান দেশে মধ্যাহ্নকালে বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করেন, কিন্তু এখানকার ওলন্দাজগণ সে বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধিমান, সন্ধ্যার সুশীতল ছায়ায় ইঁহারা বহির্গত হন।

পোষাক ও ভ্রমণ।

ছয়টার সময় সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। বাহিরে বারান্দায় যাঁহারা বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারা চা পান শেষ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; আধ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, কতকগুলি য়ুরোপীয় ভদ্রলোক, তাঁহাদিগের সামাজিক পরিচ্ছদে, ও তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকটি মহিলা পারিস নগরীতে প্রস্তুত পোষাকে সজ্জিত হইয়া, বাহিরে আসিলেন। আমি তখনই প্রথম শুনিলাম যে, বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার এই প্রশস্ত সময়। আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। বিশাল স্তম্ভোপরি স্থাপিত হোটেলের বিস্তৃত কক্ষ আলোকমালায় উদ্ভাসিত। একটি বালিকা পিয়ানোর সঙ্গে তাহার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া একটি গান গাহিতেছে।

রাত্রি আটটার সময় যখন আহার করিতে গেলাম, তখন প্রাতের সেই ভোজনব্যাপারের দুর্দ্দশা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে আমার ভোজনপাত্র পরিবর্ত্তনার্থ প্রসারিত একখানি হাত দেখিয়া আমার সেই ভ্রম অপনোদিত হইল।

পূর্ব্ব দেশের সমস্ত সহরের ন্যায় ব্যাটাভিয়াতেও চীনাম্যানগণ আপনাদিগের সংখ্যা ও পশার বিস্তার করিতেছে। সহরের মধ্যে ইহাদিগের কতকগুলি পল্লী আছে। এক দিকে উদ্যমশীল পরিশ্রমী চীনাম্যান অর্থোপার্জ্জনে ব্যতিব্যস্ত, অপর দিকে আলস্যপ্রিয় চিন্তাশীল যবদ্বীপবাসী আতপতাপোপভোগ করিয়া স্বপ্নরাজ্যের কুহকে মগ্ন! যবদ্বীপে চীনাম্যান কায়মনঃপ্রাণে বাণিজ্যে নিরত। মাতৃক্রোড় হইতে সমাধি পর্য্যন্ত, আহারে বিহারে, আমোদে প্রমোদে, শয়নে স্বপনে, অহিফেন-সেবনে, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, চীনাম্যান বাণিজ্যের অবতার। ইহাদের চিন্তা ও বুদ্ধি 'টাকা আনা'য় প্রকাশ করা যায়। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটা ইহাদের নিকট অর্থোপার্জ্জনের একটা প্রকাণ্ড সুযোগমাত্র, এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই ইহাদের পণ্য দ্রব্য। ইহাদের ভাষায় বাণিজ্য বলিতে শ্রীমানের পক্ষে লাভ ও অন্যান্য সকলের পক্ষে লোকসান বুঝায়। ইহাদের অভাব অতি অল্প; উপায় ও সুযোগ অসংখ্য, এবং ব্যবসায়কুশলতা সম্বন্ধে আত্মনির্ভর যথেষ্ট। সুতরাং ইহারা যে কৃতকার্য্য হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ইহাদের এক জনের জীবন যত্নসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। প্রথমে দেখিবে, কোন এক সহরে আসিয়া, চীনাম্যান গুলিরুটী, চিরুণী ও দেশালাইএর এক ব্যাগ স্কন্ধে করিয়া চলিয়াছে।

চীনাম্যান।

কয়েক মাস পরে দেখিবে, সে হয় ত তোমার বাড়ীতেই ভৃত্যবর্গের নিকট পোষাক ও রেশমী কাপড় বিক্রয় করিতেছে। এক বৎসর যাইতে না যাইতে দেখিতে পাইবে, তাহার বোঝা মস্তকে লইয়া এক জন মুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পশ্চাতে চলিয়াছে। আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, দেখিবে, সেই চীনাম্যান একখানি ছোটখাট দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে, এবং তখন একখানি বড় কৌচ ও দেয়ালে একখানি বড় আয়না তাহার দোকানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। কয়েক বৎসর পরে দেখিবে, সে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন একখানি বড় নূতন দোকানে অর্দ্ধশায়িত ও অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া অতি সুরুচির সহিত অহিফেন সেবন করিতেছে। এবং যদি তোমার ভাগ্যে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীর দর্শনলাভ ঘটে, তাহা হইলে তুমি সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপার উজ্জ্বল অলকাবলীতে উজ্জ্বলতর হীরার ফুল দেখিয়া বিস্মিত হইবে। বন্ধুবর এখন উন্নতির পথে অগ্রসর! সত্বরই তাঁহার কারুকার্য্যখচিত সুন্দর সুসজ্জিত আবাসহর্ম্ম্য রাজবর্ত্মশ্রীর সুষমা-বর্দ্ধন করিবে।

ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণের সমাজে নৈতিক বল ও দুর্ব্বলতা উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন সমাবেশ প্রচলিত, সেখানে গুজব একটু আধটু থাকিবেই। যববাসিগণ বিশেষ শান্ত, মিতাচারী ও সরলপ্রকৃতি; শিকার প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদিগের উৎসাহ ও দক্ষতা থাকিলেও, অলসতা তাহাদিগের স্বভাবগত ব্যাধি। ইহাদিগের ধারণা,—যত অমঙ্গল হইতেই ব্যস্ততার সৃষ্টি। ইহাদের কতকগুলি গার্হস্থ্য আচারপদ্ধতি পাশ্চাত্য রুচির নিতান্ত বিরোধী।

দেশবাসিগণ।

যববাসিগণ তাহাদিগের শিশুসন্তানগুলিকে কিরূপে আহার করাইয়া দেয়, তৎসম্বন্ধে কুমারী অগষ্টার বর্ণনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক।

অন্যান্য অনেক বিষয়ে শিশুসন্তানদিগের স্বাধীনতা থাকিলেও, ইহাদের আহার সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। শিশুদিগকে কখনও ইচ্ছামত খাইতে দেওয়া হয় না। জননীগণের সংস্কার, তাহারা নিজে খাইতে গেলে কিছুমাত্র খাইবে না। স্বভাবের এই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যগ্র। জননী অন্নের থালা সম্মুখে রাখিয়া, শিশুসন্তানকে বলপূর্ব্বক ক্রোড়ের উপর ফেলিয়া, অন্নের গুটি পাকাইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে সেই অন্নপিণ্ড শিশুর গলনলীর অভ্যন্তরে চালান দেন!—অবশ্য এইরূপ ব্যাপারে শিশুর আহারস্পৃহা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে চীৎকার করিয়া দম আটকাইয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একরকমে যখন সমস্তটা গলাধঃকরণ করে, তখন মার মনে হয় যে, শিশু যথেষ্ট আহার করিয়াছে! অর্থাৎ, যখন তাহার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, আর একটু অন্নকণারও স্থান নাই, তখন বেচারীর নিষ্কৃতি!

সন্তানগণের আহার।

জননী।

১

জননী-হৃদয় তুমি না জান তা' নয়
জগত-জননী, তুমি মা জননী-পরা—
তোমার যে স্নেহ-রাগিণীর সুধাময়
আনন্দ-হিল্লোলে, তপন শশাঙ্ক ধরা
বিকশিত সৃষ্টি-স্রোতে—কুসুম-নিচোলা
বসন্ত-মাধুরী যাহার প্রথম তান—
পূর্ণ-পূর্ণিমায় তার আপন-বিভোলা
সুর লক্ষ্মী-রূপে বিরাজে মায়ের প্রাণ।

আছে কি কোথাও দেবি, এমন কোমল?—
অমঙ্গল ছায়া স্বপ্নে ব্যথিতা হরিণী—
আছে কি এমন দেবি, সুদৃঢ়—সবল?
প্রিয়-শুভ তরে বুকে ধরে যে অশনি—
"মা" বলে তোমারে ডাকে মানব-হৃদয়
ভক্ত যবে পায় তব স্নেহ-পরিচয়!

২

মা হয়ে মায়ের প্রাণ কোন প্রাণে তুমি
কাঁদাও জননি তবে? জ্বালাও মৃত্যুর
অলঙ্ঘ্য বিরহ দাহে—অসীম মধুর
আনন্দময়ীর হৃদয়-স্বরগ-ভূমি
নির্ব্বাপিত কর অনির্ব্বাণ হলাহলে।
শূন্য ক্রোড় অভিশাপ মার, তিরস্কার
নহে কি তোমার? পরদিন মুখ তার
উষা আসি কেমনে দেখায়? অশ্রুজলে
না মুছায়ে লয় সন্ধ্যা কেমনে বিদায়?
জ্যোৎস্নাবাস নিশীথিনী পরায় কেমনে
সে শোক-আঁধার-স্পর্শ-অশুচি আপনে
যে আঁধারে রবি-শশী আলো না জুয়ায়?
নাহি সামঞ্জস্য দেবি, তোমার ধরায়—
মার প্রাণে মৃত্যুশোক—অ-শোক ভুবনে।

৩

অপূর্ণা সৃষ্টির মাঝে সম্পূর্ণা জননী,
স্নেহ-কর্ত্তব্যের তার নাহিক স্খলন।
নিঃস্বার্থের এক মূর্ত্তি!—মিটায় তখনি
জাগায় যে সাধ স্নেহ।—উদার পাবন
নিজের জীবন দিয়া রক্ষিছে জীবনে।
লুপ্ত করি ধূলি-নত স্বার্থ জগতের
সে স্নেহ করেছে জয় দুর্জ্জয় আপনে।
এ কি ঘোর উপহাস সে মাতৃস্নেহের!

এ কি ঘোর উপহাস!—সে অসীম স্নেহ
পায়নি ক্ষমতা হায়, সৃষ্টির নীতিতে,
মৃত্যু যবে আসে নিতে, অন্ধ করি গেহ,
প্রাণ দিয়া প্রাণাধিকে বুকেতে রাখিতে।
মরত-জননী—তুমি দরিদ্রা আমার!—
জগত-জননী হতে শ্রেষ্ঠ শতবার।

৪

এ কি রে প্রলাপ মূঢ়—পাপ অভিমান—
অন্ধ, করিতেছ সূর্য্যে তিমির আরোপ!
স্নেহের আকরে দেখ স্নেহের বিলোপ!
যা' হতে মায়ের প্রাণ তার নাই প্রাণ!—
ভাবিলি না হায় মূঢ়, নিজে কি জননী
গড়িয়াছে সঙ্গোপনে সে স্নেহ অচল
যাহার অমৃত-স্রোতে জীয়ে ধরাতল?
শিশু কি গড়িল নিজে সে স্নেহের খনি?

কত দূর দৃষ্টি চলে অন্ধ মানবের!
কে দেখেছে জীবনের পরিণাম হায়!
যখন আসিলে অন্ধ—রিক্ত—অসহায়,
মা দাঁড়া'ল অযাচিত স্নেহ-দাসত্বের
অপেক্ষায়! আছে পুনঃ পারে মরণের
মাতা হতে মাতৃতমা তব প্রতীক্ষায়।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

মাধবী দেবী।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"শ্যামানন্দ পুরী নিজকে দুঃখিনী ও শিবানন্দ আপনাকে 'শিবাসহচরী' বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। পাঠক মেয়েলী নাম পাইয়া স্ত্রীকবির খোঁজ করিতে করিতে দেখিবেন, ভক্তির ইন্দ্রজালে পুরুষগণ স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রতিভাত হইয়াছেন।"—১৬৯পৃঃ।

আমরা দেখিতেছি, দীনেশ বাবু স্ত্রীকবির সন্ধান বিষয়ে তাঁহার পাঠকগণকে এইরূপ সতর্ক করিয়া দিলেও, তিনি নিজেই জনৈক পুরুষ কবির কীর্ত্তিহার একটি স্ত্রীলোককে অর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত বৈষ্ণব-গ্রন্থরহস্যাভিজ্ঞ তত্ত্বনিধি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাধবী দেবীকে পদকর্ত্তা মাধবীদাসের কীর্ত্তিবাস পরাইয়া, অপ্রতিভাতস্ত্রীপ্রতিকৃতি পুরুষনামধারী পুরুষ কবির বনবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীতরত্নাবলী, প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রভৃতি পদাবলী-সংগ্রহের মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি পদকর্ত্তৃগণের ও তাঁহাদের রচিত পদাবলীর একটি তালিকা প্রস্তুত করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তালিকায় কোনও স্ত্রীকবির নাম নাই। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, তাহার ১৭৪ ও ৩২১ পৃষ্ঠায় শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীকে অনেকগুলি পদের রচয়িত্রী বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই, এবং সম্প্রতি "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় (৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা) "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে তত্ত্বনিধি শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাধবী দেবীর বিবরণ ও তাঁহার পদাবলীর সমালোচনা সহ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। দীনেশ বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়, মাধবী দেবীর যে পরিচয় ও তৎকৃত পদাবলীর যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার সংগৃহীত বিবরণের তুলনা করিয়া, সেই সকল পদ মাধবী দেবী বা অন্য কোনও স্ত্রী কবির রচিত কি না, তদ্বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সেই সন্দেহ কত দূর সমূলক, তাহার আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

দীনেশ বাবু পদকল্পতরুগ্রন্থেই মাধবীর পদ পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন, এবং তিনি পদকল্পতরুর ৭৮৮। ১৮৪। ২১৯২ এবং ২১৯৩ সংখ্যক পদগুলিকে শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলেন। * বটতলায় মুদ্রিত কয়েকখানি পদকল্পতরুতে দেখিলাম যে, ২১৯৩ সংখ্যক পদটিতে "মাধবী," এবং অপর তিনটি পদে "মাধবী দাস" এই ভণিতা আছে। সমগ্র পদকল্পতরুগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, "মাধবীদাস" এই ভণিতাযুক্ত আরও দুইটি পদ পাওয়া যায়। তত্ত্বনিধি মহাশয়ও পরিষৎ-পত্রিকায় "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে এই দুইটি ও দীনেশ বাবুর উক্ত চারিটি, সর্ব্বসমেত এই ছয়টি পদ, মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য পদকল্পতরুর সংখ্যা সহ উক্ত ছয়টি পদ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

১

রাধামাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস পরশ রস পিবই
কমলিনী মধুকর রাজ ॥
সচকিত নাগর কাঁপই থর থর
শিথিল কয়ল সব অঙ্গ।
গদগদ কহয়ে রাই ভেল অদরশ
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ ॥
সো ধনি চাঁদবয়নি কিয়ে হেরব
শুনব অমিয়াময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয়ে তাপ কিয়ে মিটব
সোই করব কিয়ে কোল ॥
ঐ ছলে কতহুঁ বিলপয়ে মাধব
সহচরী দূরতহিঁ হাস।
অপরূপ প্রেমে বিষাদিত অন্তর
কহত হিঁ মাধবী দাস ॥

প. ক. ৭৮৮।

২

পরশিতে রাই-তনু আপনে ভুলল কানু
মূরছি পড়িল ধনী-কোর।
শ্যামক হেরইতে ধনি ভেল গদগদ,
ঢরকি ঢরকি বহে লোর ॥
শ্যাম মূরছিত হেরি চকিতে ললিতা ফিরি
রাধামন্ত্র শ্রুতিমূলে দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু নিরখই রাইতনু
হেরি সখী চমকিত ভেল ॥
চিত্রপুতলী হেন বেঢ়ল সখীগণ
নিরখই শ্যাম-মুখচন্দ্র।
কি ভেল কি ভেল বলি, ধাওল বিশখা আলী
সব জনে লাগল ধন্দ ॥
শ্যামর সুন্দর বদন সুধাকর
সুমুখী নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস কহই মাধবী দাস
বিদগধ মাধব রাধে ॥

প. ক. ৭৮৯।

৩

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে চায় ॥
লতা তরু যত দেখি শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় ফুটন
মেঘগণে দেখে রাতা ॥
ডালে বসি পাখী মুদি দুটি আঁখি
ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচান্দ নাম লৈয়া ॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ে গা ॥

প. ক. ১৮০৪।

৪

কলহ করিয়া ছলা আগে পঁহু চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচলে রায়।
যতেক ভকতগণ হৈয়া সকরুণ-মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায় ॥
নিতাই বিরহ আনলে ভেল বন্দ।
আঠার নালাতে হৈতে নাচিতে নাচিতে পথে
যায় নিতাই অবধৌত চন্দ্র ॥
সিংহদুয়ারে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায়।
হরেকৃষ্ণ হরি বলে দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে
নীলাচলবাসীরে সুধায় ॥
জাম্বুনদ হেম জিনি গৌরাঙ্গ বরণখানি
অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেমভরে গর গর আঁখিযুগ ঝর ঝর
হরি হরি বোল বলি ধায় ॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ ভ্রমে পঁহু দেশ দেশ
এবে ভ্রমে সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসে কয় অপরূপ গোরা রায়
ভট্টগৃহে করয়ে প্রবেশ ॥

প. ক. ২১৯২।

৫

নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুকুন্দ গদাধরে।
দেখিলেন গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ঘরে ॥
প্রতপ্তকাঞ্চনকান্তি অরুণ বসন।
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন ॥
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে শোভিত।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধে তিলক শোভিত ॥
গোপীনাথ, বাণীনাথ, সার্ব্বভৌম কাশী।
গৌরারূপ দেখে যত নীলাচলবাসী ॥
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর।
মিলিলেন গৌরাচাঁদের যত অনুচর ॥
যেই দেখে গৌরামুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে ॥

প. ক. ২১৯৩।

৬

আনন্দে নাচত সঙ্গে ভকত
গৌর কিশোর-রাজ।
ফাগু উঝালি করে ফেলাফেলি
নীলাচল পুরী মাঝ ॥
শুনিয়া নাগরী প্রেমেতে আগরী
ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌর পড়িলা ফাঁপরে
বদন চাহিয়া থাকে ॥
দু' বাহু তুলিয়া বেড়ায় নাচিয়া
ভকতগণের সঙ্গ।
নীলাচলবাসী মনে অভিলাষী
কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ ॥
বাজে করতাল বোলে ভালি ভাল
আর বাজে তাহে খোল।
মাধবী দাস মনেতে উল্লাস
সদা বোলে হরিবোল ॥

প. ক. ২২৪২।

এই পদগুলির মধ্যে, পদকল্পতরুর একমাত্র ২১৯৩ সংখ্যক পদে "মাধবী", ও অপরগুলিতে "মাধবীদাস" এই ভণিতা আছে। পদগুলির মিলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, পদকল্পতরুর ৭৮৮, ৭৮৯, এবং ২২৪২ সংখ্যক পদত্রয়ের ভণিতায় সকারান্ত পঞ্চাক্ষরযুক্ত নাম (যথা মাধবীদাস) ভিন্ন স্ত্রীবাচিকাপদবীযুক্ত

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩২১ পৃষ্ঠা।

কোনও নাম (যথা মাধবীদাসী) থাকিতে পারে না, এবং পদকল্পতরুতেও নাই। তত্ত্বনিধি মহাশয়ের "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধেও উদ্ধৃত পদত্রয়ে "মাধবী দাস" আছে। কিন্তু অপর দুইটি অর্থাৎ পদকল্পতরুর ১৮০৪ ও ২১৯২ সংখ্যক পদের ভণিতায় "মাধবী দাস" ভণিতা আছে, এবং তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত পদে সেই স্থলে "মাধবী দাসী" ভণিতা আছে। এই পাঠান্তর কোন্ গ্রন্থে আছে, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের প্রবন্ধে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

এ স্থলে আমার মনে এই কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হইতেছে,—

১ম,—দীনেশ বাবু পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ এবং ২১৯৩ সংখ্যক পদচতুষ্টয়কে যে শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলিয়াছেন, তাহা সমূলক কি না?

২য়,—উক্ত পদগুলির "মাধবী দাস" এবং "মাধবী" এক ব্যক্তি, অর্থাৎ শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবী কি না?

৩য়,—উদ্ধৃত ছয়টি পদের রচয়িতা কে? এবং তিনি পুরুষ কি নারী?

পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদ যে শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে দীনেশ বাবু তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়ও শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, অথচ তাহার কোন অনুকূল প্রমাণের প্রয়োগ করেন নাই। মাধবী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পরিগণিতা ছিলেন, কিন্তু তিনি যে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ইত্যাদির পরিচয়স্বরূপ তাঁহাদের পদাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, রামানন্দ স্বরচিত পদ দ্বারা চৈতন্যদেবের আনন্দবিধান করিতেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; গুণরাজ, সনাতন, গোপালভট্ট, স্বরূপ, দামোদরাদির গ্রন্থপ্রণয়নের কথা তাঁহাদের পরিচয়স্বরূপ বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হন নাই, অথচ শ্রীচৈতন্যদেবের, তাঁহারই বর্ণিত "সাড়ে তিন জন" পাত্রের অন্তর্গত "এক জন" পাত্র শিখিমাহিতির ভগিনী, এবং স্বয়ং "অর্দ্ধ জন" পাত্র মাধবী দেবীর পদাবলীর উল্লেখ করিবেন না, ইহা কিয়ৎপরিমাণে বিস্ময়জনক। মাধবী দেবীর রচিত পদ থাকিলে, সেই পদ কোন না কোনরূপে চৈতন্যদেবের শ্রবণপ্রীতি সম্পাদন করিত, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা ব্যাসাবতার বৃন্দাবন

দাস তাহার উল্লেখ করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কাব্যে গোবিন্দ দাসাদির পদাবলীর উল্লেখ আছে, কিন্তু মাধবী দেবীর পদাবলীরচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত আমার বিশ্বাস,—মাধবী দেবী কোনও পদাবলীর রচনা করেন নাই।

মাধবী দেবী যে শিক্ষিতা ছিলেন, তাহারও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"মাধবীর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তাঁহার স্বল্পাক্ষরগ্রথিত রচনাক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিগৌরবে মোহিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র, স্ত্রীলোক হইলেও, মাধবীকে এই সম্মানিত পদে (লিখনাধিকারীর পদে) নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" (১)

শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় কোন্ গ্রন্থে মাধবী দেবীর রচনাক্ষমতা, পাণ্ডিত্য, ও বুদ্ধিগৌরবের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থে মাধবী দেবীর এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। অপর দিকে চৈতন্যচরিতামৃতকারের—

"শিখিমাহিতি নাম এই লিখনাধিকারী।" (২)

এই বর্ণনা হইতে প্রতীত হয় যে, শিখিমাহিতিই প্রতাপরুদ্রের সময় লিখনাধিকারী ছিলেন। শিখিমাহিতির ভগিনী লিখনাধিকারীর পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত প্রবীণ লেখক নিশ্চিত তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের অন্তখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে,

"শিখিমাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী তেঁহ পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখাকার যাঁরে রাধিকার গণ।"

এইরূপ বর্ণনা আছে। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ্বরগুপ্ত, ভূধর চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ দত্ত ও বটতলার প্রকাশিত সকল সংস্করণের চরিতামৃতেই উক্ত পংক্তিত্রয়ের শেষ চরণের "যাঁরে" স্থলে পাঠান্তর নাই, কিন্তু তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে ঐ "যাঁর" স্থলে "যেই" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন,—

"চৈতন্যচরিতামৃতে এই জন্যই (মাধবী দেবী লিখনাধিকারীর পদ পাইয়াছিলেন বলিয়া) মাধবী 'প্রভুলেখাকার' বলিয়া লিখিত আছে।"

তত্ত্বনিধি মহাশয় সম্ভবতঃ মাধবীর লিখনাধিকারী পদপ্রাপ্তির প্রমাণ জন্য উক্ত পংক্তিত্রয় স্বপ্রণীত প্রবন্ধে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত রূপ উক্তি করিয়া-

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ১৬০ পৃঃ। (২) দশম পরিচ্ছেদ।

ছেন। কিন্তু এ স্থলে পাঠকগণের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, উক্ত পংক্তি-ত্রয়ের শেষ চরণে "যাঁরে" স্থলে "যেই" দিলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোনও অর্থ হয় কি না, এবং "প্রভুলেখাকার" বর্ণনা হইতে মাধবীর লিখনাধিকারীর পদপ্রাপ্তি সূচিত হয় কি না, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃতের অন্য স্থল হইতে

"মাধবী দেবী শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধিকার দাসী মধ্যে যার নাম গণি॥"

এই চরণদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখন বিবেচ্য এই যে, "লেখাকার" ও "গণি" সমার্থপ্রতিপাদক কি না? আমার বিশ্বাস, 'প্রভুলেখাকার" বচনের দ্বারা মাধবী দেবীর লিখনাধিকারীর পদপ্রাপ্তি বা তাঁহার লেখাপড়া জানা প্রতিপন্ন হয় না।

'উড়িয়া' ও 'বাঙ্গালা' এই দুই ভাষার প্রকৃতিগত বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য আছে। সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বৈলক্ষণ্য আরও অধিক ছিল। তখন বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা বাঙ্গালী ও উৎকলবাসীর সম্মিলন বেশী হইত না, এবং সম্বন্ধও ঘনিষ্টতর ছিল না; সুতরাং উৎকলীয় পুরুষ বা নারীর বাঙ্গালা শিক্ষা বা বাঙ্গালা রচনার আবশ্যকতা ছিল না। এরূপ অবস্থায় চৈতন্যদেবের সময় এক জন উৎকলরমণী, পদকল্পতরুর উক্ত ছয়টি পদের ন্যায় উড়িয়াভাষার গন্ধবিহীন অবিমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, ইহা প্রমাণ ভিন্ন তাহা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ তত্ত্বনিধি মহাশয় মাধবী দেবীকে উৎকলরমণী বলিয়া পরিচয় দিয়াও তাঁহাকে বাঙ্গালা-পদ-রচয়িত্রী বলিয়া বিনা সন্দেহে সাহিত্য-পরিষদে উপস্থিত করিয়াছেন।

পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থে উপরিউদ্ধৃত ছয়টি পদ বা 'মাধবী' বা 'মাধবী দাস' ভণিতাযুক্ত কোন পদ দৃষ্ট হয় না। এমন কি, আচার্য্যবংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের যে পদামৃতসংগ্রহ গ্রন্থ দেখিয়া পদকল্পতরু সংগৃহীত হয়, (১) তাহাতেও মাধবী বা মাধবী দাসের ভণিতাযুক্ত কোনও পদ পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের অনুরক্ত ভক্ত, 'জগতের মধ্যে সাড়ে তিন জন পাত্রের' অন্তর্গত শিখিমাহিতির ভগিনীও স্বয়ং 'অর্দ্ধ জন' পাত্র মাধবী দেবীর কোন পদ থাকিলে, তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজে সেই

(১) আচার্য্য প্রভুর বংশে শ্রীরাধামোহন। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।
* * * *
গ্রন্থ কৈল পদামৃতসমুদ্র আখ্যান। সেই মূল গ্রন্থ অনুসার ইহা কৈল।
—পদকল্পতরু

পদ অবশ্যই প্রচলিত থাকিত, এবং রাধামোহন ঠাকুর তাহার অন্ততঃ একটিও স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া কৃতার্থ হইতেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, মাধবীদাস-ভণিতাযুক্ত পদাবলী পদামৃত-সমুদ্র ও পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার মধ্যসময়ে রচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পদকল্পতরু এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদামৃতসমুদ্র সংগৃহীত হয়। সুতরাং মাধবী বা মাধবীদাসের ভণিতাযুক্ত পদাবলীর বয়স ২৫০ বৎসরের অধিক হয় নাই। মাধবীদেবী, চৈতন্যের সময়, অর্থাৎ উক্ত পদাবলীর রচনার অন্ততঃ ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান ছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যত দূর আলোচিত হইল, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র দীনেশ বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী হইয়া, পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯১ এবং ২১৯২ সংখ্যক পদ মাধবী দেবীর রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

পদকল্পতরুর ২১৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদের বর্ণিতব্য বিষয় এক, এবং ভাষা বা রচনারও বিশেষ পার্থক্য নাই। দুইটি পদে একই ব্যাপারের বিভিন্নাংশ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে এই দুইটি পদ একই কবির রচনা বলিয়া প্রতীত হয়; সুতরাং মাধবী ও মাধবীদাস এক ব্যক্তি হইতেছেন। শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয়ও 'মাধবী' ও 'মাধবীদাস' ভণিত পদগুলিকে একই ব্যক্তির রচনা বলিয়া "স্ত্রীকবি মাধবী" প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মাধবীদাস ব্যবহারিক ভাবে পুরুষবাচক নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাসোপাধি 'মাধবী'-গণের নামান্তে ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু বৈষ্ণবদীনতার যুগেও, স্ত্রীলোকে আপনার নামের পর পুরুষের দাসোপাধি গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত ছিলেন। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মাধবী দেবীকে বিনা-প্রমাণে মাধবীদাস বলিয়া "সনাক্ত" করা সঙ্গত নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরি-উদ্ধৃত পদাবলীর রচয়িতা, মাধবীদাস বা মাধবী, শিখিমাহিতির ভগিনী মাধবীদেবী বা কোনও স্ত্রী-কবি নহেন।

সত্যনির্ণয় আমার উদ্দেশ্য, দীনেশ বাবু বা তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ভ্রমপ্রতিপাদন নহে। যদি এ স্থলে আমারই ভ্রম হইয়া থাকে, তাঁহারা বা অপর কেহ সেই ভ্রমের অপনোদন করিলে, সত্য সুপ্রকটিত হইবে।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

কবিতাকুঞ্জ।

বসন্ত।

আসো নিশি-অবসানে উষা-হাসি সম
হিম ঋতু-অবসানে;
মধু যৌবন নব জাগায়ে তুলিতে
ধরার বিবশ প্রাণে।
তুমি অঞ্চল ভরি আন সাথে করি
আধফোটা ফুল কলি;
তাই গমনের পথে গুঞ্জরে তব
অযুত মত্ত অলি।
তব কুন্তলজালে খেলা করে সদা
লুব্ধ মলয় বায়;
তব চরণ-আলোকে ঝলকে পুলকে
প্রজাপতি পায় পায়।
আন জলদ-মুক্ত নীল গগন,
জ্যোৎস্না-উজল রাতি;
ঢাল ধরার অঙ্গে নন্দন-জাত
মধুর মাধুরীভাতি।
তুমি ধরার মলিন অধরযুগলে
ফুটাও মধুর হাসি;
তুমি বিমল সরসী-আরসী-হৃদয়ে
হের নিজ রূপরাশি।
তুমি বিহগকণ্ঠে তুল জাগাইয়া
সুপ্ত মধুর স্বর;
ওই ঐন্দ্রজালিক পরশে তোমার
পুলকিত চরাচর।
তুমি হৃদয়-সরসে ফুটাও হরষে
আকুল প্রণয়জ্বালা;
তুমি চরাচর সব কর আলোকিত
ঢালি নিজ রূপ-আলা।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সাধ।

সে উঠেছে ফুটি' স্বর্ণকমল
আমার মানস-সরসে;
সাধ যায় তাই, হয়ে মধুব্রত
সৌরভে তার ভাসি' অবিরত
তা'রি চারিধারে উড়িয়া নিত্য
গুঞ্জন করি হরষে।

সে আমার বনে কুসুম গুচ্ছ
ফুল্ল যূথিকা কামিনী;
তাই চাহি, হয়ে বালরবিকর
ফুটাই তাহার শোভা মনোহর,
শিশিরবিন্দু হয়ে করি তারে
সিক্ত সারাটি যামিনী।

সে শোভিছে একা পূর্ণ ইন্দু
নির্ম্মল নীল আকাশে;
সাধ যায়, হয়ে সিন্ধু অতল
বক্ষে রাখিতে সে ছবি অমল,
চকোরের মত উড়িতে ঊর্দ্ধে
তাহার অমিয় সকাশে।

সে যে বসন্তশোভার প্রতিমা—
মাধুরী অতুল ভুবনে;
সাধ তাই, হ'য়ে কোকিল সুরব
গাহিতে তাহার গুণগৌরব,
অশোকের মত চরণ-পরশে
শোভিতে কুসুম-ভূষণে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

নিশীথে।

আমি অনাথিনী, চির একাকিনী,
তোমায় ডাকি,
করুণা-পাথার! এক বিন্দু তার
দিবে হে না কি?
কবে প্রকাশিবে হৃদয়-আকাশে,
শ্রীমুখ-ইন্দু?
করুণা-কিরণে, কবে উছলিবে
পরাণ-সিন্ধু?
ধূলিকণা লয়ে, গড়েছি হৃদয়ে—
যে ছবি, আমি;
কনক বরণে কবে সাজাইবে
তাহারে তুমি?
গভীর আঁধারে সংসার-পাথারে
পড়ে একেলা,
ওহে কর্ণধার! পাব না তোমার
চরণ-ভেলা?

শ্রীসরলাবালা সরকার।

কাল আঁখি।

কাল আঁখি তব সখি, সরসীর জল
অতল, অপরিমেয়, প্রশান্ত, নির্ম্মল,
শোভা তার;—তটশোভা, শ্যাম-কুঞ্জবন
উদার আকাশ নীল বিম্বিত যেমন
সরসীর স্বচ্ছ বারি মাঝে, ওগো প্রিয়ে,
তেমনি সুন্দর শোভা রয়েছে ফুটিয়ে
তোমার নয়ন মাঝে, স্নেহ, ভালবাসা,
মৌন লজ্জা, প্রীতি, দয়া, হৃদয়ের ভাষা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাকচী।

সংসারের পথে।

এসেছি দু' জনে হেথা
সুদূর হ'তে,
হারায়ে ফেলেছি তারে
এ কূট পথে;
জানি নাক কোথা যাব
এ দূর বনে,
এসেছি যে কোথা হ'তে—
নাই তা' মনে।
খুঁজিতেছি কত তারে,
পাই না দেখা;
র'ব আর কত কাল
এখানে একা!

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। পৌষ ও মাঘ। "ষ্টুডেণ্ট মেস্" প্রবন্ধটি "সহৃদয় পাঠকদিগের নিকট কৌতূহল-জনক" হইয়াছে বটে। লেখক ছাত্রজীবনের উজ্জ্বল অংশটুকু উজ্জ্বলতর অনুরাগকিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কিন্তু পড়িয়া মনে হয়, কলিকাতার ছাত্রজীবনে কি কেবলই রৌদ্র? তাহাদের জীবন কি মেঘসম্পর্কশূন্য? বর্ত্তমান লেখক এক অংশের ছবি সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু আর এক অংশের চিত্রাঙ্কন এখনও অবশিষ্ট। "দৃষ্টিদান" গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। গল্পটির প্রত্যগ্র সৌন্দর্য্য ও কোমল তরুণতার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা প্রবাহিণীর মত করুণরসের স্নিগ্ধ পূতধারা বহিয়া যাইতেছে। সুদক্ষ কবি, কঠোর দার্শনিকের মত কঠিনভাবে নায়িকার চিত্তবৃত্তির আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আবার করুণাকোমল কবির ন্যায় সমবেদনাপূর্ণহৃদয়ে সেই ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয় ভক্তিপ্রেমের সুকোমল কমলদলে আবৃত করিয়া দিয়াছেন। "বীমসের বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। "ছবি-জন্ম" একটি ছন্দোবদ্ধ রচনা,—কবিতা নহে, ছড়া। "গৃহকোণ" প্রবন্ধটি সকলেরই পঠনীয়। লেখক বঙ্গলক্ষ্মীর অন্তঃপুরের সৌন্দর্য্যশ্রীর চিত্র আঁকিয়া পরিশেষে আক্ষেপ করিয়াছেন,—"সেই জন্য এই বাহুল্যবিবর্জ্জিত সরল সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে আসিয়া প্রথম যখন অগণ্য কৌচক্যাবিনেট্‌কণ্টকিত আধুনিক কোনও নব্যতন্ত্রীর ভবনে প্রবেশ করা যায়, অনেক ক্ষণ ধরিয়া কিছুই যেন ভালরূপ ঠাহর হয় না—এমন কি, বলিতে সাহস হয় না, অনেক সময় সেই অভ্যর্থনাকক্ষের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীকে দেখিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না যে, তিনি আমাদেরই এক জন ভ্রমপ্রমাদসুখদুঃখমোহময়ী

মানবী, না, বিলাতী সাহেবের অদৃশ্যতারবিলম্বিত কোনরূপ আশ্চর্য্য কলের পুতুল। কারণ, অনভ্যস্ত চক্ষে তাঁহাদের গতিবিধি, তাঁহাদের গুরু গাম্ভীর্য্য ও লঘু হাস্যবিকীরণ, তাঁহাদের আতিথ্য ও অভ্যর্থনা সকলই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় যান্ত্রিক বলিয়া ঠেকে। এবং খানিকক্ষণ সেই চুরোটিকাধূমকুণ্ডলিত আব্‌হাওয়ার মধ্যে থাকিতে থাকিতে নিজেকেও যেন রঙ্গালয়ের অভিনেতা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এবং সে অভিনয়ও বড় সহজ নহে, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় যে, কখন্ কোন্ ভঙ্গীটি বেদস্তুর হইয়া পড়ে। কারণ, এ ভঙ্গীকলার মধ্যে কোনরূপ যুগযুগান্তরাগত ভাবপ্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে অবলীলা-ভরে পরিচালিত করে—আছে কেবল কতক পরিমাণে নেপথ্যের তারওয়ালা সাহেবের অদৃশ্য হস্ত এবং আর কতক পরিমাণে শিথিলপ্রকৃতি কয়েকটি দেশী পুত্তলিকার হস্ত পদ ও রসনা সঞ্চালন।" লেখকের ভাষা কাদম্বরী-বিজয়িনী,—কিন্তু তাঁহার আক্ষেপের আদ্যোপান্ত সত্য!

পূর্ণিমা। মাঘ। "নব্য-ভারতে"র সম্পাদক বিগত অগ্রহায়ণ মাসে মাসিক-সাহিত্য-সমালোচকগণের প্রতি যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে "পূর্ণিমা"র সম্পাদক বলিতেছেন,—"আমরা নব্যভারত লেখকের কথায় বলি 'বাবুর সাহস, কৃতিত্ব এবং গবেষণায় পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক।' দেখিতেছি আমরাও আসামী শ্রেণীভুক্ত। চেষ্টা করিয়া ও চিন্তা করিয়া দেখিয়াও কবুল জবাব দিতে পারিলাম না। দুই একটি উদাহরণ দেখিয়াও তাহা হইতে সাধারণ নিয়মের সূত্র করা অন্যায়। লেখক যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার সেই চিত্র পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না এবং বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্ত হয় না। সকল সমালোচকই বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী ও হিংসা প্রণোদিত হইয়া বিষদিগ্ধ ছুরিকা হস্তে পরস্পরকে জবাই করিবার জন্য বসিয়াছেন, কল্পনায় সাহিত্য-কসাইখানার এ চিত্র মন্দ নহে, কিন্তু সত্যের বাজারের দরে ইহার ডিস্‌কৌণ্ট। তবে নব্যভারতের ষোড়শ খণ্ডের অষ্টম সংখ্যায় এ আবিষ্ক্রিয়া সহসা কেন হইল—সেটা ভাবিবার কথা। 'সমালোচনা' যতদিন ব্যবহারে থাকিবে ততদিন সমালোচক দোষ গুণ দেখাইতে ন্যায়ানুসারে বাধ্য। আমরা অনেক দিন সাহিত্যের বাজারে ঘুরিতেছি। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, সমালোচনায় বঙ্গদর্শনের কশাঘাত আর নাই—উঠিয়া গিয়াছে। সমালোচনায় সত্য সত্য বঙ্গদেশে কাহারও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। লেখক সে সংবাদ দেন নাই কিন্তু বিলাতে এক দিন তাহা হইয়াছিল। * * * সমালোচনা একেবারে উঠাইয়া দিলে আর কোন আপদ থাকে না। স্বর্ণের অগ্নিপরীক্ষায় কোন ভয় হইতে পারে না। বেঙ্গা রাঙ্গ, পিতল শীসা তাহা ভাবিবে। * * *" ইহার টীকা অনাবশ্যক।

মুকুল। মাঘ। মুকুলের ক্রমোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রিন্স রাঞ্জিত সিংজীর ছবিখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। "শিয়ার বাহাদুরের পাগলামি" গল্পটি মনোরম। পড়িতে পড়িতে কিপ্‌লিংএর জঙ্গল-কাহিনী মনে পড়ে। গল্প-কল্পনা লেখকের নিজের উদ্ভাবিত, না সংগৃহীত? যদি গল্পটি মৌলিক হয়, তাহা হইলে লেখকের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। "বিড়ালের জাত" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুচিত্রিত;—আমোদের সঙ্গে শিক্ষা-বিধান করিবে। "গুণ করিবার সহজ উপায়" সম্পূর্ণ অভিনব। বালকবালিকার অভিভাবক-গণও এই কৌতুকজনক তথ্যে আকৃষ্ট হইবেন।

ভানুমতী।

বিজয়া।

অনাথনাথ বড়ই পত্নী-পুত্র-পরায়ণ ছিলেন। নিমেষের জন্যেও তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তর করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কার্ত্তিক ঝটিকাসঙ্কুল মাস; তথাপি স্ত্রী পুত্র সঙ্গে করিয়া আপনার জমিদারী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাই সকলে মনে করিয়াছিল যে, পত্নী পুত্র হারাইয়া তিনি উন্মত্ত হইবেন; কিন্তু ভানুমতীকে সঙ্গে করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সকলে দেখিল, তাঁহার গম্ভীর, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি আরও গম্ভীর, শান্ত ও মধুর হইয়াছে। এই নিদারুণ শোকের সময়ে তিনি কি যেন এক শান্তিছায়া পাইয়াছেন; কি যেন এক সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মুখে শোকের চিহ্ন কেহ দেখিল না; শোকের কথা কেহ শুনিল না। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। ইহা তাঁহার চির অভ্যাস। তাহার পর ভানুমতীকে লইয়া পুরোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম পরিদর্শন করেন। সকলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইয়া, নিজ বাটীর ঔষধালয় হইতে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়া, বিপন্নের বিপদ উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়া, এবং যাহার যেরূপ অভাব, যথাসাধ্য তাহার অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়া, তিনি গৃহে ফিরেন। ভানুমতী ইহাতে তাঁহার এক জন প্রধান সহায়। অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া গেলেও সে অনেকক্ষণ গ্রামে গ্রামে বেড়াইত, এবং গ্রামবাসিগণের সুখদুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত। সে যেন তাহাদের পরিবারস্থ এক জন হইয়া পড়িয়াছিল। শিশুরা তাহাকে দেখিলেই আনন্দে ছুটিয়া আসিত, রমণীরা জোর করিয়া তাহাকে আপন আপন বাড়ী লইয়া যাইত, পুরুষেরা তাহার উপর অজস্র আদর বর্ষণ করিত। সকলের মুখে সেই একই কথা,—"মা! তুই কোন দেবকন্যা?" সেও জাতি-নির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বাবা ও মা, ও যুবক যুবতীকে দাদা ও দিদি বলিয়া ডাকিত, এবং শিশুদিগকে পুত্র কন্যার মত আদর করিত। তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রামে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইত।

অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া ইতিমধ্যে আপনার বিষয়কার্য্য করিতেন।

তিনি এখন যেরূপ মনোযোগের সহিত ও পরিশ্রমের সহিত জমিদারীর কার্য্য দেখিতেন, পূর্ব্বে এরূপ দেখেন নাই; কর্ম্মচারীরা বুঝিল যে, তিনি সমস্ত সুশৃঙ্খল করিয়া সেরেস্তার কাগজপত্র গোছাইয়া লইতেছেন; কি যেন তাঁহার একটা অভিসন্ধি আছে। তাহার পর অপরাহ্ণে ভানুমতীর মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ শুনিতেন, এবং তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কখন বা দ্বারস্থ পণ্ডিত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া উভয়কে শুনাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার উদ্যানে, নদীতীরে, কিংবা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভানুমতীকে লইয়া বেড়াইতেন, এবং কখন বা কোন বৃক্ষতলায় কি গিরিশেখরে, উপলখণ্ডে কি উদ্যানবাটীতে বসিয়া, ভানুমতীর মুখে বেহালা, হারমোনিয়ম, এস্রার, সারঙ্গীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতেন। ভানুমতী বৈরাগীর মেয়ে; সে পূর্ব্বে বেহালা, সারঙ্গী বাজাইতে জানিত। ইতিমধ্যে সে অবলীলাক্রমে অন্য দুই যন্ত্রও বাজাইতে শিখিয়াছিল। এই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে কখন সে নিজে বাজাইয়া গাইত; অনাথনাথ তাহার সঙ্গে গাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি বাজাইতেন, এবং আত্মহারা হইয়া তাহার গান শুনিতেন। এইরূপে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বড় পুণ্য দিন; ইহা শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম ও তিরোধানের দিন। অনাথনাথ দিবস ও নিশার্দ্ধ আনন্দে মহামুনির মন্দিরে ও উপবনে কাটাইয়াছেন। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল, যেন কে অতি মধুর ভক্তি বিহ্বল কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন গাহিতেছে—তিনি যেন শুনিতে পাইলেন,—

"শ্যাম পরশমণি, কি দিব তুলনা!
সে অঙ্গপরশে আমার এ অঙ্গ সোনা।
হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন;
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন;
বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

তাঁহার বোধ হইল, কণ্ঠ ভানুমতীর। সে যেন উদ্যানে, গৃহে, ছাদে, আকাশে বিচরণ করিয়া গাইতেছে; ফুল্ল জ্যোৎস্নাকীর্ণ জগৎ যেন শ্যাম নামে মুখরিত ও ভক্তিরসে সিক্ত হইয়াছে; চারি দিকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং সেই পুণ্যদৃশ্য

দেখিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে সঙ্গীত থামিল; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; বুঝিলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু। এ কি? তিনি উঠিয়া উদ্ঘাটিত গবাক্ষের নিকটে গিয়া উদ্যানের দিকে দেখিলেন। নির্ম্মল ধবল জ্যোৎস্নালোকে পত্র-পুষ্প-শোভিত উদ্যান হাসিতেছে। কই, সেখানে ত ভানুমতী নাই! তখন অনাথনাথ ভাবিলেন, তিনি রাত্রিতে এ সঙ্গীত ভানুমতীকে গলদশ্রুনয়নে, বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে সারঙ্গীর সঙ্গে গাইতে শুনিয়াছিলেন, স্বপ্নে আবার সেই গীত শুনিয়াছেন। কিন্তু এ স্বপ্নে তাঁহার হৃদয় যেন ভক্তিতে আর্দ্র, দ্রব হইয়াছে, প্রাণে যেন কি অমৃত প্রবেশ করিয়াছে, ধমনীতে যেন কি অমৃত সঞ্চারিত, সঞ্চালিত হইয়াছে। ভক্তিতে আত্মহারা অবশ ভাবে রজনীর অবশিষ্ট কাল না নিদ্রিত, না জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কই, অন্য দিন যেরূপ ভানুমতী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, আজ ত নাই। তিনি মনে করিলেন, সে নদীতীরে গিয়াছে; তিনি পুরগিরি অবতরণ করিয়া কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই, ভানুমতী এখানেও নাই। তিনি তখন মনে করিলেন, বালিকা কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আনন্দ করিয়াছিল, তাই এত সকালে জাগিতে পারে নাই। তিনি কিছুক্ষণ নদীতীরে বেড়াইলেন। বৈশাখের প্রভাত স্বভাবতঃ সুন্দর। তাহাতে এই গিরিতল-বিচারিণী গিরিজায়ার তীরে উহা আরও কত সুন্দর। অবস্থার পর্ব্বতজাল ভেদ করিয়া ভক্তিস্রোতের মত কর্ণফুলী বহিয়া যাইতেছে। ভক্তিতে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হইলে উহা যেরূপ আরও প্রসন্নভাব ধারণ করে, বসন্তের বালসূর্য্যকিরণে কর্ণফুলী সেইরূপ প্রসন্নসলিলা হইয়াছে। দৃশ্যটি ঠিক যেন অনাথনাথের হৃদয়ের একটি প্রতিকৃতি। গত সন্ধ্যায় সেই সঙ্গীত শুনিয়া, গত নিশিতে সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়েও এরূপ একটি শান্তসলিল ভক্তিস্রোত সেই 'শ্যাম পরশমণির' দিকে ছুটিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল; কই ভানুমতী আসিল না। তখন তাঁহার মনে আর একটি সন্দেহ হইল। তিনি বড় মধুর ঈষৎ হাসি হাসিলেন। কাল উৎসবের শেষে শয়ন করিতে যাইবার সময় অনাথনাথ একখানি পুরু কাগজ ভানুমতীর হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মা! ইহা আমার দানপত্র। আজ হইতে আমার এই বিপুল সম্পত্তি তোমার। এই পুণ্যতিথিতে আমার পূর্ব্বপুরুষের এই পবিত্র পুরীতে তোমাকে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।" ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। তাহার সমস্ত

শরীর যেন কম্পিত হইল। সে প্রসারিত দানপত্র গ্রহণ করিল, এবং অঞ্চলে কণ্ঠ বেষ্টিত করিয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণত হইল, এবং পদযুগল অশ্রুসিক্ত করিল। অনাথনাথ তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। দেখিলেন, শিশিরসিক্ত শতদলের ন্যায় সেই মুখ শান্ত, স্থির, পবিত্র। সে আর কিছু বলিল না। অনাথনাথ আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া সানন্দাশ্রুনয়নে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, ভানুমতীর বুঝি সেই কারণে হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে, তাই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে।

তিনি পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, যে কর্ম্মচারীটি মরিয়া গিয়াছে, এবং যাহার পরিবারপ্রতিপালনের আপনি সে দিন মাত্র সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহার কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার জন্যে তাহার একটি বাক্স খুলিলে তাহাতে আপনার নামাঙ্কিত এই পুরাতন পত্র অনেক কাগজের নীচে পাইলাম। পত্রখানি বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতেই বোধ হইতেছে, আপনি দেখেন নাই।" কার্য্যাধ্যক্ষ এই বলিয়া একখানি 'তুলট' কাগজে লেখা অতি পুরাতন পত্র অনাথনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনাথনাথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"শ্রীহরিঃ শরণং।

মহামহিমার্ণব

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ রায়, জমীদার মহাশয়

মহিমার্ণবেষু—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনার মঙ্গল ভিক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন। ১২৮৮ সনের কার্ত্তিক মাসের মহা ঝড়ে রাজখালি গ্রামের নিকটে সমুদ্রতীরে আপনার বজরা জলমগ্ন হয়। ঝটিকার সময় আমি ও আমার বৈরাগিনী যে একটি ভূপতিত বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার কাছে একটা কি ভাসিয়া যাইতে আমার পায়ে লাগে। স্পর্শ করিয়া দেখিলে একটি শিশু বলিয়া বোধ হইল। আমি উহাকে উঠাইয়া লইয়া আমার বক্ষের মধ্যে রাখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করি। প্রভাতে দেখিলাম, আপনার দুই বৎসর বয়স্কা কন্যা। আপনার বজরায় ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাহার জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। সে সময়ে ৺পুরী গোস্বামী এই পথে আদিনাথ যাইতেছিলেন। তিনি শিশুটিকে তাঁহার দৈবশক্তি দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করেন।

আমার বৈরাগিনী কাঁদিতে লাগিল। সে কোনও মতে মেয়েটিকে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে দিবে না। সেই রাত্রিতেই তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, এবং বহু অন্বেষণে আমি অনেক দিন পরে ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি গ্রামে তাহাকে প্রাপ্ত হই। দেখিলাম, দুটিতে বড় আনন্দে আছে, মেয়েটি বৈরাগিনীর জীবনসর্ব্বস্ব হইয়াছে, এবং মেয়েটি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমার সাধ্য নাই যে, তাহাকে বৈরাগিনীর কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া আপনাকে প্রত্যর্পণ করি। ৺পুরী গোস্বামীও নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেয়েটি শ্রীভগবতীর অংশসম্ভূতা। কোনও মহৎ কার্য্যসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যর্পণ করিলে তাহার বিঘ্ন হইবে। বিশেষতঃ সে যখন আমাকে তাহার কচি মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, তখন আমার হৃদয়ে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের লীলা,—আমিও মায়াপাশে আবদ্ধ হইলাম। এই দশ বৎসর আমি তাহাকে সঙ্গীত ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। মা আমার স্বয়ং সেই ব্রজকিশোরী কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী শ্রীরাধা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন ভক্তি, মানুষের হইতে পারে না।

আমি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত। আপনি এই পত্র যখন পাইবেন, আমি তখন ধরাধামে থাকিব না। বৈরাগিনী আমার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে শ্রী হরিচরণ দত্তের দোকানে আপনার হারাণ লক্ষ্মীকে পাইবেন। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন, এবং এই মহাপাতকী তস্করের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি ১২ই মাঘ, ১২৯৮ সন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস

শ্রীগৌরদাস বৈরাগী।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া অনাথনাথ "ভানুমতী আমার অমিয়া! মা অমিয়া! মা অমিয়া!" বলিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে উন্মত্তের মত অন্তঃপুরে ভানুমতীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের দ্বিতল গৃহে তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্বের একটি কক্ষ অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভানুমতীকে থাকিতে দিয়াছিলেন। কক্ষ ত নহে,—একটি ক্ষুদ্র ত্রিদিব। কিন্তু কক্ষে ভানুমতী নাই। সমস্ত বাড়ী, সমস্ত পুরী, সমস্ত উদ্যান ও উপবন, সমস্ত নদীতীর অন্বেষণ করিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। পুরীতে মহা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। কর্ম্মচারী, দাস, দাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলে চারি

দিকে অন্বেষণে ছুটিল। সকলেরই মুখেই—"ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত পুরী যেন আনন্দে এককণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত উদ্যান ও উপবন আনন্দে পত্রের মর্ম্মরে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" শৈলসমীরণ আনন্দে সন্ সন্ রবে, পার্ব্বত্য পক্ষিগণ কল কলরবে, বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" কর্ণফুলী আনন্দে তর তর স্রোতে বহিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" উপত্যকাস্থ গ্রামসমূহে আনন্দকোলাহল উঠিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" কিন্তু ভানুমতী কোথায়? এ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সময় ভানুমতী কোথায়? যাহাকে বুকে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে যেন জগৎ আকুল হইয়াছে, সে ভানুমতী কোথায়? অনাথনাথ স্বয়ং বারবার পুরী, উদ্যান, নদীতীর, সর্ব্বশেষে গ্রামে গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। তিনি ভগ্নহৃদয়ে গলদশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিয়া আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শূন্য গৃহের প্রত্যেক সজ্জা ও উপকরণ যেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভানুমতী কোথায়?" তিনি বাতায়নপথে পুরোদ্যান, নীলমণিমালানিভ গিরিগর্ভস্থ কর্ণফুলী ও বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবনসদৃশ গিরিপদতলস্থ গ্রামসমূহ দেখিতে লাগিলেন,—সকলই যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"ভানুমতী কোথায়?" তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি ভানুমতীর শয্যার উপর বক্ষ রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া শয্যা সিক্ত করিলেন। হৃদয়ের বিপ্লব একটু উপশমিত হইলে তিনি শূন্যহৃদয়ে কক্ষমধ্যে দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার লিখিবার মেজের উপর তিনি যেন একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, পত্র ভানুমতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত, এবং শিরোনামায় তাঁহার নাম। বিদ্যুৎবেগে পত্রের আবরণ ছিন্ন করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

"বাবা! আজ তোমাকে আমার অতীত কাহিনী কহিব। সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈশবে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, মনে নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে, বৈরাগী পিতা ও বৈরাগিনী মাতার বড় স্নেহভাগিনী ছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে নানা স্থানে বেড়াইয়া গান গাইয়া শৈশব বড় সুখে কাটাইয়াছি। অষ্টম বর্ষ বয়সে আমার স্নেহপ্রতিমা করুণাময়ী বৈরাগিনী মাতা আমাকে বক্ষে লইয়া কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠে

চলিয়া যান। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহুকাল মাতার জন্যে, কি ভিক্ষার সময়, কি গান গাইবার সময়, কি গৃহে বিশ্রাম করিবার সময়—কাঁদিতাম, পিতার সমুদয় সান্ত্বনা এই শোকস্রোতে ভাসিয়া যাইত। এই শোকের শান্তি না হইতেই দুই বৎসরের মধ্যে পিতাও পুণ্যবতী জননীর অনুসরণ করেন। রাজনগর গ্রামে একটি দোকানে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। আমাকে সেই দোকানদারের কাছে রাখিয়া যান; বলিয়াছি,—'মা! তুই আমাদের মেয়ে নহিস্। আমরা মহাপাতকী, তোর মত দেবকন্যা কোথায় পাইব? তুই ঝড়ের সময় সমুদ্রের বন্যায় আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিয়াছিলি; আমরা মহাপাপী, মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোর পিতাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি নাই। তিনি কুবেরসদৃশ ভাগ্যবান। বৈরাগিনী চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে গেলে তোকে তোর পিতার হাতে অর্পণ করিব। কিন্তু শ্রীভগবানের বুঝি তাহা ইচ্ছা নহে। আমি তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। তুমি এই দোকানে থাকিবে। তিনি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' আমি এই প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পিতার পরলোকগমনে সংসার শূন্য হইল। আমি আশ্রয়হীনা হইলাম। এবার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি শোকে এরূপ অভিভূতা হইয়াছিলাম যে, তিনি কি বলিয়াছিলেন, ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। একটি ক্ষুদ্র কুসুমের উপর পার্ব্বত্য শিলাখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে ফুলটি যেরূপ নিষ্পিষ্ট হয়, পিতার মৃত্যু সমাগত জানিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকানদার পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থ পাইয়াছিল। সে কয়েক দিন আমাকে খুব যত্ন করিল। ক্রমে সে যত্ন শিথিল হইল। এমন সময়ে এক দল বেদে সেখানে উপস্থিত হইল। দোকানি আমাকে গোপনে তাহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, 'তুমি বৈরাগীর মেয়ে। কোনও গৃহস্থ তোমাকে স্থান দিতে চাহে না। তুমি আর বেশী দিন আমার এখানে থাকিলে আমার জাতি যাইবে। অতএব তুমি বেদেদের সঙ্গে চলিয়া যাও।' জগৎ অন্ধকার দেখিলাম। আর কোথাও যাইবার স্থান দেখিলাম না। আমি এইরূপে বেদেদের ক্রীতকন্যা হইলাম। বেদিনী মাতা কিছু উগ্রপ্রকৃতি হইলেও বেদে পিতা বড় ভালমানুষ। সর্ব্বশেষ তাহাদের শিশু পুত্র গোপাল—(এখানে পত্রে এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়াছে) বাছা! আমার কোথায় গেল! তাহার

আদরে আমি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পরে সুবর্ণদ্বীপে তোমাদের দর্শন লাভ করি। দর্শন-মাত্রই কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিল, 'অভাগিনী! এই তোর পিতা, তোর মাতা, তোর ভ্রাতা।' হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ছুটিয়া গিয়া তোমাদের চরণ-তলে পড়িতে, ভাইটিকে বুকে লইতে, প্রাণ আকুল হইল। কত দেশে কত লোকের কাছে বাজী করিয়াছি; কত লোক কতরূপ স্নেহ মমতা দেখাইয়াছে; কিন্তু মনের এমন ত ভাব কখনও হয় নাই; কাহাকেও ত পিতা মাতা বলিয়া মনে হয় নাই। তোমাদেরও আমার প্রতি সেই অপার স্নেহ ও করুণা। তাহার পর সেই প্রলয়কারী ঝড়। মাকে হারাইলাম, ভাইকে হারাইলাম। আমার গোপালকে হারাইলাম। সেই দরিদ্রআশ্রয় দাতা দুটিকে হারাইলাম। (এখানে অশ্রুতে লেখা ভাসিয়া গিয়াছে।)

কিন্তু বাবা! শ্রীভগবানের কি লীলা! যে ঝড়ে পৃথিবী দলিত নিষ্পিষ্ট করিয়া গেল, আমার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বনফুলটিকে উড়াইয়া আনিয়া তোমার দেবচরণে অর্পণ করিল! যে ঝড়ে জগৎ বিধ্বস্ত করিল, আশ্রয়হীনা আমার জন্যে কি এই স্বর্গের সৃষ্টি করিল! আমি এই কয়েক মাস তোমার হৃদয়ে কি স্বর্গ দেখিলাম, তোমার মুখে কি স্বর্গের সংবাদ শুনিলাম, তোমার স্নেহে কি স্বর্গ ভোগ করিলাম! সর্ব্বশেষে আজি আমি পথের ভিখারিণী রাজ-নন্দিনী,—একটি বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী।

কিন্তু বাবা! বৈরাগিনী কি রাজনন্দিনী হইতে পারে? তোমার এই উদ্যানের লতাটি যে ভাবে ওই তরুটিকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, বল-পূর্ব্বক তাহার সেই ভাবের, সেই গতির কি পরিবর্ত্তন করিতে পার? যে জীবনলতা বৈরাগ্য-বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এত দূর উঠিয়াছে, তাহাকে স্থানা-ন্তরিত করিয়া সংসার-বৃক্ষের ছায়ায় রোপণ করিলে কি সুখী হইতে পারে? বাবা! এই কয়েক মাস ত তোমার বিপুল সংসারের শীতল ছায়ায় কাটাইলাম। কিন্তু কই? তোমার ইন্দ্রপুরীসদৃশ রাজপুরী, তোমার এই বিস্তীর্ণ রাজ্য, এই গৌরব, এই সম্পদ, এ সকল ত কিছুই আমার চক্ষে পড়িল না। তোমার ওই দেবমূর্ত্তি, তোমার ওই দেব-হৃদয়ে, তোমার দেব-দুর্ল্লভ জ্ঞান। তোমার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া তোমার পূজা করিতে পারিলেই ভানুমতী সুখী। তাহার অধিক সুখ সে চাহে না,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। বৈরাগী পিতা তাহার হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তুমি এই

কয়েক মাস তাহাতে জল-সেক করিয়া অঙ্কুরিত করিয়াছ। তুমি কি উহার ফুল ফল হইতে দিবে না? বৈরাগী পিতা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ। তোমার মুখে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে সে হৃদয় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্থাপিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি বড়ই মহিমাময় হইয়াছে। এখন কেবল সেই রূপ দেখিতে পারিলে, সেই নাম গাইতে পারিলেই আমার সুখ; এ হৃদয়ে অন্য সুখ স্থান পায় না।

"হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন,
বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

এত দিন দেবদেবী কি, আমি বুঝিতাম না। রাধাকৃষ্ণ কিরূপ ছিলেন, বুঝি-তাম না। যে দিন তোমাকে ও মাকে দেখিলাম, সে দিন বুঝিলাম, দেব-দেবী কি, রাধাকৃষ্ণ কি! বৈরাগী পিতা আমাকে একটি ক্ষুদ্র বালগোপাল দিয়াছিলেন। আমি উহাকে বুকে বুকে রাখিতাম, এখনও রাখি। পিতা হাসিয়া আমাকে তাই যশোদারাণী বলিয়া ডাকিতেন। বেদের পুত্র গোপালকে পাইয়া মনে করিতাম, বালকৃষ্ণ বুঝি এইরূপ ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেন তৃপ্তি পাইতাম না। যে দিন অমিয়কে বুকে পাইলাম, সে দিন বোধ হইল, আমি প্রকৃতই বালগোপালকে পাইলাম। আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। কিন্তু তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইলাম। আমি রাজ্য লইয়া কি করিব? এখন যে পাথরের বালগোপালটি আমার বুকে আছে, আমি উহাকে আমার সেই হারাণ গোপাল ও অমিয় বলিয়া জানি। তাহারাই কালে সেই যশোদার দুলালকে আমার বুকে আনিয়া দিবে। তুমি যে ছয় রসের ব্যাখ্যা করিয়াছ, আমি তাহার মধ্যে বাৎসল্য রসটি বুঝিয়াছি। উহাতে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

আজ তুমিও আমার চক্ষে সেই বালগোপাল। আমি তোমার যশোদা মা। তুমি যখন আমাকে বুকে লও, আমি সেই যশোদার ভাবে বিভোর হই। তবে তুমি এত স্নেহে যখন এই রাজ্য দান করিয়াছ, তখন আমি তাহা প্রত্যা-খ্যান করিতে পারি না। গ্রহণ করিলাম। গুরুদেব ৺পুরী গোস্বামী আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। আমার অমিয়কে লইয়া তাঁহারই কাছে আদিনাথে গিয়া-

ছিলাম। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হইবে বলিয়া। অমিয়কে বাঁচাইলেন না; বলিলেন, তাহার দ্বারা সে কার্য্যের বিঘ্ন হইবে। সেই মহৎ কার্য্য কি, আমি যেন এত দিনে বুঝিতেছি। এই বিপুল রাজ্যের আয়ের দ্বারা একটি ভাণ্ডার গঠিত হইবে। তাহার নাম হইবে 'অনাথ-ভাণ্ডার'। উঁহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়োজিত হইবে।

১। যে সকল তীর্থধাম মোহন্তদের পাপাচরণে বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল তীর্থের উদ্ধার ও রক্ষা করিতে হইবে।

২। কয়েক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকে বৃত্তি দিয়া পূর্ব্ববৎ টোল স্থাপন করিতে হইবে, এবং পতিত ব্রাহ্মণদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মত স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং ইহাদের দ্বারা যাহাতে গ্রামে গ্রামে পূর্ব্ববৎ পঞ্চায়েত সৃষ্ট হইয়া গ্রামের শান্তি-বিধান হয়, এবং স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। যাহাতে অন্য শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে, বালকবালিকাগণের জন্যে সেইরূপ কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

৪। এই পুরীতে সেইরূপ দুটি প্রধান টোল ও বিদ্যালয়ই তোমার ও জননীর নামে স্থাপিত হইবে, এবং 'অনাথনাথ' ও 'রাজরাজেশ্বরী' নামে তোমাদের হরগৌরী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া সমারোহে পূজিত হইবে, এবং ভোগের দ্বারা দরিদ্রের ও অতিথি, সন্ন্যাসী ও আতুর নিরন্নের সেবা হইবে।

৫। আদিনাথের পশ্চিমে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আমার গুরুদেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার আদেশমতে সেই পবিত্র স্থানে মহামহীরুহ অশ্বত্থের ছায়ায় আমার অমিয়কে গুরুদেবের চরণকমলতলে রাখিয়া আসিয়াছি। সেখানে 'অমিয়গোপাল' নামে একটি বালগোপালমূর্ত্তি একটি সুন্দর মন্দিরে স্থাপিত হইবে, এবং 'অমিয়াশ্রম' নামে আদিনাথ শৈলশ্রেণীর উপর একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপিত হইবে। উহা ঠিক ভারতের পূর্ব্বকালীন আশ্রমের মত হইবে, যেন সাধু বৈরাগী সন্ন্যাসীরা সেই মনোহর শৈলাশ্রমে তপস্যা করিতে পারেন। সেখানে একটি টোল ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এবং পূজার ভোগের দ্বারা দরিদ্র ও তপস্বীদের সেবা হইবে। সমুদ্র-প্লাবনের সময় দ্বীপবাসীরা সেই আশ্রমে আশ্রয় পাইবে, এবং সেই 'অমিয়-

ভাণ্ডার' হইতে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য পাইবে। সেই আশ্রমের মন্দিরে তোমার ও জননীর প্রতিকৃতি থাকিবে।

বাবা! তোমার আমার জন্যে কিছুই রাখিলাম না। আমাদের পিতা-পুত্রীর,—মাতাপুত্রের,—আশ্রয়ের স্থান শ্রীভগবানের চরণাম্বুজ। আমি সেই আশ্রয়ে চলিলাম। তুমিও আসিও, বদরিকাশ্রমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতলে উভয়ে আবার মিলিত হইব। তপস্যা সিদ্ধ হইলে পিতাপুত্রী 'অমিয়াশ্রমে' আসিয়া তাহার দেহমৃত্তিকায় সঙ্গে আমাদের দেহমৃত্তিকা মিশাইব।

তোমার স্নেহের কন্যা
ভানুমতী।"

অনাথনাথ পত্রখানি একবার, দুইবার, বহুবার পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে পত্রখানি সিক্ত হইল। শেষবার পাঠসমাপন করিয়া বলিলেন, "মা! তাহাই হইবে। তুই প্রকৃত মায়ের কাজ করিলি; তোর এই পতিত পুত্রকে উদ্ধার করিলি।" তিনি জেলার কালেক্টরকে পত্র লিখিলেন, "আমার সমস্ত বিষয় গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলাম। দেশের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হইবে, এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতে এক জন সাধু কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইয়া আমার কন্যা অমিয়া (প্রকাশ ভানুমতীর) পত্রের লিখিত অনুষ্ঠানে আমার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ব্যয়িত হইবে। 'অমিয়াশ্রমে' ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বক্ষে 'অমিয়গোপাল' মূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিতে হইবে, এবং মা আমার যশোদা-রূপে পূজিতা হইবেন।"

কক্ষে আলনার উপর ভানুমতীর দুইখানি গৈরিক বসন ছিল। ভানুমতী রাজনন্দিনী হইয়াও বৈরাগীর বসন ত্যাগ করে নাই। একখানি পরিধেয় ও আর একখানি উত্তরীয় করিয়া সেই বিপুল রাজ্যের অধিকারী অনাথনাথ পথের ভিখারী হইলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

মৌর্য্যসম্রাট অশোক।

চতুর্থ প্রস্তাব।

অশোক-রাজত্বের চতুর্থাংশ, ষড়বিংশতি বৎসর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। এই শেষভাগের ইতিহাস প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্তম্ভলিপি (Pillar Edicts) হইতে সংগৃহীত ঃ—

১। দিল্লী সিভালিক বা ফিরোজ সাহার লাট ;
২। দিল্লী মিরাট ;
৩। এলাহাবাদ ;
৫। রাধিঅ বা গৌড়িঅ অররাজ, জেলা চম্পারণ ;
৫। মথিঅ বা লৌড়িঅ নবগুগণ্ড, জেলা চম্পারণ ;
৬। রামপুরওআ, জেলা চম্পারণ।

সব স্তম্ভলিপিগুলিই প্রায় এক রকম। রামপুরওআর কতকটা প্রোথিত থাকার দরুণ চারিটি লিপিমাত্র পাওয়া গিয়াছে ; দিল্লী সিভালিকে সাতটি, এবং বাকি কয়টিতে ছয়টি লিপি আছে। এই সব লিপির শেষ পাঠ ডাক্তার বুলার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (১) তাঁহার পাঠ সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে ; সুতরাং তাহাই এ রচনায় গৃহীত হইবে। সপ্তম লিপি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি অভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসর পরে (অর্থাৎ সপ্তবিংশতি বৎসরে) আজ্ঞাপিত। সপ্তম লিপিটি এক বৎসর পরে, অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি বৎসরে লিখিত।

স্তম্ভলিপির সময়ে অশোক সম্পূর্ণ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা দেখাইয়াছি। তবে স্বাভাবিক সমদর্শিতাবশতঃ জনসাধারণের উদ্দেশে খোদিত অনুশাসনগুলিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির সারাংশমাত্র নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ মতগুলির (dogmas) উল্লেখ করেন নাই। অতএব স্তম্ভস্থ অনুশাসনসমূহ গিরিলিপিমালার ক্রমিক পরিণতিমাত্র, সারাংশে অতি সামান্য প্রভেদ।

স্তম্ভীয় অনুশাসনগুলির মর্ম্ম দুই চারিটি উদাহরণ হইতে পাঠক কতকটা উপলব্ধি করিবেন। ধর্ম্মপালন করা উচিত ; কিন্তু ধর্ম্ম কি ? তাই দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে অশোক বলিলেন ;—

(১) Ep. Ind. vol. II, pp. 245-274.

"ধর্ম্ম কি ? অপাসিনব (পাপরাহিত্য), বহুসৎকার্য্য, দয়া, দান, সত্যতা, শুচি।"

পাপ কথাটা কিছু অস্পষ্ট ; সুতরাং তৃতীয় লিপিতে অশোক ব্যাখ্যা করিলেন,—

"আসিনব কি ? চণ্ডত্ব, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান, ঈর্ষ্যা।"

এই ত অশোকের নৈতিক ব্যাখ্যা ; তদনুযায়ী উপদেশ। কর্ত্তব্য কার্য্যের তালিকা গিরিলিপির তালিকা হইতে পৃথক নহে। তবে এখন অশোক কেবল উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সাধ্যমতে নিজ কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিচারকার্য্যে অনবরত হস্তক্ষেপ করিলে তাহাতে ব্যাঘাত হইবে ; সুতরাং চতুর্থলিপিতে অশোক আজ্ঞা করেন যে, উচ্চপদস্থ "লাজুক"গণকে মান্যকরণ ও শাস্তিদানবিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত ; সুতরাং পঞ্চম লিপিতে অশোক অনুজ্ঞা করেন যে, সেই সকল কয়েদীকে হুকুমের পর তিন দিন অবকাশ দেওয়া যাইবে যে, তৎকালে তাহারা ও তাহাদিগের জ্ঞাতি বন্ধুরা দান বা ধর্ম্মচিন্তা দ্বারা পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। সামান্য সামান্য দোষে দণ্ডিত বন্দিগণকে দয়া করিয়া খালাস দেওয়া রাজধর্ম্মের উচিত ; তাই অশোক প্রতি বৎসর একবার করিয়া কতক কয়েদীকে খালাস দিতেন, এবং পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে লিখাইয়াছেন,—"ষড়বিংশতি অভিষেক পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি বার আমা কর্ত্তৃক বন্দিগণ মুক্ত হইয়াছে।"

অশোকের দয়া কেবল মনুষ্যে আবদ্ধ ছিল না ; পশুদের জন্যও তাঁহার হৃদয় করুণাপূর্ণ থাকিত। ইহার নমুনা প্রথম গিরিলিপির "জীবহিংসা অকর্ত্তব্য" এই উপদেশে ও দ্বিতীয় গিরিলিপির পশুচিকিৎসাশালাস্থাপনে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে তাহা বিস্তারিত করিয়া, কোন কোন জীব কোন কোন সময়ে অবধ্য, ইহার তালিকা দিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহলনিবারণার্থ সেই তালিকাটির অবিকল নকল নিম্নে দিলাম। পাঠক দেখিবেন, অশোকের দয়া ও সহানুভূতি কত দূর বিশ্বব্যাপিনী।

"দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—অভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসর পরে নিম্নলিখিত জীবগণের বধ আমা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে—শুক, সারিকা, অলুন, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গেলাট্, জাতুকা, অম্বাকপীলিকা,

দদী, অনঠিকা মৎস্য, বেদবেয়ক, গঙ্গাপুপুত্রক, সংকুজ মৎস্য, ফফটশল্যক, পন্নসস, সুমর, যওক, ওকপিণ্ড, পলসত, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও অন্য চতুষ্পদ সকল যাহা প্রতিভোগে আসে না বা খাদিত হয় না। অজকা (মাদী ছাগলী) এড়কা (মাদী ভেড়ী) ও শূকরী, গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী অবধ্য; এবং তাহাদের ছয় মাসের ন্যূনবয়স্ক পোতকেরাও তদ্রূপ। বধি-কুক্কুট কাটা হইবে না; জীব সহিত তুষ দগ্ধ হইবে না। অনিষ্টার্থে বা হিংসার্থে বন সব অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না; জীব দ্বারা অন্য জীবকে পোষণ করিবে না। তিন চাতুর্ম্মাস্যায়, পৌষপূর্ণিমাতে, (মাসের) তিন দিবসে চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিপদে, এবং প্রত্যেক উপবাসদিনে মৎস্য অবধ্য ও বিক্রীত হইবে না। সেই সেই দিবসে নাগবনে এবং কেউট-ভোগে যে সমুদায় অন্য জীব থাকিবে, তাহারাও হন্তব্য নয়। অষ্টমীপক্ষে, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায়, তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তদিনে, তিন চাতুর্ম্মাস্যায়, ও (অন্য) সুদিবসে ষাঁড় খাসি করা হইবে না; এবং অজ, মেষ, শূকর বা অন্যান্য জীব, যাহাদিগকে লিঙ্গরহিত করা হয়, তাহা হইবে না। তিষ্য ও পুনর্ব্বসু দিনে, চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণিমায়, চাতুর্ম্মাস্য পক্ষে, অশ্ব বা গো লাঞ্ছিত হইবে না।" (২)

ফিরোজলাটের সপ্তম স্তম্ভলিপি সুপ্রসিদ্ধ। ইহার প্রথমাংশ সোজা লেখা; দ্বিতীয়াংশ বাঁকা করিয়া দুই পার্শ্বে লেখা; এই জন্য পূর্ব্বে ইহা দুইটি স্বতন্ত্র লিপিরূপে পরিজ্ঞাত ছিল। এই লিপিতে প্রিয়দর্শিন্ কি কি ধর্ম্মকার্য্য কি কি উদ্দেশে করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। অতএব সব ধর্ম্মলিপির মধ্যে এইটি সুদীর্ঘ। ইহা স্থানে স্থানে অস্পষ্টভাবে পঠিত; এবং ইহাতে মোটামুটি কোন কবিত্ব বা লিপিকুশলতা নাই। কিন্তু সদ্ধর্ম্মপ্রচার ও তদনুযায়ী ধর্ম্মকার্য্যাবলীতে যদি কোন যশ থাকে, তবে সে এই লিপি-আজ্ঞাপক প্রিয়দর্শিনের। যাঁহারা লেখকের জড়িত, পুনরুক্তিপূর্ণ বাক্যে বিরক্ত না হন, তাঁহাদের জন্য সমস্ত সপ্তমলিপিটি পরিশিষ্টে নকল করিয়া দিলাম।

অশোক কবে রাজা হন, তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহা দেখা যায় যে, লিপিমালার বৎসর সর্ব্বত্র অভিষেক হইতে গণিত হইয়াছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, রাজা হওয়ার বৎসর অভিষেকের বৎসর হইতে পৃথক। কত পৃথক, তাহা জানিবার কোন বিশ্বসনীয় উপায় নাই; অন্ততঃ এখনও পাওয়া

(২) Bwhler, Ep. Ind. vol. II, pp, 257-8.

যায় নাই। সিংহলদেশীয় বিবরণ গ্রহণ করিলে অশোক পঞ্চম বৎসরে রাজত্বে অভিষিক্ত হয়েন। ইহাতে কোন অসম্ভবতা দেখিতেছি না। অভিষেক কখন হয়? গিরিলিপি হইতে দেখা যায় যে, অভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ বৎসরে) বিদেশীয় রাজগণের নিকট ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইবার অনুজ্ঞা হয়। সেই সময় কিরিনি-রাজ মগ ও ইপায়ারস-রাজ আলিকসুদরো জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যু অনুমান খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৮ বৎসরে হয়। তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫৯ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে অশোকের ত্রয়োদশ বৎসর (অভিষেকের) পড়িয়াছিল, ইহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। সেই হিসাবে তাঁহার অভিষেকের প্রথম বৎসর ২৭১ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে পড়িতেছে। যদি পালি ইতিহাস ঠিক হয়, তবে অশোক ২৭৫ খৃষ্টপূর্ব্ব বৎসরে রাজা হইয়াছিলেন।

অশোকের প্রকৃত মৃত্যুকাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। সপ্তম স্তম্ভলিপি হইতে দেখা যায় যে, তিনি অভিষেকের অষ্টাবিংশতি বৎসরে জীবিত ছিলেন। সপ্তম স্তম্ভলিপির সময় ২৭১—২৭=২৪৪ খৃঃ পূঃ। তাহার পর তারিখবিশিষ্ট কোনও লিপি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পৌরাণিকমতে তিনি ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার মৃত্যুকাল ২৩৯ (২৭৫-৩৬) খৃঃ পূঃ বৎসরে পড়িতেছে। সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্ব অসঙ্গত বোধ হয় না।

অশোকের বংশাবলীর বিবরণ অতি অস্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ কিম্বদন্তী এই যে, ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে প্রায় সকলকে তিনি বিনাশ করেন; ইহা অতিরঞ্জিত বোধ হয়। পঞ্চম গিরিলিপিতে ভ্রাতৃবর্গকে সাধারণতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ধউলী ও জউগড়ের প্রথম নম্বর বিশেষ লিপিতে "কুমার"-গণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অবরোধে বহু মহিষী ছিল, সন্দেহ নাই। পঞ্চম গিরিলিপি ও সপ্তম স্তম্ভলিপিতে তাঁহারা "দেবীগণ" ইতি শব্দে উল্লিখিত। কিম্বদন্তীমতে অসন্ধিমিত্তা তাঁহার প্রধান মহিষী ছিলেন। অসন্ধিমিত্তার মৃত্যুর পরে নববিবাহিতা ঋষ্যরক্ষিতা প্রধানা মহিষী হয়েন। সন্তান অনেকগুলি ছিল। সপ্তম স্তম্ভলিপিতে অশোক নিজে লেখাইয়াছেন,—"দালকাণাম্ পি চ মে" (এবং আমার পুত্রগণেরও)। কোনও পুত্রের নাম লিপিমালায় পাওয়া যায় না। হিন্দু পুরাণ মতে সুযশা নামক পুত্র তাঁহার অন্তে সম্রাট হয়েন। হাওনথসাঙ্গ শুনেন যে, অশোকের ধর্ম্মবর্দ্ধন নামক পুত্র গান্ধারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দীপবংশ ও মহাবংশমতে অশোকের পুত্র মহিন্দ ও কন্যা সংঘমিতা সিংহলদেশে ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রেরিত

হন। কিন্তু হাওনাথসাঙ্গ বলেন, মহেন্দ্র অশোকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (৩) অবদানমতে কুণাল নামে অশোকের একটি পুত্র ছিল। তাঁহার গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অশোকরাজের এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার লোচনযুগল অতি সুন্দর, কুণাল পক্ষীর ন্যায়। এই জন্য লোকে তাঁহাকে কুণাল বলিয়া ডাকিত। যৌবনাগমে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত মৃদু থাকায় তিনি রাজাবাটীর গোলমালে মিশিতে চাহিতেন না; দূরে থাকিয়া সংসার অনিত্য বুঝিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন। ঘটনাক্রমে অশোকমহিষী ঋষ্য-রক্ষিতা তাঁহাকে দেখিতে পায় ও দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়ে। তখন মহিষী তাঁহাকে অবৈধ প্রণয়ে আকর্ষণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্থিরচিত্ত টলাইতে পারে না। ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় রাণীর প্রেম ক্রোধে পরিণত হয়। তাহার ষড়যন্ত্রে কুণাল রাজধানী হইতে অতিদূরে তক্ষশিলায় শাসনকর্ত্তৃস্বরূপে প্রেরিত হন। কিয়ৎকাল পরে রাণী কৌশলক্রমে সম্রাটের হস্তিদন্তনির্ম্মিত মোহর যোগাড় করে ও সেই মোহরা-ঙ্কিত এক হুকুমনামা সম্রাটের নামে তক্ষশিলাস্থ কর্ম্মচারিগণের নিকট পাঠায়। তাহাতে আজ্ঞা ছিল যে, কুণালের দুই চক্ষু উপড়াইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। ইতিমধ্যে কুণাল সুশাসনের দ্বারা প্রজাবর্গের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং রাজাজ্ঞা পাইয়াও কেহই এমন নির্দ্দয় কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল না। কুণাল কিন্তু রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তাহাদের অনেক বোঝান ও অবশেষে যথেষ্ট পুরস্কারের ঘোষণা দেন। পুরস্কারলোভে অবশেষে এক জন কদাকার কুষ্ঠরোগী স্বীকৃত হয়। রোরুদ্য-মান প্রজামণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া সেই চণ্ডাল প্রথমে এক চক্ষু উপড়ায়; উৎ-পাটিত চক্ষু হস্তে করিয়া কুণাল বলিলেন,—

"হতভাগ্য মাংসপিণ্ড, কেন এই সকল মূর্ত্তি, যাহা কিঞ্চিৎপূর্ব্বে দেখিতে-ছিলে, আর দেখিতে পাইতেছ না? যাহারা তোমাকে উদ্দেশ করিয়া বলে 'আমি', তাহারা নিজেকে কতই না প্রবঞ্চিত করে, তাহারা কতই না নির্ব্বোধ।"

দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটিত হইলে তিনি বলেন যে,—"এই মাংসচক্ষু যাহা এত কষ্টে পাওয়া যায়, আজ আমা হইতে উৎপাটিত হইল; কিন্তু দোষ-

(৩) Beal's Si-Yu-Ki, vol. II. pp. 91-3; 246-7.

শূন্য সর্ব্বগুণান্বিত জ্ঞান-চক্ষু পাইলাম। রাজা আমাকে ত্যাগ করিলেন; কিন্তু আমি মহৎ ধর্ম্মরাজের পুত্র হইলাম। সকলে আমাকে তাঁহার সন্তান বল। যদিও আমি উচ্চ পদ হইতে চ্যুত হইলাম, যাহাতে এত কষ্ট ও শোক লিপ্ত আছে, তবু আমি ধর্ম্মরাজ্য প্রাপ্ত হইলাম, যাহাতে কষ্ট ও শোক বিলুপ্ত হয়।"

কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি জ্ঞাত হন যে, সম্রাট নিজে কোন আজ্ঞা দেন নাই, মহিষী ঋষ্যরক্ষিতার প্রবঞ্চনায় সেই জাল আজ্ঞাপত্র আসিয়াছিল। তখন কুণাল উত্তর দেন:—"তিনি বহু দিন সুখ, আয়ু ও ক্ষমতা ভোগ করুন, যাঁহা হইতে আমার এই উপকার হইল।"

তৎপরে অন্ধ রাজপুত্র সস্ত্রীক পাটলীপুত্রাভিমুখে যাত্রা করেন ও ভিক্ষা দ্বারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। কালক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে ও বীণাবাদন করিতে করিতে পিতার প্রাসাদের নিকট আইসেন। সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া অশোক তাঁহাকে প্রাসাদাভ্যন্তরে ডাকান, কিন্তু প্রথমতঃ চিনিতে পারেন না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অবশেষে সর্ব্ব ঘটনা শুনিতে পান। ক্রোধে রাণী ঋষ্যরক্ষিতাকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন। আজ্ঞাশ্রবণে রাজপুত্র বারণ করেন ও বলেন, "রাজন্, তাহাকে বধ করা আপনার ন্যায় ব্যক্তির উপযুক্ত নয়। নিজ পদ ও মন অনুযায়ী কার্য্য করুন; নারীহত্যা করিবেন না। দয়ার অপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার নাই। তথাগত ধৈর্য্য আজ্ঞা করিয়াছেন।" পুনশ্চ অশোকের পদতলে নিপতিত হইয়া বলেন, "পিতঃ, আমি কোন যাতনা ভোগ করিতেছি না, ও রাণীর নির্দ্দয় ব্যবহারে কোন ক্রোধাগ্নি অনুভব করিতেছি না। আমিই আমার দুঃখের জন্য দায়ী; বোধ হয়, কোন প্রাক্তন পাপকর্ম্মের জন্য এ জন্মে এই শাস্তি ভোগ করিতেছি। আমার বাক্য সত্য; যদি বিশ্বাস না করেন, তবে, হে চক্ষু, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হও।" ইহা বলিতে বলিতে চক্ষুতে পুনরায় দর্শন-শক্তি ও পূর্ব্ববৎ সৌন্দর্য্য আসিয়া পড়িল। (১১)

(১১) Burnouf's Introd, p. 403 etseq. L. C. Oldenberg's Buddha (Eng. trans.) pp, 296-8 and B. st Hilaire's Buddha (Eng. trans.) pp. 110-2. "Buddhist poetry has nowhere glcrified in more beautiful fashion, forgiveness and the love of enemies than in the narrative of Kunala" (Oldenberg, p. 298.)

পঞ্চম প্রস্তাব।

পাঠকের সুবিধার্থ অশোকের জীবনচরিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তদীয় জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিবার নিমিত্ত এই কয়টি দলীল ব্যবহৃত হইয়াছে :—

গুহালিপি	তিনটি	ফাহিয়েনের ফো-কো-কি (৩৯৯-৪১৪ খৃষ্টাব্দ)
গিরিলিপি	পনেরটি	হিউএন্থসাঙ্গের সি-উ-কি (৬২৯-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ)
স্তম্ভলিপি	দশটি	

দীপবংশ	(সিংহলদেশীয় পালি ইতিহাস)	বায়ুপুরাণ
মহাবংশ	ঐ	মৎস্যপুরাণ
অট্ঠকথা	ঐ	বিষ্ণুপুরাণ
		ভাগবতপুরাণ

দিব্যাবদান
শোকাবদান

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—

খৃষ্ট পূর্ব্ব বৎসর		বিবরণ
২৭৫	...	সিংহলবৃত্তান্তমতে সিংহাসনে আরোহণ।
২৭১	...	অভিষেক।
২৬৩	...	কলিঙ্গ-বিজয়।
২৬২	...	অশোকের অনুশোচনা। বৌদ্ধধর্ম্মের উপাসক হওয়া।
২৬১	...	ধর্ম্মযাত্রার আজ্ঞাপ্রদান।
২৫৯	...	"সংঘকে উপগত" হওয়া। অধিকাংশ ধর্ম্মানুশাসন লিপিবদ্ধ। স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারক প্রেরণ। থলিতকে দুই গুহা আজীবিকগণকে দান।
২৫৮	...	ধর্ম্মমহামাত্য নিয়োগ।
২৫৭	...	কোণাকমণের পূর্ব্বস্তূপবৃদ্ধি।
২৫৩	...	সম্পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের লিপিমালা প্রকাশিত। মগধসংঘকে বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে অনুজ্ঞা। পালি বিবরণ মতে তৃতীয় বৌদ্ধসমিতির সমবেত।
২৫২	...	থলতিকের তৃতীয় গুহা আজীবিকগণকে দান।
২৫১	...	ধর্ম্মযাত্রায় শাক্যমুনির জন্মস্থান লম্বিনি গ্রামে পূজা।
২৪৫		সপ্তমলিপি ব্যতীত অন্যান্য স্তম্ভলিপি আজ্ঞাপিত।
২৪৪	...	সপ্তম স্তম্ভলিপির প্রকাশ।
২৩৯	...	পৌরাণিক মতে অশোকের মৃত্যু।

মৃত্যুকালে অশোকের সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সুবিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাঁহার গিরিলিপি সিদ্ধাপুরে উৎকীর্ণ হওয়ায় দেখা যায় যে, মহীশূরের উত্তরাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। পড়েরিঅ ও নিগ্লীবস্থ স্তম্ভলিপি হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, নেপালের দক্ষিণাংশ তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। পূর্ব্বে রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; অনুমান, ব্রহ্মপুত্র নদী পর্য্যন্ত। পশ্চিমে গান্ধার ও কাম্বোজ তাঁহার অধীনস্থ ছিল; সুতরাং বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অধিকাংশ তাঁহার শাসনের বশবর্ত্তী ছিল, এমন সম্ভব। অতএব মোটামুটি চতুঃসীমা এই :—

উত্তরে হিমালয় ও হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালা; পশ্চিমে হেলমন্দ নদী, বেলুচিস্থান ও আরব্য মহাসাগর; দক্ষিণে মহীশূর, ১৪° অক্ষাংশ; পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদী।

ইহার অতি দীর্ঘতা পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় পঞ্চদশ শত মাইল; অতিপ্রস্থতা উত্তর-দক্ষিণে অনুমান চতুর্দ্দশ শত মাইল। এই বিশাল সাম্রাজ্য আয়তনে সার্দ্ধ বার লক্ষ বর্গ মাইলের কম হইবে না; এবং ইহাতে বর্ত্তমান লোকসংখ্যা বিংশতি কোটীর ঊর্দ্ধ। ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে এত বড় প্রকাণ্ড জনপদ ভারতে কখনও একচ্ছত্রীকৃত হয় নাই। ইহা অশোক প্রিয়দর্শিনের যুদ্ধকৌশল ও সুশাসনের জ্বলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। সেক্সপীয়রের সহিত আমরাও বলিতে পারি,—

> "His life was gentle, and the elements
> So mixed in him that Nature might stand up
> And say to all the world 'This was a man'."

আর দুই চারিটি কথায় এই ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, কিম্বদন্তীময় অশোকচরিত শেষ করিব। কি বীর্য্যবত্তা, কি কার্য্যকুশলতা, কি ধর্ম্মবিষয়িণী সমদর্শিতা, সর্ব্ব বিষয়ে অশোক বনাম প্রিয়দর্শিন্ ভারতীয় রাজগণের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার একমাত্র সমতুল মোগল সম্রাট জেলালুদ্দিন্ আকবর। উভয়েই তেজস্বী পিতামহের পৌত্র; এক জন চন্দ্রগুপ্তের,—আর এক জন বাবরের। উভয়েই স্বীয় ভুজবলে পিতৃ-রাজ্য অধিকার করেন; উভয়েই নিজ যুদ্ধনিপুণতায় সুবৃহৎ সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সংগঠিত করেন; উভয়েই মনুষ্য চিনিতে বিচক্ষণ ছিলেন; সুদক্ষ কর্ম্মচারী রাখিয়া ও রাজ্যশাসনপ্রণালীর সময়োচিত পরিবর্ত্তন করিয়া, নিজ নিজ বিশাল সাম্রাজ্য সুশাসিত করেন; উভয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও

সমুজ্জ্বল বুদ্ধি বলে স্বরাজ্য অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের বহিঃস্থ রাজ্যমালা ও তত্রত্য ধর্ম্মাবলির সংবাদ রাখিতেন; অশোক গ্রীক রাজগণের সম্বন্ধ রাখিতেন; আকবর পোর্টুগিজ ও ইটালিয়ানগণের সংস্পর্শ রাখিতেন। উভয়েরই নিকট বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ যথেষ্ট মান্য পাইতেন; তাহার চিহ্ন অশোকের লিপিমালায় ও ত্রিপিটকসমূহে, এবং আকবরের সভাস্থ আবুল-ফজল্, বদাওনি ও ফৈজির পুস্তকাবলীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। উভয়েই ধর্ম্ম সম্বন্ধে উন্নতভাবে সমদর্শী ছিলেন। অশোক বৌদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মসমূহকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতে বলিতেন; আকবর মুসলমান হইয়াও হিন্দু, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি ইত্যাদি ধর্ম্মকে মান্য করিতেন, এবং সাদরে তাহাদের যুক্তি শুনিতেন।

অবশ্য, উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্যও দেখা যায়। অশোক অপেক্ষা আকবরকে পিতৃরাজ্য-অধিকার ও বিস্তৃতির জন্য অনেক অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সুতরাং যাবজ্জীবন যুদ্ধ করিয়া অশোক অপেক্ষা অধিক বর্ষ রাজত্ব করিয়াও অশোক-সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিকার করিতে পারেন নাই। তথাপি রাজকার্য্যজ্ঞান, ক্ষিপ্রকারিতা, যুদ্ধকুশলতা, ও বৈষয়িক বুদ্ধিতে, আমার ধারণা, তিনি অশোকের অপেক্ষা উচ্চ ছিলেন। সেই কারণে, পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য, পাঠান ও মোগল কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা, হিন্দু মুসলমানের ঘোরতর শত্রুতা সত্ত্বেও, এত বড় বৃহৎ সাম্রাজ্য রাখিয়া যান; এবং সেই সাম্রাজ্য পুত্রপৌত্রাদিগণের অক্ষমতা ও গৃহবিবাদ সত্ত্বে ও এক শত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী ছিল, এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, অশোকের বংশধরেরা পঞ্চাশৎ বর্ষের অধিককাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, এবং অনুমান হয়, অল্প দিনে তাঁহার সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্রায়তন হইয়া যায়। পরন্তু ইহাও আমার বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আকবর অপেক্ষা অশোক উচ্চস্থানীয়। অনবরত যুদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের কঠোরতাবশতঃ আকবর অশোকের সপ্তদশ শত বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়াও তাঁহার ন্যায় নৈতিক উদারতা, ধর্ম্মবিষয়িণী সমদর্শিতা ও ধর্ম্মপ্রচারে প্রবলসহৃদয়তাপূর্ণ চেষ্টা দেখাইতে পারেন নাই। নিজের অনবরত চেষ্টা, স্বরাজ্যে প্রতিবেদক ধর্ম্মমহামাত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারীর নিয়োগ, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারক-প্রেরণ, অন্য ধর্ম্মে সহানুভূতি ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মকে এত বিস্তৃত করিয়া ফেলেন

যে, অন্য কোন রাজা কোন ধর্ম্মবিশেষের জন্য এত করেন নাই। সেই কারণে, অশোকের নাম, স্বদেশে বা বিদেশে, যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিহ্ন আছে, সেখানে এখনও ভক্তির সহিত উল্লিখিত হয়।

স্থূল কথায়, উভয়েই শ্রেষ্ঠ নরপতিশ্রেণীতে গণনীয়। এক জন সাম্রাজ্য-সংগঠক যোদ্ধা নরপতি; অপর জন ধর্ম্মপ্রচারক ধার্ম্মিক ভূপতি। আকবর, পার্শী কায়রস্ (Cyrus) মাকিডনাধিপতি এলেক্‌জাণ্ডার, রোমক কাইজর (Caesar), জর্ম্মান্ সার্লেমেন্ (Charlemagne) ফরাসিস্ চতুর্থ হেনরি, রবিয়ান্ পিটার, প্রুসিয়ান্ ফ্রেডরিক্ প্রভৃতির সমকক্ষ; অশোক য়িহুদি সলোমন্, রোমক মার্কস্ অরিলিয়স্ ও কন্‌ষ্ট্যাণ্টাইন, ফরাসীস্ লুই দি পায়স্ (Louis the Pious), প্রভৃতির সমকক্ষ। উভয়েই জগৎপূজ্য, মানব-জীবনের উৎকৃষ্ট আদর্শস্বরূপ।

অশোকচরিত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক মসিয়র সেনার্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া রচনা শেষ করিলাম। (১৮)

"It cannot, I think, be denied, wthout injustice, that he (Piyadasi) exhibits, in his edicts, a spirit of moderation, a moral elevation, a care for the public good, which merits every praise. He possessed from his birth a taste for enterprise and energetic qualities, borne witness to by the conquest of Kalinga.....That intellect (of his) was not perhaps very vast or very decided, but it was certainly animated with excellent intentions and full of the idea of moral duty and of the sentiments of humanity. By the various efforts with which he was inspired in his religious zeal, by his relations with nations not subject to his empire, nay with peoples the most distant from the Peninsula, and finely by the monuments epigraphic or otherwise of which he was the creator, Piyadasi certainly rendered services to the general civilisation of India, and the credit of these merits we are in justice bound to render to him."

পরিশিষ্ট।

সপ্তম স্তম্ভলিপির অনুবাদ; ডাক্তার বুলারের পাঠ।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই বলিয়াছেন,—

(১৮) Ind. Ant, vol. xx. (1891), pp. 266-7.

অতিক্রান্ত অন্তর রাজগণ ইহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া জনগণ-মধ্যে ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু জনগণে অনুরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় নাই।

এই (বিষয়ে) দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ বলিয়াছেন,—

এই (চিন্তা) আমার হইল "অতিক্রান্ত ও অন্তর রাজগণ ইহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন—কেমনে জনগণমধ্যে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি করিতে পারা যায়—কিন্তু জনগণে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় নাই।" কি প্রকারে জনগণমধ্যে অনুরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে; কি প্রকারে ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য (অন্ততঃ) কতকটা অভ্যুন্নতি হইতে পারিবে। এই (সম্বন্ধে) দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

এই (ভাব) আমাতে আসিল,—ধর্ম্মশ্রবণ সকল ব্যাপ্ত করিব; ধর্ম্মানুশাসন সকল জ্ঞাত করাইব; জনেরা ইহা শ্রবণ করিয়া অনুপ্রতিব্রজ হইবে ও অভ্যুন্নত হইবে। ধর্ম্মবৃদ্ধিতে বৃদ্ধি হইবে। এতদর্থে আমি ধর্ম্মশ্রবণসমূহ ব্যাপ্ত করিয়াছি; বিবিধ ধর্ম্মানুশাসনগুলি আজ্ঞাপিত করিয়াছি; যে আমার পুরুষেরা বহুজন মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে প্রতিবর্দ্ধিত ও পরিবোধিত করিবে। রাজুকেরাও আমা কর্ত্তৃক আজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, বহুপ্রাণী শত-সহস্রে যাইয়া ধর্ম্মযুক্ত জনগণকে এই প্রকার এই প্রকার প্রতিবোধ কর।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

এই সকল অনুবেক্ষণ করিয়া আমি ধর্ম্মস্তম্ভাবলী করিয়াছি, ধর্ম্মমহামাত্য-গণ (নিযুক্ত) করিয়াছি, ধর্ম্মশ্রবণসমূহ (ব্যাপ্ত) করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

মার্গসমূহে ন্যগ্রোধাবলি রোপিত করিয়াছি যে, তাহারা পশু মনুষ্য সকলকে ছায়ার উপভোগ দিবে; আম্রবাটিকাসমূহ রোপিত করিয়াছি; প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশে বাপী খনন করিয়াছি; ধর্ম্মশালা সকল করাইয়াছি; বহু বহু আপণাবলী করাইয়াছি—মনুষ্য ও পশুগণের প্রতিভোগ জন্য। এই প্রতিভোগে নাম (কিন্তু "লঘু")। পূর্ব্ব রাজগণও আমার ন্যায় বিবিধ সুখবস্তু জগৎ সুখায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মানুপ্রতিপত্তি অনুপ্রব্রজিত হউক—এতদর্থে আমি এই সব করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মমহামাত্যেরা প্রব্রজিত ও গৃহস্থগণের মধ্যে বিবিধ অনুগ্রহিক বিষয়ে তৎপর আছে। পাষণ্ডগণের মধ্যেও তৎপর আছে। আমি (বন্দোবস্ত) করিয়াছি—তাহারা (বৌদ্ধ) সংঘ মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে (হিন্দু) আজীবিকগণের মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা (জৈন) নিগ্রগণের মধ্যে তৎপর থাকিবে; আমি ইহা করিয়াছি যে—তাহারা নানা পাষণ্ডদলের মধ্যে তৎপর থাকিবে—যে সেই সেই মহামাত্যগণ যথাযথ প্রতিবিষ্ট থাকিবে। সেই ধর্ম্মমহামাত্যগণ আমা কর্ত্তৃক (আজ্ঞাপিত) যে এই সকল দলে তৎপর থাকিবে, এবং অন্য পাষণ্ড দলেও তৎপর থাকিবে।

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ বলিয়াছেন,—

ইঁহারা এবং অন্য বহুমুখ্য (কর্ম্মচারীরা) আমার ও দেবীগণের (মহিষী-গণের) দানবিষয়েও তৎপর আছে। সকল (কর্ম্মচারীরা) আমার অব-রোধীগণের (অন্দর মহলের) মধ্যে বিবিধ প্রকারে সন্তোষের উপায় (দেখা-ইতেছে), এখানে (পাটলীপুত্রে) এবং সর্ব্ব দিকেতে। আমি (এখন ইহা) করিয়াছি যে, (তাহারা) আমার পুত্রগণের ও অন্যান্য দেবীকুমারগণের দান-বিষয়ে তৎপর থাকিবে—ধর্ম্মাপদানে ধর্ম্মপ্রতিপত্তি নিমিত্ত। ধর্ম্মাপদানে ধর্ম্মপ্রতিপত্তি এই যে দয়া, দান, সত্যতা, শুচিতা, মৃদুতা, সাধুত্ব, এই সব লোকে বৃদ্ধি পাইবে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ রাজা ইহা বলিয়াছেন,—

(নিম্নলিখিত) যে কিছু সাধুকার্য্য আমা কর্ত্তৃক (আজ্ঞাপিত) হইয়াছে, লোকে তাহাকে অনুপ্রতিপন্ন করিয়া অনুবিধান করিয়াছে, তাহাতে বাড়ি-য়াছে ও বাড়িবে—মাতা পিতার প্রতি শুশ্রূষা, গুরুর প্রতি শুশ্রূষা, ব্রাহ্মণ শ্রমণ দরিদ্র ও দুঃখী, এমন কি, দাস ভৃত্যের প্রতি সম্প্রতিপত্তি।

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শিন্ ইহা বলিয়াছেন,—

মনুষ্যগণের মধ্যে এই ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়াছে দ্বিবিধ প্রকারে, ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা ও নিধ্যাসন দ্বারা। তাহার মধ্যে ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা লঘু, নিধ্যাসন দ্বারা বহু। ধর্ম্মনিয়মে আমা দ্বারা ইহা কৃত হইয়াছে—এই এই জাতি অবধ্য; অন্যান্য বহু নিয়মও আমি করিয়াছি। নিধ্যাসন (একাগ্রচিত্ততা) কিন্তু মনুষ্যগণের মধ্যে ভূয়সী ধর্ম্মবৃদ্ধি করিয়াছে—ভূতগণের অবিহিংসায় ও ও প্রাণিগণের অনালম্ভায়। এতদর্থে ইহা কৃত হইয়াছে যে, পুত্রপৌত্রাদিকাল

পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য (স্থিতি) পর্য্যন্ত ইহা থাকুক, ও তদনুযায়ী (সকলে) অনুপ্রতিগমন করুক। এবংবিধ অনুপ্রতিগমন করিলে ইহতঃ ও পরতঃ আনন্দ হইবে। সপ্তবিংশতিবর্ষাভিষিক্ত আমা দ্বারা এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হইল।

দেবপ্রিয় এই বলিয়াছেন,—

যেখানে শিলাস্তম্ভ বা শিলাফলক আছে, সেখানে এই ধর্ম্মলিপি লেখাইবে, যে তদ্দ্বারা ইহা চিরস্থায়ী হইবে।

সম্পূর্ণ।

ভারত-যুদ্ধকাল ও সপ্তর্ষির গতি।

গত দুই মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় যুধিষ্ঠিরের কালনিরূপণের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত কালনিরূপণের পক্ষে জ্যোতিষিক উপজীব্য-গুলি আলোচনা করিয়া ১৩০১ সালের পৌষ মাসের 'নব্যভারতে' আমার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে আসিতে পারি নাই। তদবধি সময়ে সময়ে ঐ বিষয়টি মনে হইয়াছে। নিখিল বাবুর দুইটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আবার দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা হইল। এই প্রবন্ধে তাঁহার কোন কোন অনুমানের প্রতিবাদ আবশ্যক হইবে, এবং কোন কোন প্রমাণের অর্থান্তর করিতে হইবে।

ভূমিকায় একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। প্রাচীন কালের ইতিহাস-প্রকটন-সময়ে পদে পদে প্রমাণ আশ্রয় করিতে হয়। ইতিহাসে আপনার আমার জল্পনা কল্পনার মূল্য কিছুই নাই। আমাদের জ্যোতিষ-বিষয়ে নিখিল বাবু এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহার প্রত্যেক উক্তিরই প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা হয়। তর্ক করিবার উদ্দেশে এ কথা বলি না; নিরর্থক তর্ক করিবার সময়ও নাই, রুচিও নাই। এইরূপ দুই একটা উক্তির উল্লেখ করিতেছি।

(১) সপ্তর্ষিকে কৃত্তিকা মনে করা নিতান্ত ভ্রান্ত ব্যক্তির কার্য্য। সংহিতায়, সিদ্ধান্তে সপ্তর্ষির বিস্তৃত বিবরণ আছে। ৺বাপূদেব শাস্ত্রী কৃত্তিকাকে সপ্তর্ষি মনে করিতেন? কথাটা সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

(২) কোন কোন প্রাচীন সংহিতাকার সপ্তর্ষির একটা গতির উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তর্ষি না কি শত বৎসরে এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। কোন সিদ্ধান্তে এই গতি অঙ্গীকৃত হইতে দেখি নাই। সংহিতা ও ব্যবহার-গ্রন্থে এবং পুরাণেই ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, কোন নিরপেক্ষ গণিতবিশারদ জ্যোতিষী সপ্তর্ষির উক্ত শত বৎসর এক এক নক্ষত্রে পরিভ্রমণ সম্বন্ধে অদ্যাপি বিচার করেন নাই। কথাটা ঠিক নহে। নিরপেক্ষ জ্যোতিষী অর্থে য়ুরোপীয় পণ্ডিত মনে করিলে, বেণ্টলী ব্যতীত কোলব্রুক এবং সম্প্রতি ব্রেনাণ্ড সাহেব যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। আমাদের জ্যোতিষী মনে করিলেও দুই এক জন করিয়াছেন। সকল সিদ্ধান্তী করেন নাই; বোধ করি, কেহই এই গতি বিশ্বাস করিতেন না। সংহিতা ও পুরাণে যাহাই হউক, প্রত্যক্ষাসিদ্ধ বিষয় সিদ্ধান্তকারগণ বিশ্বাস করিতেন না। সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌমে মুনীশ্বর, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেকে কমলাকর, এবং সম্প্রতি সিদ্ধান্তদর্পণে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সপ্তর্ষির উক্ত গতি বিচার করিয়া, কেহ বা কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কেহ বা অর্থান্তর ঘটাইয়া সংহিতাকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছেন। বিদেশীয় জ্যোতিষী অপেক্ষা স্বদেশীয় জ্যোতিষীর ব্যাখ্যার আমরা অধিক সমাদর করি। এ জন্য সিদ্ধান্ততত্ত্ব-বিবেকে ইহার যে বিচার আছে, তাহার সারার্থ দেওয়া যাইতেছে।

কমলাকর লিখিয়াছেন, শাকল্যমুনি সপ্তর্ষি তারকার বিক্ষেপ ও ধ্রুবক চল বলিয়াছেন। এই সকল তারা এক রবিবর্ষে ৮ লিপ্তা করিয়া গমন করে। যুগাদিতে ক্রতু তারা শ্রবণায় ব্যবস্থিত ছিল। * * * কিন্তু

ইৎথং ভগোলে বসতির্মুনীনাং নৈব সঙ্গতা। অন্যথানুপপত্ত্যাতঃ সার্ব্বভৌমেঽন্যথোদিতা॥

* * * * * *

মুনির্বর্ষশতেনৈকং প্রাগ্‌গত্যা ভং ভুনক্তি বৈ। ভবৃত্তস্যানুরোধেন কল্পনেয়ং বুধৈঃ স্মৃতা॥

শেষে বলিতেছেন, এই সকল মুনি লোকপ্রসিদ্ধ মুনি নহেন, অন্য মুনিও নহেন। তবে, কাহাদের গতি লিখিত আছে? না অঙ্গীকৃত দেবাংশের!

স্থূল কথা, কমলাকর সপ্তর্ষির পূর্ব্বগতি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, অথচ সংহিতার উক্তি একেবারে অগ্রাহ্যও নহে। তাই এক কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়া বিষয়টি ঢাকিতে চাহিয়াছেন।

ইংরাজি-অনভিজ্ঞ ইদানীন্তন জ্যোতির্বিদ্ চন্দ্রশেখর সপ্তর্ষির গতি আছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাই সিদ্ধান্তদর্পণে লিখিতেছেন,—

প্রত্যব্দং প্রাগ্‌গতিঃ প্রোক্তা পুরাণৈরষ্টলিপ্তিকা। তথায়নাংশসংস্কারো বামস্তেষাং যদীরিতঃ। তেষাং নো নিশ্চিতা পূর্ব্বানুভবাদর্শনান্নয়া॥ তৎসর্ব্বং কবিভির্ভাব্যৈর্জ্ঞেয়ং মৎকালিকস্থিতেঃ॥

অর্থাৎ, পুরাণে সপ্তর্ষির ৮ কলা করিয়া যে পূর্ব্বগতি লিখিত আছে, তাহা পূর্ব্বে অনুভব-অদর্শন হেতু আমি নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। যদি কোন গতি থাকে, তহা আমার সময়ে সপ্তর্ষির স্থিতি দেখিয়া ভবিষ্যেরা স্থির করিবেন।

এই গতি সম্বন্ধে আমরা যেমন বুঝিয়াছি, তাহা 'নব্যভারতে' দৃষ্ট হইবে। পরেও কিঞ্চিৎ বলা যাইবে। সপ্তর্ষি নক্ষত্রের গতি যে কাল্পনিক, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঐ গতির আরম্ভ মঘা নক্ষত্রে বৎসরে ৮ কলা, এবং পূর্ব্বাভিমুখে। ঐ গতি এমন অস্বাভাবিক যে, পূর্ব্বকালে বিদেশীয় আল্‌বেরুণী উহাকে উপলক্ষ করিয়া আমাদের প্রাচীনদিগকে উপহাস করিতে ছাড়েন নাই। নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, "পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে, গর্গ, পরাশর, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষিগণ এই সপ্তর্ষির গতির বিষয় নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।" সংহিতাকার বৃদ্ধগর্গ এই গতির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বোধ করি, তিনিই এই কথা রটাইবার মূল। বরাহ তাঁহার সংহিতায় (সিদ্ধান্তে নহে) গর্গের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। পরাশর সংহিতাকার ছিলেন, তিনিও ঐ গতি উল্লেখ করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। কিন্তু পরাশরসংহিতা আজকাল দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য। এতদ্‌ভিন্ন, আর্য্যভট্ট বা অন্য কোন প্রাচীন বা আধুনিক সিদ্ধান্তী সপ্তর্ষির গতির বিষয় স্ব স্ব গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানি না। এমন গুরুতর বিষয়ে প্রমাণ জন্য শ্লোক উদ্ধার করা আবশ্যক। স্মরণ করিবেন, সিদ্ধান্ত ও সংহিতার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

(৩) নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, "রাশিচক্রের নক্ষত্র বলিয়া হিন্দু জ্যোতিষীরা যাহা বুঝেন, তাহা যে একেবারেই স্থির তারা বলিয়া বুঝেন, এমন নহে। সচল (?) রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগকে তাঁহারা এক একটি নক্ষত্র বলেন, তাহার মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জ পড়িয়া যায়, তাহারাও সেই নামে অভিহিত হয়। সুতরাং মঘাকে স্থির তারা বলিয়া যে তাঁহারা স্বীকার করেন, এরূপ বলা যায় না।" বোধ করি, নিখিল বাবু নক্ষত্র শব্দের দুইটি অর্থ আছে দেখিয়া, তারা শব্দেরও দুইটি অর্থ করিয়া থাকিবেন।

মঘা তারা চিরকালই স্থির নক্ষত্র, এবং মঘা নক্ষত্রও বহুকাল পর্য্যন্ত বা চিরকালই স্থির নক্ষত্র। সপ্তর্ষির গতি বলিয়া প্রাচীনেরা বর্ষ সংখ্যা করিতেন। এতদ্‌বিষয় পরে বক্তব্য।

(৪) নিখিল বাবু লিখিয়াছেন, (৫৪০পৃঃ) সুতরাং সে সময়ে [পূর্ব্বকালে] যে দিন সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন হইত, সেই দিনকেই তাঁহারা [পূর্ব্বকালের লোকেরা] উত্তরায়ণ বা মকরসংক্রান্তি বলিতেন।" প্রমাণ? "পূর্ব্বকালে দৃগ্‌গণিত প্রচলিত ছিল, এবং অয়নচলনও যে প্রচলিত ছিল, তাহাও ঠিক।" 'পূর্ব্বকালে' বলিতে অবশ্য মহাভারতাদি গ্রন্থের রচনাসময়ে। সে সময়ে অয়নচলন প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাই না। এমন কি, বরাহের সময়েও ৪২৭ শকে অয়নচলন এ দেশে অজ্ঞাত ছিল। তাই তিনি অয়নচলন প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। "নিরয়ণের পূর্ব্বে যখন সায়ন মত প্রচলিত ছিল, তখন তাঁহারা [পূর্ব্বকালের লোকেরা?] উত্তরায়ণকে ৬৭ বৎসর অন্তর এক দিন পিছাইয়া আনিতেন, এবং কোন সময় হইতে এইরূপ পিছান আরম্ভ হয়, তাহার কোনও উল্লেখ না থাকায় অয়নচলনের দ্বারা কদাচ পূর্ব্বকালের সময় নির্ণীত হইতে পারে না।" দুইটি উক্তিরই প্রমাণ আবশ্যক। শেষের উক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, অয়নচলন দেখিয়া ঠিক সময় অবগত হইতে পারা যায় না বটে, কিন্তু নির্ণেয় সময়ের পূর্ব্বাপর সীমা পাওয়া যাইতে পারে। তাহাও অন্য কারণে। সায়ন গণনা চলিত ছিল না বলিয়াই পাওয়া যায়, নিরয়ণ গণনা চলিত থাকিলে পাওয়া দুর্ঘট হইত।

নিখিল বাবু আরও অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাদের সম্বন্ধে প্রমাণ দিলে সুখী হইতাম। যথা, আর্য্যভট্ট ও পরাশরের মতেও কলির ৬৫৩ বৎসর হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরব্ধ হয় (৬১৮ পৃঃ) কল্যব্দই যুধিষ্ঠিরের শক (?) (৬২০ পৃঃ); রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দের পরই শকাব্দের আরম্ভ হয় (৬২১ পৃঃ) ইত্যাদি। অন্য দুই একটি সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। প্রথমে দেখা যায়, মহাভারত-বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদি আদৌ ছিলেন কি না, তাহাতেই মতভেদ আছে। যদি বা ছিলেন, মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদের যে ইতিহাস মহাভারতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে বহু বিঘ্ন আছে। এই প্রবন্ধে মহা-

ভারতকে ভারত যুদ্ধের ইতিহাস বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইবে, এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ত্যাগ করিয়া কেবল তথাকথিত জ্যোতিষিক প্রমাণ বিচার করা যাইবে।

বলা বাহুল্য, মহাভারতরচনার কালনিরূপণ এক কথা, এবং ভারতযুদ্ধের কালনিরূপণ আর এক কথা। এটুকু স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ কেহ মহাভারতরচনার কাল এবং ভারতযুদ্ধকাল এক মনে করিয়া থাকেন। কোন্ অতীত কালে বেদব্যাস মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। পরে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। তবে, মহাভারতের যে আকার আমরা দেখিতেছি, তাহার উৎপত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাভারতে লিখিত জৈন ম্লেচ্ছাদির নাম দেখিলেই এ কথা প্রমাণিত হইবে।

মহাভারতগ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও, ঐতিহাসিক যুধিষ্ঠিরাদি আধুনিক নহেন। এই উক্তির পক্ষে অনেকগুলি প্রমাণ আছে। তাহাদের আলোচনায় দেখা যাইবে, ভারতযুদ্ধের দুই প্রকার কাল পাওয়া যায় (১) খৃঃ পূঃ ১২।১৩শ শতাব্দী, এবং (২) ২২।২৩শ শতাব্দী। এই দুই সময়ের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। শেষোক্ত সময়ই কতকটা ঠিক বলিয়া বোধ হয়। * (১) মহাভারতে লিখিত প্রমাণ। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম বলিতেছেন,

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥

এই শ্লোকের 'সৌম্য' পদটি বর্দ্ধমান মহারাজার মহাভারতে আছে, এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারতে তৎপরিবর্ত্তে 'পুণ্যঃ' পাঠ আছে। যে পাঠই হউক, শ্লোকটির অর্থ সম্বন্ধে কোন গোল নাই। যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা নীলকণ্ঠের টীকায় তিরোহিত হইয়াছে। রবির দক্ষিণায়নে মৃত্যু না হইয়া যাহাতে উত্তরায়ণে হয়, এই নিমিত্ত ভীষ্ম কিছু দিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে দেখিলেন, চান্দ্র (বা পবিত্র) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ সমাগত হইয়াছে, এবং সেই মাসের প্রথম ভাগও গত হইয়াছে। অর্থাৎ দেখিলেন, মাঘ শুক্লাষ্টমী আগত, এবং রবির উত্তরায়ণও আরম্ভ হইয়াছে।

* 'নব্যভারতে' ঐ দুই সময়ের মধ্য লইয়া যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ১৬শ শতাব্দী বলিয়াছিলাম।

মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্ম দেহ ত্যাগ করেন। এই নিমিত্ত উক্ত অষ্টমী ভীষ্মাষ্টমী নাম অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। যথা রাজমার্ত্তণ্ডে,

শুক্লাষ্টম্যাং তু মাঘস্য দদ্যাদ্ ভীষ্মায় যো জলম্। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে॥

রঘুনন্দনধৃত ভবিষ্যোত্তরে,

শুক্লাষ্টম্যান্তু মাঘস্য দদ্যাদ্ ভীষ্মায় যো জলম্। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

বঙ্কিমবাবু চান্দ্রমাসের পরিবর্ত্তে সৌরমাস কল্পনা করিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। পরন্তু পূর্ব্বকালে দৈনিক কালগণনায় চান্দ্রমাসই প্রচলিত ছিল। আমাদের যাবতীয় সিদ্ধান্তে চান্দ্রকাল হইতে সৌরকাল গণনার ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি তিথি দ্বারা দিন গণিত হইয়া থাকে। মহাভারতরচনার সময়ে চান্দ্রমাসগণনার রীতি প্রচলিত ছিল। এখানে এ বিষয়ের একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বিরাটপর্ব্বের অন্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দেখা যায়, কৌরবেরা অর্জ্জুনকে দেখিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, হয় ত প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তখন ভীষ্ম এইরূপে ত্রয়োদশবর্ষ গণনা করিলেন,

পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপজায়তঃ॥
এষামপ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ॥

অর্থাৎ, প্রতি পাঁচ বর্ষে দুই মাস অধিক হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ বর্ষে পাঁচ মাস বার রাত্রি (বা দিন) অধিক হইয়াছে।

উক্ত গণনাকে স্পষ্ট করা যাইতেছে। পাঁচ বৎসরে (সৌর) ১২×৫=৬০ সৌরমাস, এবং ২ অধিমাস হয়। ১৩ বৎসরে ৫ মাস ১২ দিন অধিক হয়। তবেই, ১৩ সৌর বৎসর গণনা করিতে ১৫৬×৫=১৬১ চান্দ্রমাস ও ১২ দিন (তিথি) গণিতে হইয়াছিল।

অবান্তর হইলেও, এই গণনার সহিত আলোচ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। দেখা যায়, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ও পৈতামহ সিদ্ধান্তে বর্ষগণনার ঠিক ঐ প্রকার ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। পৌষ অমাবস্যার দিন রবি দক্ষিণায়ন ত্যাগ করিয়া উত্তরাগতি আরম্ভ করিতেন। এই নিমিত্ত ও অন্যান্য কারণে মাঘ শুক্লপক্ষ চিরদিন প্রশস্ত ছিল। শুক্লপক্ষের মধ্যে উত্তরার্দ্ধ প্রশস্ত, তখনই চন্দ্রের সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অপরঞ্চ, কৃষ্ণাষ্টমীর পর শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ এবং অন্যত্র পূর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে দেখা যায়,

মাঘশুক্লপ্রপন্নস্য পৌষকৃষ্ণসমাপিনঃ। যুগস্য পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে॥

অতএব উক্ত বেদাঙ্গের সময়ে পৌষ অমাবস্যান্ত (মাঘী শুক্ল প্রতিপৎ) হইতে বর্ষ গণিত হইত। রবির উত্তরায়ণারম্ভসময়ই বর্ষের আদি ছিল।

যাহা হউক, পৌষ অমাবস্যার ১৪ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমা। মাঘী পূর্ণিমার দিন চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে থাকেন, এবং তথা হইতে চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে—শতভিষায়—রবি থাকেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন রবি শতভিষায়, এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অমাবস্যায় ধনিষ্ঠায় থাকেন। ধনিষ্ঠার রবির উত্তরায়ণ হওয়াতে ভরণীর শেষ পদে বিষুবস্ এবং অশ্লেষার অর্দ্ধে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত।

এই সমস্তই বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুযায়ী। বস্তুতঃ, মহাভারতে ভীষ্মের দেহ-ত্যাগের যে কাল প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে বেদাঙ্গজ্যোতিষ পঞ্জিকার মত। অতএব বোধ হইতেছে, মহাভারত-রচনার সময়ে উক্ত প্রাচীন পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল, এবং তদনুসারে কাল নির্দ্দিষ্ট হইত। উক্ত জ্যোতিষ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বহুকাল পরেও তাহার গণনাক্রম চলিত ছিল। এ নিমিত্ত উহার সময় হইতে মহাভারত-রচনার সময় অবগত হইতে পারা যায় না। তবে বলিতে পারা যায়, অত বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান মহাভারত ছিল না। অয়ন চলন অবলম্বন করিয়া এই কাল নির্দ্দিষ্ট হইল। অয়নের বেগ নিশ্চিতরূপে জানা নাই। কাজেই এই সময় খৃঃ পূঃ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে পারে।

(২) পুরাণ ও ইতিহাসের প্রমাণ। সে যাহা হউক, এই সময়ের সহিত পুরাণোক্ত যুধিষ্ঠির-কালের ঐক্য আছে।

বিষ্ণুপুরাণমতে পরিক্ষিতের সময় হইতে নন্দের অভিষেচন পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর; নন্দবংশ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল; তার পর মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে রাজা হন। অতএব ১০১৫+১০০+৩১৫=১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ের সহিত পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ-নির্দ্ধারিত কালেরও সমতা আছে। অন্য প্রমাণের সাহায্যে তাঁহারা খৃঃ পূঃ ১২শ হইতে ১৪শ শতাব্দী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর ভারতের প্রাচীন ইতিহাস হইতে নিখিল বাবু পৌষের 'সাহিত্যে' এই সকল প্রমাণ বলিয়াছেন। এখানে পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

(৩) সংহিতার প্রমাণ। বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে সপ্তর্ষিচার লিখিয়াছেন। যথা,

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥ *
একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।
প্রাগুদয়তোঽপ্যবিবরাদৃজূন্নয়ন্তি তত্র সংযুক্তাঃ॥

অর্থাৎ, মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি যুধিষ্ঠির নৃপতির পৃথ্বীশাসনকালে মঘানক্ষত্রে ছিলেন। শকারম্ভের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যকাল। সপ্তর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ বিচরণ করেন। পূর্ব্বদিকে সমুদয় নক্ষত্রের নিরন্তর উদয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে নক্ষত্রের উদয় হইলে সপ্তর্ষিপংক্তির স্পষ্ট প্রকাশ হয়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি স্থিত বলা যায়।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, পরিক্ষিতের সময়ে সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে দুইটি (পুলহ ও ক্রতু) প্রথমে উদিত হন, তাঁহাদের সম-দক্ষিণোত্তর রেখায় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের যেটি দৃশ্য হয়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি স্থিত বলা যায়। * ইঁহারা এক এক নক্ষত্রে শত মানুষ বর্ষ থাকেন।

বৃদ্ধ গর্গ লিখিয়াছেন, (উৎপল)

কলিদ্বাপরসন্ধৌ তু স্থিতাস্তে পিতৃদৈবতম্। মুনয়ো ধর্ম্মনিরতাঃ প্রজানাং পালনে রতাঃ॥

অর্থাৎ, কলি ও দ্বাপরের সন্ধিসময়ে মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমুনি থাকিতেন।

কশ্যপ লিখিয়াছেন, (উৎপল)

শতং শতং তু বর্ষাণামেকৈকস্মিন্ মহর্ষয়ঃ। নক্ষত্রে নিবসন্ত্যেতে সসাধ্বীকা মহাতপাঃ॥

অর্থাৎ, সারুন্ধতীক মহর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে শত বৎসর নিবসতি করেন।

এইরূপ আরও অনেক বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল বচনে দেখা যায়, (১) দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষি ছিলেন, (২) মঘানক্ষত্রে থাকিবার সময় যুধিষ্ঠির ও পরিক্ষিৎ ছিলেন, (৩) শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ছিলেন, (৪) সপ্তর্ষির একটি পূর্ব্ব গতি আছে, বৎসরে ৮ কলা। কিম্বদন্তী আছে, এবং কিম্বদন্তীর মূলে লিখিত প্রমাণ আছে যে, দ্বাপরের শেষে এবং কলির প্রারম্ভে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল। শকের ৩১৭৯ বৎসর, এবং খৃষ্টাব্দের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কলির আরম্ভ। সুতরাং সেই সময়ে ভারত যুদ্ধ হয়। বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে বরাহ বলেন, শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে। গর্গসংহিতার অভাবে বলা যায় না, এই গণনা গর্গ নিজে করিয়াছিলেন, কি

* পুরাণকারের বাস ২৭। ৪২ অক্ষাংশাদির দক্ষিণে না হইলে তিনি ক্রতুর উদয়াস্ত দেখিতে পাইতেন না। মথুরার অক্ষাংশ ২৭। ৩০; সম্ভবতঃ তাঁহার বাস মগধদেশে ছিল।

বরাহ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে, গর্গ শকারম্ভের অনেক পূর্ব্বে ছিলেন। সুতরাং বোধ হয়, তিনি ২৫২৬ বৎসর বলেন নাই। উৎপলোদ্ধৃত গর্গ-বচন হইতেও জানা যায়, গর্গ মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতি মাত্র বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহা হইতে বরাহ স্বয়ং বৎসরগণনা করিয়া যুধিষ্ঠির নৃপতির কাল শকের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৎসর-সংখ্যার নির্দ্দেশ দেখিলেই বোধ হয় যে, উহার মধ্যে জ্যোতিষগণনা ছিল। এতদ্‌বিষয় পরে বক্তব্য।

কাশ্মীর দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীতে ভারত-যুদ্ধকাল বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতযুদ্ধ ঠিক দ্বাপরান্তে হয় নাই, কলির ৭৫৩ বৎসর পরে হইয়াছিল। কলির যে সময়ে কুরুপাণ্ডবেরা ছিলেন, সেই সময়ে কাশ্মীরে গোনন্দ রাজা ছিলেন। এই গোনন্দ (তৃতীয়) আরম্ভ করিয়া ২৩৩০ বৎসর গিয়াছে, এবং ১২৬৬ বৎসরে ৫২ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শকের ১০৭০ অব্দে কহ্লণ এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন। তবেই ঐ অব্দের পূর্ব্বে ২৩৩০ × ১২৬৬ = ৩৫৯৬ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের গোনন্দ ভারত-যুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। শক ১০৭০ অব্দ = কলির ৪২৪৯ বৎসর। ৪২৪৯ হইতে ৩৫৯৬ হীন করিলে ৭৫৩ বৎসর থাকে। কাজেই কহ্লণের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠির ছিলেন।

এই প্রকার বর্ষ সংখ্যা করিতে দেখিলে আপাততঃ মনে হয় যেন, কহ্লণ কাশ্মীরের কোন প্রাচীন ইতিহাস দেখিয়া গত রাজগণের আধিপত্যকাল গণনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন শকের একাদশ শতাব্দীতে, অথচ তাঁহার পূর্ব্বের তিন চারি সহস্র বৎসরের রাজগণের আধিপত্যকাল নিঃসন্দেহে বলিতেছেন! এমন কি, বলিতেছেন, কলির ঠিক ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ছিলেন!

এই সকল স্মরণ করিলেই মনে হয়, তাঁহার প্রমাণ গত রাজগণের আনুপূর্ব্বিক আধিপত্যকাল সংখ্যা নহে। তাঁহার কি প্রমাণ ছিল, তাহাও তিনি পরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

ঋক্ষাদৃক্ষং শতেনাব্দৈর্যাৎসু চিত্রশিখণ্ডিষু।
তচ্চারে সংহিতাকারৈরেবং দত্তোঽত্র নির্ণয়ঃ। ৫৫
আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য। ৫৬

তাঁহার প্রমাণ তবে সংহিতা। শেষের শ্লোকটি অবিকল বারাহী সংহিতার। বলা বাহুল্য, তাঁহার পূর্ব্বে সংহিতার উৎপত্তি হইয়াছিল।

দেখা যাইতেছে, সংহিতার উক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শকারম্ভে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল। অবশ্য যুধিষ্ঠিরাব্দ ও কল্যব্দ এক নহে, কিংবা যুধিষ্ঠিরাব্দ অপ্রচলিত হইলেই শকাব্দ প্রচলিত হয় নাই। আর্য্যভট্টের সময়ে শকাব্দ তত প্রচলিত হয় নাই, তাই তিনি নিজ সময় কল্যব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। শকের দশম শতাব্দীতে—কহ্লণের পূর্ব্বে আল্‌বেরুণী কাশ্মীরের একখানা পঞ্জিকায় তৎকালের যুধিষ্ঠিরাব্দ লিখিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অদ্যাপি কাশ্মীরে এই অব্দ গণিত হয় কি না, বলিতে পারি না। মনে হইতেছে যেন, দাক্ষিণাত্যের কোন পঞ্জিকায় এই অব্দানুসারে গত বর্ষ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়াছি। *

বোধ করি, এই প্রসিদ্ধিবশতঃ রত্নমালায় শ্রীপতি নক্ষত্রবিশেষে সপ্তর্ষির স্থিতি অনুসারে দেবতাবিশেষের প্রতিষ্ঠার বিধি দিয়াছেন। রত্নমালায় দেখা যায়, শকারম্ভে সপ্তর্ষি পুষ্যানক্ষত্রে ছিলেন। কেন না, ৩৫২৬ বৎসরে সপ্তর্ষি মঘা হইতে পুনর্ব্বসু শেষ করিয়া পুষ্যাতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, মঘা নক্ষত্র এই গণনার আদি; এবং যখন সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে ছিলেন, তদবধি কত শত বর্ষ গত হইয়াছে, তাহা সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত না করিয়া, কোন্ নক্ষত্রে সপ্তর্ষি আছেন, তদ্দ্বারা প্রাচীনেরা গত কাল জ্ঞাপন করিতেন। পুরাণেও এই গণনাক্রম লিখিত আছে। কোন প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব বোধ হইতেছে, জ্যোতিষ-সংহিতা ও পুরাণের রচনাসময়ে যুধিষ্ঠিরাব্দগণনার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রকৃত-সিদ্ধান্ত-রচনার পূর্ব্বে অধিকাংশ সংহিতা প্রণীত হইয়াছিল।

---

* এই অব্দগণনক্রম বুঝা সহজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ বৎসরের (শক ১৮২০) যুধিষ্ঠিরাব্দ গণনা করা যাউক। শকাব্দ সংখ্যার সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরাব্দ হয়। অতএব ১৮২০ শক = ৪২৪৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ। সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে ১০০ বৎসর থাকেন, এবং যুধিষ্ঠিরাব্দের প্রথমে তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। অতএব তদবধি সপ্তর্ষি ৪৩ নক্ষত্র পার হইয়া ৪৪ম নক্ষত্রের ভোগ্য ১০০ বৎসরের মধ্যে ৯৬ বৎসর গত হইয়াছে। মঘা হইতে অশ্লেষা অনুলোমক্রমে ২৭ নক্ষত্র উক্ত লব্ধ ৪৩ হইতে হীন করিলে ১৬ অবশেষ থাকে। মঘা হইতে গণিয়া গেলে ১৬শ নক্ষত্রে পূর্ব্বফল্গুনী হয়। অতএব, এ বৎসর উত্তরফল্গুনীতে সপ্তর্ষির ৪৬ বর্ষ স্থিতি গত হইয়াছে।

ভারতযুদ্ধকাল-নিরূপণ পক্ষে প্রায় সমুদয় প্রমাণ আলোচনা করা গেল। দেখা গেল, উহার দুইটি সময় পাওয়া যায়, এবং সেই দুইটি সময়ের মধ্যে প্রায় সহস্র বৎসর অন্তর আছে। অবশ্য দুই সময়ই কদাপি সত্য হইতে পারে না। অন্ততঃ একটিতে নিশ্চয়ই ভুল আছে। এই ভুলের উৎপত্তি কি, সপ্তর্ষির গতির অর্থ কি, এখানে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

অবশ্য বিষয়টি গুরুতর। প্রাচীনকালের গণনার দোষ ধরাও যেমন কঠিন, বলাও তেমনই কঠিন। এ স্থলে আমাদের অনুমান ভিন্ন অন্য প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যাইবে না। সপ্তর্ষির গতি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, শকারম্ভে যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ হইয়াছিল। শত বৎসরে এক নক্ষত্র গতি; সুতরাং শকারম্ভের পূর্ব্বে সপ্তর্ষি ২৫.২৬ নক্ষত্র পার হইয়াছিলেন। মঘা হইতে অনুলোমক্রমে গণিয়া আসিলে শকমুখে সপ্তর্ষি পুষ্যাতে ছিলেন। শ্রীপতিও তাহাই বলিয়াছেন।

এ দিকে দেখা যায়, মঘা হইতে অয়ন ২৭—২৫.২৬ = ১.৩৪ নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বকালের জ্যোতিষীরা অয়নচল জানিতেন না। কিন্তু অয়নবেগ তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিলেও প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় অজ্ঞাত ছিল না। বেদ ও ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, পূর্ব্বকালে মঘা নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। শকারম্ভসময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, উত্তরায়ণ মঘা হইতে ১.৩৩ নক্ষত্র পিছাইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা অয়নের বিলোমগতি দেখিয়া নিশ্চিত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই বিস্ময়প্রকাশের নিদর্শন আছে। এই বিলোমগতি না জানাতেই, বোধ করি, তাঁহারা ভাবিলেন, মঘা নক্ষত্র হইতে অনুলোম গতিতে উত্তরায়ণ পুষ্যাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

এখানে অয়নের চলন বলা গেল। কিন্তু অয়নের সহিত সপ্তর্ষির সম্বন্ধ কি? পরে বলা গিয়াছে, কোন অতীত কালে মঘাতে উত্তরায়ণ শেষ হইত, এবং মঘা নক্ষত্রের সহিত সপ্তর্ষির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল ও এখনও আছে। সপ্তর্ষি, মঘা ও রবির উত্তরায়ণনিবৃত্তি,—তিনটিই পরস্পর সংযুক্ত ছিল। যে ধ্রুবসূত্র সপ্তর্ষি ও মঘাকে ভেদ করে, সেই ধ্রুবসূত্রই অয়নান্ত (solstitial colure) ছিল। অয়নান্ত সূত্রের চলন অজ্ঞাত, কিন্তু সপ্তর্ষি ও মঘা-গত সূত্র ঠিক একই থাকে না। অক্ষাংশভেদে সপ্তর্ষি ও মঘার উদয়াস্তের তারতম্য হয়, মঘা নামক তারা থাকিলেও মঘা নামক নক্ষত্র আছে, সপ্তর্ষিরও

সাতটি তারা একই ধ্রুবসূত্রে অবস্থিত নহে। পরন্তু মরীচি হইতে ক্রতু পর্য্যন্ত প্রত্যেকই মঘা নক্ষত্রের অংশবিশেষের সহিত যুক্ত বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, সপ্তর্ষি মঘাতে অবস্থিত, উত্তরায়ণও মঘাতে অবস্থিত। ইহা হইতে সপ্তর্ষিরেখা ও অয়নান্ত সূত্র কালক্রমে একার্থবাচক হইবার সম্ভাবনা ছিল। অন্ততঃ এতদ্ভিন্ন অন্য কোন অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না, শাস্ত্রেও কোন অনুমান বা বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই।

অয়নান্ত সূত্র অর্থে সপ্তর্ষিরেখা বা সপ্তর্ষিমণ্ডল * অঙ্গীকার করিয়া দুই একটি বিষয়ের উপপত্তি দেখা যাউক। উপরে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বকালে মঘাতে উত্তরায়ণ হইত, শকমুখে ১.৩৩ নক্ষত্র পশ্চিমে হইত। প্রতি নক্ষত্র অয়ন পিছাইতে প্রায় ৯৫০ বৎসর লাগে। সুতরাং ১.৩৩ নক্ষত্র পিছাইতে ১২৬৭ বৎসর লাগিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের সময়ে উত্তরায়ণ বা সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘাতে ছিল। তবেই যুধিষ্ঠির শকের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে ছিলেন।

আমাদের উক্ত অনুমানের পক্ষে একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বরাহ স্বসময়ে—৪২৭ শকে—উত্তরায়ণনিবৃত্তি পুনর্ব্বসুর তৃতীয় পদে দেখিয়াছিলেন। শকমুখে পুষ্যার ০.২৫ নক্ষত্র বাকি ছিল, এবং ৪২৭ শকে পুনর্ব্বসুর ০.২৫ গত হইয়াছিল। উভয়ে মিলিয়া অর্দ্ধ নক্ষত্রের অন্তর ঘটিয়াছিল। অর্দ্ধ নক্ষত্র পিছাইতে ৪২৭ বৎসর অপেক্ষা কিছু অধিক হইলেও আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীয় গণনানুসারে প্রায় ঠিক। কেন না, এতদনুসারে প্রতি নক্ষত্র পিছাইতে ৮৫২ বৎসর, এবং বার্ষিক অয়নবেগ ৫৬৩ বিকলা পড়িতেছে। এই বেগ আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষিগণের প্রদত্ত বেগের তুল্য।†

কিন্তু আরও কথা আছে। এতদ্দ্বারা ২৫২৬ বৎসরের উপপত্তি পাওয়া গেল না। এক্ষণে এই গণনার মূল অনুসন্ধান করা যাউক। ইহার মূল নক্ষত্র শব্দের দুইটি অর্থের মধ্যে একটির পরিবর্ত্তে অন্যটি গ্রহণ। উপরে মঘা নক্ষত্র অর্থে ক্রান্তিবৃত্তের দশম ৮০০ কলা পরিমিত প্রদেশ লওয়া গিয়াছে। কিন্তু মঘা নক্ষত্র বলিলে মঘা তারাও বুঝায়। মঘা তারা মঘা নক্ষত্রের আদিতেও

---

* মণ্ডল শব্দটি জ্যোতিষে বৃত্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল বুঝিতে সপ্তর্ষি-সমূহ হইতে পারে। কিন্তু রবিমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি জ্যোতিষ্কসম্বন্ধে জ্যোতিষে গোল বুঝিয়া থাকি। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের পরিবর্ত্তে কেবল সপ্তর্ষির প্রয়োগ হওয়া বিচিত্র নহে।

† এ সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলিবার স্থান নাই। মৎসম্পাদিত সিদ্ধান্তদর্পণের ইংরাজি মুখবন্ধে যথেষ্ট আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

অবস্থিত নহে। আমাদের অনুমানে, যে সময়ে মঘাতে রবির অয়নপরিবর্ত্তন হইত, সেই অতীতকালে, নক্ষত্র শব্দের কৃত্রিম অর্থ প্রচলিত ছিল না। নক্ষত্র শব্দ দ্বারা নক্ষত্রচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা জ্যোতিষচর্চ্চার প্রথমাবস্থায় সম্ভাব্য ছিল না। তৎকালে মঘা তারা ও মঘা নক্ষত্র একার্থ-বাচক ছিল। বেদেও ব্রাহ্মণের ঋষিগণ মঘাতে রবির অয়নপরিবর্ত্তন লিখিয়া গেলেন। পরবর্ত্তী জ্যোতিষিগণের মধ্যে কেহ বা উহাতে মঘা তারা বুঝিলেন, কেহ বা মঘা নক্ষত্র বুঝিলেন।

মঘা নক্ষত্র বুঝিলে যে সময় পাওয়া যায়, তাহা উপরে বলা গিয়াছে। মঘা তারার অয়ননিবৃত্তি ধরিলে কোন সময়ে আসা যায়, এখন তাহাই বিবেচ্য। দেখা যায়, খৃঃ পূঃ ২৩০০ বৎসরে মঘা তারার অয়ন পরিবর্ত্তন হইত। শকাব্দ ধরিলে ঐ সময় ৭৮ বৎসর অধিক হয়। বর্ত্তমান জ্ঞাত অয়নবেগ-সাহায্যে অত দীর্ঘকাল নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা দুরূহ। এতদ্ভিন্ন, উক্ত কালগণনা পাশ্চাত্য জ্যোতিষের অয়নবেগ অনুসারে করা গিয়াছে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা সেই বেগ গ্রহণ করেন নাই। কত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে দুই এক শত বৎসরের প্রভেদ ধর্ত্তব্য নহে।

আর দুই একটি কথা বলিয়া এই নীরস তত্ত্বের উপসংহার করা যাইতেছে। জ্যোতিষসংহিতা মতে ২৫২৬ শকপূর্ব্বে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। অর্থাৎ, খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে। মঘা তারায় রবির অয়ন পরিবর্ত্তন হইলে আধুনিক গণনানুসারে খৃঃ পূঃ ২৩০০ অব্দ পাওয়া যায়। আমাদের জ্যোতিষানুসারে এই গণনা করিতে হইলে মঘা তারার ধ্রুবক আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান সূর্য্য-সিদ্ধান্তাদির ধ্রুবক লইলে চলিবে না। প্রাচীনকালে প্রদত্ত ধ্রুবকের মধ্যে পঞ্চসিদ্ধান্তকার বরাহ কয়েকটি তারার ধ্রুবক দিয়াছেন। তন্মধ্যে মঘার ধ্রুবক ১২৬ অংশ দেখা যায়। মঘা তারাটি উজ্জ্বল এবং ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত। সুতরাং ১২৬ অংশই মঘার তাৎকালিক অপাংশ (True Iongitude) ছিল। উহা হইতে ৯০ অংশ হীন করিলে ৩৬ অংশ থাকে, এবং ইহাই পূর্ব্ব-কথিত সময়াবধি অয়নাংশ। ৭০ বৎসরে অয়ন ১ অংশ সরিয়া থাকে। এতদনুসারে আমরা শকের ২৫২০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া পড়িতেছি। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মঘার উক্ত ধ্রুবক শকের প্রথম শতাব্দীতে পরিমিত হইয়াছিল।

কিন্তু বৃদ্ধ গর্গ বলেন, কলিদ্বাপরের সন্ধিসময়ে খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, এবং শক পূঃ ৩১৭৯ অব্দে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। ইহার সহিত উপরের লিখিত সময়ের ঐক্য হইতেছে না। এই প্রভেদের কারণ নিশ্চয় করা দুরূহ। তবে দুই একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সপ্তর্ষি একটি তারা নহে; উহার সাতটি তারা এক ধ্রুবসূত্রেও অবস্থিত নহে। এখন এই বিষয় আলোচনা করা যাউক।

কেহ (শাকল্য) বলেন, ক্রতু দিয়া ধ্রুবসূত্র টানিতে হইবে। ক্রতু তারাটি সপ্তর্ষির সাতটি তারার পশ্চিম। গণনা করিলে দেখা যায়, খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অয়নান্ত সূত্র ক্রতু দিয়া গমন করিত। এই সময় ইতঃপূর্ব্বে আমরা অন্য উপায়েও পাইয়াছি।

বরাহ বলেন, মরীচি দিয়া ঐ সূত্র টানিতে হইবে। তিনি বা গর্গ এ কথা স্পষ্টতঃ বলেন নাই বটে, কিন্তু মরীচির উদয় না হইলে অন্য ছয়টি তারার প্রকাশ হয় না, কেন না, মরীচি সপ্তর্ষির সর্ব্বপূর্ব্ব ভাগে। যাহা হউক, দেখা যায়, খৃঃ পূঃ চত্বারিংশৎ শতাব্দীতে অয়নান্তসূত্র মরীচি দিয়া গমন করিত।

অধিকাংশের মতে, পুলহ ও ক্রতু দিয়া উক্ত রেখা টানিতে হইবে। পুলহ ও ক্রতু ঠিক এক ধ্রুবসূত্রে অবস্থিত নহে। সুতরাং উহাদের মধ্য দিয়া টানিতে হইবে। এরূপ করিলে খৃঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ সূত্রটি অয়নান্ত সূত্র ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহের মতও এই। তিনি লিখিয়াছেন, ধ্রুবসূত্রেণ যল্লগ্নৌ তদৃক্ষস্থা মহদয়ঃ। কথ্যন্তে সাম্প্রতং সিংহে ভুভুজাং ২১ শান্তগৌ হিতৌ। তবে ইহাঁর মতে সিংহ রাশির ২১ অংশে পুলহ ক্রতুগত ধ্রুবসূত্র অবস্থিত। বরাহের সময়ে ৪২৭ শকে কর্কটের আদিতে অয়ন পরিবর্ত্তন হইত। সিংহের ২১ অংশ হইতে কর্কটের আদিতে অয়ন পিছাইতে ৫১ অংশে ৫১ × ৭০ = ৩৫৭০ বৎসর গিয়াছিল। উহা হইতে ৪২৭ হীন করিলে ৩১৫৩ থাকে। প্রায় এই সময়ে কলির আরম্ভ হইয়াছিল। * যাঁহারা বলেন, দ্বাপর কলির সন্ধিসময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তাঁহাদের গণনার মূল এই। কিন্তু শাকল্য লিখিয়াছেন,

যুগাদৌ বিষ্ণুতারায়াঃ ক্রতুর্ভাদ্যে ব্যবস্থিতঃ।

* এখানে দৃককর্ম্মসংস্কার করা আবশ্যক। স্থূলগণনার প্রয়োজন বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল।

যুগাদিতে শ্রবণার আদিতে ক্রতু ছিলেন। মঘা হইতে শ্রবণার অন্তর ১২ নক্ষত্র। শাকল্যমতেও সপ্তর্ষির গতি শত বৎসরে এক নক্ষত্র। এইরূপে ১২০০ বর্ষ মাত্র পাওয়া যায়। তার পর, যুগাদি অর্থে কলিযুগাদি ধরিতে হইবে। শ্রবণাদি-গত সূত্র মঘা দিয়া যায় না, পুষ্যার অর্দ্ধাংশ দিয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, শকারম্ভে পুষ্যার প্রথম পাদে সপ্তর্ষি ছিলেন। সুতরাং যুগাদিতেও সেইখানে সপ্তর্ষিরেখা থাকিতে পারে না। অতএব মনে করিতে হইবে, শকারম্ভের পূর্ব্বেই সপ্তর্ষিরেখা ২৭ নক্ষত্র একবার ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। এইরূপে ২৭০০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহার সহিত যুগারম্ভকালের কতকটা ঐক্য আছে। অন্য পক্ষে, যুগাদিতে শ্রবণায় শকারম্ভে পুষ্যায় সপ্তর্ষি-রেখা থাকিলে উভয় সময়ের মধ্যে প্রায় ১৩০০ বৎসরের অন্তর ঘটে।

এই সকল বিষয় বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন-রূপে সপ্তর্ষির অবস্থিতি গণনা করিতেন; সুতরাং কোন্ মত গ্রাহ্য, কোন্ মত অগ্রাহ্য, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে সপ্তর্ষিগত সূত্র দ্বারা গণিত সাহায্যে সময় নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনাবিশেষ। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সপ্তর্ষিগত সূত্র অর্থে অয়নান্ত সূত্র ধরিলে অনেক উক্তির সামঞ্জস্য করিতে পারা যায়। এই সকল কারণে আমাদের বিশ্বাস যে, সপ্তর্ষির গতি দ্বারা প্রাচীনেরা অয়নের গতি স্থূলতঃ ব্যক্ত করিতেন। কালক্রমে ঐ অর্থ পরবর্ত্তী কোন কোন জ্যোতিষী ও পুরাণকার বিস্মৃত হইয়া অর্থান্তর ঘটাইয়াছিলেন। সত্য ঘটনা চিরদিনই সত্য; অর্থান্তরবশতই সত্য অনেক স্থলে কাল্পনিক বোধ হয়।

তবে, সপ্তর্ষি নামক সাতটি তারার সহিত নক্ষত্রবিশেষের যোগ কাল্পনিক। এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির শত বৎসর স্থিতি দ্বারা কেবল শত বর্ষ জ্ঞাপিত হইত। এই কৃত্রিম অর্থের মূলে অয়নান্ত কালের পরিবর্ত্তন ছিল। কালসহকারে এই অর্থও কেহ কেহ অন্যরূপ ভাবিয়া বিষয়টি অতিশয় জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু সমুদয় অর্থের সঙ্গতির চেষ্টা করিলেও ভারতযুদ্ধকাল দুইটি পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ১২শ শতাব্দী এবং ২২শ কি ২৩শ শতাব্দী। ইহার মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? আমাদের অনুমানে, যদি ভারতযুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা শেষোক্ত সময়েই হইয়াছিল। সেই সময়ে, যে সময়ে বেদের কতিপয় মণ্ডল রচিত হইয়াছিল, বেদের না হইলেও যে সময়ে কয়েকটি ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল;

যে সময়ে মঘা নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত এবং কৃত্তিকায় বিষুবস থাকিত। মঘা নক্ষত্রের কৃত্রিম অর্থ ধরিলে ভারতযুদ্ধকাল ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ-রচনার কাল খৃঃ পূঃ ১২শ বা ১৩শ শতাব্দী হয়, স্বাভাবিক অর্থ ধরিলে খৃঃ পূঃ ২২শ বা ২৩শ শতাব্দী হয়।

আমাদের বিবেচনায় অত পুরাকালে নক্ষত্র শব্দের কৃত্রিম অর্থ ছিল না। তাই শেষোক্ত সময় সত্য বলিয়া বোধ হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ গণনায় দুই এক শত বর্ষের তারতম্য ধর্ত্তব্য নহে।

বস্তুতঃ মহাভারতের আদি বৃত্তান্ত বহুপূর্ব্বকালের। এই আদি, শতপথ-ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। রমেশবাবু এ বিষয় তৎপ্রণীত ইতিহাসে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। উক্ত ব্রাহ্মণে কুরুপাঞ্চালযুদ্ধের কেবল উল্লেখ আছে, এমন নহে। উক্ত ব্রাহ্মণরচনার পূর্ব্বে পরিক্ষিৎ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ ব্রাহ্মণরচনার কালনিরূপণ করিতে পারিলে কুরুপাঞ্চালযুদ্ধের সময় নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতের যাবতীয় প্রাচীন কাল অপেক্ষাকৃত অল্প করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা নক্ষত্র শব্দের কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া অতীত কাল সংখ্যা অল্প করিয়া ফেলেন। তথাপি বেবর সাহেবকে বলিতে হইয়াছে যে, তৈত্তিরীয় সংহিতা খৃঃ পূঃ ১৭৮০—১৮২০ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। ঐ তৈত্তিরীয় সংহিতা-তেই প্রথমে নক্ষত্রগণের নাম দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতেই কৃত্তিকা আদি নক্ষত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

উক্ত আদি কুরুপাঞ্চালযুদ্ধ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। যেমন বর্ত্তমান কোন কোন বঙ্গ কবির কাব্য হইতে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অন্য আকার দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাস আদি যুদ্ধের কতখানি রাখিয়াছিলেন, কবিকল্পনায় কতখানি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করা অতীব দুরূহ। তবে, যে সময়ে মহাভারত প্রথমে প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে নক্ষত্র শব্দের কাল্পনিক অর্থ প্রচলিত ছিল। এইরূপে জানিতেছি যে, বর্ত্তমান মহাভারতোক্ত যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই। *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* এই প্রবন্ধের অনেক যুক্তি মৎপ্রণীত এবং সম্প্রতি যন্ত্রস্থ "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইল। বস্তুতঃ প্রবন্ধটি ঐ পুস্তকের অংশবিশেষ। তাহাতে সমুদয় উক্তির প্রমাণ আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে অধিক দিলাম না।

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য।

শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শ।

বিগত জানুয়ারি মাসের "সুবিচারসমাগম" পত্রে শ্রীযুক্ত বাসুদেব গোবিন্দ আপ্টে মহাশয় "শিক্ষণপদ্ধতির আদর্শ" ইতি নামধেয় একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। লেখক ইতঃপূর্ব্বে আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, পাঠকের স্মরণ আছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তিনি প্রাচীন গ্রীকদিগের শিক্ষাপ্রণালীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। ইউরোপের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে প্রাচীন গ্রীকপদ্ধতির পরিণামফল, এই প্রবন্ধ পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। আমরা এ স্থলে উহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীসদেশে বালকদিগের শিক্ষার জন্য পাঠশালাদি ছিল না। পিতাই বালকের পালক, শিক্ষক ও পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন। বক্তৃতা ও শৌর্য্য সেকালের গ্রীক-

বীরত্বশিক্ষার যুগ।

শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। যুদ্ধকালে যিনি বক্তৃতা করিয়া সৈনিক-দিগকে উৎসাহিত, উত্তেজিত ও বাহুযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিতেন, সমাজে তাঁহারই প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি হইত। এই কারণে ঐ কালকে আমরা সাধারণতঃ "বীরত্বশিক্ষার যুগ" (Heroic age) নামে অভিহিত করিতে পারি। সেই যুগে রাজপুত্রগণ ও সামন্ত সর্দ্দারের পুত্রগণ ভিন্ন অপর সাধারণের শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকৃত হইত না। সেনাপতি, বিচারপতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের কার্য্য দেশের শাসনকর্ত্তাকেই করিতে হইত। এই কারণে যাহাতে সদসৎবিচারশক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, বুদ্ধিবৈভব, বল, সাহস, তেজস্বিতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ আয়ত্ত করিতে পারা যায়, রাজকুমারগণকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। সেকালে রাজাদিগের শক্তি অপরিমিত ছিল, তথাপি তাঁহাদের ব্যবহারে বিলাসা-ড়ম্বরের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। স্বহস্তে হলচালনা করিতে রাজারা লজ্জা অনুভব করিতেন না। রাজপ্রাসাদনির্ম্মাণকালে রাজা মিস্ত্রীর নিকট কর্দ্দমপূর্ণভাণ্ড হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। রাণীরা ও রাজকুমারীগণ স্বয়ং পাকনিষ্পত্তি, সূত্রকাতন ও বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য করিতেন। হাতুড়ে বৈদ্য, দৈবজ্ঞ ও ভাটগণ, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইতেন। হোমারের রচিত ইলিয়ড কাব্য হইতে গ্রীসদেশের তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

পরকীয়দিগের সংস্রবে ও পারসীকদিগের সহিত সংঘর্ষফলে গ্রীসদেশে নানা বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পারসীকদিগের নিকট গ্রীসীয়েরা উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও বিলাসিতার

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা।

প্রতি আসক্তি লাভ করে। সুতরাং অল্প কালের মধ্যেই প্রাচীন শিক্ষা-নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তৎস্থলে বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সাহিত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার প্রথা গ্রীক সমাজে প্রচলিত হয়। এই সময়ে শিক্ষাক্রম সাধারণতঃ যেরূপ ছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

জন্মাবধি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বালক পিতা মাতার অধীন থাকিয়া গার্হস্থ্যশিক্ষা লাভ করিত। ৮ম হইতে ১৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিদ্যালয়ে থাকিয়া শিখিতে হইত। তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসর (কেবল স্পার্টায় ৫ বৎসর) নাগরিকতা-শিক্ষার কাল। ব্যবহারশিক্ষা বা বিদ্যা-লয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুসারে আচরণ করা গ্রীক শিক্ষার শেষ ও এক প্রধান অঙ্গ। স্ত্রীলোকের শিক্ষা অধিকাংশ স্থলেই নামমাত্রসার ছিল। কেবল স্পার্টান ও ওলিয়ানগণ স্ত্রীশিক্ষা-

বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। এই কারণে উক্ত দুই জাতির মধ্যে অনেক বিদুষী ও কবয়িত্রী রমণী আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

স্পার্টাবাসীর শিক্ষাপদ্ধতি এথেনিয়ানদিগের অনুরূপ ছিল না। স্পার্টানেরা পুরাণ-মতবাদী বা রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন অতি অল্পমাত্রায়

স্পার্টার শিক্ষানীতি।

সাধিত হইয়াছিল। শারীরিক বলবৃদ্ধি ও আজ্ঞাবহতা-শিক্ষার প্রতি স্পার্টাবাসীর অধিক দৃষ্টি ছিল। পারতন্ত্র্য-স্বীকার ও দেশীয় বিধি ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করা তাহাদিগের নিকট ভয়ঙ্কর পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। থার-মাপলির পবিত্রক্ষেত্রে লিওনিডাসের সমাধিস্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ

"Go, tell Sparta, thou that passest by,
That here, obedient to her laws, we lie."

ইত্যাদি শ্লোকেই স্পার্টানদিগের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্পার্টায় শিক্ষাবিভাগের সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতেই প্রদত্ত হইত, এবং রাজাই উক্ত বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ছিলেন। বালক জন্মগ্রহণ করিবামাত্র গৃহস্বামীকে সেই সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত। রাজপুরুষেরা সূতিকাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সদ্যোজাত শিশুর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিতেন। শিশু ক্ষীণ বা বিকলাঙ্গ হইলে তাঁহারা ভূগুপাতনপ্রণালীক্রমে তাহার বিনাশসাধন করিতেন। যে সকল সুস্থকায় বালক এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইত,

বাল্যশিক্ষা।

তাহাদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। রাজপুরুষগণের তত্ত্বাবধানতায় ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বালকগণ পিত্রালয়ে পালিত ও বর্দ্ধিত হইত। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিবামাত্র বালক মাতৃক্রোড় হইতে আচ্ছিন্ন হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক শিক্ষানিবাসে নীত হইত। শিক্ষানিবাসে প্রত্যেক বালকের শিক্ষার জন্য এক এক জন স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত থাকিতেন। যে বালকের প্রতি যাঁহার ভাল-বাসা জন্মিত, তিনি সেই বালকের শিক্ষা ও পালনের ভার প্রাপ্ত হইতেন। যে কোনও সম্ভ্রান্ত বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি শিক্ষানিবাসে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য ছাত্রগণের আচরণের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন। এবং তাহাদিগের আচরণে শিষ্টতা ও বাধ্যতার কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলে তাঁহারা শিক্ষকের কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারিতেন। ব্যায়াম, সঙ্গীত, নৃত্য, সামান্য লিখনপঠন ও মৌখিক মানসাঙ্ক আয়ত্ত করিতে পারিলেই সেকালের বাল্যশিক্ষার চরম হইত। ইহার অধিক আর কিছু শিক্ষা করা রাজবিধিমতে নিষিদ্ধ ছিল। বালকগণ উন্মুক্ত প্রান্তরে, বায়ুবহুল স্থানে সহস্রাধিক দর্শকের সম্মুখে শিক্ষাভ্যাস করিতে বাধ্য হইত। নাগরিকগণ বালকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ গুণ লাভ করিতে উৎসাহিত করিতেন। কখনও কখনও সর্ব্বসমক্ষে প্রতিযোগিতায় পরা-জিত বালক লজ্জায় ও মনঃক্ষোভে জরাগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিত। স্পার্টান-দিগের শিক্ষানিবাসে ছাত্রগণকে চৌর্য্যবিষয়েও শিক্ষা প্রদত্ত হইত। বালকেরা বয়ঃপ্রাপ্ত

চৌর্য্য-শিক্ষা।

হইলে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাহাতে সহজে চুরি ধরিতে পারে, অপরাধিগণ যাহাতে তাহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপে আত্ম-গোপন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই চৌর্য্যবিদ্যা স্পার্টান বালকদিগের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। চৌর্য্যবিদ্যার পরীক্ষায় যে বালক অনুত্তীর্ণ হইত, তাহাকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। কথিত আছে, একবার এক বালক এক খেঁক-শেয়ালের বাচ্চা চুরি করিয়া উহাকে স্বীয় পরিচ্ছদতলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শৃগাল-শিশু বালকের উদরের একাংশ নখরপ্রহারে বিদীর্ণ করিয়া তাহার অন্ত্র বাহির করিয়া

ফেলিল; তথাপি ধৃত, দণ্ডিত ও সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত হইবার ভয়ে বালক সমস্ত ক্লেশ ধৈর্য্যসহকারে সহ্য করিয়াছিল! বালিকাদিগের শিক্ষার জন্যও স্পার্টায় এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেখানে গিয়া বালিকাগণ দৌড়াদৌড়ি, লম্ফ ঝম্প,

বালিকাবিদ্যালয়।

তাণ্ডব নৃত্য ও মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীতাদি করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিত। বাল্যকালে উন্মুক্ত স্থানে এইরূপ স্বচ্ছন্দভাবে ব্যায়ামক্রীড়াদি করায় স্পার্টান রমণীগণ দৃঢ়-কায়া ও নীরোগপ্রকৃতি হইতেন। বালিকাগণের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ই রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহিত হইত।

অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে সামরিক বিভাগে প্রেরণ করিতেন। সামরিক বিভাগ স্পার্টান বালকদিগের "কালেজ" বলিয়া বিবেচিত হইত। তথায় ১২

যৌবনে উচ্চশিক্ষা।

বৎসর উমেদারী করিয়া ছাত্রগণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রসঞ্চালন, যুদ্ধ-কৌশল ও শৌর্য্য সাহসের কার্য্য শিক্ষা করিত। তথায় তাহাদিগকে রুক্ষ অন্ন ভোজন, সৈনিকনিবাসে (ব্যারাকে) অবস্থান, তৃণশয্যায় শয়ন ও অঙ্গে লৌহবর্ম্ম ধারণ করিতে হইত। অশ্বারোহণ, অস্ত্রক্রীড়া, সন্তরণ ও মল্লযুদ্ধ তাহাদিগের প্রমোদক্রীড়ার প্রধান অঙ্গ ছিল। তাহাদিগের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের এক স্থানে বহুসংখ্যক উলঙ্গ অসি ঊর্দ্ধমুখে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স্থাপিত হইত। ছাত্রগণ তাহার মধ্য দিয়া তানলয় অনুসারে নৃত্য ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিতে শিক্ষা করিত।

ত্রিংশৎ বর্ষ বয়সে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে স্পার্টান যুবকেরা "নাগরিক" আখ্যা প্রাপ্ত হইত। নাগরিক আখ্যা লাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের বিবাহ করিবার ও কোনও রাজকীয়

প্রৌঢ় দশা।

ব্যাপারে লিপ্ত হইবার অধিকার থাকিত না। পক্ষান্তরে প্রত্যেক নাগরিককে দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য করিবারও কোনও বিধান ছিল না। বিবাহিত স্ত্রীপুরুষেরাও সাধ্যমত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে যত্নশীল হইতেন। পতিপত্নীর সাক্ষাৎকার ক্বচিৎ কখনও গোপনে সম্পন্ন হইত। স্পার্টান নাগরিকদিগের জীবনের অধি-কাংশ যুদ্ধযাত্রা, মৃগয়া ও সার্ব্বজনিক উৎসবাদিদর্শনার্থ নানা স্থানে পরিভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্যেই অতিবাহিত হইত। গৃহে থাকিয়া দাম্পত্যধর্ম্মপালনের অবসর তাঁহারা প্রায়ই পাইতেন না। এবং সে বিষয়ে তাঁহাদিগের তাদৃশ আসক্তি বা অনুরাগও লক্ষিত হইত না। বাল্যকাল হইতে বীরোচিত শিক্ষা লাভ করায় তাঁহারা বাহুবলগর্ব্বে স্ফীত হইয়া অপরাপর জাগতিক ব্যাপারসমূহকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন। এই কারণে স্পার্টা প্রদেশে শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি ও উচ্চশিক্ষা দ্বারা মনোবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা প্রায় কখনও হয় নাই।

শিক্ষার পরিণাম।

বলা বাহুল্য, এইরূপ একদেশীয় শিক্ষার দোষেই অল্প দিবসের মধ্যে স্পার্টানদিগের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। আমাদিগের বিশ্বাস, ভারতের রাজপুত জাতির অবনতির কারণও কিয়ৎপরিমাণে স্পার্টানদিগের অনুরূপ ছিল। রাজপুতদিগের যেরূপ বাহুবল ছিল, তাঁহারা যদি সেইরূপ শিল্পবাণিজ্য ও রাজনীতিক কৌশলজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অচিরেই তাঁহারা ভারতীয় জাতিসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতেন। ফলতঃ, কেবল বাহুবল, বুদ্ধিবল, বা ধর্ম্মবলে, কখনও কোনও জাতির রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধিত হয় না। সমাজের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ ও তাহাদিগের ত্রিবেণীসঙ্গম না ঘটিলে, কোনও জাতি প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। মহারাষ্ট্র সমাজে এইরূপ ত্রিবেণী-সঙ্গমের সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়াই মহারাষ্ট্রীয়গণ শতাব্দীকালমধ্যে রাষ্ট্রীয় গুণে সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

স্পার্টানদিগের শিক্ষাপ্রণালী শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণলাভের পক্ষে যেরূপ অনুকূল ছিল, নাগরিকোচিত গুণগ্রামের লাভের পক্ষে তাহা সেরূপ ছিল না। শিক্ষাপ্রণালীর এই অভাব দূর

পিথাগোরস।

করিবার জন্য মহাত্মা পিথাগোরস অশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম রাজার সাহায্য না লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নীতিশিক্ষাকে তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান লক্ষ্য বিষয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মঠে থাকিয়া ছাত্রগণ মৌন, চিত্তশুদ্ধি, বিনয় ও বিবেকের আজ্ঞাবহতা প্রভৃতি গুণ শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে, স্পার্টানদিগের ঔদ্ধত্য, শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতা ও নীতিশিক্ষার অভাব বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল।

গ্রীসদেশের দ্বিতীয় বিদ্যাপাঠ এথেন্স নগরে অবস্থিত ছিল। এথেন্সবাসীরা স্পার্টানদিগের ন্যায় স্থিতিশীল ছিলেন না। তাঁহারা পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং এই উন্নতিশীল গ্রীকদিগের শিক্ষাপ্রণালীও যে স্পার্টানদিগের শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা উন্নত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এথেন্স নগরে বে-সরকারী পাঠশালার অভাব ছিল না। বলবীর্য্য-লাভের সহিত উৎকৃষ্ট নাগরিক গুণসমূহ শিক্ষা করা এথেনীয় শিক্ষাপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য

এথেনীয় শিক্ষা প্রণালী।

ছিল। এথেনীয়েরা কঠোর শাসনের পরিবর্ত্তে সদুপদেশের সাহায্যে বালকগণকে অসৎ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে বালকগণ সাধারণতঃ পাঠশালায় প্রেরিত হইত। তৎপূর্ব্বে গৃহে থাকিয়া তাহারা যুদ্ধকাহিনী ও বীররসপ্রধান সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিত। এথেনীয় বিদ্যালয়-সমূহ, "সঙ্গীতশালা" ও "ব্যায়ামশালা", এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সপ্তম বর্ষ হইতেই

বিদ্যালয়ে।

বালকদিগকে উভয় বিভাগে ভর্ত্তি করা হইত। প্রত্যেক পল্লীর বালকেরা প্রাতঃকালে কোনও প্রশস্ত স্থানে সমবেত এবং তথা হইতে সৈনিকদিগের ন্যায় তালে তালে পদবিক্ষেপ করিয়া সকলে এক সঙ্গে পাঠশালায় উপস্থিত হইত। তাহাদিগের পুস্তকাদি ও তন্ত্রবাদ্য লইয়া এক এক জন সিপাহী তাহাদিগের সহিত পাঠশালা পর্য্যন্ত গমন করিত। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বালকগণ বিদ্যালয়ে থাকিত। সেকালেও কোনও কোনও পাঠশালায় একালের মত বালকদিগের বসিবার জন্য কাঠাসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিদ্যালয়ে বালকগণের ব্যবহারের প্রতি শিক্ষকদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। দিবসের প্রথমার্দ্ধ সঙ্গীতশিক্ষায় ও অপরার্দ্ধ ব্যায়ামচর্চ্চায় অতিবাহিত হইত। মূর্চ্ছা, গীত, বাদ্য ও কাব্যাদি সঙ্গীতশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। হোমার ও হিসীয়াড় প্রভৃতি বীররসপ্রচুর ও নীতিপূর্ণ কাব্যাদি পাঠ করিয়া বালকগণের চিত্ত সুসংস্কৃত হইত। লক্ষ্মী (সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) সরস্বতী ও ভগবানে এপোলোর সুগঠিত মূর্ত্তি প্রত্যেক পাঠশালায় স্থাপিত ছিল। উন্মুক্ত স্থানে বালকদিগের জন্য ব্যায়ামশালা নির্ম্মিত হইত। তাহার চতুষ্পার্শ্বে দর্শকগণ সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া যাহাতে ব্যায়ামক্রীড়া দেখিতে পারেন, প্রত্যেক ব্যায়ামশালায় তাহার ব্যবস্থা ছিল। পণসহকারে ধাবন, উল্লম্ফন, লক্ষ্যবেধ, ভল্লসঞ্চালন ও মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি বিদ্যায় বালকগণ পারদর্শিতা লাভ করিত। সংবৎসরের মধ্যে তিন মাস (৯০ দিন) বালকদিগের ছুটী থাকিত।

এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষালাভের জন্য কালেজে প্রেরিত হইত। স্পার্টানদিগের উচ্চশিক্ষা সামরিক শিক্ষামাত্রে পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু এথেনীয়েরা

উচ্চশিক্ষা।

যুবকগণকে যে শিক্ষা প্রদান করিতেন, সমরকৌশলশিক্ষার ন্যায় রাজনীতিবিষয়ক জ্ঞান লাভ করাও তাহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে অশ্বারোহণ, রথচালনা, সন্তরণ, নৌবিদ্যা, প্রকাশ্য সভায়

বক্তৃতা ব্যাখ্যানাদি প্রদান, প্রচলিত রাজনীতিক আলোচনায় যোগদান এবং নৃত্য গীত প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার মানসিক শিক্ষা সেকালে যুবকগণকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল না। এথেন্স নগরে কলেজের ছাত্রগণ শিক্ষানিবাসে বাস করিতে বাধ্য হইত না। শিক্ষা শেষ হইলে তাহারা "নাগরিক" আখ্যালাভের যোগ্য হইত। ঐ আখ্যালাভের জন্য শিক্ষিত এথেনীয় যুবককে মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ও কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রথমতঃ সমবেত নাগরিকগণের সভার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইত। সেই সার্ব্বজনিক সভা হইতে তাঁহাকে অসিচর্ম্ম প্রদত্ত হইলে,

নাগরিকতা।

যুবক উহা গ্রহণ পূর্ব্বক দেবমন্দিরে গিয়া দেবতার সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিত,—"আমি বিশ্বস্ততার সহিত ও ধর্ম্মতঃ নাগরিক কর্ত্তব্যসমূহ পালন করিব; কখনও কর্ত্তব্যপালনে বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবার পর ২।৩ বৎসর সৈনিকবিভাগে চাকরী করিয়া যুবকগণ সমরকৌশলে পাণ্ডিত্যলাভ করিত; তাহার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত।

এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতিও বহুদিন অবিকৃত ছিল না। নাগরিকগণের মধ্যে ক্রমে দলাদলি উপস্থিত হওয়ায় শিক্ষাবিভাগের প্রতি সাধারণের অবধান অল্প হইতে লাগিল। বাণিজ্যবৃদ্ধির

সোফিষ্ট দল।

সহিত বৈদেশিকদিগের সংসর্গে এথেন্সের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। দেশীয় ও বৈদেশিক প্রণালীর সংমিশ্রণফলে, এথেন্সে সোফিষ্ট নামক এক নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাহাদিগের আমূল-পরিবর্ত্তনপ্রিয়তায় এথেন্সের বহু অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। সমস্ত প্রাচীন রীতিনীতির উন্মূলন, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের বেতনবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যলাভ সোফিষ্টদিগের মূলমন্ত্র ছিল। এই নূতন সংস্কারকদিগের কার্য্যফলে এথেনীয়ানদিগের রাষ্ট্রীয়তা (Nationality) বিলুপ্ত হইয়া সমাজে ব্যক্তিবিশিষ্টতা বৃদ্ধি পাইল, সকলেই স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিতে লাগিল। সোফিষ্টদিগের শিক্ষায় ছাত্রগণের মধ্যে নাস্তিকতার বিস্তার হইল, রাষ্ট্রীয় হিতাকাঙ্ক্ষার স্থলে স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাইল, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের স্থান পল্লবগ্রাহিতা দ্বারা অধিকৃত হইল। সোফিষ্টদিগের দ্বারা কেবল এক বিষয়ে গ্রীসদেশ, এমন কি, সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ উপকৃত হইয়াছে। সোফিষ্টদিগের সময়েই গ্রীসদেশে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমানকালের মিশনরিদিগের ন্যায় সেকালের সোফিষ্টেরা পথে ঘাটে দাঁড়াইয়া শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ও সুগ্রথিত ভাষায় যখন দেবদেবীর ও প্রাচীন রীতিনীতির নিন্দা করিত, তখন শত শত গ্রীক যুবক মুগ্ধচিত্তে তাহাদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করিত, এবং তাহাদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত।

এই পরিবর্ত্তনের স্রোত ফিরাইবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এস্‌চিলিস পৌরাণিক নাটকাদি ও অ্যারিষ্টফনিস বহুসংখ্যক হাস্যরসোৎপাদক নাটক রচনা করিয়া

প্রতিক্রিয়া।

প্রাচীন রীতিনীতির শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেরিক্লিজ প্রাচীন আদর্শে ব্যায়ামবিদ্যালয় ও সঙ্গীতশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া এথেনীয়ানদিগকে পুনর্ব্বার একতাসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না; সোফিষ্টদিগের বাক্‌জালে মুগ্ধ যুবকেরা প্রাচীনতার প্রতি আর আস্থাবান্ হইল না। কিন্তু গ্রীস দেশের সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এই বিপ্লবকারীদিগের শক্তিহ্রাস হইল। মহাত্মা সক্রেটীস জন্মগ্রহণ করিয়া এথেন্সের অধঃপতন নিবারণ করিলেন। তাঁহার উপদেশে উচ্ছৃঙ্খল যুবকবৃন্দ সুপথে প্রত্যাবৃত্ত হইল। সক্রেটীসের পর

তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও জোনাথনও সমাজোন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সক্রেটীসের শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে এরিষ্টটলের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রণালীই পরিশেষে গ্রীক জাতির আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। এই কারণে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব।

এরিষ্টটল প্লেটোর নিকট বিংশতি বর্ষ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বিশাল, তর্কপদ্ধতি অভ্রান্ত ও অবলোকনশক্তি (Observation) অতীব সূক্ষ্ম ছিল। তিনি

এরিষ্টটলের উপদেশ।

বলিতেন, বালকের শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে তাহার জন্মের বহু পূর্ব্বে, এমন কি, তাহার পিতামাতার বিবাহের সময় হইতে আরব্ধ হয়। এই কারণে হৃষ্টপুষ্ট ও নীরোগ যুবক যুবতী ভিন্ন অন্য কাহারও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে। তাঁহার মতে ক্ষীণকায় ব্যক্তিগণ ও মল্লগণ যাহাতে বিবাহ করিতে না পারে, রাজার সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য। সপ্তত্রিংশৎবর্ষীয় পুরুষের সহিত অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যহ দেবদেবীর দর্শনের জন্য মন্দিরে গমন করা কর্ত্তব্য। অপূর্ণ-অবয়ব-বিশিষ্ট বালকগণকে বিনষ্ট করিতে অথবা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। বাল্যকালে বালকদিগকে সুরাপান করাইবার যে প্রথা ছিল, তাহা তিনি রহিত করেন। তিনি অল্প বয়সে বালকগণের শিক্ষারম্ভ করিবার বিরোধী ছিলেন। বালকগণকে চীৎকার করিতে তিনি কখনও নিষেধ করিতেন না। ধাবন উল্লম্ফনাদির ন্যায় চীৎকার করাও তাঁহার মতে বালকগণের পক্ষে পথ্যকর। নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার অভ্যাস, নাটকাদি-দর্শন ও অশ্লীলশব্দোচ্চারণ, বালকগণের পক্ষে অতীব অনিষ্টজনক। সপ্তম বর্ষ হইতে একবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে কাব্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও ব্যায়াম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে হাস্যরসোৎপাদক ও সুনীতিপূর্ণ নাটকাদি পাঠ করা বিধেয়। শোকরসপ্রধান নাটক অধিক পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। চিত্রলেখনকলা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় ছাত্রগণের অধিক আসক্তি যাহাতে না জন্মে, তৎপ্রতি শিক্ষকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সঙ্গীতের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে আরিষ্টটল সুদীর্ঘ বিচার করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সকল ছাত্রেরই সঙ্গীতশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। ব্যায়াম সম্বন্ধেও তিনি মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যুবকগণ যাহাতে প্রাচীন স্পার্টানদিগের ন্যায় দুর্দ্দান্ত না হয়, অথচ তাহারা যাহাতে নীরোগ ও দৃঢ়কায় নাগরিক হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম যাহাতে এক সময়েই বালকদিগকে করিতে না হয়, তাঁহার মতে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন ছন্দঃ, ব্যাকরণ, গণিত, ভূমিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত ছিল। তিনি বৃদ্ধগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে ও যুবকগণকে তাঁহাদিগের সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই শেষোক্ত উপদেশের প্রতি আমাদিগের দেশের নবীন সন্ন্যাসী ও তরুণ ধর্ম্মোপদেশকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে রাজ্যরক্ষা ও শাসনকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারে, গ্রীসীয় প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এরিষ্টটলের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয়

উপসংহার।

শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মানসিক উৎকর্ষসাধনের দিকেই তখন শিক্ষাবিভাগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সোফিষ্টদিগের প্রাদুর্ভাবই যে এইরূপ অবস্থান্তরের প্রধান কারণ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তাহারা গ্রীসীয়দিগের রাষ্ট্রীয়তা বিনষ্ট করিয়া দেশে যে ব্যক্তিবিশিষ্টতার যুগ আনয়ন করিয়াছিল, সক্রেটীস, প্লেটো ও এরিষ্টটল প্রভৃতির বহু চেষ্টাতেও তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তথাপি এরিষ্টটলের শিক্ষাপদ্ধতি যে সোফিষ্টদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার নিবারণে সম্পূর্ণ সমর্থ

হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইউরোপের আধুনিক শিক্ষাদানপদ্ধতি এরিষ্টটলের মতের উপর বহুপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। রোমকেরা শিক্ষাবিষয়ে গ্রীকপদ্ধতিরই অনুকরণ করিয়াছিলেন। গ্রীস ও রোম রাজ্য বিলুপ্ত হইলে ইউরোপে বাইবেলের আদর্শে শিক্ষার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই নবপ্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতিও এরিষ্টটলের প্রচারিত তত্ত্বসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সাক্ষিগোপাল।

দক্ষিণ সাগরতীরে উৎকল দেশে ঋষিকুল্য ও বৈতরণী নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পুরুষোত্তম একটি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্বয়ং পুরুষোত্তম নারায়ণ এই স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া, এই স্থানের নাম পুরুষোত্তম হইয়াছে। জনশ্রুতি আছে, এবং কোন কোন পুস্তকে এইরূপ জানিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার সেই পবিত্র দেহ বৃক্ষমূলে পতিত থাকে; পরে কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক ভগবানের সেই দেহ-অস্থি সংগৃহীত হয়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই অস্থিতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করেন। তৎকালে বিশ্বকর্ম্মার সহিত তাঁহার এইরূপ নিয়ম হয়, যদি কেহ এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণসময়ে দর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মা নিরস্ত হইবেন। এই নিয়মানুসারে বিশ্বকর্ম্মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিমাদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া যেমন দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, অমনি বিশ্বকর্ম্মা অন্তর্হিত হইলেন। এই সময়ে জগন্নাথদেবের হস্ত পদ বিনির্ম্মিত না হওয়ায়, সেই মূর্ত্তি তদবস্থায় রহিল।

পরে ব্রহ্মার বরে ঐ মূর্ত্তিই জগন্নাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ইহারই উত্তর পশ্চিমে সত্যবাদী গ্রামে সাক্ষিগোপাল অবস্থান করেন। সত্যবাদী ষ্টেশনের পরেই পুরী ষ্টেশন। বেলা ৭ টার সময় সত্যবাদীতে রওনা হইলে বেলা ৪ টার সময় পুনরায় পুরীতে ফিরিয়া আসা যায়।

প্রশস্ত ইষ্টকমন্দিরে হস্তপদাদিবিশিষ্ট পাষাণমূর্ত্তিকেই সাক্ষিগোপাল কহে। এই সাক্ষিগোপাল সম্বন্ধে ৺কৃষ্ণদাস প্রণীত ভক্তমাল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সংগৃহীত অদ্ভুত ও ভক্তিরসউদ্দীপক একটি গল্প প্রকটিত করাই বর্ত্তমান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

বিদ্যানগরে রাধানাথ ও কৃষ্ণদাস নামে অতিবিশিষ্ট দুই জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহারা দুই জনেই শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত ছিলেন। রাধানাথের গৃহে সুখ স্বচ্ছন্দতার কোন অভাব ছিল না। তাঁহার স্ত্রী পুত্র পৌত্র কন্যা সমস্তই বর্ত্তমান ছিল।

কৃষ্ণদাসের সংসার ছিল না। একদা রাধানাথ কৃষ্ণদাসের সমভিব্যাহারে শুভ যাত্রা করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই তীর্থ-পর্য্যটনকালে কৃষ্ণদাস আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত প্রাণপণে বয়োজ্যেষ্ঠ রাধানাথের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের ভক্তিসন্দর্শনে এবং সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া এক দিন রাধানাথ বৃন্দাবনে দেবালয়ে গোপালের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাসকে কহিলেন, "কৃষ্ণদাস! আমি তোমার গুণে মুগ্ধ ও সেবায় প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার যেরূপ উপকার করিতেছ, তাহাতে আমি যদি তোমার এ উপকারের প্রত্যুপকার না করি, তবে আমার পাপের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আমি স্থির করিয়াছি যে, তোমার হস্তে আমার 'বেলমালা' নাম্নী কন্যারত্নকে সমর্পণ করিয়া তোমার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিব।"

রাধানাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদাস কৃতাঞ্জলিপুটে রাধানাথকে কহিলেন, "আপনি এরূপ অসম্ভব কথা কহিতেছেন কেন? আপনি কুলবন্ত হইয়া কি প্রকারে আমাকে কন্যাসম্প্রদান করিবেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।" রাধানাথ কহিলেন, "আমি কুলাকুল কিছু বুঝি না; যে কর্ম্মে ধর্ম্মরক্ষা হয়, সেই কর্ম্মই উত্তম কর্ম্ম। অকুলীন ব্যক্তিও যদি ধার্ম্মিক হন, তবে তিনিও পূজনীয়; আর কৃষ্ণভক্তিহীন কুলবন্তও অধমাধম। অতএব তুমি অকুলীন হইলেও কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র। কৃষ্ণদাস, আমি তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।"

কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আপনি এরূপ কহিতেছেন, কিন্তু আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ অন্যরূপ কহিবেন।" তদুত্তরে রাধানাথ কহিলেন, "এরূপ বাক্য আমি কখনো কর্ণে স্থান দিব না, কেন না আমার কন্যা আমি দান করিলে আমার পরিবারস্থ লোকেরা কি করিতে পারে?"

কৃষ্ণদাস কহিলেন, "যদি এই মন্দিরস্থ গোপালের সাক্ষাতে আমাকে কন্যা

দান করিতে আপনি প্রতিশ্রুত হইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি।”

তখন রাধানাথ বৃন্দাবনধামে মন্দিরস্থ গোপালকে সাক্ষী করিয়া কৃষ্ণদাসকে আপন কন্যাসম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই রাধানাথ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং আপন পরিবারে কৃষ্ণদাসকে কন্যাদানের কথা ও গোপাল সমক্ষে আপন প্রতিজ্ঞার বিষয় সমস্ত বিবৃত করিলেন।

রাধানাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধানাথের স্ত্রী পুত্র ক্রোধে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল; এবং অপাত্রে কন্যাদান করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল। তাহাদের এতাদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্ত রাধানাথ বড় ব্যথিত হইলেন, এবং সদর্পে কহিলেন, “তোমরা যাহাই বল না কেন, কৃষ্ণদাসের হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবেই হইবে। নচেৎ আমাকে ঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে, কারণ আমি তাহার গুণে বশীভূত হইয়া তাহার হস্তেই কন্যা দান করিব বলিয়া বৃন্দাবনে গোপালকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।”

রাধানাথের স্ত্রী পুত্রও সদর্পে কহিল, “তাহা কিছুতেই হইবে না, কারণ হীন বংশে কন্যা দান করিলে আমরাও হীন হইব। অতএব আমাদের অপমানের সীমা পরিসীমা রহিবে না। তুমি এরূপ কাজ করিলে আমরা সকলে বিষপান করিয়া অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাধানাথ বহুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; পরে কহিলেন, “তোমরা এরূপ কহিলে আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তোমরা বিবেচনা করিয়া কথা কহিতেছ না। আমি গোপাল দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার কি হইবে?”

রাধানাথের পুত্র কহিল, “অবশ্য কৃষ্ণদাস কোন নেশায় তোমাকে বশ করিয়াছিল; নচেৎ ঈদৃশ অন্যায় বাক্য তোমার মুখ হইতে কিরূপে নির্গত হইল? এখন আমরা বুঝিলাম, কৃষ্ণদাস মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। এবার কৃষ্ণদাস আসিলে বিষম প্রহার পূর্ব্বক তাহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিব।”

রাধানাথ কহিল, “আচ্ছা কৃষ্ণদাস যেন প্রবঞ্চক, আমি যে গোপাল দেবতাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার কি হইবে? রাধানাথের পুত্র কহিল, তুমি বারবার গোপালের কথা উত্থাপন করিতেছ কেন?

গোপাল ত এক পাষাণমূর্ত্তি বই আর কিছুই নয়। গোপাল কি আসিয়া সাক্ষ্য দিতে পারিবে? আচ্ছা, তাই যদি হয়, তোমার গোপাল যদি আসিয়া সাক্ষ্যদান করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই আমরা কৃষ্ণদাসের হস্তে বেলমালাকে সমর্পণ করিব।

তখন রাধানাথ একান্তমনে কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হইলেন।

ইহার অল্প দিন পরে কৃষ্ণদাস রাধানাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া রাধানাথের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাসের কথা শ্রবণ করিয়া রাধানাথ মৌনী হইয়া রহিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। তখন রাধানাথের পুত্র আসিয়া কৃষ্ণদাসকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল।

কৃষ্ণদাস সে সময় রাধানাথের মনোভাব উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন, এবং প্রতিবেশীদিগের নিকট রাধানাথের পুত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাধানাথ আমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া আমাকেই কন্যা সমর্পণ করিবেন বলিয়া বৃন্দাবনে গোপালকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মূঢ় পুত্র তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করিয়া নরকগামী করিতেছে।

কৃষ্ণদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবেশিগণ রাধানাথের পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, তোমার পিতা কৃষ্ণদাসকে কন্যাদান করিবে—বৃন্দাবনধামে গোপালের মন্দিরে গোপাল সাক্ষাতে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহাতে অন্তরায় হইতেছ। তোমার কি ধর্ম্মভয় নাই? ধর্ম্মকর্ম্মে যে ব্যাঘাত জন্মায়, তাহার যে কি দারুণ দুর্গতি হয়, তাহা কি তোমার জানা নাই?

রাধানাথের পুত্র ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে এবং রোষারুণলোচনে সর্ব্বসমক্ষে গর্জ্জন করিয়া কহিল, আমার পিতা এরূপ অন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী কে?

কৃষ্ণদাস কহিলেন, গোপাল,—এ কথার সাক্ষী সেই বৃন্দাবনস্থ গোপাল দেবতা!

রাধানাথের পুত্র দ্বিগুণ গর্জ্জন করিয়া কহিল, যদি সেই গোপাল আসিয়া সাক্ষ্য দিতে পারে, তবে কৃষ্ণদাস! অবশ্য তোমাকে আমার ভগ্নী দান করিব, সন্দেহ করিও না।

কৃষ্ণদাস স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, তবে তাহাই হইবে। দেখিও, তখন আবার কলহ করিও না।

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণদাস অনন্যমনে কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে বৃন্দাবন-ধামে যাত্রা করিলেন। এবং গোপালের মন্দিরে সমুপস্থিত হইয়া গোপালের চরণবন্দনাপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে সমস্ত জানাইলেন, এবং সাক্ষ্য দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

গোপাল ভক্ত কৃষ্ণদাসের সাতিশয় ভক্তি সন্দর্শন কবিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং প্রসন্ন হইয়া সাক্ষ্য দিব বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কৃষ্ণদাস গোপালের পদবন্দনা করিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রভু! তোমায় আমার সঙ্গে বিদ্যা নগরে যাইতে হইবে। শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া গোপাল কহিলেন, আমি প্রতিমা হইয়া কিরূপে চলিয়া যাইব? গোপালের পদধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণদাস কহিলেন, প্রভু! তবে তুমি প্রতিমা হইয়া কিরূপে কথা কহিতেছ? তখন ভক্তবৎসল গোপাল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সংকল্প করিয়া মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন,আচ্ছা, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া যাইব। কিন্তু তুমি কখনও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতে পারিবে না; যদি কখনও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাও, তবে আমি সেই স্থলেই রহিব।

কৃষ্ণদাস কহিলেন, প্রভু! আমি কিরূপে জানিতে পারিব যে, তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ?

গোপাল কহিলেন, তুমি আমার চরণস্থিত স্বর্ণনূপুরধ্বনি শুনিতে পাইবে, এবং তাহাতেই আমার আগমন সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর কৃষ্ণদাস প্রীতমনে যাত্রা করিলেন। আর ৺বৃন্দাবন-ধামের গোপাল তাঁহার অনুগমন করিলেন। কৃষ্ণদাসের গ্রামে পঁহুছিবার আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময়ে নদীতটস্থ বালুকণা গোপালপদস্থিত নূপুরের ভিতর প্রবেশ করায় নূপুরের সে মধুর ধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল।

হঠাৎ নূপুরধ্বনি বন্ধ হওয়ায় গোপালের আগমন সম্বন্ধে সন্দেহাকুলচিত্ত হইয়া কৃষ্ণদাস পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন। কৃষ্ণদাস পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলে, গোপাল হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার নিষেধবাক্য অবহেলা করিয়া তুমি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়াছ, অতএব আমি এই স্থলেই থাকিব। তোমার গৃহে আর আমার যাওয়া হইল না।

তখন ভক্ত কৃষ্ণদাস কাঁদিতে কাঁদিতে আপন গ্রামে উপস্থিত হইলেন, এবং রাধানাথের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। রাধানাথ তৎ-শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া স্ত্রী পুত্র পৌত্র কন্যাগণ সহ কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তথায়

উপস্থিত হইলেন, এবং সেই বৃন্দাবনধামের স্বনামখ্যাত গোপালকে সেই স্থলে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

তাঁহাদের সকলের মনেই একবারে ভক্তিসমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

রাধানাথ আপন পরিবারগণ সহ দন্তে তৃণ লইয়া গোপালের চরণপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

অচিরকালমধ্যেই সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা গ্রামের সর্ব্ব স্থানেই প্রচারিত হইয়া পড়িল। এবং গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আসিয়া সেই স্থলে সমুপস্থিত হইল।

অস্তগামী সূর্য্য যখন সাগরজলে অবগাহন করিতেছিলেন, এবং সাগর যখন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া, লহরের উপর লহর ঢালিয়া, ফেনরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে সূর্য্যদেবের অভ্যর্থনা করিতেছিল, সেই সময় সর্ব্বসমক্ষে গোপাল আকাশ-বাণী করিলেন, "রাধানাথ তুমি কৃষ্ণদাসকে কন্যাদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এ কথা সত্য; আমি তাহার সাক্ষ্য দিতেছি। অতএব তুমি কৃষ্ণদাসকে কন্যা সমর্পণ করিয়া আমার সম্মান রক্ষা কর।"

তখন রাধানাথ মনের আনন্দে কৃষ্ণদাসের হস্তে কন্যা দান করিলেন। এবং গোপালকে লইয়া মহা মহোৎসব করিলেন। এই ঘটনার পর কিছু দিন গোপাল সেই বিদ্যা নগরেই ছিলেন। তাহার পর পুরুষোত্তমে জগন্নাথের মন্দিরে রহিলেন।

গোপালকে আপন মন্দিরে দেখিয়া জগন্নাথ এক দিন আপন সেবক-দিগের প্রতি স্বপ্নাদেশ করিলেন যে, গোপাল আমার সমুদয় আহার্য্য আহার করিয়া ফেলে, অতএব আমি কিছুই আহার করিতে পাই না।

জগন্নাথদেবের এইরূপ আদেশ হওয়ার পর গোপালের স্বতন্ত্র পুরী নির্ম্মিত হইল। গোপাল সত্য কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "সত্য-বাদী", এবং সাক্ষী দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "সাক্ষিগোপাল" হইয়াছে। তাঁহার নামেই তাঁহার গ্রামের নাম হইয়াছে—সত্যবাদী।

অগ্রে সত্যবাদীতে সাক্ষিগোপাল দর্শন করিয়া, তাহার পর যাত্রিগণ জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকে।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

কবি শেলি ও তাঁহার মৃত্যু।

বর্ষচতুষ্টয়ের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রতিভা-গগনের তিনটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অকালে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কিট্‌স্ যৌবনারম্ভেই পরলোকে গমন করিলেন; পর বৎসর শেলি স্পিজিয়া উপসাগরে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন; ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বায়রণও পূর্ণ যৌবনে বন্ধুদ্বয়ের অনুসরণ করিলেন। যে প্রতিভার বিকাশ হইতে না হইতেই পৃথিবী এমন অমূল্য রত্নের অধিকারিণী হইয়াছিল, তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইলে, সমগ্র পৃথিবীর গৌরবের আর সীমা থাকিত না। ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্যের মাত্রা এইখানেই শেষ হইল না; আট বৎসর গত হইতে না হইতে সার ওয়ালটার স্কটও অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

কবিমাত্রই স্বভাবের উপাসক; কেহ মানবচরিত্রের পরিচিন্তনে, কেহ বাহ্যপ্রকৃতির ধ্যানে, কেহ বা উভয়ের সাধনায়, আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কিটস্, শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ,

প্রকৃতি-পূজা।

ইহাঁরা প্রায় এক সময়ে আবির্ভূত হইয়া একই অনন্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডার প্রকৃতির পবিত্র শোভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিট্‌স্ প্রকৃতির বাহ্য-শোভায় বিভোর হইয়াছিলেন। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু কমনীয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ, তাহাই সত্য, তাহাই মহৎ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ স্নিগ্ধ, শান্ত, পবিত্র, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বভাবের নৈতিক আধ্যাত্মিক প্রভাবে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার কবিতার স্বাস্থ্যদায়িনী বা সঞ্জীবনী শক্তি পাঠকের প্রবৃত্তি চরিত্র উন্নত করিয়া দেয়। কিন্তু স্বভাবের নৈসর্গিক চিত্র শেলির চিত্রফলকে যেমন সুন্দর, যেমন অবিকল ও যেমন বিশদভাবে উঠিয়াছিল, বোধ হয়, কবিত্বের ইতিহাসে সেরূপ নিতান্ত দুর্ল্লভ। শেলির প্রতিভা স্বভাবতঃই কল্পনাময়ী। তাঁহার কল্পনার কমনীয় সূত্রে সমস্ত প্রকৃতি যেন আপনি গ্রথিত। সুন্দর সুন্দর উপমা, শ্রুতিমধুর ছন্দোবিন্যাস ও বর্ণনার গাম্ভীর্য্য শেলির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। শেলির জীবন সমগ্র প্রকৃতির একটি নিরবচ্ছিন্ন অংশ। স্বভাবেই শেলি আপনাকে হারাইতেন, এবং আপনাকে পাইতেন। স্বভাব ও শেলির জীবনের মধ্যে এমন এক অচ্ছেদ্য বন্ধন, এবং এমন সহানুভূতি ছিল, যেন উভয়ে উভয়ের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। শেলির কবিতার সুধানিঃস্যন্দী উৎস কোন সুদূর স্বপ্নরাজ্যের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া, হৃদয়ের নিভৃত-তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া, প্রাণের কোন বিস্মৃত আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করিয়া, অলসভাবে বহিয়া যায়। সেই কুহকে, সেই মদিরায়, অনেক সময় শেলির কবিতা অর্থশূন্য ও ভাবশূন্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলেও, তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি 'Prometheus Unbound' এর পৃথিবী, সময়ের রূপ কল্পনা, এবং চাঁদের গান এত সুন্দর যে, শেলির সমস্ত ত্রুটী ভুলিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদিগের পক্ষে, শেলির উপাসকগণের ন্যায়, তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সমর্থন করিতে চেষ্টা করা নিতান্তই বিফল। শেলির চরিত্রের বিচার করিতে গিয়া আমরা সাধারণতঃ

সমাজদ্রোহিতা।

একটি বিষয় বিস্মৃত হই। কবি যৌবনোদ্গমেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবনের পূর্ণকাল বাঁচিয়া উৎকর্ষাপকর্ষের নির্ণয় করিবার সমস্ত সুযোগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই। সমাজের রুদ্ধস্রোত পঙ্কিল প্রতিভার বিকাশের স্থান

নহে। হ্যাম্‌লেটের সেক্‌স্‌পিয়র, ফষ্টের গেটে, লর্ড বায়রণ, শেলি, প্রত্যেকেই সমাজশৃঙ্খলের প্রতি তীব্র ভ্রূকুটী করিয়াছিলেন। উদ্দামপ্রকৃতি শেলি এবং লর্ড বায়রণ সমাজ হইতে বহু দূরে গিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ইহাঁদের চরিত্রবিচার সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক এইরূপ লিখিয়াছেন, "বায়রণের মৃত্যুর পর লর্ড মালমস্‌বেরি তাঁহার এক বাক্স চিঠি পাইয়াছিলেন। অনেকগুলি রূপযৌবনসম্পন্না ভদ্রমহিলা বায়রণের প্রেমের বিনিময়ে আত্মীয়, স্বজন, গৃহ, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, জাতিকুলমান সমস্ত উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, এই সকল প্রেমলিপি লিখিয়াছিলেন; বায়রণ ও শেলির দোষগুণের বিচার করিতে হইলে, অগ্রে আমাদিগেরও ঐরূপ এক এক বাক্স প্রেমলিপি দর্শন আবশ্যক।" ফলতঃ, শেলির সম্বন্ধে ম্যাথু আর্ণল্ড সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ বলিয়া মনে হয়,—"Shelley, beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain."

শেলির মৃত্যু যেমন শোচনীয়, তেমনই রহস্যপূর্ণ। মেরি শেলি, লে হাণ্ট, ট্রেলনি কবির শেষ জীবনের যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে।

নূতন জীবনচরিত।

সম্প্রতি ইটালির অন্তঃপাতী ভায়ারেগিও নিবাসী ডাক্তার বয়জি শেলির জীবনের শেষভাগ সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক নূতন কথা জানা যায়। এই পুস্তকে যে সমস্ত প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ফ্লোরেন্স, লিউকা ও লেগহরণের গবর্মেণ্ট সেরেস্তা হইতে সংগৃহীত।

শেলির প্রথমা পত্নী হেরিয়েট—যাঁহাকে যৌবনে শেলি নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেই অবধি শেলির নিকট এইরূপ মৃত্যু এত সুন্দর বোধ হইয়াছিল যে, তিনি জাহাজ মগ্ন হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন।

স্যান টেরেন্সো নামক স্থানে এক দিন তিনি ও জেন উইলিয়ম্‌স্ একখানি জীর্ণ তরণীতে পাল উড়াইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন। নৌকা ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রে চলিল। শেলিকে যেন স্বপ্নাবেশ-বিমুগ্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। জেন্ নৌকা ফিরাইবার জন্য কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সহসা প্রভাদীপ্তমুখে শেলি বলিয়া উঠিলেন, "চল, আজ আমরা দু'জনে মিলিয়া জীবনসমস্যার নির্ণয় করি।" জেন্ বলিলেন, "না, তার চেয়ে বাড়ী গিয়া আমার সন্তানগুলির সহিত আহার করিতে আমি বেশী ভালবাসি।"

আর একবার শেলি, লেগহর্ণ হইতে পিজায় গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হয়। নাবিক সন্তরণপটু ছিল। সে অগ্রে ক্যাপ্তেন উইলিয়ম্‌স্‌কে তীরে রাখিয়া শেলিকে লইতে আসিল; কিন্তু তখনও শেলি সেই মগ্নপ্রায় পোত পরিত্যাগ করেন নাই। সেই জন্য তিরস্কৃত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "বেশ, তোমাদের যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু আমার সে সময় যেমন ভাল লাগিয়াছিল, বোধ হয়, জীবনে কখনও তেমন লাগে নাই।"

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে, শেলি ও এডওয়ার্ড উইলিয়ম্‌স্, উভয়েই সস্ত্রীক পিজায় অবস্থান করিতেছিলেন। শেলি ও উইলিয়ম্‌স্ পরিবারের মধ্যে আদর্শ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। রূপগুণসম্পন্না সঙ্গীতাভিজ্ঞা জেন্, শেলির জীবনে যেন নব জ্যোতিষ্কের মত উদিতা হইয়াছিলেন। রাত্রে ট্রেলনি ইঁহাদের গৃহে আসিয়াছিলেন। ট্রেলনি শেলিকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সে দিন শেলির মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া ট্রেলনি বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শেলি ও উইলিয়ম্ স্পিজিয়ার নিকট গ্রীষ্মাতিবাহন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বায়রণ এই সময় পিজা নগরীতে বাস করিতেছিলেন। শেলির ইচ্ছা ছিল, বায়রণও এই গ্রীষ্মাবাসে

আগমন করেন, কিন্তু Claire Clairmontএর প্রতি বায়রণের নির্দ্দয়াচরণে কবিদ্বয়ের বন্ধুতা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়। স্পিজিয়া উপসাগরের উপকূলে ক্যাসামগ্নি নামক স্থানে শেলি ও উইলিয়ম্‌স্-পরিবার গ্রীষ্ম অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া তথায় গমন করিলেন। এই উদ্দেশ্যে জেনোয়া হইতে একখানি নৌকা প্রস্তুত হইয়া আসিল।

বায়রণের প্রতি ট্রিলনির অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তিনি বোটের নাম 'ডনজুয়ান' রাখিবার প্রস্তাব করিলে, শেলি তাহাতে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু মেরি শেলি ইহার নাম 'এরিয়েল' রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বায়রণ যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয় নায়কের নামে জাহাজের নামকরণ করা হইয়াছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। সুতরাং পোতখানির নাম 'এরিয়েল' রাখাই স্থির হইল।

শেলি এই নৌকায় আরোহণ করিয়া মেঘ ও পবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অনেকবার সমুদ্রে গিয়াছিলেন। প্রাচীন নাবিকেরা নিষেধ করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এই সময়ে তিনি অধিক কবিতা রচনা করিতে পারেন নাই।

লর্ড বায়রণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তখন তিনি অধিক কবিতা রচনায় সক্ষম হন নাই। "আমি বায়রণের সঙ্গে অনেককাল বাস করিয়াছি—সূর্য্যের আলোকে ক্ষুদ্র খদ্যোত নিভিয়া গিয়াছে।" এই সময়ে পোতে বসিয়া তিনি 'Triumph of Life' শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। এই কবিতায় তাঁহার প্রতিভার পূর্ণোজ্জ্বল বিকাশ, তাঁহার কবিতাসরিতে নূতন স্রোত। তাহাতে অপেক্ষাকৃত শান্তভাব, গাম্ভীর্য্য ও সহানুভূতি দেখা গিয়াছিল। এই কবিতার বিষাদক্লিষ্ট শেষ চরণে যেন আমরা শেলির আসন্ন মৃত্যুর আভাষ পাই। একবার ট্রিলনিকে শেলি কিছু 'প্রুসিক এসিড' পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন; তিনি লেখেন,—"বলা বাহুল্য, আজ কাল আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা আমার নাই; কিন্তু অনন্ত শান্তিগৃহের চাবি সর্ব্বদা আমার হাতে থাকা নিতান্ত আরামপ্রদ নয় কি?"

মরণলালসা।

লে হাণ্ট একখানি সাহিত্যপত্রিকার প্রকাশবিষয়ে বায়রণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইটালিতে আসিয়াছিলেন। 'এরিয়েলে' আরোহণ করিয়া শেলি ও উইলিয়ম্‌স্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। লে হাণ্ট ও শেলির মধ্যে যেরূপ প্রণয় ছিল, পৃথিবীতে সেরূপ প্রণয় নিতান্ত দুর্লভ। উইলিয়ম্‌স্ ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলে তাঁহারা লে হাণ্টের নিকট বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। লে হাণ্ট কবি কিট্‌সের প্রণীত একখানি "Hyperion" গ্রন্থ শেলিকে উপহার দিলে, শেলি বলিলেন, "এখানি এখন তুমি রাখিয়া দাও, আবার যে সময় নিজ হাতে আমাকে দিতে পারিবে, তখন দিও।" আকাশের অবস্থা না দেখিয়া লে হাণ্ট শেলিকে সঙ্কটসঙ্কুল সমুদ্রে যাইতে বারংবার নিষেধ করিয়া গেলেন। ৮ই জুলাই সোমবারে পিজা বন্দর হইতে ইঁহারা জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে জলরাশি ধূমোদ্গীরণ করিতেছিল, এবং জাহাজ বহিঃসমুদ্রে আসিবার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া লবণাম্বুরাশি ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, 'এরিয়েল' ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। তিন দিনের মধ্যে 'এরিয়েল' সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পাইয়া ট্রিলনি চিন্তিত হইলেন, এবং বায়রণকে তাঁহার আশঙ্কার বিষয় জানাইলেন। দুই একটি আশঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াই বায়রণের অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শেষ যাত্রা।

জেন্ ও মেরি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা সেই প্রকৃত নিদারুণ বার্ত্তা জানিতে পারেন নাই। পরিশেষে প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহারা লেগহর্ণে যাইবার

উদ্যোগ করিলেন। ইতিমধ্যে লে হাণ্টের নিকট হইতে শেলির নামে একখানি চিঠি আসিল; হাণ্ট লিখিয়াছেন, "তোমরা সোমবারে কেমন অবস্থায় ছিলে,—লিখিবে; আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।" জেনের হস্ত হইতে পত্রখানি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। জেন্ বলিলেন, "তবে সব ফুরাইয়াছে!" মেরি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁহারা উভয়ে পিজায় গমন করিলেন। সেখানে তাঁহাদের কোন সন্ধান না পাইয়া তাঁহারা সত্বর লেগহর্ণে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কাপ্তেন রবার্টসের গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাঁহারা স্ব স্ব অদৃষ্ট বুঝিয়া লইলেন, তবুও তাঁহারা আশা পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা ভায়ারেগিও নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তখন এই শোকাবহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। ১৯শে জুলাই শেলি ও উইলিয়ম্‌সের শবদেহ বেলাভূমিতে সংলগ্ন দেখা গেল। ট্রিলনি, জেন্ ও মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ক্যাসামগ্নিতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমি কোন কথাই বলিলাম না, তাঁহারাও আমাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। মিসেস্ শেলির আকর্ণবিশ্রান্ত লোচনযুগল আমার মুখের উপর নিপতিত ছিল। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম। সেই গম্ভীর ও শোকপূর্ণ নিস্তব্ধতা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তবে আর আশা নাই?' আমি উত্তর দিতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলাম।"

শেলি ও উইলিয়মের মৃতদেহ স্পিজিয়া উপসাগরের সৈকতে বালুকারাশির মধ্যে সমাধিস্থ হইয়াছিল। লেগহর্ণের গবর্মেণ্ট ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা আবেদন করিয়া, ঐ দুইটি মৃতদেহ দাহ করিবার অনুমতি লওয়া হইল। এই দুইটি দেহ যে শেলি ও উইলিয়মসের, এবং উহা যে সমাধি হইতে বহিষ্কৃত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য, ডাক্তার বয়জি অত্যন্ত অধ্যবসায়সহকারে অনেক কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন।

অনুমতি প্রদত্ত হইলে, ট্রিলনি,—যাঁহার উপর এই শোচনীয় কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল,—একখানি দেহপ্রমাণ লৌহপাত্র ও প্রচুরপরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। হাণ্ট এবং বায়রণকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল। ১৫ই আগষ্ট দেহ দুইটির সৎকার আরম্ভ হইল। লে হাণ্ট, ট্রিলনি ও বায়রণ, এক দল সুসজ্জিত সৈন্য এবং স্বদলবল ও স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ সৎকারস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। উইলিয়ম্‌সের দেহ অগ্রে দাহ করা হয়। যখন তাঁহার সমাধি খনন করা হইল, তখন কেবলমাত্র অস্থিমাংসের স্তূপ পাওয়া গেল। ইহা যে উইলিয়ম্‌সের দেহ, বুট দেখিয়া ট্রিলনির সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। বায়রণ উইলিয়ম্‌সের মুখের কঙ্কাল দেখিয়া বলিলেন, "আমি দন্ত দেখিয়া মানুষ চিনিতে পারি; আমি যখন কাহারও সহিত কথা কহি, তখন তাহার ওষ্ঠপুট ও মুখ-গহ্বরের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকে। কারণ, জিহ্বা ও চক্ষু যাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে, ইহারা তাহা ব্যক্ত করিয়া দেয়।" শবাবশিষ্ট কটাহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

বায়রণ বলিলেন, "আমার বেলায় এরূপ করিও না। দেহ যেখানে পতিত হয়, সেইখানেই যেন পচিয়া যাইতে পারে।" চিতা সবেগে জ্বলিয়া উঠিল। বায়রণ এই সময় কাপড় জুতা খুলিয়া সন্তরণ পূর্ব্বক প্রায় এক মাইল গিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

শবদাহ।

ভস্মাবশেষ একটি ক্ষুদ্র বাক্সে তুলিয়া বায়রণের শকটে রক্ষিত হইল। পর দিন ট্রিলনি প্রভৃতি ভায়ারেগিওতে গমন করিলেন; সমাধি খনন পূর্ব্বক শেলির শব বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে দাহ করা হইল।

ডাক্তার বয়জি বলেন যে, শেলির সমাধিস্থান কোথায়, কাগজপত্র হইতে তাহা নিশ্চিত-

রূপে নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহা জানা যায় যে, ট্রিলনির মতে স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন, শান্তিময় ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ;—শেলির পক্ষে আদর্শ বিশ্রামস্থান। বায়রণ ট্রিলনিকে শেলির মস্তকের কঙ্কাল তাঁহার জন্য রক্ষা করিতে বলিলেন; কিন্তু অন্য একটি কঙ্কাল পূর্ব্বে বায়রণ মদ্যপাত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া ট্রিলনি স্থির করিলেন যে, শেলির মস্তক এইরূপে অপবিত্র করিতে দেওয়া হইবে না। সমস্ত দেহ ভস্ম হইয়া গেল, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হৃৎপিণ্ড ভস্মসাৎ করিতে পারিল না। দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। ট্রিলনি অগ্নির মধ্যে হইতে সেই হৃৎপিণ্ড বাহির করিতে গিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলিলেন।

শেলির ভস্মাবশেষ তাঁহার পত্নীকে দেওয়া হইল। তিনি তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক Adonaisএর পাতার মধ্যে রাখিয়া দিলেন। তিনি বলিতেন যে, Adonais যদিও Keatsএর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত, তথাপি ইহা শেলির সম্বন্ধেই অধিকতর প্রযোজ্য। ডাক্তার বয়জি ১৮৯০ সালে ভায়ারেগিও প্রদেশে কতিপয় নাবিক ও নাবিকরমণীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহাদিগের মনে ঐ শবদাহের স্মৃতি তখনও পরিস্ফুট ছিল। ইহাদের এক জন শেলির সমাধির প্রকৃত স্থল নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল;—সমুদ্রবিধৌত দেবদারুবনের সন্নিহিত একটি নির্জ্জন প্রশান্ত বনভূমিই সেই সমাধিস্থান।

কুশীনগরের আবিষ্কার।

কুশীনগরের পথে যে ৭।৮টি বৌদ্ধতীর্থের উল্লেখ ছিল, তাহাদের একটিরও স্থাননির্ণয়ের উপায় ছিল না। কিন্তু কনিংহাম ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারীর অশ্রান্ত পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও উদ্যোগে, তাহা অনাবিষ্কৃত রহিল না। শ্রাবস্তীর পর হিউআন্থস্যাঙ্ অযোধ্যার বর্ণনা করিয়াছেন,—এই সরযূতীরবর্ত্তিনী অযোধ্যায় বহুসংখ্যক বিধর্ম্মী বাস করিত। অন্যান্য প্রাচীন নগর কালমাহাত্ম্যে অদৃশ্য অজ্ঞাত হইলেও, কবিগুরু বাল্মীকির প্রতিভাগুণে অযোধ্যা অমর। হিউআন্থ-বর্ণিত অযোধ্যা কোন বিলুপ্ত নগরী নহে,—প্রাচীন অযোধ্যা; আর, তাঁহার বর্ণিত বিধর্ম্মী আমরা,—অর্থাৎ হিন্দুগণ।

সুতরাং এখন অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, রামগ্রাম, অনোমা, পিপ্পলীবন দিয়া কুশীনগরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই স্থানেই আমরা মহাত্মা কার্‌লীলের কৌশল ও অধ্যবসায়ে বিস্মিত হইব। চীন পরিব্রাজক বলিয়াছেন, অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তীর দূরত্ব ৫০০ লি। পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন যে, ৬ লি'তে এক মাইল গণিত হয়, সুতরাং এ হিসাবে ৫০০ লি'তে ৮৩ মাইলের কিঞ্চিৎ উপর। সুতরাং ৮৩ মাইল উত্তরে সাহেত মাহেত নামক স্থানে অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, সাহেত মাহেতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা আছে। সুতরাং অনুমানে বোধ হইল যে, সাহেত মাহেতই শ্রাবস্তী হইতে পারে। "সাহেত" শব্দও প্রথমে "শ্রাবস্তী"র অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। ক্রমে উক্ত নগরের এক স্থান খনন করিতে করিতে

এক বৌদ্ধপ্রতিমা পাওয়া গেল। তাহার সিংহাসনের নীচে শ্রাবস্তী নগরের নাম খোদিত আছে। এই আবিষ্কারে এই সাহেত মাহেতই যে শ্রাবস্তী, তাহাতে কোন সন্দেহই রহিল না।

শ্রাবস্তী ভগবানের জীবিতাবস্থায় তাঁহার বড় প্রিয় স্থান ছিল, এ কথা বৌদ্ধ ইতিহাসে জানা যায়। কথিত আছে, এখানকার অনাদপিণ্ডদ নামক জনৈক ধনী বুদ্ধ ভগবানের বাসার্থ জেতবন নামক একটি উদ্যান ক্রয় করিবার বাসনা করেন। উহা শ্রাবস্তীর রাজকুমারের সম্পত্তি ছিল। ইহার মূল্য নির্দ্ধারণের সময় রাজকুমার বলেন, সমগ্র উদ্যান স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আবরণ করিতে যত মুদ্রা লাগিবে, উহাই উদ্যানের মূল্য। ভক্ত বৌদ্ধ এই কল্পনাতীত মহার্ঘ মূল্যেও উদ্যানটি ক্রয় করেন। এই শ্রাবস্তীর ৫০০ লি, অর্থাৎ ৮৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কপিলাবস্তু। আমরা কুশীনগরের অবস্থান সম্বন্ধে নবীন-মতালোচনায় দেখিব যে, বঙ্গের স্যানিটারি কমিশনার লামাইক্ (Lamaic) বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাক্তার ওয়াডেল্ (Waddell) এই নগরী আবিষ্কার করিয়া কেমন কীর্ত্তি রাখিয়াছেন। কপিলাবস্তু সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। এই কপিলাবস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের সময় বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল, এবং এখন ওয়াডেল্ সাহেব যাহা চরম সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, হয় ত ভবিষ্যতে তাহাও অপ্রমাণ ও অগ্রাহ্য হইতে পারে। সে যাহা হউক, ৮৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে আসিয়া ভুঁইলাতাল (Bhui Latal) নামক স্থানের ভগ্নাবশেষ উক্ত নগরীর বর্ত্তমান চিহ্ন বলিয়া নির্ণীত হইল। কার্লীল্ সাহেব এই স্থানে মায়াদেবীর মন্দির প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং এই স্থান কপিলাবস্তু বলিয়া নির্ণীত হইল। এই স্থান হইতে ২০০ লি, অর্থাৎ প্রায় ৩৪ মাইল পূর্ব্বে, রামগ্রামে হিউয়ান্থস্যাং একটি প্রকাণ্ড স্তূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। পালী ভাষায় লিখিত মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে ভগবানের নির্ব্বাণের ও উহার অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক দিনের কথা বিবৃত আছে। তাহাতে জানা যায় যে, যখন ভগবানের মৃতদেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণে রাখিয়া দ্রোণান্তরে উহা সংস্থাপিত করিয়া সুগন্ধি চন্দনাদি কাষ্ঠের দ্বারায় দাহ করা হয়, তখন যেমন তৈল বা ঘৃত দগ্ধ হইবার পর ভস্ম বা অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে না, ভগবানের দেহেরও তদ্রূপ কোনও প্রকার ভস্মাবশেষ ছিল না। কেবল কয়েকখানি অস্থি দগ্ধ হয় নাই, অবশিষ্ট ছিল। সেই অস্থি কয়খানি লইয়া বিভিন্ন দেশের রাজারা বিভিন্ন স্থানে যে কয়েকটি সমাধিস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, রামনগরে ইহারই অন্যতম স্তূপ ছিল। স্তূপগুলি অল্পাধিক বৃহৎ নীরেট ইটের গাঁথনি; তাহাদের উচ্চতা ৪০।৫০ হইতে ৩০০ ফুট পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছে। স্তূপের অর্থ ঢিপি। আজ কাল যেমন স্মরণার্থ চিহ্নসূচক মনুমেণ্ট বা অন্য কোন প্রস্তরমূর্ত্তি বা স্তম্ভে স্মরণীয় ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষা করে, পূর্ব্বকালের লোকেরাও এইরূপ স্তূপ নির্ম্মাণ করিত। মস্‌জিদের গম্বুজের আকৃতি স্মরণ করিলে পাঠকেরা অনেকটা ইহার ধারণা করিতে পারিবেন। কোলীয় নামক জাতির দ্বারা রামগ্রামে পূর্ব্বোক্ত যে স্তূপ নির্ম্মিত হয়, হিউআন্থস্যাঙ্ তাহারই

বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং কার্‌লীল্ ভাবিলেন, যদি এই রামগ্রাম যথার্থ চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত রামগ্রাম হয়, তবে নিশ্চয় ইহাতে উক্ত স্তূপ থাকিবে। সৌভাগ্যক্রমে ঐ স্তূপ বর্ত্তমান দেখিয়া অনুসন্ধানকার্য্যে তাঁহার দ্বিগুণ উৎসাহ জন্মিল। এই রামগ্রাম হইতে অনেক ঘুরিয়া তামেশ্বরনাথ মন্দিরের নিকট "কড়োয়া" নামক নালাকে কার্‌লীল্ অনোমা বলিয়া স্থির করিলেন। "কড়োয়া" শব্দের অর্থ 'যাহার উপর দিয়া কেহ পার হয়'। ভগবান সন্ন্যাসী হইবার পূর্ব্বে এইখানে অশ্বারোহণে লম্ফ দিয়া পার হইয়াছিলেন। কার্‌লীল্ এ জন্য অনুমান করিলেন যে, ইহাই অনোমা হইবে। তাঁহার অনুমানের আর একটি কারণ এই যে, এই নদীর অনতিদূরে "শিরসারাও" নামক গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। "শিরসারাও" অর্থে মস্তকমুণ্ডন। অনোমার তীরে সিদ্ধার্থ রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া মস্তকমুণ্ডন করিয়াছিলেন, এই শিবসারাও গ্রামের নামে তাহার পরিচয়। এই তিনটি স্থান বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান। এ তিন স্থানে তিনি অনেক স্তূপাদি দেখিতে পাইলেন। এই স্তূপত্রয়ের ১৮০ লি, অর্থাৎ ৩০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে, নিবিড় ন্যগ্রোধবনের মধ্য দিয়া, পরিব্রাজক মৌর্য্যরাজাদিগের রাজধানীতে উপস্থিত হন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এইখানে উক্ত রাজাদিগের নির্ম্মিত একটি স্তূপ ছিল। বুদ্ধের দেহাস্থির অবশেষ আট জন রাজার মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়; তখন মৌর্য্যরাজারা উপস্থিত না থাকায়, তাঁহারা উক্ত অস্থি হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখিতমনে ভগবানের চিতা-অঙ্গার লইয়া স্বীয় রাজধানীতে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এ জন্য ইহাকে অঙ্গারস্তূপ * বলে। কার্‌লীল্ এই ন্যগ্রোধবনের ভিতর সেই অঙ্গারস্তূপ দেখিয়া এই স্থানকেই উক্ত রাজাদের রাজধানী স্থির করিলেন।

এবারেই গোল। অধ্যবসায়শীল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এত দূর চীন পবিব্রাজকের পদচিহ্ন অতি কষ্টে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এ স্থানে আসিয়া, বহু দিনের অভিলষিতদর্শন ইষ্টদেবের সমাধিমন্দির এবার দেখিতে পাইব, এই আহ্লাদে, হিউঅ্যান্থস্যাঙ্ এই স্থান হইতে কুশীনগরের দূরত্বসীমার নিরূপণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং যে ক্ষীণ আলোকবর্ত্তিকা কার্‌লীলের পথ উজ্জ্বল করিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাণপ্রায় হইল। কিন্তু ইহাতে তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। ফাহিয়ান্ নামক চীনপরিব্রাজক ও হিউঅ্যান্থস্যাঙ্ ঠিক এই স্থান হইতেই কুশীনগরের পথে গিয়াছিলেন, কিন্তু ফাহিয়ান্ এই মৌর্য্য-রাজধানী হইতে কুশীনগরের ১২ যোজন, অর্থাৎ ৮৪ মাইল, দূরত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সকল দিক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, ফাহিয়ানের এ গণনায় ভুল আছে; উহা ১২ যোজন হইতে পারে না, ১২ মাইল মাত্র। কারণ কানিংহাম্ বলেন, "যদি ফাহিয়ানের কথা মত কুশীনগরকে উক্ত অঙ্গারস্তূপের ১২ যোজন পূর্ব্বে ধরা যায়, তাহা হইলে বৈশালী ও বারাণসীর লিপিবদ্ধ দূরত্বের ইতিহাসের তুলনায় ইহা

* The charcoal Stupa.

অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং উহা ফাহিয়ানের কথামত ১২ যোজন হইতে পারে না। বারাণসী হইতে ইহার দূরত্ব না বাড়াইয়া, বা বৈশালী হইতে ইহার দূরত্ব না কমাইয়া, মানচিত্রে কখনই উক্ত নগরীর অবস্থান আরও উত্তর-পূর্ব্বে স্থাপিত করা যাইতে পারে না। এখন বারণসী হইতে কুশীনগর ৭০০ লি, অর্থাৎ ১১৭ মাইল, এ কথা হিউঅ্যান্থস্যাঙ্ বলিয়াছেন। আবার ফাহিয়ানের কথায় বৈশালী হইতে কুশীনগর ২৫ যোজন, বা ১৭৫ মাইল। এবং এই দুই হিসাব তুলনা করিলে, কাশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থানের সহিত, বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহাতে ফাহিয়ানের ১২ যোজন যে ভুল, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ দেখা যাইতেছে। কাশিয়ার নিকট অনুধোয়া নামক স্থান ম্যাপের সরল রেখায় মাপিলে কাশীর ঠিক ১১১ মাইল উত্তরপূর্ব্ব (N.N.E.) সুতরাং রাস্তা ধরিয়া মাপিলে কখনই ১২০ মাইলের ন্যূন হইতে পারে না। আবার কাশিয়া হইতে বৈশালী ঠিক ১৪০ মাইল।

গোরকপুরের ৩৫ মাইল পূর্ব্বে, সাহঙ্কট নামক স্থানের ২৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কাশিয়া নামক স্থান আছে। ইতিপূর্ব্বে উইলসন প্রথমে এই কাশিয়াকেই কুশীনগর বলিয়া স্থির করেন। কানিংহাম্ ইত্যাদি পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, এই কাশিয়াই কুশীনগর। এই কুশীনগরে পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণস্তূপ ছিল, নির্ব্বাণপ্রতিমা ছিল, একটি প্রকাণ্ড বিহার ও তৎসংলগ্ন মন্দির ছিল। কানিংহাম সাহেব ইহার স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া দেখিয়া কতকগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি ১৮৭৬ সালে তাঁহার সহকারী কার্‌লীলকে ইহার সমীপবর্ত্তী স্থান অন্বেষণ করিতে প্রেরণ করেন। কার্‌লীল সাহেব তাঁহার অন্বেষণবৃত্তান্ত উক্ত বৎসরের আর্কিওলজিকাল্ সর্ভে রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বসন্তে।

আজি এ বসন্তে পুন নবীন শোভায়
নিরখি যৌবন নব নিখিলের গায়।
রাঙা রবিছবিকান্তি করিয়া হরণ
রাঙা অশোকের রূপ ভরিছে ভুবন।
কনকের শোভা জিনি কনক-চম্পক
বিথারিছে তনুখানি বিকাশি' কোরক।
লুটিয়া আপন বাস টুটিয়া মুকুল
দিশি দিশি বিলাইছে বাতাবীর ফুল।
শত বুকে শত সুখ করিয়া বিকাশ
ধরণী-রাণীর মুখে ধরেনাক হাস।
আমিই বঞ্চিত শুধু সুখ নাহি পাই,
বুক-ভরা ব্যথা নিয়ে শূন্যে আছি চাই।
ধরার বসন্ত ফিরে আসে বার বার,
প্রাণের বসন্ত ফিরে আসে না কি আর?

জন্মোৎসবে।

পাষাণহৃদয়মাঝে স্নেহের নিঝর,
কে তুমি ঢালিছ সুধা শিলারাশি 'পরে?
মরুময় এ জীবনে কুসুম সুন্দর,
কে তুমি, উঠেছ ফুটি হরষ অন্তরে?
কে তুমি, পূর্ণিমাশশী, অনন্ত আঁধারে
করিতেছ জ্যোতির্ম্ময় আলোকবিকাশ?
কে তুমি হতাশ মরু-হৃদয়-মাঝারে
জাগায়ে তুলিছ নব সুখের আশ্বাস?
কে তুমি, বেদনাতপ্ত হৃদয়ে আমার
আবার দিতেছ শত নব আকর্ষণ?
কে তুমি, আলোকরাশি ঢালি অনিবার
তুলিছ উজল করি মলিন জীবন?
ব্যথিত হৃদয়ে মোর জাগাইতে বল
তুমি কি এ গৃহ মোর করেছ উজল?

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ। ফাল্গুন। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের "বিলাতে সন্তানশিক্ষা" প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নবপ্রকাশিত গীতিকাব্য "চিত্তবিকাশে"র যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে লেখকের সমালোচনাশক্তি অপেক্ষা সহৃদয়তার সমধিক বিকাশ দেখা যায়। হেম বাবুর চিত্রখানি মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "গ্রন্থিবন্ধন" প্রবন্ধে ময়ূরভঞ্জ প্রদেশে প্রচলিত প্রথাবিশেষের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু রচনায় না আছে বলিবার প্রণালী, না আছে ভাষার ভঙ্গী। এবারকার 'প্রদীপে'র প্রবন্ধভাগ্যের প্রশংসা করা যায় না। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, গত মাঘ মাসের "প্রদীপে" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত "পুলিসের বাহাদুরী" ইতিশীর্ষক একটি গল্প মুদ্রিত হয়। গল্পটি মৌলিক নহে, একটি ইংরাজী গল্পের নকল। "প্রদীপের" সম্পাদক মহাশয় "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, গল্পটি যে মৌলিক নহে, তাহা তিনি জানিতেন না; এবং "সম্পাদকীয় সর্ব্বজ্ঞতা" তাঁহাতে থাকিলে এমনটি ঘটিত না। কোনও সম্পাদক সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ করেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা জানি, "প্রদীপের" পক্ষে এরূপ ঘটনা নূতন নহে।—লেখকগণের, বিশেষতঃ পরিচিত লেখকগণের স্বাক্ষরিত রচনা, তাঁহাদের ভদ্রতায় নির্ভর করিয়া, সকল সম্পাদককেই পত্রস্থ করিতে হয়। পৃথিবীর অপরিমেয় বিপুল সাহিত্যের গ্রন্থবিশেষের, বা অগণ্য বিদেশী পত্রের কোন্ পাতা হইতে কোন্ লেখক কি চুরী করিয়া কখন্ আমার মুণ্ডপাত করিবেন, এ আশঙ্কার নিরাস করিতে হইলে, প্রত্যেক সম্পাদকের আফিসে দশ বিশ হাজার গোয়েন্দা রাখিতে হয়। তাহা যখন সম্ভাবিত নহে, তখন সম্পাদকগণকে অগত্যা লেখকগণের ভদ্রতা ও সাধুতার প্রতি নির্ভর করিতেই হইবে। দুনিয়া নিরবচ্ছিন্ন সাধুজনের নিবাস নহে, সুতরাং অন্য বিশ্বাসের যেমন অপব্যবহার হইয়া থাকে, সম্পাদক ও লেখকগণের মধ্যে বিদ্যমান এই যে বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব, কখনও কখনও যে তাহারও ব্যতিক্রম ও ব্যভিচার ঘটিবে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং আমরা আশা করি, এই অপরাধে বঙ্গীয় পাঠকসমাজ আমাদের দলের কাহাকেও ফাঁসি দিবেন না। অতএব, প্রদীপ-সম্পাদক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।—কিন্তু কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি, গত পৌষ মাসের প্রদীপে, [দ্বিতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা] "ইতর প্রাণীর মুখে মানবীয় ভাব" এই নামে যে 'সচিত্র' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছিল, সেটি লেখকবিশেষের বাহাদুরী, না চুরী? বিগত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের Windsor Magazine নামক সচিত্র মাসিকের ৯৭ পৃষ্ঠায় "Human Expression in Animals" নামক একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি Fred Miller নামক এক জনের লিখিত, এবং চিত্রগুলিও তাঁহারই অঙ্কিত। "ইতর প্রাণীর মুখে মানবীয় ভাব" প্রবন্ধটি উক্ত রচনা হইতে সঙ্কলিত, এবং "প্রদীপে" প্রকাশিত চিত্রগুলি Windsor হইতে অবিকল অনুকৃত হইয়াছে। অবশ্য "প্রদীপে" তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় জানিতেন না বলিলে, অনেকে সহজে বিশ্বাস করিবেন না;—কেন না, "সম্পাদকীয় সর্ব্বজ্ঞতা" না থাকিলে, প্রদীপ-সম্পাদক এ ক্ষেত্রে ফ্রেড্ মিলারের অঙ্কিত চিত্রগুলির সন্ধান পাইতেন না। ইংরাজী Windsor হইতেই ত তাঁহাকে ছবিগুলি কাটাইতে হইয়াছে?